

তাহিতি সুন্দরী

সুদূরের পিয়াসী

[এস্কিমোদের দেশে, অভিশপ্ত দ্বীপ, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র]

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৬০

প্রকাশক : বিমল দে
১১এ বিদ্যাসাগর স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রক : নবপ্রেস প্রাঃ লিঃ
৬৬ গ্রে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

সূচীপত্র

এস্কিমোদের দেশে

ভূমিকা

আমি সাহিত্যিক নই, আমি লিখি নেহাতই লেখার জন্য। আমাব ডায়রী থেকে সংগ্রহ কবে বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলোকে সংযোজন করে, সংক্ষেপে আমার প্রিয় যাযাবব এস্কিমোদের কাহিনী, লিখলাম। নেহাতই ভ্রমণ কাহিনী তাই সরসতার পরিবর্তে লেখাটা হয়তো শুকনোই লাগবে— তবুও যারা ভ্রমণ কাহিনী পড়তে ভালবাসেন—পৃথিবীর আব এক প্রান্তের মানুষদের সম্পর্কে যাবা জানতে উৎসাহী—তাদেরই জন্য আমাব এ লেখা।

গ্রীনল্যান্ডেব এস্কিমোদেব প্রসঙ্গে বলার আগে, গ্রীনল্যান্ডের কিছু তথ্য জানা দরকার। আসলে গ্রীনল্যান্ডের ইতিহাস বলতে এমন কিছু নেই। বিখ্যাত অভিযাত্রী ক্নুড় বাসমুসেন (KNUD RUSSMUSEN 1879 1933) সাহেবই সর্বপ্রথম গ্রীনল্যান্ড সম্পর্কে প্রবল উৎসাহী ছিলেন আর তাঁর সময় থেকেই গ্রীনল্যান্ডেব ইতিহাস শুরু হয়।

গ্রীনল্যান্ডে যাবাব জনা আমাব কোনরকম পবিকল্পনা ছিল না। এখানে আসার পুরো কৃতিত্ব লুইস-এব, সেই-ই আমাকে এখানে নিযে এসেছে। সে আমেরিকান আর্মির হেলিকপ্টারের চালক, তাই সে তাব বিষয়ে বিশদ লিখতে বাবণ করেছে। বিনা খরচায় সে শুধু আমাকে নয়, আমার সাইকেলটাকেও এখানে নিয়ে এসেছে। বরফের বাজত্বে সাইকেল চড়ার স্বপ্ন কেউ দেখে না। কাজেই আমাকে এস্কিমোদেব সাথে বেখে সে আমাব সাইকেলটাকে তার ক্যাম্পে (থুল) নিয়ে গেছে, কথা হয়েছে যে গ্রীনল্যান্ড ছাড়াব সময় তার সাথে যোগাযোগ কবলেই, সে সাইকেলটাকে আবার আমার কাছে পৌঁছে দেবে। তার এই সাহায্যেব জনা আমি কৃতজ্ঞ—নয়তো যত প্রিয়ই হোক না কেন এই দ্বিচক্রযানটিকে নিয়ে আমাকে বিব্রত হতে হ'ত। গথ্সহাব থেকে থুলে লুইস্-এর সাথে যোগাযোগ কবে ফিরে পেলাম আমার সাইকেলটা। সেখান থেকে ইউনিভার্সিটি কলেজের মিঃ ব্রঁ ও পোর্ট কমিশনেব সহৃদয়তার যোগাযোগ হয় একটা কানাডিয়ান মাছ-ধরা জাহাজের ক্যাপ্টেনের সাথে— আব সেই জাহাজেই আমি গ্রীনল্যান্ড থেকে আবার সমুদ্রে পাড়ি দিই কানাডাব নিউফাউন্ডল্যান্ডের দিকে।

রাসমুসেন সাহেবেব বাবা ছিলেন খৃস্টান ধর্মপ্রচাবক। তিনি ডেনমার্ক থেকে গ্রীনল্যান্ডে যান ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে; সেখানে তিনি এক এস্কিমোর প্রেমে পড়েন, তাঁদেরই ছেলে হচ্ছে রাসমুসেন। গ্রীনল্যান্ড শুধু ববফের রাজত্ব, কাজেই সেখানে কোন

গ্রীক বা রোমদেশীয় নৃপতিদের পদার্পণ হয়নি, এখানে কোনদিনই যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়নি। এখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে ছিল—সিল, সিন্ধুঘোটক, সাদা ভাল্লুক, বরফে খরগোশ, নীল শেয়াল আর যাযাবর এস্কিমোর দল। আর জলে বিচরণ করতো ছোট বড় রঙ বেরঙের মাছ, অবশ্য তিমি, হাঙ্গর ও জাহাজী মাছের জন্য গ্রীনল্যান্ড সাগর বরাবরই নাম করা। তাই গ্রীনল্যান্ড কোনো রাজা বা রাজ্যের অধীনে ছিল না। ড্যানিস্ সবকাবই সর্বপ্রথম গ্রীনল্যান্ডে মিশনারী পাঠান।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে ড্যানিস্-রাজ রাসমুসেনের নেতৃত্বে এক অভিযাত্রী দল পাঠান—তাদের মূল উদ্দেশ্য গ্রীনল্যান্ড সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ। ছোটবেলা থেকেই রাসমুসেন কায়াক ও স্লেজ চালনায় খুব দক্ষ, আব সেই সাথে সাথে বরফের জন্তু জানোয়ার শিকাবে তাঁর হাত ছিল খুব পাকা। রাসমুসেন গ্রীনল্যান্ড সম্পর্কে ধীরে ধীবে বহু তথ্য সংগ্রহ কবলেন। ওখানকার মাছ, জন্তু জানোয়াব, জলবায়ু, এমনকি গ্রীনল্যান্ডে কত এস্কিমো আছে তাও তিনি জেনে নিলেন।

১৯১০ সালে তিনি তাঁর কৃতকার্যতাব জন্য রাজাব কাছ থেকে বিশেষ খেতাব অর্জন কবলেন। আসলে ঠিক সেই সময় থেকেই গ্রীনল্যান্ড জগতেব দৃষ্টি আকর্ষণ করে। থুল (THULE গ্রীনল্যান্ডের রাজধানী) মিউজিযামে যত্ন করে রাখা হয়েছে বাসমুসেনেব আবিষ্কৃত বহু অজানা তথ্য। তাঁর সম্মানার্থে গ্রীনল্যান্ডে ছোট একটা শহরেব নাম হযেছে কুংগুয়াক (KUUNGUAQ) বা ছোট কনুড়্।

গ্রীনল্যান্ড সাগব ছোট মাছ, হাঙ্গর, তিমি ও সিন্ধুঘোটকেব জন্য পৃথিবী-বিখ্যাত। কৃষিজাত ও খনিজদ্রব্যের জন্য এবা সম্পূর্ণ বহির্জগতের ওপব নির্ভবশীল।

এস্কিমোদের মূল উৎস হচ্ছে নবওয়ে। হাজাব হাজার বছর আগে হয়তো কোনো যুদ্ধ-বিগ্রহের দরুন নরওয়ের কিছু নাগরিক জলপথে পালিয়ে আসে গ্রীনল্যান্ডে, তারপব বাঁচাব তাগিদে তারা পবিণত হয়েছে এস্কিমোতে।

সাধারণত এস্কিমো বলতে বুঝায় যাযাবর আদিবাসী, আজকাল ডেনমার্ক সরকার তাদের লেখাপড়া শিখিয়ে, সহজ ও সরল এস্কিমোদের কলের পুতুল করে গড়ে তুলছে। তামাক, মদ ও ছোঁয়াচে কোন রোগ গ্রীনল্যান্ডে আগে ছিল না, কিন্তু বর্তমান সভ্যতাব নামে তার আমদানী হচ্ছে প্রচুব। তাই তো, সিগাবেট বা মদ ছাড়া আবাব সভ্যতা কিসের! হায় দুনিয়া— এরই নাম সভ্যতা।

সম্পূর্ণ গ্রীনল্যান্ডে বাসিন্দার সংখ্যা হচ্ছে প্রায় তেত্রিশ হাজার। আর সত্যিকারের এস্কিমোদের সংখ্যা নিতান্তই অল্প। দুনিয়ায় যাযাবরদের স্থান নেই বললেই হয়, মাত্র দু'শ পরিবার কোনো রকমে টিকে আছে— তবে সভ্যতার আঁচড় তাদের ওপরও পড়েছে।

যদিও রাসমুসেন সাহেবই সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ গ্রীনল্যান্ড পর্যটন করেছেন, কিন্তু তার আগেও গ্রীনল্যান্ডের বিভিন্ন বন্দরে আগন্তুকদের পদার্পণ ঘটেছে; তবে শান্ত ও

নিরীহ বাসিন্দাদের তখন ধ্যান ভঙ্গ হয়নি— আজকাল গ্রীনল্যান্ডের দিকে দিকে চলেছে অভিযান। মানুষ পৃথিবীর এক বিচিত্র জীব, তার কাজে লাগুক বা না লাগুক সবার ওপব কর্তৃত্ব করার জন্যই যেন তাদের জীবন।

ড্যানিস্ ভাষায় একে বলে গ্রোণল্যান্ড বা বিরাট দেশ— বিরাট দেশই বটে ২,১৭৫,৬০০ কিলোমিটার স্কোয়ার (2,175,600 km^2)। এই বিরাট দেশের অতি সামান্য অংশই আমি ভ্রমণ করেছি, তাই আমার জ্ঞানের পরিধিও সীমিত, অতি ক্ষুদ্র, তবুও জানাই আমি যা দেখেছি।

ইংবেজিতে Greenland বলে, কিন্তু আসল নাম Groenland গ্রোয়েনল্যান্ড।

বিমল দে

হাসির ফোয়ারা ও গ্রীনল্যান্ডের মাটিতে

হাহা হাহা হা হা আ আ.....
হিহি হিহি হি হি ই ই......
হোহো হোহো হো হো ও ও .....

সবাই মিলে হাসছে— হাসছে তো হাসছেই, থামবার নামমাত্র নেই, বুড়োরা ভাঙা দাঁতের ফাঁক দিয়ে হাসছে— যুবকেরা দাঁতের মাড়ি বার করে হাসছে—যুবতীরা ও বুড়িরা হাসতে হাসতে চামড়ার বিছানার ওপর আছাড় খেয়ে পড়ছে—ছোট ছেলেমেয়েরা লাফিয়ে লাফিয়ে হাসছে— আর আমি বেচারা সব দেখেশুনে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে 'থ' মেরে বসে রইলাম। কিন্তু তাতেই বা রেহাই আছে, পাশের বন্ধুটি আমার কাঁধের ওপর হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়লো আর তার মুখের ভেতর থেকে কাঁচা মাংসের উৎকট গন্ধে আমার ভিড়মি খাবার যোগাড়। কিন্তু কতক্ষণ আর বে-রসিকের মতো থাকা যায়—শেষ পর্যন্ত তাদের হাসির জোয়ারে আমিও ভেসে গেলাম— ওদের অদ্ভুত ধবনের হাসি দেখে আমিও হাসতে হাসতে ফেটে পড়লাম। চললো হাসির মহড়া—ওঃ এদের হাসি যেন আর থামতে চায় না—হাসছে তো হাসছেই— কিন্তু আসল কারণটি কি মাথামুণ্ড কিছুই বোঝবার উপায় নেই। অনেক পরে তাদের হাসি থামলো, —আসলে সব হাসি ফুরিয়ে গেছে কি? তা নয়, হাসতে হাসতে এদের পেটে খিল ধরে গেছে, তাই বাধ্য হয়ে থামতে হ'ল। চোখের জলে ও জিভের জলের সঙ্গম ঘটিয়ে এরা পেটে হাত দিয়ে সবাই হাঁপাতে লাগলো—হ্যাঁ-এই হচ্ছে এস্কিমোদের হাসির ব্যাপার।

আগে কোনোদিন ভাবতেও পারিনি যে আমাকে এই ইগলুর মধ্যে এদের সাথে বাস করতে হবে— তাই এদের সব কিছুই আমার কাছে শুধু নতুন নয়, উদ্ভটও বটে।

আমি এদের সাথে আছি প্রায় মাসখানেক হতে চললো— অবশ্য মাসখানেক বলা ভুল হবে, কারণ এখানে এখন সূর্যাস্ত বা সূর্যোদয়ের কোনো ব্যাপারই নেই; এখন গরমকাল, সূর্য প্রায় সব সময়ই মাথার ওপর রয়েছে— উত্তর মেরুর ব্যাপারই আলাদা। পরে আমি এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করবো।

আসা যাক্ পূর্ব প্রসঙ্গে অর্থাৎ যদিও আন্দাজ মতো প্রায় মাসখানেক হ'ল এদের সাথে রয়েছি, কিন্তু আজ পর্যন্ত এদের ভাষায় মাথামুণ্ড কিছুই আয়ত্তে আনতে পারিনি, কাজেই এদের হাসির ব্যাপারটি আমার কাছে এখনও বোধগম্য হয়নি। তবে আমি হাসির পরিবেশটি বলতে পারি। রোজই শিকার থেকে ফিরে এসে আমরা সবাই ইগ্‌লুব মধ্যে ঢুকি, তারপর চলে আমাদের আহারের প্রস্তুতি। খাবার মানে ফুটন্ত জলের ভেতর মাংস ছেড়ে দেওয়া। তারপব আধসেদ্ধ মাংসগুলো উনোনেব ওপর থেকেই তুলে তুলে খাওয়া হচ্ছে।

আমাদের ইগ্‌লুটি বরফের তৈরি নয়। এখন গরমকাল, তাই চাঙা বরফ গলে যাওয়ার ভয়ে এটা চামড়ার তৈবী। এই গোল ঘব আমাদের দেশের অনেকটা গোলপাতার ছাউনিব মতো। এই ঘরের মাঝখানে টিনেব তৈবি উনোন অনেকটা তিন-ইটের উনোনেব মতো। আর তাকে ঘিরে আমবা এগাবোজন। উবান— তার স্ত্রী, বাবা মা আব দুই মেয়ে এক ছেলে, তাদের বয়স আট থেকে এগাবো বারোর মধ্যে। উবানের বাবা— আবা রোজই আমাদেব খাবাবেব পব গল্প বলেন আর তার সেই গল্প শোনাব জন্য আমাদেব পাশের ইগ্‌লু থেকে আবও চারজন এসে জড়ো হয়েছে। 'আবা'ব গল্প বলাব ধরনটি বেশ ভাল, গল্প বলার সময় তার দেহে যেন হাতীব বল। গল্প বলাব সময় শুধু যে তার মুখ এবং হাত চলে তাই নয়, সাথে সাথে সমস্ত শবীবেব অঙ্গভঙ্গি দেখবার মতো। গল্পেব আসল সারমর্ম হচ্ছে তাব প্রাচীন শিকাব কাহিনী অর্থাৎ কি করে সে একদিন একা তিমিমাছ শিকাব করতে গিয়ে নাস্তানাবুদ হয়ে গিয়েছিল। রোজ সেই একই গল্পেব পুনবাবৃত্তি চলে আর সাথে সাথে চলে হাসিব ফোযাবা। সত্যি এদেব এমন মন মাতানো প্রাণ ফাটানো হাসি আমি জীবনে দেখিনি। আমি অবশ্য কোনোদিনই চেঁচিয়ে হাসবার চেষ্টা করিনি, কিন্তু ওদেব পাল্লায় পড়ে আমাকেও জোবে শব্দ কবে হাসতে হচ্ছে। কি বিপদ বলো দেখি, জোবে না হাসলে নাকি হাসিই হ'ল না, আর হাসতে হাসতে যদি গড়িযে না পড়লাম তা'হলে আর হাসি কোথায়? ওদেব মধ্যে থেকেই আমি বুঝলাম যে—সত্যিকাবেব হাসি— 'শান্ত সরল ও সুন্দবেব প্রকাশ আর বয়সেব কোনো মাপকাঠি দিয়ে তার যাচাই চলে না,— মন যেখানে মুক্ত হাসিব সেখানে প্রাচুর্য।' বর্তমান সভ্যতাব চাপে পড়ে আমবা দিন দিন হাসতে ভুলে যাচ্ছি— নির্মল হাসির মধ্যেই যে সত্য শিব ও সুন্দরের প্রকাশ এই প্রথম জানলাম।

সকলের সাথে সাথে আমিও পেটের পিলে ধবে হাঁপাচ্ছি— এইভাবে যদি আর কিছুক্ষণ থাকতাম হয়তো আমার পিলে ফেটে যেতো। জানি না হাসির উৎস পেটের ভেতর কি না—কিন্তু হাসির পরে যে পেটে এক অদ্ভুত ধীর-মোচনের একটা যন্ত্রণা সে সম্পর্কে আমি নিশ্চিত। চামড়ার বিছানাব ওপর এতক্ষণে আমরা গড়িয়ে পড়েছি। বুড়ো বাবা— আবা উট্‌কো হয়ে বসে এখন হাসিব শেষ ধাপে পৌঁছেছেন —পাশের ইগ্‌লু থেকে আসা বন্ধুরা বিদায় জানালো। গরমেব দিনের এই হচ্ছে একদিন বা দিনেব শেষ। অবশ্য দিনেব শেষ বলতে সূর্যদেব একটু অন্তিম দিকে হেলে পড়েছেন—ব্যাস ওই পর্যন্তই। তার পুরোপুরি অস্ত এই ছয় মাসে বন্ধ থাকে, উত্তর গোলার্ধের আকাশ।

এস্কিমোদের সাথে আমি ছিলাম প্রায় তিন মাস। এদের সম্পর্কে আরও বলতে গেলে আগে শুরু করা ভাল— আমার প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা থেকে।

ছিলাম আইস্‌ল্যান্ডে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত মেরুরেখার কাছাকাছি একটি দ্বীপে। সেখান থেকে পাইলট বন্ধুর সহায়তায় তারই হেলিকপ্‌টারে করে এসে পৌঁছলাম গ্রীনল্যান্ডের অন্যতম প্রধান বন্দর আংমাগ্‌শালিকে।

ঘড়িব সময় অনুযায়ী এখন রাত দুটো, অথচ পশ্চিম আকাশে সূর্য এখনও দেখতে পাচ্ছি। আশ্চর্য হয়ে লুইস্‌কে (Luis) জিজ্ঞেস করলাম,

—বলো কি? এখন রাত দু'টো?

—হ্যাঁ এই দেখো, সে আমায় তার ঘড়িটা দেখালো— ২৪ ঘণ্টার দাগ দেওয়া ঘড়িতে সবে দু'টো। আমরা দিব্বি সব পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, এমন কি এই আলোতে পরিষ্কার খবরের কাগজ পড়া যায়। তাইতো এই দেশকে বলে 'নিশিথ-সূর্যের দেশ'। গবমের ছ'মাস সূর্যের অবস্থান উত্তব গোলার্ধে। আমরা এখন উত্তর গোলার্ধের উত্তরে—এখানকার অক্ষাংশ হচ্ছে ৬৫ ডিগ্রী (উত্তর)। অবশ্য ৬৫ ডিগ্রির আরও উত্তরে আমি গিয়েছি। নরওয়েব ট্রম্‌সো-এ'ব থেকেও উত্তরে।

—চলো একটু কফি খাওয়া যাক।

লুইস্‌-এর সাথে আমরা কাছাকাছি একটা কফিব দোকানে ঢুকলাম। এ দোকানগুলো ২৪ ঘণ্টাই খোলা থাকে। কফির দোকানে ঢোকাব সাথে সাথেই একজন লোক (পুরো চামড়ায় ঢাকা দেহ) আমাদের দিকে এগিযে এলো— লুই-এর সাথে কথাবার্তায় বুঝলাম যে এর ভাষা ড্যানিস্‌। ভদ্রলোক আসলে পুলিশ, আমার পাসপোর্ট দেখতে চাইল— আমার তো মুখ চুন! কাবণ গ্রীনল্যান্ডে আসার আমার কোনো পরিকল্পনা ছিল না— তাই এখানকার কোনো ভিসাও নিইনি। ভদ্রলোক আমার পাসপোর্টের পাতা না উল্টেই আমাকে জিজ্ঞেস করলেন,

—কোত্থেকে আসছেন?

—আপাততঃ রেক্‌জাভিক্‌ থেকে।

—তার আগে কোথায় ছিলেন?

—ইউরোপে।

—হ্যাঁ, ডেনমার্কে কোনোদিন গিয়েছেন?

—গিয়েছি।

—ডেনমার্কের ভিসা কোথায়?

মনে মনে ভাবলাম আচ্ছা রকম পুলিশতো— আছি গ্রীনল্যান্ডে অথচ ইনি দেখতে চাইছেন ডেনমার্কের ভিসা। কিন্তু মুখে আমার বিরক্তি প্রকাশ করলাম না। শুধু বললাম ডেনমার্কে যেতে হলে আমাদের ভিসার দরকার হয় না। অবশ্য ৫ বছর আগেও ভিসার দরকার হতো, কিন্তু আজকাল ফ্রি।

ভদ্রলোক আমার জবাবে খুশী হলেন, আমাকে ধন্যবাদ জানালেন। লুইস্ অবশ্য এখানকার পরিচিত লোক, ওর মুখে শুনেছি যে আইস্ল্যান্ড থেকে গ্রীনল্যান্ডে ওর হেলিকপ্টার মাসে প্রায় দশবার যাতায়াত করে।

একটা টেবিল ঘিরে আমরা বসলাম— কোনিয়াক্ ও হুইস্কির বোতল টেবিলের ওপর সাজানো— 'সেল্ফ্ সার্ভিস সিস্টেম' (Self Service)। অনেক পুরোনো কাঠের তৈরি দোকান, অনেকটা পাহাড়ী বাড়ির মত। দেয়ালের গায়ে কিং ফ্রেডরিক ও রানীর ছবি আমার চোখে পড়লো, সেদিকে তাকিয়ে কফিতে এক চুমুক লাগিয়ে লুইস্‌কে জিজ্ঞেস করলাম,

—ব্যাপার কি? গ্রীনল্যান্ডে ডেনমার্কেব রাজা-রানীব ছবি দেখছি।

—সে কি, তুমি জান না? গ্রীনল্যান্ড তো ডেনমার্কের অধীনে। আমরা তো গ্রীনল্যান্ডকে ডেনমার্কের কলোনি বলি।

—আচ্ছা— তাই নাকি। বুঝলাম আমি এ লাইনে একান্তই মুর্খ, তাই চেপে গেলাম। এতক্ষণে বুঝলাম কেন এই পুলিশ ভদ্রলোক আমাকে ডেনমার্ক সম্পর্কে এত প্রশ্ন করছিলেন। আমরা তারপর ওখান থেকে বেবিয়ে এলাম। দোকানে পয়সাব জন্য কোনো অসুবিধা হয়নি— কারণ ওরা আইস্ল্যান্ডের মুদ্রা নিতে দ্বিধা করে না।

বাইরে বেরিয়ে দেখলাম— মন্দ নয়, যদিও শীত প্রায় শূন্য ডিগ্রিব কাছাকাছি, তবে পর্যাপ্ত পরিমাণ পোশাক থাকায় আমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। গ্রীনল্যান্ডটা অনেকটা আইস্ল্যান্ডের* মতোই, তবে সবচেয়ে বেশি তফাৎ যেটা চোখে পড়ছে তা হচ্ছে আইস্ল্যান্ডের মাটি বলতে শুধুই আগ্নেয়গিরির লাভা আর গ্রীনল্যান্ডে তা নয়। এখানে পাথর ও সামান্য বালিমাটির আভা পাওয়া যায়; কিন্তু শীতের জন্য কোন গাছপালাই জন্মে না। গরমকাল ও শীতকালের সবচেয়ে যে প্রভেদ তা হচ্ছে আকাশ; গরমকালে আকাশ পরিষ্কার আর শীতকালে প্রায় সব সময়ই কুয়াশায় ঢাকা। শীতকালে তাই চারদিকে বরফ আব ববফ। গ্রীনল্যান্ডের সমুদ্রে বরফের পাহাড় অর্থাৎ আইস্‌বার্গ —কিন্তু গরমকালে সমুদ্রে জল দেখা যায়।

আমরা হাঁটতে হাঁটতে আরও এগিয়ে এলাম— দু'পাশে কাঠের বাড়ী আর তার মাঝখান দিয়ে উঁচু নিচু রাস্তাটা এগিয়ে গেছে। রাস্তায় কোন লোকজন চোখে পড়ছে না—সাধারণতঃ সূর্য যখন পশ্চিমদিকে একটু হেলে আবার গোলাকার হয়ে পূর্বদিকে যায় তখনই এদের রাত।

আমরা হাল্কা ধবনের কথাবার্তা বলতে বলতে এগিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ পেছন থেকে যমদূতের মত প্রায় পাঁচ ছ'টা কুকুর আমাদের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়লো। হঠাৎ যেন ভিয়েতনাম—লুইস্ আমাকে সাবধান করে দিল।

—চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়, কোনো ভয় নেই।

—ভয় নেই কিন্তু ভরসাই বা কোথায়! এই মুখপোড়া যমদূতের কি অন্য কোনো কাজ নেই। কিন্তু কি বিপদ —এইভাবে আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যায়। আর কুকুরগুলোও লেজ তুলে তারস্বরে চিৎকাব কবছে।

—ভয় পেও না, এগুলো এস্কিমোদের হাস্‌কি কুকুর। এবা সাধারণতঃ কামড়ায় না, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত না এদের মালিক আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত এরা একদম নড়বে না।

লুইস্ এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ, কাজেই আমিও ওব কথা অমান্য করে বিপদ ডাকতে চাই না। সত্যি কিছুক্ষণেব মধ্যেই দেখলাম আশপাশেব ঘর থেকে দু'জন বেবিযে এল। একজন কাছে আসতেই লুইস্‌কে চিনতে পাবলেন। কুকুবগুলোকে ধমক দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে ভদ্রলোক আমাদেব উদ্ধাব কবলেন।

লুইসেব মাধ্যমে পরিচিত হলাম এখানকাব একজন ব্যবসাযী এস্কিমো। ভদ্রলোক ইংবেজি বলেন। নাম —মেমা।

—আমি হেলিকপ্টারে আওয়াজ শুনেই বুঝতে পেবেছি যে কে আসছে। চল তোমাব বন্ধুকে নিয়ে ঘরে বসে একটু চুরুট খাওযা যাক।

—চল —আমবা সবাই মাথা নিচু কবে ছোট একটা কাঠের ঘবে এসে বসলাম—চুরুটেব ধোঁয়া ও তাব গন্ধের সাথে খাপ খাইয়ে আমাদেব গেঁজানো চলতে লাগলো। লুইস্ ও মেমার আকর্ষণীয় প্রসঙ্গ হচ্ছে 'সুন্দরী তরুণী'— আইসল্যান্ডে এবাবে কাব বিছানায কে ক'দিন শুয়েছিল, আব কে দুষ্টুমি কবে শেষ বাতে সিগাবেটেব ছেঁকা লাগিয়েছিল তারই সবস গল্প। লুইস্ অবশ্য মেয়েটাকে আচ্ছা জব্দ কবতে পাবতো, কিন্তু কিছু বলেনি, তাব আসল কারণটা হচ্ছে মেয়েটা সুন্দবী এবং অল্পবযসী। একটু আধটু ছেলেমানুষীকে প্রশ্রয দিতে হয, নযতো ভাল ও কচি মাল পাওযা আজকালকার বাজারে দুষ্কব। মেমা যেমন এস্কিমোদের কাছ থেকে সস্তায় চামড়া কিনতে পটু তেমনি লুইস্‌ও কচি চামড়াব ব্যাপাবে কমতি যায় না।

সময় কাটাবাব এটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ। আমি জানি এ প্রসঙ্গ একবাব উঠলে চট করে থামে না। কাজেই আমাদেব ছোট্ট কাঠের ঘরটাকে সবগবম কবে তুললো— লুইস্ ও মেমাব সরস গল্প। গল্পেব মাঝে মাঝে হো হো করে মেমার হাসি— মাঝরাতে সকলের ঘুম ভাঙানোর পক্ষে যথেষ্ট।

এবার লুইস্ আমাকে অনুরোধ করলো— আবে ভাই, তুমি তো রিয়েল টুরিস্ট, ছাড়ো না কিছু, অত চুপচাপ কেন? পকেটে ছবি-টবি কিছু আছে?

এমন ক্ষেত্রে আমি ভাবলাম কিছু ছাড়া দরকাব, কাজেই আমিও কিছু গুয়া মুসুরী শুরু করলাম। .....

ঘড়িতে এখন ছ'টা বাজে। কোথা দিয়ে যে ৪ ঘণ্টা কেটে গেলো বুঝতেই পারলাম না। মেমার সাথে আমার ভাব হয়ে গেলো, ঠিক হ'ল আমি থেকে যাবো ওর সাথে, লুইস্‌ও তাতে রাজি হয়ে গেলো। আমরা সবাই মিলে আবার এলাম হেলিকপ্টারের কাছে। আমার পিঠের ব্যাগটা নিতে হবে; অবশ্য আমার সাইকেলটা হেলিকপ্টারেই রাখতে বাধ্য হলাম।

লুইস্ আসলে কাজ করে আমেরিকান এয়ার ফোর্সে, ওর হেড্‌কোয়ার্টার হচ্ছে—থুলে (Thule)। ওর কাছ থেকে ব্যাগটা নিয়ে আমরা ওকে বিদায় জানালাম—মাথায় চরকি ঘুরিয়ে লুইস্‌ও আমাদের বিদায় জানালো।

মেমার সাথে আমি ফিরলাম, বলাই বাহুল্য যে ওর সঙ্গী কুকুরগুলোও আমাদের পেছন পেছন ঘুরছে। আমি থেকে গেলাম, কিন্তু জানি না কবে কি করে আবার আমি ফিরে যাবো।

এই হচ্ছে আমার গ্রীনল্যান্ডে আগমন। মেমার সাথে আমার দিন দিন ভাব জমে উঠলো। ওর দোকানে কাজ করি— চামড়াগুলোকে রোদ্দুরে দিই আর সময় পেলেই আশপাশের লোকদের সাথে ভাব জমাই —অর্থাৎ আছি পরমানন্দেই। অদ্ভুত দেশ—পৃথিবী ছাড়িয়ে সম্পূর্ণ এক রূপকথার দেশে যেন এসে পড়েছি, যেখানে শুধুই দিন, রাতের কোনো বালাই নেই। মেমাও আমায় পেয়ে খুশী। কর্মী হিসেবে আমি খুবই ভালো অথচ বিনা পয়সায়। কাজেই আমি যতদিন খুশী থাকতে পারি। মেমার বউ ও ছেলে-মেয়ের সাথে প্রথম প্রথম মিশতে একটু অসুবিধা হয়েছিল কারণ ওরা কেউ ইংরেজি বুলি জানে না, কিন্তু পরে আমার আন্তর্জাতিক ইসারা ভাষার মাধ্যমে সব ম্যানেজ হয়ে গেল। মেমা এস্কিমো বটে কিন্তু ওর জীবনযাপন এস্কিমোদের থেকে অনেক উন্নত। সাধারণ এস্কিমোরা শিকার করে জীবজন্তুর চামড়া এর কাছে নিয়ে আসে— তার বদলে ওরা পায় স্টোভ কেরোসিন-কাঠ-দেশলাই লোহার যাবতীয় জিনিস। অথবা বিক্রি করে সেই টাকাতে কেনে এদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। রোজই যে বেচাকেনা চলে তা নয়, কোনো কোনোদিন হয়তো সারাদিনে একটা খদ্দের পাওয়া যায়। মেমার ব্যবসা হ'ল, এস্কিমোদের কাছ থেকে চামড়ার যাবতীয় জিনিস খরিদ করা। আর তারপর সেগুলোকে চড়া দরে ইউরোপের বাজারে বিক্রি করা। সাদা ভালুকের চামড়ার কোট অথবা নীল শেয়ালের ফার-এর তৈরি পোশাক অভিজাত মহলে এক বিরাট চাহিদা।

আর কিছুদিন ওর দোকানে থাকার পর ইচ্ছা হ'ল আরও দূরে যেতে, কিন্তু একমাত্র শহর ছাড়া যাতায়াতের কোনো উপায় নেই। কাজেই সুযোগের অপেক্ষায় রইলাম।

হঠাৎ একদিন মেমার এক পুরোনো বন্ধু ওর দোকানে এসে হাজির। ওর সাথে এনেছে একটা বিরাট সিন্ধুঘোটকের চামড়া— সিন্ধুঘোটকের অনেক গল্প পড়েছি

কিন্তু আজ পর্যন্ত জ্যান্ত চোখে পড়েনি— তাই খুব মনোযোগ সহকারে চামড়াটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলাম— অনেকটা ছাই রঙের মোষের চামড়ার মত। ঘরের ভেতর এসে এ সম্পর্কে নানারকম প্রশ্ন করতে লাগলাম। আমার প্রশ্নে হয়তো অনেকটা বিরক্ত হয়েই মেমা বললো— তোমার যদি অতই জানার সখ থাকে তাহ'লে চলে যাও এর সাথে শিকাবে। যদিও ও বিরক্তিতেই একথাটা বললো কি না জানি না— কিন্তু আমি আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম। আমি খুব সিরিয়াসভাবে কথাটা নিলাম। মেমা আমার অনুরোধে ওর বন্ধুর সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিল আর সেই সাথে সাথে জিজ্ঞেস করলো উরান আমাকে নিতে রাজি কি না। হয়তো মেমা আমার সম্পর্কে খুব উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছে তাই দেখলাম উরানও আমাকে নিতে রাজি হয়ে গেলো। বলাই বাহুল্য যে উরান এস্কিমোদের কথোপকথন ছাড়া অন্য ভাষা জানে না। এস্কিমোদের সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা অতি সামান্য অর্থাৎ এ-কদিনে মেমার সাথে থেকে যতটুকু বুঝেছি। আমি উরানের সাথে রওনা দিলাম। আমাব পিঠের ব্যাগটা ঠিক করে নিয়ে বিদায় জানালাম মেমাকে— জানি না কোথায় যাচ্ছি— কার সাথে আর কবেই বা ফিরবো। আংমাগ্‌শালিক থেকে আমবা রওনা দিলাম দক্ষিণের দিকে।

সাধারণতঃ আমরা এক জায়গা থেকে যখন আর এক জায়গায় যাই তখন সে সব জায়গাব নাম ব্যবহার কবি। কিন্তু কল্পনা কবা যায় কি যে কোথায় যাচ্ছি তার নাম নেই। মরুভূমিতে যাযাবরদের সাথে যখন ছিলাম তখনও ওই একই রকম অর্থাৎ আঙুল দেখিয়ে বলতে পাবি যে কোথা থেকে আসছি এবং কোথায় যাচ্ছি। কিন্তু যেখানে জনমানবের বসতি নেই, যে জাযগা মানুষের কাজে লাগে না অথবা যে জায়গাব মাধ্যমে কোনো কিছুব মানে বোঝায না তার আবার নাম কি? উরান আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তা জানি না।

মেমার বন্ধু উরান। এখন আমাব সঙ্গী, যদি ঠিক মতো এর চেহারার বর্ণনা দিই তাহ'লে আমাদেব দেশের ঠিক "শেবপা" গোছের। আশ্চর্য বটে, পৃথিবীর এক কোণ থেকে আর এক কোণে এসে যে এমন দেশের মানুষটি পাবো ভাবতে পারিনি। চলতে চলতে আমি আলাপ শুরু করলাম, ভাষা বলতে শুধু ইসাবায়। নতুন মানুষ বা নতুন জায়গায় কি করে নিজেকে খাপ খাওয়াতে হয় তাতে আমি এখন অভ্যস্ত। আমরা এগিয়ে চলেছি, চলতে কোনো অসুবিধা নেই, কারণ রাস্তাটা পাথরের, বরফে পিছলে যাবার ভয় নেই। তার'ার রাস্তাটা শেষ হ'ল— মনে হয় প্রায় পাঁচ ছ'ঘণ্টা আমরা হেঁটেছি। একটা বড় পাথরের চাঁই-এর কাছে এসে ও থামলো—আমবা বসলাম একটু জিরোবার জন্যে। আমার ব্যাগের মধ্যে জলের বোতল ছিল সেটা বার করলাম। উরান আমাকে জল খেতে বারণ করলো—তার বদলে উরান তার শেয়ালের চামড়ায় তৈরী জ্যাকেটের পকেট থেকে বার করলো লম্বা একটা দড়ির মতো, ঠিক কি রকম দেখতে আমি বলছি— ফুটবলের চামড়ার লেস যেমন থাকে অনেকটা তেমন, তবে আরও মোটা। আমি ওটাকে চামড়ার

দড়িই বলবো। দাঁত দিয়ে সেই দড়ির কিছুটা কেটে উরান আমার হাতে দিয়ে বললো— খাও। আমি আঁতকে উঠলাম, বলে কি! এই চামড়ার দড়িটাকে বলছে কি না খাও। ভাবলুম হয়তো আমি ঠিক ওর কথা বুঝতে পারছি না, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। আমাকে থ' করে দিয়ে ও দড়িটাকে ৩-এর মতো প্যাঁচ খাইয়ে মুখের মধ্যে পুরে দিলো। ওকে দেখে আমি বেদুইনদের চামড়া ভিজিয়ে খাওয়ার কথা মনে করলাম। আমি তখনও হাতে দড়িটা নিয়ে বসে আছি। আর আমাকে তাক লাগিয়ে উরান সেই দড়িটাকে চুইন্‌গামের মতো চিবোতে লাগলো—দেখলাম সেই শক্ত চামড়ার দড়িটা ভিজে জল হয়ে আঠার দলার মতো হয়ে গেছে। এবারে আমার পালা। —হে বাবা তারকনাথ তুমিই ভবসা! আমি উরানের মতো সেই দড়িটাকে ৩-এর মতো করে প্যাঁচ খাইয়ে গালে পুরে দিলাম, তারপর চিবোতে লাগলাম। অদ্ভুত বটে— কিছুক্ষণের মধ্যেই চামড়াটা ভিজে চুইন্‌গামের মতো হয়ে গেলো, তারপরই চকোলেটের মতো মুখের লালায় গলতে লাগলো। স্বাদ ঠিক যেন কাঁচা ভেড়ার চর্বি— আহা কি সে স্বাদ, যে না খেয়েছে তাকে বোঝাই কেমন করে। ঠিক যেমন চুইন্‌গাম মুখের উত্তাপে গলে এটাও তেমনি, বুঝলাম এটাই এস্কিমোদের লবনচুষ।

আবার আমাদের হাঁটার পালা। এবার আমরা রাস্তা ছেড়ে আবও পশ্চিমের দিকে এগিয়ে চললাম। অসমতল পাহাড়ী উপত্যকা, এ-পাথর ও-পাথর কবে ডিঙ্গিয়ে লাফিয়ে আমাদের এগোতে হচ্ছে। গাছ-গাছড়াব কোনো চিহ্ন মাত্র নেই, মাঝে মাঝে যা চোখে পড়ছে, তা হচ্ছে ছোট ছোট পাথুরে আগাছা অথবা শৈবাল জাতীয় রঙ-বেরঙের গুচ্ছ। এগুলোকে দেখতে এতো সুন্দর যে, দূর থেকে মনে হয় পাথরের ওপর নিপুণ শিল্পী তার শিল্প নৈপুণ্য ফুটিয়েছে। আমি আমাব ব্যাগটা নিয়ে এখন একটু পিছিয়ে পড়েছি, লাফাতে লাফাতে পেটের নাড়িভুড়ি আব ফুসফুস যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। উরানকে এখন আর দেখতে পাচ্ছি না, সে অনেকটা এগিয়ে গেছে। আমি আন্দাজ মতো তার পথ লক্ষ্য কবে এগিয়ে চলেছি, একটা উঁচু টিপি পার হতেই লক্ষ্য করলাম একটা সবুজ পাথরের ওপর টান হয়ে উবান শুয়ে পড়েছে। আমিও এক লাফে সেখানে এসে পৌঁছলাম—পৌঁছেই অবাক হয়ে গেলাম আমি যেন হঠাৎ মখ্‌মলের গদির ওপর এসে পড়লাম। ভাল ভাবে নজব করে এবং হাত বুলিয়ে সবুজ পাথরটাকে পরীক্ষা করতে লাগলাম— সবুজ পাথুরে শৈবালগুচ্ছের এক শক্ত বাঁধনে আঁটা এই বিরাট পাথরের মেঝেটাকে। একেই বলে বরফের শেওলা।

আমি অনেক দেখেছি— পারস্যের দামী কার্পেটের ওপর দিয়ে হেঁটেছি, রাজার ঘরের মখমলের গদিতে বসেছি। তুরস্কীয় সুলতানের গদিতে হাত বুলিয়েছি— তাজমহলের ঘাসের বাহার দেখেছি, কিন্তু এমন অপূর্ব মোলায়েম সূক্ষ্ম সবুজ ও পা-ডোবানো প্রাকৃতিক কার্পেট সব কল্পনার উর্দ্ধে। মানুষ যা সৃষ্টি করতে পারে তা দেখেছি,

কিন্তু বিধাতাব সৃষ্টি এই সূক্ষ্ম কাজেব তুলনা করতে পারি এমন কিছুই আমার চোখে পড়েনি। কাঁধের ব্যাগটা সেই সবুজের ওপর রেখে আমিও চিৎ হলাম। ওঃ দীর্ঘ ক্লান্তির পর এই বুঝি পরম শান্তি— নীল আকাশের ওপর পেঁজা তুলোর মতো মেঘের দিকে তাকিয়ে বইলাম— ভগবানকে কি বলে যে ধন্যবাদ দেবো, কি করে তাঁকে জানাই আমাব আন্তবিক কৃতজ্ঞতা— ঠিক বুঝতে পারছি না। সেই অসীম নীলের দিকে তাকিয়ে শুধুই মনে হ'ল তিনি অসীম, তাঁব উদারতার সীমা নেই। শ্রান্ত ক্লান্ত সন্তানদেব জন্য তাঁর করুণা বিস্তৃত— কবিগুরুব গানটা আপন মনেই মুখ দিয়ে বেড়িয়ে এল— 'সীমাব মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুব....'।

উরান সামনে এসে দাঁড়াতে আমাব কবিত্বভাব ঘুচলো— আমি উঠে দাঁড়ালাম, ভেলভেটেব থেকে হঠাৎ যেন কাঁটাঝোপেব মধ্যে পডলাম— শুকনো রুক্ষ পাথবেব ওপব দিয়ে আবাব আমবা হাঁটতে শুরু কবলাম। কিছুদূব এগোতেই উরান আমার দৃষ্টি আকর্যণ কবলো— ও আমাকে আঙুল দিয়ে কিছু যেন দেখাবাব চেষ্টা কবছে। ভালোভাবে তাকাতেই নজবে পড়লো গোলপাতাব ছাউনিব মতো কয়েকটা ঘর—অর্ধ-গোলাকৃতি এই ঘবগুলোই এদেব গ্রীষ্মকালীন ইগ্‌লু। আস্তে আস্তে আমবা এগিয়ে এলাম। ভালোভাবে এবাব দেখবার সুযোগ পেলাম। আসলে এটা গোলপাতাব ছাউনি নয়, শক্ত কাঠেব ফ্রেমেব ওপব চামড়াব ছাউনি। আবও একটু কাছে আসতেই কয়েকটি শিকাবী কুকুব আমাদেব দিকে ছুটে এলো আমি বিপদ দেখে উবানের আবও কাছ ঘেঁসে দাঁডালাম। কুকুরগুলো আমাকে লক্ষ্য কবেই আসছিলো, কিন্তু হাত তুলে কি যেন বলতেই মন্ত্রেব মতো কাজ হল, ওবা দাঁডিযে পডলো। অ্যাল্‌সাসিয়ান কুকুরগুলো যেমন অনেকটা নেকড়েব মতো দেখতে— হাস্কি কুকুবগুলো তেমনি অনেকটা অ্যাল্‌সাসিযান ও শেযালেব মাঝামাঝি বকমেব। তাই অনেকেব মতে এস্কিমোদেব কুকুর-চবিত্রে, নেকড়েব হিংস্রভাব আব শেয়ালেব চৌর্যভাব দুই-ই প্রবল। অথচ উপযুক্ত ট্রেনিং-এব ফলে এবা দারুণ প্রভুভক্ত। কুকুরেব চিৎকারে ও উবানের আওয়াজে আশপাশেব ইগ্‌লু থেকে অনেকেই বেরিয়ে এলো। পশমেব বা চামড়াব তৈরি জুতো জামা ও প্যান্ট পবনে ছোট মেয়েদের দল, আমাদেব আশপাশে এসে জড়ো হল। উবান সকলেব সাথে আমার পবিচয় কবিয়ে দিল, সকলেই দেখলাম হাসিমুখে আগন্তককে আমন্ত্রণ জানালো— শেষে আমরা সবাই গিযে একটা বড় মতো (অথবা বড় মাঝারী ধরনেরই বলা যেতে পাবে) ইগ্‌লুব মধ্যে ঢুকলাম। জীবনে এই প্রথম সত্যিকারের এস্কিমোদের ঘবে ঢুকলাম।

গোল ঘবটাব মেঝেতে তক্তা পেতে প্লাটফবম কবা হয়েছে আর তার ওপর চামড়াব ওপব চামড়া পেতে গদি করা হয়েছে। একপাশে একটা পাথরের বাটিতে চর্বির প্রদীপ জ্বলছে আব তার আশপাশে ছড়ানো রয়েছে নানা ধরনের সরঞ্জাম। একটা 'তিন ইট' পাথবেব উনোনও চোখে পড়লো। ঘবে ঢুকতেই কিন্তু আশ্চর্য ধরনের গরম বোধ করলাম। মাথার উলের টুপি ও হাতের দস্তানা খুলে উরানের পাশে এসে বসলাম। উরানকে ঘিরে বসলো যুবক-যুবতী আর বুড়োবুড়ির দল আর

আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা। বুঝলাম এদের চোখে মুখে ফুটে রয়েছে অসংখ্য প্রশ্ন—আমি কে, কোথায় আমার বাড়ি, কি নাম ইত্যাদি। আমি শিশুপ্রেমিক— ওদের ওই না-বলা কথার অব্যক্ত বেদনা আমি বুঝলাম। দু'একজন আমাকে দু' একটা প্রশ্নও শুরু করলো, কিন্তু উরান ওদের থামিয়ে দিল, হয়তো ওদের বুঝিয়ে দিল যে, আমি ওদের কথা বুঝি না। আমিও ভাবলাম সহজেই এদের সাথে বন্ধুত্ব না করে একটু হাবভাব লক্ষ্য করা ভাল। উরান শহর থেকে যেন বিরাট সওদা করে ফিরে এসেছে। ওকে ঘিরে তাই ঔৎসুক্য —শহরে চামড়া বিক্রি করে ও অনেক কিছু এনেছে, ওর ওই বড় চামড়ার কোটের পকেটে যে এত কিছু জিনিস ছিল তা বুঝিনি। একে একে ও সব বার কবতে লাগলো— ডজন খানেক দেশলাই, পেট্রোল, লোহার বর্শার ফলক, ছুরি, কিছু বড়শি, নুন-চিনির কৌটো, এই ধরনের আরও ছোটখাটো কিছু জিনিস। বৃদ্ধ ভদ্রলোক যার সামনের তিনটে দাঁত খোয়া গেছে তিনিই হচ্ছেন আবা— উবানেব বাবা।

কিছুক্ষণ পর আর একজন মহিলা প্রবেশ করলেন— উরান তাকে আলিঙ্গন করে পাশে বসালো। তাকে দেখিয়ে উবান আমাকে আঙুলের সাহায্যে সঙ্কেত জানালো, বুঝলাম ইনি হচ্ছেন উরানের স্ত্রী। পবে আব এক বিশেষ সংকেতে জানলাম ছেলে মেয়েদের মধ্যে তিনজন উরানেব আব বাকী পড়শীব। আবও কিছুক্ষণ বসবাব পর বুঝলাম এবার শোবাব পালা। সূর্য মাথাব ওপব দিয়ে চক্রাকাবে পশ্চিম থেকে পূবের দিকে সবে যেতে শুরু করেছে— এই হচ্ছে বাত্রি। আর কিছুক্ষণ পব সূর্যকে কিছুক্ষণের জন্য দেখা যাবে না বটে কিন্তু দিনেব আলো পডবাব আগেই আবার সূর্যোদয় হবে। আশপাশেব ছেলেমেয়ে চলে গেল, চৌকিব ওপর ছেলেমেয়েরা শুতে চলে গেছে, চৌকির ওপর আগের থেকেই আবও দু'জন ঘুমোচ্ছিল। হয়তো উরানের বন্ধু-বান্ধব বা কেউ হবে। আমিও ঘন ঘন হাই তুলতে লাগলাম। চৌকির এক কোনায় আমার জায়গা ঠিক হ'ল, ঠিক যাবা ঘুমোচ্ছিল তাদের পাশেই। এরা যদিও জুতো সমেতই ঘুমোতে যায় কিন্তু আমি তা নই। আমি এদেব মধ্যে একটু ভদ্র, তাই ব্যাগের ভেতর থেকে ভারী মোজাটি বাব করে পরে নিলাম।

ঘরের ভেতর অনেকক্ষণ ধরেই একটা ভ্যাপ্‌সা গন্ধ পাচ্ছিলাম —বিছানায় ঢুকেই ব্যাপারটি পরিষ্কার হল। বিছানায় লেপ হিসেবে যেটাকে ব্যবহাব করতে দেওয়া হয়েছে সেটা আসলে চামড়ার। ছোটখাটো অনেকগুলো চামড়াকে একসঙ্গে জুড়ে একটি বড় লেপ করা হয়েছে— মনে হচ্ছে এটা ভালুকের চামড়া, তাই খুব গরম। যদিও ভারী কিন্তু পশমের জন্য বেশ নরম— তুলোট। ওর ভেতব ঢুকে নাক পর্যন্ত লেপটি টানতেই গন্ধটি স্পষ্ট হয়ে উঠলো, বুঝলাম এটা কাঁচা চামড়ার গন্ধ। যদিও আমার কাছে চামড়ার গন্ধ উৎকট কিন্তু এস্কিমোরা এই নতুন চামড়াব গন্ধ খুব ভালবাসে। আমাদের দেশে অনেকে যেমন নতুন কোরা কাপড়ের গন্ধ শুঁখতে ভালবাসে ঠিক তেমনি।

ইতিমধ্যেই অনেকে নাক ডাকাতে শুরু করে দিয়েছে। আমার যদিও কিছুক্ষণ আগে বড্ড ঘুম পাচ্ছিল কিন্তু চামড়ার উৎকট গন্ধে আর নাকের কাছে পশমের সুরসুরিতে ঘুম গাছে উঠলো। কিছুক্ষণের মধ্যে এও প্রায় সহ্য হয়ে এসেছিল। এমন সময় নতুন একটা উৎকট গন্ধ নাকের মধ্যে জ্বালা করতে লাগলো। দূরে আলোটা মিট মিট করে জ্বলছে, চারপাশে আস্তে আস্তে চোখ বুলোতে লাগলাম— আমরা সবাই এখন বিছানায়, —একই তোষক আর একই সরকারী লেপ। আমি এক কোনায় অর্থাৎ লেপের শেষাংশে।

গন্ধের উৎস আবিষ্কারের জন্য এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি তার ঠিক নেই। ঘুমিয়ে পড়েছি বটে কিন্তু নাক থেকে সেই উৎকট গন্ধটি মাথার মধ্যে ধাক্কা দিতে লাগলো— স্বপ্ন দেখলাম— এগিয়ে চলেছি আর দারুণ ঝড়ো হাওয়া বইতে শুরু করেছে, বিরাট একটি মরা শেয়াল টানতে টানতে আমি এগুচ্ছি কিন্তু এত শীত যে আর এগোতে পাচ্ছি না, এদিকে মরা শেয়ালটি পচতে শুরু করেছে আর তার পচা গন্ধ নাকের কাছে ভূর ভূর করছে। কি কবি, এই ঝড়ো শীতে এগোতেই হবে, আবাব এই পচা শেয়ালটাকে ছাড়লে চলবে না। এইভাবে অনেকক্ষণ শীত ও ঝড়ো হাওয়ায় যুদ্ধ করে ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। পাহাড়ের ওপর থেকে তাই হাত ফস্কে শেয়ালের বিরাট দেহটা পড়ে গেল— ধর ধর বলে আমিও লাফিয়ে পড়লাম পাহাড়ের ওপর থেকে। ব্যস তার পরই..... স্বপ্নভঙ্গ। চোখ খুলতেই দেখি অস্পষ্ট আলোয় ঠিক আমার নাক বরাবর আর এক থ'করা মুখ থেকে ভস্ ভস্ করে পচা শেয়ালেব গন্ধ বেড়োচ্ছে —আর ওদিক থেকে কে যেন লেপটি সম্পূর্ণ টেনে নিয়ে গেছে— মাথা ঝেড়ে উঠে বসলাম। পাশেব লোকটির (মেয়েলোক কি না কে জানে) মুখের ওপর একটি টুপি পরিয়ে— লেপটা টেনে আবার ঘুমোবার চেষ্টা করলাম। আমি একান্নবর্তী পরিবারের ছেলে, কাজেই লেপ টানাটানিতে আমাকে হার মানাবে কার সাধ্য, আর এদিকে আমার সাধ্য কি যে, টুপি চাপা দিয়ে আমি গন্ধ ঢাকি— কাজেই এস্কিমোদেব সাথে আমার প্রথম রাত পচা শেয়ালের গন্ধেই কাটলো। কি দুরবস্থা, তবুও লোকে বলে— আহা! কি ভাগ্যবান পরিব্রাজক।

সাধারণতঃ সকাল হওয়ার সাথে সাথে আমাদের ঘুম ভাঙে—কিন্তু এস্কিমোদের দেশে যার যখন খুশী ঘুম থেকে ওঠে। এদের কোনও বাধা-ধরা নিয়ম নেই, তাই ব্রেকফাস্ট বা বেড-টি'রও বালাই নেই। উনোনে মাংস ঝলসে বা সেদ্ধ করে যখন খুশী খাও আর আরামে ঘুরে বেড়াও। তবে হ্যাঁ, রাতের খাবার ওরা সবাই একসাথেই খায়—তার আসল কারণ হচ্ছে আবার পেটে খিল ধরানো রসালো গল্প। আর এই গল্পের মধ্যে যে কি রস তা আমার মতো বেরসিক বোঝে না বটে, কিন্তু আশপাশের ইগ্‌লু থেকে রসময়দের সমাগম প্রচুর।

আমি এদের দলে ভিড়ে গেলাম। আস্তে আস্তে ছোটদের সাথে ভাব হয়ে গেল, ওদের কথা বুঝি না বটে কিন্তু একসাথে দৌড়তে পারি, ডিগবাজী খেতে পারি আর অকারণে হাসতে হাসতে মাটির ওপর গড়িয়ে পড়তে পারি। ছোটদের সাথে মেশায় এর চেয়ে বেশি গুণের প্রয়োজন হয় কি ?

এস্কিমোদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েবা ঠিক নেপালী শিশুদের মতো দেখতে। খুব ছোট্ট শিশুরা মায়ের পিঠে বাধা আর যারা একটু হাঁটতে পারে তারা সব সময়ই স্বাধীন। ছোটদের করার প্রায় কিছুই নেই, সারাদিন খেলাধুলা আর হৈ চৈ করেই ব্যস্ত। মেয়েরা তেরো চৌদ্দ বছ্ব বয়স থেকেই মায়েদের সাহায্য করতে থাকে, আর ছেলেরা যখন সমর্থ হয় শিকার করা শিখতে থাকে। আমি ধীরে ধীরে এদের আদব-কায়দা রপ্ত করতে আরম্ভ করলাম। সারাদিন আমাব করার কিছুই নেই, শুধু রাত্রিটাই আমার কাছে মজাদার। বুড়ো যখন দিনের পর দিন একই গল্প বলতে থাকে তখন তাকে ঘিরে যে হাসির তুফান ছোটে তা শুধু যে মজাদার তাই-ই নয় আমার কাছে আশ্চর্য বলেই মনে হয়। কল্পনা করা যায় কি —রোজ রাত্রিতে তিন চার ঘণ্টা ধরে অনববত পেটে খিল ধরানো হাসির চোট। সেই হাসির জোয়ারে একমাত্র আমিই যেন এক বিবাট রসভঙ্গ বিগ্রহ।

এস্কিমোদের হাস্কি কুকুর

এইভাবে প্রায় পনেরো বিশ দিন হয়তো কেটেছে, একদিন সকাল বেলা উরান আমাকে ডেকে নিয়ে গেল। ওর সঙ্গে আমি এলাম ছোট্ট একটা ইগ্‌লুতে, এই ঘরের মধ্যে আমি এর আগে কোনোদিন ঢুকিনি। ঝাঁপ খুলে ভিতরে ঢুকতেই দেখি অনেকগুলো কুকুরের বাচ্চা। তার মধ্যে অনেকগুলোকে দোলনায় করে রাখা হয়েছে; হয়তো কনকনে ঠাণ্ডাব হাত থেকে বক্ষা পাওয়ার জন্যই এই ব্যবস্থা। সর্বসমেত প্রায় ২০-২৫টা হবে, সেগুলোকে আস্তে আস্তে বের করে দেওয়া হল। তারপব উরান মুখটাকে উ-এর মতো করে চেঁচাতে লাগলো উ-উ। কিছুক্ষণের মধ্যেই ছ'টা কুকুর সেখানে এসে হাজিব। কুকুবগুলো আসতেই বাচ্চাগুলো যে যার মাকে খুঁজে বার করে আরামে দুধ পান কবতে লাগলো। অতি সুন্দর কুকুরবাচ্চাগুলোর দিকে আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। এইভাবে ওখানে ঘণ্টাখানেক থাকার পব আমরা আবার তাদের যথাস্থানে রেখে ফিরে এলাম। সেদিন আমরা আরও চারবাব কুকুরবাচ্চাদের দুধ খাওয়াবার জন্য গেলাম। কুকুববাচ্চাগুলোকে বাইরে ছেড়ে রাখা বিপদজনক, অনেক সময় এরা ঠাণ্ডায় মারা পড়ে। অন্ততঃ মাস দুয়ের পরে এদের স্বাধীনতা দেওয়া হবে অর্থাৎ যখন এরা নিজেব থেকে মাংস খাওয়া শিখবে। উরান আমাকে খুব ভালভাবে সব দেখিয়ে শুনিয়ে দিল— কাল থেকে আমাকেই এ দায়িত্ব নিতে হবে। মনে মনে খুব খুশী হলাম— অন্ততঃ একটা কাজ পাওয়া গেল। আসলে এ কাজটি যে করে তাকে আজ সারাদিন দেখতে পাইনি, হয়তো কোথাও গিয়ে থাকবে, তাই তার কাজটা আমাকে নিতে হচ্ছে।

যথারীতি পরের দিন থেকে আমি কাজে লেগে গেলাম। সকাল বেলা গিয়েই কুকুরবাচ্চাগুলোকে ছেড়ে দেওয়া। কুকুবগুলোকে ডাকা— দুধ খাওয়ানো, তাবপব আবার তাদের অতি শিশুদের দোলনায় আলাদা করে রাখা সব একেবাবে নিখুঁত। কয়েকদিন এইভাবে কুকুর সেবা কবতে গিয়ে ছেলেমেয়েদের সাথে আমার যোগাযোগ একটু কমে গিয়েছে অর্থাৎ সময় কম। কুকুর সেবা করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত আমি কুকুরপ্রেমিক হয়ে গেলাম। এখন আমি চোখ বুজে বলে দিতে পারি যে, কোন কুকুরের কোন বাচ্চা অথবা দুধ খেতে কার কতটা সময় লাগে।

যখন আশপাশের কেউ কোথাও নেই আমি নির্জনে ওদের সাথে আমাব মনের কথা বলি— কথা বলার লোক অনেক পাই কিন্তু এমন নীরব শ্রোতা সত্যি বিরল। বাংলার মাটি থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে অক্ষাংশ দ্রাঘিমাংশের আর এক কোণে বসে এ-যে কি মাদকতা তা কেমন করে বোঝাই।

এমনি একদিন অবসর সময়ে কুকুর-সঙ্গীদের সাথে আমি যখন মশগুল, ঠিক সেই সময় উরান এক এস্কিমোকে নিয়ে এসে হাজির। হাসি বিনিময়ের পর উরান তার সঙ্গীকে কুকুরবাচ্চাগুলোকে দেখাতে লাগলো। সঙ্গীকে দেখে মনে হ'ল সে কুকুরবাচ্চাগুলোকে দেখে খুব খুশী, সন্দেহ হল হয়তো উরান এগুলোকে বিক্রি করে দিচ্ছে। সঙ্গী লোকটিও একটার পর একটা কুকুরের বাচ্চাকে বাঁ-হাতের ওপর রেখে ডান হাত দিয়ে তার পরিপক্কতা যাচাই করতে লাগলো— কোনোটার দাঁত দেখে,' কোনোটার কানের ফুটো, দেখে আবার কোনোটার পায়ের নখ টিপে সে ভাল মালগুলোকে বাছতে লাগলো। আমি হাঁ করে ওদের এই কাঁঠাল বাছা দেখতে লাগলাম। এইভাবে তেরোটি কুকুরবাচ্চা লোকটি বেছে নিলো, তারপর সেগুলোকে একটি চামড়ার বড় থলেতে ভরে বিদায় জানালো। যদিও এখন ওরা আরও বড় হয়েছে আর সবে মাত্র মাংস ছাড়াতে শিখেছে, তবুও চোখের সামনে প্রিয় সঙ্গীদের এই বিচ্ছেদ দারুণভাবে আমার বুকে বাধলো। পরে অবশ্য ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। আসলে এস্কিমোরা বেশি কুকুর একসঙ্গে রাখে না। কুকুরের সংখ্যাধিক্যে গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়, তাই অসংখ্য কুকুরের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য এরা ওদের এমনি অথবা বিক্রি করে দেয়। আমি ফরাসী দেশ অতিক্রমনেব সময় দেখেছি আল্পসের চূড়ায় হাস্কি কুকুরের একটা কেন্দ্র— খুব চড়া দামে এগুলোকে বিক্রি করা হয়। শিকারী কুকুর হিসেবে এর দাম প্রচুর। বেশি কুকুর বাখার আর একটা মুশকিল হচ্ছে এই যে শীতের সময় যখন শিকাব পাওয়া একান্তই অভাব তখন তাদের খাবার জোগানো একটা বিবাট সমস্যার ব্যাপার— তাই সময় থাকতে তাদের বিলিয়ে দেওয়াই ভাল। বাচ্চা কুকুর যখন সবে মাত্র মাংস খেতে আরম্ভ করে ঠিক সেই সময় থেকেই ওদের ট্রেনিং শুরু হয়।

আমাদের সভ্য সমাজে ঘর বাড়ি সোনা-দানা যেমন অমূল্য সম্পদ এস্কিমোদের অমূল্য সম্পদ হচ্ছে তাদের কুকুর। হিন্দুদের পাড়াগাঁয়ে গরু যেমন গৃহস্থদের পূজ্য ঠিক তেমনি এস্কিমোরা কুকুরকেও অতি আদরে রাখে। আর হবেই বা না কেন— কুকুব কি না কবে, গাড়ী টানছে—স্লেজ চালাচ্ছে—শিকাব ধরে দিচ্ছে, আবার চোর ডাকাতেব হাত থেকে বক্ষা কবছে। শুধু তাই নয়, এবা মবে গেলে ওদের হাড় দিয়ে অস্ত্র তৈরি করা হয় আর চামড়া দিয়ে গরমকালের ইগ্‌লুর ছাউনি হয়। কুকুরগুলোর চরিত্রও বড়ো অদ্ভুত, শিকারের সময় যেন নেকড়ে বাঘ আর অন্য সময় ভিজে বেড়াল। মাঝে মাঝে তাই মনে হয় কুকুর মানুষেব এত কাজে লাগে অথচ মানুষও বুঝি মানুষের এত কাজে লাগে না। এ হেনো জীবকে ভাল না বেসে কি পাবা যায়!

এদিকে কুকুবের সংখ্যাল্পে আমারও কাজ কমে এলো। আজকাল আর কুকুরের পেছনে বেশী সময় নষ্ট করি না— তাতে দেখেছি মায়াবৃদ্ধি— কাজেই আমি আবার মানব-শিশুদের দলে ফিরে এলাম।

শিকার

প্রায় মাসখানেক (অনুমান) কাটাবার পর একদিন সকালবেলা দেখলাম সবাই ইগ্‌লুগুলোকে ভাঙতে শুরু করে দিয়েছে— বুঝলাম, এবার যাবার পালা। এস্কিমোদের চরিত্র যাযাবর চরিত্র। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যেন প্রাণ ফিরে এলো। ইগ্‌লু ভাঙার অনেক ঝামেলা। প্রথমে ঘরের ভেতরকার জিনিসপত্রগুলোকে বাইরে এনে রাখা— তারপর সেগুলোকে আলাদা আলাদা করে চামড়ার ব্যাগে ভরা—এগুলো মেয়েদের কাজ মেয়েবা করতে লাগলো, তাবপর শুরু হ'ল আমাদের কাজ, আমি উরানকে যথাযথ সাহায্য করতে লাগলাম। আমি ইগ্‌লুর চামড়াব সেলাইগুলোকে খুলে দড়ি ও চামড়া আলাদা কবতে লাগলাম, তারপর তক্তাগুলোকে নিয়ে একের পর এক সাজাতে লাগলাম। আমার শিশুবাহিনীও এব্যাপারে কম যায় না। আমার অনভ্যস্ত আঙুল যতক্ষণে একটা সেলাই নিয়ে ব্যস্ত সেই সময়ে ওবা হয়তো তিন চারটে সেলাই খুলে ফেলেছে। সব সমেত নটা ইগ্‌লু ছিল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই জায়গাটা মাঠে পরিণত হ'ল— আমাদের এই কাজের সময় মাঝে মাঝে 'হাই' অর্থাৎ উরানের মা এসে চর্বির দড়ি চুষতে দিয়ে গেলেন।

উরানকে জিজ্ঞাসা করলাম— কোথায় যাচ্ছি? সে আমাকে বুঝিয়ে দিল শিকারে।

সত্যি? আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম। আমরা উৎসাহ তখন দেখে কে?

মালপত্রগুলো সব পড়ে রইল সেখানে— আমরা সবাই হাতে হাতে ছোট ছোট কাঠ, বল্লম ও কোঁচ জাতীয় জিনিস নিয়ে রওনা হলাম পাশের নদীর দিকে। যাত্রার আগে কিছু মাছ মেবে নিতে হবে। যেখানে এসে আমরা পৌঁছলাম সেটাকে নদী না বলে বড় নালা বলাই ভাল। বরফের জল গলে ঝিরঝিব করে বয়ে চলেছে, তাকে অনুসরণ করে আরও একটু এগিয়ে এলাম, এবারে সেই নালার জল এক জায়গায় পড়ে ছোটখাটো ডোবার সৃষ্টি করেছে। আমরা সবাই সেখানে এসে থামলাম, বুঝলাম এই ডোবা থেকেই মাছ শিকার করা হবে। চামড়ার বিশেষ ধরনের প্যান্ট অনেকের পরণে। এই প্যান্টের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে জুতো ও প্যান্ট একই চামড়ায় তৈরি— জুতো ও প্যান্ট একসাথে তৈরি কারণ তাতে কোমর জলে নামলেও কোনো জল শরীরে লাগবে না। আমার ওই প্যান্ট ছিল না তাই আমি ডাঙ্গায় রইলাম। আমরা সর্বসমেত প্রায় সতেরোজন ডোবাটার চারপাশ ঘিরে দাঁড়ালাম। তারপর হঠাৎ এগারোজন ডোবার জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। টলটল করছে পরিষ্কার সবুজ জল— পাথরের ওপর শ্যাওলা। এবারে হাতের বল্লম দিয়ে শ্যাওলাগুলোকে নাড়া দিতে

লাগলাম। আশ্চর্য বটে, সঙ্গে সঙ্গে তার ভেতর থেকে ঝাঁক ঝাঁকে মাছ বেরিয়ে এলো। এবার শুরু হবে জল পিটিয়ে মাছ ধরা— অনেক মাছ ঘাবড়ে গিয়ে ডাঙ্গায় পড়লো— শুরু হ'ল মাছ ধরা। কেউ কোঁচায় বিধছে, কেউ কাঠের ঘা খাচ্ছে, কেউ আবার নালা ধরে পালাতে গিয়ে আমাদের হাতে ধরা দিচ্ছে। সত্যি এই ছোট্ট ডোবাটার মধ্যে যে এত মাছ ছিল আমি ধারণাই করতে পারিনি। ছোট বড় নানান ধরনের মাছ— তারমধ্যে বড় সাদা সোল মাছ এবং সালমন মাছই বেশি— সবচেয়ে যেটা বড় তার ওজন হবে প্রায় পাঁচ-ছয় সের। বিনা পয়সায়, এত সহজে এত মাছ, আমার মতো মাছ-কাঙালী বাঙালীর পক্ষে এক তাজ্জব ব্যাপার— খাই বা না খাই দেখেই আনন্দ।

প্রায় ঘণ্টাখানেক ওই বরফ জলে মাছ ঠ্যাঙাবার পর আমরা ফিরে এলাম আমাদের বোঝাই করা মালের কাছে। এবার শুরু হল খাওয়ার পালা।

এরমধ্যে অনেকেই কাঁচা কাঁচা খেতে আরম্ভ করে দিয়েছে। তবে কাঁচা খাওয়ার একটা মুশকিল কি, তাতে মুখে কাঁটা লাগার ভয় আর মুণ্ডটাকে বাদ দিতে হয়। যদিও আমি মাছ-প্রেমিক কিন্তু কাঁচার ভক্ত নই। অনেকে সেদ্ধ করে অথবা ঝলসে খেতে আরম্ভ করলো-— সত্যি, টাটকা ঝলসানো মাছের স্বাদই আলাদা। তার ওপর সেটা যদি গ্রীনল্যান্ডের উন্মুক্ত আকাশেব নীচে হয় তাহলে তো কথাই নেই। যাই হোক, এইভাবে আমরা যা পারলাম খেলাম, বাকীটা সঙ্গে নিয়ে চললাম রাস্তার জন্য।

উত্তর-পশ্চিমের দিকে আমরা যাত্রা করলাম। নৌকোর মতো বিরাট কায়াকটার সামনে কুকুরগুলোকে জুড়ে দেওয়া হল। আর এই ধবনের পাঁচটা কায়াক গাড়িতে আমাদের মালপত্র উঠে এলো। কায়াক সাধাবণতঃ কাঠের নৌকো। কিন্তু প্রয়োজনে এর ওপর মাল বোঝাই কবে কুকুর দিয়ে টানানো হয়। তখন এটা অনেকটা স্লেজের কাজ করে। আমাদের মালপত্রগুলো বেশ ভাবী, তাই আমরা পেছন থেকে ঠেলতে শুরু করলাম। এইভাবে আমরা মাছ ধরা নালার কাছে এসে পৌঁছলাম। নালার ধারে তখনও সম্পূর্ণ বরফ গলেনি। এখানে স্লেজগুলোকে ধীরে ধীরে নামিয়ে দেওয়া মাত্রই ব্যস হালকা হয়ে গেল। এবার কুকুরগুলো অনায়াসেই বরফের পিচ্ছিল পথ ধবে ওটাকে টেনে নিয়ে চললো।

পুরোনো ডোবাটা আমরা পেরিয়ে এলাম—তার একটু পরেই টিবিমত একটা জায়গা পেরোতেই আমরা একটা নদীর ধাবে এসে পড়লাম। এবারে স্লেজ থেকে কুকুরগুলোকে ছাড়িয়ে নেওয়া হল, ওরাও ক্লান্ত। আসলে এগুলো ঠিক স্লেজ নয়, অনেকটা নৌকোর মতো। অথচ কায়াকও নয়। জলে নৌকোর কাজ করে আর ডাঙ্গায় গাড়ির কাজ করে যদিও এর চাকা নেই, কুকুরে টানে। সাধারণতঃ কায়াক বলতে এস্কিমোদের নৌকো বোঝায় আর সে নৌকোগুলো অনেকটা আমাদের দেশীয় ছিপ নৌকোর মতো, তবে আঁতে খুব বেশী হলে চারজনের বেশি ধরে না। সেইজন্য

আমি এটাকে কায়াক না বলে নৌকোই বলবো। এ দেশীয় ভাষায় এরা বলে—নোভোমিনি।

নদীর ধারে আসামাত্রই আমাদের দল আরও ভারী হ'ল। আমাদের সাথে আরও অনেক 'হুনুং' (এস্কিমোদের স্থানীয় নাম) এসে যোগ দিল বড় শিকারের জন্য। চাই বড় দল— এবার আমাদের নোভোমিনিগুলো জলে ভাসলো, চলছি আজানার উদ্দেশ্যে শিকারের সন্ধানে।

শিকারের প্রসঙ্গে আরও এগোবোর আগে এখানকার একটু ভৌগোলিক বিবরণ দেওয়া ভাল। গ্রীনল্যান্ড আসলে নামেই গ্রীনল্যান্ড; গ্রীনল্যান্ড নামটাই একটা বিরাট প্রহসন। শিয়ালদহে যেমন শিয়াল নেই, গ্রীনল্যাণ্ডেও তেমনই গ্রীন বা সবুজের নামগন্ধ নেই। গ্রীনল্যান্ড না বলে একে হোয়াটইল্যান্ড বললেই যেন মানাতো ভাল। আসলে গ্রীনল্যান্ড একটা বিরাট বরফের মহাদেশ। গ্রীনল্যান্ডের কেন্দ্রে যেসব বরফের পাহাড় রয়েছে তার অধিকাংশর উচ্চতাই সাত হাজার থেকে দশ-এগারো হাজার ফুটের কাছাকাছি। কাজেই এই বিরাট বরফের পাহাড়ের উপরিভাগ গরমকালে কিছুটা মাত্র গলে আর সেই জলস্রোতে সৃষ্টি হয়েছে গ্রীনল্যান্ডের তীরবর্তী অসংখ্য 'ব' দ্বীপ। গ্রীনল্যান্ডে গরমকাল মানে বরফ গলার সময় অথবা সূর্য যখন দেখা যায়, কিন্তু তাতে তাপমাত্রার পরিবর্তন মধ্য গ্রীনল্যান্ডে খুব বেশী একটা হয় না। কাজেই সমুদ্রের কাছাকাছি গ্রীনল্যান্ডের তীরভূমি ছাড়া সম্পূর্ণ গ্রীনল্যান্ডই বারো মাস বরফে ঢাকা থাকে। গ্রীনল্যান্ডের শুরু ৬০ ডিগ্রি থেকে উত্তর মেরু ৯০ ডিগ্রি পর্যন্ত। আর দ্রাঘিমাংশে ১০ ডিগ্রি থেকে শুরু করে ৭০ ডিগ্রি (গ্রীনিচ পশ্চিমে) গিয়ে পৌঁচেছে। তাই গ্রীনিচের পূর্ব থেকে পশ্চিমের সময়ের ব্যবধান যেমন, ঠিক তেমনি উত্তর দক্ষিণের তাপমাত্রার ব্যবধানও প্রচণ্ড। উত্তর সাগর যদিও উত্তর মেরুর কাছাকাছি বলে ওখানকার বরফ না গলারই সম্ভাবনা বেশি ছিল, কিন্তু গাল্ফ্ স্ট্রীম্-এর ফলে এখানকার জল কখনই পুরো বরফে ঢেকে যায় না। অবশ্য জলে আইস্‌বার্গের অভাব নেই। গ্রীনল্যান্ড সাগরে গাল্ফ্ স্টীম্ এসে পৌঁছায়নি। আর যেহেতু এটা উত্তর মেরুর কাছাকাছি তাই বছরের ছ'মাসই এখানে সূর্যকিরণ থাকে, আবার তেমনি দক্ষিণায়নে ছ'মাস রাত্রি। আমি আরও সবিশদ ভৌগোলিক বিবরণে না গিয়ে আবার আরম্ভ করি আমার কাহিনী।

হ্যাঁ, ইনুংদের সাথে এখন আমি নদীর প্রায় মাঝামাঝি। এখানে কোনো স্রোত নেই, তবে গর্ভ-স্রোত আছে কি না জানি না—এতক্ষণে এর একটা পরিষ্কার দৃশ্য পেলাম। নদীটাকে এখন একটা বিরাট লেকের মতো মনে হচ্ছে। কাকচক্ষুর মতো পরিষ্কার জল আর দূরে সাদা বরফের পাহাড়—তার মানে পাহাড়টার ওপর বরফ নয়, সম্পূর্ণ বরফের পাহাড়। এই সামনের ছোটখাটো পাহাড়টা যদি হঠাৎ গলে যায়, তাহলে কলকাতার যাদবপুরকে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বন্যায় ভাসিয়ে নেবার

পক্ষে যথেষ্ট। ভাগ্য ভাল, আমাদের কলকাতা এখান থেকে অনেক অনেক দূরে, আর এ বরফের পাহাড় কোনোদিনই গলবে না। অবশ্য ভবিষ্যতের কথা কি করেই বা বলি; তবে মানুষ যতদিন ধরে এর ইতিহাস জানে তাতে এ পাহাড় গলাবার মতো তাপমাত্রার এখানে নিতান্তই অভাব।

ঘণ্টা তিনেক ধরে আমরা বৈঠা মেরে—বৈঠা ঠিক বলা যায় না— তক্তা চালিয়ে লেকের ধারে এসে পৌঁছলাম। লেকের ধারে নোভোমিনি লাগার সাথে সাথেই আমরা লাফিয়ে পড়লাম ডাঙায়। এখন আর পাথরের কোনো বালাই নেই, সম্পূর্ণ বরফের দেশ। সাগরের ধার থেকে আমরা হয়তো বড় জোর তিরিশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে এসে পড়েছি। তাতেই বিরাট পরিবর্তন, একমাত্র জল ছাড়া চারদিকে বরফ বরফ আর বরফ।

ঠাণ্ডার কথা আর নাই বা বললাম। ঠাণ্ডার সাথে যাতে আর সম্পর্ক না থাকে তার যথাযথ ব্যবস্থা করা হয়েছে। পায়ে ভালুকের চামড়ার জুতো, পুরো উলের প্যান্ট ও জামার ওপর চামড়ার জ্যাকেট, হাতে তিমি মাছেব ছালের দস্তানা, মাথায় রোমস শেয়ালের টুপি আর গলায় বকফে বেজির লেজ পরে আমরা আদ্যপান্ত মনুষ্য জানোয়ারে পরিণত হয়েছি। এমন অবস্থা যে একজন আরেকজনকে চেনবার উপায় নেই। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে এই যে, চামড়ার এত লট্‌-বহব সত্ত্বেও শরীরের ওজন কিন্তু খুব বেশী একটা বাড়েনি।

নোভোমিনি বা নৌকোগুলোকে টানাটানি করে ডাঙ্গায় তোলা হল। এবারে তার সাথে কুকুরগুলোকে যুতে দেওয়া হল— নৌকোগুলো এখন ডাঙ্গায় পিছলিয়ে চলতে লাগলো। আগেব মত আমাদের আর কষ্ট করে ঠেলতে হচ্ছে না। আমরা প্রত্যেকটা নৌকো বা নোভোমিনির পেছন পেছন হাঁটতে লাগলাম। অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে আমাদেব বেশ খিদে পেয়ে গেছে— বিশেষ করে আমার, তবে এতক্ষণ নতুন অভিযানের মোহে ব্যস্ত থাকায় সেটা বুঝতে পারিনি। কিন্তু এখন হঠাৎ যেন পেটের মধ্যে মোচড় খেতে শুরু করেছে। খুঁজে পেতে শেষ পর্যন্ত উরানকে কাছে পাওয়া গেল। ওকে আমার পেটের অবস্থাটা বোঝাতেই উরানও তৎক্ষণাৎ বুঝে ফেললো—মনে হ'ল ওর পেটের অবস্থাটাও তাই। সে তার মায়ের পিঠের ঝুলি থেকে কিছু খাবার নিয়ে এল। এই খাবারের মধ্যে রয়েছে কিছু শুকনো সাদিন আর আমাদের ধরা সাল্‌মন। নুন দিয়ে সেগুলো চলতে চলতেই আমরা খেতে লাগলাম— অনেকটা চলার পথে মুড়ি-মুড়কির মতো, খিদের সময় সেও আমার কাছে পরম উপাদেয়।

অনেকক্ষণ চলার পর এই আমরা প্রথম থামলুম— জায়গাটার নাম জানা নেই—হয়তো কোনো নাম নেই অথবা এই বরফের মরুভূমিতে কেউ কোনোদিন নামের কথা চিন্তাও করেনি— কাজেই আমারই বা নামের দরকার কি?

কিছুক্ষণ ইনুংদের মধ্যে কি নিয়ে যেন বিশেষ আলোচনা শুরু হল— ঠিক বুঝতে পারছি না, তবে ওদের হাবভাব দেকে স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে— এখান

থেকে কোনদিকে যাওয়া যাবে অথবা ওই ধরনের একটা কিছু প্রসঙ্গ। বেশ কিছুক্ষণ ধরে তাদের পরামর্শ চলতে লাগলো আর এই ব্যাপারে বুড়োদের পরামর্শের ওপরই সবাই নির্ভরশীল। এইভাবে আরও কিছুক্ষণ পরামর্শের পর যুবকেরা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়লো। এব্যাপারটা আমার কাছে মোটেই পরিষ্কার হচ্ছে না।

আমিও কি করবো ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না— যুবকদের সাথে আমিও কোনো একটা দিকে বেরিয়ে পড়বো কি না—তাই ভাবছি, এমন সময় উরান আবার এসে আমার সমস্যা মেটালো। তার হাতে জড়ো পাকানো এক বিরাট সুতোর বান্ডিল, সেটা আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বুঝিয়ে দিলো— সুতোগুলোকে ছাড়াও তো বাবা। তার মানে অনেকটা নেই কাজ, তো খই ভাজ গোছের।

আন্দাজ প্রায় ঘণ্টা পাঁচ-ছয় পর একে একে সবাই যারা বাইবে গিয়েছিল তারা সব ফিরে আসতে লাগলো, আবাব শুরু হল পরামর্শ। বিভিন্ন যুবকেরা বিভিন্ন দিকে আঙুল দিয়ে কি সব বোঝাতে লাগলো।

এইভাবে যখন তাদের পবামর্শ শেষ হল, হিসেব মতো এখন প্রায় ভোর হয়ে এসেছে, অর্থাৎ আমরা এক নাগাড়ে প্রায় ২৬-২৭ ঘণ্টা হেঁটেছি। কিন্তু আশ্চর্য, এরা কেউ ক্লান্ত নয়— এমন কি শিশুরা পর্যন্ত চলার আনন্দে মেতে রয়েছে।

শেষে পরামর্শ থামলো, আঁশবিহীন ভেটকিমাছ সেদ্ধ খেয়ে আবার শুরু হল আমাদের যাত্রা। এবার আমরা সরাসবি উত্তরের দিকে চললাম। বরফের ওপর দিয়ে চলার এক আনন্দ হচ্ছে বটে কিন্তু তার ওপর আছাড় খেলেই সব আনন্দের দফা রফা— তাই আমার আনন্দও নিরানন্দে পরিণত হল। একটা বরফের ওপর দিয়ে একটু কেরামতি করে চলতে গিয়ে পড়লাম আছাড় খেয়ে। তবে বলিহারি— পোশাকের জন্য সে যাত্রা বেঁচে গেলাম, নয়তো আমাব পায়ের আধখানা হয়তো ওখানেই ফেলে রেখে আসতে হত। উঁচু-নিচু ঢিপির মত বরফের ভূমি— দলের লোকজনেরা এসে আমাকে তুললো বটে, কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ ধরে আমার হাঁটা বন্ধ রাখতে হল। কিন্তু আমার জন্য দলের কেউ অপেক্ষা করলো না, সবাই চলে গেল, আর আমি বরফের চাঁই-এর ওপর বসে চেঁচিয়ে, বাবাগো মাগো করতে লাগলাম। যদিও পায়ের ব্যাথাটা বেশ জোড়ালো— মনে হল বেশ ভালোরকম মচকে গেছে কিন্তু মাতৃভাষায় প্রাণখোলা বাবাগো মাগো বলায় অনেকটা শান্তি পেলাম। ইনুংরা চলে গেছে ভালোই হয়েছে, এখন এই নিরালায় খাঁটি বাংলায় একটু চেঁচানো তো যাচ্ছে।

বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর হঠাৎ মনে হ'ল, তাইতো এ আমি কোথায়— রাস্তা নেই ঘাট নেই, আশপাশেও কেউ আমার জন্য অপেক্ষা করছে না, ওরা চলে গেছে। সর্বনাশ— হঠাৎ মাথার মধ্যে যেন বজ্রপাত হল। নিঃসঙ্গতার দুর্বলতা আমায় যেন ঘিরে ধরলো। উঠে দাঁড়ালাম, না আমাকে চলতে হবে— হঠাৎ মনে পড়ে গেল আমার সৌদি আরবের মরুভূমিতে হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা। না— জীবনের

সেই নিদারুণ অভিজ্ঞতা আর আমি নূতন করে চাই না— এস্কিমোরা যেদিক দিয়ে গেছে সেদিক লক্ষ্য করে হাঁটা শুরু করলাম— এই শীতের মধ্যেও আমার জামা ঘামে ভিজে গেছে। হঠাৎ খট করে পায়ে একটা আওয়াজ হ'ল— একটা দারুণ ব্যাথা দিয়ে সরে যাওয়া হাড়টা যেন ঠিক জায়গা মতো বসে গেল। অকারণেই আমি চেঁচিয়ে উঠলাম— আমার পা সেরে গেছে—ওঃ কি আনন্দ! আকাশের দিকে মুখ করে বললাম— ঠাকুর তুমি আছো— সবই তোমার ইচ্ছে।

ববফের ওপর দিয়ে ভারী মাল টানার দাগ লক্ষ্য করে আমি এগিয়ে যেতে লাগলাম। জোর হয়তো এক ঘণ্টা এগিয়েছি, হঠাৎ শুনতে পেলাম— ইনুংদের চেঁচামেচি—ইউরেকা! কাছে আসতেই দেখি বিরাট ব্যাপার— দারুণ ব্যস্ততা। একটা সমতল জায়গা বেছে নিয়ে এরা লট্বহর নামিয়েছে আর কয়েকটা বড় উনুনে মাংস সেদ্ধ হচ্ছে— যেন এরা সব ফিস্টি করতে বেরিয়েছে। উরানকে খুঁজতে হ'ল না, ওব ছেলেমেয়েরা আমাকে দেখেই ছুটে এসেছে— আনন্দে গলা জড়িয়ে ধরে ঝুলে পড়লো— মনে মনে ভাবলাম খুব যে দরদ— ওদিকে আমাকে ফেলেই যে তোমরা চলে এসেছিলে তা মনে আছে? ভাগ্য ভাল ভাষাটা জানতাম না, নয়তো ফস করে বলে ফেলতাম হয়তো। যাই হোক এখন মাংসের গন্ধে অভিমান সব ভুলে গেলাম।

মাংসতো নয় মাংসের জল, আমি জোর কবে বলতে পারি যে, যে মাংসেব গন্ধে আমার জিভের জল গড়াচ্ছে, আমার মেজদাকে যদি সেই মাংস চাখতে দেয়া হয় তা'হলে... থাক কুরুক্ষেত্রের কথাটা আব লিখে দবকার নেই। অবশ্য সবই অবস্থা ভেদে। ভেবেছিলাম খাওয়া-দাওয়ার পর একটু শোয়া যাবে, কিন্তু কোথায় শোবো। শিশুরা মালপত্রের ওপর ছোট চামড়াব বাস্কেটে ঘুমোচ্ছে বটে— কিন্তু বড়দের উপায় নেই।

মাংস ও মাংস-জল খেয়ে আবার কাজ শুরু হয়ে গেল। কিসের মাংস খেলাম জানি না তবে খাওয়ার সাথে সাথেই শরীবে যেন হাতীর বল পেলাম, আমিও তাদেব সাথে কাজে লেগে গেলাম।

কাজ করার জন্য সবাই ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে পড়লো, তারপর তারা এক একটা জায়গা বেছে নিয়ে কাজ করতে শুরু করলো। সত্যি বরফের রাজত্ব। রাস্তা থেকে বরফ সরালে বরফই থাকবে। বরফের ওপর কুয়ো খুড়লে নিচে বরফই মিলবে আর যদি ঝোড়ো হাওয়া বয় তাহলে আশপাশ থেকে বরফের কুঁচোয় ধূলিময় হবে।

সামনে একটা ঢিপি বেছে নিয়ে তার থেকে সাইজ মতো বরফ কাটা হচ্ছে। কোনো কোনো বরফ কাটবার সময় ফেটে যায় কিন্তু এগুলো ফাটে না। বরফ কাটবার জন্য অর্ধ-বৃত্তাকারের করাত ব্যবহার করতে হচ্ছে। এরকম একটা করাত

হাতে পড়তেই ভালভাবে দেখতে লাগলাম এক কোনে লেখা রয়েছে—মেড্ ইন ইউ এস এ। ইস্পাতের করাত ছাড়াও এদের কাছে রয়েছে আরও ছোটখাটো আধুনিক যন্ত্রপাতি। সাইজ মতো করে বরফগুলোকে কাটা হচ্ছে—এক একটার সাইজ প্রায় দু'ফুট বাই চার ফুটের মতো। একদল বরফ কাটছে আর একদল সেগুলোকে নিয়ে এক জায়গায় বৃত্তাকারে সাজাচ্ছে আর বুড়োরা দেখাশোনা করছে। এতক্ষণে বুঝলাম—ও! আসলে আমরা তা'হলে ইগ্‌লু তৈরি করছি। নতুন অভিজ্ঞতা ও নতুন উৎসাহে উৎসাহিত হলাম।

ইগ্‌লু তৈরি যতটা সোজা ভেবেছিলাম আসলে তা নয়, এর জন্য দরকার প্রচুর অভিজ্ঞতা—একটা বরফের চাঁই যদি এদিক থেকে ওদিকে পড়ে তাহলেই—ব্যস, তাসের ঘরের মতো সব ভেঙে পড়বে। এর জন্য চাই নিখুঁত মাপ। এর জন্য ওদের অবশ্য স্কুলে যেতে হয় না, চোখে দেখেই এরা পাকা অভিজ্ঞ হয়ে ওঠে। মাপের জন্য এরা সাধারণতঃ চলার ব্যবধান ব্যবহার কবে অথবা সরাসরি পা মেপে—আমাদের পাড়াগাঁয়ে জমি মাপার মতো প্রায় বলা যায়।

ইগ্‌লুর সাইজ হয় লোক অনুযায়ী। সাধারণতঃ দুটো-তিনটে পরিবার একসাথে থাকে, অর্থাৎ প্রায় পনেবো-কুড়ি জনের এক ইগ্‌লুকে প্রায় বড়োই বলা যায়। ইগ্‌লু তৈরির ব্যাপারটা ভারী মজার। একজন নির্দেশকর্তা আর সবাই কর্মী। প্রায় ছাব্বিশটা বরফের ইটকে প্রথমে গোলাকৃতি করে সাজানো হল তারপর প্রত্যেকটা ইটেব কাছে একজন করে দাঁড়ালো—তার মানে ছাব্বিশ জন। এবার সেগুলো আস্তে আস্তে আগে-পিছে করে ঠিক কায়দা মতো সাজানো হল—একটার সাথে আব একটা গায়ে গায়ে লাগানো। ইটগুলোর কেন্দ্রের দিকটা পরস্পর ঠেকলো বটে কিন্তু বিপরীত দিকটায় ফাঁক থেকে গেল। এবাব কুচো বরফ দিয়ে সেই ফাঁকগুলো বন্ধ করা হল। ঠিক মাঝখানে একটা কাঠের ফ্রেম করে তার ওপর তক্তা সাজিয়ে অনেকটা অর্ধবৃত্তাকারে ছাদ করা হল। আমি আশ্চর্য হয়ে দেখতে লাগলাম ওদের অপূর্ব কর্মকৌশল। কাঠের এই কারসাজিতে প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় লাগলো। এই সম্পূর্ণ ফ্রেমটা তৈরি হল তক্তা ও সুতোর সাহায্যে —পেরেকের কোন নামগন্ধ নেই। এইবার বাকি কাজটা সহজ হয়ে দাঁড়ালো। বরফের ওপর বরফের চাঁই সাজিয়ে আস্তে আস্তে পাঁচিল তোলা শুরু হল, গোলাকৃতি এই পাঁচিল যতই ওপরে উঠতে লাগলো ততই সঙ্কীর্ণ হয়ে কেন্দ্রের দিকে ঝুঁকে পড়লো।

এই সময়টা দারুণ ক্ষতির সম্ভাবনা, কারণ অধিকাংশ ইগ্‌লু তৈরির সময়ই এরকম জায়গায় এসে সব ধ্বসে পড়ে যায়। এবার প্রায় বারো তেরোজন ইগ্‌লুর ভেতর থেকে পাঁচিলের বরফের চাঁইগুলোকে সামলাতে লাগলো, যাতে ধ্বসে না যায়। তারপর অতি সন্তর্পণে বাকী ডজনখানেক লোক একটা একটা করে বরফের চাঁই কাঠের ছাদের ওপর সাজাতে লাগলো।

আমার অবশ্য এখন করার কিছু নেই, কারণ এ ব্যাপারে নিপুণ হাতের দরকার। তাই আমিও মজা করে ওদের এই অপূর্ব কৌশল দেখতে লাগলাম। এই সময়টাই ওদের সবচেয়ে বেশী চেঁচামেচি শুরু হল— অনেকটা 'ধর ধর— সামলাও—খবরদার মাথা বাঁচিয়ে— হা-হা—হাই-হাই—হুপ্-হুল্লে' ইত্যাদি ধরনের। শেষ পর্যন্ত অর্ধবৃত্তাকৃতি ছাদ চড়লো, আর ছাদ চড়তেই এটা এখন যা দাঁড়ালো তা হচ্ছে ঠিক একটা গোল গামলা উপুড় করে দিলে যা হয়। যে লোকগুলো ভেতরে ছিল তারা এখন সবাই আলোবাতাসশূন্য দরজা-জানালাবিহীন বরফের বিরাট গামলার ভিতরে।

—সর্বনাশ! এখন উপায়! এই লোকগুলো বেরোবে কি করে— আমি নিজের মনেই বলে উঠলাম।

হঠাৎ চারজন বড় কুড়ুল নিয়ে জমি ঘেঁসা ইগ্লুর পাঁচিলের ওপর দমাদ্দম মারতে শুরু করে দিল— আর কিছুক্ষণেব মধ্যেই পাঁচিল থেকে দুটো বরফের চাই (বরফের ইট) বেরিয়ে এলো আব আস্তে আস্তে সেই দবজা দিয়ে একে একে সবাই বাইরে বেরিয়ে এলো— এই হ'ল ইগ্লুর দরজা। পরে ভেতবকাব কাঠের ফ্রেমটাকেও ভেঙে টুকরো টুকরো কাঠগুলোকে বাইবে বের করা হল। এই হল আমাদের থাকবার বন্দোবস্ত, এস্কিমোদেব ইগ্লু।

এইভাবে তৈরি হ'ল, প্রথমে তক্তা পেতে তক্তপোশ করা হ'ল আব তার ওপর এসে পড়তে লাগলো যত বাজ্যের চামড়া আর চামড়ার চাদব। ভারী এবং খসখসে চামড়াগুলোকে রাখা হল একেবারে তলায় আর তাব ওপর যথাক্রমে নরম চামড়া পেতে বেশ সুন্দর গদি কবা হ'ল। ঘরেব একদিকে মোমবাতির মত চর্বি বাতির জায়গা করা হ'ল— অনেকটা প্রদীপের মতো—অর্থাৎ পলতে ফুরিয়ে গেলে দড়ির পলতে জুগিয়ে দিতে হয়, আর চর্বিব তেল ফুরিয়ে গেলে তাব ওপর আরও চর্বি ঢেলে দিতে হয়। এইভাবে চারটে ইগ্লু ভরে গেল প্রায় আটষট্টি— জনে অবশ্য ছেলেমেয়ে সব নিয়ে— আর একটা দূরের ইগ্লুতে কুকুবগুলোকে সব ঢোকানো হ'ল। এইভাবে প্রায় আটচল্লিশ কি পঞ্চাশ ঘণ্টা পর আমাদেব শোবাব সময় হল।

প্রায় তিন দিনের অবিশ্রান্ত খাটুনির পর—ওঃ বিছানা যে কত প্রিয়। আমরা মাছ-মাংসের সুপ্ খেয়ে শুয়ে পড়লাম।

এখন আমি আর কেবলমাত্র উরানের সাথেই নেই, সম্পূর্ণ ইনুংদের সাথে মিশে গেছি। এখন এই ইগ্লুর ভেতর সব একান্নবর্তী।

বরফের ঘর এই ইগ্লুর ভেতর ভেবেছিলাম দারুণ ঠাণ্ডা হবে, কিন্তু আশ্চর্য— ঠাণ্ডা খুব বেশি নয়, একটা সাধারণ কাঠের ঘরের মতোই। অর্থাৎ ইগ্লুর ভেতরকার তাপমাত্রা আংমাগশালিকের মতোই হবে। ভেতরে অধিকসংখ্যক লোকের জন্যও হয়তো উষ্ণতা বজায় থেকে গেছে।

সবাই যখন একে একে শুতে চলে গেছে তখন দেখি একমাত্র আমি আর এক বুড়ি জেগে আছি। প্রথমে ভেবেছিলাম আবার গল্প বলবে কিন্তু কর্মক্লান্তির জন্য আর গল্পের মহড়া সেদিন হ'ল না।

এর মধ্যে অনেকেই নাক ডাকাতে শুরু করেছে— ঘোঁৎ-ঘোঁৎ-ঘড়-ঘড় শব্দ বরফের দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে এক অদ্ভুত ধরনেব রহস্য মায়াজালের সৃষ্টি করেছে। ওদিকে বুড়ি চর্বি বাতির আলোতে কি যেন সেলাই করছে, তার মুখের বেগুন পোড়া চামড়া চর্বির আলোয় যেন থলথল করছে। এক্ষুনি মুখ থেকে চামড়াগুলো খসে পড়বে।

একটা বড় চামড়া দিযে ইগ্‌লুর দরজার ঝাঁপি তৈরি হয়েছে। বাইরে এখন কিন্তু দিব্বি দুপুব, কিন্তু যখন এদের বিশ্রামের দরকাব হয় এরা বিশ্রাম নেয়— রাত আর দুপুরের কোনো বালাই নেই।

আমি বসে বসে ইতস্ততঃ কবতে লাগলাম— কোথায় শুই। অবশ্য আজকাল এদের মুখের গন্ধটি সয়ে গেছে—এরা কোনোদিন মুখ ধোয় না অথবা মুখ ধোয়ার মত একটা যে ব্যাপার আছে তাও এরা জানে না। এদেব সাথে থাকতে থাকতে এখন হয়তো আমার মুখেই দারুণ গন্ধ। যাই হোক, নিজের গন্ধ-ত্রুটির কথা চিন্তা না করে পরের গন্ধের চিন্তা করাই দেখছি সমাজে বিধেয়— তাই আমিও ওদের কথাই বলি। তবে সত্যি কথা বলতে কি—আজকাল ওদেব সাথে কথা বলার সময় যে গন্ধ পাই সেটাকেই আমি এস্কিমোদের জাতীয় গন্ধ বলে ধরে নিয়েছি— তাব মানে ওদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যদি সেই গন্ধ না পাই তাহলে আর তার এস্কিমত্ব কোথায়। আমাব মতে দেশাচার ও জাতীয় অন্যান্য বৈশিষ্ট্যও বর্তমান, যেমন আমাদের দেশে মুখ থেকে পানের গন্ধ অথবা বিড়ির গন্ধ, ব্যক্তিবিশেষে ঘামেব গন্ধ, গুরুর মুখে গাঁজার গন্ধ (অবশ্য গুরু যদি তান্ত্রিক হয়)। বিদেশে দেখেছি প্রায় সব জায়গাতেই জাতীয় গন্ধ বিদ্যমান, যেমন— আফগানিস্থানে তামাকের গন্ধ, রাশিয়ায় ভোদকার গন্ধ, জার্মানীতে বিয়ারের গন্ধ, আরবে বিবির গন্ধ, গ্রীসে উজোর গন্ধ, ফ্রান্সে আতর ও সিগারেট মিলিত গন্ধ— কাজেই এস্কিমোদেরও যে একটি গন্ধ থাকবে তাতে আর অবাক হবার কি আছে? যাই হোক— এখন গন্ধ তত্ত্ব ছেড়ে আমাব তত্ত্বেই আসা যাক।

আমি একটু শোবার বন্দোবস্ত খুঁজতে লাগলাম, সকলেই প্রায় আঁটাআঁটি করে শুয়ে আছে— এই ঠাণ্ডার রাজত্বে আমি আর কোনেব দিকে শুতে রাজি নই— কারণ একবার যদি লেপ চুরি হয় তাহলেই দেখতে হবে না— ব্যস নিউমোনিয়া।

হঠাৎ নজরে পড়লো একটা জায়গা— কোনরকমে আমার এই ছোট্ট শরীরটাকে ওখানে গুঁজে দিতে পারি বটে, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে লিঙ্গগত; কি জানিরে বাবা— কার পাশে শুতে গিয়ে কি বিপদে পড়বো তার ঠিক আছে। এদের ছেলেমেয়ে চেনবার উপায় নেই। ছেলেদের চুল ছোট, মেয়েদের লম্বা। এ ক্ষেত্রে সবাই টুপি পরে শুয়ে— কাজেই চেনবার উপায় নেই। দাঁড়ি গোফ প্রায় নেই বললেই চলে, অনেকটা তিব্বতিদের মতো। আর বুক দেখে বোঝার উপায় নেই— সব সমতল।

বুড়ি এতক্ষণ ধরে হয়তো আমাকে লক্ষ্য করছিলো। সে ফোকলা দাঁতে হেসে আমাকে শোবার নির্দেশ দিলো— আমিও হেসে বুঝিয়ে দিলাম শোবো কোথায়?

আমার সমস্যা বুঝলো, কোলের ওপর থেকে চামড়ার সেলাইটি রেখে আমার জন্য জায়গা বাছতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত সে একজনকে কনুই-এর গুঁতো দিয়ে সরিয়ে আর একজনের পা টেনে পাশে সরিয়ে আমাকে জায়গা করে দিলো— আমিও তাকে অশেষ ধন্যবাদ দিয়ে কচি শেয়ালের নরম চামড়ার লেপের ভেতরে ঢুকে পড়লাম। ওঃ সত্যি নরম বটে...।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম বলা যায় না, হয়তো বিশ বা পঁচিশ ঘন্টা হওয়াও অসম্ভব হয়। আমার যখন ঘুম ভাঙল তখন দেখি আমার ডান পাশের একজন ছাড়া সবাই উঠে গেছে, নাক ডাকাডাকিতে আমারও ঘুমের ঘোর কাটলো। আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসলাম— এবার ভালভাবে তাকিয়ে দেখি মনে হচ্ছে আমার পাশের সঙ্গী—সঙ্গিনী। যাকগে বাবা, ভালোয় ভালোয়ই ঘুমটা ভেঙেছে। অবশ্য এরা সে ব্যাপারে খুব সংযমী হয়তো শীতেব কারণে। বাইরে বেড়িয়ে এলাম--- কুয়াশা না মেঘ জানি না, তবে দূরের কিছু দেখা যাচ্ছে না— দিন, না রাত্রি কে জানে--- সত্যি এটা একটা গোলকধাঁধার ব্যাপার।

চারদিকে সবাই কাজে ব্যস্ত—আমি শুকনো মাছেব কিছু ব্রেকফাস্ট নিয়ে খেতে খেতে ওদেব কাজ দেখতে লাগলাম। আজকে শীতটা যেন একটু বেড়ে গেছে, তাই একটা চামড়াব চাদর জড়িয়ে নিলাম। এবা কাজের লোক, কয়েকদিন ধবে নতুন আলাপ হয়েছে নাজোর সাথে। উঠতি যুবক ও আমাকে অনেক কিছু বলতে চায, বোঝাতে চায় ওর ব্যক্তিগত প্রতিভা। ও যত বলে, লাফায় তাব চেয়েও বেশী আব হাসিতে মনে হয় ও-ই এখন সর্বোচ্চ। নাজো মুখে আঙ্গুল দিয়ে একটা সিটি মারতেই আমি ওর দিকে দৌড়ে গেলাম। দেখে মনে হলো ছোটখাটো একটা নৌকাব মতো ও কি যেনো একটা করার চেষ্টা করেছে। আমি কাছে যেতেই ও আমাকে হাত-মুখ-পা ও শরীরের অঙ্গভঙ্গিতে বুঝিযে দিল ওব পবিকল্পনা। আমি বুঝলাম ও একটা স্লেজ তৈরী করেছে।

স্লেজ মানে স্লিপ্ কেটে যে গাড়ী চলে। যাব কোনো চাকা নেই— বরফেব ওপব সবই পিচ্ছিল, কাজেই অতি ভারী জিনিযও অতি অল্পায়াসে টানা যায়।

ছোটবেলায় ভূগোলে পড়েছিলাম বল্গা হরিণেব কথা, কিন্তু এস্কিমোদেব দেশে বল্গা হরিণেব সংখ্যা লোপ পেতে বসেছে। আজকাল যে কয়েকটা পাওয়া যায তাতে গাড়ী টানার পরিবর্তে মানুষের ক্ষুধানিবৃত্তিব জন্যই বেশী ধরা হয়। অবশ্য আমি ল্যাপ্‌ল্যাণ্ডের কথা জানি না।

স্লেজগাড়ী করার ব্যাপারে যে খুব বেশী একটা বুদ্ধির দরকার হয় তা নয়। সরঞ্জাম সব সাথেই থাকে, শুধু সেগুলোকে সেট করা—তাতেই নাজোর বাহাদুরি বেশী। অবশ্য আমার কাছে ওর বাহাদুরি নেবার কোনোই অসুবিধা নেই কারণ ওদের এই রাজত্বে আমিই একা গো-মুখ্যু। অর্থাৎ সবাই কিছু না কিছু কাজকর্ম জানে আর আমিই শুধু একটা ক্যাবলাকান্ত।

এস্কিমোদের স্লেজ সাধারণতঃ কুকুরে টানে, তবে ইউরোপ বা আমেরিকায় ঘোড়ায় টানা স্লেজের প্রচলনই বেশী।

একটা স্লেজ তৈরী করতে লাগে কয়েকটা আক্ডালিকা বা তক্তা, কাপুন বা ছোট খুঁটি আর আকুনডারমিক্ বা চামড়ার দড়ি— এই হচ্ছে প্রধান উপকবণ। নাজো এইসব জিনিসগুলোকে একের পর এক সাজিয়ে একটা ছাদবিহীন পাল্কীর মতো জিনিস তৈরী করলো। এর মধ্যে অবশ্য কিছু লোহার স্ক্রুও যোগ দিয়েছে। এই হ'ল স্লেজের মোটামুটি রূপ— দূর থেকে একটা বড় দেশলাই-এর ভেতরকাব খোলার মত দেখতে। তবে যে জায়গাটা ভূমি স্পর্শ করছে সে জায়গাটা নৌকার মত। যাতে চলবাব সময় শক্ত বরফের প্রচণ্ড ধাক্কা সরাসরি না লাগে। স্লেজটা তৈরী হবাব সাথে সাথেই নাজো একটা ডিগবাজি খেয়ে নিল— তার মানে খাসা হয়েছে। এবার কুকুরগুলোকে জুড়ে দিলেই ব্যস— এস্কিমোদের এক্সপ্রেস— কোনো কোনো সময় ঘন্টায় ষাট মাইল পর্যন্ত চলে। অবশ্য তাব জন্য চাই পাকা ড্রাইভার। ওটাকে ঠেলে আমবা কুকুরেব ঘবেব সামনে এনে রাখলাম। তারপর আমরা এসে হাজির আমাদের ইগ্‌লুর সামনে, দেখলাম উবানও আবাব বাইরে বেরোবাব জন্য প্রস্তুত।

উরান আমাকে দেখেই হেসে বললো— "ফোযা"— তার মানে চলো; আমিও সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলাম। নাজো কি বলে দৌড়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলো, আমরা অপেক্ষা কবতে লাগলাম। কিছুক্ষণেব মধ্যেই ও একজোড়া জুতো এনে আমাকে পরতে দিল। ও নিজেও অবশা পাল্টে এসেছে। আমিও প্রায় জানু পর্যন্ত ঢাকা চামড়ার লম্বা জুতো পবে নিলাম, জুতো পায়ে ফিট করবার জন্য কয়েকটা চামডার প্যাড গুঁজতে হলো। এই ধবনেব লম্বা জুতোগুলো সবই এক সাইজেব। ছোটদের জন্য এ বকম জুতো নেই। নাজো আমার হাতে একটা আকুন গুঁজে দিয়ে বললো— চলো। বুঝলাম আমবা শিকারে যাচ্ছি। চারদিকে বরফের ঢেউ আব মাঝে মাঝে ডোবা-নালার মত ছোটখাটো জলাশয়, কিছুদূর এগোতেই আমাদেব সাথে আরও কয়েকজন এসে যোগ দিল।

আমরা লাইন ধবে চলতে লাগলাম, অদ্ভুত জগৎ এই গ্রীনল্যাণ্ড। ওঃ ঠাণ্ডা আর কাকে বলে— ধন্য এস্কিমোদের পোশাক, একমাত্র চোখ ছাড়া সবটাই ঢাকা। জায়গাটা উঁচু-নীচু টিপির মত, দূরে পাহাড় দেখা যাচ্ছে। গ্লাসিয়ার সে বরফ কোনদিনই গলে না— মসৃণ ও নীল, তার ওপর সূর্যের আলো পড়ে সুন্দর দেখাচ্ছে। কুয়াশার ভাব এখন আর নেই, মনে হচ্ছে দুপুর গড়িয়ে এসেছে।

এখানকার বরফের ওপর দিয়ে হাঁটা আগের থেকেও কষ্টকর, জমাট-মসৃণ বরফ— পুকুরঘাটে শ্যাওলার ওপর দিয়ে হাঁটার মতো অর্থাৎ একটুখানি অন্যমনস্ক হলেই ব্যস চিৎপটাং।

আরও কিছুদূর এগিয়ে এসে আমরা থামলাম। এটা একটা সমতল জায়গা, ঠিক খেলার মাঠের ওপর যদি বরফের চাঁই দিয়ে ঢেকে দেয়া যায় তাহলে যে রকম হয়। এবারে কুড়ুল দিয়ে বরফ কাটা শুরু হ'ল আব এইভাবে কিছুটা খুঁড়তেই জল বেরিয়ে পড়ল। প্রত্যেকেই এরকম একটা গর্ত করে নিল। এবার বুঝলাম আসলে এটা একটা বিরাট হ্রদ অথবা নদী, তার ওপর বরফ জমে শক্ত হয়ে গেছে, কাজেই ওপরকার একফুট বরফ সরাতেই জল বেরিয়ে গেছে। তার মানে আমবা এখন নদী বা লেকের ঠিক মাঝখানে— হঠাৎ যদি এই বরফগুলো গলে যায় তাহলেই— ব্যস ওই পোশাকের বহর নিয়ে আব জুতোর ওজনে সরাসরি বসাতলেব পথ পবিষ্কার ভেবে শিউরে উঠলাম। কিন্তু এ ববফ গলবার নয়— অন্ততঃ সঙ্গীদেব হাব-ভাব দেখে তাই মনে হ'ল।

ফিন্ল্যাণ্ডের উত্তরে অথবা ট্রম্সোয় ভ্রমণকালীন আমি দেখেছি লেকের ওপর যখন ববফ জমে যায় তখন বরফে গর্ত করে মাছ ধবাব অপূর্ব কৌশল, এখানেও অনেকটা সেবকম হলেও একটু অন্য ধবনের।

যদিও এই জলাশয়টা বরফে ঢাকা কিন্তু নীচে আভ্যন্তবীণ স্রোত বজায় থাকাতে মাছেব আনাগোনা বন্ধ থাকেনি— তার মানে নীচেব জলেব কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। ঠিক জলাশয়েব ওপর বরফের একটা ছাদ—আর সেই ছাদ ফুটো করলেই জল আর সেই জলে মাছ— মাছ আর মাছের রাজত্ব। তবে আজকে এদের এই প্রস্তুতি ঠিক সাধারণ মাছের জন্য নয়। হাব-ভাব দেখে মনে হচ্ছে যেন জন্তু শিকারে বেরিয়েছি।

গর্ত খোড়াব পব ঠিক গর্তের ধারে বিরাট এক বরফেব চাই প্রস্তুত করা হ'ল ওটা হচ্ছে বসবাব টুল— হাঁটু গেড়ে বসাব উপায় নেই, ওই বিরাট জুতোয় হাটু ভাঙা মুশকিল। গর্তটা খুব বড় নয়— এদিকে এক পা আর ওদিকে আর এক পা দিয়ে অনায়াসেই দাঁড়ানো যায়। ববফের টুলে বসবাব জন্য মোটা চামড়ার একটা আসন পাতা হ'ল আর পায়ের নীচেও অনুরূপ একটা মোটা চামড়া রাখা হ'ল ঠাণ্ডাব হাত থেকে বেহাই পাবার জন্য। এবাব ছিপেব ডগায় বরশি বেঁধে জলে ফেলে দিয়ে মাছের অপেক্ষা। বড়শিগুলো একটু অন্য ধবনেব। আমাদের দেশে বড়শিব সাথে আঁটা বা কেঁচো দিয়ে মাছকে আকৃষ্ট কবা হয। কিন্তু এদের ফন্দি সম্পূর্ণ আলাদা। এদের বড়শিটা হচ্ছে ছোট ছোট হাড়ের তৈরী আর সেগুলোকে দেখতে অনেকটা ছোট সাদা মাছের মত। জলের নীচে বড় মাছগুলো এই বরশিটাকে ছোটো মাছ ভেবে যেই গিলেছে, ব্যস্ সঙ্গে সঙ্গে গেঁথে গেল। এইভাবে আমরা ঘণ্টা-পাঁচেকের মধ্যে প্রায় মন খানেক মাছ ধরলাম—সবচেয়ে বড় মাছটার ওজন প্রায় সাত আট সেরের মতো। আকাশের অবস্থা এখন রঙীন— রঙীন সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উত্তর দিকে প্রায় পূর্বাকাশে— তার মানে এখন প্রায় ভোর। মাছ ধরাকালীন আমরা শুকনো মাছের লজেন্স্ ছাড়া আর কিছুই খাইনি। আমাদের

ধরা মাছগুলোব লেজে ফুটো কবে একটা দড়ি দিয়ে মাছের মালা করা হ'ল। আর তারপরে সেগুলোকে বাস্তাব ওপর দিয়ে টানতে টানতেই আমরা আমাদের ইগলুতে এসে পৌঁছলাম। তারপর শুরু হ'ল আমাদেব ভোজ। মাছের জল আর মাছ সেদ্ধ খেয়ে আবার আমরা বেরিয়ে পড়লাম। বিশ্রামের অবশ্য দরকার নেই, কারণ পাঁচ ছ'ঘন্টা ধরে বসে বসে মাছ ধবা মানেই বিশ্রাম। আর মাছ ধরা যাদের নেশা তাদের ঘুম কিসের? আমার যদিও একটু একটু ঘুম পাচ্ছিল কিন্তু নাজোর পাল্লায় পড়ে ঘুম পালালো।

এবাব একটা আশ্চর্য জিনিস আমি লক্ষ্য কবলাম যে সকলেব কোমবেই গাংগিন অর্থাৎ দড়ি ঝুলছে অনেকটা 'কাউ-বয়ে'ব মতো— আব হাতে উনাং অথবা বর্শা, ছিপের কোনো বালাই নেই— হাঁটবাব বা চলবাব সময এবা খুব প্রয়োজন ছাড়া কথা বলে না। আমাব কাছে এটা অনেকটা একঘেয়েমিব মতো— বিশেষ করে চলাব বাস্তা যদি দীর্ঘ হয।

চাবদিকে দেখবার কিছুই নেই— নেই কোনো শব্দ—নৈশব্দের ভেতব দিয়ে আমবা হেঁটে চলেছি। বৈচিত্র্যেব মধ্যে, মাঝে মাঝে আমাদেব মধ্য থেকে দু'একজন পেছল খাচ্ছে— কেউ হাতেব লাঠিতে সামলে নিচ্ছে, কেউ সামলাবার আগেই পেছল খাচ্ছে। এটাই আমাব কাছে একটা মজাব ব্যাপাব হযে দাঁড়ালো— অন্ততঃ একটা কিছু অবলম্বন কবে চলা যাচ্ছে। আমি শুধু অপেক্ষায় রয়েছি কে কখন পড়ে। যেই একজন আছাড খেযে পড়ল— অমনি আমি ঠোঁট চেপে হাসি সামলাই। জোব্বা গোছেব পোশাক সমেত আছাড খাওয়া দেখা একটা যেন ছেলেমানুষি আনন্দ আমায পেযে বসলো। আছাড় খাওয়াই এই চলাব বৈশিষ্ট্য আর সেটাই যেন একটা ছন্দ। এবকম আছাড়ের ছন্দে আমি যখন ছন্দিত ঠিক সে সময় আমার সামনের একজন হঠাৎ পিছলে পড়লো আর তাকে সামলাতে গিয়ে আমাবও পা গেলো পিছলে, কাজেই ওকে সাহায্য কবার বদলে আমিই সড়াৎ কবে পিছলে পড়লাম বিশ হাত দূরে— আর সাথে সাথেই, আমাব ছন্দেব তাবটা ছিঁড়ে যেন আমাবই নাকে লাগলো। এবার বুঝলাম, কেন একজন পড়লে আবেকজন তাকে ধবতে যায় না, অথবা কেনই বা একজন পড়লে আব একজন হাসে না— সবাই ভুক্তভোগী।

চলেছি তো চলেছিই, সে চলার যেন বিরাম নেই। মাঝে শুধু দু'বার চামড়া পেতে পা ছড়িয়ে বসে কাঁচা মাংস চিবিয়েছি। তাবপবেই আবার চলা শুরু হয়েছে আমাদেব; কোথায় কি করতে যাচ্ছে তা একমাত্র এরাই জানে আর ভগবান জানে। আমার পন্থা অনুসরণ করা—আমি তাই চলতে লাগলাম এদের চলার উৎসাহে। যদিও চলতে কষ্ট হচ্ছে, পা জড়িয়ে আসছে, কিন্তু কি করা যায় ওদের দিকে তাকিয়ে নিজের মনেই বলি— আমি কি কম্‌তি যাই না কি?

এবার একটা খালের মতো পেলাম— পাহাড়ী জলস্রোত হয়তো আমাদেব পায়ের নীচে দিয়ে তরতর করে বয়ে যাচ্ছে। খুব সাবধানে আমরা একের পর এক চলতে লাগলাম—একদম সামনে যিনি চলেছেন তিনি লাঠি ঠুকে ঠুকে পরীক্ষা করে দেখছেন পা বসে যাবে কিনা। একটু যেন বৈচিত্র্য এসেছে। এখন সকলেই যেন একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছে—কিসের যেন গন্ধ পেয়েছে—আস্তে আস্তে মাঝে মাঝে একটু পবামর্শ করে আমরা খালটা ধরেই সামনেব দিকে এগুতে লাগলাম। এবাবে খালটা ছেড়ে আমরা তার পাশ ধরে হাটতে লাগলাম। সকলের লক্ষ্য কিন্তু খালের ওপরেই— খাল মানে পার্বত্য জলস্রোত আব কি। সেই জলস্রোতের ওপব ববফেব পরিমাণটা এখন অনেকটা কমে এসেছে, মাঝে মাঝে এত পাতলা যে আমবা সেই বরফেব ভেতর পরিষ্কাব জলস্রোত দেখতে পাচ্ছি।

শেষ পর্যন্ত আমরা যা খুঁজছিলাম, ঠিক জাযগা পেলাম, গোল হয়ে দাঁড়িয়ে পকেটের সেদ্ধ মাংস চিবোতে চিবোতে আবম্ভ হ'ল যুক্তি পবামর্শ; আমি তাদেব হাব-ভাবে বুঝলাম যে একটা বিরাট কিছু হতে চলেছে।

শেষে আমাদের মধ্যে একজন বেবিযে গিয়ে পাহাড়ী জলস্রোতটা যেখানে বরফের হাল্কা কোটিন রেখে নীচ দিয়ে বয়ে গেছে সেখানে গিয়ে দাঁড়ালো। তাবপব মাংস কাটা বড় কবাতের মত ছুরি দিযে সেখানে ববফ কাটতে লাগলো কিন্তু যখন দেখলো যে সেই ছুরি দিয়ে আর গর্ত কবা সম্ভব নয় তখন কুড়ুল দিযে আবম্ভ হ'ল। তারপব একসময় বিবাট একটা ববফেব চাই বার কবার সাথে সাথেই সে জাযগাটা আগেব মাছ ধরা গর্তেব মতো হযে গেল। এইবার আশপাশ থেকে ববফ আনিয়ে টুল বানানো হল আর টুলেব ওপব বসবাব জন্য ভারী রোমশ চামডা পাতা হল। গর্তেব দিকে মুখ করে টুলেব ওপব বসে এইবার জলেব দিকে তাকিযে শিকাবেব অপেক্ষা। এবাবও পায়ের তলায় বেশ ভাবী চামড়া পাতা হয়েছে যাতে পাযে ঠাণ্ডা না লাগে। দু'দিন আগে মাছ শিকাবেব সমযও এই একই বকমেব ব্যবস্থা দেখেছি। তবে এখন ছিপেব বদলে এদেব হাতে বয়েছে বর্শা বা কোঁচা ধবনেব। আব বর্শার সাথে বিরাট দড়ি বাঁধা, তাব মানে বর্শাটা যদি হাত থেকে ফস্কেও যায তাহলেও দড়ি ধরে তাকে আনা যাবে। অথবা শিকাব যদি বর্শা সমেত পালায তাহলে তাকে খুঁজে বার কবতে কোনো অসুবিধা হবে না। যেখানে ও বসে আছে সেই ববফেব নীচের জল স্থির নয়, আভ্যন্তবীণ স্রোত বয়েছে। এই স্রোত ববফেব ছাতের নীচ দিয়ে বযে গিযে শেষ পর্যন্ত গ্রীনল্যান্ড সমুদ্রে গিযে পৌঁছেছে। শীতকালে এরকম বরফ কাটা অসম্ভব ব্যাপার, কাবণ তখন এই বরফের স্তর বিশ ফুটের মত অথবা তাব চেয়েও বেশি। এইভাবে একটু ব্যবধানে দুটো গর্ত কবে দু'জন বল্লম হাতে নিয়ে গর্তের দিকে তাকিয়ে বসে রইল।

এটা আসলে সীল মাছ শিকারেব ব্যাপাব। এই জলস্রোতে প্রচুব সীলমাছ ঘোবাফেরা করে। ওপরে যদিও বরফ কিন্তু তাতে ওদেব বিশেষ কিছু যায় আসে না। মাঝে

মাঝে যখন ওদের নিশ্বাসের জন্য বাতাসের দরকার হয় তখন যেখানে অপেক্ষাকৃত পাতলা বরফের স্তর সেখানে ফুঁস করে উঠেই আবার ডুব মারে। গঙ্গায় যেমন শুশুক মাঝে মাঝে জলের ওপর ভেসে ওঠে এও ঠিক সেরকম। তবে সীল মাছগুলো খুব শক্তিশালী— ওদের মাথা দিয়ে জলের ওপর বেশ ভারী বরফের চাদরও এক ধাক্কায় ভেঙে ফেলে। তবে যদি ওরা বিচরণের সময় কোনো ফাঁকা জায়গা দেখে, যেখানে আর বরফ ভাঙার দরকার নেই, সেখানে ওরা আস্তে আস্তে ওপরের দিকে নাকটাকে তুলে নিশ্বাস নেয়। আর তার জন্যই এই গর্ত করা। তারা যখন এই বরফের গর্ত দিয়ে নাকটাকে আস্তে আস্তে ওপর দিকে তুলে ভেসে ওঠে— ঠিক সেই সময় দক্ষ শিকারীর বর্শার ফলক দারুণভাবে বসে যায় নাকের ওপর। আর একবার যদি বর্শা ঠিক কায়দামত নাকেব ওপর মারা হয় তাহলে আব রক্ষে নেই— নির্ঘাত মৃত্যু।

সাধারণ মাছের চেয়ে সীল মাছ শিকারে অনেক বেশি ধৈর্যের দরকার হয়। প্রথমত সীল মাছের ঘ্রাণ ক্ষমতা খুব প্রখর আব তাদের শক্তিও উল্লেখযোগ্য। বরফ কাটার সময় যে সব সীল মাছ জলে ছিল তারা নিশ্চয়ই পালিয়েছে, এখন নতুনের অপেক্ষা। গর্তেব পাশে শিকারী দু-হাতে বর্শা ধরে জলের দিকে তাকিয়ে আছে তো তাকিয়েই আছে, একটু নড়া-চড়ায়ও তাদেব সাবধানতা। অনেক সময় একটা চুলও যদি গর্তের জলে পড়ে তাহলেই সব মাটি। আর কখন যে একটা সীল মাছ এসে নাক তুলবে সেই আশায় এরা ঘন্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর একজন যখন নিতান্তই বসে বসে হয়রান হয়ে যায় তখন আব একজন এসে তার জায়গা নিয়ে তাকে বেহাই দেয়। এইভাবে লোকবদল করে গর্তেব ওপর পুরো নজর রাখা হয়— ঠিক যেন বাজবাড়ীব প্রহরী।

গর্ত মাত্র দুটো আর ক্রমান্বয়ে তাব ওপর নজর রাখবার জন্য আমরা সাতজন উনাং। দু'জন যখন গর্তেব ধারে, পাঁচজন তখন দূরে অপেক্ষা করছে, মাঝে মাঝে দু-একটা মৃদুস্ববে কথাবার্তা ছাড়া আব কিছু চলে না। আমাকে নিয়ে আটজন, এই সময়টা ওদের কাছে কেমন লাগে জানি না— তবে আমি পা ছড়িযে বসে মাথা হেঁট করে ঝিমুতে লাগলাম। হঠাৎ একজন চেঁচিয়ে উঠতেই আমার ঘুমেব ঘোর কাটলো বুঝলাম ও খুব জোব পালিয়েছে, এক চুলের জন্য ফসকে গেল। মাছের ওপর বর্শাটা মাবাব সাথে সাথেই হুপ্ করে মুখের আওয়াজ কবে গায়ের জোর আনা হয়।

আমাদের সামনে চামড়ার ব্যাগেব মধ্যে প্রচুর খাবার। শুকনো সাল্‌মন— আঁশবিহীন ভেটকি পোড়া, বিভিন্ন ধরনের মাংসেব চানাচুর আর তাও যদি ভাল না লাগে রয়েছে চর্বির চুইন্‌গাম। এরা কেউ ধুমপান করে না— অথবা পায় না বলা যেতে পারে। জানি না এদের এই আধ সেদ্ধ কাঁচা মাছের সাথে ধুমের গন্ধ যুক্ত হলে কি রকম হয়। পরে দেখলাম শুধু আমি নই, আরও অনেকেই ঝিমুতে শুরু করেছে;

সত্যিই করবার মত আছেটা কি? আমি তো অনেক সময় দেখেছি কাজের অভাবে পুলিশরা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোয়। যে চামড়াটার ওপর আমরা বসে ছিলাম সেটা একটা তিমি মাছের ছাল। কম্বলের মতো যদিও নরম নয়, কিন্তু গরম বটে। চামড়ার ওপর আমরা সবাই গাদাগাদি করে বসে আছি। আর ঝিমিয়ে এর ওর গায়ে ঢলে পড়ছি— আমরা সবাই এখন রাত দুপরের ট্রেন যাত্রী। কল্পনা করা যায় কি এভাবে আমরা দু-এক ঘণ্টা নয়, পাক্কা প্রায় দুটো দিন বসে দাঁড়িয়ে আর ঝিমিয়ে কাটিয়ে দিলাম, কিন্তু তবুও তাব পাত্তা নেই। ওরা নিজেদের মধ্যে জায়গা বদল করছে, আশার উৎসাহে ওদের মন হয়তো ভরপুর আর আশার অভাবে আমি হতাশ। বসে বসে শুধু চিন্তা—চিন্তা আব চিন্তার স্রোত উপভোগ কবতে লাগলাম। আমি যদি যোগী পুরুষ হতাম তাহলে এই দু-দিনের শান্ত নিস্তব্ধতায় ধ্যানেব মাধ্যমে ধনী হতে পারতাম। আমি বসে বসে যা খুব ভালভাবে লক্ষ্য কবেছি তা হচ্ছে এদের দাঁত। এবা কোনোদিন দাঁত মাজে না, মুখ ধোয় না, অথচ দাঁতগুলো পবিষ্কার ও ঝক্‌ঝকে সাদা। এদেব দাঁতের বা মাড়ীব কোনো অসুখ আছে বলেও আমাব মনে হয় না।

'হুপ্'— একটা বিবাট চিৎকাবে আমবা মাথা ঠোকাঠুকি করে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

'হাপ্ পা—হাপ্ পা'— শব্দে কে যেন চিৎকাব কবছে, ভালভাবে নজর কবে দেখলাম একজন শিকাবী, তার কোমবেব দড়ি ছেড়ে যাচ্ছে, তাব মানে মাছে টোপ গিলেছে। এবার আর আস্তে আস্তে নয়, ঊর্ধ্বশ্বাসে আমরা সব দৌড়ে গেলাম। বর্শাব লাঠিটা পাশে পড়ে বয়েছে— আর বর্শার ফলক সমেত মাছ রয়েছে জলেব নিচে— ফলক দড়ি দিয়ে বাঁধা, কাজেই শিকাব পালাবে কোথায়!

এবার দড়িটা উবান হাতে নিল, দড়ির আর এক প্রান্ত দু-জন শক্ত কবে ধরে বইল, হঠাৎ যদি দড়িটা উবানেব হাত থেকে ফসকে যায় তাহলে ক্ষতি নেই, এদেব হাতে রয়েছে দড়িব খুঁটি। এবার শুরু হল দড়িব খেলা। পাশেব গর্ত থেকে সেও চলে এসেছে সাহায্য করতে— আমাদেব এই দুদিনের সুপ্ত উৎসাহ জেগে উঠেছে। গর্তের কাছে এগিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখেই শিউবে উঠলাম— জল তো নয় বক্ত গঙ্গা— উবান কখনও দড়িটা ছেড়ে কখনও গুটিয়ে কেরামতি দেখাতে লাগলো— ঠিক যেন ঘুড়ির প্যাচ লেগেছে। প্রায় এইভাবে এক ঘণ্টা শিকার ও শিকারীব খেলা চলতে লাগলো। সত্যিই অদ্ভুত বটে— বর্শার ওই বিরাট ফলা সমেত যে মাছ একঘণ্টা বেঁচে থাকতে পারে সে তো মাছ নয় নির্ঘাত জন্তু। আমাদের উত্তেজনা বেড়েই চললো; উরান দক্ষ শিকারী, তার মুখের প্রত্যেকটি রেখায় এখন ফুটে উঠেছে দক্ষতার চিহ্ন আর সবাই তার সাথে সাথে হেলে দুলে উরানকে উৎসাহিত করতে লাগলো। তারপর একসময় এলো, যখন শুধু তাকে ওপরে ওঠাবার পালা। কিন্তু তার ওই বিরাট দেহ ওই দু-ফুট গর্ত দিয়ে তোলা সম্ভব নয়। একটা শক্ত খুঁটির সাথে দড়িটাকে বেঁধে রাখা হল, তারপর শুরু হল দ্বিতীয় পর্ব—

সবাই লেগে গেলো মুখ বড় করতে। আস্তে আস্তে আগের সেই দু-ফুটের গর্তটা এখন একটা বড় ইঁদারার মুখের মত হয়ে দাঁড়ালো আর ভেতরে ভেসে উঠলো বিরাট একটা শুয়োরের মতো জন্তু। এবার সবাই মিলে সেটাকে টানাটানি করে গলদ্‌ঘর্ম হয়ে ওপরে তুললো—সত্যি একেই কি বলে সীল মাছ? মাছ নয়তো যেন জন্তু আর যদি একে মাছও বলতে হয় তাহলে আমি বলবো মহামাছ। আমাব বুদ্ধিতে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না যে, কি কারণে সীলকে মাছ বলা হয়, আর যদি সীলকে মাছ বলতে হয় তাহলে আমি তো বলবো কুমীরও একটা মাছ। তার মানে জলে থাকলেই যদি মাছ হল তাহলে কুমীরেরই বা মাছ হতে বাধা কি! আমি অবশ্য প্রকৃতির কথা বলছি না, বলছি আকৃতিব কথা।

একটা বুনো শুয়োরের সাইজেব আর দেখতে অনেকটা পা-বিহীন ভোঁদড়েব মতো ছাই রং-এর তেল-তেলে চামড়া। ওব নাকেব ঠিক ওপরেই বর্শাটাকে চেপে মাবা হয়েছে— বর্শার ফলাটা নাক ও ঠোঁটেব মাঝখানটা ভেদ করে ভেতবে ঢুকে গেছে আব বক্তাক্ত দড়িটা বেবিয়ে ঠিক লক্ষ্যস্থলেব প্রমাণ দিচ্ছে।

এখন সবাই খুশী— কাজ হাসিল— শিকারীকে সবাই বাহ্বা দিতে লাগলো আর ঘন ঘন সীলের দিকে চেয়ে সবাই গর্বে ফুলে উঠলো— সত্যি মহা শিকাব বটে।

ওটার লেজে বেশ শক্ত করে একটা দড়ি বাঁধা হল, তারপর ওটাকে টানতে টানতে আমরা ইগ্‌লুর দিকে রওনা হলাম। ঠাণ্ডায় এতক্ষণে ওর রক্ত জমে গেছে, কাজেই এখন আর রক্তপাতের কোনো সম্ভাবনা নেই— আর ওই চামড়ায় অনেক ধকল সইবার ক্ষমতা রাখে।

শেষ পর্যন্ত আমরা ফিরলাম। আমবা ইগ্‌লুর কাছে আসতে না আসতেই আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবাই আমাদের দিকে ছুটে এলো— হয়তো বাতাসে গন্ধ পেযে থাকবে। আমাদেব ঘিবে তখন নাচ শুরু হ'ল।

ইগ্‌লুর কাছে এসে আমবা সবাই থামলাম। আমরা দারুণ ক্লান্ত, কিন্তু বিশ্রামেব সময নেই। সীলটাকে মাঝখানে বেখে চারদিকে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে নাচ শুরু হযে গেল। তারপর শুরু হল গান— কাঁধের ঝাঁকুনি দিয়ে অনেকটা হেঁচকি টানাব মতো শব্দ করে ওদের গান শুরু হ'ল— অনেকক্ষণ ধরে ভাল করে কান পেতে শুনে যতটুকু তার কথাগুলো বুঝতে পারলাম তা হচ্ছে:

—আয়গো না গোগ্ না কা।

এই একটা লাইনই ওরা বার বার উচ্চারণ, করে তারপব এমন এক সময় এলো যখন ওরা সবাই ক্লান্ত —নাচগান থামলো। তখন একজন বুড়ো গোছের লোক মাঝখানে সীল মাছটার কাছে এসে দাঁড়ালো, তার হাতে একটা বড় মাংস কাটা ছুরি।

এবার সে এগিয়ে এসে দক্ষ কসাই-এর মতো ছুরিটাকে ঠিক নাভির কাছাকাছি বসিয়ে দিলো, তারপর গোল করে কাঁচা আম কাটার মতো কেটে কি একটা জিনিস বের করে আনলো— অনেকটা মেটের মত দেখতে। ওটা প্রথমে শিকারীর হাতে দেওয়া হল অর্থাৎ যে আসলে ওটাকে মেরেছে। শিকারী কামড়ে একটুখানি খেয়েই পাশের লোকের হাতে দিল, তারপর সেও একটুখানি কামড়ে নিয়ে বাকিটা পাশেব অন্য লোকের হাতে দিল। এইভাবে সেটা প্রসাদের মতো হাতে হাতে ঘুরতে লাগলো— এইভাবে আমার হাতে এসে যখন পৌঁছলো তখন তার আয়তন কমে গিয়ে একটা নৈনীতালের আলুর মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার পূর্ব অভিজ্ঞতায় আমি জানি যে এই অবস্থায় কি করতে হবে। তাই আমিও তাতে এক কামড় বসালাম। স্বাদটা মন্দ নয়, অনেকটা কাঁচা চিংড়িব মত স্বাদ তবে তার মধ্যে একটু আদা গোলমরিচ আব নুন পড়লে ব্যাস দেখতে হতো না সাক্ষাৎ অমৃত! তারপর আর কয়েকজনেব হাত ঘুরতেই তা ফুবিয়ে গেল।

এবার শুরু হল সত্যিকাবের কসাই-এর কাজ। ছ'জন লোক লেগে গেল কাজে। প্রথমে ছাগলের মতো এর চামড়াটা ছাড়াতেই বেবিয়ে পড়লো ভেতরকাব থাক থাক করে সাজানো মাংসপিণ্ড। এব ওজন কতটা হবে বলা মুসকিল, তবে মাংসেব পবিমাণ প্রায় দুটো শুয়োরের তুল্য।

পরে এর মাংস আদ্দেকটা সেদ্ধ কবে খাওয়া হ'ল, বাকি আদ্দেকটা ববফের তলায় ভবিষ্যতের জন্য মজুত রাখা হল। সেই বাত্রে আর গল্প হল না। শিকাবে বেবিয়ে রাতে গল্প বলা বন্ধ থাকে। সবাই যখন ক্লান্ত তখন ঘুমোয়, আব যখন সতেজ তখন চলে শিকাব। এই হল মোটামুটি এদের সীল মাছ শিকার কাহিনী। এবপর আমি আবও অনেকবাব এদের সীল মাছ শিকার দেখেছি। কিন্তু প্রথমবাবেব মতো সেবকম উৎসব নাচ গান সব সময় হয় না। বৎসরেব শুরুতে অর্থাৎ সূর্যেব উত্তরায়নে প্রথম শিকারের সময়েই তাদেব সীল উৎসব, আর এই উৎসবের মাধ্যমেই তাদের শিকারেব শুরু। বৎসবের প্রথম শিকাব অনুযায়ী তাদের পববর্তী শিকাব হবে, এই হচ্ছে তাদের বিশ্বাস। কাজেই আমি তাদেব এই প্রথম শিকাবেব অভিজ্ঞতা জীবনে ভুলব না।

নাজোর সাথে নতুন অভিজ্ঞতা

নাজোর সাথে আমার ভাব ধীরে ধীরে আরও জমে উঠলো। বয়স হয়তো কুড়ি থেকে পঁচিশের মধ্যে, তার মানে ওর জীবনে পঁচিশবার সূর্যোদয় হয়েছে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, আমাদের দেশে সেই সময়ে পঁচিশ বছরে, পঁচিশগুণ তিনশ পঁয়ষট্টিবার সূর্যোদয়।

বেঁটে-খাটো শেরপা গোছের নাজো এখন আমার সাংকেতিক ভাষা আগের চেয়ে অনেক ভালো বোঝে, আর আমিও ওর সাহায্যে ওদের জীবনযাত্রার অনেক কিছু বুঝতে শুরু করেছি। তবে ওদের কথাবার্তা আমার কাছে প্রায়ই বোঝা হয়ে দাঁড়ায়।

কিছুদিন যাবৎ ও কুকুরদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে রয়েছে আব আমিও ওর পেছন পেছন ঘুরে অনেক কিছু জানতে লাগলাম। কুকুরগুলো যে ইগ্‌লুতে আছে সেটা আমাদের ইগ্‌লু থেকে অনেক দূরে। আগামী শিকারের জন্য কুকুরগুলো প্রস্তুত করতে হয়। শিকার বা স্লেজগাড়ি টানা ছাড়া যখন কুকুরগুলোর করার কিছুই থাকে না, তখন তাদের শারীরিক ব্যায়ামেব জন্য কাঁটাযুক্ত মাছ অথবা খুব খিদের সময় অনেক দিনের পুরোনো হাড় দেওয়া হয়। শিকাব হচ্ছে কুকুরদের স্বভাব, তাই শিকারেব জন্য ওদের বেশি ট্রেনিং দিতে হয় না. একমাত্র লিডার ডগ্‌কেই খুব ভাল করে ট্রেনিং দেওয়া হয়।

সাধারণতঃ পাঁচ-সাতটা কুকুর নিয়ে এক একটা দল করা হয়, কখনও কখনও তার বেশি সংখ্যকও এক একটা দলে থাকে। আর প্রত্যেক দলের দলনেতা হিসেবে একটা কুকুরকে নিয়োজিত করা হয়। এই কুকুরটাকে নেতৃত্ব ভার দেবার আগে তাকে বিশেষভাবে ট্রেনিং দেওয়া হয়। এই লিডার ডগ্ বা ওদের ভাষায় যাকে বলে বুজু, সেই আসলে দলের অন্যান্য কুকুরকে সামলাবার দায়িত্ব নেয়। যে কোন কুকুরই কিন্তু বুজু হবার উপযোগী নয়। ছোটবেলা থেকে খুব চালাক চতুর এরকম একটা কুকুরকেই বুজুর জন্য তৈরি করা হয়। বুজুর বৈশিষ্ট্যর মধ্যে প্রধান হচ্ছে— সে দলের যে কোনো কুকুরের চাইতে জোড়ে দৌড়তে পারে— দলের যে কোনো কুকুর অপেক্ষা তার শক্তি বেশি আর তীক্ষ্ণ ঘ্রাণশক্তি।

স্লেজগাড়ি চালানোর সময় দলনেতা থাকে সব চাইতে আগে, তারপর দুটো দুটো করে বলগার দু'পাশে অন্যান্যের স্থান। শিকারের সময় যদি শিকারী খুব দক্ষ না হয়— তা হলে এই দলনেতাকে সামলানো মুসকিল হয়ে পড়ে— বিশেষ করে

যদি স্লেজে যোতা থাকে তাহলে প্রায়ই প্রচণ্ড বেগের দরুন স্লেজ যায় উল্টে। অন্যান্য কুকুরগুলো যখন নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি বা কামড়াকামড়ি আরম্ভ করে তখন দলনেতার দাপট দেখবার মতো,— দু'দলের বা দুই কুকুরে যখন যুদ্ধ বাঁধে তখন দলনেতা ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের মধ্যে; তারপর তার দাঁত বসানো অসহ্য কামড়ের ভয়ে যুদ্ধরত দুই পক্ষই শান্তিচুক্তি করতে বাধ্য হয়। এগুলো দেখবার মতো। কাজেই দলনেতাকে ট্রেনিং দেওয়া হয় খুব সাবধানে এবং তাকে রাখা হয় খুব সতর্কে। দলনেতাকে ঠাণ্ডা রাখলেই সব ঠাণ্ডা।

উরান যেমন পাকা শিকারী নাজো তেমনি কুকুরকে ট্রেনিং দিতে ওস্তাদ। ওর সাথে থাকতে থাকতে আমিও ওদের বিভিন্ন কৌশল দেখতে লাগলাম।

সেদিন ভোরবেলা হঠাৎ নাজো আমায় নাকে সুড়সুড়ি দিয়ে আমার ঘুমটা ভাঙালো— নাকের সুড়সুড়িতে ঘুম ভাঙায়, আমারও আড়মোড়া ভাবটি কেটে গেল। উঠেই জুতোটা পরে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। বাইরে বেরিয়ে দেখি চারদিকে সাদা যেনো ময়দা ছড়ানো —তাব মানে বাতে তুষাবপাত হয়েছে, ঠাণ্ডাটা শূন্যেব কাছাকাছি এলেই এই অবস্থা হয়।

আমরা কুকুরের ঘরেব সামনে এসে পাঁচটা কুকুর বার কবলাম —তারপব কুকুরগুলোকে স্লেজে লাগানো হল, কুকুরগুলোর শরীরেব ওপর দিয়ে চামড়া ও দড়ি চালিয়ে তাদের ঘোড়ার মত তৈরি করা হল। স্লেজের ঠিক সামনেই দুর্বল কুকুরগুলোকে রেখে সবচেয়ে প্রথমে দলনেতাকে রাখা হল। স্লেজটা ছোট একটা নৌকো ধরনের কাঠের বাক্স, দুটো খুঁটি রয়েছে ধরবার জন্য। পাশাপাশি দু'জন বসবার উপায় নেই —সামনে নাজো ও পেছনে আমি। স্লেজের ভেতরটা কিন্তু অদ্ভুত ধরনের নরম। হাত দিয়ে পরখ করে বুঝলাম এগুলো নীল শেয়াল ও পোলার বেয়ারের বা মেরু ভালুকের চামড়া— বেশ নরম এবং গরম। আজকে একটা নতুন জিনিস লক্ষ্য করলাম, নাজোব কোমরে একটা নতুন চওড়া চামড়ার বেল্ট, তাতে লটকানো রয়েছে বল্‌গা হরিণের বাঁকানো শিং-এর হুক্। তাতে ছোটখাটো অনেক জিনিস ঝুলছে। তাবমধ্যে আছে ছুরি দড়ি বর্শার ফলক আরও কয়েকটা ছোট খাটো জিনিস। স্লেজের পাশেও ওরকম একটা হরিণের শিং-এর আংটার ওপর গোল করে পাকানো এক গোছা দড়ি। ঠক্ ঠক্ করে শব্দ করতেই কুকুরগুলো লাফিয়ে স্লেজ টানা শুরু করলো। উঁচু নিচু রাস্তা দিয়ে আমরা দোলনার মত চলতে লাগলাম।

ঘোড়ার গাড়ি চালাবার জন্য ছপ্‌টির দরকার হয় বটে, ছপ্‌টির শব্দে ভয় পেয়ে ঘোড়া আরও জোরে দৌড়ায়। কিন্তু স্লেজ গাড়ীতে তার ঠিক উল্টো— কোনবকম ছপ্‌টি ব্যবহার চলে না কারণ কুকুবগুলো যদি একবার ভয় পেয়ে যায় তাহলে স্লেজ টানার পক্ষে অসুবিধা দেখা দেয়। প্রত্যেকটা কুকুরের পিঠের চামড়ার বেল্ট-এর সাথে লাগাম লাগানো—চারটে কুকুরের লাগাম এক হাতে আর দলনেতা কুকুরের

লাগাম অন্য হাতে। কাজেই দু'হাতই ব্যস্ত। বসে বসে এভাবে চালাতে কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু দাঁড়িয়ে চালানো সত্যি কষ্টসাধ্য— কারণ তাতে ব্যালেন্স রাখার খুবই অসুবিধে। সামনে যে খুঁটির মত একটা কাঠ আছে সেটাতে হাঁটুর ঠেকা দিয়ে ব্যালেন্স রাখতে হয়। অবশ্য অভ্যাসে সবই হয়। তুরস্কে দেখেছি, শুধু একটা তক্তার ওপর দাঁড়িয়ে কি নিপুণভাবে ওরা ঘোড়াব গাড়ি চালায়। এও অনেকটা সে রকম।

নাজো কখনও বসে কখনো দাঁড়িয়ে, ওব বাহাদুবী দেখিয়ে স্লেজ চালাতে লাগলো। এইভাবে কিছুদূর আসার পর আমাদের স্লেজের বেগ কমে এলো, তারপর আস্তে আস্তে কুকুরগুলো দাঁড়িয়ে পড়লো। ব্যাপার কি ?

নাজো আমাকে বুঝিয়ে দিলে এখানকার বরফ মোটেই সুবিধাব নয। স্লেজ আর এগোবে না, কাজেই আমাদের ফিবতে হল। নাজোব হযতো আবও দূবে শিকার করতে যাবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু বিধি বাম। ইতিমধ্যে সূর্যের তাপে ময়দাব মতো গুঁড়ো বরফগুলো গলতে শুরু করেছে কাজেই সেদিনকাব মতো আমাদেব স্লেজ টানা বন্ধ রাখতে হল। অন্ততঃ কিছুটা অভিজ্ঞতা তো হল। আবও কিছুদিন ওখানে চুপচাপ থাকার পর আবার প্রস্তুতি শুরু শিকাবের। এ জায়গাটা শিকারের পক্ষে ঠিক উপযোগী নয তাই যেতে হবে উত্তবে।

শুরু হল ভাঙাচোরা। ভারী জিনিসগুলোকে বোঝাই করা হল দুটো স্লেজে, তাকে বেশ শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হ'ল যাতে রাস্তায় পড়ে না যায়। ঠিক হল উঁচু জায়গায় সবাই মিলে ঠেলবে আব নিচু জায়গায় বা ভাল বাস্তায উপযোগী বরফ পেলে কুকুরগুলো টানবে। কুকুবগুলো সব ছাড়াই রইল। আবার শুরু হ'ল চলা শিকারের সন্ধানে।

চলা ও বিশ্রাম, বিশ্রাম ও চলা। এই করে প্রায় চারটে দিন কেটে গেল, একদিন হঠাৎ সবাই সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো। ওদের আনন্দের উৎস হচ্ছে দূবের ওই নীলাভ পাহাড়, পাহাড় তো নয়, শক্ত বরফেব আট। আকৃতি দেখে মনে হ'ল এটাই দক্ষিণ-পূর্ব গ্রীনল্যান্ডের সব চেয়ে উঁচু পাহাড়। পাইলট বন্ধু লুইস্ আমাকে এই পাহাড়টার সম্পর্কেই বলেছিল, নামটা যতদূর মনে পড়ছে— মাউন্ট ফোবেল (Mount Forel), এর উচ্চতা প্রায বারো হাজার ফিটের মতো—হ্যাঁ বাবো হাজার ফিট— সম্পূর্ণই শক্ত আট জমাট বরফ— তার নীল রঙ দেখেই বোঝা যায় যে এটা একটা গ্লাসিয়ার। আমরা মাউন্ট ফোরেল এবারে ডান দিকে রেখে চলতে লাগলাম। আরও প্রায় দু'দিন ধরে আমরা পাহাড় ডিঙোলাম। এই সময় যাদের সবচেয়ে কষ্ট করতে হচ্ছে, তাবা হচ্ছে— পিঠে শিশু সমেত মহিলার দল। তবে বুড়ো ও ছোটদের জন্য যতটা চিন্তিত হয়েছিলাম, দেখলাম— না, ওরা আমার চেয়ে অনেক শক্ত। তারপর এক সময় আমরা ঢালু পেলাম আর বরফও এখানে অনেকটা নরম— ঠিক আগের মতো পাথরের মত নয়। ঢালু বেয়ে নামবার আগেই আমাদের বিশ্রামের

দরকার হ'ল— আমরা সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। শিশুদের অনেকেই কান্না শুরু করে দিয়েছে হয়তো খিদেতে। সাধারণতঃ চলার সময় এরা উনোন জ্বালায় না, তাতে সময় ছাড়াও পরিশ্রমেরও দরকার হয়। এখন সবাই ক্লান্ত, কাজেই ওসব ঝামেলার দরকার কি— তাই সরকারী ঝোলা থেকে বিতরিত হতে লাগলো আমসির মতো মাংস আর শুকনো বড়ির মতো চর্বিতে ভাজা মাছ। কাজেই সেই নিঃশব্দ পার্বত্যাঞ্চলে প্রায় আধঘন্টা ধরে কুড়মুড় শব্দ প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো।

খাওয়া শেষে আমরা সবাই এবার ঢালু বেয়ে নিচে নেমে এলাম— তার মানে পশ্চিমদিকে অথবা গ্রীনল্যান্ডের কেন্দ্রের দিকে বলা যেতে পাবে। এই প্রথম আমবা তুষাবপাত পেলাম— হয়তো দু-একদিন আগেই তুষারপাত হয়ে থাকবে, পেঁজা তুলো আর কুঁচো বরফ পেলাম। উনাংদের স্ফূর্তি বেড়ে উঠলো, ঠিক শিকাবেব উপযোগী জায়গা বটে।

আবাব আরম্ভ হল কর্মতৎপবতা, আব এইভাবে দিন বাত খাটাব পর চাবটে ইগ্‌লু তৈরি হল। আরও তিনটে স্লেজ তৈরি হ'ল, কুকুর সঙ্গেই ছিল কাজেই অসুবিধার কোন কাবণ নেই। এবারকার ইগ্‌লুগুলো আগে মতো মোটেই নয, ভেতবে শোবাব পক্ষে খুব ভালো তবে বসারও কোনো অসুবিধে নেই, কিন্তু দাঁড়াতে গেলেই ববফের দেয়ালে মাথা ঢুকে যায়। উপায নেই কারণ এখানে চাঁই ববফেব অভাব। ইগ্‌লুর ভিতরটা যেমনই হোক না কেন এখানকার আবহাওয়া বরং স্লেজ টানার খুবই উপযোগী, কুকুরগুলো চার মানুষেব একটি স্লেজকে অনায়াসেই টেনে নিতে পাবে। এ জায়গাটা মাছ শিকাবেব পক্ষে মোটেই সুবিধাব নয়, কিন্তু ভাবী জন্তুব আশাযই এখানে আসা।

আমি নাজোর সহযোগিতায় আজকাল স্লেজ চালাতে শিখেছি। স্লেজের সামনে দাঁড়িয়ে বাঁ হাতে চারটে কুকুরের বল্‌গা ও ডান হাতে লিডার কুকুরের বল্‌গা নিয়ে চালাতে অসুবিধা হয় না। তবে স্টার্টিংটা এখনও আয়ত্তে আসেনি। অধিকাংশ সময়ই কুকুরগুলোর হ্যাঁচ্‌কা টানে আমার পক্ষে তার সামলানো মুসকিল। একদিন তো স্লেজ চালাতে গিয়ে পড়লাম ঠিক স্লেজের সামনেই— আব সম্পূর্ণ স্লেজটা আমার ওপব দিয়ে চলে গেল। ভাগ্যিস বরফের অবস্থা ছিল কাদার মতো, আর স্লেজের নেই চাকা; নয়তো অবস্থা সঙ্গীন হয়ে দাঁড়াতো। অনেকটা ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ান যদি সামনের দিকে পড়ে যায় আর তাব গাড়িটা যদি চলে যায় তার পিঠের ওপর দিয়ে তাহলে যেমন হয় ঠিক সেইরকম।

কুকুরগুলোকেও বরফের অবস্থাভেদে যত্ন নিতে হয়। যেমন বরফ যেখানে কাদার মতো প্যাচ পেচে— সেখানে কুকুরগুলোকে চামড়ার জুতো পরানো হয়, নয়তো তাদের পায়ের তলায় অথবা আঙুলের ফাঁকে বরফ জমে গিয়ে ইটের মতো হয়ে

যায়। তাতে কুকুরগুলোর চলতে খুব অসুবিধে হয়, তাদের পা যায় পিছলে অথবা স্লেজ টানার সময় আঙুলের ও নখের যে জোরের দরকার তার অসম্ভব হয়ে পড়ে।

এইভাবে স্লেজ চালানো আমার একটা নেশা হয়ে দাঁড়ালো, স্লেজ চালাতে চালাতে কুকুরগুলোর লেজ ও পিঠের অঙ্গভঙ্গি আমার মুখস্ত হয়ে পড়লো। তবে একটা অসুবিধা হচ্ছে আমার শরীরের ওজন নিয়ে। স্লেজের ওজন যদি পঞ্চাশ থেকে পয়ষট্টি কিলোর মধ্যে হয় তাহলে ব্যালেন্স্ রাখার পক্ষে খুব সুবিধা হয় কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার ওজন বড়জোর পয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ কিলো হবে তার বেশি নয়। কাজেই হালকা স্লেজের জন্য প্রায়ই আমাকে আছাড় খেতে হচ্ছে অথবা মাঝে মাঝে স্লেজ যায় উল্টে। অবশ্য আমার কিছু সুবিধাও ছিল, ভারী তুষারপাতের ওপর দিয়ে চলতে গেলে পা যায় ডুবে, তার জন্য পায়ে চওড়া তক্তা কাঠের মত জুতো ব্যবহার করতে হয়, কিন্তু আমাব শবীর হালকা থাকায় সেই জুতো না পবেও আমি হাঁটতে পারতাম। অনেক সময় বরফ গলতে শুরু কবে, সেই সময় স্লেজের পাশ দিয়ে হেঁটে কুকুরগুলোকে টেনে নেবার জন্যও আমার শরীর নেহাৎই উপযোগী।

অধিক মাংস ও চর্বিজাত খাবারেব জন্য ও বছরেব প্রায় ছ'মাস বসে থাকার জন্য অধিকাংশ এস্কিমোই চর্বিবহুল—ওদের ওজন গড়ে ষাট কিলোগ্রামের মত। বন্ধু নাজোর ওজন প্রায় ষাটের কাছাকাছি অথবা কিছু কম হবে।

একদিন নাজো ও আমি দু'জনে বেরিয়ে পড়লাম একটা স্লেজ নিয়ে— সূর্যের তখন উত্তর-পূর্ব গতি অর্থাৎ রাত। সেদিন সকাল থেকেই কুকুরগুলো খুব অস্থির হয়ে উঠেছে, নিজেদের মধ্যে দু'বাব কামড়া-কামড়ি কবেছে। ওদেব এই চঞ্চলতার সাথে সাথে মানুষদের মধ্যেও কিছু চঞ্চলতা দেখা দিল। অভিজ্ঞ বুড়োরা ইগ্লুর বিভিন্ন দিকে ঘুরে নাক উঁচু করে কিসের জন্য গন্ধ পাওযার চেষ্টায় ব্যস্ত— তাই প্রায় দুপুব নাগাদ তিনটে শক্ত স্লেজ বেরিয়ে পড়লো। তাদের চঞ্চলতা দেখে মনে হল যে হয়তো তারা শিকারের গন্ধ পেয়েছে—নাজো সকাল থেকেই সেখানে ছিল না— থাকলে হয়তো বেরিয়ে যেত। আমিও সেদিন নতুন সীল মাছের চামড়ার ওপব বরফ ঘসতে ব্যস্ত ছিলাম। কাজেই প্রায় যখন ঘুমোতে যাবো ঠিক সেই সময়ই নাজোর পাল্লায় পড়ে বেরিয়ে গেলাম।

স্লেজেব লিডার কুকুরটা ঠিক সুবিধার নয়, ওর স্বভাবের ওপর হস্তক্ষেপ সব সময় ওর পছন্দ নয়, আর তাই নিয়ে চলার সময় আমাদের বেশ বেগ পেতে হচ্ছে। অবশ্য নাজো নাছোড়বান্দা, কুকুরের গতির জন্য ওর গতি অব্যাহত হোক সেটা ও চায় না। মুখের 'চোকাচোক্' শব্দ করেই আর ডান হাতের দড়ি ধরেই সাধারণত স্লেজের গতি ঠিক রাখা হয়। কিন্তু আজকে সব চেষ্টা বাড়াবাড়ি করেও লিডার কুকুর বা দলনেতাকে আয়ত্তে আনতে অসুবিধা হচ্ছে। এর মধ্যেই আমরা

প্রায় দু'বার পড়ে গেছি— অবশ্য পড়লেই যে থামতে হবে তার কোনো মানে নেই। কুকুরদের উৎসাহের চেয়ে আমাদের উৎসাহও কম নয়। মাঝে মাঝে এরকম প্রায়ই নাজোর সাথে বেড়াতে বেরোতাম, কারণ আমি স্লেজ নিয়ে বেশিদূর যাবার সাহস পেতাম না, আছাড় খাওয়ার চেয়ে হারিয়ে যাওয়ার ভয়ই বেশী।

বেশ কিছুদূর আসার পর হঠাৎ একটা উঁচু জায়গা থেকে নিচে নামবার সময় কুকুরগুলো ক্ষেপে উঠলো, দৌড়তে লাগলো পাগলের মতো— নাজো চেঁচিয়ে দু'তিনবার আমাকে কি যেন বললো, মনে হলো স্লেজটাকে আঁকড়ে ধরার জন্যই ও বলছে। প্রচণ্ড বেগ সামলাবার জন্য ও বসে পড়েছে সামনে আর একটা বাঁক পেরোতেই কুকুরগুলো ডান দিকে ঘুরলো আর স্লেজটা তাড়াতাড়ি বাঁক নিতে গিয়ে গেল উল্টে। কুকুরগুলোও হুক থেকে ছাড়া পেয়ে বেরিয়ে গেল। তাবপর আমি আর কিছু বুঝতে পারার আগেই ছিটকে পড়লাম একটা ববফের শ্লেটের ওপর। সেখানে কোনও কিছু আঁকড়ে ধরবার আগেই গ্লাসিয়ারের ওপর থেকে আমি গড়াতে শুরু করলাম।

যেন মুহূর্তেব মধ্যে ব্যাপারটা ঘটে গেল— আমাব পক্ষে তার বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। শেষে যেখানে এসে আটকালাম সে জায়গাটা প্যাচ্‌প্যাচে কাদার মত বরফের কূপ। মানে আমার চারিদিকে টিবির মত বরফ। ববফেব ওপর থেকে এবারে ওপরে উঠতে শুরু করলাম। অনেকক্ষণ চেষ্টাব পব পাশেব শক্ত বরফে এসে উঠলাম। বরফের নীচে পড়ে রইল আমার এক পায়ের জুতো। ভাগ্য ভালো শরীরের কোথায়ও আঘাত লাগেনি। এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি কিন্তু এখন দেখছি আমার একটা পা প্রায় অবশ হয়ে আসছে। হাত দিয়ে দেখি আমাব বাঁ পায়েব ভারী উলের মোজাটা ভিজে জব্‌জবে আর তাই পায়ের বক্তও প্রায় জমতে শুরু করেছে— এর পরিণাম কি ভেবে শিউরে উঠলাম। তাড়াতাড়ি মোজাটা খুলে পায়ে ম্যাসেজ শুরু করলাম। পায়ে একটু আরাম বোধ করতেই আবার উঠতে শুরু করলাম। চামড়ার কোটের নিচে জামাটাও ভিজে গেছে, জানি না— ববফে অথবা ঘামে। সেদিকে আমার লক্ষ্য কবার সময় নেই। এখন খুঁজে বার করতে হবে নাজোকে; ও বেচারার অবস্থাটা কি কে জানে। হামাগুড়ি দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে শেষ পর্যন্ত টিপির উপর উঠে এলাম। এবার ভালভাবে লক্ষ্য করতে সামনেই প্রায় পঁচিশ গজ ব্যবধানে একটা বড় কালো পাথরের মতো জিনিসের ওপব আমাব চোখ আটকে গেল। চারদিক বরফে সাদায় সাদা আর তাব মধ্যে এমন বৈচিত্র্য সত্যি অদ্ভুত বটে, আমি ওটাকে ভালভাবে দেখবার জন্য সবে সেদিকে পা বাড়িয়েছি, সঙ্গে সঙ্গে সেই কালো পাথরটাও যেন একটু নড়ে উঠলো— ব্যাপারটা অদ্ভুত বটে। সাদা বরফে চোখ ঝলসে গিয়ে অনেক সময় মরিচীকার মতো ভুল দেখাটা আশ্চর্য নয়, তাই চোখটা ভালভাবে রগড়ে নিলাম। হঠাৎ কানে এলো হাস্‌কি (কুকুর) দের চীৎকার। একটু দূরেই ছায়ার মতো কতকগুলো কি যেন এদিকে দৌড়ে আসছে— হ্যাঁ কুকুরগুলোই বটে। আমি একটু উঁচু জায়গায় থাকাতে বেশ ভালভাবেই সব দেখতে পাচ্ছি। সেই কালো পাথরটাও আরও একটু নড়ে উঠলো— এইবার ভালভাবে নজর পড়তেই

পরিষ্কার বুঝলাম এটা একটা বিরাট জন্তু। যেন হামাগুড়ি দিয়ে বসে আছে— বিরাট শরীরের ওপর শুয়োরের মতো ছোট একটা মুখ। সর্বনাশ এ আমি কোথায়? নিজেদের অবস্থাটা অনুভব করতেই ভয়ে আমার পা-টা আরও অচল হয়ে এলো। ওদিকে কুকুরগুলো অনেক এগিয়ে আসছে— এখন অবস্থা আরও সঙ্গীন কারণ কুকুরগুলোর ভয়ে যদি জন্তুটা আমার দিকে এগিয়ে আসে— তাহলে আমার পালাবার পথ নেই দৌড়বারও উপায় নেই— কিন্তু এমন অবস্থায়ই বা কতক্ষণ থাকা যায়। কুকুরগুলো আরও কাছে এগিয়ে আসতেই জন্তুটা একটু নড়ে উঠলো। আর তার ভারী দেহটাকে নাড়াবার আগেই কুকুরগুলো তাকে প্রায় ঘিরে ধরলো। একটা ভয়ংকর কিছুর আশঙ্কায় আমিও পেছনে দৌড়তে গিয়ে পড়লাম পিছলে— আগের সেই বরফের জলে। তারপর সেখান থেকে কোনোরকমে নিজেকে উদ্ধার করে পাশের অন্য ঢিপির ওপর হামাগুড়ি দিয়ে প্রাণপণে উঠতে লাগালাম— এই ঢিপিটা অনেক উঁচু, একদম উঁচুতে উঠতেই কুকুরগুলোর চীৎকার স্পষ্ট হয়ে এল। অবস্থাটা দেখবার জন্য এতক্ষণে আমার সেদিকে চাইবার সময় হল। এখন দেখছি সেই জন্তুটাকে ঘিরে পাঁচটা কুকুর প্রাণপণে চীৎকার করছে আর পালাবার পথ না পেয়ে সেই জন্তুটা নির্লিপ্তের মত বসে আছে। যাক্‌গে বাঁচা গেল, অন্ততঃ জন্তুটা আমাকে তাড়া করেনি। মাঝখান থেকে আমি নিজেই ঘাবড়ে গিয়ে বরফের জলে নাকানি-চোবানি খেলাম। আমার যে এখন কি দুরবস্থা একমাত্র ভগবানই জানেন। কুকুরগুলো চীৎকার করছে তো করছেই, আশপাশে তাকিয়ে নাজোকে আর খুঁজে পাচ্ছি না, লোকটার কি অবস্থা কে জানে? আমিও কি করবো কোথায় যাবো ঠিক করতে না পেরে ওই জন্তুটার মতোই দিশেহারা হয়ে পড়লাম। মাঝে মাঝে পায়ের অবশ ভাবটা কেটে যেতেই ম্যাসেজ করতে আরম্ভ করলাম। আশ্চর্য বটে জন্তুটার এত বড় দেহ থাকতেও ওই কুকুরদের সঙ্গে কিন্তু মোটেই লড়াই করছে না অথবা এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছে না। বসে আছে তো বসেই আছে, শুধু মাঝে মাঝে ঘাড় তুলে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে— কিন্তু নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে। এতক্ষণে ভোর হয়ে এসেছে মানে সূর্যের আলো এখন দিন ঘোষণা করেছে। আমি এখনও বসে আছি কেন নিজেই জানি না— এখন শীতে রীতিমত কাঁপুনি শুরু হয়েছে। আর কুকুরগুলো আগের মতোই লেজ তুলে জন্তুটাকে ঘিরে তারস্বরে চিৎকার করছে।

হঠাৎ মনে হল দূরে আরও কয়েকটা কালো কালো কি যেন এদিকেই ছুটে আসছে, হ্যাঁ— কুকুরই বটে! যাকগে বাবা, তাহলে বাঁচা গেছে ওরা আসছে। আমি এইবার সাহস পেয়ে খুব সাবধানে ঢিপির পাশ ধরে আস্তে আস্তে জন্তুটার দিকে এগিয়ে এলাম; তারপর নেমে এলাম সমতলে, বাকী কুকুরগুলো ঝাঁপিয়ে এসে পড়লো সেই জন্তুটার সামনে— আগে ছিল পাঁচটা আর এখন দাঁড়ালো চোদ্দটা, আর সেই চোদ্দর চিৎকারে কান ঝালাপালা হতে লাগলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওখানে এসে পৌঁছলো আরও সাতজন এস্কিমো। তারপর তাদের হাতের বর্শা এসে বিধলো জন্তুটার মাথায় ও বুকের কাছে। সাদা ধপ্‌ধপে বরফের ওপর দিয়ে বয়ে চললো

রক্তের বন্যা। তারপরের দৃশ্য আরও নৃশংস। নেকড়ের মতো কুকুরগুলো বরফের ওপর থেকে সেই রক্ত পরম তৃপ্তিভরে চাটতে লাগলো আর উনাংরা বীরদর্পে সেই পশুটার ছাল ছাড়াতে লাগলো। এই হ'ল ওদের সীলমাছ শিকার। আস্তে আস্তে তারপর শুরু হল বাকী কাজ।

এই বিরাট সীলমাছটার ওজন কত হবে জানি না। তবে আয়তনে প্রায় তিনটি গরুর সমান। হ্যাঁ আমি বলতে ভুলে গেছি, আসলে হয়তো নাজোই এই লোকগুলোকে খবর দিয়েছে, ওরা কাছাকাছি কোথায়ও হয়তো এই জন্তুটারই সন্ধানে ছিল। মাংস কাটতে কাটতে নাজো আমার দিকে তাকালো— তারপর আশ্চর্য হয়ে আমার দিকে ছুটে এলো— আমার তখন পাগলের বেশ— মাথায় টুপি নেই, একপায়ে জুতো আর একপায়ে ভেজা মোজা আর শীতে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছি। ও তাড়াতাড়ি চেঁচিয়ে আরও দু'জনকে ডাকলো তারপর ওরাই আমাকে কাঁধে করে তুলে নিয়ে চললো দূরে রাখা স্লেজটার ওপর, তারপর হাতাহাতি করে আমার পোশাক পাল্টে দিল। আমার অবস্থা অনেকটা যুদ্ধে আহত সৈনিকের মতো। পোশাক পরিবর্তনের পর আবার আমি প্রকৃতিস্থ হলাম, পা গরম হতেই রক্তচলাচল আবার আরম্ভ হল। ওদিকে তিনটে স্লেজে বোঝাই করা হল সেই জন্তুটার মাংস, তারপর তাকে 'নাকেটারা' করা হ'ল, অর্থাৎ শক্ত দড়ির চামড়া দিয়ে বাঁধা হ'ল। কুকুরগুলো রক্ত চেটে সাদা বরফকে আবার সাদা করে দিল, এখন ওরা সত্যিই শান্ত। কুকুরগুলোকে আবার স্লেজে লাগানো হল। আমার বাঁ পা তখনও সম্পূর্ণ সারেনি— নাজো সেটা বুঝতে পেরে, মাংস বোঝাই স্লেজের কোনে আমাকে একটু দাঁড়াবার জায়গা করে দিল—তারপর আমরা বাড়ির পথ ধরলাম, সঙ্গে আমাদের বিরাট সম্পত্তি, মাংস হাড় দাঁত আর বিরাট চামড়া। আমার প্রতি সবাই সদয় আর সবাই আমার কাছাকাছি চলতে লাগলো—দু'একজন এরই মধ্যে আমাকে আনন্দে জড়িয়েও ধরেছিলো— কেন জানি না, হয়তো এই শিকারে ওরা ভেবেছে আমার কৃতিত্ব অনেকখানি। যাই হোক বিনা আয়াসে যদি কৃতিত্ব পাওয়া যায় তাহলে মন্দ কি?

এবার এস্কিমোদের শিকারে একটু ভাঁটা পড়লো, পর পর দুটো বড় জন্তু হাতে পাওয়ায় এদের প্রাচুর্যতা এসে গেছে, তা ছাড়াও শুকনো মাছ সঙ্গে থাকায় এদের খাবারের কোনও অসুবিধাই নেই। অবশ্য সিন্ধুঘোটক শিকারটা অনেকটা বরাতের ব্যাপার, কারণ ওরা সাধারণতঃ জল থেকে উঠে খুব বেশি একটা দূরে যায় না—তবে সেদিনকার সেটা জলাশয় ছেড়ে রোদ পোহাবার জন্য অনেক দূর এগিয়ে এসেছিল, আর বেচারা সিন্ধুঘোটক ভাবতেই পারেনি তার আশপাশেই রয়েছে এস্কিমোদের ইগলু। কুকুরগুলোও সাংঘাতিক—শিকারের গন্ধ ওদের নাকে যায় প্রায় পাঁচমাইল দূর থেকে আর একবার সেই গন্ধ নাকে গেলেই ওদের চঞ্চলতা যায় বেড়ে।

এস্কিমোদের গল্প

বুড়ো আবার শুরু করলো তার গল্প, সাধারণতঃ আমি দেখেছি যে, শিকারে বেড়িয়ে আজ পর্যন্ত গল্প হয়নি, কিন্তু হঠাৎ আবার কেন বুড়োবাবার গল্প শুরু হ'ল বুঝতে পারলাম না।

সেদিন রাতের সিন্ধুঘোটকের মাংস সেদ্ধ ও চর্বির ঝোল খাবার পর শুরু হ'ল আমাদের গল্প। বরফের ইগ্‌লুটার মধ্যে বেশি জায়গা মোটেই নেই, তবু ঠাসাঠাসি করে হরিণের চামড়ায় পা ঢেকে আমরা প্রায় কুড়িজন বসলাম। গল্প শুরু হওয়ার সাথে সাথে সবাই দেয়ালের দিকে মুখ করে বসলো আর বুড়োবাবাও দেয়ালের দিকে মুখ করে তার কাহিনী আরম্ভ করলেন, যেন দেযালই তার একমাত্র শ্রোতা। আমি সত্যি ওদের ব্যাপার দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলুম। কিন্তু পরে পরিষ্কার হ'ল ব্যাপারটা, আসলে এই বরফের দেয়ালে কথাটা প্রতিধ্বনিত হয়ে আরও দ্বিগুণ জোর হয়ে আসে তাই এই ব্যবস্থা। মাইকের সামনে যেন বক্তা তার বক্তৃতা চালাচ্ছে—বাঃ! চমৎকার বুদ্ধি বটে। আজকাল গল্প শুনতে আমার খুব বেশী ভালো লাগে না—সেই একই গল্প রোজ রোজ শোনা। বিশদভাবে আমি যদি বলি গল্পটা হ'ল এরকম—

আমি স্লেজে করে খুব জোরে যাচ্ছি হঠাৎ দেখতে পেলাম সেই ভালুকটার পায়ের ছাপ। সাথের কুকুরগুলোকে স্লেজের থেকে দিলাম আলগা করে: মুহূর্তের মধ্যেই ওরা গিয়ে ঘিরে ফেলল ভালুকটাকে।

ওঃ সে এক মস্ত শিকার—লম্বা মেয়েলোকের চুলের মতো তার পশম— সাদা যেন ধবধবে বরফ, ওরকম পশমে তৈরি পোশাকে আমি বরফের ওপর দিব্বি নাক ডাকাতে পারি— ঘড়-ঘড়-ঘড় ঘোৎ-ঘোৎ-ঘোৎ!

কিন্তু সেই ভালুকটার নখগুলো ঠিক বর্শার ফলার মতো— একবার ছুঁলেই তিমি মাছের ছাল পর্যন্ত কেটে যাবে; তার দাঁতগুলো সাদা হালকা মাছের মতো (ওরা মাছ ধরার সময় ভালুকের দাঁত টোপ হিসেবে ব্যবহার করে) আর বিরাট বড় দুটো স্লেজ লাগে তাকে টানতে। হ্যাঁ কুকুরগুলো চেঁচাচ্ছে আর ও বোকার মত এদিক ওদিক যাবার চেষ্টা করছে কিন্তু অসম্ভব, আমার আটটা কুকুর ওকে ঘিরে ধরেছে—বোকা ভালুকটা কিন্তু ইচ্ছে করলে অনায়াসেই আমার কুকুরের পেট চিরে ভুঁড়ি বার করে দিতে পারে কিন্তু তা সম্ভব নয়, কারণ আমার কুকুরগুলো ওর তুলনায় ছোট্ট বটে কিন্তু ভীষণ হিংস্র আর ধূর্ত।

শেষে কোনো উপায় না দেখে হঠাৎ সেই বোকা ভালুকটা দু'পায়ে দাঁড়িয়ে পড়লো আমার একটা কুকুরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য। আমিও সেই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম— যেই সে দাঁড়িয়েছে আর অমনি আমি তার বুক লক্ষ্য করে ছুড়লাম আমার বল্লম। ওঃ ঠিক জায়গায় লেগেছে— তারপরই ব্যস! আমার কুকুরগুলো মজা করে ওর রক্ত চাটতে লাগলো— বুঝেছো আমি একা ওই বোকা ভালুকটাকে শেষ করলাম।

এই গল্পে যদিও আমি হাসির ব্যাপার কিছুই পেলাম না, কিন্তু জানি না ওদের কাছে কি করে এই গল্পটি পেটে খিল ধরানো হাসির খোরাক জোগায়।

প্রথম প্রথম আমি এদের খুব গরীব অধিবাসী ভেবেছিলাম, কিন্তু আসলে এস্কিমোরা সাধারণত গরীব নয়, ওদের জীবনযাত্রাই এরকম। যেমন ছাতু-লঙ্কা খাওয়া দেখে আমরা অনেককে গরীব ভাবি কিন্তু মাড়োয়ারীদের দেখেছি রূপোর থালায় ছাতু চটকাতে। ঠিক তেমনি এস্কিমোদের জীবন-যাত্রাই ওরকম। যারা এই জীবন পছন্দ করে না তারা সভ্যতার কলকাঠিতে ধরা দিচ্ছে। তাই আংমাগশালিকে দেখেছি তাদের দিব্বি আমেরিকান প্যান্ট ও টাই হাঁকিয়ে আমেরিকান ফৌজ মার্কা সিগারেট ফুক্‌তে। আমাদের এই এস্কিমো গোষ্ঠীতে পাঁচজনের যে বন্দুক আছে তা আমি আগে জানতাম না, তাই হঠাৎ একদিন এদের হাতে বর্শার বদলে বন্দুক দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। তবে বুঝতে অসুবিধা হ'ল না যে ভাবী শিকারের আয়োজন হচ্ছে। সকাল সকাল তিনটে স্লেজগাড়ী সাজানো হল। প্রথমে ওরা আমাকে নিতে রাজি হয়নি— কিন্তু শেষে নাজো আমার করুণ মুখের দিকে তাকিয়ে সবাইকে রাজি করালো— আমিও হেসে ওদের সাথে যোগ দিলাম।

আমরা কিছুটা প্রায় দক্ষিণের দিকে নেমে এলাম, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমরা একটা বিরাট জলাশয় পেলাম। অবশ্য এখানে ছোটখাটো জলাশয় প্রচুর রয়েছে। একটা বড় লেকের ধারে এসে আমরা থামলাম। লেকের ওপর ছোটখাটো প্রচুর বরফের স্তূপ ভেসে রয়েছে, কোনো কোনো সময় এই বরফের স্তূপগুলোকে দ্বীপের মতো দেখাচ্ছে— দেখতে ভারী মজার। বর্ষার সময়ে যেমন গঙ্গার জলে প্রচুর কচুরীপানা ভেসে যায় এখানেও তেমনি, তবে কচুরীপানার বদলে বরফের স্তূপ, ভাসছে ঠিক হালকা শোলার মতো।

জীবিকার্জন

এদের কাজ শুরু হল। স্লেজ থেকে চামড়া ও কাঠের লাঠি বার করে শুরু হ'ল এদের কায়াক তৈরি, দক্ষ শিকারীটি সবসময় কায়াক নিয়ে বেরোয় না কারণ স্লেজে তা বইবার অসুবিধা। তারা কায়াকের সরঞ্জাম সঙ্গে নিয়ে যায়, তারপর প্রয়োজন মত কায়াক তৈরি করে নেয়। সাধারণতঃ তিমি মাছের বিরাট ছালকে কাঠের বা হাড়ের ফ্রেমের চারপাশে মুড়ে ছোট একটা ছিপ নৌকোর মতো তৈরি করা হয়! কায়াকগুলো খুব হালকা; একজন লোক অনায়াসে একটা কায়াক বইতে পারে। কায়াক সাধারণতঃ দু'রকমের হয়— একরকম হচ্ছে পাটাতন ঢাকা, তার মানে নৌকোর ওপরটা সম্পূর্ণ চামড়া দিয়ে মোড়া, শুধু বসবার জায়গাটা গর্ত মতন— সোজা কথায় একে চামড়ার একটা বেলুনের মত বলা যেতে পারে, আর দ্বিতীয় পর্যায়ের হচ্ছে, পাটাতন খোলা ঠিক একটা ছোট্ট নৌকো। এরকম চামড়ার কায়াককে অনেক সময় উমিয়াক বলা হয়। যাই হোক, শেষে চারটে কায়াক তৈরি হল। চারটে কায়াকে চারজনের হাতেই বন্দুক আর বাকী সবাই ডাঙার বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়লো— অনেকটা সুন্দরবনের কুমীর শিকারের মতো।

কায়াক ভেসে চললো মাঝ দরিয়ার দিকে— দূরে একটা বরফের দ্বীপের দিকে। আমরা, মানে আমি আর একজন ইনুৎ— আমাদের করবার কিছুই নেই। আমার সাঙ্গীটি একটু অদ্ভুত গোছের, তার হাব-ভাবটা এমন যে আমাকে সে কোনোদিনই দেখেনি। সে আমার দিকে মিটমিট করে তাকাতে লাগলো, অবশ্য সে তাকানোর মধ্যে একটা বলিষ্ঠতা আছে— আমি একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম। ওকে একটু এড়াবার জন্য আমি স্লেজগাড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম। কুকুরগুলোকে আলাদা আলাদা করে বাঁধা হয়েছে, যাতে নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি না করে। ওর মধ্যে আমার চেনা তিনটি কুকুর পেলাম, আমাকে দেখেই ওরা লেজ নাড়তে শুরু করলো— আমিও কাছে গিয়ে তাদের মাথা চুলকোতে লাগলাম— গরুর গলায় হাত বোলালে যেমন গরুগুলো চুপচাপ দাঁড়িয়ে সেই সুড়সুড়ি অনুভব করে ঠিক তেমনি কুকুরগুলোর মাথা চুলকালে ওরাও আনন্দে লেজ নাড়তে থাকে। আমি ওদের কাছেই রইলাম।

মাথার ওপর সূর্য, বাতাস প্রায় নেই বললেই চলে, তবে ঠাণ্ডার মাত্রা মনে হয় শূন্যের তিন-চার ডিগ্রি নীচে, এই অবস্থাকেই এস্কিমোরা গরম বলে। ওদের ওই বরফে ফেটে পড়া চামড়ায় এই সময়টাই পরম উপভোগ্য। খানিক পরেই দেখলাম আমার ইনুৎ-সঙ্গী আমার দিকে এগিয়ে এলো। আমার দিকে তাকিয়ে ও আকাশের

দিকে তাকিয়ে কি যেন বললো— হয়তো চমৎকার দিন গোছের একটা কিছু। সে স্লেজের কাছে এসে আস্তে আস্তে জামা-জুতো খুলতে লাগলো। এস্কিমোদের পোশাক খোলা সেও প্রায় আধঘণ্টার ব্যাপার। তিনটে চারটে সোয়েটার, তার ওপর কোট, মাথায় টুপী পায়ে দু'জোড়া মোজার ওপর চামড়ার হাঁটু ঢাকা জুতো, যদিও মাথার ওপর সূর্যের আলো কিন্তু তাকে সূর্যের তাপ মোটেই বলা যায় না। কাজেই ওর ওই পোশাক খোলা দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। একে একে ও সব পোশাক খুলে শেষে উলঙ্গ হয়ে পড়লো— সত্যি ওর লজ্জা নেই বটে, কিন্তু আমি লজ্জায় পড়লাম— আর সেই ভাবটা এড়াবার জন্য কুকুরদের নিয়ে একটু অকারণেই ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। ইনুং মুখ দিয়ে একটা শব্দ করে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো ও আমায় ইসারায় ডাকলো— এসো ভাই উলঙ্গ হয়ে একটু মজা করা যাক। আমি এই বরফের রাজত্বে উলঙ্গ হওয়ার স্বপ্নও দেখি না— বরঞ্চ ওর উলঙ্গতা দেখে আমারই হাড় কাঁপুনি শুরু হল। এই রাজত্বে যদি একবার উলঙ্গ হই তাহলে আর দেখতে হবে না—যদিও সুদূর গ্রীনল্যান্ড, তবুও যমবাবুর আসতে এখানে বিলম্ব হবে না।

এস্কিমোরা জীবনে কোনদিন স্নান করে না অথবা স্নানকরা জিনিসটা কি কেউ জানে না। তবে তাদের স্যাঁতসেঁতে চামড়ায় একটু আলো বাতাস লাগাবার জন্যই এই ব্যবস্থা। অনেকে শুনেছি এই সময় নরম বরফ গায়ে ঘসে—ওঃ সে আমি কল্পনা করতে পারি না। অনেকক্ষণ কেটে গেছে, সঙ্গীরা শিকার করতে গেছে তো গেছেই, আমার বিশেষ কিছু করার নেই, শেষে একঘেয়েমি দূর করার জন্য স্লেজ থেকে দড়ি ও বরশি বের করে নিলাম মাছ ধরবার জন্য। সত্যি এই চিন্তাটা আগে কেন আসেনি— তাহলে অন্তত অনেক আগেই একঘেয়েমির থেকে রক্ষা পাওয়া যেত। সাধারণত এদের স্লেজ গাড়িতে শিকারের সব সরঞ্জাম মজুত করা থাকে। তিমি মাছের শিরা থেকে এরা একরকমের সুতো তৈরি করে, সেই সুতো মাছ ধরার পক্ষে খুব ভাল। সেই সুতোর সাথে হাড়ের ছোট্ট মাছ আটকানো, সেটাই আসলে বরশি ও টোপ। একটা লম্বা লাঠির মাথায় সেই সুতোটাকে বেঁধে তৈরী করলাম ছিপ— ছিপতো নয় অনেকটা গুগলি দিয়ে কাঁকড়া ধরার লাঠি বলাই ভাল।

লেকের ধারে এসে দেখি, ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ ঘুরে বেড়াচ্ছে। এগুলোকে ইংরেজিতে সাল্‌মন বলে আর ফরাসী ভাষায় একে বলে সোমো, বাংলায় এর কোনো নাম নেই বলেই আমার মনে হয়। এই মাছগুলো দেখতে অনেকটা ভেটকি আর রুই-এর মাঝামাঝি, আর খেতে অনেকটা পানকৌড়ির মতো (অবশ্য জানি না ক'জন আমার মত পানকৌড়ির মাংস চেখেছেন) মানে আসটে গন্ধযুক্ত মাছ। কাঁচা ইলিশমাছ কাগজে পুড়িয়ে খেতে যে রকম লাগে। যদিও খাবার হিসেবে সুখকর নয়, কিন্তু খিদের সময় দুঃখকর নয় এ সম্পর্কে আমি নিঃসন্দেহ। জন্তুদের মধ্যে শেয়াল, পাখীদের

মধ্যে কাক আর ঠিক মাছেদের মধ্যে সাল্‌মন মাছ খুব চালাক। এরা সহজে মরে না। ডাঙ্গায় কৈ-মাছের মত অন্ততঃ দু'দিন জল ছাড়া বেঁচে থাকতে পারে। এরা চালাক মাছ, কি করে যে বোকার মতো হাড়ের মাছের টোপ গেলে, ভেবে আশ্চর্য হই। মাছগুলোকে ধরা খুব সোজা— ঘণ্টায় আমার মতো আনাড়িও প্রায় পাঁচটা মাছ ধরতে পারে। এক একটা মাছের ওজন হবে প্রায় দেড় কিলোর মতো।

সময় কাটাবার এমন সহজ উপায় হয়তো আর নেই— অবশ্য সবই সময় ও স্থান বিশেষে। মাছগুলো টোপ গিলতেই ধরছি, তারপর বরফের ওপর আছাড় মেরে ইহলীলা শেষ করে মুখ থেকে বরশিটা ছাড়িয়ে নিচ্ছি— ব্যস্‌ তারপরই আবার ধরছি— অদ্ভুত শিকাব। ক'ঘণ্টা এভাবে কেটেছে জানি না, তবে আমার ধরা প্রায় কিলো চল্লিশ মাছ পাশে স্তূপীকৃত হয়েছে। খেয়ে নয়, তবে এ দেখেই আনন্দ বিশেষ কবে আমার মতো মাছ-কাঙালী বাঙ্গালীর পক্ষে। হঠাৎ দূরের দিকে নজর পড়লো, আমার সঙ্গী চেঁচিয়ে কি যেন বলছে, ভালো করে নজর করে দেখি ও আমাকে কিছু বলছে না, আসলে দূবে লেকেব ওপর ওর সঙ্গীদেব প্রত্যাবর্তন নজরে পড়াতে আনন্দোল্লাস।

দুটো কায়াক ঘাটে এসে লাগলো, তারা খুব উত্তেজিত—স্লেজের থেকে ভাবী দড়িব গোছা ও দুটো বল্লম নিযে ওবা আবার যাত্রা কবলো। আমার সঙ্গী ইনুং আমাকে ওব সাথে ডেকে নিয়ে গেল স্লেজের দিকে। স্লেজেব সাথে কুকুরগুলোকে যুতে আমরা লেক্‌টার ধার ধরে দক্ষিণ দিকে এগোতে লাগলাম। অনেকক্ষণ পর আমরা লেক্‌ হতে বেরিয়ে আসা একটা নদীর ধারে এসে থামলাম। সেখানে ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করতেই দূরে নজরে পড়লো পাশাপাশি চারটে কায়াক— এদিকে রাত হয়ে আসছে। কাযাকগুলোর মধ্যে একটা সামনে, সেখান থেকে লম্বা দড়ি জলে এসে পড়েছে আর সেই দড়িটাব গতি অনুযায়ীই ওদের গতিবিধি হচ্ছে। মনে হয় একটা বড় শিকাব ধবা পড়েছে। কায়াকগুলো পরপর কাছাকাছি থাকবার জন্য একটা দড়ি দিয়ে বাঁধা। জলের নীচের শিকারটাই আসলে টেনে নিয়ে চলেছে এই তিনটে কায়াককে। একটা কায়াক দূর হতে বন্দুক উঁচিয়ে রয়েছে— শিকারটা জলের ওপব ভেসে উঠলেই আবার গুলি করা হবে।

এইভাবে শিকাব ও শিকারীদের মধ্যে যুদ্ধ চললো— ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সেই যুদ্ধ শেষ হল। কুকুরগুলো কান খাড়া করে আছে অথচ টুঁ শব্দটি নেই। তারপর চারটে কায়াক ধারে এসে ভিড়লো। কায়াকের সাথে সাথে দড়ি দিয়ে বাঁধা নোঙরের মতো জলের নিচে শিকারটাকে এবার শক্ত একটা খুঁটি করে বাঁধা হল।

তারপর চললো ওদের পরামর্শ— পরামর্শানুযায়ী তিনজন স্লেজগুলো নিয়ে চলে গেল আর বাদবাকী সবাই ওখানে বসে রইলাম।

শীতেব রাত— এখন হিসেব মতো রাত দুটো থেকে চারটের ভেতর। অবশ্য এ সবটাই আমার অনুমান মাত্র। ভারী মেঘের দরুণ, আজকে সূর্যের রঙিন আলো আর দেখা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু দিব্বি দিনের আলো—যেন মেঘে ঢাকা দিন।

স্লেজগুলো নিয়ে যাবার সময় ওর মালপত্রগুলো সব রেখে গেছে, কাজেই চর্বিতে আগুন জ্বালানোর কোন অসুবিধা নেই। চর্বিব আগুনে আমাব ধরা সাল্‌মন মাছের পোড়া-চচ্চড়ি খাওয়া হল, তাবপব চামড়া বিছিয়ে তার ওপর সবাই সটান হল। একজন অবশ্য খুঁটিটার কাছে রইল, মাঝে মাঝে পরীক্ষা করবার জন্য যে শিকারটা আছে কি নেই। পরের দিন হৈ হৈ করতে করতে অন্যান্য এস্কিমোরা সেখানে এসে হাজিব হল। আগেকার ইগ্‌লু ভেঙে মালপত্র নিয়ে সবাই চলে এসেছে।

তাদেব জন্যই আমরা সবাই অপেক্ষা করছিলাম। এবার সবাই দড়িটার দিকে এগিয়ে এল, আমাকে পেছনে সরতে হল। এবার দড়িটা ধবে সবাই টানতে লাগলো। একটাব পব একটা দড়ি জুড়ে এটাকে বিবাট লম্বা কবা হয়েছে। এইভাবে প্রায় তিনশ গজেব দড়িটাতে যখন প্রায় শেষ টান দেওয়া হল, তখন ভেসে উঠলো বিবাট প্রকাণ্ড এক দেহ— দেহটাকে তীরে আনা হল বটে কিন্তু এখন সমস্যা দাঁড়ালো যে কি কবে এটাকে ডাঙ্গায় তোলা হবে। কিন্তু এবা সবাই অভিজ্ঞ, নিজেদেব আয়ত্তেব বাইরে এবা কখনও শিকার কবে না। যদি শিকাব অতি বড হয় তাহলে এরা শিকাব ছেড়ে দেয। জলের ভেতব সেই বিবাট জন্তুটাকে অনায়াসেই চারটে মানুষ কায়দা কবে ধারে নিয়ে আসতে পেবেছে, কিন্তু এখন জল থেকে কুড়িজন লোকও তাকে তুলতে হিমসিম খাচ্ছে। সিন্ধুঘোটকটাব চাবপাশে দড়ি দিয়ে শক্ত কবে বাঁধা হয়েছে, এবাব কুকুবগুলোকেও কাজে লাগানো হল। কুকুরগুলোব পিঠের বেল্টেব সাথে দড়িটাকে আটকে দেওযা হল, তাবপব মানুষ ও কুকুরের সমবেত চেষ্টায ডাঙ্গায তোলা হল বিবাট এক জন্তুকে। সীল মাছেব চাইতে অনেক অনেক বড। এব চামড়া এখন মোষের চামডাব দ্বিগুণ মোটা, আব নতুনত্বেব মধ্যে দেখলাম, হাতীব দাঁতেব মত দুটো মুলো-দাঁত। প্রথমে দাঁত দুটোকে আলাদা করা হ'ল, দাঁত দুটোই এ শিকাবের বত্ন। অন্যান্যবাবেব মতো এবাবেও তাব চামড়া ছাড়ানো হ'ল, বিবাট চামড়া, একটা ছোট্ট নৌকোর পাল খাটানো হয়ে যাবে।

যা কিছু নেবাব তা নেওযা হল, বাকীটা খাওয়া হল, আব যে অংশটা বিস্বাদ অর্থাৎ খাওয়ার অযোগ্য তাকে ববফ চাপা দেওয়া হল। আমাদেব স্লেজেব সাথে মাংসেব জন্য আলদা তক্তা জুড়ে দেওয়া হল, যাতে মানুষেব কাঁধে ওটাকে বইতে না হয। আমাদেব সাথে এখন মালপত্রেব চেয়ে মাংসেব ওজনই বেশি হয়ে দাঁড়ালো। আমার হিসেবে বলতে পাবি যে এখন যদি অন্ততঃ তিনমাস শিকাব না করি তাহলেও অনায়াসে দিন চলে যাবে।

কথায় বলে খাওয়া-পরার যদি অভাব না থাকে তাহলেই সচ্ছল। কিন্তু সব সময় তা নয়। আমাদেব যাত্রা হল শুরু। এইবার শুরু হল সত্যিকারের দুর্দশা। আমরা চলছি পশ্চিম দিকে আর চলছি তো চলছিই— সে চলার আর বিরাম নেই। মাঝে মাঝে শুধু খাওয়ার জন্য থামা। ছোট শিশুদের প্রায়ই স্লেজের মালপত্রের

ওপরে বসিয়ে দিয়ে আমরা স্লেজটাকে ঠেলে কুকুরগুলোকে সাহায্য করি। অনেক সময়ই বরফের ভেতর কুকুরগুলোর টানতে অসুবিধা হয়— আর এখন আমাদের ঠেলতে হচ্ছে বোঝাই করা কাদায় বসা গরুর গাড়ির মতো।

উঁচু নিচু বরফের ওপর দিয়ে আমরা চলছি তো চলছিই, কোথায় চলেছি ভগবান জানেন। চলতে চলতে মাঝে মাঝে বসছি, খাচ্ছি আবার চলছি। এবার মাঝে মাঝে আমাদের একটু নতুন ধরনের মাংস দেওয়া হল। মাংসটাকে নোন্‌তা জলে সেদ্ধ করে তাকে শুঁটকি করা হয়েছে। বাচ্চাদের খেতে খুবই অসুবিধা তাই মায়েরা সেই মাংস চিবিয়ে শিশুদেব খাওয়াচ্ছে। আমাদেব মধ্যে সবচেয়ে যে ছোট্ট শিশু তার বয়স বডজোব হয়তো ছ'মাস হবে। এস্কিমো মায়েদেব আমি কিন্তু কোনদিনও দুধ খাওয়াতে দেখেনি, তবে শুনেছি শিশুরা চাব পাঁচ মাস পর্যন্ত মায়ের দুধ পান করে।

আমবা অনেক পশ্চিমে চলে এসেছি, আবহাওয়া এখন আবও খারাপ। শীত এখন আমাব কাছে ভয়ংকব হয়ে দাঁড়ালো। চলাব পথে বেশ আছি, কিন্তু থামলেই শীত— আবাব চলায় ক্লান্তি। গলায় শ্বেত ভালুকেব চামডাব গলাবন্ধ— মাথায় কানঢাকা টুপী, হাতে পাযে ও গায়ে যথাক্রমে দস্তানা— হাঁটু ঢাকা জুতো—চামড়ার কোট-প্যান্ট। চামডাবদ্ধ হয়ে গেছি, কিন্তু তবু যেন শীতেব পথ বন্ধ হয়নি। আমাদের রথ এখন পবিপূর্ণ, কিন্তু এদের মনোরথ এখনও পূর্ণ হয়নি, জানি না এই হতচ্ছাড়াদের হয়রান কবে হবে। কয়েকদিন ধরেই কন্‌কনে বাতাস শুক হযছে। চামড়া ভেদ করে ছুঁচের মতো শীত শরীরে ঢুকছে অথচ এদের দেখে মনে হচ্ছে অবস্থা বেশ সচ্ছল— অতএব এগিযে চল। সেদিন হঠাৎ এলোমলো বাতাস বইতে শুরু করল। এস্কিমোদের ফাটা-গালে আরও চির খেতে লাগলো— মেয়েদেব গালগুলো আপেলের মতো হয়ে ফ্যাকাসে হতে শুরু করলো আব শিশুদের গালগুলো যেনো পাকা টমাটো। আমি গালেব কথা বলছি, তারমানে এই নয় যে আমি গালকে খুব ভালবাসি। আসলে গাল আর চোখ ছাড়া সর্বাঙ্গ ঢাকা তাই...। সেই বাতাসেব মধ্যে আমাদের চলা দুস্কর হয়ে উঠলো— কুকুরগুলো তাদেব সবটা জিব বার করে বুঝিয়ে দিল যে তাবাও ক্লান্ত। অর্থাৎ ও জায়গাটার অবস্থা মোটেই সুবিধাব নয়। বাধ্য হয়ে ওদের চলা থামাতে হ'ল। যতই এদের সাথে চলেছি ততই এদের প্রতি আমার আস্থা জন্মাচ্ছে, এদের উপস্থিতি সত্যিই প্রশংসনীয়।

ছ'টা স্লেজকে পাশাপাশি রেলগাড়ীর মত সাজিয়ে তারপর চামড়া বিছিয়ে দিয়ে দিব্বি ঘর হয়ে গেল। অবশ্য এরকম ঘরে বসার উপায় নেই। বরফের ওপর চামড়া পেতে কোনবকমে মাথা গোঁজা হয়েছে, আমাদের সকলেরই পা বাইরে। সোঁ-সোঁ করে চামড়াব ওপর দিয়ে বয়ে চললো সেই দারুণ হাওয়া। প্রায় ঘণ্টাখানেক পর হাওয়ার বেগ একটু থামলে আবার শুরু হ'ল আমাদের যাত্রা। আমরা এবার বিরাট

ঢালু পেলাম, ঢাল বেয়ে নীচে নামতেই আবহাওয়া আমাদের অনুকূলে পেলাম— ওঃ সত্যি একেই বলে কন্‌কনে শীত। হাড়-কাঁপুনি হয় হাড় খাওয়া। ওঃ কি দুর্দশা! কোথায় বাংলার বসন্ত আর সব ছেড়ে কেনই বা সখ করে মরতে এলাম এই বরফের বাহারে। ভাগ্য ভাল— রাখে কেষ্ট মারে কে? তাই মরার আগেই স্থান পেলাম ইগ্‌লুতে। অনেকগুলো কষ্টের দিন বয়ে গেছে এখন তাই সবাই বিশ্রামরত। মনে হ'ল ওদের শিকার ফুরিয়েছে। এখানে আজকাল নতুন ধরনের জিনিস আমার চোখে পড়ছে, সেটা হচ্ছে অনেকটা পাতিহাঁসের মতো একরকমের মাছরাঙা, এগুলো বেশী উঁচুতে উড়তে পারে না আর অন্যান্য পাখীর মতো এরা খুব চটপটে নয়।

একদিন আমরা সবাই মিলে পাশাপশি দাঁড়িয়ে শিকলের মতো করে, এদের একটা দলকে তাড়া করলাম— তাদের তাড়িয়ে একটা নদীর ধারে নিয়ে এলাম! সেখানে আমাদেব কুকুরগুলো আগে থেকেই ওৎ পেতে বসেছিল। যেই হাঁসগুলো আমাদের তাড়া খেয়ে জলে ঝাঁপ দিতে যাবে ঠিক সেই সময় কুকুরগুলো ঝাঁপিয়ে পড়লো তাদেব ওপব। যদিও অনেক হাঁস পালালো কিন্তু সব কুকুরগুলোই একটা করে হাঁস কামড়ে ধরল। সেদিন আমাদের হাঁসেব মাংসের চড়ুইভাতি হ'ল। অনেকটা খেতে মুরগীব মতো, এস্কিমোরা এরকম বিধবামাংস খুব বেশী একটা পছন্দ করে না। অনেকে নাক সেঁটকালো বটে কিন্তু খাবার বেলা কেউ কম গেল না। কোনো কোনো সময় হাঁসের পালক বস্তায় বন্দী করে এবা তৈরী করে শিশুদের জন্য নরম গদি। একটু দূরে একদিন ঝরণার ধারে এগোতেই ওয়াটার ফাউল্‌স্ ধরনের একরকম পাখীও আমবা দেখলাম, সেদিন আমাদের মধ্যে দু'জনের কাছে বন্দুক ছিল। একঝাঁক পাখীর মধ্যে হঠাৎ বন্দুকের আওযাজ করা হ'ল— আশ্চর্যের ব্যাপার বন্দুকের শব্দেই দেখলাম প্রায় ডজন খানেক পাখী ছটফটিয়ে মরে গেলো— তার মানে শব্দই ব্রহ্মাস্ত্র। ওখানে কয়েকদিন থাকার পর আমরা আরও পশ্চিমে সরে এলাম। পশ্চিম দিকে আসতেই ঠাণ্ডার কনকনে ভাবটা কমে এল— এখানে এখন আর ঝিরঝিরে বরফ নেই, কাজেই কুকুরদেব পক্ষে এখন স্লেজ টানা অসম্ভব। এখানে চাঙর করার মত বিশেষ বরফের অভাবে চামড়ার ছাউনি করে থাকার বন্দোবস্ত হ'ল। চাবপাশে ছোট-খাটো অসংখ্য নদী—তাব অসংখ্য মাছ। এখানেই প্রথম দেখলাম লাল রঙের সাল্‌মন মাছ। জলের ওপর উড়ন্ত মাছ জল থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে, ঠিক যেমন দেখেছিলাম আরব সাগরে। আমাদের চলন্ত জাহাজের সামনে অসংখ্য মাছ জল থেকে শূন্যের ওপর লাফিয়ে উঠছে।

গল্পদাদুর আসর আবাব জমে উঠলো, আজকাল অন্য একজন বুড়ো গল্প বলে। গল্পের সারমর্ম অনেকটা আগের মতই, তবে ভালুকেব পরিবর্তে এটা সিন্ধুঘোটক। গল্পটা এরকম :

আমি একদিন সকালবেলা হরিণ শিকার করতে বেরিয়েছি, হরিণগুলোকে তাড়িয়ে একটা জলেব দিকে নিয়ে যাওয়াই আমার আসল উদ্দেশ্য। কারণ জলের কাছে

সেই স্থলভাগটা অনেকটা উপদ্বীপের মত। স্থলভাগটা জলের ওপর সরু হয়ে গিয়ে আবার প্রসারিত হয়েছে অনেকটা মানুষের গলা ডিঙিয়ে মাথায় যাবার মত। আমার উদ্দেশ্য— যখন হরিণগুলো ওই ছোট রাস্তা ধরে আবার ফিরবে তখন রাস্তার ধারে বসে আরামসে মারা যাবে। তার মধ্যে একটা হরিণ, ও! দেখতে যেন পাতালের দেবতা— যেন পাতালের দেবতা— এই বড় বড় চোখ, বড় বাঁকানো শিং, পেঁজা বরফের মত নরম বড় বড় পশম। আর মাংস ও! আমার মনে হয় জলের নীচে দেবতাবাও কোনদিন খায়নি। সেই হরিণটাই আসলে আমাব লক্ষ্য। তাদের তাড়িয়ে সবেমাত্র জলের কাছে নিয়ে এসেছি এমন সময় হঠাৎ কুকুবগুলো গেলো ক্ষেপে। আমাব দুটো হাতই বন্দুকেব ওপব ছিল। আমি ছিলাম বসে স্লেজেব ওপর। কুকুরগুলো যেই দৌড় দিয়েছে অমনি আমি কুপোকাত। হাত থেকে বন্দুকটা ছিটকে পড়ে গেলো, আমিও পডে গেলাম জলে— ওঃ সত্যি কি দুর্দশা! জলেব নীচে দেবতারা জানেন আমি এমন করে কোনোদিন পড়িনি। সবচেয়ে দুঃখেব বিষয় কি বলব— আমার সাধের সেই বড় হরিণটি এই সুযোগ হাতছাড়া হযে গেলো। আসলে ঠিক সেই সময় ওইখানে একটা জলদানব (সিন্ধুঘোটক) পবমানন্দে রোদ পোহাচ্ছিল, আর আমাব কুকুরগুলো সেই গন্ধ পেয়েই— ব্যস্ আমাব কন্ট্রোলেব বাইবে। তবে হ্যাঁ আমি হচ্ছি খাঁটি ইনুং বাচ্ছা— আমাব বয়স তখন বাডতি, আমি একাই তখন সেই বাছাধনকে নিধন কবি। কিন্তু এমন নধরকান্তি হবিণ আমার চোখে আর পড়েনি।

এস্কিমোদের অধিকাংশ গল্পই শোক সমাপ্তি— কিন্তু তাতেও ওদের হাসির বহব কিছুমাত্র কম নয়। যদি দলে একাধিক বুডো থাকে তবে এক একদিন এক একজন গল্প বলবে। যুবক-যুবতী বা বুড়িরা কোনোদিনই গল্প বলে না। তাবা সবাই শ্রোতা। সেদিন গল্পেব শেষে আমবা সবাই শুতে যাবো, হঠাৎ কুকুবগুলো ডেকে উঠলো— আমাদেব মধ্য থেকে দৌড় দিযে একজন বাছাইকবা কয়েকটা কুকুব ছেড়ে দিল, নিমিষেব মধ্যে কুকুরগুলো উধাও হয়ে গেলো— বল্লম আব বন্দুক নিয়ে আমরাও পেছন পেছন দৌড়লুম ঠিক পাড়াগাঁয়ে চোর ধরাব মত। যদিও প্রায় মাঝরাত কিন্তু দৌড়বাব কোনো অসুবিধা নেই— দিব্বি লাল সূর্যেব আলো। এদিক ওদিক দৌড়ে কুকুবগুলোব ডাক কানে এলো— সেদিকে আরও এগিয়ে যেতেই দেখি রক্তাক্ত ব্যাপার। একটা নীল শেয়ালকে কামড়ে এবা টুকবো কবে ফেলেছে। এমনকি তার চামড়াটা পর্যন্ত কাজে লাগানোর উপযোগী নয়, শতছিন্ন। কুকুরগুলো সাধারণতঃ কাউকে কামড়ায় না, তাকে ঘিবে ধরে চেঁচায়, তাবপর এস্কিমোবা এসে মারে, কিন্তু জন্তুটা যদি পালাতে চায় তাহলেই এই শেয়ালের মত অবস্থা। ব্যর্থ শিকার— আমরা ফিবে এলাম। আমি সবে শুতে যাবো এমন সময় শুরু হ'ল তাদের হাসি, কারণ কিছুই বুঝলাম না— সব সময়ই যে হাসিব একটা কারণ থাকবে এটাই স্বাভাবিক— কিন্তু এস্কিমোদের মতে অকারণই একটা বিরাট কারণ আর সেই কারণেই সবাই হেসে এখন গড়াগড়ি— আজকাল আমিও কম যাই না, হাসতে হাসতে পশমেব লেপটা গায়ে টেনে দিলাম, ওরা ভাবছে আমি এখনও হাসছি, কিন্তু না

আসলে আমার ঘুম পেয়েছে বেশী হাসলে আমার ঘুমের ভাবটা যাবে কেটে— তাই আশ্রয় নিলাম বিছানায়। ওরা হাসুক— হাসতে হাসতে পেট ফেটে মরুক তাতে আমার কি ?

আজকাল ওরা আর বড় শিকারে যায় না, কারণ ওদের এখন কোনো অভাব নেই কাজেই খায় দায় ঘুরে বেড়ায়। যখন সত্যি করবার কিছু নেই তখন অনেক কিছুই মনের মধ্যে চাড়া দিয়ে ওঠে। মায়েদের কাজ অনেক শিশুদের দেখা-শোনা করা, কাঁচা চামড়াগুলোকে রোদে দেওয়া, চর্বি বা পশম থেকে সূতো তৈরী করা, সেলাই ইত্যাদি। বুড়োদের কাজ মাংস শুকোনো, মাছগুলোকে ঠিকমত রোদ্দুরে দেওয়া আব গল্প বলা ও বিভিন্ন বিষয়ে যুবকদের পরামর্শ দেওয়া। যুবকবা সাধারণতঃ প্রবীণদের খুবই শ্রদ্ধা করে, কারণ বৃদ্ধদের বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার প্রচুর দাম। অনেক বুড়োদের দেখেছি নাক উঁচু করে বাতাস শুখে বলে দিকে পারে কোনদিকে শিকার আছে। তাই বিভিন্ন দিকে চলার ও শিকারের ব্যাপাবে বুড়োদেব পরামর্শ একান্তই প্রয়োজনীয়।

এই হচ্ছে এস্কিমোদেব গবমেব সময়। যুবকরা কুকুবদেব দেখা-শোনা এবং ট্রেনিং দিতে থাকে আব ঘব তৈবীর সবঞ্জাম ও শিকাবের সবঞ্জামগুলোর তত্ত্বাবধান করে, যুবতীবা মাযেদের সাথে কাজ করে। আব একটু বড় ছেলেমেয়েবা খেলাধূলা করে।

শিকাব শিকাব খেলা এদের খুব প্রিয়, অনেকটা লুকোচুবি বা চোর-চোর খেলার মতো। মেযেদেব একটা বড প্রিয় খেলা হচ্ছে —নুগ্‌লিটাং। খেলাটা খুব সাধারণ, এরজন্য কোনো সঙ্গী-সাথীর দরকার হয় না। একটা ছোট লাঠির ডগায় একটা ববফেব টুকবো সূতো দিয়ে ঝুলিয়ে বাখা হয়, তারপব সেই একই লাঠি দিয়ে সেটাকে ভেঙে দেযা।

ছোট ছেলেবা টিল প্যাচ খেলতে খুব ভালবাসে। মেযেবা হাততালি দিয়ে সুর তুলে গান গায। অনেক সময় অবসর সময়ে মাছ ধরা যুবতী মেয়েদের খুব প্রিয় জিনিস। আমি জানি যে এখন আমরা আংমাগশাল্লিক থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে সরে এসেছি, কিন্তু আসলে জায়গাটা কোথায় কি ব্যাপাব কিছুই জানি না। আমার আজকাল করার কিছুই নেই, কাজেই ছোটদের সাথে আবার ভাব জমে উঠলো। ওরা আজকাল আমাকে ওদেবই একজন বলে ধরে নিয়েছে। ওদের নিযে অনেক মজা হয়। বরফের ওপর ডিগবাজি খাওয়া, গড়িয়ে পড়া, চোর-চোর খেলা ইত্যাদি ব্যাপারে আমি ছাড়া ওদের চলে না। আজকাল ওরা আমাব নাম ধরে ডাকতে শিখেছে, তবে আমার বাবার দেয়া নাম বিমল-এর পরিবর্তে ওরা ডাকে বাম্। তা একটু বিকৃতিতে ক্ষতি নেই, গালি তো নয়— বুলি। কচি মুখের ওই বাম্ নামটা আমার খুব পছন্দ। আমার কাছে অতি দুষ্টু ছেলেও জব্দ। আমি মাঝে মাঝে ওদের হাত সাফাই-এর খেলা দেখাই— মুখে কাঠি দিয়ে কান দিয়ে বের করে দিই। বাম হাতে পয়সা গুঁজে ডান হাত দিয়ে বের করে দিই। ওদের আমি এক্কা-দোক্কা খেলা শিখিয়ে দিয়েছি। তার মানে এককথায় বলা যেতে পারে যে, আমি এখন শিশু সর্দার।

আমারও মাঝে মাঝে লাভ হতো। ঋজু আমার প্রিয় শিষ্য, সে মাঝে মাঝে শুকনো হরিণের মাংস চুরি করে এনে আমায় দিত— চুরি করে আমসি খাওয়ার মত বেশ মজা লাগতো। একদিন তো ও ধরা পড়ে যায়— তবে এসব ছোটখাটো ব্যাপার বড়রা খুব একটা গ্রাহ্য করে না। সত্যি দিনগুলো আমার খুব মজায় কাটে। একদিন বড়রা বললে— নদীর ধারে একটা শুকনো পাথর আছে, সেখানে গিয়ে গায়ে হাওয়া লাগাতে, আমরা সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলাম নদীর ধারে। অনেক দিন পর এই প্রথম পেলাম পাথর, ওঃ কতদিন পর মাটি পেলাম, হোক পাথর, তবু বরফের একঘেয়েমি থেকে তো বাঁচা গেছে— তার মানে এখানে সত্যি গ্রীষ্ম। আমরা সবাই জামাকাপড় ছেড়ে সেদিন শরীরে বাতাস লাগালাম। এটাও ওদের কাছে একটা মহা আনন্দ। আমি খালি গায়ে পাঁচ মিনিটেব বেশী থাকতে পারলাম না, ওঃ গরম না গরমের শ্রাদ্ধ। ওদের সেদিকে খেয়াল নেই, গরমকালে নদীর চড়ায় যেন ন্যাংটো ছেলেব দল। ছেলেমেয়েরা প্রায় ঘন্টাখানেক ধবে খেলা করলো, তারপর জামা প্যান্ট পরে ফিরলাম আমাদের ডেরার দিকে। ফিবেই দেখি সেখানে এক মহোৎসবের ব্যাপাব। উত্তর থেকে একটা বড়ো হরিণ মাবা হয়েছে। কয়েকদিন যাবৎ তিনজনকে দেখতে পাচ্ছিলাম না, এখন বুঝলাম, বন্দুক ও শিকারী কুকুর নিয়ে তারা বেরিয়ে গিয়েছিল প্রায় ছ-সাত দিন আগে। বড় গাছ-শিংওলা একটা হরিণ, ঘাড়ের কাছে গুলি করা হযেছে— ওকে মাটিতে শুইয়ে বাখা হয়েছে আর ওকে ঘিরে সবাই দাঁড়িয়ে, যেন প্রতিমার সামনে দর্শকের ভীড়। সবাই আমাদের জন্যই অপেক্ষা করছিল। এসময় আসলে শিশুদেরই আনন্দ। ছোটরা দৌড়ে হরিণটাব কাছে এগিয়ে গেলো, তারপর কেউ তার চামড়া ছুঁয়ে, কেউ তাব শিং ধরে, কেউ তার মুখ ফাঁক করে দাঁতেব দিকে তাকিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো, যেন বাঙালীর ঘরে একটা বিরাট ইলিশমাছ এসেছে। সকলের দেখা শেষ হ'লে শেষে হরিণটাকে কাটার জন্য একজন প্রস্তত হ'ল। এটা ধরনের খেলা । যে হরিণটাকে মেরেছে সে প্রথমে একটা বড় ছুরি নিয়ে এসে হাজির। সে ভালোভাবে হরিণটাকে দেখলো, তারপর তার চোখ বেঁধে দেওয়া হ'ল, এবার চোখ বাঁধা অবস্থায় সে এগিয়ে গেলো হরিণটার দিকে, তাবপর খুব সাবধানে আস্তে আস্তে হাতের ছুরিটা এনে হরিণটার নাকের কাছে এনে ছোঁয়লো, সবাই না না কবে চেঁচিয়ে উঠলো, আসলে চোখ বাঁধা অবস্থায় যে ছুরি দিয়ে হরিণটার শিং-এর গোড়া স্পর্শ করতে পারবে সেই হরিণটাকে কাটার কৃতিত্ব পাবে।

আস্তে আস্তে সবাই এগিয়ে গেলো— খুব সামান্যের জন্য দু'একজন মিস্ করলো— শেষে আমাকেও একবার চান্স দেয়া হ'ল কিন্তু হরিণটার কাছে পৌঁছবার আগেই আমার পয়েন্ট কাটা গেলো। আসলে হরিণটার কাছে বড় বড় পা ফেলে পাঁচ স্টেপের মধ্যেই পৌঁছতে হবে। এবার উরানের পালা— সে ভালোভাবে দেখে নিল তারপর মনে মনে হিসেব করে নিয়ে বললো ঠিক আছে। তার চোখ বেঁধে দেওয়া হ'ল। উরান লাফিয়ে তারপর দু-পা এগিয়ে আস্তে আস্তে বসে পড়লো। সবাই রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলো, আস্তে আস্তে ওর ছুড়িটা নেমে এলো ঠিক

শিং-এর গোড়ায়— তারপর হুম্ করে একটা শব্দ করেই সে বসিয়ে দিল— সবাই চেঁচিয়ে উঠলো— সাবাস সাবাস! চোখ খুলে এবার উরান করাত দিয়ে হরিণের শিংটা কেটে নিল। তারপর শুরু হ'ল ওর ছাল ছাড়ানো, হলুদ রঙের ওপর ছিটে বাদামী রঙের, ও! ধুসর-কালো রঙের চামড়াটা সত্যি সুন্দর। টাটকা হরিণের মাংস মোটেই সু-স্বাদের নয়, কিন্তু এদের কাছে অপূর্ব অমৃত। আগুন জ্বেলে মাংসের ঝোল করা হ'ল। ঝোলটাকে খাওয়া হ'ল আর মাংসগুলোকে আলাদা করে রাখা হ'ল শুটকি মাংস করার জন্য। সেদিন সারারাত ধরে চললো আমাদেব হরিণের মহোৎসব— সেই রাতেই এই প্রথম নজরে পড়লো স্বামী-স্ত্রীর মিলন-সঙ্গম। অবশ্য এর জন্য ওদের আলাদা ঘর বা বিছানার দরকার হয়নি, এ ব্যাপারে ওরা উদার, কে দেখলো, কে কি মনে করলো তাতে ওদের কিছু যায় আসে না।

কয়েকদিন যাবত লক্ষ্য করেছি, ওদেব কাজকর্মে ভাঁটা পড়েছে। রাতের গল্প শুরু হয়েছে— আব তাব সাথে সাথে হাসির মহড়া আগের থেকে আরও বেড়ে গেছে। যুবকরা যুবতীদের নিয়ে আশে পাশে ঘুরছে আর ছোটরা গুগ্‌লিটাং খেলতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। সবাই ব্যস্ত, ব্যস্ত মানে কর্মহীন ব্যস্ততা— নেই কাজ তো খই ভাজ। আমি আজকাল ওদের সাথে রাতের হাসিতে বেশী যোগ দিতে পারি না, ঠাণ্ডা লেগে ব্রংকাইটিস-এর মতো হয়েছে, হাসতে গেলেই কাশি ওঠে, আর একবার কাশি উঠলে থামানো মুশকিল। মাঝে মাঝে কাশতে কাশতে এমন অবস্থা হয়ে যে পেটের নাড়িভুড়ি ছিড়ে যাবার উপক্রম। আমার এখন সত্যি দুরবস্থা। মাঝে মাঝে কাশতে কাশতে বমি করে ফেলি— আর নয়তো হাঁপানির মতো শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। গরমকাল, এস্কিমোদের এই সময়টাই হচ্ছে খুব মজার— নাচ গান আর হাসির হুল্লোব। কিন্তু আমার অবস্থা সঙ্গীন— হাসতে গেলেই কাশি আর কাশতে শুরু করলেই জীবন টানাটানি। কোথা গিয়ে কখন যে এই যমদূত এলো বুঝতে পারলাম না। এস্কিমোরা এখন আমার দিকে মোটেই নজর দিচ্ছে না— এমনকি নাজো ব্যাটা পর্যন্ত...হতচ্ছাড়া সকাল থেকে একটা মেয়ের পেছনে ঘুর-ঘুর করছে। উরান— আবার এমন কি ছোট ছেলে- মেয়েরা পর্যন্ত আমার কাছে ঘেসে না। সম্পূর্ণ পৃথিবীটাই যেনো আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছে। কাজেই আমি কাশতে কাশতে যখন পেটে হাত দিয়ে পাথরের ওপর বসে হাঁপাই তখন ঠাকুরই একমাত্র ভরসা। বিপদে পড়ে ঠাকুরের নাম কে না করে, স্বয়ং অর্জুন বিষাদগ্রস্ত হয়েই শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হয়েছিলেন— আমিও বিষাদগ্রস্ত হয়ে কালী-কৃষ্ণ-শিব-রাম শরণ করলাম। অন্ততঃ একজন না একজন আসবেই। সেই আশায়ই আমি বেঁচে আছি।

সখ করে এসেছিলাম এস্কিমোদের জীবন জানতে আর এখন আমার জান নিয়ে টানাটানি। কয়েকদিনের মধ্যেই আমার কাশিটা আরও বেড়ে উঠলো। আমি নিজেকে নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লাম, এস্কিমোরা কি করছে আর কি খাচ্ছে সেদিকে আমার

খেয়াল নেই। দুদিন যাবৎ খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। হঠাৎ মনে পড়ে গেলো প্রাণায়ামের কথা— শুনেছি সুখ-প্রাণায়াম ব্রংকাইটিস-এর পক্ষে ভাল। এ কথাটা মনে হতেই হঠাৎ যেন মনে বল পেলাম। একটা উঁচু পাথরের ওপর বসে— আত্মনিবিষ্ট হয়ে শুরু করলাম প্রাণায়াম। যদিও শ্বাসকষ্ট প্রবল, তবুও অতি সন্তর্পণে ও ধীরে ধীরে ডান নাকের নলী টিপে বাঁ নাকের নলী দিয়ে ও বাঁ নাকের নলী টিপে ডান নাকের নলী দিয়ে নিশ্বাস প্রশ্বাস শুরু করলাম। তারপর কিছুক্ষণের জন্য শান্ত ও মৌন হয়ে রইলাম। আস্তে আস্তে আমার শ্বাসকষ্ট কিছুটা সহজ হয়ে এলো। পেয়েছি— পেয়েছি— আনন্দে বুকের ভেতরটা লাফিয়ে উঠল। যেখানে ডাক্তার নেই সেখানেও ব্যবস্থা আছে। সেদিন সারাদিনে প্রায় আটবার আমি প্রাণায়াম কবলাম।

বাতের বেলা আমি তাদেব সাথেই শুই— ভগবান রক্ষা কবেছেন আজকাল আব বরফেব ইগ্‌লু নয়, চামডাব ছাউনী। আমি নাজোদেব সাথে শুই। একধার বেছে নিয়েছি, কারণ বাতে বার বাব আমাকে উঠতে হয় কাশির জন্য। সবে ঘুমটা লেগে এসেছে এমন সময় উঠলো কাশি--- আব আধঘন্টা ধবে চললো কাশি— বিছানা ছেড়ে আমি কাশতে কাশতে মেঝেতে এসে বসেছি--- পেটে হাত দিযে কোনবকমে নিজেকে রক্ষা করছি। শেষে একসময় কাশি থামলো— আমি গলদঘর্ম হযে বসে হাঁপাতে লাগলাম। বুঝলাম— কালী-কেষ্ট-শিব-শেতলা— কোনো দেব-দেবীবই এই সুদূর গ্রীনল্যাণ্ডে আমাব কাছে আসবার ইচ্ছা নেই। হঠাৎ প্রদীপেব আলোটা আবছা হয়ে এলো— মুখ তুলে দেখি, এক বৃদ্ধা প্রদীপের সামনে দাঁড়িযে আমাকে লক্ষ্য কবছেন। ইনি নাজোর দিদিমা অথবা ঠাকুমা হবেন। তিনি এবার আমার দিকে ঝুঁকে আমার মাথায় হাত দিয়ে সান্ত্বনা দিলেন। এই সময় সমবেদনার আমাব নিতান্তই প্রয়োজন ছিল। এস্কিমোদেব বাজত্বে আমাব এই মানসিক ও শারীরিক দুরবস্থা এই প্রথম সহানুভূতি পেলাম। বৃদ্ধাব মুখের দিকে তাকিয়ে আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম আমাব পবমাবাধ্যা মাতৃতুল্যা ছোট ঠাকুমার মুখ। আমাব চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পডলো। জানি না তিনি এখনও বেঁচে আছেন কিনা। মানুষ যখন যেখানেই থাক না কেন, দুঃসময়ে তাব পরমাত্মীয়েব কথাই মনে পড়ে— এটাই জানলাম স্বাভাবিক।

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি কি মনে কবলেন জানি না তবে, তাঁর কোঁচকানো মুখেব ওপব যে করুণার উদয় হ'ল তা অনায়াসেই বুঝতে পারলাম। তিনি আমাকে কি বলে আমার বুকের ওপর কান পেতে আমাকে পরীক্ষা করলেন, তারপর দেয়ালে টাঙানো একটা চামড়ায় বড় থেকে ছোট ব্যাগ বার করলেন, তার ভেতব থেকে তিনি চর্বিজাতীয় কি একটি জিনিস বার করলেন। তারপর সেটাকে একটা টিনের কৌটায় গরম কবে আমায় খেতে দিলেন। অনেকটা পুরোনো ঘিয়ের স্বাদ পেলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝলাম এটা দেবদত্ত ধন্বন্তরী। আমার শ্বাসকষ্ট হালকা হয়ে এলো— অনেকদিন পর সেদিন রাতে একটু ঘুমোলাম। পরের দিন ঘুম ভাঙলে— নিজেকে

অনেকটা হালকা মনে হ'ল। প্রণাম জানালাম বৃদ্ধাকে। বুঝলাম— মানুষ যেখানে, মানবতা সেখানে। আমার জীবনে আর একবার মানবতার মহত্ত্বের প্রমাণ পেলাম।

অনেকদিনের পুরোনো চর্বি গরম করে আরও কয়েকবার খাওয়ার পর আমি কয়েকদিনের মধ্যেই সেরে উঠলাম। আমার প্রাণদাত্রী বৃদ্ধাকে কি করে যে কৃতজ্ঞতা জানাবো জানি না। তিনি হয়তো সেটা বুঝতে পেরেছেন।

আমার কাছে হারিয়ে যাওয়া এস্কিমোদের বিচিত্র জীবন আবাব বৈচিত্র্যে ভরে উঠলো। ওদের বিরুদ্ধে আমার সব অভিযোগ আমি তুলে নিলাম।

বিদায়

কিছুদিন পর আবার শুরু হ'ল যাত্রা— মালপত্র গুছিয়ে হাঁটা শুরু হ'ল পশ্চিমেব দিকে। এখন আব বরফ নয়— পাথব ও বালিপাথর শুরু হ'ল। আমাদের সাথে এখন মালপত্র প্রচুর। চাওড়া কাঠেব ওপর চামড়াগুলোকে রেখে সেটাকে দড়ি দিয়ে টানতে হচ্ছে। আমাকে অবশ্য ওবা রেহাই দিয়েছে, আমি এখন শিশুর দলে। এবার আরও দক্ষিণে নেমে এলাম। প্রায় সাতদিনের মাথায় আমরা পাহাড় থেকে নেমে সম্পূর্ণ সমতলে এসে পৌঁছিলাম— পেছনে ফেলে এলাম ববফে ঢাকা পাহাড়ের চূড়ো। তারপর আবার তৈরী হ'ল এদের ডেবা। বাতের বেলা আজকাল আব সূর্যেব সেই বাহার দেখা যায় না— আজকাল দিন বাত্রি হয়— তবে বাত্রি বলতে মাত্র চারঘন্টার জন্য সূর্যের বিচ্ছেদ। একদিন সকাল বেলা, তক্তার ওপর নতুন চামড়াগুলোকে সাজিয়ে ওরা তৈরী হয়ে নিলো, প্রায় সব কজন যুবকই তৈরী হয়ে নিয়েছে— বুঝলাম শহর খুব নিকটেই, তাই বাণিজ্যের প্রস্তুতি। আমার কাছে এ অপ্রত্যাশিত, আমি এক লাফে আমার ঘরে ঢুকে তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নিলাম আমার ব্যাগটা— ব্যাগটা প্রায় গোছানোই ছিল, সেটাকে কাঁধে তুলে নিলাম। ইগ্‌লুব বাইরে এসে দেখি— বৃদ্ধা আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। আমিও তাঁকেই খুঁজছিলাম, তাঁব দিকে ছুটে গিয়ে তাঁর কোঁচকানো গালে চুমু দিলাম— মনে মনে বললাম— আমি চললাম তোমার স্মৃতি নিয়ে, হাজার হাজার মাইল দূবে আমার আত্মীয়দের কাছে বলবো তোমার সংবাদ। বলবো এস্কিমোদের দেশেও আমার একটা ঠাকুমা আছে। হঠাৎ মনে পড়ে গেলো ছোটদের কথা, তাড়াতাড়ি ব্যাগটা কাঁধ থেকে নামালাম। তার ভেতরে ছিল চার প্যাকেট চুইন্‌গাম্— আমি এই চুইন্‌গামের কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। চুইন্‌গাম্ খুঁজতে গিয়ে হাতেব কাছে পড়লো ছোট্ট ছুরিটা, সুইজারল্যাণ্ড থেকে মারলিন দেবী দিয়েছিলেন এই ছ'মুখো ছুরিটা। হারাবার ভয়ে আমি যত্ন করে রেখেছিলাম সেটাকে ব্যাগের মধ্যে। ছুরিটা খুলে ঠাকুমার হাতে দিলাম, তাব মুখে ফুটে উঠলো তৃপ্তির হাসি— আব ছোটবা চুইন্‌গাম্ পেয়ে লাফিয়ে উঠলো— সবাইকে বিদায় জানালাম। বিদায় এস্কিমো! তোমাদের কথা আমি ভুলবো না— বিদায়ের পালা মোটেই বিষাদ নয়, ভালোই, নয়তো মায়ার জ্বালা বড়ো সাংঘাতিক।

আমি উরান নাজো ও আব কজন যুবক সবাই হাঁটা শুরু করলাম শহরের উদ্দেশ্যে। ঢালু পাহাড়, কাজেই খুব বেশী অসুবিধা নেই, শুধু চামড়া ভর্তি তক্তাটাকে

একটু সামলানো। প্রায় চার পাঁচ ঘন্টা চলার পর হঠাৎ নজরে পড়লো দূরে কাঠের সারি সারি ঘর যেমন দেখেছিলাম আংমাগ্‌শালিকে। আর একটু যেতেই নজরে পড়লো একটা পতাকা উড়ছে— ভালো করে দেখি এটা আমেরিকান পতাকা। এখানে আমেরিকান ধ্বজা আমি মোটেই আশা করিনি। এবার নজরে পড়লো বিরাট সাইনবোর্ড— আইস্‌বার্গ রিসার্চ সেন্টার।

আইস্‌বার্গ রিসার্চ সেন্টারকে ডান দিকে রেখে শেষ পর্যন্ত আমরা একটা শহরে এসে পৌঁছলাম, অবশ্য শহর না বলে গ্রাম বলাই ভালো ছিল। জানি না কোথায় এসেছি— কোন দিক কোন দেশ। উরান ও নাজো আমাকে একটা রাস্তা দেখিয়ে দিল, এই রাস্তাটা মনে হ'ল মূল কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে গেছে। ওদের বিদায় জানাতে হ'ল। উরান ও নাজো— দুটি চরিত্র, এস্কিমোদের যেন দুটি বৈশিষ্ট্য আমার স্মৃতিতে থেকে গেলো।

শেষে শহরে এসে পৌঁছলাম— ওঃ অনেকদিনের পর যেন দেশে ফিরলাম। এখানে কথা বলার লোক পেলাম— বিশেষ করে আইস্‌বার্গ রিসার্চ সেন্টারের দৌলতে এখানে ইংরেজীর প্রচলন হয়েছে। শহরটার নাম ক্রনক বা অরনক্, গ্রীনল্যাণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিমে। একটা চায়ের দোকানে ঢুকে হাতের দস্তানাটা বিক্রি করে কিছু পয়সা পেলাম, তাতে পরমানন্দে একটা ডবল ডিমের অম্‌লেট ও এক মগ কফির অর্ডার দিলাম। গ্রীনল্যাণ্ডের অন্যতম প্রধান শহর হচ্ছে গথ্‌স্‌হাব, অরনক্ থেকে গথ্‌স্‌হাবের দূরত্ব প্রায় তিরিশ কিলোমিটার। একটা লরীর ড্রাইভারের সাথে ভাব করে তার হাতে কিছু পয়সা গুঁজে দিয়ে ম্যানেজ করলাম— রাজধানীর পথ।

গ্রীনল্যাণ্ডের এক বিরাট শহর গথ্‌স্‌হাব (Gothshab)। ভেবেছিলাম বিরাট কিছু কিন্তু আসলে তা নয়, অনেকটা আইস্‌ল্যাণ্ডের রাজধানী রেক্‌জাভিকের মতো অর্থাৎ ছোট খাটো একটা শহর তবে খুব সাজানো গোছানো। শান্ত ও নির্ঝঞ্ঝাট বলেই মনে হ'ল। গথ্‌স্‌হাবের উত্তরে শুনেছি আমেরিকান আর্মির এক বিরাট ঘাঁটি। উত্তর মেরু দিয়ে গ্রীনল্যাণ্ড থেকে রাশিয়া সরাসরি বিমানে কয়েক ঘন্টার পথ। কাজেই গথ্‌স্‌হাবে প্রথমেই যেটা চোখে পড়ে সেটা হচ্ছে বিরাট মিলিটারী আমদানী— অবশ্য সবই নাকি নর্থপোল রিসার্চের ব্যাপার। আমি আগেই বলেছি গ্রীনল্যাণ্ডটা আসলে কিন্তু ডেনমার্কের অধীনে।

বহু কষ্টে খুঁজে বার করলাম গথ্‌স্‌হাব ইউনিভারসিটি*। প্রিন্সিপালের বাড়ীতে গিয়ে তাঁর সাথে যোগাযোগ করলাম। মিঃ ব্রঁ, ভদ্রলোকের নামটা ফ্রেঞ্চ ঘেঁসা বটে, কিন্তু তিনি খাঁটী ড্যানিস্। ভদ্রলোককে আমি পরিচয় দিলাম ভারতীয় পর্যটক বলে, কিন্তু তিনি মোটেই তাতে সাড়া দিলেন না। ভাবটা এমন যে তোমার মত ভারতীয় এখানে ছড়াছড়ি। আমি ভদ্রলোকের নিরাসক্ত ভাব দেখে বেশ আশ্চর্য হয়ে গেলাম। তবে এত সহজেই আমি হাল ছাড়বার পাত্র নই। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম—

—এখানে কি আরও ইন্ডিয়ান আছে?

—আছে বৈ কি?

—আশ্চর্যের ব্যাপার বটে, আমি জানতাম এখানে আমিই একমাত্র ভারতীয়।

—না-না, এখানে মাছ ধরার কাজে আমেরিকা থেকে হরদম ইণ্ডিয়ান আসছে।

— ওঃ! তার মানে আপনি আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদের কথা বলছেন— তাই না?

—ঠিক তাই।

—আমি আমেরিকান ইণ্ডিয়ান নই— আমি খাঁটি ইণ্ডিয়ান, অর্থাৎ ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিয়ান।

ব্রঁ সাহেবের এবার আশ্চর্য হবার পালা— তিনি ভাবতেই পারেননি যে একটা কলকাতাব লোক ছিটকে গিয়ে গ্রীনল্যাণ্ডে পড়বে।

তিনি নিজেব ভুলের জন্য ক্ষমা চেয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। তিনি আমার কাছ থেকে সব শুনে খুব খুশী হলেন এবং আমার উদ্দীপনাব প্রশংসা করলেন। শেষে তাঁরই দৌলতে স্থান পেলাম গথ্‌স্‌হাব টাউনহলের এক কোনে। তিনি ওখানকার পরিচিত এবং খুব সম্মানীয় ব্যক্তি, তাঁব সাথে ঘুরে আমিও সুপবিচিত হয়ে উঠলাম। মেয়র একদিন আমাকে চা-পানে আপ্যায়িত করলেন। সেখানে আমি ভগবান বুদ্ধ সম্পর্কে ছোটো-খাটো একটা বক্তৃতা দিলাম। এখানকার যাদুঘবে ভগবান বুদ্ধের একটা মূর্তি রয়েছে আর সেকারণেই এ-প্রসঙ্গে। মেয়রের মতে আমিই গ্রীনল্যাণ্ডের প্রথম ভাবতীয় পর্যটক। আমার জুতোটাকে তিনি চাইলেন ওখানকার যাদুঘরে বাখবার জন্য। আমি শত তাপ্পিমাবা জুতোর ভাগ্যকে প্রশংসা করলাম।

এস্কিমোদের প্রসঙ্গে

এস্কিমোবা সাধাবণতঃ সমাজবদ্ধ। অত্যধিক শীত— শিকাব ও ইগলু তৈবীব কারণই হচ্ছে মূল। এরা খুব সরল ও মিশুকে। স্নেহ প্রেম প্রীতি ভালবাসা এদের মধ্যে খুবই প্রবল। অনেক সময় দেখা গেছে যে, একদল এস্কিমো যদি শিকাব না পায় তাহলে অপব দল তাদেব খাওয়াবার দায়িত্ব নিয়েছে।

আজকাল এস্কিমোদেব পুরোনো প্রথাগুলো দিন দিন লোপ পাচ্ছে।

বিবাহ : প্রসঙ্গক্রমে বিবাহের কথাই ধবা যাক— কোনো কোনো এস্কিমো সম্প্রদায়ের মধ্যে জোর কবে মেয়ে ধবে এনে বিয়ে করাব প্রথা এখনও প্রচলিত আছে। ছেলেব যদি মেয়ে পছন্দ হয তাহলেই সব ঠিক। মেয়েব মতামতের কোনো প্রয়োজন নেই। অনেক সময় অনেকটা স্বয়ম্বব সভার আয়োজন কবা হয়। মেয়ে পক্ষেব অভিভাবক ছেলের সাথে কথাবার্তা বলে তারপর ছেলে যদি রাজি থাকে তাহলে দলপতি মেয়েকে ছেলের সাথে যেতে বলে। এইভাবে বব কন্যা এক সাথে মিললেই ব্যস সব ঠিক ঠাক। শুরু হয় স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বসবাস। সাধারণতঃ যুবক স্ত্রীব বাবা ও মায়েব সাথেই থাকে ও স্ত্রীব আত্মীয়দেব সাহায্য কবে। অনেক সময় পূর্ব গ্রীনল্যাণ্ডের এস্কিমোরা স্ত্রীর ওপর অকথ্য অত্যাচার করে— অবশ্য সেটাও বিশেষ ক্ষেত্রে। যখন জোর কবে মেয়ে ধরে এনে বিয়ে করা হয়, তখনই মাঝে মাঝে বিপদ দেখা দেয়। মেয়ে যদি ছেলেকে পছন্দ করে তাহলে তো কথাই নেই। কিন্তু কন্যার যদি বর পছন্দ না হয় তাহলে সে পালিয়ে যায়। পালিয়ে গিয়ে যদি অন্য কাউকে এর মধ্যে বিয়ে কবতে পারে তাহলে কোনো কথাই নেই, কিন্তু কন্যা অপরকে বিয়ে করার আগেই যদি ধবা পড়ে তাহলেই তাদের চরম শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়। অনেক সময় শোনা গেছে কন্যার পায়ের গোড়ালীব চামড়া কেটে দেওয়ার না কি রীতি, যাতে আর না পালায় তারই ব্যবস্থা। আজকাল অবশ্য এরকম ঘটনা খুবই বিরল। বিয়ে করার কোনো বয়সের ব্যাপার নেই, ছেলের যদি পছন্দ হয় তাহলেই হ'ল; বারো কি বত্রিশ তাতে কিছু আসে যায় না। এস্কিমোদের মধ্যে অনেক সময় বৌ-বদল হয়— এটা না কি বন্ধু-প্রীতির লক্ষণ। বিবাহ প্রসঙ্গে একটা জিনিস খুব ভাল, এরা কখনও নিকট আত্মীয়দের মধ্যে বিয়ে করে না— বিশেষ করে যেখানে রক্তের সম্বন্ধ।

এস্কিমোদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ বড় একটা দেখা যায় না, তবে শুনেছি লাব্রাডোর অঞ্চলীয় ও আলাস্কার উপজাতিয়দের মধ্যে মাঝে মাঝে শিকার নিয়ে ঝগড়া-ঝাঁটি হয়। সেদিক থেকে বিচার করলে গ্রীনল্যাণ্ডেব এস্কিমোরা খুব শান্তিপ্রিয়।

মৃত্যু : এস্কিমোদের আর একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে এদের মৃত্যু। এস্কিমোদের মৃত্যুকে অনেকটা ইচ্ছামৃত্যু বলা চলে।

আদিবাসী এস্কিমোরা সাধারণতঃ ইগ্‌লুতেই বসবাস করে। শীতের দিনে ববফের ইগ্‌লু আব গরমের দিনে চামড়ার তৈরী। এস্কিমোদেব যখন বার্ধক্য আসে তখনও এরা বেশ সবল কিন্তু তারপর আস্তে আস্তে যখন কর্মশক্তি সম্পূর্ণ লোপ পায় তখন সে অন্যেব ওপর বোঝাস্বরূপ হয়ে পড়ে। এই সময়টাই হচ্ছে মানুষের জীবনে সবচেয়ে দুর্দশাগ্রস্ত। পরের ওপর নির্ভর কবে থাকাব চেয়ে মৃত্যুই ভাল। তাই সে বেছে নেয় এক শীতের সময় অন্যান্য সবাই যখন ঘুমিযে থাকে তখন আস্তে আস্তে বৃদ্ধ জর্জর দেহটাকে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে মহাপ্রস্থানেব পথে। দারুণ শীত, তারপর আছে তুষাবপাত অথবা হাড় কাঁপানো বাতাস। প্রায আশী বছরের ধকল সওয়া দেহটাকে প্রকৃতিব সেই দুর্যোগের সাথে পাল্লা দিযে আব বেশীদূর চলতে পারে না লুটিয়ে পড়ে ববফেব ওপর।

সাধাবণতঃ তাবা বুঝতে পারে কখন মৃত্যু আসবে আব সেই সময়টি বেছে বেবিয়ে পড়তে তাদের কখনও ভুল হয় না। সেই সময় কেউ যদি দেখেও ফেলে তাকে বাধা দেয় না। স্ত্রী বা পুরুষ উভয় ক্ষেত্রেই এই নিয়ম চলে আসছে। তবে আজকাল খ্রীষ্ট ধর্মানুযায়ী তাদের মৃত্যুর পর শবদেহ বহন ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন কবা হয়। যারা যাযাবর এস্কিমো তারা এখনও পুবোনো ঐতিহ্য মেনে আসছে। এইভাবে প্রকৃতির বুকে নিজেকে হারিয়ে ফেলার মধ্যে যেনো এক অপূর্ব রহস্য লুকিয়ে আছে।

ধর্ম : যাযাবরের আবার ধর্ম! ধর্ম বলতে এদের বড় একটা কিছু বোঝায় না। অবশ্য আমি গ্রীনল্যাণ্ডের এস্কিমোদের কথা বলছি। সমাজ ধর্মই এদের কাছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। দেহ ও মনকে এই পৃথিবীর বুকে বাঁচিয়ে রাখাটাই একটা বিরাট ধর্ম। ধর্মের ব্যাপাবে এস্কিমোদের মধ্যেও অনেক শ্রেণীবিভাগ আছে। যেমন ধরা যাক— হাড্‌সন বে (Hudson) অথবা আলাস্কার এস্কিমোদের কথা— তাদেব ধর্ম আছে, দেবতা আছে আব তাকে ঘিরে পূজাপদ্ধতিরও সৃষ্টি হয়েছে। বিরাট গাছের গুড়ি কেটে তার ওপর নাক চোখ খোদাই করে সৃষ্টি হয়েছে বিরাট টোটেম্ দেবতা। অনেকেব মতে আলাস্কা ও হাড্‌সন বে'র এস্কিমোরা আমেরিকা অথবা রাশিয়ার প্রাচীন উপজাতি। সভ্যতার মাপকাঠিতে যাতে তাদের প্রাকৃতিক চরিত্র বাঁধা না পড়ে, তাই তারা এই অঞ্চলে এসে আশ্রয় নিয়েছে। কথাটা উড়িয়ে দেওয়া মুশকিল। আমি আলাস্কা বা উত্তর কানাডা ভ্রমণকালে দেখেছি যে আমেরিকান, ইণ্ডিয়ান অথবা

আমেরিকান আদিবাসীদের সাথে অথবা তাজিক্‌দের সাথে এস্কিমোদের দেহের বিরাট মিল। গ্রীনল্যাণ্ডের এস্কিমোদের অনেকটা ল্যাপ্‌বাসীদের মতো দেখতে— আমার মতে সম্ভবত এটা ভৌগলিক কারণ। ধর্মীয় ব্যাপাবেও তাই গ্রীনল্যাণ্ডের এস্কিমোদের সাথে ল্যাপ্‌বাসীর অনেক মিল। আমি আলাস্কা ভ্রমণেব সময় দেখেছি যে সেখানে আজকাল এস্কিমোদের ধর্ম ও ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য সরকার যথেষ্ট সহযোগিতা করছে। অবশ্য সেই সাথে সাথে চলছে খৃষ্টান মিশনারীর প্রাণপণ চেষ্টা। প্রভু যীশুই একমাত্র গতি অতএব তাঁর শরণাপন্ন হও।

এস্কিমোদের রূপকথা. এই গল্পটি আসলে গ্রীনল্যাণ্ডেব এস্কিমোদের গল্প।

বন্দরেব একজন বুড়ো এস্কিমো সর্দাবেব কাছ থেকে শোনা। তিন বোন পরমাসুন্দরী, আর হবে নাই বা কেন? তাবা হচ্ছে বাজকন্যা। সবুজ দেশের রাজা হচ্ছেন তাদেব বাবা। তিনকন্যা তাদেব রূপের কথা দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়লো, কিন্তু কন্যাবা বিয়ে করতে চায় না কারণ বিয়ে করলেই তাবা নিজেনের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে, শুধু তাই নয়, তাদেব যোগ্য পুরুষ পাওয়াও মুশকিল। রাজা কিন্তু এবজন্য মোটেই চিন্তিত নন, কাবণ যতদিন এরা বিয়ে না কবে ততদিন পর্যন্ত এই বাজার বরফেব রাজপুরী আলো করে থাকবে। তিনকন্যা বাজার তিনটি দামী পাথর— তাদেব গায়েব বঙ সাদা ধবধবে, বরফেব ওপব ঠিকবে পবে বাজপুরীকে রাঙিয়ে তুলেছে— আহা এমন বড় বরফেব রাজত্ব আর কাব আছে! কিন্তু এইভাবে বিবাহ বিনে রূপসীদের জীবন বিফলে যাবে তাও কি সম্ভব? তাই জলরাঙা দেশের বাজা একদিন এসে উপস্থিত। ববফের রাজার বাজসভায় এসে সে হাঁক দিল—

—কই হে রাজা, তোমাব নাকি তিনটে ঝলমলে পাথব আছে?

—হ্যাঁ, তা আছে বৈকি।

—হ্যাঁ, তাহলে আমি তাদের বিয়ে কবতে চাই।

—হ্যাঁ, সে কখনও হয়— তিনজনকে তুমি একা নেবে?

—হ্যাঁ, দ্যাখো বাপু আমি হচ্ছি জলরাঙা দেশেব রাজা। —তিনটে কেন আমি তোমার রানীকে শুদ্ধু বিয়ে করতে চাই।

বরফের রাজা তার জবাব শুনে গেলো রেগে— ব্যাস শুরু হ'ল হাতাহাতি। কিন্তু কে জানতো জলরাঙা দেশের রাজা ভোজবাজি জানতো, তাই সে কৌশলে বাজাকে হারিয়ে দিয়ে তিনকন্যাকে জোর কবে নিয়ে গেল তার নৌকোয়— দামী চামড়ায় মোড়া বিরাট নৌকো— আর তিমি মাছেরা টেনে নিয়ে যায় দ্রুতবেগে। জলরাঙা দেশের রাজার নৌকো টানে পোষা বিরাট বিরাট তিমি মাছ। নৌকোব ওপর এবার রাজা জিজ্ঞেস করলে— কি হে, এইবাব আমাকে বিয়ে করবে তো? বাজকন্যারা কোনো জবাব দেয় না— তারা তাদেব বাপের শোকে কাতর। রাজা আবার জিজ্ঞেস করলো— কি হে আমাকে বিয়ে করবে তো?

মেয়েদের জবাব নেই। রাজা এবার গেলো রেগে। সে জানতো ভোজবাজি, সে বিরাট এক দানবের মূর্তি ধরে ছোটকন্যাকে গিলে ফেললো।

এবার সে দ্বিতীয় কন্যাকে জিজ্ঞেস করলো— কি হে, তুমি আমাকে বিয়ে করবে তো?

দ্বিতীয়কন্যার জবাব নেই— ভয়ে দুঃখে সে এখন কাতর, জলরাঙা দেশের রাজা এবার ধরলে তাব নিজের রূপ, তারপর দ্বিতীয় রূপসীকেই সে গিলে ফেললো।

এদিকে এসব দেখেশুনে বড়কন্যা বুঝলো খুব বিপদ, তাই সে আকাশের ও জলেব দেবতাকে ডাকলো। দেবতা তার ডাকে এসে বড়কন্যাব শবীবে আশ্রয় নিল।

জলরাঙা দেশেব বাজা এবার তাকে জিজ্ঞেস করলো— কি হে বিয়ে করবে কি না বলো?

কন্যাব কোনো জবাব নেই। বাজা এইবাব বিবাট দানব মূর্তি ধবে তাকে গিলতে এলো--- বড়কন্যাব ভেতবে তখন জলেব দেবতা আশ্রয় নিযেছে সে জানতো না— যেই সে বড়কন্যাব কাছে এগিয়ে এসেছে অমনি বড় কন্যা বিবাট দৈত্যেব মূর্তি ধবলো। রাজা বিপদ বুঝে নৌকো ছেড়ে জলে ঝাঁপ দিল। সেদিন থেকে চললো তাদেব ঝগড়া। আব আজ পর্যন্ত সেই যুদ্ধ চলছে। এইভাবে যখনই তাদেব যুদ্ধ প্রবল হয় শুরু হয় বিবাট ধস্তাধস্তি— সমুদ্র ক্ষেপে ওঠে, শুরু হয় ঝড়।

গল্পটা অদ্ভুত— এই গল্পটাব মধ্যে ওদেব ভাবধাবা লুকিয়ে আছে। এস্কিমোদের উন্নত চিন্তাশক্তিব পবিচয এই গল্প। আমাদেব দেশে বাহু ও কেতুর গল্পেব মতো অনেকটা। প্রকৃতিব বহস্যকে নিয়ে এদের গল্প।

এস্কিমোদেব অনেক গল্পে পাওয়া যায় পুনর্জন্মের কথা। সাধাবণতঃ আজও গ্রীনল্যাণ্ডীয এস্কিমোবা পূনর্জন্ম বিশ্বাস কবে। কর্মফলেও তাদের দারুণ বিশ্বাস। কেউ যদি খাবাপ কাজ করে তা'হলে সে কুকুর হযে জন্মে স্লেজ টানবে— আব যদি ভাল কাজ করে তাহলে সবুজ জলের নীচে যে স্বর্গভূমি সেখানে গিযে বাস করবে। সেখানে সে সারাজীবন ধবে খাবে মাছ— মাছ আব মাছ-- সেই তো জীবনেব পবম লক্ষ্য।

এস্কিমোদেব অনেক গল্পে ভূতের কথা পাওয়া যায়— সাদা ভালুক বা বরফেব ওপব মবীচিকাব দরুণ এদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে না দেখা ভূতের গল্প। মধ্য আদিবাসী এস্কিমোদেব মধ্যে আজও তাই ভূতের পূজা হয়।

মিঃ ব্রঁ'র সাথে আমি একুশ দিন ছিলাম আর এবই মধ্যে আমি বাজধানীর প্রায় অধিকাংশ জ্ঞানী-গুণীর বাড়িতে আমন্ত্রিত হয়েছি। তাবা অনেক আমেরিকান ইণ্ডিয়ান বা বেড ইণ্ডিয়ান দেখেছে, কিন্তু সত্যিকারের ইণ্ডিয়ান এই প্রথম। কি করে যে আমি সেখানে পৌঁছলাম সেটা শুধু তাদের কাছে নয়, আমার কাছেও বিস্ময়জনক।

অভিশপ্ত দ্বীপ

ইউরোপে যাযাবরদের সাথে

...অনেক অনেক দিন আগেকার কথা, এক দেশে ছিল এক রাজা, তাব ধন-দৌলত প্রভাব-প্রতিপত্তি কোন কিছুরই অভাব ছিল না। তার বাণী ছিল অতীব সুন্দরী, আর ছিল একটি ফুটফুটে রাজপুত্র। দেখতে দেখতে সেই বাজপুত্র বড় হয়ে উঠল আর রাজাবও আস্তে আস্তে বয়স বাড়তে লাগল। বাজপুত্রের অনেক সখ, তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে শিকার। যুবক রাজপুত্র দিন-রাত বনে জঙ্গলে ঘুরে শিকার নিয়েই ব্যস্ত। রাজার ইচ্ছে যে পুত্রকে বিয়ে দিয়ে রাজ্যভাব তাব ওপব ছেড়ে দিয়ে বিশ্রাম নেবেন। এখানেই শুরু হল রাজার চিন্তা, কারণ রাজপুত্রকে বিয়ের কথা তুলতেই সে হেসে উড়িয়ে দিল। বাজা কিন্তু নাছোড়বান্দা। তিনি প্রতিবেশী বিভিন্ন বাজ্যের সুন্দবী ও বিদুষী রাজকন্যাদের সংবাদ সংগ্রহ কবে পুত্রকে বার বাব অনুরোধ কবতে লাগলেন বিয়েতে রাজি হবাব জন্য। এই সময় ঘটল একটা অবাক কাণ্ড।

একদিন বাজপুত্র শিকাব করতে বেবিয়ে একটা বনশুকরের পিছনে পিছনে ঘুরতে ঘুরতে হয়রান হয়ে পড়েছে। ঘন বন, আশপাশে কোন মানুষের চিহ্ন মাত্র নেই। তৃষ্ণার্ত বাজপুত্র হঠাৎ দূবে একটা কুয়ো দেখতে পেযে সেদিকে এগিয়ে গেলো এবং দু'হাতে জল তুলে তৃষ্ণা নিবারণ করলো, তারপর মাথা তুলে আপন মনেই বলে উঠল— "ঠাকুর তুমি আমায় বাঁচালে বটে!" গাছের ফাঁক দিয়ে দূবে একটি পরমা সুন্দরী ছোট্ট মেয়ের ওপর বাজপুত্রের হঠাৎ নজর পড়ল। আশ্চর্য হ'ল বাজকুমার— এমন সৌন্দর্যও জগতে থাকতে পারে! পরনে একটা ছিন্ন জামা, খালি পা, লাবণ্যময় কচিমুখ, বনের মধ্যে যেনো একটি বনফুল। হাতে একটি বালতি নিয়ে মেয়েটি লাফাতে লাফাতে কুয়োব দিকে আসতে লাগলো। বাজকুমার সঙ্গে সঙ্গে পাশের একটি গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। মেয়েটি কুয়ো থেকে জল তুলে নিয়ে ফিরে যাবে, ঠিক সেই সময় রাজপুত্র লুকোচুরি খেলার মত গাছের পেছন থেকে বেরিয়ে মেয়েটিব রাস্তা জুড়ে দাঁড়ালো— মেয়েটি অবাক! বালতিটা নিচে নামিয়ে রাজপুত্রকে অতি সরল ও সহজ সুরে জিজ্ঞেস করল,

—তুমি কে? কি চাও?

—তোমাকে.

—রাজপুত্রের কথা শুনে মেয়েটি খিল-খিল করে হেসে উঠলো। সে হাসিতে যেনো গাছের সুগন্ধি ফুলগুলো ঝরে পড়ল। হাসিতে যে এত ছন্দ আছে রাজকুমার

কোনদিন তা ভাবতে পারেনি। মনে মনে রাজপুত্র প্রতিজ্ঞা করল— এ মেয়েটি যেই হোক না— এ-ই তার যোগ্য পাত্রী। রাজপুত্র জিজ্ঞেস করল,

—তোমার নাম কি?

—যাগবলী।

—বয়স কত?

—মা বলেন চৌদ্দ বছব। মেয়েটির সলজ্জ উত্তর।

—তুমি কোথায় থাকো? রাজপুত্র আবার প্রশ্ন করল।

—ওই তো দূরে আমাদের কুঁড়ে ঘর। আমরা জীপ্‌সি, বাবা মা আর আমরা তিন বোন, মানে আমার দুই দিদি।

রাজকুমার সংক্ষেপে মেয়েটির পরিচয় জেনে নিল, মনে মনে ভাবল জিপ্‌সিদের ঘরেই বুঝি রূপসীদেব আবির্ভাব হয়। আরও কিছুক্ষণ ফুটফুটে মেয়েটির সাথে কথা বলে রাজপুত্র বিদায় নিয়ে ঘোড়ায় চড়তে যাবে— এমন সময হঠাৎ ফিরে মেয়েটির হাত ধবে অনুরোধের সুরে বলল,

—আমি যদি তোমায নিমন্ত্রণ করি তাহলে আসবে কি আমাদের বাড়িতে? রাজকুমারের কথা শুনে মেয়েটি বিষন্ন হল। রাজকুমার কাবণ জানতে চাইলে সে বলল,

—আমার দিদিদের না নিলে আমি একা একা যেতে চাই না।

—ওঃ! তাই বলো! খুব ভাল কথা, আমি তোমাদের সকলকেই নিমন্ত্রণ করবো। হ্যাঁ ভাল কথা, তোমার দিদিদের নাম কি? তাদের বয়স কত?

—বড়দি আঠারো বছরের, নাম 'মেদিনী' আব ছোড়দি ষোল বছরের, নাম 'দময়ন্তী'।

—বেশ! বেশ! তারাও কি তোমার মত ফুটফুটে সুন্দরী?

—হ্যাঁ খু-উ-ব সুন্দরী, মেয়েটি সুর করে জবাব দিল।

বাজপুত্র মেয়েটির কাছে এসে তার চিবুক ধরে প্রায় নাকেব সঙ্গে নাক ঠেকিযে খুব আন্তরিকতার সুবে বলল,

—তোমার চেয়ে সুন্দরী জগতে আছে বলে মনে হয় না। এই কথা বলেই লাফিয়ে ঘোড়ায় উঠে লাগাম কষাল— হেই! চল-চল।

রাজবাড়ীর সবাই কয়েকদিন যাবৎ রাজপুত্রের হাবভাব দেখে স্তম্ভিত! সকাল থেকে রাত পর্যন্ত রাজপুত্র গুণগুণ করে গান করে, আনন্দে সকলের সাথে নাচে, সামান্য ব্যাপারেই খুশী আর দান-ধ্যানে উদার। বলাই বাহুল্য যে রাজার চোখেও এ ঘটনাটা এড়াল না। ছেলেকে রাজি করবার এই হচ্ছে উপযুক্ত সময়। রাজপুত্র বাগানে তার প্রিয় সাদা ঘোড়াটাকে নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করছিল, এমন সময় ডাক এল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে গিয়ে হাজির হল রাজার ঘরে। রাজা কোনো ভণিতা না করেই পুত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন,

—আমার বয়স হয়েছে আর তুমিও বড় হয়েছো।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তোমার মা ও আমার ইচ্ছে যে তুমি এখন বিয়ে করে আমাদের চিন্তা লাঘব কর।

—নিশ্চয়, তুমি যা বলবে... রাজপুত্রের জবাব শুনে মহানন্দে রাজা ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, তারপরে উচ্চস্বরে রাণীর উদ্দেশ্যে বললেন,

—ওগো শুনছো, ও রাজি হয়েছে।

দরজার আড়ালেই দাঁড়িয়ে ছিলেন রাণী, রাজার কথা শুনেই ছুটে এসে ছেলেকে জড়িয়ে ধরে বললেন,

—ওঃ তোমার মঙ্গল হোক বাবা, শেষ পর্যন্ত আমাদের বুকের ভার লাঘব হল।

সঙ্গে সঙ্গে রাজা উঠে-পড়ে লাগলেন— চাবদিকে যত বাজা-রাজা আর তাদের সুন্দরী মেয়েদের সন্ধান নিতে লাগলেন। সেই দেশের বীতি অনুযায়ী রাজসভায় দেশ-বিদেশের পরমাসুন্দরী বালিকাদেব একদিন নিমন্ত্রণ কবা হল। রাজবাড়ীতে নাচ হবে আর সেই কারণে সকলেই আমন্ত্রিত। এই নাচ-সভা থেকেই বাছাই করা হবে রাজপুত্রেব জন্য উপযুক্ত পাত্রী। রাজপুত্র লুকিয়ে লুকিয়ে রাজদূতকে দিয়ে তিনটি সাদা, লাল ও নীল রঙের বাহারী একুশ কুচিব জামা কিনে আনালো আর সেই সঙ্গে তার নিজস্ব পেয়াদা পাঠালো যাগবলী, মেদিনী আর দময়ন্তীকে সেই বন থেকে নিয়ে আসবার জন্য। নাচের সভায় যেমন কবেই হোক তাদেব নিয়ে আসতেই হবে।

সেই দেশে থাকতো এক ডাইনী বুড়ি, সে যেমনি ছিল কূট আর তেমনি ছিল হিংসুটে। মেযে তার মা ডাইনী বুড়িকে বলল,

—এই রাজসভায় আমিও যাব, আমাকে সাজিয়ে দাও। ডাইনী বুড়ি মেয়েব আবদার মত মেয়ের আঙ্গুলে একটি যাদু আংটি পবিয়ে দিল আর সেই আংটির গুণে ডাইনীর মেয়েটা দেখতে দেখতে সুন্দরী হয়ে উঠল। তাকে এবার সুন্দব জামা কাপড় পবিয়ে দিয়ে বাজকন্যার মত করে সাজিয়ে পাঠিয়ে দিল রাজবাড়ীর উদ্দেশ্যে।

নির্দিষ্ট দিনে রাজবাড়ীর প্রাঙ্গণ ভরে উঠলো দেশ-বিদেশেব বাজকন্যা আর পরমাসুন্দরী রূপসীতে। মূল্যবান সামগ্রী দিয়ে সাজানো হয়েছে বাজবাড়ী, উৎসব হৈ-হল্লা আর নাচ-গানে জমে উঠেছে চারিদিক। ডাইনীর মেয়েটাও যাদু-আংটির বলে রাজবাড়ীতে ঢুকে পড়েছে। রাজা রাণী ও রাজপুত্র পাশাপাশি সিংহাসনে বসে পুঙ্খানুপুঙ্খভবে প্রত্যেকটি মেয়ের রূপ ও গুণ বিচার করতে লাগলেন। একের পর এক রূপসী তাদের সামনে দিয়ে হেঁটে যেতে লাগলো— তাদের প্রত্যেকেই যেমন রূপে রূপসী, বিচার করা মহা মুশকিল ব্যাপার! রাজা ও রাণীর চোখ বারবার পড়তে লাগলো

একটি মেয়ের ওপর, আহা! রূপের যেন ঝরণা। তাঁরা কিন্তু ঘুণাক্ষরেও জানেন না যে এ আসলে ডাইনী বুড়ির মেয়ে। রাজপুত্রের দৃষ্টি ও মন কিন্তু পড়ে আছে দরজার দিকে, তার মনের ময়ূর এখনও পৌঁছল না। রাজপুত্রের মন ও প্রাণ পড়ে রয়েছে সেই বনে দেখা কুঁড়ে ঘরের দুর্মূল্য রত্নের ওপর। অবশেষে হঠাৎ সভাস্থ সকলকে বিস্মিত করে দিয়ে রাজপ্রাঙ্গণে পেয়াদার সাথে এসে হাজির হল তিন বোন। সাদা, লাল ও নীল রঙের জামা পরা তিনজন অপরূপা রূপসী যাগবলী, মেদিনী আর দময়ন্তী। তার মধ্যে সবচেয়ে সেরা যাগবলী। রাজকুমার সিংহাসন থেকে দ্রুত নীচে নেমে এসে ডান হাত বাড়িয়ে যাগবলীব বাঁ হাতটা তুলে নিয়ে হাসিমুখে রাজার কাছে নিয়ে গেল। রাজপুত্র রাজার কাছে যাগবলীর পরিচয় নিবেদন করে বলল,

—আপনি যদি মত দেন একেই আমি পেতে চাই।

বাজাব বলার কিছু নেই— সৌন্দর্যে সেরা, রূপের যেন মন্দাকিনী, কচি সহজ সুন্দর ও পবিত্রের ধ্যানে যেন এক বিগ্রহ। যদিও সে জিপ্‌সি কিন্তু রাজা-রাণীব তাতে কোন আপত্তি নেই। রাজকুমার নিজে যাকে পছন্দ করেছে তার ওপর আর কোন কথাই চলে না। রাজা ঘোষণা করলেন যাগবলী সেদিন থেকেই রাজবাড়ীর বধূ— ভবিষ্যতের রাণী। রাজবাড়ীতে আনন্দের বন্যা বয়ে চলল। ছোটবোনের ভাগ্য দেখে মেদিনী ও দময়ন্তী গর্বিত। সভার শেষে দুই বোন ছোট বোনকে রাজবাড়ীতে বেখে ফিরে চলল নিজেদের কুঁড়ে ঘরে, বাবা-মাকে এই আনন্দের সংবাদটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দিতে হবে।

রাজকুমাব যাগবলীকে পছন্দ করেছে শুনে ওদিকে ডাইনী মেয়ে তো রেগে ফেটে পড়ল। বাজপ্রাঙ্গণ থেকে দৌড়ে বেবিয়ে গেল। ডাইনী মা'র কাছে পৌঁছে ছুড়ে দিল তাব যাদু-আংটি। তারপব কান্নায় আছড়ে পড়ল— সুর করে বলতে লাগল,

—চুলোয় যাক তোমার আংটি— তোমার যাদু। যাগবলী আমার চেয়েও সুন্দরী, বাজকুমাব তাকেই পছন্দ করেছে।

মেয়ের কাছ থেকে বিস্তারিত সব শুনে ডাইনী বুড়িও হিংসায় জ্বলে উঠল। তাবপব মেয়েকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল,

—চিন্তা করিস না, দেখাচ্ছি যাগবলীর মজা, আমার হাত থেকে কারোরই নিস্তাব নেই।

এই বলে বেরিয়ে গেল ধর থেকে, তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই জঙ্গলের রাস্তায় এসে হাজিব হল। মেদিনী আর দময়ন্তী তখন উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়চ্ছিল বাবা-মাকে সেই আনন্দ সংবাদ দেবার জন্য। ডাইনী একটি বুড়ির রূপ ধরে তাদের সামনে এসে হাজির হল— তারপর তাদের থামিয়ে অতি বিনয়ে বলতে লাগল,

—আহা মরি! কি রূপ তোমাদের। এমন সুন্দরী আমি এই প্রথম দেখছি। কিন্তু এই বনে তোমরা একা একা যাচ্ছো কোথায়?

দুই বোন বুড়িকে তাদের বিষয়ে সবিস্তারে জানাল। বুড়ি খুব আগ্রহ সহকারে শুনল; তারপর অতি বিনয়ের ভান করে বলল,

—আহা! এমন ভাগ্য! তা মা যাগবলীর তো একটা ব্যবস্থা হল, কিন্তু তোমাদের কথা কি ভেবেছো?

—আজ্ঞে না। দুই বোন জবাব দিল।

—তাহলে শোন মা— আমি তোমাদের একটা ভাল পরামর্শ দিচ্ছি। দুই বোন সহজ মনে সহকারে বুড়ীর কথা শুনতে লাগল।

—জানো মা, আমার ছোট দুই ভাই আছে, এই তল্লাটের যত জঙ্গল আছে তার মালিক তারাই। তারা অগাধ সম্পত্তির মালিক আর তাদের দাপটও অনেক। তোমরা দু'জনে যদি তাদের বিয়ে কর তাহলে তোমাদেব আব কোন সমস্যাই থাকে না। আমার সঙ্গে চল, আমি তোমাদের তাদেব সাথে পবিচয় করিয়ে দেবো; তারপর তোমরা বাড়ী গিয়ে তিন বোনের সংবাদ একসঙ্গে তোমার বাপ-মাকে দেবে— কি বলো মা?

বুড়ীর কথা শুনে দু-বোন কোন রকম সন্দেহ না কবে বাজি হয়ে গেল। বুড়ীর আর আনন্দ ধরে না— ডাইনি তো আনন্দে আত্মহারা। অতি সহজেই বাজিমাৎ। কিছুক্ষণের মধ্যেই বুড়ীর সাথে দু-বোন রওনা হল। বুড়ীর দুই রাক্ষস ভাই থাকতো পাতালে। একজনের ছয় মাথা আর একজনের তিন মাথা! দুই বোনকে পেয়ে তাদের আর স্ফূর্তি দেখে কে? দুই বোন সেই ছয় মাথা আব তিন মাথা রাক্ষসদের দেখে তো অজ্ঞান। আহা! বেচাবীরা পাতালে আবদ্ধ হল।

এবার ডাইনী চলল তৃতীয় বোন যাগবলীর কাছে। সেখানেও সে বুড়ির রূপ ধরে রাজকুমারের ঘরে গিয়ে তার বিছানায় লুকিয়ে রাখল 'বিষ-গোলাপের কাটা'। রাতে রাজকুমাব ও তার জিপ্‌সি কুমারী যাগবলী যেই শুয়েছে সঙ্গে সঙ্গে সেই কাঁটা বিঁধে গেল যাগবলীর বুকে, যাগবলীর মুখ দিয়ে স্বর বেবোবার আগেই তার চক্ষু স্থির হয়ে গেল। তাই দেখে হায় হায় কবে উঠল বাজকুমার, দৌড়ে এল রাজপরিবারেব সবাই। বৈদ্য-ওঝা এসে ভরে ফেলল বাজবাড়ী, কিন্তু হায়! কেউই কিছু করতে পারল না। বাজকুমার আর রাজা রাণী কান্নায় লুটিয়ে পড়ল। ওদিকে ডাইনী বুড়ি আর তার মেয়ে এই সব দেখে শুনে খিল-খিল করে হেসে লুটোপুটি। তিন বোনের বাবা-মায়ের অবস্থা আরও সঙ্গীন। এক মেয়েব এই অবস্থা আর দুই মেয়ে জগৎ থেকে সম্পূর্ণ উধাও, সবাই জানলো যে তাদের বাঘে খেয়েছে।

রাজবাড়ির প্রথা অনুযায়ী মৃত যাগবলীকে সৎকার করা হবে, কিন্তু রাজকুমারের তাতে একদম মন নেই। রাজকুমার যাগবলীকে আঁকড়ে ধরে বসে রইল— রাজকুমারের মতে যাগবলী মরেনি সে যেন ঘুমিয়ে আছে, সময় হলেই আবার জেগে উঠবে। রাজা তার ছেলের মনে অবস্থা বুঝলেন, তিনি রাজপ্রাসাদের ফুলের বাগানে একটি ছোট্ট ও সুন্দব গোলাপ ঘর তৈরী করে দিলেন মৃত যাগবলীর জন্য। রাজকুমার

তার প্রেয়সীকে নিয়ে উঠে এলো সেই গোলাপ ঘরে। রাজকুমারের কথাই মনে হয় সত্যি, কয়েকদিন হয়ে গেল অথচ যাগবলীর দেহে এতটুকু পরিবর্তন দেখা দেয়নি, ফুলের বিছানায় শুয়ে আছে যেন ফুল-পরী। দুঃখী রাজপুত্র সেখানে পড়ে থাকে, মাত্র কয়েক ঘন্টার জন্য রাজবাড়ীতে শুতে যায়। এমনি একদিন রাজপুত্র খুব ভোরবেলা উঠে গোলাপ ঘর খুলে ভেতরে ঢুকেছে— হঠাৎ তার নজরে পড়ল একটা সুন্দর ফুটফুটে শিশু, অবাক বটে! শিশুটি কোথা থেকে এল— কি ব্যাপার! শিশুটির হাতে একটি সোনার আপেল। শিশুটি রাজপুত্রকে দেখেই হেসে উঠলো, কে যেন রাজপুত্রের কামে কানে বলে দিল এ তোমারই ছেলে। রাজপুত্রও মন্ত্রমুগ্ধের মত ছেলেটিকে বুকে জড়িয়ে ধরল। দেখতে দেখতে চারদিকে সেই শিশুর কথা ছড়িয়ে পড়ল। রাজা বাণী ছুটে এলেন— রাজার মনে এবার সন্দেহ দেখা দিল।

— এ কিছুতেই আমার নাতি হতে পারে না। এ নিশ্চয়ই সেই পুরোনো ডাইনীর ষড়যন্ত্র। জিপ্‌সি যাগবলী ঘরে ঢোকা মাত্রই আমাদের এই সর্বনাশ হতে সুরু হয়েছে।

এমন সময় সেই শিশুটি আধো-আধো স্বরে কথা বলে উঠল— আমি ডাইনীব ছেলে নই, আমি তোমাদেরই ঘরের ছেলে। এই বলেই শিশুটি হাঁটতে শুরু করল। এ সত্যি তাজ্জব ব্যাপার! রাজপুত্র খুব খুশী কিন্তু অন্যান্য সকলেই একটু সন্দেহ কবতে লাগল। শিশুটি দু'দিনের মধ্যেই বড় হয়ে উঠল। বাজা কিন্তু কিছুতেই ছেলেটিকে আপন বলে মানতে রাজি নন। শিশুটিব জন্ম কথাবার্তা এবং হাবভাব সবই এক বিরাট রহস্য। ঘন্টায় ঘন্টায় ছেলেটি বাড়তে বাড়তে এক বালকে পরিণত হল। রাজপুত্র কিন্তু তাকে ঠিক নিজের ছেলে বলেই মেনে নিয়েছে। হঠাৎ সেই ছেলেটা দাবী করে বসল একটি ঘোড়া। রাজপুত্র ছোট্ট একট সাদা ঘোড়া তাকে এনে দিল। ঘোড়ায় উঠেই সে সবাইকে বিদায় জানালো— আমি যত শীগগির সম্ভব ফিরে আসবো। আব ফিবে এসে মাকে বাঁচাবো— এই বলেই সে উধাও হল। অবাক কাণ্ড বটে!

ঘোড়ায় চড়ে ছুটতে ছুটতে সে এসে হাজিব হল একটা বনে, সেই বনে ছিল এক জীপ্‌সি কামাব। কামার তার বিরাট হাতুড়ি তুলে দমাদম পিটিয়ে তৈরী করছিল একটি বালতি। বালককে দেখেই সে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল,

—এই বনে তুমি এলে কি করে? তুমি বোধ হয় হারিয়ে গেছ? কি নাম তোমাব?

ছেলেটি কামারের সব প্রশ্নের একটাই জবাব দিল,

—আমার নাম ইয়াকা। আমাকে তোমার হাতুড়িটা একটু দেবে?

বালকের কথা শুনে কামার হেসে উঠল হি-হি করে,

—খোকার কথা শোন! এ হাতুড়িটা নিয়ে তুমি কি কববে? এটা এত ভাবী যে তুমি নাড়াতেই পারবে না।

—তাই নাকি? একবার দিয়েই দেখ না।

—নাও, তোল তো দেখি এখান থেকে।

ইয়াকো তার ঘোড়াটাকে থামের সাথে বেঁধে এগিয়ে গেল হাতুড়িটাকে তুলতে, তারপর কামারকে অবাক করে দিয়ে অনায়াসে তুলে ফেলল। এবার সেটাকে দু'তিনবার মাথার ওপর ঘুরিয়ে ছুড়ে দিল ওপরের দিকে। হাতুড়িটা অনেক ওপরে উঠে তারপর নীচে নেমে এসে সরাসরি পড়ল জমির ওপর আর তার ভারে জমির ওপর একটা বিরাট গর্ত হয়ে গেল। ইয়াকো সেই দিকে এগিয়ে গেল, তারপর কুয়োর মত সেই গর্তটার মধ্যে গেছো ইঁদুরের মত তরতর করে নেমে পড়ল। কামার তো এই কাণ্ড দেখে তাজ্জব। পরে যখন তার হুঁস্ হল প্রথমেই মনে পড়ল তার হাতুড়ির কথা। হাতুড়ি কামারের প্রধান হাতিয়াব। তার চোখের সামনে সবই যেন স্বপ্নের মতো ঘটে গেল। কামার-ঘরের পাশেই এবাব নজরে পড়ল ইয়াকোর সাদা ধবধবে ঘোড়াটা। মনে মনে ভাবলো যে, ছেলেটা যদি হাতুড়িটা নিয়ে ফিরে না আসে তাহলে এই ঘোড়াটা বিক্রি করে সেই টাকাটা কাজে লাগাবে— ফলে তাব লাভই হল। মনে মনে ভাবলো হাতুড়ির বদলে ঘোড়া পেলাম, মন্দ কি।

ওদিকে ইয়োকো গর্তটার থেকে হাতুড়িটা খুঁজে পেযে আবিষ্কাব করল সুড়ঙ্গের একটি রাস্তা, সেই রাস্তাটা এগিয়ে গেছে পাতালের দিকে। ইয়োকোর ভয়-ডর বলতে কিছু নেই, তার যেমন সাহস তেমন শক্তি। পাতালেব পথে কোন জন-মানবেব চিহ্ন মাত্র নেই— পশু-পাখী কীট-পতঙ্গ কিছুই নজবে পড়ে না, যেন এদেশ থেকে সব উধাও হয়ে গেছে। এবার দূরে ইয়োকোর নজবে পড়ল একটা বিরাট বাড়ী। খিড়কি দরজার দিকে এগিয়ে সরাসরি হাতুড়িটা দিয়ে সে দরজায় আঘাত কবল। ভেতর থেকে একটা ভীত শব্দ বেরিয়ে এল— কে?

—দরজা খোল, আমি ইয়োকো।

ভেতর থেকে দরজাটা খুলে গেল— সামনেই দাঁড়িযে এক রোগা সুন্দরী মহিলা। ইয়োকোকে দেখেই মহিলাটি হায় হায় করে উঠল।

—কি সুন্দর রাজপুত্রের মত চেহাবা, এই বাক্ষসেব বাজত্বে তুমি কি করে এলে বাছা? নিশ্চয়ই বড় রাক্ষস তোমাকে আমারই মত ধবে এনেছে, তাই না?

—না, ভয় করো না। আমি নিজে নিজেই এখানে এসেছি। তুমি মেদিনী, আমার বড় মাসী, তোমাদের দু'জনকে উদ্ধাব করতেই আমি এসেছি।

ছেলেটির কথা শুনে মেদিনী তাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। বারবার কবে তার দুচোখ বয়ে জল পড়তে লাগলো। মেদিনী তাড়াতাড়ি ইয়োকোকে ঘরের ভেতর নিয়ে এসে দরজায় খিল দিয়ে দিল। ইয়োকোর কাছ থেকে সব শুনে মেদিনীও তাকে শোনাতে লাগলো তার দুঃখের কাহিনী। ডাইনী বুড়ী মেদিনী ও দময়ন্তীকে দুই রাক্ষসের হাতে দিয়ে চলে গেছে। রাক্ষস দুটো আলাদা আলাদা থাকে। দময়ন্তী যে এখন কোথায় আছে তা সে জানে না। মেদিনীকে সরাদিন বসে রূপোর দানা সেদ্ধ করতে হয়, রাক্ষসটা শুধু তাই খায়। মাসী ও বোনপো দু'জনে বসে তাদের

দুঃখের কাহিনী বলছে, এমন সময় বাইরে দুমদাম করে শব্দ। মেদিনী হকচকিয়ে উঠে বসে কাঁপতে লাগল।

সর্বনাশ! ছ'মাথা রাক্ষসটা আসছে। বাড়ীর বাইরে থেকেই রাক্ষসটা হুংকার দিয়ে উঠল,

—আমার বাড়ীতে কে রে?

—ক্‌ কেউ নয়, এ-এ-এই আ-মি। মেদিনী কাঁপতে কাঁপতে জবাব দিল।

রাক্ষসটা বাড়ীর ভেতর ঢুকেই হুংকার দিয়ে উঠল,

—তুই মিথ্যে কথা বলছিস্‌, এই দেখ এই হাতুড়িটা বাইরে পেয়েছি। এটা কি করে এল?

মেদিনী চেয়ে দেখল এটা ইয়োকোর হাতুড়ি। সে হয়তো ভুলে বাইরে ফেলে এসেছে। কাজেই কি আর বলবে সে, ভয়ে কাঁপতে লাগল।

হঠাৎ খাটের তলা থেকে বেরিয়ে এল ইয়োকো, বাক্ষসটা তার দিকে তাকিয়ে বলল,

—আচ্ছা, একটা পুঁচকে মানুষের বাচ্ছা! তা বেশ, এই হাতুড়িটা কি তোর?

—হ্যাঁ ওটা আমার হাতুড়ি।

ওব কথা শুনে রাক্ষসটা হো হো' কবে হেসে উঠল।

—বেশ যদি বিশ্বাস না হয় তাহলে এই দেখ, বলেই ইয়োকো রাক্ষসেব হাত থেকে হাতুড়িটা নিয়ে দড়াম করে রাক্ষসটার পায়ে বসিয়ে দিল এক ঘা। কামারেব ওই ভারী হাতুড়িটা পায়েব পাতায় পড়তেই বাক্ষসটা কেঁই-কেঁই করে কুকুরেব মত গোঙাতে লাগল। তারপর রেগে দু'হাতে তুলে নিল ইয়োকোকে, তাকে আছাড় মেরে ফেলল মাটির ওপব। কাদা মাটিব ওপর বসে গেল ইয়োকোর দেহ, শুধু মাথাটা বাকী, সেই অবস্থা দেখে মেদিনী হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠল। রাক্ষসটা এবার ইয়োকোকে জিজ্ঞেস করল,

—তুই কি করে এলি, আর কি চাস?

—আমাকে এ-মাটির থেকে তুলে দাও, তাহলে বলব।

রাক্ষসটা ভাবল যে, এ একটা নাদুস-নুদুস মানুষের বাচ্ছা, কাজেই তাকে পবে খাওয়া যাবে। এই ভেবে সে টেনে তুলল ছেলেটাকে। মুক্তি পেয়েই ইয়োকো তার পকেট থেকে প্রিয় সোনার আপেলটা বার করে একটু লোফালুফি খেলে নিল, তারপর রাক্ষসটার কাছে এসে দু'হাতে তার পা-টা টেনে হাতুড়ির মতো দু-পাক ঘুরিয়েই মাটিতে আছাড় মেরে ফেলল। নিমেষের মধ্যে ব্যাপারটা ঘটে গেল, রাক্ষসটা ব্যাপারটা বোঝবার আগেই তার দেহ বসে গেল মাটির ওপর। ইয়োকো হাতুড়িটা তুলে এবার ছ'মাথা রাক্ষসের মাথার ওপর বসাতে লাগল দমাদম করে। এমনি করে সে এক এক করে রাক্ষসটার পাঁচটা মাথা চুরমার করে দিল, বাকি রইল একট মাথা। রাক্ষসটা এবার হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠল,

—রক্ষা কর, রক্ষা কর, তুমি আমাকে বাঁচালে আমার অগাধ সম্পত্তি তোমাকে দেবো।

—তাই নাকি? তাহলে জবাব দাও।

—কি চাই বল?

—তোমার ভাই কোথায় থাকে? কি ক'রে সেখানে যাওয়া যায়?

—সামনের রাস্তা ধরে ছ'ঘন্টা হাঁটলেই তার প্রাসাদ দেখতে পাবে।

—ঠিক আছে। বলেই দড়াম করে তার বাকি মাথাটায় বসিয়ে দিল আর এক হাতুড়ির ঘা। ছ'মাথা দৈত্যের সব দর্প চূর্ণ হয়ে গেল; রাক্ষসের প্রাণ বেরিয়ে গেল।

ইয়োকো আর দেরী করল না, তার মাসীকে নিয়ে রওনা দিল দ্বিতীয় মাসীকে উদ্ধাব করতে। রাক্ষসের কথামত তারা সামনের রাস্তা ধরে ছ'ঘন্টার পথ পেরিয়েই দেখতে পেল একটা বিরাট পাথরের বাড়ী। মেদিনীকে ইয়োকো সেই বাড়ীটা দেখিয়ে বলল,

—এই বাড়ীতেই বন্দী হয়ে রয়েছে বেচারা দময়ন্তী।

—কোন চিন্তা করবে না, সব ঠিকমতই হবে, শুধু বুকে সাহস রেখো আর আমাব ওপর ভরসা রাখো।

বলাস বাহুল্য যে ইয়োকোর বাহাদুরী দেখে তাব কথায় অবিশ্বাস করা ছেলেমানুষি মাত্র। তারা দু'জন বাড়ীর পেছন দিকে এসে হাজিব হল আর ঠিক আগের মতই ইয়োকো দুম্ দুম্ করে দরজায় হাতুড়ির ঘা মারতে লাগল। ভেতর থেকে একটা করুণ ও ভয়ার্ত স্বর ভেসে এল— কে?

—দময়ন্তী দবজা খোল, আমি তোর দিদি মেদিনী।

ভেতর থেকে সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা খুলে গেল। ময়লা ও ছেঁড়া জামা পরণে রোগা ও ফ্যাকাসে দময়ন্তীকে অতি কষ্টে চেনা যায়। তবুও রক্তের টানে চিনতে কোনই অসুবিধা হল না। দুই বোন পরস্পরকে জড়িয়ে ধবে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

দময়ন্তী কোন রকমে সামলে নিয়ে বোনকে বলল,

—এই দেখ, আমাদের উদ্ধার করতে কে এসেছে।

মেদিনীর কথামত দময়ন্তী পাশে তাকিয়ে দেখল একটি ছেলে, কি সুন্দর আব মজবুত তার গঠন!

—কে এই ছেলেটি? প্রশ্ন করল দময়ন্তী।

—আমাদের বোনপো, যাগবলীর ছেলে।

মেদিনীর কথায় আশ্চর্য হয়ে গেল দময়ন্তী, মাত্র তো কয়েকদিন আগে যাগবলীর সাথে রাজকুমারের পরিচয় হল, এরই মধ্যে তার ছেলে...এত বড়! মেদিনী বুঝতে পারল দময়ন্তীর মনোভাব। তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল,

—পরে বিস্তারিত জানবি, আপাততঃ ঘরের ভেতরে চল।

বিরাট প্রাসাদতুল্য বাড়ী অথচ ভেতরে লোকজনের চিহ্নমাত্র নেই। দুঃখিনী দময়ন্তী রাক্ষসের জন্য সোনার দানা সেদ্ধ করে রাখে আর তিনমাথা রাক্ষসটা তাই খায়।

তিনজনে কথা বলছে এমন সময় বাইরে দুম্‌দাম করে শব্দ হল। দময়ন্তী ভয়ে কাঠ হয়ে গেল, রাক্ষসটা আসছে। তারা দু'জনে খাটের তলায় গিয়ে লুকিয়ে পড়ল। ভয়ঙ্কর মূর্তি তিনমাথা রাক্ষসটা এবার বাড়ীর ভেতর ঢুকে হুঙ্কার দিয়ে উঠল,

—আমার বাড়ীতে কে রে?

দময়ন্তী কাঁপতে কাঁপতে জবাব দিল— কেউ নয়।

—মিথ্যে কথা— এই হাতুড়িটা কার?

হঠাৎ খাটের তলা হতে বেরিয়ে ইয়োকো বলল,

—ওটা আমার হাতুড়ি।

—এখানে একটা মানুষের বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি, তা বেশ ভালই— সময়মতো খাওয়া যাবে। কিন্তু আগে বল এই হাতুড়িটা কার, এটা এত ভারী, নিশ্চয়ই তোব নয়?

—এই দেখ দেখাচ্ছি ওটা কার— এই বলেই ইয়োকো সেই হাতুড়িটা রাক্ষসের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে কষে মারল এক ঘা তাব পায়ের পাতায়। সেই ঘা খেয়ে রাক্ষসটা কুকুরের মত কেঁই কেঁই করে উঠল। তারপর রাগে দাঁত কড়মড় করতে করতে দু'হাতে তুলে ধরল ইয়োকোকে, তারপর কাদামাটির মধ্যে ছুড়ে মারল। ইয়োকের দেহটা বসে গেল মাটিতে। রাক্ষসটা এবার হাসতে হাসতে বলল,

—কেমন মজা! আমার সঙ্গে ইয়ার্কি? এবার বল কি করে এলি, আর কেনই বা এলি?

—আমাকে এখান থেকে তুলে দাও, তারপর বলছি।

—ঠিক আছে। এই বলে তিনমাথা রাক্ষস ইয়োকোকে তুলে দিল কাদামাটি থেকে। ওপরে উঠেই ইয়োকো পকেট থেকে বের করল তার সোনার আপেলটা; তারপব সেটাকে নিয়ে একটু লোফালুফি খেলে নিল। রাক্ষসটা ছোট ছেলেটাব কাণ্ড দেখতে লাগলো। হঠাৎ ইয়োকো রাক্ষসটার পা ধরে দিল এক হ্যাঁচকা টান, তারপর তাকে শূন্যে তুলে হাতুড়ির মত দু'পাক ঘুরিয়ে মারল এক আছাড়— রাক্ষসটার অবস্থা নাস্তানাবুদ। তার দেহটা গেঁথে গেল কাদায়— ঠিক যেমন হয়েছিল একটু আগে ইয়োকোর অবস্থা।

ইয়োকো এবার হাতুড়িটা তুলে রাক্ষসটার প্রথম মাথাটা দিল গুঁড়িয়ে। রাক্ষসটা হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠলো,

—আমাকে বাঁচাও! আমাকে বাঁচাও! তুমি যা চাও আমি তাই দেবো।

—প্রথমে বল কি করে আমার মা যাগবলীকে বাঁচানো যায়?

—এখান থেকে এই পথ ধরে সোজা গেলেই পাবে একটা কুয়ো। সেই কুয়োর মধ্যে আছে একটা বুড়ো কোলা ব্যাঙ— তার জিভের তলায় আছে একটা ছোট্ট ঘাস, সেই ঘাসটা যাগবলীর কপালে ছোঁয়ালেই সে বেঁচে উঠবে।

—বেশ ভাল কথা, এইবার বল কি করে বুড়ী ডাইনীকে মারা যায়?

—সে আমি কিছুতেই বলব না।

—তবে রে? এই বলে ইয়োকো আর এক হাতুড়ির ঘা মেরে রাক্ষসটার দ্বিতীয় মাথাটাও দিল গুঁড়িয়ে, রইল বাকি একটা মাথা। রাক্ষসটা এবার হাউ-মাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলল,

—আমাকে মেরো না— আমাকে মেরো না, আমি সব বলছি। ঐ বুড়ো কোলা ব্যাঙকে মারলেই ডাইনী বুড়ীও মারা যাবে।

রাক্ষসটার কথা শেষ হতেই ইয়োকো হাতুড়িটা তুলে রাক্ষসটার তৃতীয় মাথাটা দিল গুঁড়িয়ে। —রাক্ষসটার প্রাণ বেরিয়ে গেল।

দু-বোন ভয়ে জড়সড় হয়ে ইয়োকোর কাণ্ড দেখতে লাগল, বাচ্চা একটা ছেলের গায়ে এত শক্তি! কৃতজ্ঞতায় দু-বোনের চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু বইতে লাগল। ইয়োকো এবার তাদের কাছে এসে বলল,

—আর ভয় নেই, চল এবার, এখনও কিছু কাজ বাকি। কিছুক্ষণ পর তারা এসে হাজির হল একটা কুয়োর কাছে। কুয়োটা খুব গভীর। ইয়োকো ইতস্ততঃ করতে লাগলো। এমন সময় তার পকেট থেকে আপেলটা পড়ে গেল মাটিতে— আর কি অবাক কাণ্ড! সেই আপেল থেকে দুটো থামের মতো পা আস্তে আস্তে ওপরে উঠতে লাগলো, তারপর তার ওপর একটা বিরাট ধড় আর মুণ্ডু— একটা বিরাট দৈত্য ইয়োকোর সামনে দাঁড়িয়ে। ইয়োকো মোটেই এই অবস্থার জন্য প্রস্তুত ছিল না। কি করবে ঠিক ভেবে না পেয়ে ঘাবড়ে যেতে লাগলো। আসলে পকেটের আপেলটাই তার শক্তির উৎস আর সেই আপেলটাও এখন নেই— দু-বোন তো তখন ভয়ে প্রায় অজ্ঞান, এ এক নতুন পরিস্থিতি।

দৈত্যটি এবার হেসে উঠল,

—ভয় নেই ইয়োকো, আমি তোর বন্ধু। আপেলের আকারে আমিই সব সময় ছিলাম তোর সঙ্গে, আমার নাম ওরিয়াস দৈত্য। ভগবানের আশীর্বাদে আমার বল অপরিসীম। তোকে আমিই সৃষ্টি করেছি রাজপুত্র আর যাগবলীর দুঃখ দূর করবার জন্য তুই এপর্যন্ত অসীম বীরত্ব ও সাহসের পরিচয় দিয়েছিস, বাকি কাজটা আমিই করছি— এই দেখ্। এই বলে দৈত্যটা কুয়োর মধ্যে তার বিরাট ও লম্বা হাতটা ঢুকিয়ে দিল, তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই তুলে আনল একটা বুড়ো কোলা ব্যাঙ। ব্যাঙটা ঘোৎ ঘোৎ করে উঠল। ওরিয়াস দৈত্য ব্যাঙটার জিভের তলা থেকে একটা

ঘাস বের করে নিয়ে ব্যাঙটাকে পায়ের নিচে রেখে দিল এক চাপ— হঠাৎ দূরে দেখা দিল ডাইনী বুড়ী আর তার মেয়ে, কিন্তু তারা ওরিয়াসের কাছে পৌঁছবার আগেই ছটফট্ করতে করতে মারা পড়ল। এবারে দু-বোনকে দৈত্যটা দু'হাতে তুলে নিল আর ইয়োকো পেছন পেছন হাঁটতে লাগলো। একটা বিরাট সুরঙ্গের কাছে এসে দৈত্যটা তাদের তিনজনের কাছে বিদায় চাইল। ওরিয়াস ভাল দৈত্য, পাতালে তার অনেক কাজ, কাজেই সে থেকে গেল সেখানে। তিনজন ওরিয়াসকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ওপরে উঠে এল।

কামার হঠাৎ সেই হাতুড়ি পড়া গর্তটার মধ্যে থেকে পরপর তিনজনকে বেরিয়ে আসতে দেখে বিস্ময়ে হতবাক! ইয়োকোর সাদা ঘোড়াটা তখনও গাছের সাথে বাঁধা। ইয়োকো কামারের হাতুড়িটা ফেরত দিয়ে বলল,

—অবাক্ হয়োনা, চল তোমার ঘরে, আমি তোমাকে একটা গল্প শোনাবো।

কামার খেতে খেতে তাদের গল্প শুনে অবাক হল। ইয়োকো হঠাৎ কামারকে ভাল করে দেখতে লাগল— হাতেব পেশী যেন লোহার বল আর শরীর যেন সাক্ষাৎ বীর পুরুষ। সংসারে তার কেউ নেই। কামার বার বার মেদিনীর দিকে তাকাতে লাগল। ইয়োকো বুঝল ব্যাপারটা।

—তুমি মাসীকে বিয়ে করবে?

ওর কথায় কামার ও দময়ন্তী দু'জনেই চোখাচোখি হল। মেদিনী তো সঙ্গে সঙ্গেই রাজি। আনন্দ আর দেখে কে? তবে কামার একটু হতাশ হবার ভান করে বলল,

—আমি তোমাকে বিয়ে করে কি খাওয়াবো বলো—আমার এই কুঁড়ে ঘরে একমাত্র রুটি ছাড়া আর কিছুই নেই।

দময়ন্তী এবার কামারের হাতটা নিজের হাতে টেনে নিল, তারপর তার হাতের মধ্যে একমুঠো সোনার দানা ভরে দিল। মেদিনী ইয়োকো আর কামার অবাক হল; তখন সবাই বুঝল যে সে রাক্ষসের ঘর ছাড়বার আগে বুদ্ধি করে এই সোনার দানাগুলো নিয়ে এসেছে। একটা জীবনের পক্ষে তা যথেষ্ট।

এবার মেদিনীও তার হাতের মুঠো খুল্‌ল— সেও এনেছে এক মুঠো রূপোর দানা। তবে সে জানালো যে তাব বিয়ে করার ইচ্ছে নেই। বাপ-মায়েব কাছে থেকে তাদের সেবা করাই তার ধর্ম। আর সে গাছ-গাছড়ার যাবতীয় ওষুধপত্রেও অভিজ্ঞ। গরীবের সেবা করেই সে জীবন কাটাতে চায়। মেদিনী, দময়ন্তী ও কামারকে পরে আসতে বলে ইয়োকো তার ঘোড়ায় উঠে লাগাম কষাল, হেই-ই-চল।

গোলাপ ঘরে তখন রাজকুমার তার প্রিয়া যাগবলীর ফুলের মত মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবছে— হায় ভগবান, তুমি এ কি করলে! ফুলের মত পবিত্র যাগবলীর এ দুরবস্থা রাজকুমারের অসহ্য। তাছাড়া ইয়োকোও কাছে নেই। রাজকুমারের মতে ইয়োকো হচ্ছে তাদেরই ছেলে...রাজকুমার ভাবছে আর ভাবছে, তার দুঃখের

আর অবসান নেই...এমন সময় দরজার কাছে এসে হাজির ইয়োকো— বাবা আমি এসেছি। বাবা ডাক শুনে রাজকুমারের বুকের রক্ত উথাল হয়ে উঠল; দরজার দিকে তাকাতেই ইয়োকো ঝাঁপিয়ে পড়ল তার কোলে।

রাজকুমাকে সান্ত্বনা দিয়ে ইয়োকো দুষ্টু ছেলের মতো পকেট থেকে একটা ঘাস বের করলো, তারপর রাজকুমারকে দেখিয়ে বলল,

—এই দেখ, এই যে মন্ত্রপুত ঘাসটা— তোমার সব দুঃখ দূর করে দেবে, আমার মা বেঁচে উঠবে।

এই বলে পা টিপে টিপে ইয়োকো এগিয়ে এল যাগবলীর বিছানার কাছে, তারপর অতি সন্তর্পণে সেই ঘাসটা ছুঁইয়ে দিল তার কপালে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটল অলৌকিক ব্যাপার। যাগবলীর শ্বাস বইতে শুরু করল। যেন ঘুমোচ্ছে, তারপর আস্তে আস্তে তার চোখ খুলল— যেন পাকা ঘুম থেকে উঠেছে। তারপর রাজপুত্রের দিকে তাকিয়ে অতি কোমল স্বরে বলল,

—আমি কোথায়?

রাজপুত্রের আনন্দ আর দেখে কে? ঝড়ের মতো চারিদিকে সেই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল। রাজা রাণী ছুটে এলেন; সব শুনে বাজা ইয়োকোকে কোলে তুলে নিলেন।

—তুইই আমার নাতি।

সংবাদ শুনে জীপ্সিরা ছুটে এল। যাগবলীর বাবা-মার আনন্দ যেন আব ধবে না। মেদিনী দময়ন্তী আর কামারও ইতিমধ্যে এসে পৌঁছেছে। অনেকদিন পব তিন বোন আবার একসাথে মিলিত হল। রাজা ঘোষণা করলেন,

—তিনদিনের মধ্যেই রাজকুমারে বিবাহ উৎসব শুরু হবে। রাজ্যের সবাই আমন্ত্রিত হল আর ইয়োকো? ভবিষ্যৎ যুবরাজ...

হ্যাঁ রূপকথাই বটে! জীপ্সি বা যাযাবরদের রূপকথা। গল্পটা শুনেছি এক বুড়ো ভদ্রলোকের তাঁবুতে বসে। আমার আশপাশে জড়ো হয়েছে আরাও পাঁচটি ছেলেমেয়ে। গল্পটা শুনে মনে হবে এটা আমাদের দেশীয় রূপকথা। কিন্তু আসলে এটা ইউবোপীয় যাযাবরদেরই একটা গল্প। গল্পের নাম ও ধরনটা ঠিক যেন ভারতীয়। অবশ্য হবেই বা না কেন— আসলে পৃথিবীর যাযাবরদের উৎসই হচ্ছে ভারতবর্ষ। আমি এখন আছি ভূমধ্যসাগরের উত্তর-পশ্চিমের একটি ছোট্ট শহরে, অবশ্য শহর না বলে এটাকে ইউরোপীয় গ্রাম বলাই ভাল। ফ্রান্সের সর্বদক্ষিণে ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী এই শহরটার নাম কামার্গ (Camargue)।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে ফরাসী দেশে বসে সেই দেশের ঐতিহ্য ও সমৃদ্ধি সম্পর্কে না লিখে আমি হঠাৎ এই জীপ্সি প্রসঙ্গ নিয়ে ডায়েরীর পাতাগুলো ভরছি কেন!

আমার বন্ধুদের এই প্রশ্নটাকে আমি একেবারে উড়িয়ে দিতে পারি না। সত্যি কথা— ইউরোপের অন্যতম প্রধান এবং এক নম্বর দেশে থেকেও আমি হঠাৎ কেন এই প্রসঙ্গটাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছি! প্রশ্ন করা অতি সহজ, কিন্তু তার জবাব দেওয়া, সব সময় আমাদের মানুষের ভাষা দিয়ে হয়তো সম্ভব নয়। মানুষের মন বড়ো বিচিত্র— নদীর মতই তার গতি, হঠাৎ যদি একবার মোড় নেয় তাকে ফেরানো মুশকিল।

ভাবতবর্ষ থেকে বেড়িয়ে আমি পথে পথে ঘুরছি। মাসের মধ্যে বিশ দিনই আমাব কাটে রাস্তায়। রাস্তায় চলতে চলতে আমি রাস্তা-প্রেমিক হয়ে পড়েছি, যদিও কষ্টের, তবুও এই প্রেমে মজা আছে। ভারতর্ষেব বাইবে, মধ্য-পূর্ব দেশগুলোতে ও উত্তর আফ্রিকায় প্রায় রোজই আমি বাস্তায আমাব মত আব একদল ভবঘুবেদের সাথে মুখোমুখি হয়েছি— তার কিছু কিছু ঘটনা আমি এব আগেও আমার বোজ-নামচায লিখেছি; ভেবেছিলাম যে ইউবোপে পৌঁছবাব সাথে সাথেই এবাও অদৃশ্য হয়ে যাবে। কিন্তু কি আশ্চর্য! পূর্ব ইউরোপেব দেশগুলোতে, বিশেষ করে যুগোশ্লাভিয়া, হাঙ্গেবী, পশ্চিম জার্মানী, চেকোশ্লোভাকিযা, পোল্যাণ্ড ও দাক্ষিণেব গ্রীস-ইটালী, স্পেন ও ফরাসীতে এসে দেখেছি এখানে যাযাববরা অদৃশ্য হয়নি।

তবে হ্যাঁ, দেশ ভেদে এদেব ভাষা, ধর্ম ও জীবন-যাপন প্রণালী বহু পালটেছে বটে। আসলে এদের বৈশিষ্ট্য সেই একই। বাজাবে এদের সুনাম নেই মোটেই, এমন কি অনেক শিক্ষিত লোক মনে করে যে জীপ্‌সি বা যাযাবর মাত্রেই চুবি ক'রে জীবন-যাত্রা নির্বাহ করে। কথাটা কিছুটা সত্য বটে, তবে এদের সাথে না মিশলে ঠিক 'যাযাবর' কে এবং কাবা সে সম্পর্কে জানা মুশকিল। আমি এদের হয়ে বলছি না, আমার ব্যক্তিগত মন্তব্যটা লিখছি— মানুষদের মধ্যে যাবা সীমাব মধ্যে আটকে না থেকে স্বাধীনভাবে এই পৃথিবীর মাটিতে ঘুরে বেড়ায় তাবাই যাযাবর। আর সেই স্বাধীনতাকে রক্ষা কবতে গিয়ে মানুষের গড়া আইন ও দেশে বেড়াবার জন্য তাদের জীবনটা দিনেব পব দিন অসহ্য হয়ে উঠছে। সে যাক্— সে প্রসঙ্গে পরে লেখা যাবে, আপাততঃ বলছি এই কামার্গে এলাম কেন?

অনেকের মুখে বার বাব শুনেছি এই কামার্গের কথা। ইউরোপীয় জীপ্‌সিদের প্রধান তীর্থস্থান। বলাই বাহুল্য যে ইউরোপীয় জীপ্‌সিরা সবাই খৃষ্টান। বিদেশে যারা শিক্ষার জন্য আসে তাদের মুখে শোনা যায় অক্স্‌ফোর্ড, লা-সরবন্, পাদুয়া আর হারভার্ড-এর কথা; আর যারা পর্যটক তারা বলে ক্রীট, ভেনিস্, কানারী, তাহিতি, গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ন আর কামার্গের কাহিনী।

সুইজারল্যাণ্ডের জেনেভা শহর থেকে এখানকার দূরত্ব প্রায় ছ'শ কিলোমিটার। সাইকেলে সেখান থেকে এখানে আসতে আমার লেগেছে পাঁচ দিন। প্রথম তিন দিন আমাকে পেরোতে হয়েছে আল্‌প্‌সের পার্বত্যভূমি, পরের দু'দিনে পেয়েছি

সমতলভূমি। অতি চমৎকার রাস্তা, মোটর গাড়ীর জন্য রয়েছে বিশেষ অটোরুট, কিন্তু ইচ্ছে করলে সাধারণ পথেও আসা যায়। অটোরুটে সাইকেল চড়া বিপদজ্জনক আর তাছাড়া ঢুকতে বারণ। আমি সাধারণ রাস্তায়ই আসতে বাধ্য হয়েছি।

কামার্গ অঞ্চলটা— আমাদের দেশের নামখানা-সুন্দরবন এলাকার মত, অর্থাৎ ধু-ধু করছে মাঠ, নোনা মাটির ওপর বোনা হয়েছে ধান, মাঝে মাঝে বাতাসে ভেসে আসছে সাঁৎসেঁতে ও ভ্যাপসা নোনা মাটিব গন্ধ।

প্রথমদিনের সন্ধ্যায়ই পেলাম অনেকদিনের পবিচিত সন্ধ্যালগ্নের মশার গুঞ্জন আর মাঝে মাঝে কান ও নাকের পাশ দিয়ে তাদের অবাধ গতিবিধি। গোধূলি লগ্নে আকাশেব সেই রঙেব খেলা। মনে হল যেন অনেকদিন পর দেশে ফিরেছি। রাস্তাঘাট প্রায় ফাঁকা আর বাড়ীঘবগুলোও অনেকটা গ্রামীন ধবনেব। কাছাকাছি বড় শহরগুলোর নাম নিস, আবল্, মারসেই। মারসেই ভূমধ্যসাগবের একটি অন্যতম প্রধান বন্দর। কবিগুরু নোবেল প্রাইজ পাওয়ার সময় এই মাবসেইতে ভাবত থেকে জাহাজে এসেছিলেন— তারপব ট্রেনে উত্তরের দিকে গিয়েছিলেন। প্রথমদিনেই আমি একটা ভাল আস্তানা পেয়েছি। অল্প খরচে আস্তাবলেব ধাবে একটা বেঁস্তোবায় উঠেছি। ইংবেজিতে যাকে বলে রেন্জ্।* জেনেভায় কিছুদিন কাজ কবেছি, কাজেই পয়সার কোন অসুবিধা নেই। তবে যতটা কমে পাওযা যায় ততই মঙ্গল। পঁচিশ ফ্রাঙ্কে (25 French Franc., 1 Rupee = 60 centimes, 100 centimes = 1 Fr.) আমি বেশ ভাল বন্দোবস্তই পেলাম।

পরের দিন সকালে কামার্গের গীর্জার পাশেই সম্মুখীন হলাম প্রথম যাযাবরের সাথে। তেবো-চোদ্দ বছরের একটি মেয়ে আমাব কাছে এগিয়ে এসে ফরাসীতে বলল,

—তোব হাতটা দে, আমি তোর ভবিষ্যৎ বলে দেব।

—তাই নাকি? আমি হেসে বললাম।

আসলে আমাব কাছে এ একটা সুযোগ। আমি ফ্রক পবা বাচ্চা মেয়েটাব দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিলাম,

—এই নে, বল দেখি।

—কি বলব বল।

—যা খুশি।

—সে আবার কি কথা? তুই প্রশ্ন কর আমি জবাব দেব।

মেয়েটা বোধ হয় এই ধরনের খদ্দের এব আগে পায়নি। এবার আমি বসিকতা করে বললাম,

---

* 'অনিন্দ্যসুন্দব সুইজাবল্যাণ্ড' বইটিতে বিস্তাবিত উল্লেখ রয়েছে।

—তুই জীপ্‌সি, তাই না? আমিও।

আমাব কথা শুনে মেয়েটি ফ্যালফ্যাল কবে আমাব মুখেব দিকে তাকিয়ে বইল, তাবপব 'ধ্যেৎ' বলেই দৌড়ে পালাল।

মেয়েটাব দিকে আমি তাকিয়ে বইলাম— কিছুদূবে একটা ক্যাবাভ্যানেব কাছাকাছি গিয়েই মেয়েটি অদৃশ্য হল। আমি এক পা দু'পা কবে সেই ক্যাবাভ্যানেব দিকে এগিয়ে গেলাম। একটা মাঠেব ওপব এবাব নজবে পড়ল সাবি সাবি আবও অনেকগুলো ক্যাবাভ্যান, এখানেই আলাপ হল এক বুড়ো ভদ্রলোকেব সাথে; ভদ্রলোকেব সাথে উপযাচক হয়েই পবিচিত হলাম। নাম গেমনা, জীপ্‌সি, পেশায় কামাব। আমি তাকে আমাব পবিচয় দিয়ে বললাম যে, আমি তাদেব সম্পর্কে খুবই উৎসাহী, তাদেব জীবন যাপন ও অন্যান্য বিষয়ে জানতে চাই। ভদ্রলোক একটু সন্দেহেব দৃষ্টিতে আমাব দিকে তাকিয়ে বলল,

—ওঃ বুঝেছি, তুমি আসলে সাংবাদিক— না বাপু তোমবা ভীষণ চালাক। আমবা সাধাবণ মানুষ, আমাদেব সম্পর্কে জানবাব কিছুই নেই।

ভদ্রলোক চুপ কবলো। আমি বুঝলাম যে ভদ্রলোক এড়াতে চাইছে। অথবা ভুল বুঝেছে, আমাব বলাব ধবন নিশ্চয়ই ঠিক হয়নি। আমি এবাব তাকে অনুবোধেব সুবে বললাম,

—আমি সাংবাদিক নই, আমি একজন ভাবতীয় পর্যটক, আপনি তো জানেন যে ইউবোপ বা আফ্রিকাব জীপ্‌সিবা সবাই মূলতঃ এসেছে ভাবতবর্ষ থেকে— সে কাবণেই আমাব ঔৎসুক্য। আব বলতে গেলে আমি নিজেও যাযাবব শ্রেণীব।

মিথ্যে কথাটা বলতে বাধ্য হলাম। ভদ্রলোক সব শুনে আমাব দিকে ভাল কবে তাকালো, তাবপব মাথা থেকে পা পর্যন্ত ভালভাবে পবীক্ষা কবে নিয়ে বলল,

—বেশ, তাহলে চল এক গ্লাস মদ খেতে খেতে গল্প কবা যাক।

এটাই হচ্ছে গেমানাব সাথে আলাপেব সূত্রপাত। আব যেহেতু তাকে একগ্লাস স্থানীয় মদেব দাম দিয়েছি সেহেতু আধঘন্টাব মধ্যেই সে বুঝতে পেবেছে যে আমি তাব বন্ধু। আমাদেব দেশীয় ভাষায় এই ধবনেব বন্ধুত্বকে বলা যায় চায়েব পীবিত্। জীপসিদেব একটা প্রবাদে বলে, যে তোমাকে এক গ্লাস পানীয় দেবে সেই তোমাব সাকবেদ।

পবেব দিনই আমি গেমানাব তাঁবুতে আমন্ত্রিত হই; তাব মুখেই উপবি-উক্ত গল্পটা শোনা।

কামার্গ :

জীপ্‌সিদেব তীর্থস্থান। স্থানীয় ভাষায় বলে পেয়ী দ্য জিতাঁ অর্থাৎ জীপ্‌সিদেব দেশ। আসলে এটা মোটেই জীপ্‌সিদেব দেশ নয়। 'সেন্ট মাবি দ্য লা ম্যাব' নামে

বালুচর ঘেঁসা চার্চকে কেন্দ্র করেই এখানে জীপ্সিদের আনাগোনা। স্থায়ী জীপ্সি এখানে কেউ নেই; অবশ্য থাক্‌বেই বা কি করে, স্থায়ীভাবে বসবাস করা জীপ্সীদের স্বভাব-বিরুদ্ধ। কামার্গ এলাকার সর্বদক্ষিণের ছোট্ট একটা গ্রাম যার নাম সেন্ট মারি দ্য লা ম্যার, বাংলায় তর্জমা করলে দাঁড়ায় সমুদ্রের দেবী— মেরী।

আশ্চর্য বটে! গীর্জায় সাধারণতঃ কোন দেব-দেবীর বিগ্রহ পূজা হয় না। খৃষ্টধর্মের এটাই বৈশিষ্ট্য। ভগবান এক, তার ত্রিশক্তির মাধ্যমে তার প্রকাশ, এক ঈশ্বর, দ্বিতীয় তার পুত্র যীশুখৃষ্ট আর তৃতীয় পবিত্র আত্মা। অন্যান্য ধর্মের মতো খৃষ্টধর্মেরও অনেক শ্রেণীবিভাগ। তার মধ্যে ক্যাথলিক ও প্রটেষ্টান্ট বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ক্যাথলিক্‌দের গীর্জার মধ্যে পাওয়া যায় ক্রুশবিদ্ধ যীশুখৃষ্টের স্টাচু। আর প্রটেস্টান্টদের গীর্জায় কোন স্টাচুই থাকে না। ঈশ্বর নিরাকার, সীমার মধ্যে সেই অসীমকে প্রকাশের চেষ্টা ব্যর্থ মাত্র। আমি কম করেও পাঁচশ গীর্জায় গিয়েছি; একমাত্র অর্থোডক্‌স্ গীর্জা ছাড়া কোনো জায়গায় বেদীতে দেব-দেবীর মূর্তি দেখিনি। সেইন্ট মাবি দ্য লা ম্যার-এর গীর্জায় ঢুকে তাই আশ্চর্য হয়ে গেলাম। মূল বেদীর ওপর রয়েছে কাঠের দুটো নারী-মূর্তি। ভার্জিন মেরী দেবীর মূর্তি হওয়াই স্বাভাবিক কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখলাম যে এই দুটো স্টাচুর সাথে যীশুখৃষ্টের সাথে কোনো যোগাযোগই নেই। দুটো নারী মূর্তি প্রায় একই রকম দেখতে। প্রথমটির নাম মারী জাকবে, দ্বিতীয়টির নাম মারী সালোমে। এখানকার প্রধান পুরোহিতের মুখে শুনলাম যে, মারী জাকবে ও মারী সালোমে নামে দুই বোন পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে ভূমধ্যসাগবেব দক্ষিণ-পূর্বের কোন একটি দেশ থেকে এসে হাজির হয়— উদ্দেশ্য খৃষ্টধর্ম প্রচার। তাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়নি, তবে যীশুখৃষ্টের থেকে তাদের ব্যক্তিগত প্রভাব ও ধর্মপরায়ণতা এই অঞ্চলের লোকদের মনে গভীরভাবে প্রবেশ করে। শেষে তাদেরই প্রতিমূর্তি এখানে স্থাপন করা হয়। এই গীর্জায় আজ তাদেরই বিগ্রহ মূর্তি।

এই দুই মূর্তি ছাড়াও এখানে আছে আরও একটি নারী-মূর্তি সাবাহ্ দেবীর বিগ্রহ খুবই মূল্যবান। আসলে কে এই সারাহ্? ইতিহাস বলে, সারাহ্ এক নারী। সম্ভবতঃ চতুর্থ শতাব্দীরও অনেক আগেকার কথা— ফরাসী বা স্পেনীয় জীপ্সিদের প্রথম আবির্ভাব হয় ইজিপ্ট থেকে, তাদের নামও এসেছে ইজিপ্ট শব্দ থেকে। সম্ভবতঃ জীপ্সিদের একদল সমুদ্রপথে এখানে এসে পৌঁছয়। সেই দলের নেতৃত্বে ছিল— এক জীপ্সি রমণী অথবা বলা যেতে পারে যে সেই ছিল সেই দলের পথ-প্রদর্শক ও দোভাষী। তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্যই তার বিগ্রহ করে রাখা হয় এই গীর্জায়। সেই সারাহ্ এখন সারাহ্-দেবী জীপ্সিদের পূজনীয় উপাস্য দেবতা।

প্রশ্ন দাঁড়ায় তাহলে, জীপ্সিদের ধর্মে যীশুখৃষ্টের স্থান কোথায়?

উত্তর খুবই সহজ— ভগবান এক। যীশুখৃষ্টই স্বয়ং ভগবান আর সালোমে, জাকবে, সারাহ্ এরা সবাই হচ্ছেন তাঁর শ্রেষ্ঠ ভক্তদের মধ্যে অন্যতম; স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার সেবক।

সেন্ট মারী দ্য লা ম্যার, প্রধানতঃ জীপসিদের তীর্থক্ষেত্র হলেও এখানে ট্যুরিষ্ট বা পর্যটকদের অধিকাংশই হচ্ছে গাড্‌ডী বা জেন্ট্‌ল্‌ম্যান। ফরাসী তো বটেই, তার বাইরে থেকেও প্রচুর লোক আসে এখানে বেড়াতে। বছরে একবার এখানে মেলা বসে। চব্বিশে ও পঁচিশে মে এখানকার মেলা দেখবার মত।

প্রথমদিন বিকেলবেলা সেন্ট সারাহ্‌কে নিয়ে জীতান্‌দের বিরাট শোভাযাত্রা বেরোয়। আর দ্বিতীয়দিনের শোভাযাত্রা বেরোয় মারি জাকবে ও মারী সালোমে'কে নিয়ে। দ্বিতীয়দিনের শোভাযাত্রা আসলে জীপ্‌সি ও স্থানীয় ফরাসী বাসিন্দাদের মিলিত উৎসব। স্থানীয় অধিবাসীরাও এই উৎসবে যোগদান করে। কাজেই ফরাসীরা ভাবে যে এটা তাদের উৎসব আর জিতান্‌রা (জীপ্‌সিদের স্থানীয় নাম) ভাবে যে এটা তাদের উৎসব। কামার্গ অঞ্চল ঘোড়ার জন্য খুব বিখ্যাত আর এখানকাব ষাঁড়ও খুব নাম করা।

এখানকার প্রধান বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে নোনা-জমি আর দিগন্ত-বিস্তৃত ধানের ক্ষেত। কামার্গের চাল যেমন সুস্বাদু তেমনি পুষ্টিকব। এখানকার জংলি ঘোড়াব পালনক্ষেত্রে গুলোও চমৎকার। ঘোড়াগুলো ছাড়া থাকে তাদের বিচরণ ক্ষেত্র অবধি। আব এখানে আছে শ'য়ে শ'য়ে ষাঁড় পালন কেন্দ্র। ষাঁড়ের মাংস দেশবিদেশে চালান দেওয়া হয় আর ষাঁড়ের খেলাব জন্য তাদেব ব্যবহার করা হয়। স্পেনেব ষাঁড়ের লড়াই বা বুল-ফাইটের কথা জগত-বিখ্যাত। কামার্গের জংলি ষাঁড়কে সেই ধরনের খেলার জন্য ব্যবহার কবা হয়। ঘোড়ায় চড়ে ষাঁড় ধরা একটা স্থানীয় মজাব খেলা, এতে শক্তি ও কৌশল দুইয়েবই প্রয়োজন। কামার্গের আর একটা বৈশিষ্ট্য এখানকাব পাখী। এখানকার জলাভূমির ঝোপ-ঝাড়ে নানারকমের পাখী দেখতে পাওয়া যায়। এটা শিকার-নিষিদ্ধ এলাকা, কাজেই বলাই বাহুল্য যে পাখীদে্ এটা স্বর্গবাজ্য। এখানে এমন অনেক পাখী দেখতে পাওয়া যায় যা ইউরোপের অন্যান্য দেশে প্রায় বিলুপ্ত। ফ্লামাঁ রোজ বা লাল-বক্ তাদের মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য।

যদিও কামার্গ-এব ভূগোল আমি লিখতে বসিনি, তবুও কামার্গ এবং সেন্ট মারী দ্য লা ম্যার সম্পর্কে উপরি-উক্ত দুটো চারটে কথা লিখতে আমি বাধ্য হলাম। কারণ আমি যে এলাকায় আছি সেখানকার কিছু বর্ণনা দেওয়া একান্তই প্রয়োজন মনে করি।

এবার আসা যাক্ আবার জীপ্‌সিদের প্রসঙ্গে:

এখানে এসেছি মাত্র দু'দিন হল, আমার ইচ্ছে জীপ্‌সিদের সম্পর্কে আরও অনেক কিছু জানা। গেমানা অর্থাৎ সেই বুড়ো ভদ্রলোক খুবই ভাল সে কথা স্বীকার করতেই হবে, তবে কি না ভদ্রলোক এক নম্বরের মদ-খোর। তাব কাছ থেকে কিছু আদায় করতে হলেই তাকে বারে নিয়ে পানীয় দিতে হবে। এক কথায় বলতে গেলে ভদ্রলোক মদ ছাড়া কথা বলে না। সাধারণতঃ সন্ধ্যের দিকে তার মুড্ খুব ভাল

থাকে, আশপাশের ছেলে-মেয়েদের জড়ো করে সে গল্প শোনায়। আমি যদি তার ওখানে গিয়ে হাজির হই সঙ্গে সঙ্গে সে থেমে যায়। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে,

—কাল এক গ্লাস হবে তো?

—নিশ্চয়ই, আমি সায় দিই। আমি নিরূপায় কারণ এদের মধ্যে একমাত্র গেমানাকেই চিনি, অন্য কারো সাথে এখনও পরিচয় হয়নি। যতক্ষণ পর্যন্ত না অন্য কাউকে পাচ্ছি ততক্ষণ পর্যন্ত এর সঙ্গ ছাড়তে রাজি নই। অবশ্য গেমানার চাহিদা বিরাট কিছু নয়— 'মাত্র এক গ্লাস মদ'— স্থানীয় এবং লেবেল ছাড়া অতি সস্তা দরের হলেই চলবে। আমাদের দেশে যেমন এক কাপ চা, ঠিক তেমনি। এতে দোষের কিছু নেই। মদ এখানে সবাই খায়, সেটাই এখানকার চলন আব আমাব মত যারা নেহাৎই বাঙাল তারাই একমাত্র বার্-এ ঢুকে চায় 'এক গ্লাস জল', কোনো কোনো সময় ব্যার্-ম্যান বা বার্-বণিতা আমার দিকে একটু কটাক্ষ করে, ভাবটা অনেকটা— মরণ আর কি! কচি খোকা!

যস্মিন দেশে যদাচার, ফরাসী কেন, ইউরোপের প্রত্যেকটি শহরে আর গ্রামে জলের কল বা ফাউন্‌টেনের অভাব নেই। পার্ক মাত্রেই রয়েছে ফুলেব বাহাব আব বিভিন্ন ধরনের কৃত্রিম বাহারি ঝরণা— কিন্তু তাব থেকে জল খেতে গেলেই লোকেব কু-দৃষ্টি এসে পড়ে। সে সব জায়গা থেকে আঁজলে ভরে জল খাওয়া— সে যেন একটা বিরাট অশোভন ব্যাপার। জেন্‌টেল্‌ম্যানবা এসব জায়গা থেকে জল খায় না, তারা জল খায় কিনে। পানীয় বলতে এখানে মোটেই জল বোঝায় না, বোঝায় জল ছাড়া অন্য বাকি তরল পদার্থগুলোকে। জিতান্‌দেব সাথে এখানে আমাব এক মিল। তারা ইউরোপের মানুষ হলেও ছোট বেলা থেকেই জল খেয়েই মানুষ, তবে বড় হলে জলের রঙটাকে পালটাতে চায়, সভ্যতাব চাপ!

এটা এপ্রিল মাস— সামনের মাসেব শেষ সপ্তাহে শুরু হবে উৎসব, এক এক করে জীপ্‌সিরা এখানে আসতে শুরু করেছে। থাকি রেঞ্জের বেস্তোরায় আর দিনের বেলা এদিক ওদিক গেমানার সাথে ঘুবি। আমি ওব নাম ধবে ডাকি আর সেও আমাকে বন্ধু বলে গ্রহণ করেছে। আমার ইচ্ছে জীপ্‌সিদের সাথে থাকি। আমরা চেষ্টাও করছি অনেক কিন্তু সম্ভব হচ্ছে না। গেমানার সাথে থাকা অসম্ভব, ওর ক্যারাভ্যানে জায়গা নেই। গেমানা থাকে ওর ছেলের ক্যারাভ্যানে। গেমানার মতে জীপ্‌সিদের সাথে থাকার পরিকল্পনা করা বৃথা। কারণ? অতি সহজ— যে সংসারে উঠতি বয়েসী মেয়ে আছে তারা কিছুতেই আমাকে জায়গা দেবে না; যাদের ঘরে আছে পরমাসুন্দরী স্ত্রী তারাও না; যাদের বয়েস বেশী তাদের ক্যারাভ্যানে প্রচুর জিনিসপত্র, জায়গা কম; যাদের ঘরে অনেক ছেলেপিলে তাদের আছে হরেক রকম সমস্যা, আর তাছাড়া একজন অচেনা লোককে ঘরে জায়গা দেবে এমন

উজবুক কেউ আছে নাকি! কাজেই আমি আমার রেস্তোরাতেই আপাততঃ থাকতে বাধ্য হলাম।

সাগরের ধারে একটা বিরাট মাঠের ওপর জীপ্সিসের ক্যাম্পিং-এর জন্য নির্দিষ্ট স্থান আছে। জীপ্সিরা তাদের ক্যারাভ্যানগুলো এক এক করে সেখানেই পার্ক করতে লাগলো। আমার যাতায়াত সেদিকেই। সেদিন ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ নজরে পড়ল ক্যারাভ্যানের পাশে বালির ওপর দাঁড়-করানো একটা বিরাট সাইনবোর্ড। এদের ভাষা ফরাসী; কোনরকমে তার পাঠোদ্ধার করলাম যার মানে— "দিয়ান্ আপনার ভবিষ্যৎ বলে দেবে, বিনা দ্বিধায় তার সাথে পরামর্শ করুন" ইত্যাদি। বিনা দ্বিধায় আমি ঢুকে পড়লাম তার ক্যারাভ্যানে। আমাকে ঢুকতে দেখেই ভেতরে একজন মাঝারি বয়সের মহিলা আমাকে আমন্ত্রণ জানাল। তাব কটা চুল, নীল চোখ, ঘাঘবা ধরনের একটা ফ্রক পরনে। আমি ঢোকা মাত্র সে আমার কপালের দিকে চেয়ে অনেকটা ছড়ার আকারে বল্তে লাগলো,

—অবিবাহিত প্রেয়সী খুব সুন্দবী তবে এখনও ঠিক নেই ভাগ্যবান ভগবান তোমার সহায়, পিতামাতা সৌভাগ্যবান খুব পরিশ্রমী নিষ্ঠাবান মাথায় ওপব দিয়ে তিনটে বিরাট ফাঁড়া গেছে এখনও দুটো ফাঁড়া বয়েছে তবে সেন্ট মারীদ্বয়েব কৃপায় তা কেটে যাবে, চিন্তাব কোনো কাবণ নেই।

এই বলেই মহিলাটি আমার দিকে আরও ঝুকে পড়ল, তার পর জিজ্ঞাসা করলো

—গোপনীয় কিছু নিশ্চয়ই?

—না তেমন গোপনীয় কিছু নয়। আমি আমতা আমতা করে বললাম।

—আমি জানি, সব জানি, আমি দেখতে পাচ্ছি দূবের একটা আগুন আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে আরও কাছে— আরও কাছে— তার শিখা তোমার জীবন আস্তে আস্তে গ্রাস কবছে...।

—আমার কথাটা আগে শোনো, এই বলে তাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম,

—তোমার কথা শুনেই মনে হয় তুমি খুব ভাল অভিনয় করতে পাবো, তাই না? তোমার প্রশংসা কবতেই হবে, এবার আসল কথা বলো, তোমার রেইট কতো?

রমণী আমার কথাটা প্রায় হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলল,—

—অর্থের জন্য কি আর অঘটন আটকে থাকে— সে তুমি যা খুশি দিও। তবে হ্যাঁ আমি ফুটপাতের গণৎকার নই। এই দেখ আমার পরিচয়— এই বলে সে পাশের টেবিল থেকে একটা বিরাট ও ভারী পুরোনো খাতা বার করে আমাকে দেখাতে লাগলো— খাতাটার মধ্যে অনেক ফটো এবং মন্তব্যে ভরা— সবাই দিয়ানের উচ্চ প্রশংসা করেছে। আমি খাতাটা তার হাতে ফেরত দিয়ে বললাম,

—বুঝতেই পারছো আমি ইউরোপীয়ান নই— আমি একজন গরীব ভারতীয় পর্যটকমাত্র— তোমার রেইট না বললে আমি হাত দেখাতে রাজি নই। আমার কথা শুনে দিয়ান অনেকটা অবাক হবার ভান করে বলল,

—তুমি আমেরিকান অথচ গরীব?

আমি বুঝতে পারলাম যে দিয়ান আমাকে আমেরিকান ইন্ডিয়ান ভেবেছে। ইন্ডিয়ান কথাটা কাউ-বয় ও ওয়েস্টার্ন ফিল্ম-এর দৌলতে আজকাল সর্বত্র পরিচিত। কাজেই ইন্ডিয়ান বলতে সাধারণত এরা ভারতীয় বোঝে না, বোঝে আমেরিকার রেড্ ইন্ডিয়ানদের। ফরাসী ভাষায় অবশ্য ফরাসীরা সাধারণতঃ উচ্চারণ করতে পারে না। এখানকার জীপ্‌সিরা সবাই ফরাসীভাষী। আমি দিয়ানকে বুঝিয়ে বললাম যে আমি আমেরিকান নই, আমি আসল ভারতীয়। ভূগোল সম্পর্কে তার জ্ঞান কতটুকু আমি জানি না; তবে সে গম্ভীরভাবে বলল যে সে সব বুঝেছে। শেষ পর্যন্ত সে আমাব জন্য বিশেষ কন্‌সেসন করে বলল,

—পঞ্চাশ ফ্রাংক।

—পঞ্চাশ ফ্রাংক! আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা কবলাম। সে তো অনেক— পঞ্চাশ ফ্রাংক দিযে আমি দু'দিন এখানে থাকতে পারি।

—অসম্ভব! দিযান ঘাড় নেড়ে জবাব দিল। অসম্ভব কথা, এখানকাব যে কোন হোটেলে কম করেও তোমাব লাগবে ষাট ফ্রাংক।

—আমি হোটেলে উঠিনি দিয়ান, আমি উঠেছি রেস্তোরায়।

—তাই বল।

—আমি তো আগেই বলেছি যে আমি গরীব।

—ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি— পঁচিশ ফ্রাংক— ব্যস্। এটাই আমার শেষ কথা— আমি দরদস্তর পছন্দ কবি না। আমাব আভিজাত্য অনেক।

দিয়ান এবার গম্ভীর হল। হাত দেখাটাকে কেন্দ্র করে আসলে ওর ক্যাবাভ্যানটা দেখাই আমার মূল উদ্দেশ্য। আর সেই সাথে সাথে তার সাথে আলাপ করা তো বটেই। আমি সৌদি আরবে ও ইজিপ্টে দেখেছি ঠিক একই ব্যাপার। জীপ্‌সিরা সাধারণতঃ বাইরের লোকদের মোটেই তাদের ঘরের কথা বলে না। অন্যদের ঘরের কথা জানতেই তারা আগ্রহী, নিজেদেরটা শোনাতে নয়। দিয়ান আমাব হাতটাকে তার হাতের মধ্যে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিযে বিভিন্ন সংবাদ দিতে লাগল। আমি হঠাৎ তাকে প্রশ্ন করলাম,

—দেখ তো ভাল করে— আমি জীপ্‌সিদের এই ক্যাম্পে থাকবার বন্দোবস্ত করতে পারবো কি না?

দিয়ান আমার কথা শুনে অবাক হল। বলল,

—তুমি আমাদের ক্যাম্পে থাকতে চাও? কিন্তু কেন?

—কারণ আমিও তোমাদেরই মত যাযাবর। আমি স্পষ্ট উত্তর দিলাম। আমার কথায় যেন যাদু হল। ঠিক সেই বাচ্চা মেয়েটার মত দিয়ানও আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকাতে লাগল। আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না— অপ্রাসঙ্গিক নিশ্চয়ই কিছু বলে ফেলেছি। অতি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করলাম,

—কেন, তোমাদের সাথে থাকা কি অপরাধ? বিশ্বাস কর আমার কোনো অসৎ উদ্দেশ্য নেই।

দিয়ান একটু নড়েচড়ে বসল, তারপর আমার হাতটা ছেড়ে দিয়ে বলতে লাগল,

—আমরা অপরের হাত দেখি বটে কিন্তু এক যাযাবর আর এক যাযাবরের হাত কোনদিন দেখে না, এটা আমাদের সমাজ-বিরুদ্ধ। শুধু তাই নয়, আমরা সব যাযাবরেরা পরস্পর আত্মীয়, একজন আর একজনকে অবশ্যই সাহায্য করবে—যদিও তুমি অনেক দূর থেকে এসেছো এখানে তীর্থ করতে, কাজেই আমিও তোমাকে সাহায্য করবো, এর জন্য চিন্তা করো না।

দিয়ানের কথায় আন্তরিকতার স্পর্শ পেলাম। আমি ভারতীয় যাযাবর কামার্গে এসেছি তীর্থ করতে, এটাই হল আমার পরিচয়। জীপ্‌সিদের কাছে এটাই হল যাদুমন্ত্র। আমি এত দিনে যেন আলো দেখতে পেলাম। ভেতরে ভেতরে আমার আনন্দ তখন প্রায় উপচে পড়েছে। দিয়ানকে আমি দশ ফ্রাংকের দুটো নোট বাড়িয়ে দিয়ে বললাম,

—এটা হাত দেখার জন্য নয়, তোমার আন্তরিকতার জন্য, মিষ্টি খেও। দিয়ান হাত বাড়িয়ে নিল। সেদিন বিকেলে বার-এ বসে গেমানাকে কথায় কথায় দিয়ানের কথা বললাম। গেমানার মতে দিয়ান খুব ভাল গণৎকার, তবে দাম অত্যধিক। আমি গেমানাকে বললাম যে তার সাথে আমার কথাবার্তা হয়েছে, দিয়ান আমায় সাহায্য করবে বলে কথা দিয়েছে।

পরের দিন গেমানা, দিয়ান ও তার স্বামীর সহযোগিতায় জীপ্‌সিদের শিবির এলাকায় এক সুন্দর বন্দোবস্ত হয়ে গেল। একটা তাঁবুর বন্দোবস্ত হল— দিনে তিন ফ্রাংক ভাড়া আর খাওয়া-দাওয়া এদিক-ওদিক করতে হবে। টয়লেটের জন্য পাবলিক টয়লেট রয়েছে আর জলও সেখানকার। আমি একটা সস্‌প্যান ও অ্যালুমিনিয়ামের কয়েকটি জিনিসপত্র কিনে নিয়ে সংসার গুছিয়ে বসলাম। হিসেব করে দেখলাম যে এসব কেনাকাটা ও খাওয়া সমেত আমার খরচা পড়বে দিনে প্রায় দশ থেকে পনেরো ফ্রাংক-এর মধ্যে। রেস্তোরা থেকে অনেক সস্তা আর জীপ্‌সিদের মধ্যেই থাকার এমন সুযোগ ছাড়ে কে? জীপ্‌সিদের সাথে এর আগেও আমি থেকেছি — তবে তারা হচ্ছে নেহাৎই মরুভূমির বা অতি গরীব যাযাবর। এবার সুযোগ পেলাম ইউরোপীয় যাযাবরদের সাথে থাকার।

জীপ্‌সিদের উৎস :

জীপ্‌সিদের সাথেই আমি আছি। এই শিবির এলাকার মধ্যে এগারোটা তাঁবু আর প্রায় দু'শর মত ক্যারাভ্যান। বলাই বাহুল্য যে ভারতবর্ষ বা আরবের জীপ্‌সিদের মতো এরা মোটেই গরীব নয়, স্থান ও কালের সাথে এরা নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছে। অতীতের গরু বা ঘোড়ার গাড়ী পাল্‌টে এরা গ্রহণ করেছে ক্যারাভ্যান

আর সেই ক্যারাভ্যানকে টানবার জন্য উপযুক্ত মজবুত ধরনেব মোটর। প্রত্যেক জীপ্‌সিরই মোটর গাড়ি রয়েছে। যাতায়াত করার জন্য এছাড়া উপায় নেই। ক্যারাভ্যানই এদের সংসার, এদের মূল সম্পত্তি। এক একটা ক্যারাভ্যানের ভেতরে গিয়ে আমি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছি— অতি চমৎকাবভাবে গোছানো। এর মধ্যে রয়েছে শোবার ঘর, বসবার ঘব আর ছোটখাটো রান্নাঘর। তবে এরা সাধারণতঃ রান্না করে বাইরের খোলা আকাশে। বৃষ্টি-বাদল বরফ-শীত, পুলিশ ইত্যাদির সমস্যা না থাকলে এরা বাইরেই বান্না ও খাওয়া পছন্দ কবে। জীপ্‌সিদের বিভিন্ন জীবিকা অনুযায়ী এদেব ক্যাবাভ্যানেও আছে ছোট্ট হাতুড়ে কারখানা।

শিবির এলাকায় এদেব গাড়ি ও ক্যাবাভ্যানেব মডেল দেখলে এক নজরেই মনে হয় যে এরা খুবই ধনী। এদের অনেককেই আমি জিজ্ঞাসা কবেছি- · জানতে চেয়েছি এদের উৎস, ধর্ম ও সংস্কৃতির কথা; কিন্তু বারবারই সে প্রশ্ন করে আমি ধাক্কা খেয়েছি। গন্তব্য ও উৎস এ দুটো প্রশ্নেব উত্তর এবা জানে না। ভাগ্যক্রমে সেখানে পরিচয় হয়ে গেল মসিও কর্লিনো (Monsieur Colinon) এর সাথে। সেও এসেছে তীর্থ করতে, বয়স প্রায় পঞ্চাশোর্ধ, কাঁচা-পাকা চুল, চেহারায় বেশ সম্ভ্রান্তের ছাপ। তিনি আমার বিষয় জানতে পেরে উপযাচক হয়েই এসেছেন আমাব সাথে আলাপ করতে। অতি অমায়িক ও সাদা-সিধে লোক। পরে জানতে পারলাম যে তিনিও আমারই মত এক বাউণ্ডুলে, তবে নেশা জীপ্‌সিদেব সাথে ঘোবা। লা সরবন ইউনিভার্সিটিব সাহিত্যের ওপব তিনি নাকি ডক্টরেটও কবেছেন। এখন সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে জীপ্‌সিদেব সাথে ঘুরে বেড়ান। বিভিন্ন ভাবে তাদেব সাহায্যও কবেন। তাঁর কাছ থেকেই জানলাম জীপ্‌সিদের উৎস-সংবাদ।

জীপ্‌সিদের বিভিন্ন নাম। ফরাসীবা বলে জিগান; জিগান নাচ বলতে বোঝায় জীপ্‌সিদের নাচ। জার্মানে তাদের নাম জিগনে; ইংরেজবা এদেব বলে জীপ্‌সি..... ইজিপ্টের থেকে এরা এসেছে বলেই এই নামে সম্বোধন কবা হয়। জিতানোম স্পেনীয় নাম। ইটালীয়ানরা বলে জিংগারি। ফ্রান্সে জিগান ছাড়াও তাদেব বলা হয় বোহেমিয়ান, বুমিয়ান: কামার্গেব লোকেরা এদের বলে বোমানিশেল।

আমরা যেমন বলি যাযাবর, তেমনি বিভিন্ন অঞ্চলে এদেব বিভিন্ন নাম। মরুভূমির বেদুইন, পাহাড়ি অঞ্চলে বারবার, আমেরিকানরা এদেব সবাইকেই বলে নোম্যাড। এ ছাড়াও সৌদি আরব ও আফ্রিকায় এদের অন্ততঃ আবও শ'খানেক নাম আছে। মূলতঃ এরা একই। স্বভাব-চরিত্র আচাব-ব্যবহার আসলে এক, শুধু ভৌগোলিক কারণে এদের ভাষা ও জীবনযাত্রায় সামান্য হেবফেব হয়েছে মাত্র; তবে মনের কোনো পরিবর্তন হয়নি। ফরাসীতে আজকাল জীপ্‌সিদের রক্ষা ও সাহায্য করবার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, তবে প্রয়োজনের তুলনায় তা কিছুই নয়। প্যারিসের ইউনিভার্সিটিতে নাকি এদের সমাজ ও চিন্তাধারা নিয়ে নতুন একটা গবেষণা বিভাগ

খোলা হয়েছে। বর্তমানে রাষ্ট্রসংঘেও এদের স্বাধীনতা রক্ষা বিষয়ে বিভিন্ন রকমের কথাবার্তা চলছে। ফরাসী ঐতিহাসিকদের মতে জিতানরা সবাই এসেছে ভারতবর্ষ থেকে। সম্ভবতঃ সিন্ধু নদীর তীরবর্তী এলাকা ও পশ্চিমভারত এদের মূল উৎস। চেঙ্গিশ খান ও তৈমুরলঙের ভারত আক্রমণের সময়ই এরা ভয়ে পালিয়ে যায় বাইরে। এই দুই বহিঃশত্রুর ভারত আক্রমণের ফলে হাজার হাজার যাযাবর তাদের স্ত্রীপুত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ে নতুন দেশের সন্ধানে। তাদেরই একদল ইরান, ইরাক, গ্রীস হয়ে আসে ইউরোপের দিকে। আর এক দল নেমে যায় সৌদি আরব হয়ে উত্তর আফ্রিকার দিকে। এ সম্বন্ধে প্রচুর প্রমাণও পাওয়া গেছে। বছরের হিসেব পর্যন্ত নাকি নিখুঁত, নমুনা স্বরূপ—

চেঙ্গিস খানের ভারত আক্রমণ ১৩শ শতাব্দীতে (প্রায়) এবং এই সময়েই ভারতীয় যাযাবরদের প্রথম ইরানে প্রবেশ ঘটে। তৈমুরলঙের ভারত আক্রমণ ১৪শ শতাব্দীতে— দ্বিতীয় দফায় যাযাবরদের ভারতভূমি ত্যাগ। ইরাক, ককেসাস ও গ্রীসে ১৩২২ খৃষ্টাব্দে, ইটালীতে ১৩৪৮ খৃঃ। সুইজারল্যান্ডের ওপর দিয়ে তারা জার্মানীর দিকে যায় ১৪১৪ খৃষ্টাব্দে। কাস্পিয়ান সাগরের ধার দিয়ে তারা রাশিয়ায় প্রবেশ করে প্রায় ১৫০০ খৃষ্টাব্দে। এই সময়ই তাদের দ্বিতীয় দলটি ঈজিপ্টে পৌঁছয়। সতেরো শতাব্দীতে তারা পৌঁছয় মধ্য আফ্রিকার দিকে, নীল নদীর ধার ধরেই ছিল তাদের যাত্রাপথ। স্প্যানীসদের সাথে অনেক জীপ্সির দল সুদূর দক্ষিণ আমেরিকাতেও গিয়ে হাজির হয়। তবে ল্যাটিন আমেরিকায় যারা গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেছে, বর্তমানে তারা আর যাযাবরদের পর্যায়ে পড়ে না।

কর্লিনো যখন জানল যে আমিও তারই মত জীপ্সি-প্রেমিক, বিশেষ করে ভারতীয়, কাজেই দু'দিনের মধ্যেই আমাদের ভাব হৃদ্যতায় পরিণত হল। কর্লিনো এদের সম্পর্কে সবকিছুই জানে। জীপ্সিরা আসলে খুবই ভাল— তাদের সাথে মেলামেশায় কোন অসুবিধাই নেই, তবে কর্লিনোর সাবধান বাণী মানতেই হবে— এদের সাথে গলায় গলায় ভাব করতে কোনো বাধা নেই, কিন্তু প্রেম করতে গেলেই মারা পড়বে।

পরিবার :

সেন্ট মারী দ্য লা ম্যার-এর বালুচর সন্ধ্যের দিকে খুব জমে ওঠে। জীপ্সিরা যে যার কাজ থেকে ফিরে আসে, তারপর ক্যারাভ্যানের পাশেই চলে তাদের রান্না। সসিস্, জাম্বো, পুলে রোটি ও পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধে আকাশ যায় ভরে। মুরগী, হাঁস ও বিভিন্ন ধরনের শুকনো শুয়োর ও গরুর মাংস এদের পরম উপাদেয় খাদ্য। শাকসব্জি থেকে এরা মাংসটাই বেশী পছন্দ করে। প্রায় ২/১ দিন পর পরই মুরগীর রোস্ট বা বিফ্ রোস্ট খায়।

জীপ্‌সিদের পরিবার সাধারণতঃ মহিলা-প্রধান। মা বুড়ি হয়ে গেলেও সেই পরিবারেরই সর্বেসর্বা। এদের একান্নবর্তী পরিবার।* ইউরোপে একান্নবর্তী পরিবার প্রায় অবলুপ্তির পথে। পূর্ব ইউরোপে এখনও একান্নবর্তী পরিবার অনেক জায়গাতেই দেখতে পাওয়া যায়; পশ্চিম ইউরোপে কিন্তু একেবারেই নেই। বুড়ো বাপ-মা অধিকাংশ সময়ই একা নিঃসঙ্গ জীবনযাত্রা বহন করে। আমার মতে যদিও এটা খুব দুঃখের বিষয়, কিন্তু তারা এখন অভ্যস্ত। জীতানদের জীবনে এখনও পরিবার ভাগ হয়নি। কোন কোন ক্যারাভ্যানে দেখেছি দু'তিন ভাই স্বচ্ছন্দে বিবাহিত জীবন-যাপন করছে, কোন অসুবিধাই নেই। ফরাসীদের কাছে এধরনের জীবন শুধু যে আদিমযুগের তাই নয়, এরা এরকম ব্যাপার ভাবতেও পারে না।

পেশা :

আমি এর মধ্যে আস্তে আস্তে এদের সাথে মিশে গিয়েছি। এদের একটা প্রবাদে বলে— আমাদের যারা বিশ্বাস করে তাদের বিশ্বাস রাখি আর আমাদের যারা অবিশ্বাস করে তাদের থেকে চুরি করি। ভারতবর্ষের অধিকাংশ জায়গায় জীপ্‌সিদের সন্দেহের চোখে দেখে। অনেকে বলে এরা চুরি করে জীবনযাত্রা অতিবাহিত করে। ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, জার্মানী ও স্পেন দেশের অধিকাংশ লোকও তাই মনে করে। আমি প্রথমেই লিখেছি যে, জীপ্‌সিদের সাথে না থাকলে তাদের সম্পর্কে বোঝা নিতান্তই ভুল বোঝা। শিবিরবাসীরা সবাই এসেছে এখানে তীর্থ করতে, অপেক্ষা করছে চব্বিশ ও পঁচিশে মে'র জন্য। এসেছে অনেক দূর দূর থেকে— হাজার মাইলের ব্যবধান থেকেও কয়েকজন এসেছে। কিন্তু এদের কেউই চুপচাপ বসে নেই। সবাই কর্মতৎপর। পুরুষেরা সকালে গাড়ী নিয়ে বেড়িয়ে যায় শহরের উদ্দেশে, মেয়েরা বাড়ীর কাজ, শিশুদের দেখা-শোনা আর সেলাই করা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এদের মধ্যে অনেকে দীয়ানের মত হাত দেখা বা ভবিষ্যৎ গণনা করবার জন্য এদিক ওদিক থেকে খদ্দের যোগাড় করার চেষ্টা করে। খদ্দের যে জুটবেই তার কোন নিশ্চয়তা নেই, তবে চেষ্টা করতে ক্ষতি কি ? বুড়ো-বুড়ি ও ছেলে-মেয়েরা সাধারণতঃ খুঁজে বেড়ায় ছোট-খাটো কাজ— হয় নিজেদের সংসারের জন্য নয়তো অপরের জন্য। ঝোপ-জঙ্গল থেকে রান্না করবার জন্য শুক্‌নো কাঠ-পাতা ইত্যাদি কুড়িয়েই তাদের আনন্দ। এই অঞ্চলে তাদের করণীয় খুব বেশি কিছু নেই। এই অঞ্চলে ভূ-মধ্যসাগরীয় বাঁশ-ঝাড় প্রচুর আছে। এই বাঁশগুলো আমাদের দেশের মত মোটেই অত বড় নয়, ছোট-খাটো কঞ্চির মত, অনেকটা উলুখাগড়া বনের মত। সেই বাঁশ দিয়ে এরা চমৎকার জিনিসপত্র তৈরি করে। মহিলা ও পুরুষদের মধ্যে অনেকেই চেয়ার টেবিল চুপড়ি ও ছোটখাটো প্রচুর জিনিসপত্র তৈরিতে ব্যস্ত। উৎসবেব সময় এখানে শুধু যে জীপ্‌সিরাই আসে

তাই নয়। ভীড়ের মধ্যে অধিকাংশই হচ্ছে গাড্‌জো (Gadjo) অর্থাৎ ভদ্রলোক— তারা জিপ্‌সীদের হাতের তৈরী জিনিসপত্র খুব পছন্দ করে। দক্ষিণ ফরাসীতে এক বিশেষ সম্প্রদায়ের যাযাবর আছে যাদেব নাম 'মানুষ'। উচ্চারণে যেমন মানুষ অর্থও ঠিক তাই— আশ্চর্য বটে! এই 'মানুষ' সম্প্রদায় বেত ও বাঁশের জিনিসপত্র তৈরি করতে খুব পটু। ফরাসীর বিভিন্ন বড় বড় শহরের দোকানগুলোতে এদের হস্তশিল্পের খুব দাম।

জিতান জীপ্‌সিদের জীবনটা বড় অদ্ভুত— যেখানে যায় সঙ্গে সঙ্গে চলে তাদের পেশা। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক আদোল্‌ফোর কথা, তার এলাকা হচ্ছে স্পেন। একমাত্র এই তীর্থক্ষেত্র ছাড়া সে সারা বছর স্পেনেই থাকে। পেশায় কামার। জীপ্‌সিদের মধ্যে এই পেশাটা খুবই সম্ভ্রান্ত ও সম্মানীয। দক্ষ কামার হবার জন্য যে সব গুণ থাকা দবকাব একটা জীপ্‌সির তা আছে, অর্থাৎ অধ্যবসায়, ধৈর্য, বুদ্ধি ও শক্তি। এই শিবির এলাকায় আদোল্‌কো অন্যান্য জীপ্‌সিদের মতই তার ক্যারাভ্যান ভিরিয়েছে। তার সংসারে আছে স্ত্রী, চাব ছেলে-মেয়ে, ছোট ভাই ও তার বাবা-মা। একটা পাঁচশ-চার মার্কা পেজো মোটর তাব ক্যাবাভ্যানটা টানে। রোজ সকালে সে তার মোটর নিয়ে বেড়িয়ে যায় আশপাশেব শহবে। মোটরের গদিগুলোকে খুলে বেখে এইসময় সেটাকে রূপান্তরিত করেছে একটা ছোট-খাটো কাবখানায়। পুরানো জিনিস ঝালাই মেরামত করবাব জন্য যা কিছু দরকার তার উপযোগী যাবতীয় যন্ত্রপাতিই তার আছে। চা-জলখাবার খেয়ে বেরিয়ে পড়ে সকাল বেলায়, তারপর শহরের গলিতে গলিতে মোটরের জানালা থেকে চিৎকাব করে বলে— 'পুরানো থা-লা ঘ-টি বা-টি সা-রাবে এ-এ-এ।' শুধু ঘটি বাটি নয়, সাইকেল, এমন কি মোটর লবী ট্রাকটারের বিভিন্ন ঝালাই কাজেও সে দক্ষ। রোজই সব সময় তার ভাল খদ্দের জোটে না— সেটা নির্ভর করে সেন্ট মারীর ওপরে। তবে কোনদিনই সে খালি হাতে ফেরে না। তাকে একদিন জিজ্ঞাসা কবলাম,

—তোমার সাফল্যের মূল কারণ কি?

—গলার জোর, হাতুড়িব কায়দা আব ভগবানের দয়া।

উত্তরটা বড় চমৎকার; তার এই উত্তরের মধ্যেই রয়েছে জীপ্‌সিদের দর্শন। কামার মাত্রেই কিন্তু সবাই ভাল কামায় না। যাদের ভগবানে বিশ্বাস নেই, আত্মবিশ্বাস তাদের আসবে কোত্থেকে? গলার জোব না থাকলে খদ্দের জোগানো মুশকিল আর সমাজে টিকে থাকাও দায়। আর শক্তি বা কায়দা এনে দেয় জাগতিক উন্নতি ও সম্পদ।

মিদা নামে আর একটি কামার পরিবারকে জানি— সে আদোল্‌ফের ঠিক বিপরীত— দু-একদিন অন্তর তার খদ্দের জোটে। অর্থের দিক থেকে বিচার করলে তা যৎসামান্য মাত্র; ভাগ্যক্রমে তার স্ত্রী ও বোন নাচ দেখিয়ে যা উপায় করে তাতে ভালভাবেই সংসার চলে যায়। পুরুষদের মধ্যে কামার আর মেয়েদের নাচ এই দুটো পেশা

জীপ্‌সি মহলে খুব পরিচিত। জীপ্‌সি নাচ বলতে আসলে নাইট্ ক্লাবের স্ট্রিপটিজ্ বোঝায় না। জীপ্‌সি নাচের মধ্যে লুকিয়ে আছে তাদের জীবনের ছন্দ-মাধুর্য, সরল ভঙ্গি ও মহিমা। নাচের সাথে চারদিকে তারা বিতরণ করে এক অপূর্ব আনন্দ হিল্লোল।

বালুচরে রোজ সন্ধেবেলা জীপ্‌সিরা দলে দলে এসে জড়ো হয়। গীটার তাদের প্রিয় বাদ্যযন্ত্র। ছন্দ যেন তাদের রক্তবঙ্গে বইছে। ফ্লামেঙ্গো নাচ একমাত্র জীপ্‌সিদেরই একচেটিয়া; স্পেন দেশের লোকেরা অবশ্য এটা তাদের নাচ বলে দাবী করে, কিন্তু এটা এসেছে জীপ্‌সিদেব থেকে। ইরানে জীপ্‌সিদের তাঁবুতে আমি এই একই নাচ দেখেছি। ছন্দ এক, শুধু ভঙ্গির একটু তফাৎ।

দিনের আলো নিভে যাওয়ার সাথে সাথে নেমে আসে ছন্দ, তাল আর মাদকতা জীপ্‌সিদেব দুনিয়ায়। রাতেই জীপ্‌সিদেব যেন প্রাণ সঞ্চাব হয়।

আমি কর্লিনোর সাথে বসে আছি ঠিক বালুচবেব একটু ওপবে। দুটো পাথরের ব্লককে সাজিয়ে একটা টেবিলের মতো কবেছি। আমাব ঠিক ডানপাশে শুকনো ঘাস-বিচুলি ও কাঠের এক আগুন জ্বলছে, তাবই আলোতে আমি লিখতে বসেছি আমার ডায়েরী।

বালুচরের মাঝে মাঝে এরকম আরও কয়েকটা অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে আর তাবই চাবপাশ ঘিবে বসেছে জীপ্‌সিদের দল। আমি তাদের ঠিক রূপটা বর্ণনা করবার জন্যই তাদের পাশে কাগজ-কলম নিয়ে বসেছি। আমার এখন বারবাব আফশোষ হচ্ছে— কেন আমি আমার মাতৃভাষাটা ভালভাবে আয়ত্ত কবতে পারিনি। জীপ্‌সিদের এই সান্ধ্য-জীবনেব ভবাটকে কি ভাবে যে ব্যক্ত কববো জানি না— যা দেখেছি তাকে ভাষায় রূপ দিতে পারছি না। এখানেই আমাব ব্যর্থতা ... তবুও আমি চেষ্টা করবো; আমাব ডায়েরীতে জীপ্‌সিদের কথা না লিখলে আমাব বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে...।

কানে ভেসে আসছে ওদের কোলাহল, গীটাবেব আওযাজ, গানের সুর, সমবেত তালিব তাল আর দেখতে পাচ্ছি আগুনের শিখার মত ঘুরে ফিরে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে সুন্দরী জীপ্‌সির দেহ-বল্লরী। ওরা আগুন! ওদের নাচে আছে মোহনীয় শক্তি। জীপ্‌সি মেয়ে—ভগবানের এক আশ্চর্য সৃষ্টি, যত দেখি ততই ওদের উদ্দেশ্যে আমি মাথা নত করি। স্ত্রী-চরিত্রে আছে যেন মন্ত্র। ভালোবাসায় সে যাদুকর, সৌন্দর্যে সে কুহকী, দেহের মধ্যে লুকিয়ে আছে যেন শত শত রহস্য— তার নাচে সৃষ্টি করে মায়া-লোক। সবাই তাকে চায় অথচ কেউ পায় না, আবার বলতে গেলে সবাই-ই পাচ্ছে অথচ হাত খুলে দেখা যায় সবই ধোঁকা। কে বলবে যে এই মেয়েটাই দিনের বেলা চণ্ডী মূর্তি ধারণ করে তার স্বামীকে মেরেছে দুই চর, কে বলবে যে এই মেয়েটাই কুকুর লেলিয়ে একটা লোকের ঠ্যাং খোড়া কবে দিয়েছে... সন্ধ্যের জীপ্‌সি আর দিনের— দিন-রাত তফাৎ। নাচ ও গান প্রকৃতির অদ্ভুত দান—প্রকৃতিরই প্রকাশ, মানুষের যুক্তি তর্ক ও বিচারের যেখানে শেষ সেখানেই

শুরু সঙ্গীতের। নাচ ও গান জীপ্‌সিদের জীবনে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত— ছোট্ট দুধের শিশু থেকে বুড়ি দিদিমা পর্যন্ত সবাই যেন সঙ্গীতের পূজারী, যে যেখানেই থাক না কেন সবাই আসে এই আনন্দোৎসবে যোগ দিতে। তাদের ক্যারাভ্যান এই সময় খোলাই থাকে, আর কুকুরগুলো থাকে ছাড়া। তারাই এই সময় থাকে সজাগ প্রহরী। আগুনের চারপাশ ঘিরে এরা গান গায়, নাচে, গীটার বাজায়— আমাদের দেশে দুর্গাপূজার সময় আরতির সময় ধুনচীর ধোঁয়াকে কেন্দ্র করে যেমন হয়ে ওঠে পাড়ার আনন্দ....। অনেক রাত পর্যন্ত চলে তাদের এই আনন্দ উৎসব, তারপর আগুন নিভে যাওয়ার সাথে সাথেই থেমে যায় তাদের ছন্দ। জীপ্‌সিদের ছোটখাটো দলকে ইউরোপে চলার পথে দেখেছি। বাজারে চত্বরে তারা গান গেয়ে নাচ দেখিয়ে সাধারণের মনোরঞ্জন করে পয়সা আদায় করে। এধরনের জীপ্‌সিদের ভেতর অনেকেই প্রতিভাবান, তারা তাদের নাচের ভঙ্গিমাকে কৌশলে একটু অদল-বদল করে ছাড়ে সভ্যতার বাজারে, লোকে তখন আর তাকে সাধারণ জীপ্‌সি নর্তকী বলে না, সে তখন রেগুলার ড্যান্সার। তাদের মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য লোলা ফ্লোরেস, কারমেন আমায়া, ওলা সুঙ্গা।

ফ্লামেংগো, এক বিশেষ ধরনের তাল ও শব্দের সমন্বয়ে গান। ফ্লামেংগো সঙ্গীতের সঙ্গে খাপ খাইয়েই তৈরি হয়েছে ফ্লামেংগো নাচ। এই নাচ ও গানের উৎস সম্ভবতঃ ঈজিপ্ট। সঙ্গীত বিদ্যা নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন তাঁদের মতে এর আদি হচ্ছে ভারত অর্থাৎ ভারতীয় যাযাবররা ভারত ত্যাগের সাথে সাথেই নিয়ে এসেছে এই নাচ। তবে কাল ও স্থান ভেদে ভিন্নরূপে তা দেখা দিয়েছে। তাই ফ্লামেংগোর সুর ও তালে পাওয়া যায় ভারত আরব প্রভাব। জীপ্‌সিদের নাচ প্রায় সব সময়ই মূলতঃ এক। রুমানিয়ার যাযাবরদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বিশেষ করে নাচ; যুগোশ্লোভিয়ায় যাযাবরদের বৃষ্টির জন্য বিশেষ নাচ; রাশিয়ার যাযাবরদের ফসল কাটার বিশেষ নাচ— এ সব একই তাল ও সুরের রকমফের মাত্র।

ফ্লামেংগো গান গেয়ে যারা ইউরোপে নাম কিনেছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মানুয়েল দ্য ফাল্‌লা, মামানা। বলাই বাহুল্য, গীটারের সম্রাট মানিতা দ্য লা প্লাতা নিজেই যাযাবর। তাঁকে আমেরিকানরা বলে গীটারের যাদুকর। ইউরোপে এখন এই কথাটা প্রায়ই শোনা যায়— সেতারে রবিশঙ্কর, বেহালায় ইয়াহুদি মেহ্‌নুইন আর গীটারে মানিতা। অনেকের মতে মেহ্‌নুইন নিজেও এসেছেন জীপ্‌সি পরিবার থেকে, অবশ্য ধর্মে তিনি ইহুদি।

জীপ্‌সিদের আর একটা বিশেষ ধরনের পেশা ম্যাজিক বা সার্কাস দেখানো। ভারতবর্ষে ও আরবে এই ধরনের ভেল্কিবাজি ও ছোটখাটো মজাদার শারীরিক ভঙ্গিতে তারা খুব পটু। ইউরোপেও তারা আছে, তবে বিভিন্ন শহরের পুলিশ ও আইনের ফলে তারা এখন কোণঠাসা।

এদুয়ার্দো নামে একজন জীপ্‌সি যাদুকরের কাছ থেকে জানলাম যে কোন শহরের মোড়ে বা বাজারে অথবা ফুটপাতে যাদু বা ভেল্‌কিবাজি দেখাবার জন্য লাগে অনুমতি

পত্র। আর সেই অনুমতি পত্র পাবার যে ঝামেলা সে নাই বা লিখলাম। ফরাসীতে বুগলিয়ন সার্কাস দলের খুব নাম। মঁসিও বুগলিয়ন এখন যদিও গাভ্‌জো বা জেন্টলম্যান কিন্তু অরিজিনালি তিনি এসেছেন জীপ্‌সি পরিবার থেকে। ইউরোপের আর এক বিখ্যাত সার্কাসের মূল আকর্ষণই হচ্ছে তার জোকার বা ক্লাউন, জাভাতা। জাভাতার নাম ইউরোপের সবাই, বিশেষ করে ফরাসীদের প্রায় মুখস্ত। এই জাভাতা নিজেও এক যাযাবর। সার্কাসদল সাধারণতঃ এক জায়গায় থাকে না, ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, নতুন দেশ নতুন মানুষ। জীপ্‌সিদের কাছে সার্কাস দল সব সময়ই প্রিয়। সার্কাসে কোন রকমে একটা সুযোগ পাওয়া সত্যি সৌভাগ্যের বিষয়।

পেশা এদের যাই হোক না কেন, আসলে এরা অর্থ উপার্জন করে পেট চালাবার জন্য। বড়লোক হবার বাসনা এদের কারোরই নেই। মেয়েরা সারাদিনে যা উপার্জন করে ক্যারাভ্যানে ফেরার আগেই তা খরচ করে ফেলে সংসারের জিনিসপত্র কেনার ব্যাপারে। ব্যাংকে জমা বলতে এদের কিছু নেই। সে কারণেই এরা কাজ করে দিন-রাত। সেটাই এদের স্বভাব। সমাজ বা প্রকৃতির বিরুদ্ধে তাদের এতটুকু অভিযোগ নেই। এরা যখন খায় তখন মনে করে দিনের এটাই লাভ, কালকের ভাবনা কালকে হবে। জিভ দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি।

* * * *

এদুয়ার্দোর সাথে কয়েকদিন

এদুয়ার্দোর সাথে আমার খাতির হয়েছে। হাত-সাফাইএর যাদুকর এই লোকটি। নয়টি ছেলেমেয়ে নিয়ে তার সংসার। আমি নিজে যাদুকর নই বটে, তবে যাদু দেখতে আমি খুব ভালবাসি। হঠাৎ আমি তাকে একটা অনুরোধ করে বসলাম,

—তোমার সাথে আমাকে একদিন শহরে নিয়ে যাবে। অবশ্যই আমি তোমাকে সাহায্য করবো। তোমার সাথে আমি একটা দিন কাটাতে চাই।

ও আমার প্রস্তাবটা শুনলো বটে, কিন্তু কিছুতেই রাজি হতে চাইছে না। আমি ওর মনোভাবটা বুঝতে পারলাম, প্রথম অসুবিধা হচ্ছে পেশাগত। আমি যদি ওর সাথে থাকি তাহলে ওর যাদুর কৌশল আমি ধরে ফেলতে পারি, আর দ্বিতীয় হচ্ছে ওর কন্যাদের ব্যাপার, বড় মেয়ের বয়েস উনিশ-কুড়ি হবে। এমতাবস্থায় এক উড়ো ব্যক্তিকে ক্যারাভ্যানে না ঢোকানোই মঙ্গল। ওর মনের ভাবটা বুঝে আমি নিজেই মুখ ফুটে অনেকটা ওরা সমস্যার সমাধানের সুর টেনে অতি আন্তরিকতার সাথে বললাম,

—তোমার মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি। বিশেষ করে বাপ হয়ে মেয়েদের রক্ষা ও মঙ্গল বিধানই তোমার কাজ। তবে আমাকে বিশ্বাস করতে পারো। আমি এর আগেও জীপ্‌সিদের সাথে থেকেছি। আর মেয়েদের বিষয়ে আমি খুব বেশি উৎসাহী নই। আমার কথাতে তুমি বিশ্বাস বা অবিশ্বাস কর সে তোমার ব্যাপার, তবে আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি আমার তরফ থেকে তোমার কোনোরকম মানহানি

হবে না। তোমার দ্বিতীয় সমস্যাটাও আমি বুঝতে পারছি— যাদুকর হবার ইচ্ছে আমার কোনোদিনই নেই, তবে তুমি যদি চাও তো আমি তোমাকে কয়েকটা যাদু দেখাতে পারি...

—তাই নাকি?— আমাকে থামিয়ে দিয়েই সে প্রশ্ন করল। অর্থাৎ আমার সব কথাগুলোর মধ্যে শেষ কথাটা ওর মনে যেন বিঁধে গেল। বাকি প্রসঙ্গ ছেড়ে দিয়ে ও আমার প্রতি উৎসাহিত হল।

—না, আমি কোনোদিন যাদুকর হবার চেষ্টা করিনি, তবে কিছু কিছু কৌশল জানি।

—কোন ধরনের যাদু তুমি জানো? সে খুবই উদ্‌গ্রীব।

আমি একটু ভেবে নিলাম। তারপর মনে মনে হিসাব করতে লাগলাম কোন কোন ধরনের খেলা আমি জানি। আমার দাদার এক যাদুকর বন্ধুব দৌলতে আমি কিছু হাত-সাফাই শিখেছিলাম। ভদ্রলোকের নাম ম্যাজিসিয়ান এন কে বোস। দিল্লিতে এককালে তিনি খুবই পবিচিত ছিলেন। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের আমলে তিনি বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ভবনে ভারতীয় যাদু দেখাতেন। বর্তমানে অবশ্য তিনি চাকরী উপলক্ষে রুরকেল্লায় থাকেন। সেখানেই তাঁর সাথে আমার ব্যক্তিগত পবিচয়। পৃথিবীতে চলার পথে হয়তো কাজে লাগতে পারে এই ভেবেই বোসদা আমাকে কযেকটি কৌশল শিখিয়ে দিয়েছিলেন। বলাই বাহুল্য যে, তাঁর সেই সামান্য হাত-সাফাই আমার চলার পথে বিশেষ সাহায্য করেছে— বিশেষ করে ছোটদের ক্ষেত্রে। এখানেও আবার এসেছে সুযোগ। তাই হঠাৎ বললাম,

—আমি আগুন খেতে পারি।

—বল কি?

এদুয়ার্দো'র চোখ তো ছানাবড়া! আমার দিকে এগিয়ে এসে কাঁধে হাত দিয়ে অতি ঘনিষ্ঠ ও অনেকদিনেব পুরনো বন্ধুর মতো করে বলল— সত্যি বলছ যে তুমি আগুনের খেলা জানো?

তার কথা শুনে আমি একটু গম্ভীর হবার ভান করে বললাম,

—আগুনের খেলা নয় —আগুন খাওয়া।

প্রথমে আমি ভেবেছিলাম যে এদুয়ার্দো হয়তো আগুনের এই কৌশলটা জানে, কারণ এটা এমন কঠিন কিছু নয়। আফ্রিকায় দেখেছি সাধারণ গ্রামীন উৎসবে ছেলেরা আগুন খাওয়ার খেলা দেখায়। তাই আশ্চর্য হয়ে গেলাম যখন শুনলাম যে এদুয়ার্দো এই সাধারণ খেলাটা জানে না। খুব আনন্দিত হয়ে মনে মনে বোসদাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানালাম।

ঠিক জায়গামতই আমি টোপটা ফেলেছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঠিক হয়ে গেল আমাদের প্রোগ্রাম। আমি কথা দিলাম সেইদিন বিকেলেই বালুচরের জমায়েতে আমি

আগুনের খেলা দেখাবো। আমার খেলা দেখে ও যদি খুশী হয় অবশ্যই ওর সাথে আমাকে বিভিন্ন শহরে নিয়ে যাবে। সন্ধ্যার পর খেলাটা দেখতে হবে, কাজেই আমি তৈরী হতে লাগলাম। আমার যা দরকার তা এদুয়ার্দোই জোগাড় করে দিল— একটা লোহার শিক্, ন্যাকড়া আর কেরোসিন তেল। মূল কৌশলটা আসলে কিছুই নয়, একটু প্র্যাক্টিশের দরকার— এই আর কি।

বালুচরের গোল বৈঠকে আমি আমার জানাশোনা সকলকেই আমন্ত্রণ জানিয়েছি। এখানে পয়সা আদায় করার কোনো ব্যাপার নেই, শুধু আনন্দদানই উদ্দেশ্য। যাদুকর এদুয়ার্দোই শুরু করল— শুরু করল তার ছেলে ও মেয়েদের দিয়ে, পুতুলের খেলা, গলা কাটা, তাসের ম্যাজিক। তারপরই শুরু হ'ল আমার। আমি ধুতিটা মালকোচা দিয়ে পরে নিয়ে ধুনুচি নাচের ভঙ্গিতে লাফিয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম আগুনের পাশে। তারপরই বিরাট এক যাদুকরের ভঙ্গিতে মশালটা জ্বালিয়ে নিয়ে অতি সুস্বাদু আইস্‌ক্রিমের মতো চাট্‌তে লাগলাম আগুনের জ্বলন্ত লেলিহান শিখাটাকে। তারপর আগুন খাওয়ার শেষে সবাইকে দেখালাম আমার জীভ— তার মধ্যে এতটুকু কাবচুপির ব্যাপার নেই। সবাই ধন্য ধন্য করে উঠল। আমার যাদুকর বন্ধু আমাকে জড়িয়ে ধরল— যেমন করেই হোক তাকে খেলাটি শিখিয়ে দিতেই হবে...।

যাদুকর তার প্রতিজ্ঞা রেখেছে, তার পরিবাবের সাথে পূর্বের কথামত আমাকে শহরে নেবার জন্য প্রস্তুত। ঠিক হল যে আমরা তিন-চাবদিনের জন্য বেরিয়ে পড়বো। একদিন খুব ভোরে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। উদ্দেশ্য মারসেই। মারসেই এখান থেকে মাত্র শ'খানেক কিলোমিটার। ক্যারাভ্যানে যদিও বসবার ও শোবার জায়গা প্রচুর, কিন্তু রাস্তায় চলাকালীন ক্যারাভ্যানে সওয়ারী রাখা আইনত নিষিদ্ধ। ক্যারাভ্যানটাকে টানছে একটা শক্ত ইঞ্জিনের স্টেশন ওয়াগন, গাড়ীটা চালাচ্ছে যাদুকর নিজেই, তার পাশে তার স্ত্রী ও ছোট ছেলে, আমি পেছনে বইলাম তাব বাকি আটটি ছেলেমেয়েদের সাথে।

আমি ফরাসী ভাষা মোটামুটি কাজ চালাবাব মতো জানি, কিন্তু জীপ্‌সিদের সাথে অনর্গল কথাবার্তায় অনভ্যস্ত। এই জীপ্‌সিরা ফরাসী ভাষায় কথাবার্তা বলে বটে, সেটা ঠিক ফবাসী ভাষা না বলে বলা যায় ডায়লগ্। যে দেশে থাকে সেই দেশের ভাষাটাকে একটু রদ-বদল করে জীপ্‌সীবা তাদের ভাষা ঠিক করে ফেলে। এদের ভাষার মধ্যে বিভিন্ন দেশের শব্দ মেশানো। স্পেন, আরব, গ্রীক ইত্যাদি শব্দ হরদমই পাওয়া যায়। এমন কি কিছু কিছু ভারতীয় শব্দ পর্যন্ত। বাংলার 'বড়' শব্দটাকে এরাও ব্যবহাব করে, তার অর্থও এক। অন্যান্য শব্দের মধ্যে চামচ, বাহার, গোল, সোনা, ভূত, আচ্ছা, ঠিক, ছুরি ইত্যাদি আমি নিজের কানেই এসব শব্দ ব্যবহার শুনেছি। এতেই মনে হয় যে এরা মূলত ভারতীয়। এদের রূপকথা ও ধর্মের মধ্যেও প্রচুর ভারতীয় ভাব ও শব্দ পাওয়া যায়।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমরা মারসেইতে এসে পৌঁছলাম। মারসেই বিরাট বন্দর, ইউরোপের তৃতীয় বৃহত্তম বন্দর। ভারত বা ওরিয়েন্ট থেকে যত জাহাজ সুয়েজখাল দিয়ে ভূমধ্যসাগরে ঢোকে বা ভূমধ্যসাগর থেকে বার হয় তার প্রায় সবগুলোই মারসেই'তে এসে নোঙর করে। বিশেষ করে আফ্রিকার সাথে মূল ইউরোপের যোগাযোগের জন্য মারসেই বন্দরের স্থান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ফরাসী বা জার্মানী, সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রিয়া ও অন্যান্য অনেক দেশের পেট্রোল-জাহাজ এসে ভিড়ে এই বন্দরে। আলজেরিয়া (Algeria) যখন ফবাসীর অধীনে ছিল সেই সময় এই বন্দর দিয়ে বছবে যাতায়াত করতো প্রায় ১৮ লক্ষ যাত্রী। আজকাল বছরে প্রায় ৬০,৯২,৭০০০ টন মাল এই বন্দর দিয়ে যাতায়াত করে। ৫৯টা কমিউনিটি নিয়ে গঠিত এই মারসেই। এর লোকসংখ্যা প্রায় ১৩,৫০,০০০। মারসেই'এর বিমানবন্দর ফরাসীর তৃতীয় বৃহত্তম বিমান বন্দর।

আমি পবিসংখ্যান লিখতে বসিনি, শুধু মাবসেই সম্পর্কে মোটামুটি একটা আইডিয়া দেবার জন্যই এটা লেখা।

জনারণ্য মারসেই'এর পথঘাট। মাবসেই মোটেই আধুনিক শহর নয়। প্রাচীন মারসেই'কে ঘিবে আশে-পাশেব শহবতলীকে নিয়ে গড়ে উঠেছে নতুন মারসেই। এখানকার অতি-আধুনিক রিফাইনারিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাগরের ধারে রয়েছে অসংখ্য সাবি সারি জাহাজ, আর হাজার হাজাব ছোট-খাটো লঞ্চ বোটের ভীড়। এখানকাব জাহাজ তৈরির কাবখানাও জগৎ-বিখ্যাত। এখানকার কোনো কোনো গলি ঠিক কলকাতাব বড়বাজারের মত। একটা লরী ঢুকলেই ব্যস্— যাতায়াত সব বন্ধ। চাবদিকে দোকানপাট, আর ব্যবসাদারদের চীৎকারে গম-গম করছে। আবার কোনো জায়গায় বিরাট এভেন্যু—চৌরঙ্গী বা বালিগঞ্জ এলাকাব মত। ঠিক সাগরের ধারেই এই শহরটি, অথচ বম্বের মতো বীচ্ এখানে নেই; সবই ব্যবসায়ী জাহাজ বা নৌকোয় ভর্তি। ফরাসীর বিখ্যাত নদী বোন— সুইজাবল্যান্ড থেকে শুরু করে দক্ষিণ ফবাসী হয়ে এই মারসেই'তে এসে সাগবে পড়েছে। বলতে গেলে, রোনের এই সঙ্গমকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে মাবসেই বন্দর ও শহব।

মাবসেই'এব বন্দরে আছে হাজাব হাজাব মাছ ধবাব জাহাজ। মাছের কারবাবিদেব জন্য আলাদা একটা এলাকা রয়েছে। মারসেই'এর মাছ খুব বিখ্যাত। এখানকার হোটেল ও রেস্তোরাগুলো রকমারি মাছের মেনুতে ভর্তি।

রান্নাবান্নায় ফরাসী লোকেরা খুব পটু। ইউরোপ কেন, পৃথিবীর সবাই জানে যে ফরাসী-খাবার ও রান্নার নাকি তুলনা চলে না। প্যারিসের ফ্যাসান ও রান্না দুই-ই ফরাসীর অন্যতম্ প্রধান ব্যবসা। ফরাসীদেব মধ্যে আবার মারসেই'এর খাবার জন্য খুব বিখ্যাত। আমাদের দেশে যেমন না খেয়ে লোক মরে এখানে ঠিক তার বিপরীত —অর্থাৎ এখানকার শত শত লোক মারা যাচ্ছে অত্যধিক খাওয়ার দরুন। অত্যধিক

খাওয়ার ফলে মেদ ও চর্বি বৃদ্ধি, অথবা প্রোটিন বৃদ্ধির ফলে শরীর যন্ত্রে সর্বনাশ ঘটছে। হাসপাতালে ক্লিনিকে রোগী ভর্তি। রোগের প্রধান কারণ খাওয়া। ডাক্তারদের মতে এখন যান্ত্রিক যুগ, আগের মত আজকাল আর শারীরিক পরিশ্রম করতে হয় না। কাজেই অত প্রোটিনজাত অথবা মেদজাত খাবার খাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু ডাক্তারদের কথা শুনছে কে? মরতে যখন একদিন হবেই তখন পেট ভর্তি করে মরাই ভাল। রেস্টুরেন্ট ফরাসীদের অতি প্রিয় স্থান, কথায় কথায় তারা রেস্টুরেন্টে যায়। খাওয়া ছাড়া মারসেই'এর লোকেদের বদনাম আছে, তারা নাকি কথায় বাচস্পতি আব আড্ডাবাজ। কিন্তু মারসেই'এর সমৃদ্ধি দেখে কে বলবে যে এরা কুঁড়ে। আবার আসা যাক ফবাসীদেব মাছ-প্রীতি প্রসঙ্গে। দক্ষিণের লোকেবা মাছ খুব ভাল পায়। তাবা না খায় এমন মাছ নেই। শুধু মাছ নয়, সামুদ্রিক জীব মাত্রেই তাদেব খাদ্য। মারসেই'এব মাছেব বাজারে ঢুকেই আমি অবাক হলাম। মাছেব বাজারেব এক অংশ হচ্ছে শামুকের বাজার। শামুক-গুগলি-ঝিনুক আব এই ধবনেব বহু সামুদ্রিক পদার্থে ভর্তি। আমার কাছে যদিও এগুলো অখাদ্য, কিন্তু ফবাসীদেব কাছে তা অত্যধিক উপাদেয় ও মূল্যবান সামগ্রী। মনে মনে ভাবলাম যে এবা না খায় কি?

এই শহরেই আমি প্রথম দেখলাম ইউরোপের সবচেয়ে দামী ও সৌখিন বোট। আমি বলবো যে কলকাতাব মতই এই শহরটাও এ সিটি অফ্ কন্‌ট্রাস্ট। একদিকে বয়েছে আকাশচুম্বী প্রাসাদ আর অন্যদিকে অতি সস্তাদরের বস্তি বাড়ী; রাস্তাব ওপর দিয়ে যাচ্ছে বহুদিনেব পুবানো সাইকেল আব তারই পাশে বিরাট আমেরিকান এয়াবকন্ডিশন্ড মোটর। এ ধবনের কন্‌ট্রাস্ট দেখে দেখে এখন অভ্যস্ত হয়ে গেছি।

এদুয়ার্দো খুব আস্তে আস্তে গাড়ি চালাতে লাগলো। আব কখনো কখনো গাড়ি দাঁড করিয়ে পায়ে হেঁটে এদিক-ওদিক ঘুরতে লাগলো। শহবেব মূল সমস্যা হচ্ছে পার্কিং-এর। আমিও ওব সাথে এক নজরে মারসেই শহবকে জানতে লাগলাম। জিতানবা ক্যাবাভ্যানকে বলে কারাভান, আমিও এখন থেকে তাই লিখবো। আমাদের কাবাভানটাকে দাঁড় করানো হল শহরের উত্তর দিকে একটা আবর্জনা ক্ষেত্রের পাশে— এছাড়া উপায় নেই। আর্দো (এদুয়ার্দোর সংক্ষিপ্ত নাম) বহুবাব এ শহরে এসেছে, এখানকাব আটঘাট সব মুখস্থ, বিনা পয়সায় এব চেয়ে ভাল বন্দোবস্ত আশা কবা যায় না। মোটরের পেছন থেকে কারাভানটাকে আলাদা করে রাখা হল, তারপর তার পরিবারকেও দু-ভাগে ভাগ করা হল। আর্দো, তার বড় মেয়ে ও দুই ছেলে ও আমি একদলে, আর বাকী সবাই যোগ দিল তার স্ত্রীর সাথে। আমরা শহরে ঢুকবো যাদু দেখাবার জন্য আর তার স্ত্রী ও অন্যান্যরা যাবে কাজের ধান্দায়। বড় বড় শহরে টুকরো কাজের অভাব নাই। বাসন মাজা, ঘর ধোয়া, দেয়াল পরিষ্কার করা, এই ধরনের ছোট-খাটো কাজ মাঝে মাঝে পাওয়া যায়, তাতে কিছু পকেট-খরচা চলে।

সাগরের ধারে একটা গোল চত্বরের পাশেই আমরা এসে থামলাম। আমাদের সাথে সাথেই রয়েছে যাদু দেখাবার যাবতীয় সরঞ্জাম। জায়গাটা অপেক্ষাকৃত নোংরা, শহরের বস্তি এলাকার মতো। আমরা সরঞ্জাম পেতে বসলাম। ৫ মিনিটের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে গেল। হঠাৎ আর্দোর চেঁচানো শুরু হ'ল— 'পাঁচ মিনিট, হ্যাঁ— মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যেই দেখতে পাবেন বিনাপয়সার যাদু....' নাতালি হঠাৎ তার কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে শুরু করে দিল ফ্লামেংগোর অঙ্গভঙ্গি। ফাঁকা মাঠেই যাদুকর শুরু করে দিল তার ভেল্কিবাজি, আপেল কাটার খেলাতেই সে খুব দক্ষ; আপেলটা শূন্যে ছুড়ে দিয়ে মাটির ওপর দুবার ডিগবাজি দিয়ে আবার সেটাকে লুফে নেয়া। তার ছেলেরাও এ খেলায় ওস্তাদ। আর্দো খেলা যখন শুরু করেছিল তখন আশপাশে একজনও ছিল না— কিন্তু দু'মিনিটের মধ্যেই অনেকটা বাঁদর নাচ দেখার মতোই জনতা ভীড় দেখা দিল। আর্দো আমাকে অনুরোধ করল আমার সেই আগুন খাওয়ার খেলাটা দেখাতে। আমিও তৈরিই ছিলাম। মশালটা কেরোসিন তেলেতে ডুবিয়ে তারপর আগুন ধরালাম। ম্যাজিসিয়ান বোসদার মতে— 'প্রেজেন্‌টেশনই হচ্ছে যাদুকরের চাবি কাঠি', তাই আমি মশালটাকে নিয়ে একটু এদিক ওদিক ঘুরিয়ে লাফিয়ে নেচে তারপর হঠাৎ আইসক্রীম চোষার মত সেটাকে জিভে ঠেকাতে লাগলাম— আর্দো চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে আমার বাহাদুরির প্রশংসা করতে লাগলো.... আমার খেলাটা থামতেই আর্দো নাতালি ও তার দুই ছেলে শুরু করে দিয়েছে টুপি পেতে পয়সা আদায়, যে যা দেয় তাই যথেষ্ট। সকলকেই ওরা ধন্যবাদ দিতে লাগলো "মারসি মারসি" বলে। সবশুদ্ধ আমাদের সময় নিয়েছে সাত থেকে দশ মিনিট, অর্থ যা আদায় হল মনে হয় আর্দো তাতে বেশ খুশী। দু'মিনিটের মধ্যে আমাদের জিনিসপত্র গোছানো হয়ে গেল— এবার স্থান পালটাতে হবে। আর্দো অভিজ্ঞ মানুষ। তার মতে দশ মিনিটের বেশি না নেওয়াই মঙ্গল। আইনত ফ্রান্সের পথে-ঘাটে এ ধরনের লোক জমায়েত করা দণ্ডনীয়। অতএব পুলিস আসবার আগেই সরে পড়তে হয়। ওর কথা শুনে আমার মনে পড়ল কলকাতার চৌরঙ্গীর কথা। সেখানকার ফুটপাতে যারা ফেরি করে তাদের অবস্থাও ঠিক এই ধরনের। চলতে চলতেই নাতালি ও তার দুই ভাই পয়সা গুণে ফেলল। আনন্দে লাফিয়ে উঠে নাতালি ঘোষণা করল একশ তিন ফ্রাঙ্ক। বোঝা গেল কারবারটা ভালই হয়েছে। প্রায় আধঘণ্টা পর আমরা হেঁটে শহরের আর এক এলাকায় এসে হাজির হলাম। আবার শুরু হল যাদুকরের আয়োজন ... আগের মতই সে চীৎকাব করে লোক জড়ো করতে লাগলো। নাতালি নাচতে লাগলো, দুই ছেলে হাততালি দিয়ে গাইতে লাগলো। তারপরই শুরু হল ওর আপেল কাটার খেলা। এবারে আমি আর আগুনের খেলাটা দেখালাম না।

পাঁচ মিনিট পর আমাদের খেলা থামল। এবারে আমাদের লাভ হল সাতাশ ফ্রাংক। মন্দ নয়, এমনকি পাঁচ ফ্রাংক উঠলেও আমাদের লাভ। জীপ্‌সিরা অল্পতেই সন্তুষ্ট— যা আসে সেটাই ভগবানের দান। এর চেয়ে উৎকৃষ্ট মনস্তত্ত্ব আর কি হতে পারে।

এবারে আমবা এসে হাজির হলাম আব একটা এলাকায়। দু-দিকে মাছ ধরার গাদা-বোট ট্যাগ্‌-বোটে ভর্তি। কোন বোটের ওপর বিরাট বিবাট জাল শুকোচ্ছে। আবার কোন কোন বোটের ওপব ইলেকট্রিকের তাবের জাল মেরামতি হচ্ছে। মাছের উগ্র গন্ধে নাক জ্বলে যাবার উপক্রম। অনেকটা কলকাতাব চীনেবাজারের শুটকি মাছের এলাকার মত। যারা শুট্‌কি মাছের ভক্ত আমি জোব কবে বলতে পারি যে তারা নিশ্চয়ই এইধরনের হাওয়া ও পবিবেশকে প্রশংসা কববে, কিন্তু আমার কাছে অসহ্য। কিছুক্ষণেব মধ্যেই আমবা ছোট একটা কাণাগলিতে এসে থামলাম। তখন প্রায় দুপুর দেড়টা বাজে। সকলেবই পেটে ছুঁচোয় ডন মাবছে। উদ্দেশ্য কিছু কিনে খাওয়া। এদুয়ার্দো ও নাতালিব মতে সবচেয়ে সস্তাদবেব খাওয়া হচ্ছে স্যান্ডউইচ্। এদেব ভাষায় বলে প্যাঁ-বানিযা ও পিসাল্যাদিয়েব। প্যাঁ-বানিযা হচ্ছে গোল পাউরুটি, তাব ভেতবটা ফাঁকা কবে তাব মধ্যে ছানা-টমেটো সস্ মাছ ভাজা ও সবসে বাটা ভর্তি। আর পিসালাদিযেব হচ্ছে লম্বা লাঠির মত পাউরুটিব মধ্যে কলাব মত শুকনো স্যাকা মাংস ভর্তি। দুটোই উপাদেয খাদ্য। আমবা পাঁচজনেব জন্য পাঁচটা প্যাঁ-বানিয়া কিনে খেতে খেতে চললাম। হাঁটতে হাঁটতে আর্দো আমাকে জিজ্ঞাসা কবল,

—তুমি লেজ-হুইটব কোনদিন খেয়েছো? —জিনিসটা কি, আমি সাথে সাথে প্রশ্ন করলাম।

—লেজ হুইটব হচ্ছে একবম সামুদ্রিক ঝিনুক, খেতে চমৎকাব। তোমাকে লেজ হুইটর খাওয়াব।

—ঠিক আছে, বলে আমি বাজি হয়ে গেলাম। মনে মনে ভাবলাম -- ঝিনুক সে যত স্বাদেবই হোক না কেন সে ঝিনুকই থাকবে।

আমাদেব পরিকল্পনা পাল্টালো অর্থাৎ পাউরুটির বদলে ঝিনুকেব দোকানেব দিকে চললাম। বিশেষ এলাকায় এই ঝিনুকের দোকানগুলো বাস্তাব পাশেই ছোট ছোট স্টলের আকাবে সাজানো। ছোট বড ও বিভিন্ন রকমেব ফলেব মত সাজানো থাকে ঝিনুকগুলো। ছুবি দিযে তাকে খুলে ভেতরে একটু লেবুর রস দিযে সবাসরি ভেতবকার তরল পদার্থটাকে মুখেব ভেতব ঢেলে দিতে হয়। আমি দাঁড়িযে দাঁড়িযে ভাল করে দেখতে লাগলাম। অনেকটা বম্বেব বীচে দাঁড়িয়ে ফুচকা খাওয়াব মত অবস্থা। আর্দোর ছেলে-মেয়েদের মজা আর দেখে কে? এগুলো কিনতে হয় ডজন হিসেবে। এর সাথে ইচ্ছে করলে মাখন ও পাউরুটিও খাওয়া চলে। পাউরুটিব ফবাসী নাম 'প্যাঁ', বাংলায় বলা হয় রুটি; সম্ভবত এই প্যাঁ-রুটি হতেই পাউরুটির নাম এসেছে। এই বড় বড় ঝিনুকগুলো ওবা লেবুর রস দিয়ে কাঁচাই খায়। অনেকটা কাঁচা ডিমের মত স্বাদ। তবে আমার কাছে মোটেই মুখরোচক লাগল না। যারা ঝিনুক-খাইয়ে তারা বলে এ হচ্ছে ফরাসীর এক সম্ভ্রান্ত খাওয়া। অবশ্য বেশ কয়েকবার না খেলে তার মর্ম বোঝা দায়।

সন্ধ্যের দিকে আমরা ফিরে এলাম আমাদের কারাভানের কাছে। আর্দোর বউ ও তার ছেলেমেয়েরা এরই মধ্যে এসে পৌঁছেছে। কারাভানের পাশেই নজরে পড়ল প্যাকিং বাক্সেব কাঠ দিয়ে আগুন জ্বালানো হয়েছে। তারই ওপর একটা তারের জালের ওপর পোড়ানো হচ্ছে বেশ কিছু আলু, পিঁয়াজ, বড় মিষ্টি লঙ্কা। তারই পাশে গবম জল রয়েছে ফুলের চা করবার জন্য। জিতান্‌রা ছোট ছোট বিভিন্ন ধরনের বনফুল সংগ্রহ করে তা শুকোয়। তারপর চা এর মত সেদ্ধ করে তার জলটাকে মধু বা চিনিব সাথে পান করে। দক্ষিণ ফ্রান্সের চাবপাশে দেখতে পাওয়া যায় মৌরীব গাছ। যেখানে সেখানে এই মৌরীর গাছ জন্মায়। জিতান্‌রা সময় পেলেই সেই মৌরী সংগ্রহ করে ও তা বাজারে বিক্রি করে। গবম মৌবীর জল পেটের পক্ষে নাকি খুব ভাল। জিতান্‌বা প্রকৃতিব পূজারী— এদের অসুখ বিসুখের সময়ও ওরা ব্যবহার কবে প্রাকৃতিক ওষুধ ও পথ্য। ওদের মতো পাকা প্রাকৃতিক চিকিৎসক পৃথিবীতে বিবল। আর্দোরা বোজ মাছ বা মাংস খায না। তবে সাগরের কাছাকাছি থাকলে অবশ্য আলাদা কথা; সেখানে সব্জীর থেকে মাছ সস্তা। জীপ্‌সিদেব কাছ থেকে বোগ সম্পর্কে একটা ভাল থিওরি জানলাম, প্রকৃতিব সাথে শবীরের ছন্দপতনকেই বলে বোগ। অল্পকথায় কি সুন্দর ব্যাখ্যা! আমবা একটা মাঠের ওপর বসে খাওয়া-দাওয়া করছি, এমন সময আর্দোব কাবাভানের ঠিক কাছেই আব একটি কাবাভান এসে হাজিব হল। আমবা সবাই মিলে সেদিকে তাকিয়ে রইলাম— আর্দোকে জিজ্ঞাসা কবলাম,

—এবাও কি জিতান্ নাকি।

—নিশ্চয়ই, জিতান্ ছাড়া এ ভাগাড়ে আর কাবা গাড়ী থামাবে বলো—? অনেকটা অনুযোগেব সুবে সে জবাব দিল।

হঠাৎ চেঁচিযে উঠল মাম্‌মা (আর্দোর স্ত্রী)— মাট্‌চো! মাট্‌চো— মাট্‌চো—মাট্‌চো... সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল। কাবাভানটা ঠিক মতো পার্ক কবেই গাড়ীব ভেতর থেকে লাফিযে নিচে নেমে পড়ল ছ'জন। তার মধ্যে দু'জন যুবক, তিনজন যুবতী আব একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক। তাদের দেখেই মনে হল এরা যেন আনন্দেব বন্যা। পরস্পর পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল। আমিও তাদের সাথে পবিচিত হলাম। আর্দোর বন্ধু, অনেকদিনের জানা-শোনা। মাট্‌চো পরিবারেব সকলেই আর্দো পরিবারকে চেনে। জিতান্‌রা যে শহরেই যাক না কেন, পার্কিং করার জায়গা তাদেব সব সময়ই বাধাঁ; কাজেই এ ধরনেব মিলন তাদের হামেশাই হয়।

বুড়ো মাট্‌চো, তাব দুই ছেলে দুই মেয়ে আর বড় ছেলেব বৌ। অতি অল্প সমেয়র মধ্যেই তারাও রান্না-বান্নার তৈরী হয়ে পড়ল, আগুনতো জ্বালানোই ছিল, কাজেই শুধু রান্নার প্রস্তুতি। মাট্‌চোদের সঙ্গেই ছিল অতি টাটকা সার্দিন মাছ। মাছগুলো চারা-পোনার মত দেখতে, তবে খেতে খুবই সুস্বাদু। সার্দিন পুড়িয়ে ঝলসে তাকে

পাউরুটির সাথে এরা খেতে লাগলো। আমি লক্ষ্য করে দেখলাম যে মাট্‌চোরা কেউই আমাকে বিশেষ পছন্দ করছে না; আমি যেন ওদের এই আড্ডায় এক অবাঞ্ছিত অতিথি। সেটাই স্বাভাবিক। এখন আমাব কর্তব্য ওদের মন যোগানো। আর্দো আমার প্রসঙ্গে তাদের বলতে লাগলো, বিশেষ করে আমিও যাযাবর আর আগুনের খেলায় খুব দক্ষ। মনে মনে ভাবলাম যে একমাত্র উপায় আমার খেলা দেখানো। আমি উপযাচক হয়েই আমার মশালটা নিয়ে এলাম, সেটাকে কেরাসিনের বোতলে ডুবিয়ে আগুন জ্বালালাম— সবাই এবার আমার দিকে তাকাতে বাধ্য— সকলকে অবাক করে দিয়ে এইবার আগুনশুদ্ধ মশালটাকে মুখে পুরে দিলাম...। সবাই হাততালি দিয়ে উঠল, আমিও জিতান্‌দের ভঙ্গিতে মাথা নিচু করে তাদের অভিবাদন জানালাম।

সবাই ক্লান্ত, কাজেই তাড়াতাড়ি শোবার বন্দোবস্ত কবতে লাগলাম। আমি ভেবেছিলাম যে আমাকে নিয়ে বাতে এদেব সমস্যা বাধবে, কিন্তু সবই এদেব ছকে বাঁধা। মোটরের সামনেব দুই গদিব একটা লম্বা তক্তা পেতে দিয়ে আর্দো আমাকে এক সেলাম ঠুকে দাঁড়ালো— হুজুব বিছানা তৈবী। আমিও তাকে অভিবাদন দিয়ে জানালাম— এ অধমও তৈরী। আমাব স্লিপিং ব্যাগটা সঙ্গেই ছিল, যাযাববদেব বাজসিক ব্যবস্থা...।

পরেবদিন আমাদেব ঘুম ভাঙল মুরগীব ডাকে। মাট্‌চোদেব অনেকগুলো মুবগী ওদেব কারাভানেই বয়েছে। ভোবেব ঘুম যত পাকাই হোক না কেন উঠতে হবেই। আমি উঠেই দেখি মাম্‌মা ইতিমধ্যে কাঠেব উনোনে গরম কফি ও পাউরুটি সেঁকে ফেলেছে। আমার গাড়ীব দরজাব কাছে এসে আমার হাতে তুলে দিল এক বাটি গরম কফি--- আমি হেসে কৃতজ্ঞতা জানালাম। মাম্‌মা আমাব দিকে অতি অন্তবঙ্গতার দৃষ্টিতে চেয়ে বলল,

—গতকাল তুমি টাকা কুড়িয়েছ আর্দো, খুব খুশী; তুমি আজও যাবে তো?

—নিশ্চয়ই, সে আব বলতে।

মাম্‌মাব সাথে এর আগে কথা হয়নি, এই প্রথম সে উপযাচক হয়ে কথা বলল। আশ্চর্য বটে, এরা বাস্তার লোককে ধবে তাদের ভবিষ্যৎ বলে, গায়ে পড়ে কথা বলে, আর আমি তাদেব সাথে আছি অথচ আমাব সাথে তাদেব কথা বলতে লাগল প্রায় তিনদিন। ওর মেয়ে নাতালিতো এখনও কথা শুরু কবেনি।

ঘন্টাখানেকের মধ্যেই জিতান্‌রা তৈবী হয়ে পড়ল। যে যার নিজের জিনিষপত্র গুছিয়ে বেরিয়ে পড়লাম শহরেব উদ্দেশ্যে। পথে চলতে চলতে হঠাৎ মাথায় এক বুদ্ধি এল। আর্দোকে বললাম,

—আমি আরও একটা মজার যাদু জানি।

—কি বল— সে উৎসাহিত হল।

—আমি জিভ্ কেটে আবার তাকে জোড়া দিতে পারি।

—সেটা আবার কি জিনিস?

আমি এবার আমার স্কুলে থাকতে শেখা একটা কৌশলের কথা তাকে খুলে বললাম। আসলে খেলাটা খুব সহজ, তবে প্রয়োজনের মধ্যে চাই একটি ছাগল বা ভেড়ার জিভ। আমার কৌশলটা শুনে আর্দো আমাকে জড়িয়ে ধরল— তুই আমার সত্যিকারের বন্ধু। কিন্তু অসুবিধা হচ্ছে যে এই খেলাটার জন্য বিশেষ বচন ভঙ্গী ও সময়ের দরকার, বেশ কয়েকবার রপ্ত না করে এ খেলাটা দেখানো ঠিক হবে না। তবে আর্দো এ কৌশলটা আয়ত্তে আনবেই। আমরা শহরের অন্যদিকে যাওয়া ঠিক করলাম। মারসেই-এর এ অঞ্চলটা সমুদ্রের ধরে বটে, কিন্তু এখানে সমুদ্র যেন হঠাৎ পাহাড় থেকে নীচে নেমে গেছে। পাহাড়ের কোল ঘেসে রাস্তাটা ধরে এগিয়ে যাচ্ছি আর রাস্তার ওপাশেই বিরাট খাদের নীচে সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ছে পাহাড়ের গায়ে। এখান থেকে সমুদ্রের দৃশ্যটাও বড় চমৎকার। এটাই হয়তো মারসেই-এর বৈশিষ্ট্য। সমতলের বন্দর রাস্তা ধবে কিছুটা এগিয়ে গেলেই দেখতে পাওয়া যায় হঠাৎ খাদ। আমরা এবার এগিয়ে এলাম উত্তরের দিকে। যাদুকরের দল চলেছে তার নতুন যাদুক্ষেত্রের সন্ধানে। আগের দিনের মতো আজকেও আমাদের ভালই লাভ হয়েছে, অতএব কালকে ছুটি। জিতান্‌দের এই-ই হচ্ছে জীবন— পরপর দু'দিন যদি বেশ লাভ হয় তাহলে তিনদিনের দিন ছুটি।

সত্যি কথা— বেশী অর্থের প্রয়োজনটা কি? অর্থের জন্য তো বাঁচা নয়, বাঁচার জন্য অর্থ। যারা বড়লোক, যারা ভদ্র আর কুবের তাদের কাছে অর্থই জীবন, অর্থহীন জীবন মানেই প্রাণহীন দেহ। কাজেই আরও অর্থ চাই, আরও— আরও। জিতান্‌রা বলে— সমাজ গড়ে উঠেছে অর্থের ওপবে। সত্যি কথা— কিন্তু তাই বলে অর্থের জন্য জীবন দেওয়া— সেটা নেহাৎই অর্থপিশাচদের কারবার। আমরা পৃথিবীতে এসেছি আনন্দ করতে; নাচ গান আর হৈ-হল্লার মধ্যেই রয়েছে মহানন্দ। সেই আনন্দ-লহরীর পরশেই আছে ভগবানের লীলা।

পরেরদিন বুড়ো-মাট্টচোর সাথে আলাপ হল, তাকে ভদ্রলোক বলতেই সে রেগে গেল— খবরদার বলছি আমাকে ওই ভদ্রলোকদের দলে ফেলবি না! আমি জিতান্‌, আমি ভদ্রলোক নই। ও এমনভাবে রেগে যাবে আমি আশা করিনি। আমি সঙ্গে সঙ্গে অন্য প্রসঙ্গে এলাম,

—শুনলাম আপনি নাকি খুব ভাল চুবড়ি বুনতে পারেন।

—শুধু আমি নই, এ অঞ্চলের জিতান্‌ মাত্রেই বেত ও কঞ্চির জিনিসপত্র তৈরী করতে পটু।

—সত্যি অদ্ভুত কাজ! প্রশংসা করতেই হয়। আচ্ছা এই ধরনের কাজ শিখতে কি খুব বেশী সময় লাগে?

আমার কথা শুনে সে আমার মুখের দিকে তাকালো, তারপর অনেকটা ধমকের সুরে বলল,

—তুই দেখছি গাড়্জোদের মত কথা বলছিস— সব মানুষ কি সমান নাকি? এই দেখ, আমি এ সব নিজে নিজেই শিখেছি, অথচ আমার ছোট ছেলেকে অনেক শিখিয়েও পারছি না। আসলে আগ্রহ দরকার, আগ্রহ থাকলে সব সোজা। লোহাকেও পিটিয়ে সোজা করা যায়।

বাংলাতে যেমন তুই তুমি ও আপনি এই তিন রকম সম্বোধন আছে ফরাসীতেও তেমনি তুই ও আপনি এই দুই ধরনের সম্বোধন। ছোট বড় সবাই নিজেদের মধ্যে তুই-তুকারি করে আর অচেনাদের সাথে আপনি। আপনি ফরাসী ভাষায় 'ভূ', তুইকে বলে 'তু'। জিতান্‌রা নিজেদের মধ্যে কখনই আপনি শব্দ প্রয়োগ করে না। আমিও এদের দলভুক্ত, কাজেই এই দাদুতুল্য ভদ্রলোককে 'তুই' বলে সম্বোধন করতে বাধ্য হলাম। যদিও প্রথম প্রথম জড়তা আসে কিন্তু সবই অভ্যাসের ফল। ইংরেজীতে অবশ্য এ সমস্যা নেই, তাদের কাছে সবাই 'ইউ'।

বুড়ো মাট্‌চোর সাথে অতি সাবধানে আলাপ চালিয়ে যেতে লাগলাম। সাধারণতঃ নিজেদের কথা ওরা বাইরের লোককে বলা মোটেই পছন্দ করে না। আমাকে অবশ্য এরা ভারতীয় জিতান্ ভেবেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও....।

—এই ঝুড়ি বুনে যা আসে তাতে তোদের দিন চলে?

আমার কথা শুনে হো হো করে বুড়ো হেসে দিল।

—তুই বোকার মত প্রশ্ন করছিস, দিন না চললে আমরা বেঁচে আছি কি করে? তবে হ্যাঁ, যত দিন যাচ্ছে ততই আমাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। এই দেখ, আগে ঝুড়ি বুনে খোলা হাটে বসলেই পাইকাররা এসে সঙ্গে সঙ্গে কিনে নিত, আর আজকাল পাইকাররা নিজেরাই ঝুড়ি বানাবার জন্য কারখানা খুলেছে। আর ভদ্রলোকগুলোও এমন বোকা যে সেগুলো ভালভাবে না দেখেই কিনছে। আরে বাবা, আমাদের কোয়ালিটিই আলাদা। হাতের কাজ কি আর মেসিনে করতে পারে!

—তোরা কি এখানে প্রায়ই আসিস্?

—না, প্রায়ই আসা সম্ভব নয়। আমরা ঘুরি আর ঘুরি— বছরে তিন-চারবার মারসেই-তে আসি। শহরে আসার অসুবিধে নেই, তবে খরচ অনেক। আমার বাপের আমলে আমাদের ঘোড়ার গাড়ী ছিল, ঘোড়ার ঘাস হলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। কিন্তু আজকাল রাস্তাঘাটে ঘোড়ার গাড়ী চালানো নিষেধ। এটা মোটরের যুগ, কাজেই এই দেখ না, আমার ছেলেরাও অনেক চেষ্টা-চরিত্র করে এই কারাভানটা কিনেছে। গাড়ী আমার যুগেও ছিল, কিন্তু আজকালকার একটা পুরো সংসার তো গাড়ীর মধ্যে রাখা চলে না, তাই কারানভানটা কিনতে বাধ্য হয়েছি। মোটর দিয়ে সেটাকে টানতেও খরচা হয় প্রচুর। গাড়ী আর কারাভান পুষতে গিয়ে আমার ছেলেমেয়েদের দম বেরিয়ে যাচ্ছে....। একটু থেমে সে এক বিরাট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,

—কি আর করা যায়! জিতান্‌দের আর অন্য কোন পথ নেই।

—কেন, অন্য কোন পথ নেই কেন?

—তুই তো আর এদেশে থাকিস না, কাজেই বুঝবি কি করে? এই দুনিয়াটা হচ্ছে ভদ্রলোকদের দুনিয়া। যারা জন্মে চার দেয়ালের মধ্যে আর জীবনটাই কাটায় চার দেয়ালেব মধ্যে তারাই চালাচ্ছে দুনিয়াটা।

আমি অনেকটা না বোঝার ভান করে তার মুখের দিকে তাকালাম। সে বলে চলল,

—এই, ধর যে কোন একটা ভদ্রলোককে, জীবনে ওরা করে-টা কি? জন্মায় একটা বদ্ধ হাসপাতালের ঘরে, তাবপর একটু বড় হলেই যায় স্কুলে— সেটাও আর একটা চার দেয়াল। তারপব কলেজ ইউনিভারসিটি করে সে যখন বেরিয়ে আসে, ইতিমধ্যে সে তখন দুনিয়াটাকে দেখ্‌বার নজর হাবিয়ে ফেলেছে। জীবনেব পঁচিশ তিরিশ বছব তারা শিক্ষাব জন্য থাকে দেয়াল-বদ্ধ হয়ে। এক বাড়ী থেকে আর এক বাড়ী তারা পবিবর্তন করে বটে, কিন্তু তার সেই চাবদেয়াল সব সময়ই তাদেব ঘিবে থাকে। বাকি জীবনটাও তাবা চাকরি করে কাটায়। ভদ্রলোকেরা সব সময়ই চাকবি কবে, তাবা থাকে চাব দেয়ালের মধ্যে। ভগবানেব সৃষ্টি এই পৃথিবী, তার যে প্রকৃতি, মুক্ত আকাশ, বন জঙ্গল, ভদ্রলোকেরা তাব সম্পর্কে অনেক লেখে, তাব চেয়েও বেশী পড়ে; কিন্তু উপলব্ধি করার শক্তি তাদেব কোথায়! তাবা আমাদেব কথা বোঝে না— তারাই দিনেব পব দিন পৃথিবীব প্রত্যেকটি স্থান দখল কবে বসেছে। চারদিকে তৈবী করছে কারখানা আব শহর। দিনের পর দিন আমরা কোনঠাসা হযে পড়েছি। আমবা জিতান্‌, আমরা অভদ্র, আকাশ যারা ভালবাসে— বনে-বাদাড়ে ঘুবে যাবা পায় আনন্দ। ভগবানের সৃষ্টি এই বিবাট পৃথিবীতে যারা বাঁধন-ছাড়া হযে ঘুবে বেড়ায় তাবাই জিতান্‌। দুর্ভাগ্যের বিষয, এই ভদ্রলোকদেব মন আমাদেব মন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। হবে নাই বা কেন— এরাতো আর মুক্তাকাশে মানুষ হয়নি...।

বুড়ো মাট্‌চোব চোখটা যেন জলে ভবে এল। আমাব সাধারণ প্রশ্নটাকে সে এমন সিরিয়াস্‌লি নেবে তা বুঝতে পারিনি। বুড়ো মাট্‌চোর কথাগুলো আমি অন্তর দিয়ে অনুভব কবলাম। আমার মতে সে দার্শনিক। বাংলার বাউলরা তো এই কথাই বলে। কবিগুরুতো এই কথা ভেবেই সৃষ্টি করেছিলেন প্রকৃতিব কোলে তাঁব পাঠশালা— যেখানে থাকবে না চাব দেয়ালেব বাঁধন।

ভালভাবে চিন্তা করলে ও গভীবভাবে চিন্তা করলেই দেখা ও বোঝা যায় যে বুড়ো মাট্‌চোব কথা অমূলক নয়। জিতান্‌রা আগে ঘুবে বেড়াতো পথে ঘাটে, বিচিত্র ও আজব জীবিকা ছিল তাদের পেশা। বনে জঙ্গলে দাঁড় করাতো তাদের ঘোড়ার গাড়ী— যেখানে ছিল না সভ্যতার অত্যাচার। জিতান্‌দের অনেকেই ঘুরতো পায়ে হেঁটে, তাদের মালপত্র বহন করতো গাধা অথবা ঘোড়ায়। শিকার করা ছিল তাদের দৈনন্দিন নেশা। মেয়েরা কুড়িয়ে বেড়াতো বুনো ফুল আর মৃতসঞ্জীবনীর শেকড়, বয়স্কারা বুন্‌তো ঝুড়ি। মাঝে মাঝে তারা আসতো শহরে, সেখানে তাদের যা বিক্রি হয় সেটাই হতো লাভ। বুড়ো মাট্‌চো আমাকে আরও তথ্য জানাতে লাগল।

বর্তমানে সব কিছুই গেছে পাল্টে। বন জঙ্গল আজকাল ব্যক্তিগত সম্পত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাস্তায় চলতে গেলে পদে পদে লাগে পয়সা। গাড়ীর জন্য ইন্‌স্যুরেন্স। অসুখ-বিসুখ ও বয়স বৃদ্ধির জন্য রয়েছে নানা বকমের ইন্‌সুরেন্সের ফাঁদ। ভদ্রলোকেদের দৃষ্টি এড়ানো কঠিন।

বিকেলের দিকে আমি ডায়েরিটা লিখতে বসেছিলাম, কিন্তু মাট্‌চো বুড়ো আমাকে ডাকলো— ও আরও কিছু বলতে চায়। তার অনেক কথা অনেক অভিজ্ঞতা— সব শুনলেও যার শেষ হবে না। আমাকে সে উৎকণ্ঠাব সাথে জিজ্ঞাসা করল,

—তুই লিখতে জানিস?

—হ্যাঁ, সামান্য।

বাড়ীতে চিঠি লিখছিস, তা বেশ। আমাদেব কেউ চিঠি লেখে না, আমবাও লিখি না, আমাদেব ঠিকানা কোথায়? আমাব বড় ছেলে লিখতে জানে। ছোটটাও একটু একটু শিখেছে।

—তাহলে তো খুবই ভাল— শুনেছি যে লিখতে জানলেই নাকি পড়া যায়। দোকানেব সাইন্‌বোর্ড, বাস্তাব নাম, শহবেব নাম, এমনকি পুলিশ যখন অযথা আমাদেব গাড়ীব জন্য ফাইন করে সেই কাগজও পড়া যায়। হ্যাঁ— জানিস, পুলিশবা আমাব বড় ছেলেব মতই লেখে।

বুড়ো তাব ছেলেব প্রশংসায় পঞ্চমুখ। পুলিশদেব অত্যাচাব জীপ্‌সিদেব কাছে নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপাব। যেখানে সেখানে পার্ক কবলেই পুলিশ আসে। আব সব চেয়ে আফশোষেব বিষয় এই যে, প্রায়ই শেষ বাতে পুলিশ এসে কাবাভানেব দবজায় ধাক্কা মেবে সবাইকে জাগিয়ে দেয়, তাবপব ভেতবে ঢুকে তন্ন তন্ন কবে খোঁজে। কি যে খোঁজে তা ওবা নিজেরাও জানে না। পুলিশবা ভাবে যে যাযাবব মাত্রেই চোব আব তাদেব কাবাভান মাত্রেই চুবি কবা জিনিসে বোঝাই। এ ভাবী অন্যায় কথা— ভগবান তার বিচাব কববেন।

মাট্‌চোব মেয়েরা এখন বড় হয়েছে। ফবাসী জিতানদেব রূপসী বলে খ্যাতি আছে। মাঝে মাঝে এমন হয় যে পুলিশবা শুধু এই রূপ দেখবাব জন্যই তাদেব দরজায় ঘা মাবে। কিন্তু বলার কিছুই নেই— এ সংসাব ও দুনিয়াটা চলছেই এই ধবনেব ভদ্রলোকদেব দ্বারা। এই ভদ্রলোকদেব ভদ্র-পোষাকেব ভিতবেব রূপটা যদি প্রকাশ্যে দেখানো যেত তাহলে একটা সাপও ভয়ে পালাতো, ঘেন্নায় তাদেব মুখেব ওপব থুথু ফেলতেও হয়ত কেউ আসত না। আমবা জীতান্‌, আমবা চোব, অথচ এই ফবাসীব জেলখানা যাদের দিয়ে বোঝাই হয়েছে তাদেব সবাই ভদ্রলোক। জীপ্‌সিবা চুবি করে একটা মুরগী আনে, সেটা হয়তো ঠিক নয় কিন্তু তা নিতান্তই পেটের দায়ে; আব ভদ্রলোকেরা চুরি করে বড় বড় ব্যাংক ও গাড়ী। তফাৎ বিবাট— তাই না? কিন্তু শাসকরা তা বোঝে না। সহজ ও সরল শিক্ষা তো তাদের নেই। আর্দোব মতে বুড়ো মাট্‌চো অভিজ্ঞ ব্যক্তি। সে ভবিষ্যৎ দেখতে পায়। তাইতো

তার ছেলে-মেয়েদের ঠিক মত গড়ে তুলেছে। নিজে ঝুড়ি বোনে, ছেলে-মেয়েরাও অবসর সময়ে তাই করে। বড় ছেলে গাড়ী চালায় ও গাড়ী মেরামতিতে সে দক্ষ। ছোট ছেলে ঠিকে খাটে; সে কর্মঠ, যে কোন ধরনের কাজে সে আগ্রহী। মেয়েরাও ভাল জানে। ওদের দেহটাও খুব নাচের উপযোগী। ভদ্রলোকেরা ওদের নাচ দেখে পয়সা ছোঁড়ে। মাট্‌চোর সংসারে কোনরকম আর্থিক অনটন নেই। তার স্ত্রী অনেকদিন আগেই অসুখে মারা গেছে।

আর্দোকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে সে কেন তার মেয়েকে স্কুলে পাঠায় না। উত্তরে সে থু-থু করে উঠে জবাবে বলল,

—আমার ছেলে-মেয়েরা ভদ্রলোকদের স্কুলে যেতেই চাইবে না। যে ভদ্রলোকেরা আমাদের চোর বলে, জিতান্ জিতান্ বলে আমাদের পেছনে ছোটে, তাদের মাঝখানে দেবো আমার ছেলে-মেয়েদের--- অসম্ভব।

আমি বুঝলাম যে এ ব্যাপারে জীপ্‌সিদের কন্‌সেপ্‌টাই আলাদা। অবশ্য ওরা জিতান্ যাযাবর, যাদের স্থায়িত্ব নেই তারা কি করেই বা স্কুলের চিন্তা করবে। জিতান্‌দের, সভ্য সমাজ ভাবে অপাঙক্তেয় আর জিতান্‌রা সভ্য সমাজকে ভাবে এক পরাধীন সমাজ। খাঁচার পাখীর মত তারা বন্দী থেকে থেকে স্বাধীনতার মূল্যটাই হারিয়েছে। খাঁচার পাখীর মত তার ওড়বার ক্ষমতা থাকলেও সে ওড়ে না; প্রাণ থাকতেও নিষ্প্রাণ।

আমি বারবার এদের স্বাধীনতাপ্রিয়তার কথা লিখতে বাধ্য হচ্ছি। প্রকৃতিকে ওরা কতখানি ভালবাসে তা প্রকৃতির পূজারী ছাড়া কেউ বুঝবে না। সাধু বা বাউলরা নিশ্চয়ই এ ধরনের। আমি নিজেও যাযাবর জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি আজকাল, বুঝি যে খোলা ছাদে, মাঠে খাটিয়া পেতে শোয়ার কি আনন্দ। হয়তো অশোভন বা অভদ্র, কিন্তু তাতে প্রকৃতির সরাসরি পরশ আছে। যাযাবর, সে যে দেশেরই হোক না কেন, তাদের স্বভাব অভিন্ন। রাত কাটাবার জন্য তারা প্রথমেই খোঁজে এক উপযুক্ত স্থান, অথবা প্রাকৃতিক আশ্রয়। পাহাড়ের গুহা তাদের খুবই প্রিয়। শীতের দেশে হলে অবশ্য তাদের কারাভান বা তাঁবুর আশ্রয় নিতেই হবে। আমার মত বিদেশী বা ভদ্রলোকদের তারা এড়িয়ে চলে বটে, কিন্তু নিজেদের মধ্যে তাদের আদর আপ্যায়নের যেন তুলনা চলে না। কয়েকদিনের মধ্যেই আমি তার পরিচয় পেলাম। আর্দোর পরিবারে ইতিমধ্যে আমি বেশ গুছিয়ে বসেছি। ছোট শিশুর থেকে বুড়ো মাট্‌চো পর্যন্ত সবাই আমার নাম ধরে ডাকে. আর্দোর মোটরের সামনের দুটো গদিকে ঘিরেই আমার সংসার। খাওয়া-দাওয়া ওদের সাথেই করি আর রাতের বেলা ওদের কারাভানে বসে সপরিবারে তাস বা গুটি খেলি। নাতালি আর মাট্‌চোর মেয়েরা আমার সামনেই ওদের ফ্লেমিংগো নাচের মহড়া দেয়। মোটের ওপর আমি ওদেরই একজন হয়ে উঠলাম। ওরা আমার সঙ্গে যখন কথা বলে আমি কোনরকমে বুঝতে পারি বটে, কিন্তু নিজেদের মধ্যে যখন কথা বলে তখন আমার সাধ্য কি

তা বোঝার! রোমানিষ ভাষার বিন্দুবিসর্গ বুঝতে হলে আমাকে থাকতে হবে অন্ততঃ বছর খানেক।

তিনদিনের পর আমরা মারসেই ছাড়লাম— উদ্দেশ্য কামার্গে ফিরে যাওয়া। মোটরের পেছনে কারাভানটাকে আটকে আমরা রওনা দিলাম। মাটচোরাও দু-একদিনের মধ্যেই কামার্গে আসবে। ভেবেছিলাম জিতান্‌রা খুব নোংরা ভাবে থাকে, কিন্তু আজকে তাদের অন্য একটা দিক আবিষ্কার করলাম। কামার্গে ঢোকবার আগেই পেলাম একটা জংগল। সেই জংগলের মধ্যে পাওয়া গেল একটা ছাড়া কল,. মনে হয় কৃষিকার্যের জন্যই এ কলটা ব্যবহার করা হয়। বাস্তা থেকে একটু দূবে, জনমানবশূন্য এই জায়গাটা বেশ মনোরম। কলের ঠিক পাশেই কারাভানটাকে দাঁড় করানো হল। উদ্দেশ্য সবাই মিলে স্নান করবে। যাযাবররা বোজ স্নান করে না। সে সুযোগ এদের ন-মাসে ছ-মাসে জোটে। কারাভানটা দাঁড় কবানো মাত্রই ছেলে-মেয়েরা শুকনো পাতা আর ডালপালা যোগাড় করতে শুরু কবে দিল। আর্দো আর আমি উনুন তৈরী করতে লাগলাম আর মাম্‌মা সাবান তোয়ালে বড় গামলা ইত্যাদি বন্দোবস্ত করতে লাগলো। সার্কাস পার্টির মতো হঠাৎ সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ল। হঠাৎ যেন সবাই আনন্দোৎসবে মেতে উঠেছে— সকলেরই সমান উৎসাহ। ছাড়া কলটাকে মাঝখানে বেখে তার একদিকে কারাভান আর অন্যদিকে মোটবটাকে দাঁড় করিয়ে দু-দিকে দুটো দেয়াল তৈরী হল। জল কিন্তু ভীষণ ঠাণ্ডা। গরমকাল হলে কি হবে, ইউবোপের জল মাত্রেই যেন বরফ গলা। কাজেই স্নান করতে হলে তাকে গবম করতেই হবে। প্রায় একঘন্টার মধ্যেই সব তৈবী— গর্ত করা উনোনের ওপব গরম জল ফুটতে লাগল। প্রথমে ছেলেমেয়েরা, তাবপব আমি ও আর্দো স্নান সেবে নিলাম। তারপর মাম্‌মা ও নাতালির পালা।

কে বলে জিতান্‌রা নোংরা! স্নানেব পশব দেখলে মনে হবে এদের মত এত পরিষ্কার আর খুঁতখুঁতে জাত বোধ হয় আব দ্বিতীয়টি নেই। স্নানের পর নাতালি, মাম্‌মা ও ছোট মেয়েদের চুলের বাহাব ও স্নো-ক্রীম মাখা দেখে আমি তো অবাক হয়ে গেলাম। স্নান ওদের কাছে সত্যি যেন এক পর্ব। স্নানেব পব ওদেব সৌন্দর্য যেন শতগুণে বেড়ে যায়।

আবার কামার্গে:

ফিরে এলাম আবার কামার্গে। জায়গাটা বিজার্ভ করাই ছিল। আমাব তাঁবুটা খাটিয়ে নিলাম আর কলিনোর কাছে রাখা মাইকটাকে নিয়ে এলাম। আর্দো ও তার পবিবারের কারাভানটা যেখানে পার্ক করা হ'ল ঠিক তার পাশেই আমাব তাঁবু। নাতালি ও মাম্‌মা এখন আমার সাথে খুবই সহজভাবে মেলামেশা করতে লাগল। আমার পুরানো বন্ধু গেমানা ঠিক ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না— আমার চাবপাশে বেশ খানিকখন ঘুর-ঘুর করে তারপর বলেই ফেলল্ কথাটা— ব্যাপার কি হে? তুমি দেখছি আর্দোর ঘরজামাই হয়ে উঠেছো!

ওর রসিকতার সাথে সুর মিলিয়েই আমি জবাবে বললাম — সব যাদু! আরে ভাই ইয়ে হ্যায় যাদুকা খেল্।

কামার্গের ঘোড়া খুবই বিখ্যাত। এখানকার জংলি ঘোড়াগুলো নাকি চড়বার পক্ষে অতি ভাল। কথাটা যাচাই করার একটা মস্ত সুযোগ এসে গেল। আমি যেই রেন্জে প্রথম কয়েকদিন ছিলাম সেখানে টেম্পোরারি কাজ করতো একটি জিতান্-ছেলে। তার কারাভানটা ছিল আমাদের শিবির এলাকায়। কোন একটা কাজ উপলক্ষে তাকে যেতে হবে অন্যত্র, নিম-শহরে; তার অবর্তমানে রেন্জের মালিক অন্য কাউকে নিয়ে নেবে। ছেলেটির নাম চরবি। চরবির সামনে এখন সমস্যা দেখা দিয়েছে। সে যদি তার নিজের কাজে নিমে যায় তাহলে মালিক অন্য কাউকে নিয়ে নেবে, অথচ কাজটা তার ছাড়তে মোটেই ইচ্ছে নেই। এখানে উৎসবের জন্য প্রচুর জিতান্ আসছে, কাজেই মালিক অতি অল্প বেতনে যখন তখন লোক পেতে পারে। চরবি যদি তার জিতান্ বন্ধুদেব তিন-চাবদিনেব জন্য এই কাজটা দেয় তাহলে ফিরে এলে তার কাজ ফিবে পেতে হলেও কমপক্ষেও বেশ কয়েকবার ঝগড়া কবতে হবে। এ ধবনের জিতান্-কোন্দল তাদেব দলে তো লেগেই আছে— তোর ছেলে আমার ছেলেকে মেরেছে... তোর মেয়ে আমাব ছেলেটার বিস্কুট ছিনিযে নিয়েছে... তুই আমার খদ্দেব ভাঙিযে নিযেছিস্... কারাভানের জন্য আমাব পজিসন্টা কানা হয়ে গেছে... ইত্যাদি ধরনেব গেঁযো ঝগড়া না করলে এদের পেটেব ভাত হজম হয় না।

কলিনো চরবির সমস্যাটা জানতে পেবে আমাকে চুপিসাবে ব্যাপাবটা বলল। আমরা পরামর্শ কবে ঠিক করলাম যে ঠিক আছে, আমি ওর কাজটা কববো আব এ কদিনে যা মাইনে পাব তাব অর্ধেক ও পাবে। এতে সুবিধা হচ্ছে যে আমার এ লাইনে একটু অভিজ্ঞতা হবে আব চরবিব ফিরে আসা পর্যন্ত কাজটাও বজায় থাকবে। চরবি আমাদের প্রস্তাবে সঙ্গে সঙ্গে বাজি হয়ে গেল; ওব আনন্দ যেন আর ধবে না। আমাকে সঙ্গে সঙ্গে ওর বেন্জে নিয়ে গেল। কর্মীব পরিবর্তে কর্মী, আসলে কাজ নিয়ে কথা, অতএব মালিক এক কথায় বাজি হয়ে গেল।

আমাব প্রধান কাজ হল ঘোড়াব ঘাস দেওয়া, আর ঘোড়া ভাড়া খাটানো। কাজটা ভেবেছিলাম খুবই সোজা, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল ঠিক উল্টো। ঘোড়াগুলো বাঁধা থাকতো আস্তাবলে। জংলী ঘোড়াগুলোকে পোষ মানানো হয়েছে ট্যুরিষ্টদের জন্য— অনেকটা দার্জিলিং-এ মলের কাছে চৌরাস্তার ধারের আস্তাবলেব মত। ঘাসের বাণ্ডিলগুলো রাখা হয়েছে এখান থেকে বেশ খানিকটা দূরে। দূরত্ব বেশী নয় বটে, কিন্তু রাস্তা সমুদ্রের লোনা জলের কাদায় ভর্তি। এক বাণ্ডিল ঘাস কাঁধে কবে আনতে গিয়ে আমার অবস্থা হিম্সিম্; পায়ের অবস্থা সঙ্গীন, হাটু পর্যন্ত কাদায় বসে যাচ্ছে। চরবির মতে সবই অভ্যাস, দু' একদিনের মধ্যেই অভ্যাস হয়ে যাবে। এ ধরনের কাজ নেহাৎই না ঠেক্লে ভদ্রলোকরা করে না। ঘোড়াগুলো মনে হয়

খুবই অশান্ত— প্রয়োজনবোধে আমাকে লাগামও পরাতে হবে। চরবি আমাকে সব আস্তে আস্তে শিখিয়ে দিতে লাগল।

আস্তাবলেরই এক কোণে রয়েছে একটা বার অর্থাৎ চা-কফির দোকান। ওপরে পাঁচ-ছটা ঘর হোটেল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। মালিক ভদ্রলোক দেখতে অনেকটা যণ্ডাকৃতির; স্বভাবটা কিন্তু ঠিক তার উল্টো। ভদ্রলোক আমাকে একটা জীপ্‌সি হিসেবেই গ্রহণ করল। সে আমাকে বুঝিয়ে দিল যে শুধু ঘোড়ার কাজ করলেই চলবে না, প্রয়োজন হলে রান্নাঘরের বাসনও মাজর্তে হবে। কাজে আমি সব সময়েই প্রস্তুত, কাজেই লেগে গেলাম। ঘোড়া ও ষাঁড় কামার্গের প্রতীক। ঘোড়া এক শক্তিশালী বাজকীয় জন্তু; শক্তি ও সৌন্দর্য দিয়ে গড়া ভগবানের এক অপূর্ব সৃষ্টি। বোমানদের সময়ে আসলে এই কামার্গের ঘোড়া ব্যবহৃত হ'ত বার্তা বহনের জন্য ও যুদ্ধকালীন সময়ে রথের জন্য। আগে আবব থেকে এই ঘোড়াগুলো আনা হযেছিল; ঐতিহাসিকদের মতে এদের অবিজিন হচ্ছে এশিয়া। ষাঁড় কামার্গের নোনা জমিব উপযুক্ত জন্তু। ষাঁড়গুলোকে দেখলেই মনে হবে এরা এসেছে ভারত থেকে— ঐতিহাসিকরাও বলেন যে এরা এসেছে আর্যদের দেশ থেকে। আমি আসছি ভাবতবর্ষ থেকে, কাজেই এদেব সাথে আমার মিল অনেকটা— একই অদৃশ্য সূত্রে যেন বাঁধা।

সকাল সাতটাব মধ্যেই আমাকে আস্তাবলে এসে হাজিবা দিতে হোতো। প্রথম কাজ হ'ল এই আস্তাবলেব উনিশটা ঘোড়াকে এক এক কবে বাইরে এনে বিভিন্ন থামের সঙ্গে বেঁধে বাখা, তারপব আস্তাবলটাকে ব্রাশ দিয়ে পবিষ্কাব কবা। ঘোড়ার আবর্জনাগুলোকে আস্তাবলের কোনে ঠেলে এনে সেগুলোকে ছোট্ট তিন চাকার গাড়ীতে বোঝাই করে দূরে ঠেলে নিয়ে ফেলে আসা। পবে কাজ হ'ল ঘোড়াগুলোকে ঘাস দেওয়া। এ কাজগুলো করতে আমাব প্রায দু'ঘন্টা আড়াই-ঘন্টা লেগে যেতো। কাজটা মোটেই জটিল নয় তবে দুর্গন্ধযুক্ত ও বিশেষ ধরণেব। কলকাতা করপোবেশনের যে সব কর্মীরা ডাস্টবিন পরিষ্কার করে, তাবা নিশ্চয়ই এ বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ ও দক্ষ। তাদেব আমি প্রশংসা করি। আমাব বন্ধু বা শুভানুধ্যায়ীবা ভাববেন যে ডায়েরীর পাতায় এ ধবনেব লেখাটা না লিখলেই চল্‌তো, কিন্তু আমি নিরূপায়, আমার চলার পথে কেন, আমার জীবনে এ ধরনের অভিজ্ঞতা এই প্রথম। এখানে কম্‌প্লেক্‌সিটির কোন রকম প্রশ্ন নেই, যা ঘটেছে তাই লিখছি। প্রথমদিন আমাকে গন্ধে ও ঘর্মে নাস্তানাবুদ হতে হয়েছিল, কিন্তু সব সময়েই ভেবেছি এমন সুযোগ হয়তো আর পাবো না। চারদিনের দিন দুর্গন্ধটা আমাব কাছে সুধু গন্ধে পরিণত হল— অভ্যস্ত হয়ে গেলাম।

সকাল সাড়ে নটার পর থেকে ঘোড়ার পাশে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে হয়— ট্যুরিষ্টরা আসে ঘোড়া ভাড়া করতে, ঘন্টায় পনেরো ফ্রাংক্ক। ফরাসীরা তো বটেই, তা ছাড়াও ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রচুর সংখ্যক ট্যুরিষ্ট আসে। ঘোড়া ভাড়া করে মনের ইচ্ছায় এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ানোর মধ্যে যেন রয়েছে একটা বিরাট এ্যারিস্ট্রক্র্যাসি।

ঘোড়া ভাড়া দেওয়া— আর তার সাথে পয়সার হিসেব রাখা এটা আমার একটা বিরাট দায়িত্ব। মনিবের আরও তিনজন সহচর স্থানীয় শহরে আছে, তারা মাঝে মাঝে আসে দেখাশুনা করতে। কোন ট্যুরিষ্ট যদি ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে জখম হয় বা ঘোড়া যদি সওয়ারীকে ফেলে দিয়ে পালায়, তারজন্য আমি দায়ী নই, মনিবের সহচররাই সে সব বিষয়ে দেখাশুনা করে। ট্যুরিষ্টদের বিভিন্ন বিষয়ে গাইড্ করা ও নতুন লোকদের ঘোড়ার চড়া শেখানো, সেটাও এই সহচরদের কাজ। পেশা হিসেবে বিচার করতে হলে বলতেই হবে যে ওরা আমার চেয়ে অর্ধেক উর্ধতনের কর্মচারী।

· কামার্গের ঘোড়াগুলোকে দেখলে প্রথমেই মনে হয় শান্ত-শিষ্ট গোবেচারা অথবা অপদার্থ ও কুঁড়ে। ভাবতে ইন্দোব বা উজ্জযিনীতে স্টেশনেব পাশে ঘোড়াব গাড়ীর ঘোড়াগুলোকে দেখেও আমি সে বকমই ভেবেছিলাম, অর্থাৎ এমন শান্ত প্রাণী বোধহয় পৃথিবীতে নেই; পবে তাদেব গাড়ীতে চেপে বুঝেছিলাম যে তাদেব চরিত্র সম্পর্কে মত প্রকাশ করা নেহাৎই ছেলে-মানুষি বুদ্ধি। তাবপবে অনেকগুলো বছব পাব হযে গেছে, অথচ আমার ছেলে-মানুষি বুদ্ধি এখনও যাযনি। ঘটনাটা খুলেই বলি তাহলে:

সেদিন সকাল থেকেই আকাশটা মেঘাচ্ছন্ন ছিল আব দক্ষিণে বাতাসও বইতে শুরু কবছিল। হঠাৎ ঠাণ্ডা বাতাস এই অঞ্চলের বিশেষত্ব। এই ধবনের বাতাস বইতে শুরু করলে সহজে আর থামে না; তিন চাব দিন ধবে অনবরত চলে এই ঠাণ্ডা বাতাস, স্থানীয় ভাষায় একে বলে মিস্ত্রল (Mistral)। শুনলাম এই সময়ে ট্যুবিস্টবা সাধারণতঃ বাইবে ঘোরে না। অর্থাৎ ঘোড়াব বাজার মন্দা। আমার কাছে এটা একটা সুবর্ণ সুযোগ। আমি তাড়াতাড়ি আস্তাবলটাকে পবিষ্কাব করে, দোকানে ঢুকলাম, বিরাট একটা স্যাণ্ডউইচের সাথে কফিব অর্ডাব দিলাম। মালিক নিজেই সকালে সার্ভ করে। কফিব কাপটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে অনেকটা আশ্চর্য হবার ভাব কবে জিজ্ঞাসা করল,

—কি ব্যাপার! এরই মধ্যে সব শেষ করে ফেললে যে?

— হ্যাঁ বলছিলাম কি...এই বাতাসের মধ্যে...মনে হয় দুপুরেব আগে কোন খদ্দের পাওয়া যাবে না...কাজেই আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি কিছুক্ষণের জন্য একটা ঘোডা নিয়ে একটু এদিক-ওদিক যাবার ইচ্ছে আছে...অবশ্য ঘোড়ার যা ভাড়া হয় আমি তা দিতে রাজি আছি...

আমি আম্‌তা আম্‌তা করে আমার বক্তব্য বেশ করলাম, মনিব আমার কথা শুনেই হেসে বলল,

—তা বেশ, তুমি যদি ঘোড়া নিতে চাও তো আমার বলার কিছুই নেই, তবে হ্যাঁ, এক ঘন্টার মধ্যেই ফিরে আসতে হবে। ভাল কথা— তোমার ঘোড়ায় চড়া অভ্যাস আছে?

—নিশ্চয়ই, আমি বীরের মত জবাব দিলাম।

—ঠিক আছে— তবে ভয় নেই, ভাড়া দিতে হবে না।

মনিবের পারমিশন পাওয়া মাত্রই আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্যাণ্ডউইচ্ ও কফিটাকে গলাধঃকরণ করে— দৌড়ালাম আস্তাবলের দিকে। একের পর এক দেখে বেছে নিলাম তার মধ্যেকার সবচেয়ে বলিষ্ঠ আর শান্ত ঘোড়াটাকে। তার পিঠের ওপর চড়ালাম সবচেয়ে দামী স্যাড্‌ল্‌টা। তার বেল্ট্‌গুলো ঠিক্-ঠাক্ করে বেঁধে পাদানিটাকে ভালভাবে আটকে নিলাম। এবার ঘোড়ার ওপর উঠেই তাকে চালালাম ফাঁকা মাঠের দিকে। ঘোড়ায় এর আগে অনেকবার চড়েছি, আর সে কারণেই আমার আত্মবিশ্বাসও প্রচুর। হু-হু করে কানের পাশ দিয়ে মিস্ত্রাল বাতাস বইছে, কিন্তু আমার আনন্দ তখন দেখে কে? বীরদর্পে ও মনের আনন্দে ঘোড়ার লাগামে হালকা দিয়ে পায়ের গোড়ালি দিয়ে গুঁতো মারতে মারতে তাকে দৌড়তে বাধ্য করলাম। মনিবের তাড়া খেয়ে ঘোড়াও ছুটতে লাগলো পক্ষিরাজের মতো। আশপাশে কোনরকম বেড়া নেই; যেদিকে ইচ্ছা ঘোড়াটাকে চালালেই হল। ঘোড়ায় চড়ার মত স্পোর্টস্ বোধ হয় আর দ্বিতীয়টি নেই— তাই তো একে বলে রাজকীয় নেশা।

আধঘন্টার মধ্যেই আমরা এদিক ওদিক ঘুরে এসে হাজির হলাম একটা খালের ধারে— হঠাৎ দেখতে পেলাম একটা ছোট্ট ব্রীজ— ইচ্ছা হল ঘোড়াটাকে ওপারে নিয়ে যাবার। ঘোড়ার মুখটাকে অনেক কষ্টে সেদিকে ঘোরালাম বটে, কিন্তু সে কিছুতেই ব্রীজের দিকে উঠতে চাইছে না। আমিও নাছোড়বান্দা, ওদিকে আমার যাওয়া চাই-ই চাই। ঘোড়াটা খুবই দুরন্ত ও সরল কিন্তু খুব বাধ্য। কাজেই হঠাৎ ওর এই অবাধ্যতার কারণ আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ঘোড়াটা রাজি হল; আমাকে পিঠে নিয়ে সে আস্তে আস্তে ব্রীজের ওপর এক-পা দু-পা করে অতি সন্তর্পণে উঠতে লাগলো। তারপর যেই সে ব্রীজটার মাঝামাঝি এসেছে ঠিক সেই সময়ে ঘোড়াটার পিঠটা যেন তড়িৎ গতিতে উপরে ঠেলে উঠল— মনে হল হঠাৎ যেন কেউ আমাদের পেছন থেকে সজোরে ধাক্কা মেরে দিয়েছে... তারপর? ঘটনাটাকে ঠিক বোঝবার আগেই নিজেকে আবিষ্কার করলাম খালের জলে। জামা প্যান্ট ভারী জুতো সব সমেত আমি তখন হাবুডুবু খাচ্ছি। কোন রকমে সামলে নিয়ে আমি খালটার ধারে এসে উঠলাম, ঘোড়াটা সম্ভবত আমার দুরবস্থা দেখবার জন্যই দাঁড়িয়েছিল, ওর সাথে চোখাচোখি হতেই সে এক দৌড় লাগাল। আমার যে কি ভয়ংকর অবস্থা তা লিখে প্রকাশ করা অসম্ভব। একে জামা কাপড় ও জুতো মোজা ভিজে জবজব করছে, তার ওপর এই দক্ষিণে বাতাস হাড়ে কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছে। পায়ের নখ থেকে আরম্ভ করে মাথার চুল পর্যন্ত কাঁপতে শুরু করেছে; ঠাণ্ডায় সর্বশরীর প্রায় অবশ হয়ে আসছে। ঘোড়াটাও কাছে নেই, কোথায় পালালো কে জানে— মনিবকে কি বলবো সেও আর এক চিন্তা। মিস্ত্রাল এ অঞ্চলের পাগলাটে ধরণের ঠাণ্ডা হাওয়া, তাতে আমার

সর্বশরীর প্রায় অসার হয়ে আসছে... কোন রকমে টলতে টলতে আমি বড় রাস্তার পাশে এসে দাঁড়ালাম। আমাকে দেখেই একটা মোটর দাঁড়িয়ে পড়ল— মোটর থেকে এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এসেই আমাকে ধরে ভেতরে ঢুকিয়ে নিলেন— তাকে আমার কাহিনী শোনাবারও আর ক্ষমতা আমার নেই, শুধু কোনরকমে উচ্চারণ করলাম রেস্তোরার নামটা। ত্রিশ বছরের কাছাকাছি বয়স হবে এই যুবক— এই অঞ্চলেরই বাসিন্দা, এখানকার পথ-ঘাট তার সব মুখস্ত। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি আমাকে নিয়ে এলেন রেস্তোরায়। সবাই ধরাধরি করে আমাকে একটা ঘরে নিয়ে তুলল। আমার শরীর তখন প্রায় অসার অবস্থা। মালিক ও তার লোকজনেরা আমার জুতো জামা কাপড় খুলে সঙ্গে সঙ্গে বিরাট চাদরে জড়িয়ে শুইয়ে দিল একটা বিছানায়। গায়ের ওপর চাপিয়ে দিল পাঁচ ছটা কম্বল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাকে গরম করার জন্য দু'কাপ রাম ও কনিয়াক্ এনে দিল— ধীরে ধীরে মনে হল ধরে প্রাণ এল। মনিব কাছেই ছিল, তাব দিকে চেয়ে করুণভাবে বললাম,

—বিশ্বাস করুন, আমি ইচ্ছে করে আপনাদের এই ঝঞ্ঝাটে ফেলিনি।

মনিব আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল,— সে সব কথা পরে হবে, আগে তো সুস্থ হয়ে ওঠো।

সুস্থ হওয়া অতই কি সহজ! সেই রাতেই আমাব বুকের চাপা কফটা যেন ঠেলে উঠল— শ্বাসনালী যেন চেপে বন্ধ করে দেবাব মতলব। ইতিমধ্যে খবর পেযে আর্দো ছুটে এসেছে, তার সাথে সাথে নাতালিও এসেছে। বিভিন্ন ধরনের পাতার রস গরম কবে ও মৌরির জল গরম করে ওরা আমাকে খাওয়াতে লাগলো। সারা রাত ধরেই চলল আমার প্রতি ওদের পরিচর্যা। দেশ থেকে আমি এখন অনেক-অনেক দূবে— দেশ বা আত্মীয়দের সঙ্গে আমার এখন কোন বকমই সংযোগ নেই। সুদূর ফরাসীব কোনো এক ছোট্ট জিপ্‌সি তীর্থে এসে আমার এই অবস্থা। কিন্তু রাখে হরি মারে কে? ‘‘সব ঠাঁই মোর ঘর আছে’’— এমন অবস্থায় পড়েও আমার চারপাশে রয়েছে ঠিক যেন পরমাত্মীয়। আর্দো, নাতালি ও আম্‌মাব পরিচর্যাব যেন তুলনা চলে না। পরেব দিন থেকে আমার কাজেব ভাব নিল আর্দো। আর দুদিনের মধ্যেই চরবি এসে পড়বে। মনিব জানিয়েছে যে ঘোড়াটা নিজের থেকেই চলে এসেছে, কাজেই আমার আব চিন্তা কি? আমি যতদিন পর্যন্ত সুস্থ না হই ততদিন ওই ঘরেই থাকার বন্দোবস্ত হল। পরেরদিন সকালে একটা নতুন উপসর্গ দেখা দিল— কাসি। কাসতে কাসতে দম বন্ধ হয়ে যাবার জোগাড়— তাব সাথে সাথে দেখা দিল জ্বর।

পরিব্রাজক জীবনে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে চূড়ান্ত ও ভয়াবহ মুহূর্ত, শরীর সুস্থ থাকলেই মন থাকে হালকা; শরীরকে নিয়েই তো মনের যত অশান্তি। শরীরটা যেন মনের এক অশান্ত ঘোড়া। পরিব্রাজক মাত্রেরই প্রয়োজন বলিষ্ঠ মনোবলের। শরীর ও মন যে এক নয় সেটা যে বোঝে সেই বলিষ্ঠ। মন ও শরীর এই দুইয়ের

সংযোগেই এই শরীর চলে— এই দুই অবস্থা যখন একই তালে চলে তখনই হচ্ছে শরীরের সুস্থাবস্থা। আমি আমার এই রোগ-শয্যায় সেই কথাটাই বারবার অনুভব করবার চেষ্টা করছি। তোমার শরীরতো আর আমি নই, কাজেই আমার আর চিন্তা কিসের। শরীর ভুগছে ভুগুক, তাতে মনের কি আসে যায়। চেষ্টা করি মনটাকে শরীর থেকে আলাদা করে ভাবতে, কিন্তু মন যখন পরম-আত্মার থেকে অবিচ্ছিন্ন, তখন মনকে শরীর থেকে অলাদা করা যায় কি— পার্থিব জগতে মন শরীরেরই এক অংশ। এ দেহাত্মা পরমাত্মার অংশ বটে কিন্তু সে মহাসত্যকে অনুসরণ করার সামর্থ্য কোথায়!

ভগবানকে আমি মানি, তাঁকে বিশ্বাসও কবি; কিন্তু আমার ভগবান বাস করেন জীব-দেহে। জীব যখন সেবাব্রতী, তার মধ্যে যখন ভালবাসা দয়া ও মমতায় পরিপূর্ণ তখনই সে পরিণত হয় ঈশ্বরে। ঈশ্বরত্বই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব। এ্যাথেন্সের ডক্টর করিলোস আর জেনেভার মারলিন গ্রাজো— আমি জানি তাঁদের দরজা সব সময়ই আমার জন্য খোলা আছে। তাঁরা বার বার আমাকে বলেছেন যে, যে কোন বকম বিপদ-আপদে তাঁদের অবশ্যই যেন টেলিফোন করি— এটা হচ্ছে তাঁদের দাবী। কথাটা মনে হওয়া মাত্রই আমি মনিবকে জেনেভাব ফোন নম্বরটা দিয়ে অনুরোধ কবলাম আমার অবস্থা জানিয়ে তিনি যেন অবশ্যই একটা টেলিফোন করে দেন। ইতিমধ্যে গেমানা আমাব তাঁবুটা গুটিয়ে এনেছে আব সাথে সাথে মালপত্রগুলো আর সাইকেলটাও। কলিনোও আমাকে দেখে গেছে। বেস্তোরাব মালিক আমাকে আশ্বাস দিয়ে বলেছে যে সে আমাব থাকাকালীন কোন বাড়তি খবচা নেবে না, আমাব কাজের টাকা থেকে সেটা কেটে নেবে। আমার ঘোড়া থেকে পড়ে যাওয়া নিয়ে এদেব মধ্যে বিভিন্ন রকমের গুঞ্জন আরম্ভ হয়ে গেছে। আসল গল্পটা আমি কাউকেই বলিনি। দুদিন পর যখন চরবি এল— তাকে দেখে আমি অনেকটা ভরসা পেলাম। আমাকে শয্যাশায়ী দেখে ও হায় হায় কবে উঠল। ওকেই আমি প্রথম আদ্যোপান্ত ঘটনাটা বললাম। আমার মুখ থেকে সব শুনে ওতো হেসেই অস্থির; হাসি থামলে পরে বলল,

—ঠিক হয়েছে, যেমন কর্ম তেমনি ফল। দেখলে তো জোব কবে ওকে ব্রীজ পার করাতে চেয়েছিলে, শেষ পর্যন্ত কায়দা করে দিলে তোমাকে উলটে— কামার্গের ঘোড়াগুলোর এটাই বৈশিষ্ট্য। দেখতে গোবেচাবা কিছুই যেন বোঝে না, কিন্তু ভেতরে ভেতরে ওবা এক নম্বরের বজ্জাত শয়তানের ধাড়ি, সব বোঝে; একটা মানুষের মতোই ওরা চালাক। প্রায়ই ওরা এই ধরনের শয়তানী করে— এরা অন্যান্য ঘোড়ার মত খুব বেশী চাট মারে না, তবে বেশ কায়দা করে কাঁটা ঝোপ বা জলের মধ্যে আরোহীকে ফেলে দেয়। তবে বলতেই হবে যে তোমার ভাগ্য ভাল— ঠিক সময়মতো মোটর গাড়ীর সেই ভদ্রলোক তোমাকে নিয়ে এসেছিলেন তাই, নয়তো এই ঠাণ্ডা বাতাসে রাস্তাতেই নিউমোনিয়া হয়ে মারা যেতে। এখন গরম কাল বটে, কিন্তু খালের বদ্ধ জলের মতো ঠাণ্ডা জল আর নেই! তার ওপর দক্ষিণে হাওয়া...।

কাসিটা যেন বেড়েই চলল; পুরো বিশ্রাম ও চিকিৎসার দরকার, জিপ্‌সিদের সম্পর্কে আরও অনেক কিছু লেখার ছিল, এদের সম্পর্কে আরও অনেক অজানা রহস্য থেকে গেল। হয়তো এটাই ভগবানের ইচ্ছা— ওদের পুরো কাহিনী লিখতে চেয়েছিলাম কিন্তু হল না। অনেক কায়দা করে ওদের দলে মিশে গিয়েছিলাম, সুযোগ সত্ত্বেও উপায় নেই। ভেবেছিলাম— জিপ্‌সিদের হাতের মধ্যে পেয়েছি— এর আগেও ইরানে ও আরবে তাদের সাথে থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল বটে, কিন্তু তখন আমার দৃষ্টিভঙ্গিটা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা; এখন এই সুযোগের অপচয় না করাই উচিৎ ভেবে লিখছিলাম এদের প্রসঙ্গে, মনে হয় এটা আমাব অহংকার মাত্র। এদের চিরস্বাধীন জীবনের কতটুকুই বা জানি আর যতটুকু জানি বা দেখেছি তা আসলে কিছুই না। এদের জীবনটাই একট দর্শন। তাদেব স্বাধীনতাকে লিপি-বদ্ধ করার ধৃষ্টতা নিশ্চয়ই ভগবান ক্ষমা করেন না; তাই হয়তো আমাকে দূবে সরিয়ে নেবার জন্য এই ষড়যন্ত্র। এদের সম্পর্কে মন প্রাণ দিয়ে জানাব নাম অনুভব কবা— আর লেখার নামকে বলবো অহংকাবেব খেলা। বিছানায় বসে বসে ডায়েরিব এই শেষ অধ্যায় লিখছি। জানলা দিয়ে দূবে দেখতে পাচ্ছি জিপ্‌সিদের ক্যাম্প— লেখবার মত মনের অবস্থাও ঠিক নেই। সামনের সপ্তাহেই শুরু হবে কামার্গের উৎসব, ইউরোপের যাযাবররা এসে জড়ো হচ্ছে ২৪ ও ২৫শে মেব জন্য। মনে হয় না তার আগে শবীর ঠিক হয়ে উঠবে।

হঠাৎ রেস্তোরার মালিক আমাব ঘরে এসে হাজির। খুব হাসি-মুখে বলল,— একটা সুখবর আছে।

—বলুন।

—টেলিফোন এসেছে— আজ বাত্রিতে জেনেভা থেকে একটা মেয়ে আসছে তোমাকে নিতে। তোমাকে জেনেভায় নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করাবে।

এবার মনিব আরও কাছে এসে বিছানার কাছাকাছি ঘেসে খুব আন্তরিকতার সাথে একটা চোখ টিপে বলল,— ম্যাড্‌মোয়াজেল গ্রাঁজো কে হয় তোমার?

ওর কথাটা শুনেই বুকেব ভেতবটা আনন্দে লাফিয়ে উঠল! বুকের রক্তস্রোত দ্বিগুণ উৎসাহে বইতে শুরু করল— শুধু নামেই এই! সান্নিধ্যে নিশ্চয়ই মন্ত্রের মত কাজ করাবে।

রাস্তা যাদের সঙ্গী আমি এখন তাদেরই দলে। আমার বন্ধুমহলকে বিদায় জানাতে বাধ্য হলাম। জিপ্‌সি-চরিত্র আমার পরিব্রাজক জীবনের এক অমূল্য সম্পদ। নীল আকাশের নীচে মুক্তাঙ্গনে যাদের বাস, তাদের শুদ্ধ অন্তকরণের বর্ণনা দেবার ভাষা আমার নেই। সমাজ যাদের দিন দিন দূবে সরিয়ে দিচ্ছে, পারি না কি তাদের আপন বলে বুকে জড়িয়ে ধরতে, তাদের সত্তা বজায় রাখতে?....

ইউরোপীয় যাযাবর

একমাস পর আমি আবার এসেছি কামার্গে, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার দিকে পা বারবার আগে ভাল করে দক্ষিণে ফ্রান্স পর্যটন করাই আমার উদ্দেশ্য। আমি এখন সুস্থ, জেনেভার ম্যাড্‌মোয়াজেল গ্রাঁজোকে শুধু ধন্যবাদ দিয়ে কৃতজ্ঞতা জানানো সম্ভব নয়; মনে হয় পূর্বজন্মে সে নিশ্চয়ই আমার অতি প্রিয়জনেরই কেউ ছিল। তার সাথে তার মোটেরেই আমি সাইকেলটা নিয়ে এখানে এসেছি। উদ্দেশ্য এখান থেকে আবাব যাত্রা শুরু করা।

কামার্গেব উৎসব দেখা শেষ পর্যন্ত আমার ভাগ্যে হল না। সেই আগেব রেস্তোরাতেই উঠেছি। মালিক আমাকে সুস্থ দেখে খুবই খুশী হয়ে বলল— তুমি সত্যি ভাগ্যবান। ভগবান তোমাকে বক্ষা করেছেন। পূর্বে যাদেব সঙ্গে আমার খাতির বা ভাব হয়েছিল তাদেব কেউই এখন নেই।

আল্‌দো, এদুয়ার্‌দো, গেমানা, কলিনো, দিয়ান, চরবি, তাবা সকলেই নিজ নিজ তাঁবু খুঁটিযে যে যাব পথ বেছে নিয়েছে।

গীর্জাব আশপাশে এখনও অনেক জিতান্‌ বয়েছে বটে তবে তাদের সাথে আমাব মোটেই পবিচয় নেই। আমি আগেব বাব যেখানে জিতান্‌দেব সাথে তাঁবু খাটিয়েছিলাম, সেই মাঠটা এখন পোড়া কাঠ, ভাঙা বোতল আব প্লাস্টিকের ঠোঙায় ভর্তি। বিরাট উৎসবেব ভাঙা হাটেব সাক্ষ্য।

মার্লিন ফিবে যাবে জেনেভায়। যাবাব আগে সে আমাকে নিয়ে এল স্থানীয় শহব আবল্‌ (Arle) দেখাবার জন্য। ফ্রান্সেব ইতিহাসে এই শহরেব স্থান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ছোট্ট রোন নদীর দুদিক ঘিরে গড়ে উঠেছে সুন্দর এই শহরটি— ছোট্ট কিন্তু বর্ধিষ্ণু। দক্ষিণ ফ্রান্স মদের জন্য পৃথিবীখ্যাত। এই শহরটির অলি-গলিতে মদেব গুহায় ভর্তি। আঙ্গুরের রস থেকে হয় আঙ্গুর-বস, আর তাকে কৃত্রিম ও রাসায়নিক উপায়ে পচিয়ে তৈরী হয় মদ বা ভ্যাঁ (মদের ফরাসী নাম)। আরলেব আশপাশে অন্যান্য ইণ্ডাস্ট্রিও প্রচুর রয়েছে।

টুরিষ্টদের কাছে আর্ল্‌-এর প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে এখানকার রোমান ভেস্‌টিজ্‌ অর্থাৎ রোমানদের ধ্বংসাবশেষ। মারসেই শহরের গোড়া পত্তন কবেছিল গ্রীকরা। আব সেই সময়েই তারা এই শহরটারও গোড়াপত্তন করে। মার্লিনেব মতে কামার্গে এসে আরল্‌ না ঘুরে চলে যাওয়া মানে সত্যিকারের কিছু হারানো— তাই আমি আমার এই পরিশিষ্টে এই শহর সম্পর্কে দু'একটি কথা লিখতে বাধ্য হলাম।

আর্ল্‌-এর চারপাশে এবং শহরের ভিতরেও রোমান ধ্বংসস্তূপে পূর্ণ। প্রথমেই এলাম স্টেডিয়ামে, সম্ভবতঃ তৈরী হয়েছে গ্রীকদের আমলে। গ্রীকরা এই অঞ্চলে এসেছিল প্রায় ৬০০ খৃস্ট-পূর্বে। সেই সময়কার গ্রীকরা ছিল সাধারণত ব্যবসায়ী, তারা ভূমধ্যসাগরের তীরে নৌকো ভিরিয়ে রেখে রোন নদী ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে

এসে এখানে তাদের উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। সেই সময়ে এই শহরটির নাম ছিল থেলিনে (Theline)। খৃষ্ট-পূর্ব প্রথম শতাব্দিতে রোমানরা এই শহরটি দখল করে। তারপর বহু বছর যাবৎ এই শহরটি রোমানদেরই কবলে থেকে যায়।

পাম্পের সাথে এম্পেরার জুলিয়াস সিজারের যুদ্ধের ইতিহাসে এই শহরটির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন গ্রীক স্টেডিয়াম, পডিয়াম ও থিয়েটারগুলোকে রোমানরা একটু অদল-বদল করে রূপ দিল তাদের নিজস্ব স্থাপত্য। গ্রীকদের সেই পুরানো থিয়েটারকে তৈরী করল তাদের মঞ্চশালায় আর স্টেডিয়ামকে পরিণত করল গ্ল্যাডিয়ার নৃশংস ও রক্তাক্ত যুদ্ধক্ষেত্রে। গ্ল্যাডিয়ারদের সেই আম্ফিথিয়েটারটা আজও আছে; আজকাল অবশ্য সেখানে খেলার নামে আব নরহত্যা হয় না। তবে সেই প্রাচীনেব প্রতিধ্বনি সম্পূর্ণ থেমে যায়নি, গ্লডিয়ারদের সেই যুদ্ধক্ষেত্র আজকাল পরিণত হয়েছে আরেন অর্থাৎ ষাঁড়ের লড়াই ক্ষেত্রে। আরেনে প্রতি বছর স্পেনের নাম-করা করিডা আসে তাদের কলা-কৌশল দেখাতে।

গ্রীক্‌দের একটা প্রবাদ বলে— "Deus Ex Machina" অর্থাৎ ভগবান অবতীর্ণ হয়েছেন যন্ত্রের সাহায্যে। রোমানরা তাব ব্যাখ্যা করে বলে, যন্ত্রেব ব্যবহাব জানাই ভগবানকে জানা। মনে হয়, রোমানরা মানুষকে যন্ত্রের মতো ব্যবহার করার কৌশলটা আয়ত্ব করেছিল। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষকে খাটিয়ে তারা গড়ে তুলেছিল বোমান সাম্রাজ্যের ভিত্তি। এখানকাব কন্‌ডুইট দো (Conduit Deau) দেখলেই তা বোঝা যায়। এই শহরের অনেক দূবে একটা পাহাড়েব উপর ছিল জলাশয; সেখান থেকে তারা চীনের পাঁচিলের থেকেও উঁচু পাঁচিলের উপর দিয়ে বিরাট খালেব মত পাথরের নলাকারে জলটাকে নিয়ে এসেছে তাদের কাজে লাগবার জন্য— তাদেব বাহবা দিতেই হবে। এখন আব সেই নলে জল আসে না বটে— কিন্তু সেই বিরাট কীর্তির স্বাক্ষর এখনও রয়েছে।

এ ছাড়াও রয়েছে রোমান্ ট্রেজাবী, মাটির নীচে রোমানদের স্নানাগার, বথ প্রতিযোগীদের স্টেডিয়াম, আর অসংখ্য গ্রীক ও বোমান স্টাচু। এখানকার লাপিডের মিউজিয়াম ঘুরলে মনে হয় আমি এখন রোমেই রয়েছি। এ সব হচ্ছে সবই সেকালেব কথা— আমার মতে আরল্ ছিল প্রাচীন জিপ্‌সিদের এক বিরাট মিলন ক্ষেত্র। ভৌগোলিক অবস্থান দেখেই আমি এ উক্তিটা করলাম। ইতিহাস খুঁজলে মনে হয় আমার মতটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া চলবে না।

অভিশপ্ত দ্বীপ – পাক্ দ্বীপ

ওম্ ঘোরদংস্ট্রে করালাস্যে মৎসমাংসবলিপ্রিয়ে।
বলি গৃহ্ণ মহাদেবী পশুবক্ত সমাংসকং॥
আহ্ব‍ে রুধিরাকাঙ্ক্ষি বলিং গৃহ্ণ প্রসীদ মে।
প্রীতা ভব মহাকালী রক্ষ মাং দেবী চণ্ডিকে॥

সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে এসেও বাব বাব মনে পড়ছে কেষ্ট সাধুর কাছ থেকে শেখা সেই বলির মন্ত্রটা। আমাদেব এই দেহ-মন যে প্রকৃতিরই এক অঙ্গ তা অস্বীকাব কবা যায় না। প্রকৃতি মানুষেব মনে আনে তরঙ্গ; বাতাস তাকে দেয় দোলা, ঝর্ণা যোগায় ছন্দ, ঢেউ তাকে দেয আনন্দ আর কর্মোদ্দীপনা, মেঘ এনে দেয় ভাব; আর স্থান কাল পাত্র ভেদে মানুষের মন করে দিক্ পরিবর্তন; প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে জেগে ওঠে প্রেম। প্রাকৃতিক কারণেই আমার মনে উদিত হয়েছে তান্ত্রিক তীর্থ তারাপীঠের দৃশ্য।

প্রশান্ত মহাসাগরের কোলের উপর বসে বসে দুলছে যেন এই ছোট্ট অভিশপ্ত দ্বীপটি— ইস্‌লা দা পাস্‌কুয়া। দ্বীপের ভিতবকাব ছোট একটি লাভার খাদে আমি বসে আছি। আমার দু'ধারে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য পুবানো নর-কংকাল। খাদে ঢোকবাব পথেই পেয়েছি দু'ধারে দুটো মাথাব খুলি; আশপাশে অন্য কোন জন-মানবের চিহ্নমাত্র নেই। সূর্য অস্তমিত হয়েছে, গোধূলি লগ্নের আলোকে সৃষ্টি হয়েছে এক বহস্য-জগৎ, সেই জগতেব আমি ভৈরব।

কানে আসছে দূর সমুদ্রের ঢেউ ভাঙাব শব্দ— হঠাৎ এই পরিবেশে আমার মন চলে গেল বহু দূরে ফেলে আসা আমাব জন্মভূমিতে, বাংলায়। তাবাপীঠের মহাকালী মন্দিরের পরেই রয়েছে বিরাট ও বিস্তৃত শ্মশান। তারাপীঠ পার হয়ে সন্ধ্যার পর দ্বারকা নদীর ওপার দিয়ে যদি কেউ সেই শ্মশানভূমির দিকে এগোন, তাহলে আশ-পাশে যে দৃশ্য পড়বে, ঠিক সেই রকম। তারাপীঠের কথা লিখবার জন্য আমাকে মোটেই ভাবতে হয়নি; আবহাওয়া আর পরিবেশই আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছে। ঠিক সেই গা ছম-ছম করা পরিবেশ।

না! আমি তান্ত্রিক উপাখ্যান লিখতে বসিনি— তবে পরিব্রাজক মনের বর্তমান রূপটাকে ধরে রাখাই আমার উদ্দেশ্য। এখন কথা হচ্ছে... আমাদের দেশ থেকে বহু-বহু দূরে মহাসাগরের বুকে প্রায় হারিয়ে যাওয়া এই দ্বীপটিতে কে বা কারা সৃষ্টি করল এই রহস্যজগৎ? সে কথা জানাবার জন্যই আমার এ লেখা।

দ্বীপটার সরকারি নাম ইস্‌লা দা পাস্‌কুয়া। ফরাসী ভাষায় বলা হয় ইল্‌ দ্য পাক্‌, আব ইংরেজি নাম ইস্টার আইল্যান্ড। দক্ষিণ আমেরিকার চিলি দেশের অন্তর্ভুক্ত এই দ্বীপটি। চিলি ভূ-খণ্ড থেকে পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগরের উপর অবস্থিত এর দ্রাঘিমাংশ ১১০ ডিগ্রি এবং অক্ষাংশ ৩০ ডিগ্রি। চিলির প্রধান বন্দর ভালপারাইজো থেকে এর দূরত্ব দু'হাজার চল্লিশ মাইল। ইস্‌লা দা পাস্‌কুয়া থেকে পানামার দূরত্ব দু'হাজাব আটশ কুড়ি মাইল আর নিউজিল্যান্ডের দূরত্ব চার হাজার মাইল। বলাই বাহুল্য যে এটি পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধে।

১৭২২ খৃস্টাব্দে এই দ্বীপটি আবিষ্কৃত হয়। এই আবিষ্কারের মূলে ছিলেন হল্যান্ডেব নাবিক জ্যাকব রগেভিন্‌। তাবও আটচল্লিশ বছব পর স্পেন দেশীয় নাবিক ডন ফেলিপ্‌ গন্‌জালেস এই দ্বীপটিতে না জেনে শুনে হঠাৎ এসে তাঁর জাহাজ ভেড়ান। সেই সময় থেকেই দ্বীপটি স্পেনের অধীনে আসে।

এই সময়ে প্রশান্ত মহাসাগরেব বুকে ঘন-ঘন বিভিন্ন ইউরোপীয় অভিযাত্রী নাবিক ও বাণিজ্য জাহাজের যাতায়াত ছিল। মূল উদ্দেশ্য নতুন দেশ আর গুপ্তধনের সন্ধান। পর্তুগাল, স্পেন, হল্যান্ড, ইংল্যান্ড ও ফবাসীরা তখন নিত্য নতুন আবিষ্কাব ও উপনিবেশ স্থাপনে ব্যস্ত। দক্ষিণ আমেবিকা তখন বলতে গেলে প্রায় সবটাই ছিল স্পেনেব দখলে, অবশ্য পর্তুগীজরাও কম যাযনি। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ক্যাপটেন কুক্‌ এই দ্বীপে তাঁর জাহাজ ভেড়ান ; তারপব কিছুদিন বিশ্রাম করে চলে যান নিউজিল্যান্ডের দিকে। ১৮১৬ সালে ক্যাপটেন উরে লিসিয়ান্‌স্‌কি নামে একজন রাশিয়ান নাবিকও এখানে তাঁর জাহাজ ভেড়ান। এইভাবে একের পব এক বহু অভিযাত্রীদের আনাগোনা হয় এই দ্বীপে, কিন্তু বিশেষ কোন ধনরত্ন না থাকায় সেই সময় দ্বীপবাসীরা বিদেশীর কবল থেকে রক্ষা পেয়ে যায়। আসলে ১৮৮৮ খৃস্টাব্দ থেকে এই দ্বীপটা চিলির শাসনাধীনে আসে। আব আজও তাই— কাজেই এই দ্বীপের অধিবাসীরা চিলিয়ান নাগবিক।

দ্বীপেব ইতিহাস ও অন্যান্য তথ্য আমি পবে লিখব, কি করেই বা আমি এই দ্বীপে এলাম সে কথাও জানাব, কিন্তু আপাততঃ আবার ফিরে আসি আমাব আগের কথায় অর্থাৎ যে ভাব নিয়ে আরম্ভ করেছিলাম।

তারাপীঠে আমি ছিলাম ভৈরব কেষ্ট সাধুর সাথে— আর তারই সাথে ভ্রমণ কবি বক্রেশ্বর, তারপর নেপালের আরও কয়েকটি তান্ত্রিক তীর্থে। সে ছিল ১৯৬১ সাল। এখন ১৯৭১ সাল— কোথায় ভাবত আর কোথায় এই ছোট্ট দ্বীপ। দিন-রাত্রি ঋতু—ভাষা আর ভৌগোলিক অবস্থানের বিরাট তফাৎ ... তা সত্ত্বেও মনে হচ্ছে আমি যেন চলে গেছি সেই অতীতে। দ্বীপে আসার তিন দিনের দিন খুঁজে পেয়েছি এই খাদটা। অনেকটা ছোট খাটো উপত্যকার মধ্যে। এখানকার লাভা-মাটির ওপর অস্তমিত সূর্যের রেশ পরে বীরভূমের লাল মাটির মতই রঙ ধরেছে।

খাদের কঙ্কালগুলোকে দেখে প্রথমে ভেবেছিলাম নিশ্চয়ই এটা পুরানো কোন কবরখানা হবে। কিন্তু ভালভাবে পরীক্ষা করার পর আমার উৎকণ্ঠা আরও বেড়ে গেল। মনে হল মাথার খুলিগুলোকে কেউ যত্ন সহকারে যেন সাজিয়ে রেখেছে; শুধু তাই নয়, মাটির ওপর সেগুলো এমন গোলাকৃতি ভাবে পড়ে রয়েছে যাতে মনে হয় এটা হয়তো এককালে নরমুণ্ডমালা ছিল। অবশ্য সবটাই আমার অনুমান মাত্র। এমনও হতে পারে যে আমার এই অনুমানের সাথে বাস্তবের কোন মিলই নেই। গুহার মধ্যে আসবাবপত্র কিছুই নেই। গুহার বাইরে একটু দূরেই রয়েছে একটা পাথরের আসন, তাব মাঝখানে রয়েছে একটু উঁচু করা—হয়তো এক সময়ে ভৈরবদের সিদ্ধাসন।

এখন রাত ঘনিয়ে এসেছে, আকাশের তারাগুলো আস্তে আস্তে আবও স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগলো। এই উপত্যকা থেকে দূবে এখনও দেখা যাচ্ছে সারি সারি ধ্যানমগ্ন মূর্তি, স্থির অচঞ্চল ; তাবা তাকিয়ে আছে ধ্রুব নক্ষত্রের দিকে— নক্ষত্রজ্যোতিকে হৃদয়ে ধারণ করাই হয়তো তাদের মূল উদ্দেশ্য। এই ধ্যানমগ্ন মূর্তিগুলো আসলে বিরাট বিরাট পাথরেব মূর্তি— শুধু মুণ্ড, পাথরের তৈরি এই সব মূর্তিগুলোব মধ্যে কোন কোনটা দশ মিটার পর্যন্ত উঁচু—সত্যি বিরাট! প্রত্যেকটা মূর্তির গঠন একই প্রকার, শুধুই মুণ্ড, তাকিয়ে বয়েছে আকাশের দিকে— সীমার বাইবে অসীমকে জানাই হয়তো তাদের উদ্দেশ্য— অথবা হয়তো লক্ষ তারার রহস্য খুঁজতে খুঁজতেই তাদের দেহ পাথরে পবিণত হয়ে গেছে। কবে কে বা কারা এই মূর্তিগুলোকে তৈরি করেছে তা কেউ আজ পর্যন্ত জানে না। সেই স্টাচুগুলোব গা ঘেঁষে বাতাস বয়ে যাচ্ছে, এই বাতাস যেন তাদের সাধনায় ইন্ধন যোগাচ্ছে। আসলে এই স্টাচুগুলোই এই দ্বীপের প্রধান আকর্ষণ, প্রধান রহস্য। হাঁটতে হাঁটতে আমি শহবেব দিকে এগোতে লাগলাম। ছোট্ট দ্বীপেব একমাত্র শহর। বীরভূমের যে-কোনো একটা ছোট্ট গ্রামও এর থেকে বড়।

দ্বীপটার সরকারি নাম ইস্‌লা দা পাস্‌কুয়া বটে, কিন্তু দ্বীপবাসীরা পুবানো নামটাই ব্যবহার করে অর্থাৎ "রাপা নুই", বাপা নুই শব্দের অর্থ সমুদ্রেব নাভি। দ্বীপটার আয়তন মাত্র সাতচল্লিশ বর্গমাইল, অর্থাৎ দ্বীপের দক্ষিণ বা পূর্ব-পশ্চিমেব যে কোন প্রান্তে অনায়াসেই একদিনে হেঁটে চলে যাওয়া যেতে পারে। দ্বীপেব একমাত্র শহর, রাজধানী এবং লোকালয়ের নাম হাংগা রোয়া। হাংগা রোয়ায় লোকসংখ্যা মাত্র দেড় হাজার— ছেলেবুড়ো সব মিলিয়ে।

হাংগা রোয়া ছাড়া দ্বীপের অন্য কোথাও লোকের বাড়ী ঘর নেই। মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণীদের মধ্যে রয়েছে কয়েক লক্ষ ভেড়া, কিছু সংখ্যক গবাদি পশু আর যাতায়াতের মূল বাহন হিসেবে রয়েছে ঘোড়া। গাড়ী-ঘোড়ার মধ্যে সমস্ত দ্বীপে আছে মাত্র দুটি সরকারি জীপ। দ্বীপটা ত্রিকোণাকৃতির, তিন কোণায় রয়েছে তিনটি

আগ্নেয়গিরি। অবশ্য এখন মৃত, কিন্তু এক সময়ে অগ্নুৎপাতের ফলে প্রায় সম্পূর্ণ দ্বীপটাই এখন লাভায় ঢাকা। কবে যে এই অগ্নির উৎপাত ঘটে ঠিক করে বলা মুশকিল। তারই ওপর কোথাও কোথাও খুব পাতলা বালি-মাটির প্রলেপ পড়তে আরম্ভ করেছে। সে কারণেই দ্বীপে চাষবাস মোটেই সুবিধাজনক নয়। তা সত্ত্বেও প্রয়োজনের খাতিরে এখানকার মানুষরা চেষ্টা করছে কিছু কিছু ফসল ফলাবার। মিষ্টি আলু এখানে খুব ভাল হয়, আর কিছু কিছু কলাগাছও আছে— আর সাগরের ধারে বদ্ধ জলে প্রায়ই চোখে পড়ে পাটজাতীয় চাষ। তার থেকে দড়ি হয় আর মোটা কাপড়ও বটে। কয়েকটা নারকেল গাছ ও ইউকালিপটাস গোছের গাছও চোখে পড়েছে। আবহাওয়া ও শুক্‌নো ঘাসের দরুন ভেড়াদের এখানে স্বর্গরাজ্য বলা যেতে পারে।

অন্যান্য প্রসঙ্গ লেখার আগে প্রথমেই লিখি যে, আমি এই অজানা দ্বীপে কি করে এলাম।

কি করে এলাম! আমি নিজে যখন ভাবি তখন আরও আশ্চর্য হই। আমি যখন ১৯৬৭ সালে বাড়ি ছাড়ি তখন এই দ্বীপের নামও জানতাম না, আর এখন? কোথাকার ছেলে কোথায় বসে ডায়েরি লিখছি, তাও বাংলা ভাষায়। সবই তাঁর ইচ্ছা! আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সফর করে মেক্সিকো, গুয়াতেমালা, এল্‌ সাল্‌ভেদর, নিকারাগুয়া, কোস্টারিকা হয়ে আমি এসে হাজির হই পানামায়। সেখান থেকেই গিয়েছিলাম ওয়েস্ট ইন্ডিজে বা কারিব সাগরের দিকে, তারপর এসেছি পানামা হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে।

পানামা যদিও একটি ছোট্ট স্বাধীন দেশ, পানামা খালকে কেন্দ্র করে সেই দেশের মধ্যেই গড়ে উঠেছে কানাল জোন। কানাল জোনটা সম্পূর্ণ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শাসনাধীনে। পানামা খালের উত্তর শহরটির নাম কোলোন আর দক্ষিণ শহরের নাম পানামা।* আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সফর করার সময় আমার প্রচুর প্রশংসাপত্র ও যুক্তরাষ্ট্র সরকারি শুভেচ্ছা জ্ঞাপক চিঠিপত্র সংগৃহীত হয়, সে কারণেই কানাল জোন অথরিটির তরফ থেকে বিশেষ উৎসাহিত ও উপকৃত হই। প্রায়ই এদিক-ওদিক থেকে জলখাবারের জন্য ডাক আসতে লাগল।

ভেবেছিলাম এখান থেকে দক্ষিণ আমেরিকায় যাব, তার জন্য প্রস্তুতও হয়েছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত টোপোগ্রাফির নমুনা দেখে পিছু সরতে বাধ্য হই। মেক্সিকো থেকে পানামা পর্যন্ত যে প্যান আমেরিকান হাইওয়ে এঁকে বেঁকে চলে এসেছে সে রাস্তাটাই পানামা থেকে আরও শ'খানেক মাইল দক্ষিণে গিয়ে হঠাৎ যেন ফুরিয়ে গেছে, হাজারখানেক মাইল পাহাড়ি রাস্তা— তারপর আবার দক্ষিণ আমেরিকা, বিশেষ করে কলম্বিয়া থেকে আরম্ভ হয়েছে দক্ষিণ গোলার্ধের মহাপথ। আমার মনে হয়

---

* পানামার রাজধানী।

এ বিষয়ে নতুন করে আর না লিখে আমার পানামা ডায়েরি থেকে সরাসরি কয়েক পাতা তুলে ধরাই ভাল— তাতে পরিষ্কার ভাবে বোঝা যাবে যে কি করে আমি এই দ্বীপে এলাম।

পানামা

পানামার ·লোকদের ভাষা সাধারণতঃ স্প্যানিস, কিন্তু কানাল জোনের কারণে পানামা শহরে ইংরেজি ভাষারও যথেষ্ট প্রচলন রয়েছে। চারদিক থেকে প্রায়ই আমন্ত্রণ আসে। প্রায়ই এখানকার জনগণ আমাকে নিমন্ত্রণ করে তাদের বারে আর সেখানেই জমে ওঠে আমাদের আড্ডা। সাধারণতঃ পানামা বাসিন্দারা খুব মনখোলা— আমি গল্প বলি ইংরেজিতে আর তার তর্জমা করে স্থানীয় কোন একজন ছাত্র অথবা দাদা গোছের কেউ। এখানকার বার বা চায়ের দোকানগুলো খোলা থাকে অনেক রাত্রি পর্যন্ত; পরিবেশ আমাদের দেশের মতোই। এক কাপ কফি নিয়ে তিনঘণ্টা বসে থাকলেও কেউ উঠতে বলবে না। কোন কোনদিন আমার উঠতে অনেক রাত হয়ে যায়। আমি এখানে আছি খুব সস্তা দরের একটা হোটেলে, এটাকে হোটেল না বলে একটা চটি বলাই ভাল।

পানামা নাগরিক সম্বর্ধনায় উপস্থিত ছিলেন বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি —মেয়রও বটে। সবচেয়ে ভাল লেগেছে এখানকার জমজমাটে ভাব আর সমবেত নাচ। পরিচিত হলাম বিখ্যাত ফরাসী অভিযাত্রী ও নাবিক কম্যান্ডার কুস্তোর সাথে। কম্যান্ডার কুস্তোর নাম আমি বহুবার শুনেছি, তাঁর বহু কৃতিত্বের 'ডকুমেন্টেশন' রয়েছে ওয়াশিংটনের ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক গ্যালারিতে। সমুদ্রের গভীরে যাবার জন্য তিনি প্রথমে যে জিপটা ব্যবহার করেছিলেন সেটাও মিউজিয়ামে আমি দেখেছি। কম্যান্ডার কুস্তোর মাধ্যমে সেখানে পরিচিত হলাম আর এক ফরাসী নাবিকের সাথে— তার নাম মঁসিও সের্জ কুর্বে। মঁসিও সের্জ কুর্বে খুব ভাল লোক বলেই মনে হল— তিনি আমার সব কথা শুনে জিজ্ঞেস করলেন যে, আমি কোথায় যাব। কথায় কথায় আমি তাঁকে আমার পরিকল্পনার কথা বললাম আর তাঁকে বিশেষভাবে জানলাম যে, বর্তমানে আমি প্রায় কোণঠাসা হয়ে আছি অর্থাৎ দক্ষিণ আমেরিকায় সাইক্লিং করবার জন্য অনেক দেশ ভিসা নিতে নারাজ আর যারা দিতে চাইছে সে দেশে সাইক্লিং করবার মতো রাস্তা নেই.... কাজেই আমি সম্পূর্ণ আটকে গেছি।

মঁসিও সের্জ কুর্বে আমার সব কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন, তারপর জিজ্ঞেস করলেন,

—প্রশান্ত মহাসাগরের কয়েকটি দ্বীপ ঘোরার ইচ্ছা আছে?

—ইচ্ছে তো আছে, কিন্তু সুযোগ ও সামর্থ্যের অভাবে এখনও সেই পরিকল্পনা করতে পারছি না কারণ খরচ প্রচুর।

—সুযোগ ও সামর্থ্য বলতে তুমি কি বলতে চাইছ?

—এই যেমন ধরুন, টিকিটের খরচ প্রচুর, কারণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ ঘোরা একমাত্র ধনী ও সখেব পর্যটকদেরই পোষায়।

সের্জ আমার কথায় হো হো করে হেসে উঠলেন; তারপর বললেন,

—তার মানে তুমি বলতে চাইছ যে আমরা ধনী ও সখের পর্যটক!

আমি তাঁর কথা শুনে আমতা-আমতা করতে লাগলাম। অবশেষে তিনি হঠাৎ প্রস্তাবটা কবে ফেললেন,

—চল আমাদের সঙ্গে।

সামান্য কয়েকটা শব্দ— কিন্তু তাতে আমাব আনন্দ যেন উথলে উঠল। কিন্তু খুব সাবধানে আমাব উচ্ছ্বাসটা প্রকাশ না করে অতি সাধাবণভাবে জিজ্ঞাসা করলাম,

—বেশ, বাজি আছি কিন্তু সর্তটা কি?

ভদ্রলোক আগেব মতোই হেসে উঠে জবাব দিলেন,

—সর্ত? হাঁ অনেক কাজ—বোটে আমরা আছি পাঁচ জন, আমাদের থালা ধোওয়া, জলখাবাব তৈবি কবা আব ছোট-খাটো ফাই-ফবমাস জোগাতে হবে।

—ঠিক আছে আমি বাজি। কথাটা অতি সাধারণ ও নির্লিপ্তভাবে বললাম বটে, কিন্তু ওরা যদি দেখতে পেতো আমার বুকের ভেতবটা! আনন্দে প্রশান্ত মহাসাগরেব ঢেউএর মতই যেন আমাব বক্তটা ফুলে ফুলে উঠতে লাগলো। একেই বলে লাক্! —ওঃ কি ভাগ্য যে করেছি! ক'জনের ভাগ্যে এমন সুযোগ জোটে! ওঃ ভাবতেই পারছি না।....

সেই মঁসিও সের্জ কুর্বের সাথেই আমি এসে হাজির হয়েছি এই মহাসাগরের বহস্যময় দ্বীপে। কুর্বের দল বয়েছে বোটে— আসলে বোটটাই ওদের চলন্ত বাড়ী। আমি এসে উঠেছি এই শহবে অর্থাৎ হাঙ্গা রোয়ায়।

হাঙ্গা বোয়া শহবে বড় হোটেল বলতে কিছু নেই, দ্বীপেব কয়েকটি বর্ধিষ্ণু পরিবার, তাদের বাড়ির মধ্যে কয়েকটা ঘর আলাদা কবে বেখেছে অতিথিদের জন্য। সেই ঘরগুলিই সময়ে সময়ে ভাড়া দেওয়া হয়, আর খাওয়া-দাওয়া তাদের সাথেই করা যায় অথবা হোটেল রেস্তোরা রয়েছে। আমি একটা পবিবারেব পেয়িং গেস্ট হয়ে আছি। আমার ইচ্ছে ছিল বাইরের কোন একটা গুহায় থাকার, কিন্তু দ্বীপের মিলিটারী কর্তৃপক্ষ আমাকে সে অনুমতি দেয়নি। সরকারী নিয়ম, কাজেই মানতে বাধ্য।

আমি যে পরিবারের সাথে আছি তাদের টাইটেলটা জানি না —বংশের পদবী আছে কি না তাই বা কে জানে! তবে তাদের নাম আছে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, নাম কারারা, তার স্ত্রীর নাম মাতুনা আর ছোট ছোট ছটি ছেলেমেয়ে; সবচেয়ে বড় ছেলেটির নাম মাসা। এই দ্বীপটি চিলির অন্তর্ভুক্ত— ভারতবর্ষের যেমন আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। চিলির সরকারী ভাষা স্প্যানিস, কিন্তু এই দ্বীপের ভাষা সম্পূর্ণ আলাদা, এদের দেখতে যেমন পলিনেশিয়ান,

এদের ভাষাটাও তাই। হাংগা রোয়াকে শহর না বলে গ্রাম বলাই ভাল। ভাষার অভাবে এদের সাথে খুব বেশি আলাপ আলোচনা করতে পারছি না, তবে মেলা-মেশা করার কোন অসুবিধা নেই। গ্রামে উঠতি বয়েসি ছেলে-মেয়েদের অভাব নেই আর তাদের সাথে মেশবার জন্য প্রথমেই যা দরকার তা হচ্ছে সময় অর্থাৎ তাদের সাথে রাস্তার ধারে ঘন্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকলেই যথেষ্ট! ওদের সাথে সুর মিলিয়ে না গাইতে পারলেও কোন অসুবিধা নেই, বিশেষ দবকার হাসির। আমি জানি যে প্রাণ খুলে যে হাসতে পারে তার আবাব বন্ধুর অভাব কি?

মাসার বয়স চোদ্দ-পনেরো বছর— সে ইংবেজি বা ফরাসীর কিছু বোঝে না, স্প্যানিসে দু'চারটে কথা বলে— বাড়ীতে ওরা বলে পলিনেশিযান ভাষা, সে ভাষারও আমি কিছুই বুঝি না। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই পবিবারেব সাথে আমাব যোগাযোগের এতটুকু অসুবিধা হচ্ছে না— এই ধরনেব পবিবেশে আমি এখন খুবই অভ্যস্ত। মাসার সাথে গ্রামেব বাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াই আর দুপুরেব পব বেবিয়ে পবি দূরের দিকে। এই দ্বীপের যানবাহনের কথা আগেই লিখেছি, --সবচেয়ে সস্তা হচ্ছে ঘোড়া। সারাদিনেব জন্য একটা ঘোড়া ভাড়া কবে যেখানে খুশী ছুটে বেড়াও— কেউ বাধা দেবে না আর হারাবার সম্ভাবনাও কম।

হাংগা রোয়া গ্রামে হয়তো তিন-চারজনের বেশি কেউ ইংবেজি জানে না, তার মধ্যে একজনেব সাথে সেদিন হঠাৎ আমাব আলাপ হল। প্যার তিয়োভোর বয়স ষাটের কাছাকাছি, কাঁচাপাকা দাড়ি, বিরাট আলখাল্লা পবনে। জানুয়ারির সকাল, যেহেতু স্থানটা দক্ষিণ গোলার্ধের মধ্যে পড়ছে তাই গরমকাল, গরমকাল হলেও এই দ্বীপে সকালেব বোদটা ঠিক আমাদেব দেশে পৌষেব বোদেব মত। মাসার সাথে আমি বেড়িয়েছিলাম বাজার করতে; এখানকার রাস্তার ধারে সকালবেলা জেলেরা টাটকা মাছ নিয়ে বসে। খুব সস্তা আর টাটকা তো বটেই, যেন নড়ছে। আমাদের দেশের বিরাট রুই মাছের মত একরকম সামুদ্রিক মাছ এখানে পাওয়া যায় তা খুবই সস্তা, খেতেও খুব ভাল। তা ছাড়া হাঙ্গবও প্রচুর ধবা পড়ে। প্রায় সাত কেজির একটা মাছ কিনে—রাস্তার ধারে ধারে এগিয়ে যাচ্ছিলাম— পথে দেখা হয়ে গেল ফাদার থিওডোরের সাথে, ভদ্রলোক উপযাচক হয়েই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ডাকলেন,

—ওহে শুনছো!

—আজ্ঞে, আমি জবাব দিলাম।

—তুমি আসছ কোত্থেকে?

—মানে আমি কোন দেশীয় সেইটা জানতে চাইছেন?

—হ্যাঁ বল। তোমাকে আগে দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না।

—আজ্ঞে ঠিক বলেছেন। আমি ভারতীয় মানে এসিয়াটিক, এখানে একদল ফরাসী নাবিকদের সাথে বেড়াতে এসেছি।

—তুমি এসিয়াটিক, চমৎকার! তাহলে ভালভাবেই একটু আলাপ করা যাক, কি বল?

ভদ্রলোক চমৎকার কথা বলেন আর মিশুকেও বটে, তাকে এড়ানো সম্ভব হল না। মাছটাকে একটা পাথরের ওপর রেখে, সহজ হয়ে নিলাম, তারপর জিজ্ঞাসা করলাম,

—বলুন।

ওদিকে মাছটাকে পাথরের ওপর রাখতেই, মাসা সেটাকে সঙ্গে সঙ্গে তুলে নিল, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করল,

—আমি বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি। তার কথা শুনে আমিও ইসাবায় সম্মতি জানালাম।

ফাদার থিওডোর অনেকটা পুরানো বন্ধুর মতো আমার কাঁধে হাত দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,

—ভাষা শিখলে কোথায়?

—কোথায়ও না—আসলে আমি কিছুই বুঝি না। দেখলেন না ইসারায় কাজ সারলাম।

—তা বটে, তা বটে... ...।

—আমাব নাম বিমল— আপনি?

—আমাকে সবাই প্যাব থিওডোব বলে, আমি এখানকাব গীর্জার দেখাশুনা করি। আব ভগবান যীশুব উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করি। সান্তিয়াগোব ক্যাথলিক মিশনের আমি প্রতিনিধি।

ভদ্রলোকেব কথা শুনে আমি ভক্তেব মতো তাঁর হাতটা তুলে নিয়ে চুমু দিয়ে বললাম,

—আপনার সাথে পরিচিত হয়ে আমি ধন্য হলাম।

ভদ্রলোক সাগ্রহে আমাকে জিজ্ঞেস কবলেন,

—তুমি কি ক্যাথলিক?

খুব সাবধানে তাঁর প্রশ্নটাকে এড়িয়ে গিয়ে বললাম,

—যারা ভগবান যীশুকে অবিশ্বাস করে আমি তাদের মধ্যে নাই। ভদ্রলোক আমার কথার কি সাবমর্ম করলেন জানি না, তবে আমাকে অতি সাদরে জড়িয়ে ধরে বললেন,

—তোমার মঙ্গল হোক। ভগবান যীশু তোমাকে রক্ষা করুন। চল তোমাকে গীর্জাটা পরিদর্শন করাই।

গীর্জাটাকে বাইরে থেকে কয়েকবার দেখেছি, কিন্তু ভিতরে ঢুকিনি। বলতে গেলে এই গীর্জাটাকে কেন্দ্র করেই এই শহরটা গড়ে উঠেছে। গীর্জাটা সাদা একটা একতলা

বাড়ি—পুরানো স্প্যানিস মিশনারিদের গীর্জাগুলো যেমন হয়ে থাকে। সামনের বারান্দায় ছাদের ওপর যোগাকৃতির একটা লোহার শূল। আর সামনেই রয়েছে যীশু-মাতা ভার্জিন মেরীর একটি পাথরের মূর্তি। সাদা অপরূপ দেবী মূর্তি, মুখে দেবী ভাব, অভয় বাণীই যেন প্রতীক। ভিতরে ঢুকলাম— হলঘরটার মধ্যে সারি সারি বেঞ্চি পাতা, আর জানলাগুলোকে নানা রঙের কাঁচ বসিয়ে সাজানো হয়েছে—দূরে ভগবান যীশুর ক্রুশবিদ্ধ মূর্তি। হাঁটু গেড়ে তাঁর উদ্দেশ্যে আমার ভক্তি নিবেদন করলাম। কিছুক্ষণ পর আমরা বেরিয়ে এলাম বাইরে। গীর্জার এমন কিছু বিশেষত্ব আমি খুঁজে পেলাম না; নেহাৎই উপাসনা কেন্দ্র মাত্র। এই দ্বীপের একমাত্র ধর্মীয় মিলন কেন্দ্র। প্যার তিওডোর বা ফাদার থিয়োডোর একই নাম। তিনি আমাকে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন, সেই ভদ্রলোক জার্মান পাদ্রী। বহুদিন যাবৎ তিনিই এই দ্বীপের শ্রেষ্ঠ গুণী ও জ্ঞানী ব্যক্তি হিসেবে সম্মানিত ছিলেন, তবে বর্তমানে বয়সের কারণে শরীর প্রায় ভেঙে পড়েছে; বলতে গেলে তিনিই এই দ্বীপের সকলকে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত করেছেন। এখনও যদি দ্বীপের যে কোন সাধারণ লোককে জিজ্ঞাসা করা যায়—'এই দ্বীপের মালিক কে?' উত্তর— 'এই জার্মান পাদ্রী আর ক্যাপটেন অররেগো।' ক্যাপটেন অররেগো এখানকার চীফ অফ মিলিটারী সার্ভিস্, প্রথমদিনই তাঁর সাথে আমার পরিচয় হয়েছে। এক নজরে তাঁকে দেখে প্রথমেই মনে পড়েছে— বিহারের গ্রামের এক জবরদস্ত দারোগার কথা।

এই দ্বীপে প্রথমদিন যখন আমাদের বোট এসে ভিড়ল, সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাসীরা সাগরের ধারে এসে আমাদের হাত নেড়ে সম্ভাষণ জানিয়েছে, হাসিমুখে ল্যাংটো ছেলেমেয়ের দল চিৎকার করে করে বলেছে— ইয়া ওরানা ওয়ে.... ই-য়া ও-রা-না ও-য়ে—এখানকার রীতিতে সাদর সম্ভাষণ। আমাদের বোটটাকে নোঙর করে উপরে উঠেই প্রথমেই যার সাথে হাত মেলাতে হল তিনিই হচ্ছেন এই দ্বীপের জবরদস্ত ক্যাপটেন পরতিল্লা অররেগো। ফাদার থিয়োডোর আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন,

—সিনিযর (সম্মানীয়) অররেগোর সাথে পরিচয় হয়েছে?

সিনিয়র অররেগো কে সে কথা বুঝতে না পেরে জবাব দিলাম— না এখনও হয়নি, কারণ আমাদের বোট ভিড়তেই কারারা আমাকে সরাসরি তার বাড়ীতে নিয়ে এসেছে, কাজেই এখনও সকলের সাথে পরিচয় হয়নি।

—বল কি? চল, সিনিয়র অররেগো তোমার সাথে পরিচয় হলে নিশ্চয়ই খুশী হবেন, বিশেষ করে এই দ্বীপে তুমি প্রথম ভারতীয়। কলকাতার নাম আমি ভূগোলে পড়েছি, মনে হয় সিনিয়র অররেগোও নিশ্চয়ই কলকাতার নাম শুনেছেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা সিনিয়র অররেগোর বাড়িতে এসে ঢুকলাম। বাড়ির আশ-পাশে কিছু মিলিটারী চোখে পড়ল। ফাদার থিয়োডোরের সাথে সকলেরই জানাশুনা, কাজেই বাড়িতে ঢুকতে কোন অসুবিধাই হল না। বাড়ির ভিতরকার উঠোনে ঢুকতেই দেখি সামনে চেয়ারে বসে আছেন একজন মিলিটারী অফিসার— এই ভদ্রলোকই

প্রথমে আমাদের বিষয়ে সব শুনে দ্বীপে ঢোকবার অনুমতি দিয়েছেন। ফাদার থিয়োডোর এই ভদ্রলোকেব দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে— মনে হল আমার সম্পর্কে, স্প্যানিস ভাষায় কিছু বললেন, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,

—ইনিই সিনিয়ব অররেগো।

সিনিয়ব অররেগোর সাথে আমি করমর্দন করলাম। এবার বুঝলাম যে সিনিয়র অররেগো আর মিলিটারী চীফ ক্যাপটেন অররেগো একই ব্যক্তি। তাঁর পাশেই আমরা একটা বেঞ্চিতে বসলাম।

প্রথমেই আমাব প্রসঙ্গ উঠল অর্থাৎ আমি যে আসলে এসিযাটিক ভাবতীয় এবং কলকাতার লোক সেটাই তাঁদেব মূল আলোচ্য বিষয়। ক্যাপটেন অবরেগো কলকাতা ঠিক কোথায় বার বার মাথা চুলকিয়েও তা ঠিক মনে করতে পারছেন না, তবে তিনি জোর দিয়ে এবং আশ্বাস দিয়ে বললেন যে ভিযেৎনাম থেকে খুব বেশি দূরে নয়। তাঁব অনুমানেব আমি ভূয়সী প্রশংসা না কবে পারলাম না —তাঁব স্মবণশক্তিব তুলনা চলে না। আমার প্রশংসায খুশী হয়ে তিনি একটু চেযাবে নডেচড়ে বসলেন। তাবপর ফাদার থিওডোবেব দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস কবলেন,

—একটু কফিব অর্ডাব দিই?

ফাদার থিওডোব মনে হয় সে অপেক্ষাতেই ছিলেন—তিনি তো সঙ্গে সঙ্গেই রাজি।

ক্যাপটেন হঠাৎ আমাব দিকে ঝুঁকে জিজ্ঞাসা করলেন,

—ভাল কথা, তোমাব ন্যাশনালিটি কি?

—ভাবতীয়। আমি জবাব দিলাম।

—ভারতীয়? বল কি? বলেই ক্যাপটেন হঠাৎ যেন লাফিযে উঠলেন— তারপর আবার জিজ্ঞাসা কবলেন,

—তুমি তাহলে ফবাসীব লোক নও?

—আজ্ঞে না, ওদেব সাথে এসেছি মাত্র।

হঠাৎ যেন কোথায একটা বিরাট ভুল হয়ে গেছে— ক্যাপটেন অস্বস্তিকব অবস্থায় চেয়াব ছেড়ে উঠে বসলেন, তারপর বললেন,

—তোমাব পাশপোর্টটা দেখাও তো?

আমি পকেট থেকে পাশপোর্টটা বার করে তাঁর হাতে দিলাম, ভদ্রলোক আমার ভারী পাশপোর্টটা বার বার পাতা উলটে দেখতে লাগলেন, তারপর বললেন,

—কোথায়, ভিসা কোথায়?

সর্বনাশ! আমি এ ধরনের প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না, কারণ পানামায় চিলিয়ান কনস্যুলেট আমাকে জানিয়েছে যে চিলি যাবার জন্য আমার কোনো ভিসার প্রয়োজন নেই। সেই কথাটাই আমি ক্যাপটেনকে খুলে বললাম। ক্যাপটেন গম্ভীরমুখে বললেন,

—তা ঠিক, কিন্তু এনট্রি পারমিট দরকার।

—এনট্রি পারমিট কেন?

—এখানে ঐতিহাসিক স্টাচুগুলোর বিষয়ে গবেষণা করতে এলে স্পেশাল পারমিট এবং এনট্রি পারমিট দরকার।

—কিন্তু আমি তো এখানে গবেষণা কবতে আসিনি, আমি এসেছি বেড়াতে!

এইভাবে আমাদের কথাবার্তা যখন চলছে তাবই ফাঁকে ফাদার থিওডোর 'কাজ আছে' বলে কফি আসবার আগেই সরে পড়লেন। আমি এইধরনের ঝামেলার কথা চিন্তাও করিনি। যাই-হোক, এক কথা দু'কথাব পর তাঁকে আমি খুলে বললাম আমার ইতিহাস, অর্থাৎ কিভাবে ভারত থেকে এসেছি, কিভাবে দেশ-বিদেশে ঘুরছি, কিভাবে পানামায় এলাম— কিভাবে এই ফবাসী নাবিকদের সাথে পরিচিত হয়েছি, ইত্যাদি সব। আমাব কথা প্রথমটায় ক্যাপটেন ঠিক বিশ্বাস কবতে পারেননি। কিন্তু আমি যখন জোর দিয়ে বললাম যে, আমি যা বলছি তা সবই সত্য, এবং আমার কাগজপত্র সব আছে; শুধু তাই নয় পানামাস্থ চিলি এম্বাসীব অনেকেই আমাকে চেনে, তখন বিশ্বাস না করে আব উপায় কি? মধুরতর পরিবর্তে আমাদের আলাপ রুক্ষভাবেই শেষ হল; কিন্তু তবুও ভদ্রলোক আমাকে কফি খাওয়া থেকে বঞ্চিত করলেন না— কোনবকমে সেখান থেকে ছাড়া পেয়ে আমি ধবলাম বাড়ীব পথ— ওদিকে মাছের চিন্তা আমাকে টানছে।

দ্বীপবাসীদেব খাওয়াটা অনেকটা আমাদেব খাওযাব মত, তবে মাছ ভাজার পরিবর্তে এবা স্যাঁকা মাছটাই বেশি পছন্দ কবে। তাতে তেলেব খবচ বাঁচে। এখানকার লোক দু-আড়াই কিলোর একটা মাছ একাই শেষ কবে ফেলে। মাছই এখানকার প্রধান খাদ্য— শাক-সব্জিব দাম প্রচুর, কারণ এখানে চাষ-আবাদের সুবিধা মোটেই নেই।

এই দ্বীপে প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজাব ভেড়া আছে, কিন্তু দ্বীপবাসীদেব পক্ষে তা কেনা অসম্ভব— প্রচুব দাম। বছরে একবাব সান্তিয়াগো থেকে সরকাবি জাহাজ আসে বাড়তি ভেড়া নিতে— শহরেব জন্যই সেগুলো বিক্রয় করা হয়। তবে এখানকার মিলিটারী ও গীর্জার কর্তৃপক্ষের কথা আলাদা— তাঁরা হচ্ছেন এ দেশেব রাজা। গণ্যমান্যদেব জন্য রয়েছে রাজসিক খানা।

দ্বীপবাসীদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আস্তে আস্তে আরও জানতে লাগলাম— সাধারণ দ্বীপবাসীরা পলিনেসিয়ান, আব দ্বীপে যাবা চিলিব থেকে সরকারি কাজে এসেছে তাদের ভাষা স্প্যানিস্। এক নজবে দেখলেই মনে হয় দ্বীপবাসীদের মনে আনন্দ নেই, এই দ্বীপে জন্মানো যেন একটা অভিশাপ। চিলিয়ান সরকার এই দ্বীপবাসীদের জন্য একটা গীর্জা ও ছোট একটা প্রাইমারী স্কুল খুলে দিয়েই তাঁদের কর্তব্য সম্পাদন করেছেন; দ্বীপবাসীদের ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই। বছরে একবার চিলির থেকে বোট আসে আর মাঝে মাঝে বিদেশী নাবিকদের ছোটখাটো বোট আসে এখানে। যখন কোন বোট এখানে এসে ভিড়ে তখন সেই বোটকে কেন্দ্র করে দ্বীপবাসীদের

মধ্যে এক আলোড়ন ওঠে। বোটের যাত্রী বা আরোহীদের কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে বিভিন্ন গল্প—অধিকাংশ সময়েই এই গল্পের সাথে সত্যতার কোন যোগাযোগই নেই। ভেড়া ও অন্যান্য গবাদি পশুর দেখা-শুনা করাই দ্বীপবাসীদের প্রধান জীবিকা, মাছ ধরাও এদের একটা পেশা এবং সখও বটে। মেয়েবা সাধারণতঃ বাড়ীর কাজকর্ম করে। এদের দেখতে অনেকটা অন্ধ্রপ্রদেশেব সমুদ্রতীরবর্তী জেলেদের মতো। এরা চিলি বাজ্যের অধীন বটে, কিন্তু চিলি বা দক্ষিণ আমেরিকার সাথে এদের বংশগত কোন যোগাযোগ নেই। চিলির নাগরিকেরা স্পেন্-অরিজিন অথবা আমেরিকান-ইন্ডিয়ান। আমার আফশোষ হচ্ছে, —এদের ভাষাটা যদি জানতাম তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের সাথে এদেব অনেক মিল বের করে ফেলতাম। বিশেষ করে মহিলাদের কথা—তাদের হাবভাব, চাল-চলন ঠিক আমাদের দেশেবই মত, বিশেষ করে বিদেশীর দিকে এরা যখন লুকিয়ে লুকিয়ে তাকায়। বন্দব বলতে আমরা যা বুঝি এ দ্বীপে সে রকম কিছুই নেই, প্রশান্ত মহাসাগবীয় কোন যাত্রীবাহী জাহাজের এখানে আসা বিপজ্জনক। জলের নীচের পাথব ও ঝামাব দরুন এখানে বোট লাগানো খুবই বিপজ্জনক। মঁসিও কুর্বের বোটটা প্রশান্ত মহাসাগবে পাড়ি দেবার পক্ষে যথেষ্ট শক্তিশালী বটে কিন্তু সেটা নেহাৎই সখের বোট। চওডায় পাঁচ মিটার, আব লম্বায় বাইশ মিটাব, একশ ছ মিটাব স্কোয়াবেব একটা পাল আব, বারলিয়ে ডিজেলেব একটা মোটর; আমাকে নিয়ে বোটে ছিল সাতজন। আমাব মনে হয় প্রশান্ত মহাসাগবেব এটাই সবচেযে ছোট বোট— অন্ততঃ আমাব চোখে তো তাই দেখেছি। চিলিব ভালপোবাইজো বন্দর থেকে যে বোট আসে তা এখানকার বন্দরে নোঙব ফেলতে পাবে না, অনেক দূরে থাকে; ছোট ছোট বোটে কবে মালপত্র নামানো ওঠানো হয়। এখানকার একমাত্র বন্দর নাম হাংগা রোযা, সেখানে তক্তা পেতে সাময়িক ঘাট তৈরি হয়েছে। প্রত্যেক বছরেই সেটাকে পাল্টানো হয়। গাদাবোট থেকে মাল খালাস কবার জন্য এবকম ঘাট প্রাযই গঙ্গাব ওপর দেখা যায়। চিলি তথা মুল ভূখণ্ডের সাথে এদের যোগাযোগ বছরে একবার, তখনই আসে জামা-কাপড় মশলা-পাতি, চিঠিপত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র।

ভালপারাইজো থেকে জাহাজ আসা মাত্র গ্রামেব লোকেদের মুখে ফুটে ওঠে হাসি আর চলে নাচ-গানের উৎসব। সম্প্রতি চিলিয়ান সরকার একটা বিমান বন্দর করেছে, হয়তো লাভাব জন্য —সমুদ্রে বন্দর তৈরী করা প্রায় অসম্ভব। এই দ্বীপেব বিরাট বিরাট স্ট্যাচুগুলোর জন্য দ্বীপর নাম আজকাল ছড়িয়ে পড়েছে; চারদিক থেকে শিল্পী ঐতিহাসিক নৃতত্ত্ববিদ আর প্রত্নতাত্ত্বিকেরা আসতে চাইছেন এ দ্বীপের মূর্তি-রহস্য উৎঘাটন করতে। চিলিয়ান সরকারের মতে বছরখানেকের মধ্যেই এই দ্বীপটি একটা ট্যুরিস্ট স্পট হয়ে দাঁড়াবে। আকাশপথে আমেরিকা থেকে নিউজিল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়া যাবার পথে এটাই হবে ট্যুরিস্টদের একমাত্র বিশ্রামকেন্দ্র। চিলিয়ান সরকার এই দ্বীপের জন্য একটা স্বতন্ত্র পরিকল্পনাও নাকি করেছে; তারমধ্যে আছে কুটীরশিল্প, শিক্ষা ও উন্নত সমাজ-ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি। তারই প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে

তৈরি হয়েছে এই বিমান বন্দর। খুব শীঘ্রই এই ছোট্ট শান্ত দ্বীপে দেখা দেবে বোয়িং, আর বিদেশী মুখ দেখে অন্ততঃ একঘেয়েমির হাত থেকে রক্ষা পাবে এই দ্বীপবাসী। ব্যবসাতে মুখরিত হয়ে উঠবে এখানকার পথঘাট। একমাত্র বিমান বন্দর ছাড়া এখনও এই দ্বীপে পাকা রাস্তা হয়নি— সমুদ্রে মাছ ধরার জন্য নৌকারও অভাব। সরকারের উচিত রাস্তা আর মাছ ধরার সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির জন্য পরিকল্পনা কবা, এটা আগে দরকার। যাই হোক, সেসব এ দেশবাসীর সমস্যা।

দ্বীপে একটা বিবাট ট্যুরিস্ট ইনফবমেশন সার্ভিস খোলা হবে। বর্তমানে যিনি সবরকমের তথ্য সরবরাহ করে থাকেন তিনি হচ্ছেন প্যার সেবাস্তিয়ান অন্‌জেলে, এই বুড়ো ভদ্রলোকই; এখানকাব গীর্জার সর্বেসর্বা। প্যাব থিওডোর নতুন এসেছেন, তিনি প্যাব অন্‌জেলেকে বিভিন্ন বিষয়ে সাহায্য কবেন মাত্র।

এই দ্বীপেব সম্পর্কে আমি আগে কিছুই জানতাম না, বোটে থাকাকালীন অর্থাৎ চলার পথে কুর্বেব কাছ থেকেই যা শুনেছি, আব বাকি তথ্য আহরণ করেছি এই দ্বীপবাসীদের কাছ থেকে। ভাষাব সমস্যাব জন্য বাব বাব যেতে হচ্ছে প্যাব থিওডোবেব কাছে, আর তা ছাড়াও সম্প্রতি এসেছে আব এক আমেরিকান প্রত্নতাত্ত্বিক দল। তাবাও এসেছে বোটে; আমার তথ্যেব জন্য তাবাও আমাকে সাহায্য করছে। তবে তাদের ও আমার দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ আলাদা। তাবা দেখছে বিশেষজ্ঞেব দৃষ্টিভঙ্গিতে আব আমি দেখছি আমাব ভারতীয় মন দিয়ে।

১৭২২ সালে হল্যান্ডের নাবিক জ্যাকব বগ্‌গেভীন এই দ্বীপটি আবিষ্কার করার পর থেকে এব কোন উন্নতিই হয়নি। অর্থাৎ দেশবাসীবা যাকে বলে ওয়েস্টার্ন সিভিলাইজেসন তার কোন খবরই পায়নি। ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত এই দ্বীপটি সাণ্টিয়াগোর এক ব্যবসায়ীব অধীনে ছিল; ব্যবসায়ী ভদ্রলোক সম্পূর্ণ দ্বীপটা ভাড়া নিয়ে শুধু ভেড়া ও ঘোড়ার চাষ করতেন। সেই ভদ্রলোক ছিলেন যাকে বলে সত্যিকারেব ঝানু ব্যবসায়ী, ব্যবসা ছাড়া আর কিছুই তিনি জানতেন না। এই যে কয়েকশ' স্ট্যাচু দ্বীপময ছড়িয়ে আছে, তাব যেন কোনো বৈশিষ্ট্যই নেই, আর এখানকার পলিনেশিয়ান নাগরিকরা, তারা যেন জন্মেছে শুধু ভেড়া চরাতে। বলাই বাহুল্য যে এই ব্যবসায়ী ভদ্রলোক ছিলেন আসলে সাদা চিলিয়ান, অর্থাৎ স্প্যানিস্ অরিজিন; সাদা মানুষদেব হীন-প্রভুত্ব বৃত্তি নিয়েই মনে হয় তিনি জন্ম নিয়েছিলেন।

* * * *

দ্বীপে আমাব করার মতো খুব বেশি কিছু নেই, কুর্বেব দল বিভিন্ন স্ট্যাচুর গবেষণা কাজ নিয়ে ব্যস্ত— কাজেই তাদের বিবক্ত করা ঠিক নয়। তাদের সাথে আমার দিনে একবার মাত্র দেখা হয়— এখানকার বাজারই এক মিলন কেন্দ্র। আমি একা একা ঘুরে বেড়াই— এই লাভাময় দ্বীপে, অধিকাংশ সময় দুপুরের খাওয়া সেরে

আমি বেরিয়ে পড়ি। বাতাসে গন্ধ পাচ্ছি। দক্ষিণ মেরু, সামান্য ঠাণ্ডার ওপর ফুরফুরে হাওয়া সমস্ত দ্বীপটাকে গরমের হাত থেকে রক্ষা করছে। সেদিন চলে এলাম দ্বীপের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে, বিরাট লাভাভূমির ওপর দাঁড়িয়ে আছে সাতটা স্টাচু, এক একটা আট-ন ফুটের কম নয়। পরিষ্কার ভাবেই দেখা যায় যে পাথর কেটে এ জায়গাটাকে সমতল করে ওপরে এই স্টাচুগুলোকে বসানো হয়েছে। নীল আকাশের নীচে এ এক চমৎকাব বেদী আর তারই সামনে রয়েছে বিস্তৃত মাঠ— একদিন হয়তো অগণিত ভক্ত এই মাঠের ওপর হাত জোড় করে এসে দাঁড়াতো। আশ্চর্য বটে! দ্বীপটার ভূমিকে আমি আইসল্যান্ডের সাথে তুলনা কবতে পারি। কিন্তু এই স্টাচুগুলোকে তুলনা করবো কিসের সাথে! আমি অনেক ঘুরেছি, দেখেছি মিশরের পিরামিড, ডেল্‌ফির অ্যাপোলো মন্দির, আমাদেব অজন্তা ইলোবা, মেক্সিকোর মায়া স্থাপত্য; কিন্তু এই দৈত্যাকৃতি মূর্তিগুলোর সাথে তুলনা কবার মতো কিছুই এর আগে দেখিনি। আমি অবাক হয়ে দেখি —একি দৈত্য না দেবতা, কবে কে বা কাবা কি উদ্দেশ্যে এগুলো তৈবি কবেছে ইতিহাস তাব কিছুই জানে না।

আমি আস্তে আস্তে উঁচুতে উঠতে লাগলাম। সামনেই নজবে পড়ল একটা শুকিয়ে যাওয়া ভলকানোর মুখ। এই ভলকানোই হয়তো ধ্বংস কবেছে এখানকাব ইতিহাস। পাহাড়েব ওপর আরও কিছুদূর উঠতেই সামনে হঠাৎ এক নতুন দৃশ্য নজরে পড়ল। পাহাড়টা যেন হঠাৎ এখানে শেষ হযে গেছে আর আমাব সামনেই এক বিবাট খাদ, সামনে প্রশান্ত মহাসাগর, পাহাড়েব নীচে মহাসমুদ্রের জলটা আছড়ে আছড়ে পাহাড়েব নিচে শুকনো-শক্ত লাভাব ওপবে পড়ছে— মনে হয পাহাড়ের সাথে যেন সাগরের চির বিদ্বেষ। আমাব ঠিক ডান দিকেই পাহাড় ঘেঁষে মনে হয় একটা প্রাচীন বাস্তা এগিয়ে গেছে—এখন সেটা আগ্নেয়গিরিব লাভায় ভর্তি। কৌতূহল হল— দেখা যাক কোথায় গিয়ে এব শেষ হয়। খুব সাবধানে এগোতে লাগলাম; পাহাড়েব পাঁচিল ধরে অতি সন্তর্পণে এক-পা দু-পা করে এগোনো ছাড়া উপায় নেই— একটু অসতর্ক হলেই ব্যস, কয়েকশ' মিটাব নিচে প্রশান্ত মহাসাগবেব জলে গিযে পড়তে হবে। তবুও এগিয়ে চলেছি। মানুষেব কৌতূহল অদম্য, জীবনকে বার বার হাতে নিযেও মানুষ এগোতে পিছ-পা হয় না— এ কৌতূহল শুধু আমার নয়, মানুষ মাত্রেই এই কৌতূহলের অধিকারী। পঁচিশ তিরিশ মিটার খুব সাবধানে এগোতেই দেওয়ালটা একটু বাঁক নিয়েছে, কাজেই আমিও বাঁক নিতে বাধ্য হলাম। তারপর আরও কযেক পা এগোতেই সামনে পেলাম একটা সমতল ভূমি। কোনরকমে সেখানে পা দিয়েই বুকে হাত দিয়ে অনুভব করতে লাগলাম আমার বুকের শব্দ, যাক বাবা— বেঁচে গেছি! এবার ডান দিকে ঘুরতেই চোখে পড়ল একটা গুহা। ভালভাবে নজর ফেলতেই চোখে পড়ল সাদা সাদা কি একটা পদার্থ, সেদিকে এগিয়ে গেলাম—অবাক কাণ্ড! গায়ের লোমকূপগুলো সব যেন দাঁড়িয়ে উঠল— দুটো কংকাল পাশাপাশি শুযে রয়েছে। আর তারই কিছুদূরে বিচ্ছিন্নভাবে পড়ে রয়েছে কিছু মানুষের হাড়গোড় ও একটা মাথার খুলি। মনে মনে ভাবলাম মানুষের কৌতূহল শুধু বিপদই আনে

না— তাকে এনে দেয় পৃথিবীর অজানা গুহার রহস্যালোকে। আমি নিজের কৌতূহলকে নিজেই প্রশংসা করতে লাগলাম—এখানে এসে ভালই করেছি। গুহাটা মনে হয় আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলেই সৃষ্টি হয়েছে— ভেতরটা স্যাৎসেতে ও ভ্যাপসা গন্ধে ভর্তি। গুহার অবস্থানটা অতি চমৎকার। এখান থেকে প্রায় আটশ' ফুট নিচে সমুদ্রের ঢেউগুলো আছড়ে আছড়ে পড়ছে, দূরে অসীম দিগন্ত বিস্তৃত সাগর, বাঁদিকে দুই পাহাড়ের মধ্য দিয়ে দেখা যাচ্ছে নাম না জানা কতগুলো স্ট্যাচু, সাগরের দিকে তাকিয়ে তারা যেন ধ্যানমগ্ন। দ্বীপের তিনকোণায় যেখানে আগ্নেয়গিরির মুখ রয়েছে, —বলাই বাহুল্য যে সে সব এলাকা অপেক্ষাকৃত উঁচু —অনেকটা নৈনিতালের নেতাজি (নয়না) পিকের মত।

এ পাহাড়ের অবস্থানটা চমৎকার, মাঝে মাঝে ঝড়ো হাওয়া ঝামাকৃতি পাথরগুলোর মধ্য দিয়ে বয়ে যাচ্ছে আর তারই ফলে সৃষ্টি করছে এক চমৎকার শিষ দেবার মত শব্দ— মনে হচ্ছে শ খানেক লোক একসাথে শিষ দিচ্ছে। হাংগা রোয়া থেকে এখানে আসতে আমার প্রায় চার পাঁচ ঘণ্টা লেগেছে। এখানে আসার কোন পরিকল্পনা আমার আগে ছিল না— আমি আগেই লিখেছি যে নেহাৎই কৌতূহল। মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির হাড় বা মাথার খুলি আমি অনেক দেখেছি— দু-একবার নরকংকালও খুটিয়ে খুটিয়ে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে— কিন্তু সে পরিবেশ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আমার সামনে এই নরকংকাল দুটো দেখে মনে হচ্ছে— এখানেই তাদের শেষ নিশ্বাস পড়েছে, আর কালের কারণে চামড়া মাংসগুলো গলে গিয়ে পড়ে রয়েছে শুদ্ধ ধবধবে দুটো কঙ্কাল। কি আশ্চর্য আমাদের দেহ! এই দেহে যখন প্রাণ থাকে, তখন কত কথা, গান, কবিতা আর ভাবের রাজ্যে সে বিচরণ করে; আর সেই প্রাণ যেই বেরিয়ে যায়— 'কার বা গোয়াল কে দেয় ধোঁয়া!'

আমি কংকাল-বিশেষজ্ঞ নই, তবুও কংকাল দুটো দেখে মনে হয় স্ত্রী-পুরুষ হয়তো হবে। কংকাল দুটো নিশ্চয় একদিন জীবিত ছিল, এখানে কি করে এল? কি ভাবেই বা মারা গেল? আমার সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে ইচ্ছা করছে— কিন্তু কে দেবে তার উত্তর! গুহার মধ্যে রয়েছে পাথরের একটা বেদী, আর দেওয়াল ঘেষা রয়েছে একটা খোপ, সেটা কাঠ-কয়লায় ভর্তি। গুহার পাশ দিয়ে আরও একটা সরু বারান্দা ধরে পাহাড়ের ওপরের দিকে উঠতে লাগলাম। প্রায় তিরিশ পঁয়ত্রিশ মিটার চলবার পর হঠাৎ ওপরের দিকে আমার নজর পড়ল। পড়ন্ত সূর্যের লাল রঙে আঁকা একটা ফ্রেস্কো। পাহাড়ের গায়ে বিরাটাকৃতির এই ফ্রেস্কোটার মধ্যে বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাবার জন্য নিখুঁতভাবে পরীক্ষা করতে লাগলাম। মনে হয় একটা পাহাড়ের গায়ে বাটালি দিয়ে কেউ ছেলেমানুষি করে এই মূর্তিটাকে খোদাই করেছে। মানুষের দেহের ওপর একটা পাখীর মুণ্ড, মধ্য প্রদেশের অনেক গ্রামে রামায়ণ পাঠের সময় এই ধরনের জটায়ু চিত্র আমি দেখেছি— দেশ থেকে কত দূরে অথচ কত মিল, খাজুরাহো যাবার পথে সাতনার পর অনেক গ্রামের মাটির দেয়ালেও এই ধরনের চিত্রে আলপনা দেখেছি বলে মনে পড়ে, তবে তফাৎ হচ্ছে এই যে,

এখানে আলপনার পরিবর্তে পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা ফ্রেস্কো। আশপাশের পাহাড়ের গায়ে আরও অনেক এই ধরনের খোদাই করা কাজ চোখে পড়ে, কিন্তু কোন চিত্র কোন ধবনের ভাব প্রকাশ করেছে তা আমার পক্ষে জানা অসম্ভব— অনেকটা 'নাইফ্' ধরনেব। এ অঞ্চল থেকেও দ্বীপের অনেক অংশ দেখা যাচ্ছে আর সমুদ্র তো বটেই! বাতাসের শোঁ-শোঁ শব্দ আর নীচে থেকে ভেসে আসা ঢেউ ভাঙার শব্দ মিলে এক চমৎকার শব্দ-তরঙ্গের সৃষ্টি করছে। হঠাৎ নজরে পড়ল অস্তমিত সূর্যেব নয়নাভিরাম রঙের খেলা। আহা! এ দৃশ্য আমার বড় প্রিয়। ছোটবেলায় ইছাপুরে নবাবগঞ্জের ঘাটে বসে দেখতাম গঙ্গার ওপারেব সূর্যাস্ত, আর সেই সূর্যাস্ত দেখাব স্বভাব আজও আমার যায়নি। মনের মধ্যে সেই দৃশ্য বাসা বেঁধেছে; কাজেই যখনই সেই সুযোগ আসে, চুপচাপ বসে পড়ি আব অবাক হয়ে দেখি সেই অদৃশ্য মহাশিল্পীর বহস্যময় রঙ-চঙে তুলির আঁচড়! সেদিকে চেয়ে মুগ্ধ হয়ে রইলাম। সূর্যাস্তের পরেই আসলে আকাশের গায়ে ভেসে ওঠে বঙেব খেলা। এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ বসে ছিলাম, হঠাৎ মনে হল— রাত্রি হবার আগেই ফিবতে হবে। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালাম। সামনের দিকে আর এগোনো অসম্ভব। আব দশমিটাব এগোলেই সামনের বিরাট খাদে পডার সম্ভাবনা, বাঁ-দিকে বা ডানদিকে যাবাবও কোন উপায় নেই; রুক্ষ ঝামা পাথর ডিঙিয়ে যেতে হলে, দবকাব উপযুক্ত পর্বতারোহীর সবঞ্জাম, কাজেই কঙ্কালেব সেই গুহায় ফিরে আসতে বাধ্য হলাম। দুই পাহাড়ের দেওয়ালে তৈরি প্রাকৃতিক বাবান্দা দিয়ে অবিলম্বেই এসে হাজির হলাম সেই গুহায়।

গুহায় পৌঁছবামাত্র বুকের ভেতরটা ধডাস করে উঠল, অন্ধকার! হ্যাঁ গুহার ভেতরটা এব মধ্যে অন্ধকাব হয়ে গেছে। তাডাতাড়ি হাঁটা ধবলাম নামার পথে, কিন্তু হায়! সে পথও বন্ধ। সন্ধ্যাব আলো মাথাব ওপবকাব পাহাড়েই প্রায় আটকে গেছে, দেওয়াল ঘেঁষে যে পথে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এসেছিলাম সে পথ এখন ঝাপসা অন্ধকার, এখন সে পথে ফিরে যাওয়া মানে জেনেশুনে মহাশূন্যে ঝাঁপিয়ে পড়া। এদিক ওদিক তাকিয়ে অন্য উপায় খুঁজতে লাগলাম। প্রতি মিনিটে এখন দিনের আলো নিভে আসছে। খুব তাড়াতাড়ি একটা সিদ্ধান্ত নিতেই হবে—। নিজের মনেই হায় হায় কবে উঠলাম, কিন্তু কোন পথই খুঁজে পেলাম না। সামনে এই অন্ধকাবে চলতে গেলে সাক্ষাৎ মৃত্যু আর পেছনে? কি সর্বনাশ! সেকথা ভাবতেই বুকের রক্ত হিম হয়ে উঠল-- মনে পড়ল সেই কংকাল দুটোব কথা। তার মানে বুঝতেই পারছি, যদি এই পাহাড় ডিঙ্গোবার কোন পথ না পাই তাহলে এই কংকাল দুটোর সাথেই বাত কাটাতে হবে। নিজেকে একটু সামলে নিলাম, চঞ্চলতা ও অস্থিরতার দরুণ মনের ভারসাম্য রাখা মুশকিল হয়ে পড়েছে। মন যখন চঞ্চল, চিত্ত যখন ভয়ে আকুল, সেই সময় কোন পথ পাওয়া অসম্ভব! নার্ভাস হলে চলবে না, ফিরিয়ে আনলাম আমার মনোবল। মানুষের মনটা যে কত সহজেই ভেঙে পড়ে এটা তারই প্রমাণ, চিত্তকে একটু হারালেই মন হয়ে পড়ে দুর্বল। নিজেকে সাহস দিয়ে বললাম— ভয় কি? বিবেকানন্দ বলেছেন ভয়ই ভয়ের কারণ, অতএব ভয়

না করলেই চলে। বুকটাকে সটান করে বললাম— তুমি পরিব্রাজক— ভয় করলে অভিজ্ঞতার হাত থেকে বঞ্চিত হবে, অতএব কেন এই কাপুরুষতা! অবশেষে বাধ্য হলাম সিদ্ধান্ত নিতে— আজ এখানেই রাত কাটাবো, ভয় কি? পেছনে রয়েছে সুন্দর গুহা— দুটো কঙ্কাল হবে আমার রাতের সাথী— নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে। মাথার ওপর থেকে আস্তে আস্তে দিনের আলো বিদায় নিয়ে দেখা দিতে লাগলো একটি একটি করে রাতের তারা।

আমার পরনে আছে সূতির একটা প্যান্ট, জুতো মোজা গেঞ্জি জামা আর একটা সোয়েটার— সোয়েটারটা নিয়ে এসেছিলাম— যদি...'র কারণে, এখন দেখছি কাজে লাগবে। নিজেকে আরও শান্ত করবার জন্য একটু পিছিয়ে এসে গুহাটার সামনে বসলাম—, নিচের ঝামা-পাথর এর ওপর গায়ের সোয়েটারটা খুলে একটা গদির মত করে পেতে নিলাম। হঠাৎ মনে পড়ে গেল— সর্ববেদময়ী সর্বমন্ত্রময়ী দেবীর কথা।

ওঁ নমস্তে দেব দেবেশি যোগীশ প্রাণবল্লভে,
সিদ্ধিদে বরদে মাতঃ সয়ম্ভুলিঙ্গবেষ্টিতে।
প্রসুপ্তভুজগাকারে সর্বদা কারণ প্রিয়ে,
কাম কলান্বিতে দেবী মমাভীষ্টং কুরুশ্ব চ।
অসারে ঘোর সংসারে ভব রোগাৎ মহেশ্বরি,
সর্বদা রক্ষ মাং দেবি জন্মসংসারকূপকাৎ।

আমাদের শরীরে সব শক্তিই আছে— শুধু তাকে বশ করে কাজে লাগাতে পারলে আর মনের কোনও দুর্বলতা থাকে না। ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করে দূর করতে হবে সেই দুর্বলতা।

এবার করতে লাগলাম আমার মন বিশ্লেষণ। ভয়' কেন? কিসের? সুখ-দুঃখ, অহংকার, ভয় এগুলো তো মানুষের কল্পনা। সংস্কার থেকে উৎপত্তি হয় কল্পনা; সেই কল্পনা নাড়ী-তন্ত্রে তোলে ঝংকার; সেই ঝংকারই স্থান কাল ও পাত্র ভেদে আমাদের এই স্থূল দেহে টংকার দেয়— সেই প্রভাবেই আমরা প্রভাবান্বিত। দেহের অসংখ্য নাড়ীতে সেই টংকার প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, পঞ্চবায়ু তাকে চালিত করছে আমাদের প্রত্যেকটি কোষে, আর ইন্দ্রিয় তারই মোহে মোহান্বিত হয়ে কাজ করছে। ভয় থাকে মনের স্তরে। আত্মা আরও অনেক ঊর্ধ্বে। সে মনকে দেখে হাসে। আমার মন এখন হালকা হয়ে এল। রাত বাড়ার সাথে সাথে প্রশান্ত মহাসাগরীর বাতাস আরও দুরন্ত হয়ে উঠল। দ্বীপের শান্ত পাথরের ওপর বিরাট বিরাট ঢেউগুলো তাদের তাণ্ডব নৃত্য যেন এখন রুদ্রতালে রূপান্তরিত করছে। বিভিন্ন ছোটখাটো গুহায় ও পাহাড়ের গায়ে ওলোট-পালট ভাবে সামুদ্রিক বাতাস লেগে এক অদ্ভুত শব্দ ধ্বনিত হচ্ছে। দূরে ঢেউএর ফেনার ওপর তারার আলো বিচ্ছুরিত হয়ে এক অপূর্ব মায়া-জগতের সৃষ্টি করছে। এমন অপূর্ব শব্দ ও দৃশ্যজগৎ আমার চোখে এর আগে আর পড়েনি।

মহামায়ার এ কি অপরূপ শোভা দেখছি! আমাবই পাশে পড়ে রয়েছে দুটো কঙ্কাল —মৃত্যুর পরিণাম, ধ্বংসের প্রতিমূর্তি, আর সামনেই দেখছি সেই মহামায়ার অনন্তরূপ—

ত্বমাদ্যা সর্ববিদ্যানামস্মাকমপি জন্মভূঃ।
ত্বং জানাসি জগৎ সর্বং ন ত্বাং জানাতি কশ্চন॥

হে মহামায়া! তুমিই জগৎ শক্তি, তুমিই একমাত্র জ্ঞান, তুমিই জান এ জগৎকে— কিন্তু এ জগৎ তোমাকে জানে না।

আমার চাবপাশের শব্দ-জগৎ যেন আরও প্রখব হয়ে উঠল— আমার শ্রবণ শক্তি যেন দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে, রাত্রি এখন কটা কে জানে—মাঝে মাঝে গুহার পাথবগুলো তাপমাত্রা পরিবর্তনের ফলে এদিক ওদিক গড়িয়ে পড়তে লাগলো— মনে হয় যেন গুহাব অশবীরি আত্মাগুলো এখন ভৈববীব মন্ত্রে প্রাণ পেয়ে এদিক ওদিক চলাফেরা কবছে। তারই ঠাণ্ডা স্যাৎসেতে ও হিমেল স্পর্শ আমি যেন পিঠে অনুভব করতে লাগলাম, ওরা যেন আমায ডাকছে— আমি তাদেরই একজন। মনে হয় এখন মধ্যবাত্রি—ঠিক সময়। আমি শিখেছিলাম ভ্রামবী প্রাণায়াম, অনেকদিন যাবৎ তা অভ্যাস কবিনি, এখন চেষ্টা করা যাক, যদি কাজ দেয়।

ঠিকভাবে বসে দু'আঙুল দিয়ে কানেব রন্ধ্রপথ বন্ধ করে আস্তে আস্তে বায়ু ধারণ কবে কুম্ভক কবলাম, তারপব অতি ধীবে ধীবে সেই বায়ুকে বেচন করতে আবম্ভ কবলাম....।

শুনেছি এই ভ্রামবী প্রাণায়ামেব শক্তি অসীম, শবীবকে সুস্থ ও গবম কবে ভয় ও দুঃখ দূব করে। আব বহির্জগতের শব্দকে দূব করে, হৃদয় অভ্যন্তবে অনাহত চক্রে সৃষ্টি করে এক প্রতিধ্বনি। আমাদেব দেহযন্ত্রেব যে বিবাট ও অবিবাম কোষ পরিবর্তনেব কাজ চলছে সেটাই প্রকট হয়ে ওঠে আমাদের কানে। অন্তর্জগতের যাবতীয ধ্বনি ধরা পড়ে আমাদেব শ্রবণ যন্ত্রে। সত্যি, কি অদ্ভুত এই প্রণালী— দেহ-রহস্যেব ভেদ জানতে হলে প্রাণায়ামই মনে হয় এক চবম পন্থা....।

যাব যে বকম ক্ষমতা ধর্মটাকে সে সেবকম ভাবেই গ্রহণ কবেছে। আমি কিন্তু ধার্মিক নই আর সে সম্পর্কে আমাব শিক্ষাও নেই। পরিব্রাজক হিসেবে ধর্মকে আমি নিযেছি অভিধান হিসেবে। যখনই কোন কারণে থেমে পডি, তখনই ওল্টাতে থাকি আমাব ধর্মাভিধানের পাতা। ধর্ম আমার সঙ্গী, মনে হয় আমি তাকে না চাইলেও সে আমাকে অনুসরণ কবে।

সাধারণ মানুষ আর পথের সাধুদের কাছ থেকে পেয়েছি বহু অমূল্য উপদেশ। যেহেতু সেগুলো কষ্টার্জিত নয়, তাই ভেবেছিলাম সেগুলো অর্থহীন, কিন্তু মাঝে মাঝে সেই অর্থহীন সাধারণ কথাগুলো আমাকে বক্ষা করে পরম অশান্তি ও বিপদের হাত থেকে। উপদেশ! আহা কি চমৎকার জিনিস— পরিব্রাজকদের এক অমূল্য সম্পদ। তা বইতে হলে না চাই বোঝা, না লাগে সামর্থ্য, হালকা ফুরফুরে বাতাসের

সঙ্গে সঙ্গেই তারা চলে। কাঠমাণ্ডুর পশুপতিনাথ মন্দিরে, তিব্বতের মহাকালীর সামনে, অলকানন্দার ধর্মশালায়, গঙ্গা ও কাবেরীর তীব ও পৃথিবীর বাতাসে বাতাসে ছড়িয়ে আছে সে উপদেশ, শুধু নিতে জানলেই হল। আমার এ দিক্‌বিহীন শিক্ষাটা যাচাই করবার শক্তি আমার নেই, তবে বিশ্বাস আর ধৈর্য আমার আছে, মনে হয় সে কারণেই দেশ থেকে সাত সমুদ্র তের নদীর পারে এসেও এই মহাশ্মশান-দ্বীপে বসে এই পুরানো দিনেব কথা ভাবছি।

আমি পরিব্রাজক— পরিব্রাজক যদি পথের দুধারে দেখতে না পায় সেই পরমেশ্বরের লীলা, বহুপ্রাণের মধ্যে সেই বিশ্বপ্রাণ, আর বিচিত্রের চিত্র, তাহলে তাব ভ্রমণ বৃথা। তাকে না অনুভব করলে হয়ে উঠে কষ্টময, পথেব পবিবর্তে 'অহং' মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়, সেই অহং থেকে আসে জাগতিক অহংকাব আব দুঃখ, ভয় ও দুর্বলতা। মানুষ যখন দুর্বল, ভয় তাকে গ্রাস করে। পাহাড়েব বিবাটত্ব, দিগন্তেব অসীম ও আকাশের দূরত্ব, এ সবের তুলনায় সে অসহায় ও ক্ষুদ্র, তাই সে ভীত। কিন্তু সেই ছোট্ট মানুষটি যদি একবার মনে ভাবে যে এই বিবাটত্ব ও অসীমত্বেব মধ্যে বয়েছে এক মহাপ্রাণ, আব প্রকৃতির কাবণে সেই মহাপ্রাণ তাকেও ছেড়ে থাকেনি— মহাপ্রাণেরই এক অংশ ক্ষুদ্রপ্রাণ হয়ে বাস কবছে তাব অন্তবে --বাস্! তবে ভয় কোথায়? সমুদ্রের জল আর নালাব জল তো একই-জল। অতএব সোহ্‌স— সো আ হম্ অস্মি।

আমি যে এখন এই কংকালময় এক পাহাড়কন্দবে বাস কর্বাছ তা আমাব এক স্মরণীয় দিন। এই ঘন অন্ধকার রাত্রিকে আর বিপবীত আবহাওয়াকে অনুকূল কবে তুলতে লাগলাম। ভয়েব পরিবর্তে আনন্দে ভরে উঠল আমাব প্রাণ মন। আমি চোখ বুজে সেই পবমেশ্ববীকে স্মরণ করে ধ্যানস্থ হবার চেষ্টা কবলাম- -

সর্বরূপমযী দেবী সর্বং দেবীময়ং জগৎ।
অতো অহং বিশ্বরূপাং ত্বাং নমামি পবমেশ্ববী॥

খুব ভোরে আমি যখন চোখ খুললাম— তখন আমাব দেহ ও মন এক অস্বাভাবিক আনন্দ ও শান্তিতে ভরপূব....

সকালবেলা আমি ফিবে এলাম এই জগতে, নিজেকে খুব হালকা মনে হচ্ছে। কাবারার বাড়ীতে ঢুকতেই সবাই অবাক হয়ে আমাব দিকে তাকালো— তবে দেখে মনে হয় যে আমার জন্য এরা খুব চিন্তিত হয়নি, অথচ আমি এদেব চিন্তায় চিন্তিত ছিলাম। কাবাবা আমাকে ভাব-ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলো সে, আমি কুর্বেব নৌকোতে রাত্রি কাটিয়েছি কি না। আমিও ভাব-ভঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলাম যে না, আমি পাহাড়ের উপরে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আমার সামনে কফি, সরবৎ আব পাউরুটিব প্রাতবাশ রেখে আমি শুরু করেছি এই বাতের কাহিনী লিখতে।

দ্বীপ সম্পর্কে আরও জানার নেশা আমাকে পেয়ে বসল, কিন্তু তথ্যাদি জানার সুযোগ খুব কম। কথাবার্তায় মনে হল ক্যাপটেন এই দ্বীপের ইতিহাস বা নাগরিকদের

আদি উৎপত্তি সম্পর্কে কোন খবরই রাখেন না— আর সেদিকে তাঁর ইচ্ছাও নাই। একমাত্র ভরসা সেই বৃদ্ধ পুরোহিত ভদ্রলোক অর্থাৎ ক্যাপুসাঁ সেবাস্তিয়ান অন্‌জেলে। দ্বিতীয় পুরোহিত ভদ্রলোক, ফাদার থিয়োডোর মনে হয় একটু বেশী কথা বলেন আর মন যোগাবার জন্য মিথ্যে কথাও বলতে পিছপা হন না— শুধু তাই নয়, তাঁর কাছ থেকে গল্প শুনতে হলে তাঁকে ঘন ঘন কফি খাওয়াতে হবে, কাজেই তাঁর আশা ছেড়ে দিয়েছি। ক্যাপুসাঁ সেবাস্তিয়ান অন্‌জেলের সাথেই আমি খাতির জমিয়ে বসলাম। আমি রোমান ক্যাথলিক জগতের তীর্থক্ষেত্র ভাটিকান শহর দেখেছি আর পণ্ডিত-চূড়ামণি মহামান্য পোপের সাথেও দেখা করেছি— সেই বিষয়টাই ছিল আমার মূল হাতিয়ার। ক্যাপুসাঁ অন্‌জেলের মন জয় করতে আমার মোটেই বেগ পেতে হ'ল না। ভদ্রলোক এই দ্বীপের ভাষা জানেন, লোকজনদের কাছে তিনি পূজ্য আর তিনি নিজেও এই দ্বীপের সম্পর্কে কয়েকটা বই লিখেছেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে আমি স্পেনীয় ভাষা জানি না, নয়তো অনেক ব্যাপার জানাযেতো। ভদ্রলোক ইংরেজী জানেন; আমার উৎসাহ দেখে তিনি আমার কাঁধে হাত দিয়ে বললেন,—

—যখন খুশী আসবে। আমি তোমার সাথে কথা বলে সত্যি খুব আনন্দ পাচ্ছি। কাপুসাঁ সেবাস্তিয়ান অন্‌জেলের মাধ্যমেই সেদিন বিকেলবেলা পরিচিত হ'লাম এখানকার রোঙ্গো রোঙ্গো পরিবারদের সাথে। সিনিয়র রোঙ্গো রোঙ্গো এই দ্বীপের অন্যতম সম্মানীয় ব্যক্তি এবং দ্বীপবাসীদের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে ধনী। তিনি মোটেই ইংরেজী জানেন না। তবে ক্যাপুসাঁ অন্‌জেলের সহায়তায় রোঙ্গো রোঙ্গো, তাঁর বাড়ীতে আমাকে নিমন্ত্রণ করলেন— সেই সাথে ক্যাপুসাঁ অন্‌জেলেও বটে। আমি মহানন্দে সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম।

পরদিন দুপুরে ক্যাপুসাঁ অন্‌জেলের সাথে তাঁর বাড়ীতে এসে হাজির হলাম। বাড়ীটা খুবই পুরানো, পাথরের দেওয়ালের ওপর ঢালাই ছাতের একটা একতলা বিরাট বাড়ী। বাড়ীর ভিতর ঢুকতেই কয়েকটি ছেলে-মেয়ে আমাদের চারিদিকে এসে ভীড় করে দাঁড়ালো, ঠিক আমাদের দেশের মতোই ঘিরে— যেমন কৌতুহলীদের ভীড় জমে। আমাদের দেখেই রোঙ্গো রোঙ্গো মশাই এগিয়ে এলেন— তারপর একে একে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাঁর স্ত্রীর সাথেও পরিচিত হলাম। সকলেই বেশ হাসি-খুশী। খাবার টেবিল তৈরী ছিল— খাঁটী ইউরোপীয় প্রথায় টেবিল সাজানো হয়েছে, প্লেট কাঁটা চামচ তোয়ালে কোন কিছুরই অভাব নেই। পানীয় হিসেবে রয়েছে জল আর লাল আঙ্গুরের চিলিয়ান মদ। আমরা বসলাম; একে একে খাবার আসতে লাগলো— ভাত, আলুসেদ্ধ, মুরগীর রোস্ট আর বিভিন্ন রকমের মাছ, মাছ ভাজা, মাছ সেদ্ধ, মাছ ঝলসানো আর মাছের বড়া— রাজসিক খাদ্য। খেতে খেতে এবং খাওয়ার পর আমাদের আলোচনা চলল।

রোঙ্গো রোঙ্গো পরিবারের কয়েকটা জিনিস দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম— দামী সংগ্রহের মধ্যে বিশেষ করে আমার নজরে পড়ল— কাঠের কাজগুলো; কাঠের

কাজ এই পরিবারের পেশা। রোঙ্গো রোঙ্গো পরিবার এসেছে সুদূর তাহিতি থেকে, দ্বীপের বাসিন্দাদের সকলেই এসেছে তাহিতি থেকে। অনেক পুরানো কাঠের কাজের মধ্যে প্রথমেই নজরে পড়ল দু-ফুটের একটা মূর্তি। মূর্তিটা এ দ্বীপেরই অসংখ্য বিরাট মূর্তির একটা ক্ষুদ্র সংস্করণ মাত্র, কিন্তু মূর্তিটার পিছনেও রয়েছে বিভিন্ন ধরণের লেখা। এই লেখাগুলোর মানে এরা কেউ জানে না। প্রাচীন কাল থেকেই এই কাঠের স্টাচুটা এই পরিবারে আছে। আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম, লেখাগুলো ঠিক মহেঞ্জোদরোর শিলালিপি ধরণের। দিল্লী মিউজিয়ামে এই ধরণের লেখা অনেক শিলালিপি আছে— আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, ঠিক সেই ধরণের। আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগেকার সিন্ধু উপত্যকার সেই শিলালিপির সাথে এই অদ্ভুত মিল দেখে আমার মনে এক প্রশ্ন দেখা দিল— রোঙ্গো রোঙ্গো মহাশয়কে জিজ্ঞেস করলাম,

—এই লেখার মত লেখার নমুনা আমাদের দেশের সিন্ধু উপত্যকায়ও কিছু পাওয়া গেছে, আপনি কি এর ইতিহাস কিছু বলতে পারবেন?

ক্যাপুসাঁ আমার কথাটা অনুবাদ করে দিলেন; ভদ্রলোক আমার প্রশ্ন শুনে বেশ একটু চিন্তিত হলেন, তারপর বললেন,

—আমাদের পূর্বপুরুষরা যখন তাহিতি থেকে এই দ্বীপে এসে নৌকা ভেড়ান, তখন তাঁদের সাথে অনেক জিনিসই আনা হয়েছিল। তারই কিছু কিছু এখনও থেকে গেছে; আমি এর ইতিহাস কিছু জানি না। এই দেখুন না— এই কাজগুলোও বহু পুরানো।

এই বলে ভদ্রলোক কয়েকটি মোহাই কাঠের কাজ দেখালেন। আমি আশ্চর্য হয়ে তাঁর হাত থেকে সেই কাজগুলো একে একে নিয়ে দেখতে লাগলাম— একটা কাঠের প্লেটে নক্সা করা মূর্তিগুলো দেখে মনে হয় ঠিক যেন বৌদ্ধ শিল্প, সাঁচীর তোরণে অথবা সারনাথের ধ্বংসস্তূপে এই ধরণের কাজও প্রচুর দেখেছি— কি অদ্ভুত মিল!

এবার আরও অবাক হবার পালা— রোঙ্গো রোঙ্গো মশায় বহু পুরানো ছুরির বাঁট দেখালেন— বাটলটা হাতে নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করলাম— সাধারণ একটা কাঠ-এর, মধ্যে কোন কাজ করা নেই। কি মনে হতেই সেই কাঠের ওপর নখের কয়েকটা আঁচড় দিয়ে নাকের কাছে তুলে ধরলাম— সঙ্গে সঙ্গে পেলাম সুগন্ধি চন্দনের গন্ধ। আমাকে শুকনো কাঠটা শুঁকতে দেখে সবাই আবাক হয়ে গেল। আমি এবার সেটাকে রোঙ্গো রোঙ্গো মশায়ের নাকের কাছে ধরে বললাম— এটাকে শুঁকে দেখুন। আমার কথামত তিনি সেটার ঘ্রাণ নিলেন— বার বার করে তিনি ঘ্রাণ নিয়ে হঠাৎ শিশুর মতো বলে উঠলেন— বারে বেশ মজার গন্ধ তো। তারপর আস্তে আস্তে সবাই সেটার ঘ্রাণ নিতে লাগলো। ইতিমধ্যে শ্রীমতী রোঙ্গো রোঙ্গোও এসে হাজির হয়েছেন। সকলের ঘ্রাণ নেওয়া শেষ হলে আমি অনেকটা বিজ্ঞের মত করে বললাম,

—এর নাম চন্দন কাঠ। আর খুব সম্ভবতঃ এটাকে আনা হয়েছে আমাদের দেশ থেকে। গন্ধেব সেবা এই চন্দন কাঠ, অতি পবিত্র ও সুগন্ধি। এব থেকে তেল হয়, আতর হয়, আর দামী দামী ছোট ছোট দেব-দেবীর মূর্তির জন্য এ কাঠ খুব বিখ্যাত। শুধু তাই নয়, এর থেকে ওষুধও তৈরী হয়।

আমার কথাগুলো ক্যাপুসাঁ সবই তর্জমা করে দিতে লাগলেন। এটা যে চন্দন কাঠ তা রোঙ্গো বোঙ্গো মশায় কোনদিনই শোনেনি। আমাব মত তিনিও আশ্চর্য হলেন। আমি জোর দিয়ে বললাম,— তিনটি জিনিস খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১। সিন্ধু উপত্যকার মত লেখা সমেত কাঠেব কাজ,

২। বৌদ্ধ শিল্পেব প্রভাবান্বিত কাঠেব বাব,

৩। চন্দন কাঠের তৈবী ছুবীর বাটল।

মনে হয এই জিনিসগুলোব ইতিহাস জানলেই আপনাব বংশেব ইতিহাস তথা দ্বীপের বহস্য মীমাংসাব অনেক সুবিধা হতে পারে— আমি বলছি, হযতো— অর্থাৎ এটা আমাব অনুমান মাত্র।

তারপব আবও অনেকক্ষণ গল্পগুজব কবে আমবা বিকেলবেলার দিকে চা খেয়ে তাবপর উঠলাম। বোঙ্গো রোঙ্গো মশায় বার বাব আমাকে অনুরোধ করলেন— আমি যেন আমার ব্যাখ্যাগুলো তাঁকে লিখে দিই— বিশেষ কবে পবেরদিন দুপুরে তিনি আবার আমাকে খাওয়াব জন্য আমন্ত্রণ জানালেন— কাপুসাঁ আসতে পারবেন না, কারণ, পবেবদিন গীর্জায তাঁব অনেক কাজ। তবে আমি তাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণ কবলাম— ঠিক হ'ল তাঁর বাড়ীতে বসেই সব বিস্তাবিতভাবে ইংরেজিতে লিখে দেবো।

বোঙ্গে রোঙ্গো মশায আমাকে খুব গোপনীযভাবে কানের কাছে মুখে বেখে কি যেন বললেন— কিন্তু আমি তার বিন্দুবিসর্গও বুঝলাম না। —তাই ব্যাখ্যাব জন্য শবণাপন্ন হ'লাম ক্যাপুসাঁব। ক্যাপুসাঁও শুনলেন তাঁব কথা। তাবপব আমাকে তর্জমা কবে দিয়ে বললেন,—

—যেসব জিনিস দেখলে তা সবই আব মাস দু'য়েকেব মধ্যেই এখানকার যাদুঘরে যাবে। চিলিয়ান সরকাব এয়ারপোর্টের পাশেই যাদুঘব তৈবী করছে; কাজেই বুঝতেই পারছো যে জিনিসগুলিব ব্যাখ্যাব একান্তই দবকাব।

আমি সহাস্যে জবাব দিলাম— আপনাদের কাজে আসতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে কবব।

দ্বীপেব একরকম এক সম্ভ্রান্ত পবিবারেব সাথে পবিচিত হয়ে নিজেকে খুবই ভাগ্যবান মনে করলাম। তাঁকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়ে আমরা উঠলাম।

এবার আসা যাক ইতিহাসের পাতায়— বুক থেকে আরম্ভ করে মাথা পর্যন্ত, কলকাতার পার্কে বা রাস্তার মোড়ে বিশেষ ব্যক্তিদের স্টাচুগুলো যেমন দেখতে পাওয়া

যায়— তবে উচ্চতায় আর আয়তনে তাদের চেয়ে অনেক উঁচু। ছ'-সাত মিটার থেকে আরম্ভ করে কোন কোনটা দশ মিটার পর্যন্ত উঁচু। হঠাৎ দেখলে মনে হবে ব্রোঞ্জের তৈরী বাস্ট রিলিফ। কিন্তু আসলে পাথরের। আসল রঙটাই ওরকম।

এখন আমি একটা স্টাচুর কাছে দাঁড়িয়ে এটা লিখছি। শিল্প হিসাবে এটাকে তারিফ কবাব যোগ্যতা আমার নেই; সৌন্দর্য বলতে আমার যা ধারণা এরমধ্যে আমি তার কিছু দেখতে পাচ্ছি না— তবে অ্যাবস্ট্রাক্ট নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন শুনেছি তাঁদের কাছে এব দাম অপরিসীম। আমি এই অতি সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখছি তাতে মনে হয় মূর্তিগুলো একই ধবণেব। অধিকাংশ মূর্তিগুলোই আকাশের দিতে তাকিয়ে আছে। আর বাকিগুলো মনে হয অনন্তকাল ধবে সমুদ্রের ঢেউ গুণছে। এই ধবণের স্টাচু দ্বীপে ছড়াছড়ি— শুধু তাইই নয়, আগ্নেযগিবিব মুখের কাছে অর্থাৎ পাহাড়ের ওপরও এই ধবণেব অনেক স্টাচু শুয়ে আছে। কোন কোন স্টাচু সুন্দব পাথবেব বেদীর ওপব বসানো আছে। কবরখানার পাশেও বহু স্ট্যাচুকে উঁচু বেদীর ওপর বসানো আছে। তাদেব দৃষ্টি কববখানার ওপব, যেন সদা জাগ্রত। দ্বীপের তিন কোনায় পাহাড়ের ওপব বয়েছে শুষ্ক পুষ্করিণীর মত আগ্নেয়গিরির মুখ, সেখানেও দাঁড় করানো বয়েছে স্ট্যাচু। এ দ্বীপে কোন গাছ নেই, অথচ এই ভাবী ভারী স্ট্যাচুগুলো স্থানান্তরিত করাব জন্য দরকার বিরাট বিরাট গাছের গুড়ি ও কাঠ— কি করেই বা এগুলোকে সরানো ও ঠিক জায়গা মত বসানো হয়েছে তা সত্যি ভাববার বিষয়। এখানকার স্টাচুগুলোব শিল্পকে বলে মোহাই, ঠিক তেমনি এই দ্বীপের পুরানো কাঠগুলোকেও বলে মোহাই। বোঙ্গো বোঙ্গো পবিবাবেব যেসব কাঠেব কাজ দেখেছি, সে-সব কাঠের কাজই নকল কবে গড়ে উঠেছে এখানকাব কুটিবশিল্প— তাব নামও মোহাই। প্রায় সাত-আটশ বিবাট বিবাট স্ট্যাচু, তাদের চোখ দুটো কোটবগত, ঠোঁট দুটো চঞ্চু আকৃতির হয়ে কোনবকমে ঠোঁটের ভাব প্রকাশ কবছে, ল্যাংটা, অনেকটা বাইজানটাইন নাকেব মত অর্থাৎ সরল রেখার ওপর যেন প্রতিষ্ঠিত। কান দুটোকে মনে হয় কেউ কেটে নিয়েছে। কপাল কিছুদূর উঠে গিয়ে হঠাৎ যেন শেষ হয়ে গেছে। এই বিরাট বিরাট স্ট্যাচুগুলোকে দাঁড় করাবার জন্য কম কবেও সাড়ে তিনশ থেকে চারশ লোকের পরিশ্রম দবকাব।

এখানে যে সব বিদেশী প্রত্নতাত্ত্বিকবা এ বিষয়ে গভীব গবেষণায় মগ্ন, তাঁদেব মতে, দ্বীপের তিনকোনায় পাহাড়ের ওপর যেসব আগ্নেয়গিবি বয়েছে সে সব জায়গার পাথর কেটেই এই সব স্টাচুগুলো তৈরী করা হয়েছে। বড় বড় গাছের গোলাকৃতির গুড়ির ওপর স্ট্যাচুগুলোকে শুইয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে নীচে নামানো হয়েছে। তারপব তার দুপাশে কাঠের থাম বসিয়ে ইদারার জল টানার মত করে সেগুলোকে টেনে বসানো হয়েছে। সবাই এ বিষয়ে একমত, তবে গাছের গুড়িগুলো এ দ্বীপে কি ভাবে এল আর এই দ্বীপ থেকে তারা কি ভাবেই বা নিশ্চিহ্ন হ'ল সে বিষয়ে বহু মতান্তর আছে। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক ডক্টর ফ্লেন্‌লে'র কথা। তিনি হাল্ ইউনির্ভাসিটির ভূগোলের অধ্যাপক। তিনি বলেন: সম্ভবতঃ ষোড়শ অথবা সপ্তদশ

শতাব্দীর (16th. or 17th Century) শেষের দিকে, এই দ্বীপে এক ভয়াবহ মহামারী দেখা দেয় আর সেই কারণেই এখানকার নাগরিকেরা মৃত্যুর কবলে পরে। সেই বিধ্বংসী মহামাবীর ফলস্বরূপ এখনও এখানকার বিভিন্ন গুহায় ও পর্বতকন্দরে বহু কঙ্কাল পাওয়া যায়। পঙ্গপালের মত এক ধরনের পোকার আবির্ভাব হওয়াও এই দ্বীপে অস্বাভাবিক কিছু নয়। তারাই হয়তো এখানকার ফসল শেষ করেছে। তারপর গাছপালা, এমনকি পুরানো কাঠ এবং সর্বশেষ কাঠের ঘরবাড়ী আর কাঠের যা পেয়েছে তাই জঠরাগ্নিতে দিয়েছে। এই পঙ্গপালই হয়তো এই দ্বীপে এনেছে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী, শেষে মহাশ্মশান। সম্ভবতঃ শ' খানেক লোক শেষ পর্যন্ত রক্ষা পেয়েছিল আর তাদেরই বংশধরদেব আজ আমরা দ্বীপে দেখতে পাই। তবে সবাই স্বীকাব করেন যে, বর্তমান বাসিন্দাদের মধ্যে রয়েছে পলিনেশিয়ান, ওলন্দাজ, স্পেনীয় ও ফরাসীদেব মিশ্রণ-রক্ত।

ফরাসী নাবিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্ মাজিয়ের-এর মতে, প্রায় হাজাব খানেক বছর আগে এই দ্বীপে অগ্ন্যুৎপাত হয়। সেই ভয়াবহ আগ্নেয়গিরির উদগীরণের ফলে এ দ্বীপেব ফসল ও নাগরিক উভয়ই সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। তারপব পঞ্চদশ অথবা ষোড়শ শতাব্দীব শেষের দিকে পলিনেশিয়ার দ্বীপগুলো থেকে অধিবাসীরা এসে এই দ্বীপে নতুন কবে আবার বসবাস আরম্ভ করে। কারও মতে— ষোড়শ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যেই মনে হয়, এই স্ট্যাচুগুলোব সৃষ্টি। লক্ষ্য কবার বিষয় যে, এই সময়টা প্রশান্ত মহাসাগরেব দ্বীপগুলোতে ও দক্ষিণ আমেবিকা, নিউজিল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া ইত্যাদি দেশগুলোতে ইউরোপীয় নাবিক ব্যবসায়ী ও জলদস্যুদের ঘন ঘন আগমন, আক্রমণ, লুঠতবাজ ও বিদেশী আক্রমণ থেকে দ্বীপকে বক্ষা করাব মত হাতিয়াব দ্বীপবাসীদের ছিল না। হয়তো সেই কাবণেই তাবা এইসব বিরাট বিবাট স্ট্যাচুগুলোকে পাহাড় থেকে কেটে দাঁড করিয়েছে। দূরে জাহাজ থেকে হঠাৎ দেখলে মনে হবে, সারি সারি প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে দ্বীপবক্ষায় সদা জাগ্রত। সিদ্ধান্তটা খুবই যুক্তিসংগত।

সতেবো শতাব্দীর মাঝামাঝি যখন দ্বীপবাসীরা ইউরোপীয় জলদস্যুদের হাত থেকে বক্ষা পাবার জন্য এই দ্বীপে সারি সারি এই মূর্তিগুলোকে সাজাচ্ছিল, ঠিক সেই সময়ই হয়তো সেই ভীষণ মহামারী (প্লেগ অথবা ঐ ধরণের) উপস্থিত হয়। মূর্তিগুলোকে দ্বীপ রক্ষার জন্য মিথ্যা রক্ষী হিসেবে সাজাবার আগেই তারা প্রাণ ত্যাগ করে। বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেলেও শেষ পর্যন্ত নিয়তির হাত থেকে তাদের রক্ষা করতে পারল না। বর্তমান বাসিন্দারা সম্ভবতঃ তার পরবর্তী যুগের। বিদেশী বিশেষজ্ঞরা যাই বলুক না কেন, রোঙ্গো পরিবার ও দ্বীপবাসীরা কিন্তু তাতে একমত নয়— দ্বীপের এই আজব স্ট্যাচুগুলোকে নিয়ে তারা গড়ে তুলেছে তাদের রূপকথা। ফাদার বা ক্যাপুসাঁ সেবাস্তিয়ান আসার আগে অর্থাৎ পঁচিশ তিরিশ বছর আগে তাদের ধর্ম ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। দ্বীপের এই মূর্তিগুলোই ছিল তাদের আরাধ্য দেবতা।

রোঙ্গে রোঙ্গো মশাইয়ের সাথে আমি একমত; তিনি বলেন এই মূর্তিগুলোই এককালে ছিল আমাদের আরাধ্য দেবতা। সে কারণেই আমাদের আদি বংশধরেরা এদের উঁচু বেদিতে বসিয়েছেন। আজও দেখা যায় যে কোন কোন স্ট্যাচুর সামনে রয়েছে বিরাট চত্বর। সেই চত্বরে জমায়েৎ হতো দ্বীপবাসীরা আর তাদের ঘিরে সুরু হতো পূজো নাচ-গান উৎসব। পূজোটা কোন ধরণের হতো তার বিবরণ কেউ দিতে পারে না। দ্বীপের সবচেয়ে যিনি বয়বৃদ্ধ তিনি বলেন ..."এই যে সব পাহাড়ের গায়ে বিভিন্ন গুহা দেখছো এর মধ্যে পুরোহিতরা ঢুকে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটাতো— সেই সব পুরোহিতরা ছিল সবজান্তা। গুহায়তো সবাই ঢুকতে পারত না, একমাত্র যারা সেই বিশেষ শব্দ জানে তাবাই এখানে ঢোকার অধিকারী। সেই পুরোহিতরা ছিল সবজান্তা— হ্যাঁ বাবা, তারা মড়াকে বাঁচাতে পারতো। আমি নিজের চোখে দেখেছি...তারা সবজান্তা...সবজান্তা!" বৃদ্ধের কথায় কেউ বিশেষ আমল দিল না। কিন্তু আমি শুনেছি তার কাঁপা কাঁপা গলার স্বরে রয়েছে এক দৃপ্ত ঘোষণা— দ্বীপের বাণী। ফাদার সেবাস্তিয়ান আমাকে বাজারের ফুটপাতে বসিয়ে সেই বৃদ্ধের কথা বলেছেন— আমি কিন্তু শোনামাত্রই বিশ্বাস করেছি। সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক যখন বলেছিলেন..."সবজান্তা—সবজান্তা" তখন আমি দেখেছি তার চোখের জ্যোতি— সত্যের বাণী। "বিশেষ শব্দ" বলতে মনে হয় "মন্ত্র"— আর সবজান্তাব মানে সিদ্ধ পুরুষ।

ফাদার সেবাস্তিয়ান যখন প্রথম এই দ্বীপে আসেন তখন তিনিও দেখেছিলেন— এই দ্বীপবাসীদের মধ্যে অনেকেই বড় বড় দাড়ি-চুল রেখে ঘন ঘন ওই সব গুহাব মধ্যে যাতায়াত করতো। ফাদাব সেবাস্তিয়ান নাকি একথা তাঁব লেখা "এই দ্বীপেব ইতিহাস" বইতে লিখেছেন। ফাদার সেবাস্তিয়ান চিলিয়ান সরকার তথা মিলিটিবীদের সাহায্যে এইসব মানুষদেব ধবে তাদের চুল-দাড়ি কেটে ভদ্রলোক বানিযেছে। আমি এসব শুনে মনে মনে হায় হায় কবেছি— সত্যি ইউরোপীয়ানদের কি বর্বর অত্যাচার! এখনকার নিরীহ দ্বীপবাসীদের চুল-দাড়ি রাখাটাই একটা বিরাট ফ্যাসান। কই, তাদের বিরুদ্ধেতো এতটুকু কারও অভিযোগ নেই। কি দুর্ভাগ্য! জোর যাব মুল্লুক তার। দ্বীপবাসীরা এখনও বিশ্বাস করে যে, বড় চুল রাখলে ভগবান তাকে বক্ষা কবেন। আর ভগবানে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের চুল-দাড়ি কেটে দিলে তাদের আধ্যাত্মিক শক্তি ক্ষুণ্ণ হয়। এইসব ছোট-খাটো জিনিস নিয়ে প্রত্নতাত্ত্বিকরা মাথা ঘামায় না; তাদের দৃষ্টি পাথরের দিকে। পাথর কেটে টুকরো টুকরো করে খুঁজে বার করছে তার রহস্য— পদার্থবিদতো একেই বলে। দ্বীপের যারা নাগরিক তাদেরই মুখে শুনতে হয় তাদের ইতিহাস— হোক সে সব রূপকথা, কিন্তু সেই রূপকথার মধ্যেই তো লুকিয়ে আছে দ্বীপের আত্মা। দ্বীপবাসীদের আচার-ব্যবহারের মধ্যেই লুকিয়ে আছে তাদের ইতিহাস।

আমেরিকান বিশেষজ্ঞ ও স্থানীয় চিলিয়ান সরকারের প্রতিনিধিরা গ্রামবাসীদের কথায় মোটেই কান দেয় না। —তাদের মতে এদের ভেতরে কিছু নেই, এরা অপদার্থ আড্ডাবাজ, আর ভেড়া-চোর। পাথরের গায়ে প্রাচীন ভাষায় যে সব লেখা আছে, তার বিন্দুবিসর্গও এরা বোঝে না।

ফরাসী প্রত্নতাত্ত্বিক মাজিয়ের-ই একমাত্র এই সব যুক্তি-তর্কের বিরোধী। ভদ্রলোক এখানে অনেকদিন যাবৎ আছেন এবং এই দ্বীপের মূর্তিগুলোর ইতিহাস খুঁজছেন। তিনি অবশ্য মুখে সরকারী ধারণার বিরুদ্ধে কিছু বলেন না, তবে তিনি সে সব কথায় বিশ্বাস করেন না। তিনি আমার সাথে একমত— অর্থাৎ দ্বীপবাসীদের কথা, সমাজ-ব্যবস্থা, গল্প, এসবগুলো ভালভাবে বিচার করলে— অনেক রহস্যেরই সমাধান হবে। অবশ্য হিয়েরোগ্লিকের শব্দগুলোর যদি পাঠোদ্ধার করা যায় তাহলে তো কথাই নেই। বলাই বাহুল্য যে মিশরের মত এ দ্বীপেও রয়েছে বহু প্রস্তরলিপি ও অজানা জীব-জন্তুর চিত্র।

অধিবাসীদের উৎপত্তি :

এই দ্বীপের অধিবাসীরা আসলে কোথা থেকে এল, তাদের আদি বৃত্তান্ত ও সকল তথ্য সবিশেষ জানা মুশকিল। গবেষকগণ এ বিষয়ে এখনও স্থির সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি, (অর্থাৎ আমি বলছি যে এ বছর অর্থাৎ ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত) বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন মত। আমার মতে এ দেশের ইতিহাস পাওয়া যাবে এ দেশের রূপকথার মধ্যে। বহু রূপকথার মধ্যে বিশেষ দুটো আমার মনে লেগেছে। সে দুটো নিচে লিপিবদ্ধ করলাম—।

১ম গল্প— রাজা হোতুয়া মোতুয়া : দুরন্ত প্রশান্ত মহাসাগর— তারই বুকে একটি নাম নাজানা দ্বীপে বাস করতো রাজা হোতুয়া মোতুয়া। সম্ভবতঃ বর্তমান তাহিতি ছিল রাজা হোতুয়া মোতুয়াব দেশ।

দেশটা ছিল শান্ত নিরিবিলি ও সুজলা সুফলা। রাজা তার প্রজাদের নিয়ে সুখেই ছিল। কিন্তু সেই সোনার রাজ্যে দেখা দিল প্রবল বন্যা। সাগরের জল মাঝে মাঝে প্রবল ও তাণ্ডব নৃত্যে দ্বীপে ঢুকে ঘর-দোর ও মানুষের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে লাগলো। দু'তিন মাস এরকম দুর্বিসহ অবস্থার মধ্যে কাটানোর পরে— সমুদ্রের জল যেতো নেমে। প্রথম প্রথম এটাকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলে রাজা ও রাজ্যের সবাই সান্ত্বনা দিতে চাইল— কিন্তু ক্রমে ক্রমে তা হয়ে উঠল অসহ্য। বহু পূজা বলি ও মানত করেও কিছু ফল হল না। সবাই রাজার কাছে এসে কান্নায় ভেঙে পড়ল— একটা কিছু করতেই হবে, বন্যায় প্রিয়জনদের বিয়োগ অসহ্য। শুধু তাই নয়, প্রত্যেক বছর যদি এই ধরনের বন্যা হতে থাকে তাহলে অচিরেই সম্পূর্ণ দ্বীপটাই সাগরের বুকে বিলীন হয়ে যাবে। দুশ্চিন্তায় রাজার ঘুম নেই— রাজা ও তাঁর মন্ত্রীরা বহু পরামর্শ করেও এর কোন সুরাহা করতে পারলেন না। এমনি ভাবেই আশঙ্কায় দিন যায়, সমুদ্রের জল যে কোন সময়ে এই দ্বীপে উঠে তাণ্ডব শুরু করতে পারে। হঠাৎ একদিন ভোর বেলা, রাজা উঠে বসলেন তাঁর বিছানায়, তারপর রাণীকে ডেকে উঠিয়ে বললেন,

—শোনো, আমার একটা বুদ্ধি এসেছে।

—বল, রাণী অবাক্ হয়ে রাজার মুখের দিকে চাইলেন।

রাজা শুরু করলেন,— এখান থেকে দক্ষিণে অনেক দূরে শুনেছি আরও একটা দ্বীপ আছে। সেই দ্বীপে আছে ছোট ছোট পাহাড়। আমরা যদি এ দেশ ছেড়ে সেখানে গিয়ে, আবার নতুন করে দেশ পত্তন করি— তাহলে কেমন হয়! শুধু তাই নয়, প্রজা ও রাজত্বকে বাঁচাবার এই একমাত্র উপায়।

রাণী রাজার কথা মন দিয়ে শুনলেন, তারপর গভীর নিশ্বাস ফেলে বললেন,— বুঝলাম! কিন্তু আমাদের এই সুন্দর রাজবাড়ী, অমূল্য সম্পদ আর সখের বাগানের কি হবে— এগুলো ছাড়া আমরা বাঁচব কি করে?

রাজা রাণীর হাত দুটো নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে তাকে আশ্বাস দিয়ে বিজ্ঞের মত বললেন,— প্রাণে যদি বাঁচি তাহলে আস্তে আস্তে আবার সব হবে।

রাজা ও রাণী একমত— এ দ্বীপ ছাড়তেই হবে। বাজসভায় সকলকে ডেকে বাজা তাঁব সিদ্ধান্তের কথা সবাইকে জানালেন।

রাজার কথা শুনে সবাই হায় হায় করে উঠলো।

সত্যিই তো, জন্মভূমিকে ছেড়ে যাওয়া— সেটা কি সম্ভব! রাজ্যের বৃদ্ধ-বৃদ্ধারাও তাদের ভিটে-মাটি ছেড়ে যেতে রাজি নয়। সমস্যা তো বটেই, কিন্তু তবু প্রাণ বাঁচানোর কাছে অন্য সব সমস্যাকেই বিসর্জন দিতে হবে।

রাজা তাঁর রাজ্যের বাছাই করা সাতজন নাবিককে ডাকলেন। তারপব তাদের ওপর নতুন দেশ খোঁজার দায়িত্ব দিলেন। রাজ্যেব দক্ষিণের সেই দ্বীপটিকে খুঁজে বের করতেই হবে— এর জন্য রাজার ভাণ্ডার খোলা রইল। উপযুক্ত দিনে নাবিকেরা বাজা ও রাজ্যের শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ নিয়ে বেবিয়ে নৌকো ভাসালো। অভিযাত্রী নাবিকদের নৌকো ধীরে ধীরে অদৃশ্য হ'ল সাগরের বুকে।

নিপুণ ও দক্ষ নাবিকেরা দু'মাস ধরে অনবরত নৌকো চালাবার পর খুঁজে পেলো একটা দ্বীপ, শুক্‌নো ও রুক্ষ। তাদেব মনে সন্দেহ দেখা দিল। এই দ্বীপের কথাই কি রাজা তাদের বলেছেন? তবুও রাজার আদেশ অমান্য করার উপায় নেই। বাজার আদেশ ছিল যে, দ্বীপ পাওয়া মাত্রই তিনজন সেখানে থেকে যাবে আর বাকি চারজন ফিরে এসে সবিশদ রাজাকে জানাবে।

চারজন নাবিক ফিরে এল তাদের দ্বীপে; তারপর নৌকো ভিড়িয়ে রাজদরবারে এসে হাজির হল। রাজা তাদের ফিরে আসতে দেখে আশীর্বাদ জানালেন, তারপর জিজ্ঞাসা করলেন,

—দ্বীপের সন্ধান পেলে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ.....তবে...তারা কিন্তু কিন্তু করতে লাগলো। তাদের আম্‌তা আম্‌তা করতে দেখে, রাজা অভয় দিয়ে বললেন, —নির্ভয়ে বলো তোমরা কি দেখলে।

রাজার অভয় পেয়ে নাবিকেরা বলল,— দ্বীপটা আপনার কথামত ঠিক জায়গাতেই পেয়েছি, তবে আসলে সেটা শক্ত পাথরে ভর্তি, চাষ-বাস করার উপযোগী নয়। ওই দ্বীপে উঠলে সম্ভবতঃ আমরা না খেয়ে মারা পড়বো।

তাদের কথা শুনে রাজা গম্ভীর হলেন— তারপর অনেকটা প্রশ্নের ভঙ্গিতে বললেন, —বেশ, ওখানে চাষ-বাসের অভাবে মরতে হবে বুঝলাম, কিন্তু এখানেই কি আমরা সুখে আছি! মরতে আমাদের হবেই— সমুদ্রের জল যে কোন মুহূর্তে এই দ্বীপে উঠে সব ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। কাজেই আর দ্বিধা নয়— সবাই তৈরি হও। এ দ্বীপের মায়া ছাড়তে হবে; মনে করো এটাই ভগবানের ইচ্ছে।

হোতুয়া মোতুয়া রাজার আদেশ হওয়ামাত্র দ্বীপে সাড়া পড়ে গেলো, চারদিনের মধ্যেই রাজা বিরাট দুটো ভেলা তৈরি করালেন। আর তার মধ্যে তুলে নিলেন তাঁর আবশ্যকীয় জিনিষ মালপত্র আর প্রায় দু'শ পঞ্চাশ জন দ্বীপবাসী। বয়স্করা দ্বীপ ছেড়ে সহজে যেতে রাজি নয়। বন্যার ভয়ে প্রাণের আশায় রাজা তরী ভাসালেন দক্ষিণ দিকে। রাজার ভেলা ভেসে চললো দক্ষিণের দিকে। সমুদ্রগামী নৌকো হল তাড়াতাড়ি যাওয়া যেত। কিন্তু প্রচুর মালপত্র ও জীবজন্তুর জন্য রাজা ভেলা ভাসাতে বাধ্য হয়েছেন। সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ আর অশান্ত বাতাসে এই সুদীর্ঘ সফর অনেকেই সহ্য করতে না পেরে সমুদ্র-পথেই প্রাণ ত্যাগ করলো। প্রচুর জীবজন্তুও মারা গেল। দীর্ঘ ছ'মাস এইভাবে সমুদ্রের সাথে যুদ্ধ করার পর তারা দেখতে পেল তাদের বাঞ্ছিত দ্বীপ। ভেলার সকলেই শ্রান্ত-ক্লান্ত আর অনেকে রোগে জর্জর— তাদের নিয়ে রাজা তাঁর ভেলা ঠেকালেন এই দ্বীপে— দ্বীপটির নাম পৃথিবীর নাভি। যে তিনজন নাবিক সেখানে আগে থেকেই ছিল, তারা তাদের প্রিয় রাজা রাণী আর আত্মীয়-স্বজনদের দেখে ছুটে এল তীরে। রাজা প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন, —এই দ্বীপে খাবার জল আছে তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, এই দ্বীপে একটাই মাত্র ঝরণা।* মনে হয় এ ঝরনাটা অমর।

রাজা উঠে এলেন এ দ্বীপে নতুন দেশ গঠনের আশায়। রাজারাণীর সাথে সাথে উঠে এল তাঁর প্রজারা, আর অন্যান্য মালপত্র। রাজা ছিলেন ভবিষ্যৎদ্রষ্টা, কাজেই তিনি তাঁর সাথে অনেক কিছুই এনেছিলেন, তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল, শুয়োর, মুরগী ও ইঁদুর; ইঁদুর কেন— সম্ভবতঃ তাঁর সাথে ছিল বিড়াল জাতীয় জন্তু আর পথের ধাক্কা সামলাতে না পেরে তারা পথেই মারা গেছে, রয়েছে শুধু ইঁদুর। প্রচুর গাছ-গাছড়ার মধ্যে শেষ পর্যন্ত বেঁচে ছিল মিষ্টি আলুর চারা, নারকেল গাছ, কলাগাছ, প্রচুর আখের ভ্রুণ। আর মাকয় ও মাহুত ধরনের গাছ— এই

---

* আজও এই দ্বীপে একটাই মাত্র ঝরনা— দ্বীপবাসীদের একমাত্র পানীয় জলের উৎস। তাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে দ্বীপের একমাত্র গ্রাম বা শহর।

গাছগুলো অনেকটা জলপাই গাছের মত। এ দ্বীপে এখনও কয়েকটা নারকেল গাছ দেখতে পাওয়া যায়, তবে তাতে নারকোল হয় না। কলাগাছেরও প্রায় ওই অবস্থা।

রাজা দ্বীপে উঠলেন— সকলেই বাঁচলো। এবার প্রধান সমস্যা দেখা দিল চাষ-বাসেব জন্য। দ্বীপের ওপরে রয়েছে— প্রায় ফুটখানেক লাভার প্রলেপ; একমাত্র সেই লাভার আস্তরণকে তুললেই সম্ভব ফসল ফলানোব।

একেই বলে রাজা— প্রজাদের মঙ্গলের জন্যই তাঁব জন্ম, তাঁর চিন্তা ও পুনর্জীবন। তাদের সাথে এসেছিল— শাবল, কোদাল, বেলচা হাতুরী আরও বিভিন্ন সরঞ্জাম। একটা সমতল ভূমি বেছে নিয়ে হোতুয়া মোতুয়া মেতে উঠলেন তাঁর নতুন রাজ্য স্থাপনে। তাবপব মাসখানেকের মধ্যেই ঝবনাব ধাবে তৈবি করালেন একটা চমৎকাব সব্জি বাগান। আর দ্বীপের রুক্ষ ও ঝড়ো হাওয়া থেকে সেই বাগানকে রক্ষা করবার জন্য বাগানেব চারপাশে বিবাট পাথবের উঁচু বেড়া। আস্তে আস্তে গড়ে উঠল তাঁর নতুন রাজত্ব, প্রজাদের মুখে ফুটে উঠল হাসি আব আশাব আনন্দ, তাদেব আদি দেশ হয়ে উঠল তাদেব রূপকথাব স্বর্গপুবী।

২য় গল্প— ধর্মপুত্র ত্যাগীগি: মহাসাগবেব বুকে সমুদ্রেব মুক্তার মতই ছড়িয়ে আছে বহু দ্বীপ। কোন কোন সময় পাশাপাশি এইসব দ্বীপের মধ্যে সদ্ভাব থাকে, আবাব কোন কোন সময় গড়ে ওঠে অসদ্ভাব। এবকমই দুটো দ্বীপ, একটাব নাম তাবাতাহি আব একটার নাম আভাহিকি। হঠাৎ তাদেব মধ্যে সংঘাত বেড়ে ওঠে। তাবাতাহি দ্বীপেব যোদ্ধারা ছিল খুবই দুর্ধর্ষ, মাঝে মাঝে তাদেব নৌবহর নিয়ে প্রায়ই প্রতিবেশী রাজ্যে হানা দিত আব এইভাবে লুঠতবাজ ও ফসলেব ক্ষতি সাধন করতো। তাদেব সাথে যুদ্ধে পেরে ওঠবাব মত ক্ষমতা আশেপাশেব দ্বীপবাসীদেব ছিল না। তাদের অত্যাচারে প্রায়ই আভাহিকি দ্বীপবাসীদের অনাহাবে ও অনিদ্রায কাটাতে হত। আভাহিকি দ্বীপেব মালিক ছিল আনুয়া মতুয়া। নাবিক হিসেবে তাব খুব নাম। মহাসাগরের কোথায় কোন দ্বীপ আছে তা তাব নখদর্পণে। কিন্তু যুদ্ধবিদ্যায তাব মোটেই অনুরাগ ছিল না। কাজেই তাবাতাহি দ্বীপের শত অত্যাচাব সত্ত্বেও সে হিংসার আশ্রয় নেয়নি। আনুয়া মতুয়ার অধীনে ছিল অনেক গুণীজন। তাবাতাহি দ্বীপেব দস্যুদেব অত্যাচাবে অতিষ্ঠ হয়ে তাবা একে একে সবাই আনুয়া মতুয়াকে ছেড়ে এদিক-ওদিকে চলে গেল। আনুয়া মতুযাব তিন ছেলে ও এক মেয়ে ছিল। ছেলেদের নাম যথাক্রমে ত্যাগীগি, পুনিগা ও মাবেকুরা, মেয়ের নাম ছিল তুয়াতুতি। সন্তানদের সাথে পিতার ছিল অতি মধুর সম্বন্ধ। একদিন তুয়াতুতি তার বাবাকে এসে বলল—

একে একে সব জ্ঞানী-গুণীজন আমাদেব ছেড়ে চলে যাচ্ছে; তুমিতো নাবিক, আমাদের জন্য একটা বন্দোবস্ত করতে পারো না, যেখানে আমরা শান্তিতে দিন কাটাতে পারবো। কন্যার কথায় আনুয়া মতুয়ার হৃদয় গলে গেল... কিন্তু সে কোন

উত্তর দিল না। তারও কয়েকদিন পর আনুয়া মতুয়ার বড় ছেলে ত্যাগীগি এসে বাবার কাছে বসল। ত্যাগীগি পেশায় পুরোহিত, দ্বীপের মন্দিরের সেই একমাত্র পূজারী। তারপর পিতার উদ্দেশ্যে বলল— মৃত্যু মাত্রেই অবধারিত, কিন্তু দুঃখ-কষ্টটা কি আমরা এড়াতে পারি না? দিনের পর দিন দুর্ভাবনায় থাকার চেয়ে একটা নতুন দেশে গিয়ে শান্তিতে কি আমরা থাকতে পারি না! পরপর কন্যা ও পুত্রের কথায় আনুয়া মতুয়া আর চুপ করে থাকতে পারলো না। মনে মনে ভাবলো, সত্যই তো, তার জানা দ্বীপের তো অভাব নেই। এখান থেকে অনেক অনেক দূরে তারাতাহিব আয়ত্বের বাইরে তাকে চলে যেতে হবে। আনুয়া মতুয়া সমুদ্রাভিজ্ঞ, কাজেই সমুদ্রে হারিয়ে যাওয়ার ভয় তার নেই। সেই রাতেই আনুয়া মতুয়া তার ছেলেমেয়েদের ও পরিবার বন্ধু-বান্ধবদের ডেকে তার মতামত জানালো— 'ঠিক কথা, সুখের থেকে স্বস্তি ভাল— চল যাই আমরা একটা আদর্শ দ্বীপ খুজে বার করবোই, তাতে কোনো অসুবিধা হবে না।' তিনটে বিরাট বিরাট নৌবহরে করে তারা সে রাতেই পাড়ি দিল নতুন দ্বীপের সন্ধানে। তার সাথে চলল ১৫০০শ দ্বীপবাসী। তারাতাহিব দস্যুরা পরের দিন আভাহিকিতে এসে তো অবাক! সব শ্মশান— সব ধনদৌলত নিয়ে আনুয়া মতুয়ার দল নিরুদ্দেশ হয়েছে। দস্যুরা ভাবলো জলপথে আর ওরা কতদূর যাবে— সমুদ্রের ঢেউএ নৌকোডুবি হয়ে ওরা মারা যাবে।

আনুয়া মতুয়া দক্ষ নাবিক। সমুদ্র তার সখা, সমুদ্রের ঢেউ তার দোলনা। তবে নৌকোতে যারা আছে তাদের কাছে তো আর এক জিনিস। সমুদ্রের ঠাণ্ডা বাতাস আর একঘেয়ে জলে ওদের দেখা দিতে লাগলো সমুদ্র রোগ। প্রথম দ্বীপটি দেখা মাত্র, আনুয়া মতুয়া তার ছেলে-মেয়েদের বলল, — তোমাদের মধ্যে যার খুশী এই দ্বীপে যাও। এখানে খাওয়ার কোনো অসুবিধা নেই আর দ্বীপটিও অতি সুন্দর।

তার মেয়ে তুয়াতুতি সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠল,— আমি থাকবো এই দ্বীপে।

আনুয়া মতুযা তার সাথে উপযুক্তসংখ্যক লোকজন দিয়ে আবার শুরু করলো যাত্রা।

কযেকদিন পর দ্বিতীয় দ্বীপটির কাছে তার নৌবহর ভিড়তেই আনুয়া মতুয়া তার ছেলেদের বলল,— এই দ্বীপে ঐশ্বর্যের শেষ নেই— কে যাবে এখানে?

সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় ছেলেটি লাফিয়ে উঠল,— আমি যাব। আনুয়া মতুয়' প্রথমবারের মত এবারেও তার পুত্র পুনিগার সাথে উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য-সামগ্রী ও লোকজন দিয়ে তাকে সেই দ্বীপে উঠিয়ে তারপর আবার শুরু করলো যাত্রা। দিন পনেরো পর আর একটি দ্বীপে এসে তারা উঠল। ছোটছেলে মারোকুরাকে সে এই দ্বীপের সর্বেসর্বা করে দিল। এইভাবে নাবিক আনুয়া মতুয়া বিভিন্ন দ্বীপ আবিষ্কার করে তার ছেলেমেয়ে, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে ভাগ করে দিতে লাগলো। নতুন দ্বীপ, নতুন দেশ পেয়ে সবাই খুশী, পনেরোশ' লোকের মধ্যে শেষে রইল বাকি একমাত্র নৌকোয় গুটি কতক লোক, সে আর তার প্রিয় পুত্র ত্যাগীগি।

তাদের নৌকো চলতে লাগলো। নৌকোর মধ্যে যারা ছিল তাদের মধ্যে ছ'জন পুরুষ ও নারী আনুয়া মতুয়ার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আনুয়া মতুয়ার প্রতি তাদের বিশ্বাস ও ভক্তির তুলনা চলে না। ত্যাগীগি ছোটবেলা থেকেই ধার্মিক, আধ্যাত্ম চর্চাই তার একমাত্র কাজ। নৌকোয় বসে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে সে মৌনই থাকে সারাদিন— কি যেন সে ভাবে। মুখের ভাব শান্ত ও সৌম্য। অনেকদিন চলার পর নৌকোর যাত্রীরা সকলেই ক্লান্ত ও শীর্ণকায়, তবুও মুখ ফুটে তারা একটু প্রতিবাদও করে না। তাদের এই দুরবস্থা দেখে ত্যাগীগি তার বাবাকে জিজ্ঞেস করল,

—আর কতদূর তুমি আমাদের নিয়ে যাবে? তার কথা শুনে নাবিক অনেকটা দূরে একটা মহাদেশ দেখতে পাচ্ছে এরকম ভাব নিয়ে বলল,

—আর বেশিদূর নয়— কারণ সামনেই রয়েছে বিবাট এক দেশ, সেই দেশটা উঁচু বরফেব পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, কেউ ভেতরে ঢুকতে পাবে না, সারা বছরই সেখানে প্রচণ্ড শীত। ওখানে গেলে, শীতে জমে গিয়ে সবাই মারা যায়— কাজেই আর এগোনো সম্ভব নয়। আর কয়েকদিনের মধ্যে পাবো একটা দ্বীপ, নিস্তব্ধ শান্ত ও সমাহিত। তোমার ঠিক উপযুক্ত স্থান। সেখানে তুমি সারাদিন ধ্যানস্থ হয়ে থাকতে পারবে। সমুদ্রে মাছের অভাব নেই, কাজেই খাবার চিন্তা তোমাকে করতে হবে না। আর সেই দ্বীপে আছে বড় বড় চমৎকাব গুহা; সেখানে থাকবার জন্য কোন চিন্তা করতে হবে না, জীবনের শেষ ক'টা দিন আমবা পরম শান্তিতে সেখানে থাকতে পাববো। পিতার কথায় ত্যাগীগি অভিভূত হয়ে পড়ল। এইতো আদর্শ পিতা— পুত্রের জন্য যে সব কিছু বিসর্জন দিয়ে এই পথ অনুসবণ কবছে।

আনুয়া মতুয়ার কথা বিফলে যাবার নয়। কিছুদিনের মধ্যেই তারা আবিষ্কার করল এক দ্বীপ। ত্যাগীগি জিজ্ঞাসা করল,

—এ দ্বীপের কি নাম পিতা?

—এ দ্বীপের নাম পৃথিবীর নাভি। উত্তব দিলো অভিজ্ঞ নাবিক। তারপর আরও বলল যে এব দক্ষিণে আর যাওয়া সম্ভব নয়—প্রাণী-জগতেব এটাই সীমান্ত।

লোকজন সহ সবাই উঠে এল সেই দ্বীপে। পাহাড়, পাথর আর শুকনো ঘাসে ভরা এই দ্বীপ। নাবিকদের আকৃষ্ট করার মত কোন বস্তুই এ দ্বীপে নেই। নির্জন; কোন প্রাণীরই সাড়া নেই। ত্যাগীগির আনন্দ যেন আর ধরে না। ঠিক এটাই ছিল তার জীবনের স্বপ্ন। নির্জনে বসে—সীমাহীন সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে সে ভাবতে পারবে সেই অসীম পরমাত্মাকে—জীবনকে উপলব্ধি করার এমন সৌভাগ্য আর ক'জনের হয়! সঙ্গে যারা ছিল তারও খুব খুশী, ত্যাগীগির সান্নিধ্যেই তাদের আনন্দ, ত্যাগীগির মুখনিঃসৃত বাণীতেই আছে সান্ত্বনা, আর ধ্যানের মাধ্যমেই তারা পাবে মুক্তি। পুত্রের আনন্দ পিতার আনন্দ। কিছুদিন পরই আনুয়া মতুয়া সেই দ্বীপে দেহত্যাগ করল— মহাসাগরের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীর হ'ল মৃত্যু।

কিন্তু ত্যাগীগি ছিল অসাধারণ শক্তিশালী, সে সব সময়ই ছিল বিনয়াবতার—পরলোকতত্ত্ব তার কাছে অতি সহজ ও সরল তত্ত্ব। পিতার মৃত্যুর পরই সে ধ্যানে বসে ডেকে আনল পরলোকগত পিতৃ-আত্মাকে। তারপর সেই আত্মাকে সে অনুরোধ করল,

—পিতৃদেব, তুমি এখন স্থূলদেহ ছেড়ে সূক্ষ্ম দেহে বিদ্যমান। তুমি এ দ্বীপ ছেড়ে যেও না, তোমার আশীর্বাদ ও উপস্থিতিই আমাদের বল ও ভরসা। তার কথা শুনে পরলোকগত আনুয়া মতুয়ার আত্মা বলে উঠল,

—তোমাদের ইচ্ছা পূর্ণ হোক—আমি এ দ্বীপেই অবস্থান করব।

ত্যাগীগি ও তার সঙ্গীরা পরম সুখে সেই দ্বীপে থেকে ভগবৎ আরাধনায় নিযুক্ত হল। তাদের বংশধরেরাই আজকের ইস্‌লো দা পাসকুয়ার অধিবাসী।

গল্প দুটো চমৎকার, আমি এ গল্পদুটো বিশ্লেষণের দায়িত্ব নিচ্ছি না, তবে আমার শুভানুধ্যায়ীদের অনুরোধ করবো, গল্পের মধ্যে খুজে পেতে ভাবতীয় দর্শনের ছোঁয়াচ। তবে আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, এই রূপকথা দুটোর মধ্যেই রয়েছে দ্বীপের কাহিনী। এ ছাড়াও অন্যান্য বহু গল্প এ দ্বীপে প্রচলিত আছে, কিন্তু ভাষা ও উপযুক্ত যোগাযোগের অভাবে, আমি তা সংগ্রহ করতে পাবলাম না।

প্রাচীন ধর্ম :

এ দ্বীপের প্রাচীন ধর্মেব বিষয়ে লেখা সত্যি কঠিন। আমি আগেই লিখেছি যে, এখানকাব হিয়েবোগ্লিফ এখনও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তবে এ নিয়ে ভীষণ গবেষণা চলছে। আশা আছে, ঈজিপ্টের পিরামিড বহস্যের মত এখানকার রহস্যও একদিন উদ্‌ঘাটিত হবেই। প্রস্তর-লিপির অব্যাখ্যাত লেখাগুলো পড়বার ক্ষমতা যেদিন হবে সেইদিনই এখানকার গবেষকরা দেখতে পাবে, হারিয়ে যাওয়া ইতিহাসের আলো। এ দ্বীপের ধর্ম ও সংস্কৃতির কথা তখনই আয়ত্তে আসবে।

আমি এই দ্বীপে এসেছি মাত্র সপ্তাহখানেকেব জন্য— আমার সময় অল্প, তার ওপব রয়েছে ভাষার বাধা। তবুও চেষ্টা কবছি যতটা সম্ভব এদিক ওদিক থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে। দ্বীপের বুড়ো দাদু ভেরিভেরি— আমার কাছে সে একটি চলন্ত অভিধান। কাজেই একে ওকে ধরে তার গল্পের তর্জমা করতে হচ্ছে। হাংগা রোয়া অতি ছোট্ট এলাকা; কখনও চার্চের বারান্দায় বসে, কখনও রাস্তার ধারে চায়েব দোকানের টুলে বসে, আবার কখনও, হাংগা বোয়ার ঝরণার ধারে বসে দাদু গল্প বলে। দাদুকে আমি প্রায়ই চা খাবার জন্য দোকানে ডাকতাম— তাকে ডাকলেই আসে; এতটুকু সঙ্কোচ নেই। তার কাছ থেকে ও রোঙ্গো রোঙ্গো পরিবারদের কাছ থেকেও শুনে মোটামুটি আমি আমার ডায়েরীর পাতায় লিখছি। গল্পের মধ্যেই রয়েছে সত্যতা—, তবে বাড়তি অংশটাকে অবিশ্বাস্য মনে করে ঠেলে ফেলিনি। দ্বীপটি আবিষ্কৃত হবার পর থেকে, এই দ্বীপটিতে বহুবার বহু বিদেশী জাহাজ আগমনের

ফলে দ্বীপবাসীদের খাঁটি ইতিহাস ও ঐতিহ্য তছনছ হয়ে গেছে। বিভিন্ন ইউরোপীয় বণিক অনেক সময় এই দ্বীপের পাশ দিয়ে যাবার সময়— ক্রীতদাস হিসেবেও অনেক দ্বীপবাসীদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছে, তাদের ধরে নিয়ে গিয়ে চিলির খনিতে কাজ করিয়েছে। তিমি মাছ শিকারে এসে স্পেন ও পর্তুগীজ নাবিকেরা তাদের পশুপ্রবৃত্তি নিয়ে এদেশের স্ত্রীজাতির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। খৃষ্টান মিশনারীরা এসে এদের ধর্মকে আদিম বলে উচ্ছেদ করেছে ... . কাজেই এ দ্বীপের ঐতিহ্য খুজে পাওয়া মুশকিল। এখন যা আছে তা একান্তই সে যুগেব কথা।

সবাই একমত যে এ দ্বীপবাসীদের উৎপত্তি 'হিবা' থেকে অর্থাৎ বর্তমান তাহিতি। হিবার বাজা হোতুয়া মতুয়া তার লোকজন নিয়ে এ দ্বীপে এসে প্রাণরক্ষা কবলেন। বাজা হোতুয়া মতুয়াই নিয়ে এসেছেন তার ধর্ম আব সংস্কাব। বাজা হিসেবে তিনি ছিলেন প্রজা-বৎসল। আর ধার্মিক হিসেবে তিনি ছিলেন যেন দেবতা। মৃত্যুর সময় রাজা হোতুয়া মতুয়ার প্রাণ বারবার দেখতে চেয়েছিলো তাঁব ফেলে আসা হিবা রাজ্য, কিন্তু সে অনেক দূরে। তাঁর শেষ ইচ্ছা ছিল এই যে, মৃত্যুর পর তাঁর দেহকে যেন এখানকার সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ে বাখা হয়; তাঁব মাথা যেন থাকে উত্তরমুখী অর্থাৎ হিবার দিকে। প্রজারা তাঁর শেষ ইচ্ছা পূরণ কবেছে। এখানকার সবচেয়ে উঁচু পাহাড়, যেখান থেকে আগ্নেয়গিবির মুখ বয়েছে, ঠিক সেখানে হিবামুখী এক বিবাট গুহা বেছে নিয়ে রাজার দেহকে বক্ষা করেছে। সেখানকার স্থানীয় নাম বানা কাও। মৃত্যুব পূর্বে রাজা ছিলেন এ দ্বীপের সর্বেসর্বা এবং মৃত্যুর পরও তিনি হয়ে রইলেন দেবতা। বাজার দেহকে রক্ষা কববার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হলো পুরোহিতের ওপব। তু-উবা নামে এই পুরোহিত সম্প্রদায়ই হয়ে উঠল দ্বীপের সর্বেসর্বা। হোতুয়া মতুয়ার শাবীবিক মৃত্যু ঘটলেও তাঁর আত্মা থেকে গেল অমর, আর প্রয়োজনে তু-উরা রাজার কাছ থেকে আদেশ ও উপদেশ নিয়ে বাজ্য চালাতো। জীবিতকালীন বাজা যেসব কথা বলতেন আর তাঁর আচাব-ব্যবহাব নিয়েই এই দ্বীপে সৃষ্টি হল ধর্মেব। বাজা খুব কম কথা বলতেন; রাজা বলেছেন— বেশী কথা বললে মনের অপচয় হয়। রাজা বলেছেন —চুল কাটলে মনের অপচয় হয়, রাজা বলেছেন— মনই জীবনের মূল, রাজা বলেছেন—দ্বীপবাসীবা বিভিন্ন ভাগে ভাগ হয়ে নিজেরা সুখে শান্তিতে থাকুক। রাজা বলেছেন— হিবাব দিকে মুখ করে প্রার্থনা করতে। রাজা এই ধরনের বহু কথা বলেছেন যা দ্বীপবাসীদেব কাছে একান্তই পালনীয়। আমার কাছে 'মন' শব্দটি ভাল লাগলো, এখনও দ্বীপবাসীবা পলিনেসিয়ান ভাষায় শক্তিকে বলে মন। আরও দু-একটি এইরকম কথার মধ্যে যেমন আছে 'কুমড়া'। মিষ্টি আলুকে এরা বলে কুমড়া। তু-উরা সম্প্রদায়, রাজার শবদেহকে রক্ষণাবেক্ষণ করতো আর দিনের মধ্যে অধিকাংশ সময়েই গুহায় বসে রাজার সাথে যোগাযোগ করতো।

পুরোহিত বা তু-উরা ছাড়া আর কারও এই গুহায় প্রবেশ করার ক্ষমতা ছিল না। রাজা জীবিতকালীন তাঁর আর একটি বিশেষ ক্ষমতা ছিল— রাজা যদি কোন

রুগ্ন বা অলস ব্যক্তিকে স্পর্শ করতেন, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সেই ব্যক্তি সুস্থ ও সবল হয়ে উঠে কাজে লাগত।

তাই রাজার মৃত্যুর পর বছরে দু'বার তাঁর দেহকে স্পর্শ করার জন্য বিশেষ উৎসবের দিন ধার্য করা হ'ল। দ্বীপবাসীরা সকলেই সেদিন রাজার মাথার খুলি ছুঁয়ে পুণ্যার্জন করতো। স্বাস্থ্য সম্পর্কেও রাজার অনেক বাণী আছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য জন্মবিধি। শিশুর জন্ম হওয়া মাত্র তার নাভি কেটে নবজাতকের পেটের ওপর ভারী ও সামান্য গরম কাটির প্রলেপ দেওয়া হত, তাতে রক্তক্ষয় দূর হয়; তারপর শিশুকে তার মায়ের বুকে শুইয়ে দিয়ে তার পিতা স্ত্রীর স্তন ধরে প্রথম আহার প্রদান করবে। তারপর শিশুর মাকেও তার স্বামী আহার দেবে— আর সেই সাথে বলবে— 'তুমি হিবার থেকে এখানে এসেছো— এখানেই থাকো।'

রাজার বাণীতে আছে, চুল কাটলে মনের অর্থাৎ শক্তির অপচয় হয়, তাই পুরোহিত ও দ্বীপবাসীরা চুল রাখাটাই পছন্দ করতো। মনে হয় দ্বীপের রুক্ষ হাওয়া থেকে মাথা ও গলাকে বাঁচানোর জন্যই রাজার এই বাণী।

চুলের প্রসঙ্গে এখানকার দ্বীপবাসীরা অনেক গল্প জানে। যেমন— ১৮৬৪ সালে ফাদার থাইরড নামে একজন খৃস্টান মিশনারী প্রথম এই দ্বীপে এসে এখানকার ধর্ম সম্পর্কে অনেক কিছুই দেখেছেন, সেসব কথা ভদ্রলোক লিখেও রেখেছেন তাঁর ডায়রীতে। তবে দুঃখের বিষয় যে, তিনি এখানকার ঐতিহ্য ও রীতিনীতির ওপর আস্থা না রেখে সেগুলো গেঁয়ো ও কুসংস্কার বলে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনিই জোর করে এ দ্বীপের পুরোহিতদের ধরে ধরে তাদের চুল কেটে মস্তক মুণ্ডিত করে ছেড়েছেন। আর তৎকালীন রাজার আট বছরের একমাত্র শিশুপুত্রকেও মস্তক মুণ্ডিত করতে বাধ্য করেছেন। দ্বীপবাসীরা এখনও বলে যে তখন থেকেই অর্থাৎ চুলের সাথে সাথে এ দ্বীপের অলৌকিক শক্তিও হঠাৎ উধাও হয়েছে। ইউরোপীয়ান বুদ্ধিমানদের এই ধরনের কূটনৈতিক অত্যাচার আমাদের দেশেও প্রচুর হয়েছে।

এইভাবে দ্বীপের যা বৈশিষ্ট্য ও ধর্ম তা বর্তমানে নে-ই বললে চলে—যা আছে তা হচ্ছে পলিনেসিয়ান ভাষায় গান আর নাচ। আজও মাঝে মাঝে তারা এই ধরনের লোকনৃত্য দেখিয়ে ট্যুরিস্টদের আনন্দ বিতরণ করে। দ্বীপের বর্তমান ধর্ম বলতে বোঝায় রোমান ক্যাথলিক। কাপুসাঁ সেবাস্তিয়ান সেই গীর্জার সর্বেসর্বা। তার মূল কেন্দ্র চিলির রাজধানী সান্তিয়াগোতে। রাজা হোতুয়াই এ দ্বীপে ধর্মের গোড়াপত্তন করেন, হয়তো সে সময়েই এখানকার বড় বড় স্ট্যাচুগুলোকে দাঁড় করানো হয়, আর তাঁর মৃত্যুর পরও সেকাজ চলতে থাকে। তারপর সম্ভবত ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে হঠাৎ এক অজ্ঞাত কারণে এখানকার সব কাজ থেমে যায়। একের পর এক করে সবাইকেই মৃত্যুর করাল গ্রাসে পড়তে হয়।

বুড়ো ভেরিভেরির মতে দ্বীপের অধিবাসীরা একদিন তাদের দেবপূজো দিতে ভুলে যায়। আর তারই ফলে দেবতা রুষ্ট হয়ে, এই দ্বীপে তাঁর অভিসম্পাত বর্ষণ করেন— তাঁর সেই ভয়ঙ্কর রুদ্র দৃষ্টি থেকে কেউই বাদ পড়েনি।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে আমি একরাতে যে গুহার মধ্যে দুটো নরকংকালের সাথে রাত কাটিয়েছি, সেই কংকাল দুটোই ছিল এ দ্বীপের এককালীন জাগ্রত ও আরাধ্য দেবতা, অর্থাৎ রাজা হোতুয়া মতুয়া আর তাঁর রাণী।

দ্বীপে প্রায়ই দেওয়ালের গায়ে অনেকটা ফ্রেস্কোর মত একটা ছবি চোখে পড়ে— এদেশের লোকেরা যাকে বলে মানুষ পাখী। এককালে সেই মানুষ পাখী—পাখী দেবতা হিসেবে পূজিত হত। এই দ্বীপে পাখীর অভাব, তাই এই পাখী দেবতাকে স্তবে তুষ্ট করে বহু দূর থেকে সীগাল বা মুয়েত ধরণের সমুদ্র-পাখীদের এ দ্বীপে নিয়ে আসা হত। সে যুগে এ দ্বীপের পাখীগুলো ছিল সুখ, আনন্দ ও মুক্তির প্রতীক। সেই পাখীর ডিম একমাত্র রাজারই আহার। কাজেই রাজ্যে যেখানেই সেই পাখীর ডিম পাওয়া যাক না কেন তা রাজ-সামগ্রী।

খেলাধুলা :

দ্বীপেব তিনদিকে আছে তিনটি আগ্নেয়গিবি, সবচেয়ে যেটি উঁচু রানো রোয়া, উচ্চতা প্রায় আটশ মিটার, বাকি দুটো হচ্ছে রানো কাও ও বানো রারাকু; উচ্চতা যথাক্রমে চারশ দশ মিটার ও তিনশ কুড়ি মিটার। এখানকার অধিবাসীরা অগ্ন্যুৎপাতের অনেক পরে এসে উপস্থিত হয়েছে, কাজেই বসবাসের জন্য তাদের খাটতে হয়েছে প্রচুর। স্টাচুগুলো ছাড়াও এখানকার আব এক আশ্চর্য রানো কাও-এর খেলার মাঠ। পাহাড়ের গা কেটে আর লাভার আস্তরণ সরিয়ে তৈরি করা হয়েছে একটা মাঠ। মাঠ মানে শক্ত পাথরের এক সমতল ভূমি— আর তারই পাশে পাহাড়ের দেওয়াল কেটে তৈরি করা হয়েছে সারি সারি ঘর। মাঠের পাশেই এই ঘরগুলো দেখলে মনে হয় এগুলো ক্রীড়া-রসিকদের জন্যই তৈরি করা হয়েছিল। শুধু কোদাল-শাবল-খন্তা আর অসাধারণ গায়ের জোরেই এগুলো তৈরি করা হয়েছিল। সত্যি আশ্চর্য বটে!

এখান থেকে সুমুদ্রের দৃশ্যটা বড চমৎকার। কিছু দূরেই সমুদ্রের বুকে হঠাৎ ত্রিশূলের মত একটা বিরাট পাথর উঠে গিয়ে সৃষ্টি করেছে একটা ছোট দ্বীপ। সাঁতার কেটে গিয়ে ওই দ্বীপ থেকে রাজার জন্য পাখীর ডিম নিয়ে আসা ছিল একটা বিরাট সম্মানীয় প্রতিযোগিতা। অন্যান্য খেলাধুলার মধ্যে কি কি ছিল বলা মুশকিল তবে পাহাড়ের গায়ের লেখাগুলোর মর্মোদ্ধার করতে পারলে নিশ্চয়ই তা জানা যাবে।

আবার যাত্রা :

দেখতে দেখতে দশদিন কেটে গেল। মঁসিও কুর্বের দল এখন দ্বীপ ছাড়ার জন্য অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। তাদের মতে দ্বীপে দীর্ঘদিন থাকার মত কোন আকর্ষণ নেই। আমার মত যাই থাকুক না কেন, তাতে এদের কিছু যায় আসে না। এরা সখের ভ্রমণকারী, বিজ্ঞানজগতের জড়ত্ব আর জীবনের চাঞ্চল্যে অতিষ্ঠ হয়ে এরা বেরিয়েছে

অন্য জগৎ দেখতে— আর রিল্যাক্স্ হতে, অর্থাৎ সব জড়ত্বর বাইরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে। এইভাবে কয়েক মাস চলার পরে আবার তারা ফিরে যাবে তাদের গণ্ডির মধ্যে। এরা সখের নাবিক, অর্থ এদের আছে, আর তা দিয়েই কিনতে চায় সখের আনন্দকে।

এ রহস্যময় দ্বীপকে দেখা আর জানা এক জিনিস, কিন্তু এর মধ্যে স্পন্দিত হচ্ছে যে বিগত আত্মা তাকে তো আর দেখা যায় না। তাকে করতে হয় উপলব্ধি। আপশোষ থেকে গেল, সে ক্ষমতা আমার নেই। হাতে সময় থাকলে অবশ্য চেষ্টা করতাম এ আত্মার সাথে সে আত্মার যোগাযোগের। আত্মা অমর, কাজেই তারা এখনও আছে। যদি কোনো ভারতীয় ভবিষ্যতে এ দ্বীপে আসেন নিশ্চয়ই তিনি অনুভব করবেন এক অপূর্ব জগতের ছন্দ, যে ছন্দ আমার মত সাধারণের ধরা-ছোঁয়ার বাইবে। মঁসিও কুর্বে তৈরি, তাঁদের সাথে আমিও। বিদায় জানাতে হল ক্ষণিকের পবিবারকে। প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে আমাদের তরী দুলে উঠল। বোটেব ভাবী মোটবেব ওজন আর তাকে সাহায্য কববাব জন্য পালে ধরা হল বাতাস। দ্বীপবাসীবা প্রায় সকলেই হাজির হয়েছে হাংগা বোয়া ঘাটেব উপব। সখের বোট এ ঘাটে বেশি ভেড়ে না, বছরে ছ'সাতটা মাত্র, কাজেই যখনই এ ধরনেব বোট আসে বা যায় তাকে ঘিরে জমে ওঠে ঘাটেব কাহিনী। আমাদেব দিকে তাকিযে নিশ্চযই এতক্ষণে জমে উঠেছে ওদের গল্প। আমি জোর কবে বলতে পারি, এবাবকাব মুখ্য বিষয়ের নায়ক কলকাতার একটা লোক....।

সমুদ্রযাত্রায় আছে মুক্তি, আছে আনন্দ। অসীম আনন্দের মধ্যে একটা ছোট্ট পাতাব মত আমাদের বোটটা দুলে দুলে এগোতে লাগলো। দ্বীপের উপর কয়েকশ হাত তখনও নড়ছে; আমরাও তাদের বিদায় জানাচ্ছি আমাদের বিরাট তোয়ালে উড়িয়ে। বিদায় জানালাম অভিশপ্ত দ্বীপকে। দ্বীপেব উপর এখনও পরিষ্কাব দেখা যাচ্ছে সারি সারি স্ট্যাচুগুলোকে। মনে হচ্ছে দ্বীপের সজাগ প্রহরীবা দ্বীপরক্ষায় সর্বদাই সচেতন। মনে মনে সেই প্রশ্নটা থেকেই গেল— কে বা কারা কি উদ্দেশ্যে এই মূর্তিগুলোকে তৈরি করেছে?

প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ইস্‌লা দা পাসকুয়া আস্তে আস্তে ধোঁয়ার মত আবছা হতে লাগলো; আর কিছুক্ষণের মধ্যেই তা সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হয়ে যাবে—। আমাদেব বোট সাগর তরঙ্গের উপর নাচতে নাচতে এগোতে লাগল— উদ্দেশ্য তাহিতি।

পরিশিষ্ট

এই দ্বীপে আমি এসেছি মঁসিও কুর্বের সাথে। তার সাথে কথাই ছিল যে তার বোট দ্বীপে পৌঁছানো মাত্র আমি যেন নিজে আলাদা থাকবার ব্যবস্থা করি। সে কারণেই আমি এ দ্বীপের এক পরিবারের সাথে আছি। দিনে মাত্র এক ডলার— খাওয়া ও থাকা সমেত। মঁসিও কুর্বেরাও সবসময়ই যে তাদের বোটে থাকে তা

নয়, তারাও মাঝে মাঝে এসে থাকে হাংগা রোয়ার শহরে। সেখানে ছোটখাটো হোটেলের মত দু'একটা জায়গা আছে— সবরকমের সুযোগ-সুবিধাই সেখানে আছে। কুর্বেরা সকলেই নাবিক। তারা আসলে ফ্রান্সের দক্ষিণে মারসেই-এর অধিবাসী। কাজকর্মের একঘেয়েমির থেকে বাঁচবার জন্য বে[illegible]ড় ঘরপালানো ছেলের মত। সমুদ্রের মুক্ত হাওয়া আর অসীমত্বের ছোঁয়াচ পাব[illegible]ই তাদের এই যাত্রা —মুক্তির নেশায়। কেন বেরিয়েছে তা এরা নিজেরাও ঠিক করে গুছিয়ে বলতে পারে না— তবে এদের ভাষায় বলে আভানচুর বা অ্যাডভেঞ্চার। সমুদ্রের ছোট্ট মাছ থেকে শুরু করে বড় তিমি পর্যন্ত সব কিছুতেই এদের আছে সমান আগ্রহ। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এটা বড়লোকি নেশা— নয়তো সখের বোটে সমুদ্র পাড়ি দেওয়া— এটা কি সবাই ভাবতে পারে?

এদের সাথে আমার যোগাযোগ, এটাকে একটি দৈব ঘটনা ছাড়া আর কি বলবো! অভিজ্ঞতার জন্য আমি ঘর ছেড়েছি আর ভাগ্যবলে আমার পথে একের পর এক এসে পড়ছে সেই অভিজ্ঞতা। এতে আমার বাহাদুরীর কিছুই নেই। যারা আমাকে চলার পথে ইন্ধন জোগাচ্ছে তাদেরই কৃপায় আর সাহায্যে আমার এ চলা।

পথে আমি অনেক চলেছি। পায়ের জোবে আর সাইকেলের চাকায় করে দুনিয়ায় আমি চক্কব দিচ্ছি; কিন্তু আমার এই সমুদ্রপথ যদি বাকি থেকে যেতো তাহলে আমাকে এক বিরাট কিছু থেকে বঞ্চিত হতে হত। একটা ছোট বোটে কবে প্রশান্ত মহাসাগরেব ঢেউএর মধ্যে দিনের পব দিন চলার মধ্যে যে এক বিরাট আনন্দ আছে তা আমি বলতে পারবো না, কিন্তু সেই অসীম ও অনন্তের মধ্যে নৌকোবন্দী হয়ে থাকার একটা বিরাট অভিজ্ঞতাকে আমি বলবো মানুষ ও তার আত্মাকে জানার এক প্রত্যক্ষ উপায়। আকাশের চাঁদ যখন সমুদ্রের ওপব তার আলো ছড়িয়ে দেয় ঠিক সেই সময়েই বার বার খুজে পেয়েছি আমার অস্তিত্বকে। শুধু আমি নই, নিঃসঙ্গ সমুদ্রযাত্রী মাত্রেই এ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। দিন-দশেক থাকার পব মঁসিও কুর্বে ঠিক করল আবার যাত্রা। আমাকেও তারা সঙ্গে নেবে। পানামা থেকে এখানে আসার পথে আমি তাদের জন্য যে কাজ করেছি তাতে তারা খুবই খুশী। আমার সাহায্য চায়, আমিও চাই এ সাগর পার হতে।

সখের সাগরতরী

তাহিতি : পৃথিবীর অন্যতম একটি সুন্দর দ্বীপ। যারা বন জঙ্গল ও সামুদ্রিক শোভা দেখতে ভালবাসে তাহিতি তাদের স্বর্গরাজ্য। তাহিতির আকর্ষণ অনেক— রঙ-বেরঙের মাছ, জলের নিচে শিকার, এখানকার কোরাল Snorkel, Scuba, glass bottom boat, skinny-dip, surf, sail, swim, এই কথাগুলো ট্যুরিস্টদের মুখস্ত। আর তার সাথে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে আর একটি কথা— Les belles Tahitiennes লে বেল (তাহিসিয়েন) সুন্দরী তাহিসিয়ান। এখানকার মেয়েদের রূপে আগুন নেই, কিন্তু আছে এক আকর্ষণীয় স্নিগ্ধতা। সদ্যজাত গোলাপের মতই তার আকর্ষণ। এখানকার বনে জঙ্গলে, হ্রদ ঝরণা ও পাহাড়ি উপত্যকায় ছন্দ আর সৌন্দর্য যেন উপচে পড়ছে।

আমি লেখক নই— সাধারণ পর্যটক মাত্র। আমি সেখানকার সেই বিরাটত্ব আর সীমাহীন সৌন্দর্যের বর্ণনা দেবার চেষ্টা করিনি, কাবণ যেখানে উপলব্ধির বিষয় সেখানে লেখনী দিয়ে কাজ হয় না। তবুও আমি সেখানে বসে লিখেছি। দৈনন্দিন জীবনের রোজনামচা থেকে কিছুটা তুলে ধরলাম। আমার অভিজ্ঞতার অংশ বিতরণই এই লেখার মূল উদ্দেশ্য। পাঠকদের যদি ভাল লাগে তাহলেই আমার সার্থকতা।

প্রশাত মহাসাগর অনন্ত অসীম। আকাশ আর জল অঙ্গাঙ্গিভাবে এখানে জড়িত; আমাদের বোটের চারিদিকে যেন এক অনন্ত বৃত্ত। যেখানে জল শেষ হয়েছে মনে হয়, সেখান থেকেই শুরু হয়েছে আকাশ, হয়তো এই মহাকাশ থেকেই নেমে এসেছে এই জলরাশি। আকাশ আর জলের এই সহাবস্থান ঠিক যেন দেহ ও প্রাণের সম্বন্ধের মতোই। চারিদিকের এই বিস্তৃত জলরাশি, অব্যক্ত ও অনন্ত গাম্ভীর্যের এক ব্যক্ত রূপ। মহাসাগরের বুকে চিরচঞ্চল ঢেউগুলো আনন্দে নাচছে আর দূরে সেই ঢেউগুলোই শান্ত ও সমাহিতের রূপ নিয়েছে। সাগর তটে ঢেউ ভাঙার দৃশ্য এক, আর সাগরের মাঝখানে বসে তার রূপ প্রত্যক্ষ করা সম্পূর্ণ অন্য অভিজ্ঞতা।

বোটের ওপর থেকে দিনের পর দিন ধরে এই ঢেউ দেখছি। ঢেউ-এর যে এত বিচিত্র রূপ আছে তা আমার কল্পনাতীত ছিল। প্রত্যেক্যটি ঢেউ তার নিজস্ব

সত্বা আর বৈশিষ্ট্য নিয়ে জেগে উঠছে, তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই তার লীলা দেখিয়ে আবার বিলীন হচ্ছে সাগরের বুকে ; নিস্তব্ধ শিবের থেকে যেন জেগে উঠছে কালী-তরঙ্গ। চির-চঞ্চল ঢেউগুলোর মধ্যে যেন কোন রকম শৃঙ্খলা নেই; কোনো কোনোটা বিরাট উঁচু— প্রায় দোতলা বাড়ির সমান আর কোনোটা ছোট্ট, কোমর পর্যন্ত; দৈর্ঘ্যে কোনোটা চল্লিশ পঞ্চাশ মিটার আবার কোনো কোনোটা মাত্র হাতখানেক —একের সঙ্গে আরেকের চরিত্রগত কোন মিলই নেই। প্রত্যেকটি ঢেউই আত্মপ্রকাশ করে কিছুদূর এগিয়ে এসে তারপর শতভাগে বিভক্ত হয়ে ভেঙে পড়ছে। কি আশ্চর্য এই ঢেউ! ভূ-খণ্ডের কোন এক অজ্ঞাত স্থানে, বাতাস চন্দ্র ও সূর্যের আকর্ষণের ফলে সৃষ্টি হচ্ছে এক স্রোত আর সেই স্রোতের সাথে তাল মেলাবার জন্যই উৎপত্তি হচ্ছে এই ঢেউ। দিনের বিভিন্ন সময়ে ঢেউ-এর রঙও যায় পাল্টে, আকাশের সাথে এই সমুদ্রের বোঝাপড়াও এক রহস্যছন্দ।

ঢেউ দেখার মধ্যে একটা মাদকতা আছে। সমুদ্র-যাত্রায় ঢেউ-এর দোলার একঘেয়েমি থেকে অনেকে সাগর-রোগে ভোগে, যাবা ঢেউ-এর মধ্যে চির-চঞ্চল প্রাণকে দেখতে পায়, মনে হয় একমাত্র তারাই এ রোগ থেকে অব্যাহতি পেতে পারে। ঢেউ আমার কাছে মোটেই একঘেয়েমি নয়— তার মধ্যে আমি আবিষ্কার করেছি প্রাণের স্পর্শ। ঢেউ ভাঙার শব্দ ও তার গতির ছন্দে আবিষ্কার করেছি তার সঙ্গীতকে। সাগর অভ্যন্তর রহস্যময়, আর ঢেউগুলো মায়াময়— দিনের পর দিন ধরে যাকে দেখতে দেখতে মনে আনে মাদকতা। এক অদ্ভুত নেশা! সব ইন্দ্রিয়গুলোকে সংযমী করেও যেন এর থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া মুশকিল; এই শব্দ ও রূপের মধ্যে রয়েছে এক ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য। সীমার মধ্যে পেয়েও তাকে ধরা যায় না— দৃশ্য জগতেই সে অদৃশ্য; অস্থায়ীর মধ্যেই রয়েছে তার স্থায়ী রূপ। একে লিখে বোঝাবার ভাষা আছে কিনা জানি না, থাকলেও অন্ততঃ আমাব সে ক্ষমতা নেই। আর লিখবার চেষ্টা করলে মনে হয় সত্য থেকে আমি অনেক দূবে চলে যাবো।

ছোট্ট শিশুর মতো হেলে দুলে— একের পর এক ঢেউ-এর স্তর লাফাতে লাফাতে এগিয়ে চলেছে। বোটের ওপর আমাদের ছোট্ট মঞ্চ আর ছোট্ট সংসার। আমরা ছ'জন। এরা সখের নাবিক আর সমুদ্র পথেই এরা গঠন করেছে নাবিক-চরিত্র। নাবিক-চরিত্রের মুখ্য প্রাণ হচ্ছে নারী। তার অভাবে যখন তখন এদের মধ্যে দেখা দিচ্ছে যন্ত্রণা—এদের ভাবেই তা প্রকাশ পাচ্ছে। কি আশ্চর্য্য! এরা নাবিক, অথচ এদের কাছে সাগর পথ এরই মধ্যে একঘেয়েমি হয়ে উঠেছে— একঘেয়েমির হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য সঙ্গী হিসেবে নিয়েছে বোতলের আশ্রয়। হুইস্কি, ওয়াইন্, বিয়ারের ছড়াছড়ি। কিন্তু তা সত্তেও এদের টিম ওয়ার্কের প্রশংসা করতেই হবে— তাতে এতটুকু গাফিলতি নেই। দু'জন দু'জন করে চব্বিশ ঘণ্টা যাবৎ বোটটাকে অতি দক্ষ নাবিকের মতো এরা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, আর রান্না খাওয়া ও পড়াশুনার ব্যাপারে এরা শৃঙ্খলাবদ্ধ।

সমুদ্র বিষয়ে মঁসিও কুর্বের জ্ঞানের তুলনা চলে না। নাবিকদের মধ্যে এক একজন এক এক বিষয়ে দক্ষ। কেউ যন্ত্রবিশেষজ্ঞ, কেউ আবহাওয়া বিশেষজ্ঞ, কেউ ডাক্তার আর একজন সাহিত্যিক। আমি এদের মধ্যে বাড়তি যাত্রী এক গুণহীন ভবঘুরে। বোট সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান ছিল না, কিন্তু এদের সাথে চলতে চলতে এ সম্পর্কে বেশ ভাল রকম অভিজ্ঞতাই হচ্ছে।

মঁসিও কুর্বেকে সবাই ডাকে কাপিতেন বলে। বোট কোথা দিয়ে কোথায় যাবে সে ব্যাপারে তিনিই সর্বেসর্বা, আর তার পরেই মঁসিও জাগু— তিনি টেক্‌নিসিয়ান ও ইঞ্জিনিয়ার। বোটের মেকানিক্‌স্‌এ তিনি দক্ষ।

বিভিন্ন বোটের বিষয়ে মঁসিও জাগুর অভিজ্ঞতার তুলনা নেই। দূর থেকে বোট দেখেই তিনি বলে দিতে পাবেন, যে সেটার কোন মডেল কোথায় তৈবী আব তার বৈশিষ্ট্য কি।

আমি তাঁর খুব প্রিয়। নজবে বোট পড়লেই তিনি আমাকে সে বিষয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব ব্যাখ্যা কবে দেন। এইভাবেই আমি জানতে লাগলাম মহাসাগবীয় বিভিন্ন সখের বোটের বিষয়।

ইউরোপে বা আমেরিকায় স্থলে পার্কিং সমস্যাব মতো জলে বোট বাখাব সমস্যাও বেশ নজরে পড়েছে। লেক, নদী বা সাগবেব বন্দরে বোটেব পব বোট বেখে জলটাকেই যেন ঢাকবাব চেষ্টা কবা হয়েছে। এত দেখা সত্তেও ঠিক নৌতত্ত্ব জানবার সুযোগ হয়নি; এবাব যখন সুযোগ এসেছে কাজেই তাকে উপেক্ষা কবা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

বিরাট বিরাট জাহাজ যাবা শয়ে শয়ে যাত্রী নিয়ে প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিচ্ছে, আমি তাদের বিষয়ে কিছু লিখছি না, সেসব বিরাট তত্ত্ব। আমি লিখছি নেহাৎই প্রশান্ত মহাসাগরের ছোট্ট বিভিন্ন ধবনের সখের বোটের কথা। বোটগুলো সাধারণতঃ খুব বড় নয়, লম্বায় বারো থেকে চোদ্দ পনেরো মিটার পর্যন্ত। শক্ত প্লাস্টিকের বডি, তাব ওপর কাঠের বা হালকা অ্যালুমিনিয়াম এ্যালয়ের ঘর। কাঠের বোটও অনেক আছে, তবে প্লাস্টিকেব জগতে তা দিন দিন দূরে সরে যাছে। মাস্ট বা পালেব থামগুলোও শক্ত এ্যালুমিনিয়ামের তৈরী। বোটগুলোর পালের বাহার সত্যি দেখার মত— কোনটা দু-পালের, কোনো কোনোটা তিন-চার বা পাঁচ পালের; পালেব সাইজগুলো নির্ভর করে হাল ও নৌকোর আয়তনের ওপর। পালগুলো সাধারণতঃ শক্ত নাইলন অথবা টেরিলিনের আর দড়িগুলোও তাই। বোট চালাবার জন্য পেট্রল ইঞ্জিন বসানো আছে বটে, কিন্তু সাধারণতঃ পালের সাহায্যে হাওয়া ধরেই তাকে চালানো হয়।

এই ধরণের নৌকোকে বলা হয় ইয়ট্ (yacht)। ইয়টিং আমি দু-একবার করেছি বটে কিন্তু তা নেহাৎই ছেলেমানুষি। লেকে ও নদীতে আমি ইয়টিং করেছি—ছোট এক পালের নৌকোতে। হাল ছাড়া পালের সাহায্যে বাতাস ধরে নৌকোকে চালানোয়

একটা সত্যিকারের কেরামতি আছে বটে। তবে সেই ইয়টিং-এর সাথে এই প্রশান্ত মহাসাগরীয় ইয়টিং-এর তফাৎ বিরাট। মহাসাগরের ইয়টিং হচ্ছে রাজসিক ব্যাপার।

মহাসাগরের ইয়ট্গুলো দেখতে অতি চমৎকার। প্রতিটি ইয়টের মধ্যে প্রয়োজনমতো সুসজ্জিত কেবিন অর্থাৎ ঘর; তা ছাড়া একটা কমন রান্নাঘর। আমাদের এই বোটটায় পাঁচটা কেবিন আর আমি থাকি এদের রান্নাঘরের এক কোণে একটা দড়ির দোলনায়। বোটে রেডিও-কমিন্যুকেশন বাধ্যতামূলক। পানামা থেকে ইস্‌লা দা পাসকুয়া হয়ে তাহিতির পথে অনেক রকম সখের বোট আমাদের চোখে পড়েছে, তার মধ্যে যেগুলো বিশেষভাবে মঁসিও জাগু আমাকে বুঝিয়েছে, সেগুলো পৃথিবী-বিখ্যাত, দামী ও মজবুত; আরামদায়ক তো বটেই। যেমন— আমেরিকান ইগল্, গ্রেটেল টু, বারমুডিয়ান শ্লুপ্, শুনার বিগ্, গাফ্ কাটার, দি কাটামারাণ, ইত্যাদি।

শুনার ধরনেব বোটগুলো অতি চমৎকার; বিরাট লম্বা (তেরো মিটার), দু-তিনটে তিন কোণাচে পাল আব দু-তিনটে চার কোণাচে পালকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে, কৌশল করে বাতাসকে ধবা হয়, তারপর সেই বিরাট বোটটা হেলে দুলে একদিকে কাত হয়ে ঝুকে পড়ে স্টেডি হয়ে এগিয়ে চলে সামনের দিকে। ইয়টিং-এব বৈশিষ্ট্যই এই অর্থাৎ ছোট বড় যে ধবণেরই ইয়ট্ হোক না কেন পালে বাতাস ধরলেই সে একদিকে কাত হয়ে পড়ে— দক্ষ নাবিকেরা সেইভাবেই তাদেব নৌকা এগিয়ে নিয়ে চলে।

পানামা থেকে আমাদের বোটটি (yacht) যখন ছাড়লো প্রথম দু-দিন উৎকণ্ঠায় আমার কিছুতেই ঘুম আসেনি। আমাদের বোটটা মাঝে মাঝে কাৎ হয়ে একদিকে ঝুঁকে পড়ছিলো; আমার মনে হতো যে যে কোন মুহূর্তে বোটটা উল্টে পড়বে। পরে বুঝেছি যে এই রকম কাৎ হয়েই মহাসাগর পাড়ি দিতে হবে।

ক্যাপ্টেন কুর্বে ও টেক্‌নিসিয়ান জাগুর কাছ থেকে আরও জানতে পারলাম যে বর্তমানে ইউরোপ ও আমেরিকায়, প্রশান্ত ও আটলান্টিক মহাসাগব পাড়ি দেবার জন্য প্রতিযোগিতা হয়— তার উৎপত্তির মূলে রয়েছে ইংরেজরা। পর্বতারোহণের মতো আটলান্টিকের ইয়ট্ প্রতিযোগতার গোড়াপত্তন করে ইংরেজরা। রয়াল টেমস্ ইয়ট্ ক্লাব, রয়াল কর্ক ইয়ট্ ক্লাব, এই ধরনের আরও কয়েকটি সখের নৌকো-সংঘ গড়ে ওঠে প্রায় অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। এইসব সংঘের সভ্যদের দক্ষ নাবিক হিসেবে তৈরী করবার জন্য গড়ে ওঠে 'দি সেইল্ ট্রেইনিং অ্যাসোসিয়েসন'। আর সেই এ্যাসোসিয়েসনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ডিউক্ অফ এডিনবরা। ইয়ট্ তথা সখের নৌকো প্রতিযোগিতা এইভাবেই শুরু হয়। টেমস্ নদীতে যদিও শুরু হয় কিন্তু আজ তার বিস্তৃতি বহুদূর। ইংরেজরাই প্রথম শুরু করে ট্রান্স আটলান্টিক ইয়ট্ কম্‌পিটিশন; আর প্রথম দিকে ইংরেজরাই ছিল তার প্রতিযোগী; তারও অনেক পর আমেরিকানরা 'আমেরিকান কাপ' প্রতিযোগিতা শুরু করে।

এ বিষয়ে ভারতবর্ষের দান অপরিসীম। সমুদ্র-বিশেষজ্ঞ ও ঐতিহাসিকদের মতে ভারতবর্ষই এই প্রতিযোগিতার মূল প্রেরণা। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী ইংরেজরা

প্রথম গঙ্গার বুকে ডিঙি নৌকার প্রতিযোগিতা ও তার উৎসব দেখে মুগ্ধ হয়ে যায় আর তারই নকল করে তারা তাদের দেশে শুরু করে সখের নৌকো প্রতিযোগিতা।

ইংরেজদের অহংকার ছিল যে নৌবিদ্যায় ভারতবাসীরা তাদের তুলনায় কিছু নয়। কিন্তু প্রথম সুরাট বন্দরে তাদের জাহাজ লাগাতেই সে দর্প চূর্ণ হল। সুরাট থেকে আরবসাগর হয়ে পাল-তোলা নৌকো করে অনেক মুসলমান তীর্থযাত্রীকে পারস্য উপসাগর হয়ে মক্কাশরীফে আসতে দেখে তারা অবাক হয়ে যায়। আর শুধু তাইই নয়— সেই সময়কার ভারতবাসীদের নৌ-বিদ্যার জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে তারা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল।

আজকাল ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, পাপুয়া, নিউগিনি ইত্যাদি বন্দরে মহাসাগর পাড়ি দেবার জন্য বিরাট বিরাট ইয়ট্ প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে।

টেকনিসিয়ান জাগু আমাকে কয়েকটি বিশেষ তথ্য জানালেন, সেটা খুবই চমকপ্রদ।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক পর্যন্ত ইয়টিং রেসেব সব পুরস্কারগুলোই যেত ব্রিটিশদের হাতে। যে কোনরকম প্রতিযোগিতায় ব্রিটিশদেব কাছাকাছি ঘেঁসে এমন সাধ্য কার! তাই দেখে ১৯৩৮ সালে একটা আমেরিকান কোম্পানী তৈবি করলো বারো মিটারের একটা বোট আর তার নাম দিল ভীম। ভীম— বলাই বাহুল্য যে আমাদের চির-পরিচিত মধ্যম-পাণ্ডবের নামানুসারে।

একটা লম্বা ত্রিকোণাকৃতির আর একটা অর্ধবৃত্তাকারের, এই দুটো পালের সাহায্যে আমেবিকান ভীম তার অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিল। সুদূর আমেরিকা থেকে ভীম এল ইংল্যান্ডে। ১৯৩৯ সালে মহাসাগর পেবিযে ভীম ঢুকলো টেমস্ নদীতে। সে বছব ইয়টিংএর যতগুলো প্রতিযোগিতা হল— সবগুলো প্রতিযোগিতাতেই ভীম একচেটিয়া প্রথম স্থান অধিকার করে বসল। ভীম-এব কাছাকাছি এসে দাঁড়ায় এমন সাধ্য কার!

ইয়টিং প্রতিযোগিতায় ভীম উনিশবার প্রথম স্থান, চারবার দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিল। বারো মিটার দৈর্ঘ্যের ইয়টিংএর এমন সাফল্য এব আগে কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। ১৯৬২ সালে ভীমকে আনা হয় অস্ট্রেলিয়ান ইয়ট প্রতিযোগিতার জন্য। সেখানেও সে বিশেষ স্থান অধিকার কবে। কিন্তু শেষ বারে সে অস্ট্রেলিয়ার 'গ্রেটেল এক' নামক নৌকোর কাছে হার মানতে বাধ্য হয়।

এতো গেল মহাসাগরীয় ও বিরাট বিরাট প্রতিযোগিতার কথা। প্রসঙ্গত 'ভীম' নামক ইয়ট্কে চালাবার জন্য দরকার হ'ত কমপক্ষে বারোজন নাবিকের। এবার আসা যাক এক বা দু-মানুষের উপযোগী ছোট্ট ইয়টের কথায়। আমি আগেই লিখেছি যে ইয়টিং-এর ইতিহাসে ভারতের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এক বা দু-মানুষের জন্য তৈরি সখের পালতোলা নৌকোগুলোর নাম 'ডিঙি'। এ ধরনের নৌকোগুলো পৃথিবীর যেখানেই তৈরি হোক না কেন তার নাম ডিঙ্গি। এই নামটা এসেছে বাংলার ডিঙি নৌকোর থেকে। ইউরোপ, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার

যে কোন নদী ও লেকে এই ধরনের বোট হামেশাই চোখে পড়ে। সাগর যখন শান্ত থাকে তখন বন্দরের কাছাকাছিও এই ধরনের বোট দেখা যায়। বোটের ইতিহাস জানবার জন্য আমার এ লেখা নয়— নেহাৎই আমাদের দেশের প্রভাবের কথা জেনে এ সম্পর্কে না লিখে থাকতে পারলাম না। বিশেষ করে ক্যাপ্টে কুর্বে ও মঁসিও জাগু'র মুখে আমাদের দেশের কথা জানতে পেরে নিজেকেও গর্বিত মনে করেছি।

১৫৭৭ থেকে ১৫৮১ সাল পর্যন্ত, ড্রেকের 'গোল্ডেন হিন্দ' নামক পাঁচ পালের জাহাজটা প্রথম পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে। ইংল্যান্ড তথা ইউরোপের বাণিজ্য ও অগ্রগতির ইতিহাসে তার দান অসামান্য, আর ঠিক সেই একই মডেলের জাহাজ আরও অনেক আগে থেকে গঙ্গাসাগরের মেলায় দেখতে পাওয়া যেত। ১৯৬০ সালে ট্রান্স আটলান্টিক প্রতিযোগিতায় যোগদান করে পাঁচটি ইয়ট্; তার মধ্যে দুটি নির্মিত হয় বোম্বাই বন্দরে— তাদের নাম যথাক্রমে লিভ্‌লি লেডি ও সুহাইলি। ইয়টিং আধুনিক কালের এক দুর্মূল্য নেশা। ভারতের বন্দরেও ইয়টিং চোখে পড়ে বটে— কিন্তু পাশ্চাত্যের তুলনায় এখনও তার শৈশবাবস্থা।

ফরাসী পলিনেশিয়া

আমাদের ছোট্ট বোটটা পালের বাতাসে ভর দিয়ে এগিয়ে চলেছে, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এতটুকু বিরাম নেই। কখনও ঘণ্টায় চাব মাইল কখনও পাঁচ মাইল। বাতাসেব ওপরই নির্ভর করে তার গতি। মোটর আছে বটে কিন্তু তাকে ব্যবহার করা হয় না। নেহাৎই না ঠেকলে ইয়টের মোটর কেউ ব্যবহার করে না। প্রায় তেরদিন অনবরত নৌকা চালিয়ে আমরা প্রবেশ করলাম ফরাসী পলিনেশিয়া এলাকায়।

প্রশান্ত মহাসাগরের যে এলাকায় আমরা প্রবেশ করলাম— তার একটু ভৌগোলিক বিবরণ দেওয়া যাক।

প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণে, দক্ষিণ গোলার্ধের ১৭ ডিগ্রি দ্রাঘিমাংশে (south latitude) এবং ১৫১ ডিগ্রি পূর্ব অক্ষাংশে (longitude) অবস্থিত এই অংশে। পৃথিবীর মানচিত্রে এর অবস্থান পাওয়া খুব সহজ; অস্ট্রেলিয়া ও ক্যালিফোর্নিয়ার ঠিক মাঝখানে, টোকিও ও সান্তিয়াগোর প্রায় মাঝামাঝি দূরত্বে।

ফরাসী পলিনেশিয়ার জলভাগ, রাশিয়া বাদে প্রায় সমগ্র ইউরোপের স্থলভাগের সমান। অবশ্য শুধু স্থলভাগের সীমানা হচ্ছে মাত্র একহাজার পাঁচশ চল্লিশ বর্গমাইল। পাঁচটি বৃত্তাকার দ্বীপপুঞ্জ (Archipelago) নিয়ে এই ফরাসী পলিনেসিয়া দেশটি গঠিত। যদিও আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার কাছাকাছি, তবুও এই এলাকাটি সম্পূর্ণই ফরাসীর অধীনে।

তেরদিনের দিন আমাদের বোটের খুব কাছাকাছি একটা আশ্চর্য জিনিস দেখতে পেয়ে মঁসিও বোশাঁতো চেঁচিয়ে উঠলেন— 'রোগার, রোগার'— অর্থাৎ 'দেখ দেখ'!

তার আঙুল লক্ষ্য করে আমরা সবাই সেদিকে তাকালাম, আশ্চর্য বটে— আমাদের বোটের প্রায় তেরো মিটারের ব্যবধানে একটা বিরাট তিমি মাছ! ঠিক যেন একটা বিরাট নৌকো উল্টো হয়ে ভাসছে আর তার পিঠের ওপর থেকে ফোয়ারার মত জল বেরচ্ছে। এর আগেও দূরের থেকে অনেক বার তিমি মাছ নজরে পড়েছে— কিন্তু নৌকোর এত কাছাকাছি এইই প্রথম।

তিমি, মাছ তো নয় জন্তু। আমাদের বোটটা কাছাকাছি আসতেও সে এতটুকু বিব্রত নয়—, জলের তলায় ঠিক যেন একটা পাহাড়ের পিঠ। বোটের ওপর আমি, বোশাঁতো ও সবাই বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছি। এই তিমিটার একটু সামান্য ছোঁয়াতেই আমাদের বোটটা উল্টে যেতে পারে— কি সর্বনাশ! এই জলে একবার নৌকো ডুবি হলে আর দেখতে হবে না— আধঘণ্টার মধ্যেই হাঙ্গরগুলো আমাদের টুকরো টুকরো করে ফেলবে।

ক্যাপ্টেন কুর্বে আমাদেব অবস্থা দেখে তা হেসেই অস্থির— তাবপব অভয় দিয়ে বললেন, ভয়ের কোন কারণ নেই; তিমিরা নিরামিশভোজী ও খুব শান্ত প্রাণী।

ক্যাপ্টেন কুর্বে আমাদের বোটের এক নম্বর পালটাকে হঠাৎ হাল্কা করে দিয়ে তারপব টেনে বেঁধে দিলেন দ্বিতীয় পালটাবে; সবাইকে হুঁসিয়াব কবে দিলেন— সাবধান! আমাদের বোটটা হঠাৎ বাঁদিকে কাৎ হয়ে পড়ল— প্রায় জলের কাছাকাছি, তারপর পালের দিক পরিবর্তন কবে কিছুক্ষণের মধ্যেই বাতাস ধবে আমাদের বোটটা অন্যদিকে তীরের মত ছুটে চলল।

এইভাবে প্রায় আধঘণ্টা চলার পর আবাব তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হল আগের ডিগ্রিতে। তারপর ক্যাপ্টেন কুবে পালের দায়িত্ব জাগুকে দিয়ে একটু হাঁফ ছাড়লেন। আমাদের বুঝিয়ে বললেন যে, —সাধারণত তিমি মাছেরা দলবদ্ধ হয়ে বাস করে, কাজেই প্রথম তিমি মাছটা দেখা মাত্রই তিনি অন্যদিকে বোটের মুখ ঘোরাতে বাধ্য হয়েছেন— দলের মধ্যে একবার যদি বোটটা ঢুকে পড়ে তাহলে একটু বিপদের সম্ভাবনা আছে। তবে সেরকম বেশি বিপজ্জনক হলে বোটের মোটর খুলে তাড়াতাড়ি পালিয়ে যাওয়া যায়। তিমিবা কখনই কোন বোট বা জাহাজকে আক্রমণ করে না, বরং মানুষেরাই তিমি শিকাবেব জন্য বিরাট বিরাট জাহাজে করে তাদের আক্রমণ করে।

প্রায় চৌদ্দ দিনের দিন আমরা ফ্রেঞ্চ পলিনেশিয়ার প্রথম দ্বীপপুঞ্জের কাছাকাছি পৌঁছলাম। দূরে আকাশ ও জলের মাঝখানে ধূসর রঙের মেঘের মতো স্থলভাগ দেখা দিল। ক্যাপ্টেন কুর্বে নিজেই দূরবীন দিয়ে দেখে সে সংবাদ ঘোষণা করলেন। আমাদের আনন্দ আর দেখে কে— আনন্দে চীৎকার করে আমরা বোটের ওপরে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে নাচতে লাগলাম। নাবিকদের আনন্দের এটাই নাকি আসল রূপ...।

ফরাসী পলিনেশিয়ার পাঁচটি দ্বীপপুঞ্জ :—

(১) মারকুয়েসা (Marquesas Islands)

(২) তুয়ামোতু আর্সিপেলাগো (Tuamotu Archipelago)
(৩) সোসাইটি আইল্যান্ডস্ (Society Islands)
(৪) গাম্বিয়ার আইল্যান্ডস্ (Gambiar Islands)
(৫) অস্ট্রাল আইল্যান্ডস (Austral Islands)

এদের অর্থাৎ ফরাসী পলিনেশিয়ার রাজধানী এবং মুখ্য দ্বীপ হচ্ছে তাহিতি। তাহিতি সোসাইটি আইল্যান্ডের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের লক্ষ্য তাহিতি। কম্পাসের ডিগ্রিটা তাহিতিরই ডিগ্রি।

দূরের সেই মেঘের রূপটা ধীবে ধীরে আরও স্পষ্ট হতে লাগলো —জল থেকে ধীরে ধীরে জেগে উঠছে একটি দ্বীপ। আমাদের অদম্য কৌতূহল। শুধু আমি নই, আমরা সকলে এই প্রথম যাচ্ছি তাহিতিতে। বহু রূপকথার নায়িকা, নাবিকদের স্বপ্ন আর বর্তমান দুনিয়ার স্বর্গপুরী এই তাহিতি।

অনন্যসুন্দর একটি দ্বীপ

ষোল দিনের দিন। আমাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে ভেসে উঠল একটি সবুজ পাহাড়। মনে হল হাল্কা মেঘ আস্তে আস্তে জমাট বেঁধে পাহাড়ে পরিণত হল। শান্ত সমুদ্রের উপর ত্রিকোণাকৃতিব একটা পাহাড় যেন ভেসে উঠেছে। বেশ অনেকক্ষণ ধরে সেই দৃশ্য চোখেব উপর ভেসে রইল। বোটের কম্পাস সেদিক থেকে কিছুতেই নড়তে চাইছে না। ক্যাপ্টেনের মতে ওটাই তাহিতি।

সাগরের ঢেউ এখন কমে এসেছে, সাগরের স্বচ্ছ নীল জলে ঝাঁকে ঝাঁকে বিভিন্ন রকমের মাছ আমাদের চোখেব সামনে ধরা দিতে লাগলো। আরও প্রায় ঘণ্টা দুয়েক পর হঠাৎ মনে হতে লাগলো যে সেই দূরের ভাসমান পাহাড়টা ঢেউ-এর দোলায় দুলছে, তারপর মনে হল যে এই পাহাড়ের উপর সবুজের ঢেউ বইছে, নীলাকাশ আর নীল সমুদ্র, তার মাঝে মাঝে সবুজের খেলা। আমবা যত কাছে এগোতে লাগলাম ততই সেই দৃশ্যের বিশদ চোখে ধরা দিতে লাগলো। হঠাৎ মনে হল এই বিরাট ভূখণ্ডটি যেন আকাশ থেকেই শুরু হয়েছে; তারপব হাল্কাভাবে নেমে পড়েছে এই মহাসাগবের বুকে।

ধীরে ধীরে সেই দ্বীপটি এবার আমাদের দিকে ভেসে আসতে লাগলো। ক্যাপ্টেন ঘোষণা করলেন— এটাই তাহিতি।

দ্বীপটি সবুজে ঢাকা ছিল, এখন আস্তে আস্তে তার বিশেষত্ব নজরে পড়তে লাগলো। অসংখ্য গাছেব মধ্যে প্রথমেই নজরে পড়ল তীরে সাজানো রয়েছে একটা ঘন নারকেল গাছের সৌন্দর্য। মনে হয় সম্পূর্ণ দ্বীপটাই নারকেল গাছের মালা দিয়ে পরিবেষ্টিত। সিমেন্টের বাড়ীগুলোর চারপাশে যেন অতি সুন্দর বাগান দিয়ে ঘেরা। সাগরতীরে কয়েকটি বাঁশ ও বিচুলির বাংলোও চোখে পড়তে লাগলো। কিন্তু সবই ঢাকা— অস্পষ্ট বাড়ী-ঘরগুলোর কোনোটাই যেন সবুজের সীমা ছাড়িয়ে ওপরে উঠতে সাহস পায়নি।

সমুদ্র থেকে দ্বীপ দেখার মধ্যে এক অদ্ভুত কৌতূহল মানুষের মনে সজাগ হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে তাকে আবিষ্কার করার মধ্যে আছে এক অদ্ভুত আনন্দ— যেন এক পরমাসুন্দরীর দেহ-সৌন্দর্য চোখের সামনে তিলে তিলে ধরা দিতে লাগলো।

ঘণ্টাখানেক আগেও এটাকে দেখে মনে হয়েছিল গল্পরাজ্য, আর তারপর মনে হয়ছিল এ এক সবুজের ঢেউ; আর এখন দেখছি তার প্রাণ। হ্যাঁ প্রাণ বইকি! চোখের ওপর নজরে পড়ছে তারই গতিবিধি। গাছগুলো বাতাসে নড়ছে, সমুদ্র তীরবর্তী রাস্তায় যানবাহন চলাফেরা করছে, তার মাঝে মাঝে নজরে পড়ছে খুদে খুদে মানুষদের চলাচল।

দ্বীপের স্থির ছবিটা এখন ধীরে অস্থির হয়ে উঠল। আহা! কি সুন্দর! চোখে না দেখলে বিশ্বাসই হয় না। ছোট ছোট ঢেউগুলো চড়ায় নারকেল গাছগুলোর পায়ের কাছে ভেঙে পড়ছে, জলে রঙ-বেরঙের মাছগুলো সামুদ্রিক রহস্য কোরাল বনে খেলা করছে, সামনেই শান্ত সবুজে ঢাকা বাংলোগুলো দেখেই মনে হচ্ছে এ যেন নন্দন কানন।

ইস্‌লা দা পাসকুয়া দ্বীপ থেকে এ দ্বীপটা সম্পূর্ণ আলাদা। গঠনটাই অপরূপ। সমুদ্র, পাহাড় আর আকাশের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে এক স্বর্গভূমি। দেখেই মনে হয় যে এ সৃষ্টি মানুষের নয়। স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা ছাড়া অনিন্দ্যসুন্দর তাহিতিকে সৃষ্টি করা অসম্ভব। ক্যাপ্টেন কুক্ ঠিক কথাই বলেছিলেন— তাহিতি এ জগতের স্বর্গভূমি।

তাহিতিতে ঢোকার আগেই আমাদের বোট থেকে নজরে পড়ল সমুদ্র-গর্ভেব কোরাল বন। অসংখ্য রন্ধ্রবিশিষ্ট পাথরের ওপর এক রহস্যময় বিচিত্র উদ্ভিদ্ জগৎ। লাল লাল বলের সাহায্যে নাবিকদের সজাগ করে দেওয়া হয়েছে— 'খুব সাবধান, এপথে নয়।' ধারালো ছুরির মত সমুদ্র-গর্ভের এই পাথরের আচড়ে বোটের সঙ্গীন অবস্থা হতে পারে।

পাথরের ধাক্কা

তাহিতি এলাকায় ঢোকার সাথে সাথেই, জল-পুলিশ আমাদের ওপর নজর রেখেছিল। এবার তীরের কাছাকাছি আসতেই দ্রুতগামী একটা পুলিশ বোট আমারেদ বোটের কাছাকাছি এসে হাজির হল। জিজ্ঞাসা করল— কোথা থেকে আসা হচ্ছে, তাহিতিতে ভীড়বে কি না, ক্যাপ্টেনের নাগরিত্ব, কজন নাবিক, কতজন যাত্রী, তাদের নাগরিত্ব। ক্যাপ্টেন কুর্বে পুলিশ বোটকে বঁ জুর (গুড মর্নিং) জানিয়ে একে একে উত্তর দিতে লাগলেন,—

পানামা ও ইস্‌লা দা পাসকুয়া হয়ে আমরা এখানে আসছি। তাহিতিতে মাসখানেক থাকার ইচ্ছা আছে, ক্যাপ্টেনের নাগরিত্ব ফরাসী, চারজন নাবিক তারা সবাই ফরাসী, একজন বাড়তি লোক, ন্যাশানালিটি ইন্ডিয়ান— বিস্তারিত।

পুলিশ কর্তৃপক্ষ অতি হাসিমুখে আমাদের স্বাগত জানালেন। তাহিতি ফরাসীদেরই একটি কলোনী, কাজেই নারাজ হবার কোন কারণই নেই। তারপর দূরে একটি লাইট-হাউসের থাম দেখিয়ে দিয়ে বললেন— ওখান থেকে সরাসরি বন্দরে গিয়ে কাস্টমস-এ কাগজপত্র দেখালেই তারা সব বিস্তারিত জানাবে।

তাহিতি ফ্রেঞ্চ পলিনেশিয়ার প্রধান দ্বীপ। আর এই দ্বীপের প্রধান বন্দর ও রাজধানীর নাম পাপীত। বন্দরে নৌকো ঠেকতেই দু'জন কাষ্টমস্ পুলিশ এসে আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা কাষ্টমস্ অফিসে এসে হাজির হলাম।

নৌকোর কাগজপত্র ও একের পর এক পাশপোর্ট দেখে তাদের ছাড়া হ'ল। এ পর্যন্ত কোন সমস্যাই ছিল না— কিন্তু কাষ্টমস্ অফিসারের হাতে আমার পাশপোর্টটা পড়া মাত্রই তাঁরা সমস্যায় পড়লেন। আমাব সমস্যা মোটেই নয়, কারণ তাহিতিতে আমি পৌঁছেছি, কাজেই আমাকে নিযেই এদেব সমস্যা। ক্যাপ্টেন কুর্বেকে আমি বিশেষ ধন্যবাদ দিয়ে বললাম যে তিনি এখন যেতে পারেন, পবে আমাব গণ্ডগোলটা মিটে গেলেই আমি তাদের সাথে যোগদান কববো। আগে থেকেই তারা ঠিক করে বেখেছিল যে, তাহিতি হোটেলে তাবা থাকবে, কাজেই পরে তাদের খুঁজে পেতে মোটেই অসুবিধা হবে না।

কাস্টমস্ অফিসারা আমার পাশপোর্ট ভালভাবে বারবাব পরীক্ষা কবেও যখন ভিসার নাম-গন্ধ পেলেন না তখন স্বভাবতঃই তিনি সমস্যায় পড়লেন। আমি কোন বকম জটিলতার মধ্যে না গিয়ে সরাসরি আমাব ঘটনাটাকে খুলে বললাম,

—আমার ভিসা নেই সত্যি কথা, ভিসাব জন্য আমি চেষ্টাও করিনি। আমি পানামাতে ছিলাম, সেখানেই পরিচিত হই ক্যাপ্টেন কুর্বের সাথে— তাঁরই সাথে বেরিয়ে পড়ি সমুদ্র যাত্রায়। ইস্‌লা দা পাসকুয়া দ্বীপের ভিসাও আমার ছিল না, কিন্তু সেখানকার কর্তৃপক্ষ আমাকে সপ্তাহখানেক থাকবার অনুমতি দিয়েছিলেন। আশা করি এখানেও পাবো। আমার এখানে স্থায়ীভাবে থাকবার কোন ইচ্ছা নেই। দেখুন, যদি একবার আমাকে কোনরকমে এ দ্বীপে সপ্তাহখানেক থাকার অনুমতি দেন তাহলে বিশেষ বাধিত হ'ব।

আমি বারবার করে এই একই কথা তাঁদের বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু কাস্টমস্ অফিসার সব বুঝেও কিছু করতে পারছেন না। আইন বড় শক্ত কাঠামো। তিনি আমাকে আইনের বই দেখিয়ে ভারতীয় নাগরিকদের ক্ষেত্রে কি কি করা দরকার তা পড়তে বললেন— তাতে স্পষ্টই লেখা আছে.....valid passprot and previously secured tourist vaisas...। আমি অফিসার ভদ্রলোককে বিশেষ ধন্যবাদ দিয়ে বললাম,

—আপনাকে এই সমস্যার মধ্যে ফেলতে আমি খুবই দুঃখিত, কিন্তু কি করে বলুন?— এ অবস্থার জন্য আমি মনে মনে প্রস্তুতই ছিলাম, এ ধরনের সমস্যা

আমার কাছে মোটেই সমস্যা নয়। বিশেষ করে ধৈর্য ধরে মনের শান্তভাব বজায় রাখলে অধিকাংশ সময়ই আমি জয়ী হয়েছি। কাজেই এক্ষেত্রেও আমি জানি যে একটা বন্দোবস্ত হয়ে যাবেই। প্রায় ঘন্টা খানেক থেকেও যখন ভদ্রলোকেরা কোনরকম একটা সুরহা করতে পারছেন না, তখন আমি উপযাচক হয়েই তাঁদের জিজ্ঞসা করলাম,

—শুনুন, আমার পাশপোর্টটা দেখেই বুঝতে পারছেন যে আমি বহু দেশ ঘুরছি। অনেক দেশেই ভিসা ছাড়া ঢুকেছি, কিন্তু সব জায়গায়ই শেষ পর্যন্ত একটা সুরাহা হয়ে গেছে। আমার মনে হয় আপনাদের এখানেও এ সমস্যা সমাধানের একটা উপায় আছে।

আমার কথা শুনে কাস্টমস্ অফিসাব বললেন,

—নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু প্রয়োগ করতে আমরা চাইছি না।

—আপনাদের আইনে যা আছে তা প্রয়োগ করতে অসুবিধাটা কি? আমার কথা শুনে ভদ্রলোক একটু আমতা আমতা কবতে লাগলেন। পরে ব্যাপারটা আরও পরিস্কাব হল; যেহেতু আমি ফরাসী বোটে একদল ফরাসী নাবিকদেব সাথে এসেছি সেহেতু কাস্টমস্ অফিসারবা আমাব বিরুদ্ধে কোন গুরুদণ্ড আরোপ কবতে চাইছেন না। শত হলেও তাহিতিতে ফরাসীরাই আসল রাজা। অতএব! কি করা যায়? আমিই তাঁদের একটা পরামর্শ দিলাম,

—আচ্ছা, আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে তাহলে আপনাদের উর্ধতন অফিসাবের কাছে আমাকে নিয়ে চলুন— তাঁব সিদ্ধান্ত আমি মাথা পেতে নেবো।

মনে হয়, এ ছাড়া আর কোন উপায দেখতে না পেরে তাঁরা রাজি হয়ে গেলেন আমাকে তাঁদের হেড্-কোয়ার্টারে নিয়ে যেতে। মূল বন্দরেই একটু দূরে তাঁদের সবকাবী বাড়ী। তাঁদের সাথে আমি সেখানে এসে হাজির হলাম। ফরাসী এবং ইংরেজি ভাষায সেখানে লেখা রয়েছে এমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্ট। একতলার একটা বিরাট হলঘর পার হয়ে আমরা একট ছোট অফিসেব সামনে এসে হাজির হলাম। মনে হয় আগে থেকেই অফিসারবা টেলিফোন কবেছিলেন, কাজেই বাইরে আমাদের অপেক্ষা কবতে হল না।

কাস্টমস্ এ্যাণ্ড এমিগ্রেশন ডিরেকটব মঁসিও রবার্ট কতিয়ে মাঝারি চেহারার একজন ইউরোপীয়ান— দেখেই মনে হল যে তিনি খুব বদরাগী অফিসার নন। তার সাথে করমর্দন করে আমরা বসলাম। কাস্টমস্ অফিসার ভদ্রলোক মঁসিও কতিয়েকে আমাব সম্পর্কে বিস্তারিত জানাতে লাগলেন। ফরাসী ভাষা আমার মোটামুটি আয়ত্বে আছে, কাজেই আমিও কথোপথনে মাঝে মাঝে যোগ দিতে লাগলাম।

সব শুন মঁসিও কতিয়ে টেবিলে কয়েকবার টোকা মেরে কিছু ভেবে নিলেন, তারপর আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন,

—আমাদের আইন অনুযায়ী, যদি কেউ তাহিতি বা পলিনেশিয়ার কোন দ্বীপে বিনা ভিসায় ঢুকে পড়ে তারজন্য আমরা তাকে পাঁচদিনের জন্য একটা ভিসা দিতে পারি, তারপর অবশ্য সেই পাঁচদিনের ভিসার মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে আবার পাঁচদিনের জন্য বন্দোবস্ত করা যেতে পারে।

তাঁর কথা শুনে আমি সঙ্গে সঙ্গে হেসে তাঁর দিকে হাতটা বাড়িয়ে করমর্দন করে বললাম,

—সত্যি, কি বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ দেবো তার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। লোকে বলে ফরাসীরা খুবই সহযোগী— কথাটা আর একবার সত্য বলে প্রমানিত হল.....

—দাঁড়ান! দাঁড়ান! এটাই সব নয়, আমার কথাটা শেষ করতে দিন— আমাব কথা মঁসিও কতিয়ে হেসে থামিয়ে দিলেন, তারপর আবার শুরু কবলেন,

—এই পাঁচদিনের ভিসাটা পাওয়ার একটা সর্ত আছে।

—বেশ বলুন।

—সর্তটা হচ্ছে এই যে এখান থেকে আপনার হোম কান্ট্রির একটা এয়ার টিকিট আপনাকে কিনতে হবে, সেই টিকিটটা দেখামাত্রই আমরা আপানাকে ভিসাটা দেবো।

তার কথাটা শুনে আমি একটু মাথাটা চুল্‌কালাম— তাবপব বললাম,

—এ ছাড়া কি অন্য উপায় নেই? কারণ আমব অবস্থাটা একবাব বুঝে দেখুন— টিকিট কাটবার মতো যথেষ্ট টাকা আমাব কাছে, আছে কিন্তু এখান থেকে কি ভাবে ও কোথা দিয়ে যে দেশে ফিববো তা এখনও ঠিক করিনি।

নিশ্চয়ই অন্য উপায়ও আছে বৈকি— এই বলে ভদ্রলোক একটা মোটা বই বের করে তার থেকে বিশেষ চ্যাপটরের ইংরেজি তর্জমা করে শোনালেন*— অর্থাৎ যদি...টিকিট না কিনি তাহলে তাহিতি থেকে ভারতে ফেরার ভাড়াটা এখানকার ট্রেজারীতে জমা দিতে হবে— সেই টাকাটা এরা আমার তাহিতি ছাড়ার দিন ফেরত দেবে। আর যদি না যাই তাহলে সেই টাকাটা আর ফেরৎ দেওয়া হবে না— এরাই আমার হয়ে টিকিট কিনে জোর কবে ভারতগামী যানে চড়িয়ে দেবে।

তাহিতি থেকে আমাকে দেশে ফিরতেই হবে, কাজেই এতে আপত্তি থাকলেও নান্য পন্থা বিদ্যতে।

ট্রাভেলার্স গাইড্ দেখে মঁসিও কতিয়ে আমাকে বললেন,

—চারশ পঁচাত্তর ডলার ($475) অস্ট্রেলিয়া হয়ে দিল্লীর ভাড়া। আমি কথা মত আমার ট্রাভেলার্স চেক্‌বুকটা বাব করে তাঁর টেবিলে রাখলাম।

ভদ্রলোক খুশী হলেন— আমি তো বটেই, মঁসিও কতিয়ে তার সহকর্মীদের আমার বিষয়ে কি কি করতে হবে বলে দিলেন। প্রায় আধঘণ্টার মধ্যেই আমরা মঁসিও কতিয়েকে তাঁর অনুমতিব জন্য ধন্যবাদ দিয়ে বেড়িয়ে পড়লাম।

তারপর আমরা ট্রেজাবীতে গিয়ে টাকাটা জমা দিয়ে— সেই রসিদটা জমা দিয়ে দিলাম। এবার আর ভিসা পেতে দেরী হল না, সেই একই অফিসার আমার পাশপোর্টের একটা পাতায় ভিসার স্ট্যাম্প মেরে দিলেন। মাত্র পাঁচদিনের জন্য। ভদ্রলোক সহাস্যে পাশপোর্টটা আমার হাতে দিযে বললেন,

—আশা করি আমাদেব ভুল বুঝবেন না।

—অবশ্যই না। আমি হলে ঠিক আপনাব মতই শক্ত হতে বাধ্য হতুম। ধন্যবাদ, আবাব নিশ্চয়ই দেখা হবে। আমি কবমর্দন করে বেড়িয়ে পডলাম।

রাজধানী পাপীত

সীমানব ঝঞ্ঝাট মিটিযে আমি যখন তাহিতিব পথে পডলাম তখন বেলা তিনটে। সাইকেলটা নৌকোব ওপব বেখে এসেছি, আমাব সঙ্গী হিসেবে ব্যাগটা পিঠেই আছে। ভালভাবে এদিক ওদিক তাকিযেই মনে পড়ে গেল আমাদেব আসাম বাজ্যেব কথা। গাছ-গাছড়া আব পাহাডেব সমন্বযে এ জাযগাটাকে ঠিক আসামেব সাথেই তুলনা কববো। কি অদ্ভুৎ সাদৃশ্য! আবও আশ্চর্যেব বিষয— আমাব সামনে বাস্তাব ওপবই প্রথম দেখতে পেলাম এখানকাব বাসিন্দাদেব— এখানকাব মেয়েদেব পোষাক ঠিক গ্রামীন অসমীয়াদেব মতই। ফালি কাপড় দিযে বুকেব ওপব থেকে জানু পর্যন্ত ঢাকা। ভাবত থেকে অনেক দূবে অথচ কি অদ্ভুত মিল। শুধু তাইই নয, এদেব দেখতেও অনেকটা আসামীদেব মতই। বঙ ও দেহাকৃতিব সাথে আসামীদেব অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখে আমি অবাক না হয়ে পাবলাম না।

চৌবস্তাব মোড়েই বিরাট একটা তীব-চিহ্ন দিয়ে দেখানো হযেছে তাহিতি হোটেলেব ডিবেক্সন। এখান থেকে মাত্র এক মাইল, কাজেই অসুবিধা কোন কাবণই নেই, আমি সেই পথই ধবলাম।

১৯৭১ এর জানুয়াবী। এখানকাব গরমকাল। গ্রীণউচ-এর সাথে এখানকাব সময়ের তফাৎ দশ ঘন্টা। অর্থাৎ এখানে যখন দুপুর বাবোটা, লণ্ডনে তখন বাত দশটা। আব যেহেতু এটা দক্ষিণ গোলার্ধে কাজেই লণ্ডনে এখন শীতকাল আব এখানে গরমকাল। এখানকাব বোদ্দুবে বাস্তায় হাঁটতে খুব একটা ক্লান্তিবোধ হচ্ছে না। ডানদিকে সমুদ্র তট। আমি সামনেব দিকে এগুতে লাগলাম। যদিও ছোট্ট দ্বীপ কিন্তু এর রাস্তাঘাট ও দোকান-পসাব দেখলে মনেই হবে না যে এটা ছোট্ট জায়গা। খুবই বর্দ্ধিষ্ণু বন্দর, বিরাট চওড়া ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাস্ত, বন্দবে ঠাসাঠাসি গাড়ী; লোকজনদের মধ্যে যাদের এ পর্যন্ত নজরে পড়ছে তাদের অধিকাংশই মেম-সাহেব অর্থাৎ ইউরোপীয় বা আমেরিকান।

শেষ পর্যন্ত তাহিতি হোটেলের দরজায় এসে পৌঁছলাম। দেখেই তো আমার চক্ষুস্থির! এতো ছোট খাটো হোটেল নয়— এ যে রাজপ্রাসাদ, ঢোকবার পথেই তোরণ আর সামনেই গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে অতি চমৎকারভাবে সাজানো বিরাট একটা বাড়ী। ডানদিকে সমুদ্রের তীরে চোখে পড়ছে আতি সুন্দরভাবে সাজানো কাঠের বাংলো। গাম্ভীর্যময় শান্ত পরিবেশ। কিছুদূর এগোতেই একটি দেশীয় মেয়ে আমার দিকে হাসতে হাসতে এগিয়ে এল— যেন কতদিনের চেনা, পরণে তাহিতি পোষাক, তার মাথার ওপর একটি দেশীয় মেয়ে আমার দিকে হাসতে এগিয়ে এল— যেন কতদিনের চেনা, পরণে তাহিতি পোষাক, তার মাথার ওপর একটি রক্তজবার মুকুট। মনে হল নাচেব আসর থেকে উঠে এসেছে।

আমার কাছে এসেই মেয়েটি করমর্দন করে বলল,— আমার নাম মিরিয়ম। তোমাকে সাহায্য কবতে পারি কি?

আমি হেসে জবাবা দিলাম,— আমার নাম বিমল— বিশেষ ধন্যবাদ। পিঠের ব্যাগটা বিশেষ ভারি নয— নয়তো নিশ্চয়ই বলতাম...হ্যাঁ ভাল কথা, এটাই কি তাহিতি হোটেল? দেখে তো মনে হচ্ছে প্রাইভেট প্রপার্টি।

—হ্যাঁ, এটাই তাহিতি হোটেল— তাহিতি সবচেয়ে বড় অভিজাত হোটেল।

—বল কি? সবচেয়ে বড় ও অভিজাত হোটেল! আমি শুকনো মুখে আম্‌তা আম্‌তা করে শুধু তার কথাটাবই পুনরুক্তি করলাম।

এবার আমরা একটা বিরাট চত্বরে এসে হাজির হলাম। দুধাবে অসংখ্য নাম নাজানা ফুলেব বাহাব, গাছের ওপর থেকে ভেসে আসছে সুকণ্ঠি পাখীর কুজন; পরিবশেটা এব চেয়ে ভাল আশা করা যায় না। মনে পড়ে (২৪ পরগণা জেলার) ইছাপুরের নবাবগঞ্জ এলাকার গঙ্গার ধারে পরীওলা মণ্ডল বাড়ীটির কথা। ঠিক সেই রকমই এর রূপটা, তবে আরও বড়। দরজার সামনে এগোতেই একজন দরজাটা খুলে স্বাগতম জানালো। মিরিয়ম আমাকে রিসেপ্‌সন ডেস্কের কাছে পৌঁছে দিয়ে বিদায় জানাল। পিঠ থেকে ব্যাগটা রেখে আমি একটা সোফায় বসলাম। রিসেপ্‌সনিস্ট আর একটি মেয়ে এসে আমার পাশে এসে চেয়ার টেনে বসল। তাবপব বিসেপসনিস্টদের চির পরিচিত ভঙ্গিতে বলল,

—গুড্ আফটশরনুন। আমি আপনার সেবায় আসতে পারি কি?

—নিশ্চয়ই। মনে মনে ভাবলাম এ যে চরম বৈষ্ণব বিনয়— এর দাম কত হবে কে জানে? তাকে জিজ্ঞসা করলাম,— এখানেই কি মঁসিও কুর্বে ও তাঁর গ্রুপ এসে উঠেছেন?

—আমার কথাটা লুফে নিয়েই সে জবাব দিল,

—মানে যারা বোটে করে এসেছে— ফরাসী নাগরিক?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আপনি তাদেরই লোক, তাই বলুন! মারী, এই ভদ্রলোককে এগারো নম্বর বাংলোতে নিয়ে যাও। মরী নামে একজন বয়স্ক ভদ্রমহিলা কাছেই ছিল, সে আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল— এগারো নম্বর বাংলোতে।

সমুদ্রের তীরে সারি সারি বাংলো ছোট বড় মাঝারি বিভিন্ন ধরণের। কোন কোনটাকে জলের ওপর প্লাটফরম তৈরী করে তার ওপর বসানো হয়েছে আর কোন কোনটা নারকোল বনের মাঝখানে রেখে তার চারপাশে সুন্দর সুন্দর ফুলের বাগিচা সাজানো হয়েছে। নারকোল বনের একটা বাংলোর কাছাকাছি আসতেই আমার নজরে পড়ল— পরিচিত মুখ। মঁসিও জাগু আমার দিকে এগিয়ে এসে বলল— তুমি আমার সাথে থাকবে।

কাঠের দেওয়ার আর খড়ের চাল— এ ধরণের বাংলো আমাদের প্রত্যেক গ্রামেই আছে, কাজেই আমাব কাছে এটা নতুন কিছু নয়। তবে দৃশ্যটা বলতেই হবে যে নয়নাভিবাম। বাংলোটা চার ঘবেব।

কথায় কথায় মঁসিও জাগুকে জিজ্ঞাসা করলাম, যে, মাথা পিছু কত করে পড়ছে।

মঁসিও জাগু জবাবে বললেন,— বাংলোগুলো অবশ্য একটু খবচের, মাথা পিছু ১৮০০ ফ্রেঞ্চ পলিনেশিয়ান ফ্রাংক— অবশ্য খাওয়া বাদে।

বলাই বাহুল্য যে এখানকার টাকাকে সেন্ট্রাল পলিপেশিয়ান ফ্রাংক বলে। ১৮০০ পলিনেশিয়ান ফ্রাংক! মনে মনে হিসেব করে দেখলাম প্রায় তেইশ ডলারের ($23) মতো। প্রচুর দাম! আমি মঁসিও জগুকে বললাম,— এত খরচায় থাকা আমাব পোষাবে না। আজকের রাতটা এখানে থাকবো বটে, কিন্তু কালকের থেকে আমি অন্য ব্যবস্থা করবো।

আমার সাইকেলটাও বোটের ওপবই থেকে গেছে, সেটাকে আনা দরকার।

মিরিয়ম ঠিক কথাই বলেছে, এই হোটেলটা বলতে গেলে তাহিতি তথা সমগ্র পলিনেশিয়ার সেরা হোটেল। প্রত্যেকটা ঘর ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে, মূল হোটেল বিল্ডিং ছাড়াও প্রচুর বাংলো। তাহিতির নীল লাগুণ ও কোরাল বনের ওপর এই বাংলোগুলোব অবস্থান। একটা প্রথমশ্রেণীর হোটেলের যতগুলো সুবন্দোবস্ত থাকতে পারে তার সবই এখানে আছে। খাওয়া-দাওয়া ব্যাপারেও অনেক সুবিধা— আমেরিকান ডিস্, ইউরোপীয়ান ডিস্ আর লোকাল স্পেশালিটি তো বটেই। আসলে এই হোটেলটা এককালে তাহিতির রাজকন্যা পোমারের বাড়ী ছিল। বিদেশী আক্রমণের সময় এই প্রসাদটা ফবাসীদের কবলে আসে। বর্তমানে একজন আমিরেকান ব্যবসায়ী এটাকে হোটেলে পরিণত করেচেন। হোটেলের আসল বাড়ীটায় একশ দশটা ঘর— আর তাছাড়ও বয়েছে লাইব্রেরী, টেনিস কোর্ট, সুইমিং পুল, ড্যানসিং রুম, ব্যাংক, ট্রাভেলিং এজেন্সি, পোষ্ট অফিস ইত্যাদি। দশ একরেরও ওপর এই হোটেলটার জমি বিস্তৃত। য়ায়াসে একটা গ্রাম বলা যেতে পারে।

হোটেলের যাত্রীদের সবাই আমেরিকান অথবা ইউরোপীয়ান। আমার এখানে থাকলে আরাম ও বিশ্রামের অভাব হবে না ঠিক কথা, কিন্তু সত্যিকারের তাহিতির জীবন থেকে তা অনেক দূরে। এতদূর এসেও তাহিতির বাসিন্দাদের থেকে অনেক দূরত্বই থেকে যাবে। এখানকার মতো দৃশ্য ও জলবায়ু তো আমাদের দেশেও আছে, কিন্তু যা নেই তা হচ্ছে এখানকার সমাজ ও রীতিনীতি। এখানকার মানুষদের সাথে না মিশলে তা কিছুতেই জানা যাবে না।

সেদিন হোটেলে বিশ্রাম করে পরের দিন সকালে আমি বিদায় জানালাম আমার বন্ধুদের। ক্যাপ্টেন কুর্বে আমার সঙ্গেই শহরে এলেন, কারণ বোট থেকে আমার সাইকেলটাকে উদ্ধার করতে হবে। বোটের পার্কিংটা খুঁজে বের করতে কোনরকম অসুবিধাই হল না। এখানকার বন্দরে সবই শৃঙ্খলাবদ্ধ। বোট থেকে আমার প্রিয় সাইকেলটিকে তাহিতির মাটিতে নামালাম। সাইকেলটাও অনেকদিন পর যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো।

ক্যাপ্টেন কুর্বেকে আমি ভুলবো না— বিশেষ করে তাঁরই কৃপায় আমার এখানে আসা হয়েছে। এখানে ধন্যবাদ কথাটা নেহাৎই ছোট, তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে আমার কৃতজ্ঞতা জানালাম। তাঁকে অনুরোধ করলাম— যদি কোনদিন বঙ্গোপসাগরের দিকে যান তাহলে অবশ্যই আমার কথা মনে রাখবেন। আমি আপনাকে সবরকমের সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

ক্যাপ্টেন কুর্বের কাছ থেকে ভারি মনে বিদায় নিলাম। তবে তাহিতিতে থাকাকালীন নিশ্চয়ই আবার দেখা হবে।

বন্দরের কাছেই পুলিস স্টেশন থেকে ট্যুরিস্ট অফিসটা কোথায় জেনে নিলাম। সমুদ্রের ধারেই ট্যুরিস্ট অফিস। সাইকেলটা বাইরে রেখে ভেতরে ঢুকলাম। রিসেপ্‌সন ডেস্কটা ঘিরে বসে আছেন চারজন মহিলা ও একজন ভদ্রলোক। নমস্কার জানিয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগলাম আমার জ্ঞাতব্য বিষয়। কথায় কথায় আমি তাঁদের জানালাম যে, আমার সাইকেল আছে, কাজেই পায়ে হেঁটে ও সাইকেলে চড়ে যতটা দেখা যায়। তাদের মধ্যে একটি মেয়ে হঠাৎ মন্তব্য করলো, —খুব ভাল আইডিয়া তবে, এতদূর সাইকেলটাকে না টেনে আনলেই হতো, কারণ এখানে ছোট প্লেন থেকে আরম্ভ করে সাইকেল পর্যন্ত সব কিছুই ভাড়া পাওয়া যায়।

তার উত্তরে আমি জানালাম— ঠিক কথা, কিন্তু এই সাইকেলটা আমার সাথে সাথে ভারতবর্ষ থেকে আসছে, সাইকেলে করেই আমি ভূ-পর্যটনে বেড়িয়েছি। তবে আমার সাইকেল বেচারা সাঁতার জানে না, তাই জলপথে আমি নৌকোর সাহায্য নিতে বাধ্য হয়েছি।

আমার কথা শুনে তারা তো অবাক।— বলেন কি ?

আমার সম্পর্কে মাঝে মাঝে কথা বলতে বাধ্য হই— তাতে আমার অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। এরা সকলেই ফরাসী ভাষী, তবে ইংরেজিও বলে।

তাদের সন্দেহ দূর করার জন্য আমি ব্যাগ থেকে কয়েকটি ফরাসী ও কয়েকটি ইংরেজি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত আমার সম্পর্কে মন্তব্য তাদের দেখালাম, তারা পড়তে লাগলো। মেয়েদের মধ্যে চারজনই পলিনেশিয়ান, নিঃসন্দেহে ভদ্রলোক ফরাসী। মন্তব্যগুলো পড়ে ওরা তো হতবাক! তারা আমার সঙ্গে সব রকমের সহযোগিতা করতে উৎসাহ দেখালো। অবশ্য এটাই তাদের কাজ। তারাই আমাকে পরামর্শ দিল,

—ট্যুরিস্ট ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের ডাইরেক্টর মঁসিও আলেকজান্ডার আতার সাথে দেখা করলে ভাল হয়। তিনি নিশ্চয়ই আপনার সাথে পরিচিত হয়ে খুশী হবেন, তিনি নিজেও খুব ক্রীড়ামোদী।

—ঠিক আছে, যোগাযোগ করিয়ে দিন। আমি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলাম।

ট্যুরিস্ট ডেভেলপমেন্ট বোর্ড সরকারি সংস্থা, সমগ্র ফরাসী পলিনেশিয়ার পর্যটন বিভাগের সর্বেসর্বা। মঁসিও আতার অফিস এই বাড়ীরই তিন তলায়। অনতিবিলম্বে ভদ্রলোকের অফিসে এসে হাজির হলাম।

গোলগাল লাল টুকটুকে হাসিখুশী এক ভদ্রলোক আমাকে আপ্যায়ন জানালেন, —ওয়েলকাম্ টু তাহিতি। তারপর, কিভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি বলুন।

প্রথমেই তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম,

—পাঁচ দিনের মধ্যে দর্শনীয় জিনিসগুলো দেখতে চাই আর আপনাদের সামাজিক রীতিনীতিগুলোর সাথে কিছু কিছু পরিচিত হতে চাই। এ সম্পর্কে আপনার উপদেশ ও পরামর্শ দেবেন কি?

ভদ্রলোক আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন,

—কাজের কথা পরে হবে, আপনার সম্পর্কে আগে বলুন। তার আগে বলুন এক কাপ কফি আনতে বলি?

—আমার আপত্তি নেই। সহাস্যে জবাব দিলাম।

ভদ্রলোক সত্যি রসিক লোক। প্রায় একঘন্টা ধরে চললো আমাদের কথাবার্তা। তাঁর উৎসাহ দেখে মনে হয় যে তিনি নিজেই যেন পর্যটনে বেরিয়েছেন। শেষের দিকে তিনি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন,

—মাত্র পাঁচদিনের জন্য কেন?

—আমার ভিসার মেয়াদ মাত্র পাঁচদিনের, —ব্যাপারটা একটু গণ্ডগোলে— তাহলে খুলেই বলি শুনুন... এই বলে আমি তাঁকে আমার কাহিনী শোনাতে লাগলাম।

আমার কাহিনী শুনে তিনি হেসে উড়িয়ে দিলেন,

—এটা একটা সমস্যাই নয়, আপনি বে-আইনি কিছুই করেননি। তা ছাড়া রিটার্ন ফেয়ার যখন ডিপজিট্ দিয়েছেন তখন কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। আপনি চিন্তা করবেন না— আমি এক্ষুনি (মঁসিও রবার্ট কতিয়ে) সাথে কথা বলছি।

এই বলেই ভদ্রলোক টেলিফোনটা তুলে ধরলেন— তারপর নির্দিষ্ট সংখ্যায় মঁসিও কতিয়েরে সাথে কথা বলতে লাগলেন।

তাঁর টেলিফোনের ভঙ্গিতে মনে হয় তিনি আমাকে যেন কতদিন ধরে চেনেন; আমার সম্পর্কে বিশেষণ প্রয়োগে তিনি দ্বিধা বোধ করছেন না। কথা শেষ হলে তিনি টেলিফোনটা রাখলেন, তারপর অনেকটা অনুযোগের ভঙ্গিতে বললেন,

—তাঁকে আপনার এই প্রেস্-ক্লিপিংগুলো দেখালেই পারতেন। যাই হোক, অসুবিধা নেই, এখানে যতদিন খুশী থাকুন— ভিসা এক মাসের জন্য তো পাবেনই!

তাঁর কথা শুনে আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে তাঁর সাথে করমর্দন করে বললাম, —বিশেষ, বিশেষভাবে কৃতার্থ হলাম।

মঁসিও আতা আমাকে আরও বললেন, —ইমিগ্রেশন অফিসে গিয়ে দেখা করলেই তারা ভিসার বাড়তি মেয়াদের বন্দোবস্ত করে দেবে।

* * * *

পাপীত ছোট্ট সাজানো শহর। তাহিতির লোকসংখ্যা প্রায় তিরানব্বই হাজার (৯৩,০০০)। আর এই তিরানব্বই হাজারের মধ্যে ছাপান্ন হাজারই থাকে পাপীত শহরে। সম্পূর্ণ ফরাসী পলিনেশিয়ার লোকসংখ্যা প্রায় এক লক্ষ চৌত্রিশ হাজার মাত্র। এখানকার সরকারী ভাষা ফরাসী তবে স্থানীয় অধিবাসীরা পলিনেশিয়ান ভাষাই ব্যবহার করে। শহরে ইংরেজি ভাষা জানা থাকলে কোন অসুবিধা নেই। এদের ধর্ম প্রধানতঃ খৃস্টান। শহরে একটা ছোট বৌদ্ধ-সমাজও আছে, তারা নেহাৎই মুষ্টিমেয়। পাপীতের রাস্তাগুলোর সবই ফরাসী নাম, তবে তার মধ্যে একটি নাম মনে খট্‌কা লাগালো। সমুদ্রের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা এগিয়ে চলেছে তারই এক অংশের নাম বীর হাকিম। বিভিন্ন সরকারি অফিসগুলো এক মাইলের মধ্যেই অবস্থিত। ফরাসী টাইপের বুটিক্ ও হোটেল রেস্টোরেন্টের অভাব নেই। আমার একটা আস্তানা আগে খুঁজে বের করতে হবে, সস্তায় এবং স্থানীয় পরিবেশের মধ্যে।

তাহিতির একটি পরিবার

তাহিতি দ্বীপটা বিশেষ বড় নয়; একটি বড় ও একটি ছোট বৃত্তাকার স্থলভূমির সংলগ্নে গঠিত হয়েছে এই তাহিতি দ্বীপটি। বৃত্তদুটির বৃহত্তর অংশের নাম তাহিতি মুই আর ক্ষুদ্রতর অংশটির নাম তাহিতি ইতি। পাপীত তাহিতি মুই-এর অন্তর্ভুক্ত। পাপীত থেকে সরাসরি উত্তর-পশ্চিমের রাস্তা ধরে এগোলে এই রাস্তাটা সম্পূর্ণ দ্বীপ পরিক্রমা করে দক্ষিণ-পূর্ব দিক দিয়ে আবার পাপীতে এসে পড়েছে; কাজেই হারাবার কোন সম্ভাবনাই নেই। দ্বীপটির প্রধান রাস্তা সমুদ্রের ধার ধরেই তৈরি হয়েছে। দ্বীপটির মাঝখানে কোন রাস্তা করবার সম্ভাবনা নেই কারণ, মাঝখানে রয়েছে বিরাট উঁচু প্রায় ২২৩৭ মিটারের ওরোহেনো পাহাড় (Mt. Oroheno)।

পাপীত থেকে আমি উত্তর-পশ্চিমের রাস্তা ধরে সাইকেলে করে এগোতে লাগলাম। এখন গরমকাল, সমুদ্রের ফুরফুর হাওয়ার সাথে খাপ খাইয়ে রয়েছে এখানকার তাপমাত্রা। পশ্চিমবঙ্গের দীঘার সৈকতের গরমকালের সন্ধ্যার মতই অতি মনোরম।

আগের দিন তাহিতি হোটেলে মঁসিও কুর্বের সাথে খেয়েছি ইউরোপীয়ান খাওয়া, আর তার আগে সমুদ্রের মজুত খাবার খেয়ে খেয়ে একঘেয়েমি লেগে গেছে। অনেকদিন পর আজকে এই প্রথম নিজেকে সম্পূর্ণ আলাদা পেয়েছি। ঠিক করলাম স্থানীয় খাবার খেতে হবে।

প্রায় চার মাইল চলার পর আমি 'ফা-আ' নামে একটি বর্ধিষ্ণু গ্রামে এসে পৌঁছলাম। এই গ্রামের কাছেই তাহিতির বিমান বন্দর। বিমান বন্দরের নির্দেশমূলক একটি বিরাট সাইনাবোর্ডও চোখে পড়ল। বিমান বন্দরটাকে আমার ডানদিকে অর্থাৎ সমুদ্রের ধারে রেখে আমি প্রবেশ করলাম ফা-আ গ্রামে। গ্রামের নামটি বড় চমৎকার—ফা-আ। এখন প্রায় বেলা বারোটা, কাজেই মধ্যাহ্ন ভোজের সময়।

এখানে অনেকগুলো ছোটবড় রেস্টোরেন্ট রয়েছে— আমি মাঝারি ধরণের একটা রেস্টোরেন্ট দেখে সেখানে ঢুকলাম। বাইরে থেকে এই রেস্টোরেন্টটির ভিতরের রূপ বোঝা মুশকিল। ভিতরে ঢুকতেই কানে এলো রেডিওর গান। লম্বা লম্বা টেবিল পাতা, দূরে একটা বার আর তার চারপাশে ঘিরে রয়েছে আট দশটি ছেলে। সকলেই প্যান্ট-সার্ট পরণে, তবে চেহারায় মনে হয় এরা সবাই স্থানীয়। প্রত্যেকের সামনে রয়েছে বিয়ারের বিরাট বিরাট কাপ। ওদের আলোচনার বিষয়ও মনে হয় বেশ মজাদার। আমি এরকমই একটা দল খুঁজছিলাম। পিঠের ব্যাগটাকে একটি চেয়ারের উপর রেখে আমি তাদের দিকে এগিয়ে গেলাম। তাদের সামনে বারের একটা উঁচু টুল দখল করে বসে বেশ একটু জোর গলায় বারম্যানকে বললাম, —আঁ বিয়ার সিল্ ভূ প্লে —অর্থাৎ একটা বিয়ার দেবেন কি? অবশ্য ফরাসী সিল্ ভূ প্লে শব্দটার প্রকৃত অর্থ অনুগ্রহপূর্বক। এরা কথায় কথায় এ শব্দটা ব্যবহার করে।

আমার ফরাসী কথা শুনে এরা সবাই আমার দিকে তাকাল। আমিও তাদের দিকে তাকিয়ে মাথাটাকে একটু নিচু করে বললাম— বঁ জুর মসিও! ইংরেজিতে গুড্ মর্নিং জেন্টলম্যান।

—বঁ জুর মঁসিও— বলে ওরা সবাই আমাকে প্রত্যুত্তর জানাল। আলাপ শুরু করলাম।

বিয়ারকে টেবিলে রেখেই আমাদের কথা জমে উঠল। এখানে আসলে ঢুকেছিলাম মধ্যাহ্নাহার করতে, কিন্তু পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াবার জন্যই আমি বিয়ার নিতে বাধ্য হয়েছি। কথায় কথায় জানলাম যে, এরা সবাই স্কুলের ছাত্র, বয়স খুব বেশি হলেও পনেরো-ষোল বছরের হবে। আজকে স্কুলের ছুটি। পাপীতের স্কুলে এরা পড়ে। কথায় কথায় আমি জিজ্ঞেস করলাম,

—আমি হোটেলে ছিলাম, কিন্তু সেখানকার পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছি না, কাজেই অন্য কোন বন্দোবস্ত খুঁজছি। তোমাদের মধ্যে কেউ কি আমাকে এ বিষয়ে পরামর্শ দিতে পারবে?

আমার কথা শুনে এরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো। তারপর একজন বললো,

—পাপীতে ছাত্রদের জন্য একটা ভাল হোস্টেল আছে, সেখানে অতিথি হিসেবে থাকা যায়, আর খরচও বেশি নয়।

—বাঃ চমৎকার পরামর্শ। সেটা কোথায়? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

—সেটা পাপীত বাজারের ঠিক পেছনে। আমি তার জবাবটা সঙ্গে সঙ্গে নোট করে নিলাম। তারপর বললাম,

—শহরে ঠিক দেশীয় পরিবেশ পাওয়া যায় না, তাই আমি গ্রামের দিকেই এই ধরনের কিছু খুজছি।

আমার কথা শুনে বারম্যান অর্থাৎ যে ছেলেটি বিয়ার সার্ভ করছিল সে এগিয়ে এসে বলল— আমি একটা পরামর্শ দেবো?

—বেশ দাও না, আমি তাকে আশ্বাস দিলাম। আমার আশ্বাস পেয়ে সে বলল, —আমাদের গ্রামে মঁসিও সিয়ারী বলে এক ভদ্রলোক আছেন, তিনি তাহিতি এয়ার-লাইনসে কাজ করেন। আমি জানি যে তিনি মাঝে মাঝে পেয়িং গেস্ট রাখেন। আপনি তাঁকে জিজ্ঞেস করতে পারেন। তাঁর বিরাট বাড়ি, অনেকগুলো ঘর, বিধবা মা—দুটি ছোট বোন স্কুলে পড়ে....

...দুটো বোন ইস্কুলে পড়ে..... এ কথাটা শোনার সাথে সাথেই উপস্থিত ছেলেদের মধ্যে একটু চাঞ্চল্য দেখা দিল— আমার চোখ এড়াল না— তাই সরাসরি জিজ্ঞাসা করলাম,

—তোমরাও তাদের চেনো দেখছি, ভালই হল। বুঝতেই পারছো যে আমি একজন বিদেশী— কাজেই তোমাদের কি মত বলো?

আমার কথায় সবাই চুপ করে গেল। তবে রেস্টোরেন্টের ছেলেটি ওদের দিকে একটু দুষ্টুমির ভঙ্গিতে তাকিয়ে বলল,

—মেয়ে দুটো খুবই চালাক তাই..... তবে আপনার তাতে কি? আপনি চেষ্টা করে দেখতে পারেন, এখনই চলে যান, মঁসিও সিয়ারীকে এখন বাড়িতে পাবেন, তিনি দুপুরে খেতে আসেন।

—ক্ষতি কি? বিয়ারের দামটা মিটিয়ে দিয়ে সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে আমি মঁসিও সিয়ারীর বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম।

নারকেল গাছ ও আমগাছের বাগানের মধ্য দিয়ে একটা কাঁচা রাস্তা দিয়ে আমি এগিয়ে চললাম। সেখানে যাওয়ার ডিরেক্সনটা ভালভাবেই জেনে নিয়েছি। যদি একটা আস্তানা পাওয়া যায় তাহলে ক্ষতি কি?

গ্রামটা ঠিক বাংলাদেশের মতই। কিছুক্ষণের মধ্যেই মঁসিও সিয়ারীর লাল রঙের ফিয়াট গাড়ীটা নজরে পড়ল। তারপরই পরিষ্কার দেখতে পেলাম তাঁর জমিদারী ধরনের কাঠের বাড়ীটা। দরজার কাছে পৌঁছতেই ঘেউ-ঘেউ করে ছুটে এল একটা ছোট্ট ফরাসী কার্ণিস ধরনের কুকুর। আমার সামনে এসেই লুটিয়ে পড়ল পায়ের ওপর—যেন কতদিনের পরিচিত বন্ধু। কুকুরের আওয়াজ শুনেই বাড়ির ভিতর থেকে একজন ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। ভদ্রলোক পলিনেসিয়ান নিঃসন্দেহ, বয়স মনে হয় আমারই সমবয়সী অর্থাৎ তিরিশ থেকে পঁয়তিরিশের মধ্যে।

ভদ্রলোক কাছে আসতেই আমি তাঁকে নমস্কার জানিয়ে বললাম,

—আমি আপনাদের দেশের এক নতুন অতিথি, আপনার সাথে আমার পরিচয় নেই। গতকাল বিকেলে মাত্র আমি এখানে এসে পৌঁছেছি। আমি ভারতীয় পর্যটক—আপনার সাথে একটু কথা বলতে চাই, সময় হবে কি?

ভদ্রলোক আমার কথা শুনে প্রথমটা একটু আশ্চর্য হলেন বটে, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই নিজেকে সংযত করে নিয়ে বললেন,

—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই—আসুন, ভেতরে আসুন।

আমি সাইকেল ও পিঠের ব্যাগটাকে তাঁর বারান্দায় রেখে তাঁর সাথে ঘরে ঢুকলাম। ছোট্টর ওপর একটি বেশ সাজানো বৈঠকখানা ঘর। আমরা পাশাপাশি বসলাম। নিজেকে একটু গুছিয়ে নিলাম। ভদ্রলোকই প্রথম প্রশ্ন করলেন,

—আমার ঠিকানা আপনাকে কে দিল?

আমি হাসিমুখে তাঁর প্রশ্নটাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে বললাম, —আপনি তো এয়ারলাইন্সে কাজ করেন, তাই না? কাজেই আপনার পরিচিত লোকের কি অভাব?

—তবুও নামটা শুনতে চাই।

ভদ্রলোক সত্যি চালাক, কাজেই এড়াবার উপায় নেই, অথচ চায়ের দোকানে তার নামটা শুনেছি এই কথাটাকে এই মুহূর্তে বললে হয়তো ভাল রেফারেন্স হবে না, তাই হেসে বললাম,

—আমার বিষয়ে আগে শোনাই— নামটা পরে বলছি। আমি শুনেছি যে আপনি মাঝে মাঝে বিদেশীদের আপনাদের এখানে আশ্রয় দেন। আমার এখানে আসার আসল উদ্দেশ্যটাই তাই, আমার উপস্থিতিতেই মনে হয় আপনি তা বুঝতে পারছেন—তাই না? গতকাল আমি তাহিতি হোটেলে ছিলাম। আমি যদিও ভারতীয় কিন্তু এখানে এসেছি একটি ফরাসী ইয়টে করে। হোটেলের পরিবেশে থাকলে এ দেশের সম্পর্কে আমি বিশেষ জানতে পারবো না, তাই আমি একটি গ্রামীন পরিবেশ খুঁজছি। এই হচ্ছে সংক্ষেপে আমার কথা। দ্বিতীয়তঃ ভাল রেফারেন্স না দিলে নিশ্চয়ই হঠাৎ এক বিদেশীকে আপনি এখানে জায়গা দিতে পারেন না; সেটাই স্বাভাবিক।

তাই বলছি, —আপনি যদি ট্যুরিস্ট ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের ডাইরেক্টরকে আমার কথা জিজ্ঞাসা করেন— মনে হয় তিনি আমার বিরুদ্ধে কিছু বলবেন না, মঁসিও আলেক্জান্দার আতার সাথে আজ সকালে প্রায় একঘন্টা ধরে গল্প করেছি...।

আমাকে আর কিছু বলতে হ'ল না, ভদ্রলোক আমাকে থামিয়ে দিলেন,— বলেন কি? আপনি মঁসিও আতাকে চেনেন! এর চেয়ে বেশী কিছু আর আপনাকে বলতে হবে না।

এই বলে ভদ্রলোক চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে আমার হাত দুটো ধরে আবার বললেন, —কিছু মনে করবেন না, আমি আগে ঠিক বুঝতে পারিনি।

আমি অনেকটা রসিকতা করে বললাম, —আমি কি করে আপনার ঠিকানা পেলাম তা কিন্তু এখনও বলিনি।

—পরে শুনবো, —আমাকে মাপ করবেন, দুটোর মধ্যেই আমাকে অফিসে যেতে হবে। আমার মা-এর সাথে আপনার পরিচয় কবিয়ে দিই। এই বলে ভদ্রলোক পাশের ঘর দিয়ে অন্দর মহলে ঢুকলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁর সাথে এসে ঢুকলেন— একজন বয়স্কা ভদ্রমহিলা, পরণে অসমীয়াদের মত বুক পর্যন্ত ঢাকা একফালি কাপড়। হাসি-খুশী সুন্দরী— বয়স মনে হয় পঞ্চাশোর্ধে তো বটেই। ভদ্রমহিলা ইংরেজি বলেন। ফরাসী তো বটেই, আর তাঁর মাতৃভাষা পলিনেশিয়ান। তিনি হাসিমুখেই আমাকে গ্রহণ করলেন। আমার আনন্দোচ্ছ্বাস তখন দেখে কে? এই দুপুরবেলা তাঁদের আর বিরক্ত করার ইচ্ছা আমার নেই— সে পর্বটা বিকেল থেকেই শুরু হবে। কাজেই আমার ব্যাগটা তাঁদের বৈঠকখানা ঘবে রেখে দুপুরের মত তাঁদের কাছে বিদায় জানালাম। ভদ্রমহিলা যদিও আমাকে থাকতে অনুরোধ করলেন, কিন্তু অন্যান্য সর্তগুলো জানার আগে আমি ঠিক গুছিয়ে বসতে রাজি নই। বিকেল পর্যন্ত অর্থাৎ মঁসিও সিয়ারীর না আসা পর্যন্ত আমি এদিক ওদিক ঘুরেই কাটাবো। এত সুন্দর একটা দেশ দেখতে দেখতে সময় কেটে যাবে। ছ'টার পর আসবো বলে আমি বাংলো থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

এবার এসে উঠলাম 'ফা-আ'র সেই রেস্টোরেন্টে। আমাকে ঢুকতে দেখেই ছেলেটি এগিয়ে এল,—কি হয়েছে—কি খবর?

—খুব ভাল খবর— সব ঠিক-ঠাক, তোমাকে ধন্যবাদ। মনে হয় আজ থেকেই ওখানে থাকবো, আপাততঃ আমাকে তোমাদের দেশীয় রান্না খাওয়াও—হবে তো বলো!

—নিশ্চয়ই— মাছের ঝোল, মাছ-ভাজা আর কলার তরকারি —এই মেনু, চলবে তো?

—তোমার ওপর আমার আস্থা এসে গেছে; তুমি যা খাওয়াবে আমি তাই খাবো—এই বলে ওর পিঠে একটা স্নেহের চাঁটি বসিয়ে দিলাম।

খাওয়া-দাওয়ার পর এদিক-ওদিক ঘুরে তারপর কথামত আমি বিকেলবেলা আবার মঁসিও সিয়ারীর বাড়িতে এসে হাজির হলাম। গেটের কাছে আসামাত্রই ওদের কুকুরটাই আমার উপস্থিতি সকলকে জানিয়ে দিল। মঁসিও সিয়ারী বাইরে এসে 'পুমা-পুমা' বলে কুকুরটাকে থামিয়ে দিলেন— বুঝলাম এর নাম পুমা। ভেতরে ঢোকা মাত্রই মঁসিও সিয়ারী আরম্ভ করলেন, —আমার ডাক নাম জিল্। আমাকে জিল্ বলে ডাকলেই খুশী হব।

—আমার নাম বিমল। আমারও নাম ধরে ডাকতে পারো, আমি হাসিমুখে প্রত্যুত্তর জানালাম।

ঠিক হল যে আমাদের মধ্যে কোনরকম ভদ্রতার গণ্ডি না থাকাই ভাল। আমাদের সম্পর্কটা আরও সহজ হয়ে উঠল। জিল্ বলল,

—ভাল কথা, আমি ট্যুরিস্ট অফিসে টেলিফোন করেছিলাম, তারা তোমার খুবই প্রশংসা করল।

—তাই নাকি? আসলে তোমার কথা আমি প্রথম শুনি তোমাদের এই পাড়ার রেস্টোরেন্টে; ছেলেটি তোমার খুবই ভক্ত মনে হয়। তবে পাড়ার ছেলেরা কিন্তু তোমার বোনেদের কথা বলছিল— আমি কথাচ্ছলে কথাটা বললাম।

—ও হ্যাঁ, তাইতো—তাদের সাথে তোমার পরিচয় হয়নি, তাদের ডাকছি। এই বলে সে পলিনেশিয়ান ভাষায় কি যেন বলল। মনে হল বোনেদের ডাকল। কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্দর মহলের দরজা দিয়ে প্রবেশ করল দুটি মেয়ে। তরুণী— তাদের প্রবেশ মাত্রই তাদের সাথে চোখাচোখি হল। পরনে ফ্রক। আহা! কি মিষ্টি চেহারা, হাসি-খুশী মুখ আর পাতলার ওপর শ্যামাঙ্গী। ওরা এগিয়ে আসতেই জিল্ তাদের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিল।

—এরা দু'জনেই আমার ছোট। বড়জনের নাম তেমানু, আর ছোটজনের নাম আতাপু।

আমি ওদের দেখে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম, এবার এগিয়ে এসে করমর্দন করলাম। মুখে বললাম,

—আপনাদের সাথে পরিচিত হয়ে ধন্য হ'লাম। আর আপনাদের আশ্রয়ে কৃতার্থবোধ করছি। মনে হয় আপনাদের পরিবারে থেকে আমি নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করবো।

পরিচয়ের পরেই মেয়েরা ঘরে ঢুকে পড়ল। আমি জিলের দিয়ে চেয়ারটা এগিয়ে নিয়ে বসলাম— শুরু হল আমাদের টারমস্ অ্যান্ড কণ্ডিশনস্।

প্রথমেই জিল্ আমাকে বুঝিয়ে বলল যে এটা মোটেই হোটেল নয়, কাজেই হোটেলের সব সুবিধা এখানে পাওয়া যাবে না; তবে পারিবারিক পরিবেশের কোন অসুবিধাই নেই। বিশেষ করে তেমানু আতাপু ওরা দেখাশুনা করবে, আর মা তো আছেনই। ব্রেকফাস্ট ও দুবেলা খাওয়া আর থাকা নিয়ে পড়বে দশ ডলার। বিছানা

বা ঘর গোছাবার জন্য কেউ আসবে না। কাপড় কাচার জন্য বাইরের লন্ড্রি আছে। আর স্নানের জন্য রয়েছে সাগর, তবে ইচ্ছা করলে নদীতেও স্নান করা চলে। বাড়তি চায়ের দরকার হলে মা'র সাথে কথা বলতে হবে। আরও অন্যান্য টুকিটাকি নির্দেশ দিয়ে একটু দ্বিধা করে জিল্ বলল,

—কিছু মনে করবে না কিন্তু, আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি। আমার বোনেদের সাথে কোনরকম সেন্টিমেন্টাল রিলেশন্‌শিপ গড়ে তুলবে না যেন।

আমি তাকে আশ্বাস দিয়ে বললাম, —আমার ওপর ভরসা রাখতে পারো।

পরিবারে জায়গা পেয়ে গেলাম। এর চেয়ে বেশি কিছু আমি আশা করতে পারিনি। বাগানের দিকে খোলা একটা ঘর আমাকে দেওয়া হয়েছে। ঘরের ঠিক সামনেই রয়েছে খোলা মাঠ ও নারকেল গাছের ডেকোরেশন্। বাড়ীতে কোন অসুবিধাই নেই, টয়লেট্‌টাও কাছেই। মনে হয় পেয়িং গেষ্ট রেখে এরা অভ্যস্ত হয়ে গেছে। জিলের মাকে ফরাসী কায়দায় মাদাম্ সিয়ারী বলেই সম্বোধন করতে লাগলাম।

জিল্ সকালে বেরিয়ে যায় অফিসে। আর তেমানু আতাপু দুপুরের দিকে বেরোয়, বাড়ি ফেরে সন্ধ্যের দিকে।

পরে জানলাম যে, বোনেরা ইস্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে এখন হোটেল ট্রেইনিং ইন্‌স্‌টিটুটে ঢুকেছে, দু'বছর ট্রেনিং নেবার পর ওরা হোটেল চালাবার ডিগ্রি পাবে। অন্যান্য ইউরোপীয় শহরের মত এখানেও হোটেল খুলতে হলে বা হোটেল চালাতে হলে চাই ডিগ্রি আর সরকারী অনুমতি। এদের বাবা অর্থাৎ মাদাম সিয়ারীর স্বামী বছরখানেক হল হৃদরোগে মারা গেছেন। বাড়ী ছাড়াও জিল্‌দের অনেক জমি আছে। আর দেখেই মনে হয় এরা মোটেই গরীব নয়; গ্রামের ছোটখাটো জমিদার বলা চলে। এরা পেয়িং গেষ্ট রাখে অনেকটা সখে। বিদেশীদের সম্পর্কে জানার জন্য এবং সেই সাথে সাথে পরোপকার তো বটেই। এদের পেয়িং গেষ্টের একটা খাতা দেখলাম, তাতে এ পর্যন্ত বারো জনের নাম পেলাম। তারা সকলেই ইউরোপীয়ান দম্পতি। আমি একাই মনে হয় প্রথম অবিবাহিত। এদের বাড়িতে কাজ করতে আসে একটি মেয়ে, তার নাম আভেয়া। নামটা বাঙালীঘেঁসা। বাসন মাজা ও ঘর পরিষ্কার করাই তার কাজ। আভেয়া এদেশীয় পোষাকই পরে অর্থাৎ লুঙ্গির মতো— এদেশীয় ভাষায় যাকে বলে 'পারো'।

আমি আগেই লিখেছি যে তাহিতিতে পৌঁছেই আমার মনে হয়েছে যে আমি অসমের কোন এক গ্রামে পৌঁছেছি। আভেয়াকে দেখে আমার সে ধারণা আরও বদ্ধমূল হল।

আভেয়ার বুক থেকে জানু পর্যন্ত ঢাকা ফুল-রঙা পারো, মুখে হাসি তো লেগেই আছে, সব সময়েই সুন্দরভাবে আঁচড়ানো খোলা চুল আর মাথার ওপর জবা বা ঐ ধরনের কোন ফুল। ওর মধ্যে লুকিয়ে আছে এক উজ্জ্বল গরীবি সৌন্দর্য। সকালে আভেয়াই নিয়ে আসে আমার প্রাতঃকালীন জলখাবার। কফি, সরবৎ, আচার আর

পাউরুটি। দুপুরে আমি খাই জিলের সাথে ওদের ডাইনিং রুমে, মাদাম সিয়ারী নিজেই মায়ের মত আমাদের খাওয়ান। এদের রান্নার মধ্যেও অনেকটা ভারতীয় স্বাদ, প্রায় সব কিছুর মধ্যেই সামান্য হলুদের ছোঁয়া, আর সামান্য ঝাল তো বটেই। তবে আমাদের দেশের মতো রুটি বা ভাতের ব্যবহার এদেশীয় রান্নায় নেই। এদের প্রধান খাদ্য হচ্ছে 'ফেজ্' নামক একরকম তরকারী। ফেজ্ আসলে বিরাট বিরাট কাঁচকলা। হ্যাঁ, কাঁচকলাই এখানকার প্রধান খাদ্য। সেদ্ধ করে তার বিভিন্ন রকম ব্যবহারকেই বলে ফেজ্।

এধরনের কলার চাষ এখানে হয় না, জঙ্গলে ও পাহাড়ের গায়ে কলাগাছগুলো বিনা তত্ত্বাবধানেই বেড়ে ওঠে। এখনও এই ধরনের কলাগাছ চাষের প্রয়োজন হয়নি, তবে পাপীতের উঠতি জনসংখ্যার ফলে হয়তো একদিন এই কলাগাছগুলো সরকারি সম্পত্তিতে পরিণত হবে। তবে তাহিতির ইউরোপীয় বাসিন্দারা খুব বেশি ফেজ্ ব্যবহার করে না।

বাঙালীদের মত এরাও খুব মাছ প্রিয়। তবে ঠিক মাছের ঝোলের পরিবর্তে এবা ব্যবহার করে জমানো সস্। এই ধরনের এক সুস্বাদু সস্‌কে এরা বলে ওমোটো। ওমোটো আসলে নারকেল কুরিয়ে তার সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের মসলার সংমিশ্রণে তৈরি। মাছ ভাজা বা সিদ্ধ মাছের সাথে এই চাটনির মত ওমোটো মিশিয়ে খাওয়া হয়। বিভিন্ন ধরনের শুকনো মাছের চাটনি তাহিসিয়েনদের খুব প্রিয় খাদ্য।

তাহিসিয়েন খাদ্যে চীনদেশীয় প্রভাব খুব বেশি, কারণ তাহিতিতে প্রচুর চীনা অধিবাসী আছে। বহুদিন থাকার ফলে তারা এখানকার নাগরিকত্ব পেয়েছে বটে, কিন্তু তাদের রীতিনীতি ও খাদ্য ঠিক আগের মতই আছে। বিভিন্ন ধরনের শুকনো লংকাব কড়া ঝালের চাটনি ও শুঁটকি মাছের ব্যবহার চীনাদের কাছ থেকেই এরা পেয়েছে।

জিল্ সুট্-টাই পরে। তাহিসিয়ানদের মধ্যে যারা শহরে থাকে তারা সকলেই ইউরোপীয় পোষাকে অভ্যস্ত হয়েছে। তাহিসিয়েন পুরুষরাও দেখতে অনেকটা অসমীয়াদের মত; গায়ের রঙও আমাদেরই মতো। সাধারণতঃ এরা সুপুরুষ, লম্বা, উজ্জ্বল চোখ, কালো চুল আর দেহের মধ্যে যেন লুকিয়ে আছে বনজ সৌন্দর্য— সরল ও হাসিখুশী। এদের নাক একটু চওড়া ও চ্যাপটা ধরনের বটে, কিন্তু তার মধ্যেই নজরে পড়ে সৌখিন মসৃণতার প্রলেপ। এদের সহজ ও সরল ব্যবহার কথা বলার সাথে সাথেই আকৃষ্ট করে।

আমি ইউরোপ ও আমেরিকার বহু পরিবারের সাথে দিনের পর দিন থেকেছি। তাদের সাথে পরিচিত হয়ে পরে তাদেরই একজন হিসেবে নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছি। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই প্রথম দু-তিন দিন লেগেছে সেই পরিবারের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে। কিন্তু এখানে ঠিক বিপরীত— একরাতেই আমি এদের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছি। এদের আতিথেয়তা আর উদার অন্তঃকরণের তুলনা চলে না।

ভ্রমণে আনন্দ আছে নিঃসন্দেহ, কিন্তু সেই আনন্দকে সর্বক্ষণ মনে ধরে রাখার জন্য চাই উপযুক্ত পরিবেশ; তার আকর্ষণ তাহিতিতে অভাব নেই। তাহিসিয়ানরা জীবনকে যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখে ঠিক সেই দৃষ্টিভঙ্গি আমার নেই, তবে আমি চেষ্টা করছি যতটা তাদের কাছাকাছি যাওয়া যায়।

জীবন এখানে সহজ। জগতের রিয়েলিটি এখানে যেন ভিন্ন রূপ নিয়েছে। কাঠ-ঠোক্‌রার ঠক্-ঠকানি আর টিয়াপাখীর ট্যা-ট্যা শব্দে সকালে আমার ঘুম ভাঙে, আর সুন্দরী আভেয়ার মিষ্টি হাসির থেকে শুরু আমার দিন। আর দিন ফুরোয় মহাসাগরের সূর্যাস্ত দেখে।

বাজার

সেদিন রবিবার। জলখাবার খেয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে নারকেল গাছ ছাঁটা দেখছি, এমন সময় পেছন থেকে জিল্ এসে দাঁড়াল,—বঁ জুর!

—বুঁ জুর। আমি প্রত্যুত্তরে সুপ্রভাত জানালাম।

—চল, আজকে তোমাকে এখানকার হাট দেখিয়ে আনি, আমাদেরও কেনাকাটা করতে হবে। অবশ্য মনে হয় তোমার খুব ভাল লাগবে।

আমি সাথে সাথে রাজী হয়ে গেলাম। প্রতি রবিবাব পাপীতে হাট বসে। পাপীতের হাট খুব নামকরা। প্রতি রবিবারে সিয়ারী পরিবারেব সকলে একসাথে হাটে যায়। এটা তাদের এক পারিবারিক উৎসব বলে মনে হয়। জিল্ বললো যে সাইকেল নিতে হবে না, মোটরেই সবাইকে ধরে যাবে। জিল্, মাদাম সিয়ারী, তেমানু, আতাপু ও আমি।

মোটরের কাছাকাছি তেমানু ও আতাপুকে দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। কি সুন্দর দেখাচ্ছে— ঠিক এ ধরনেরই ছবি তাহিতির ট্যুরিস্ট বইতে দেখেছি। তাদের পরণে পারো আর মাথায় ঝুমকো জবা। আমরা রওনা হলাম।

পাপীতের মূল শহরেই এই বাজার। অনেকটা দার্জিলিং-এর বাজারের মতো। দেশের সেরা সেরা জিনিস নিয়ে হাজির হয়েছে স্থানীয় বাসিন্দারো। এদের মধ্যে বিশেষভাবে নজরে পড়ে বিরাট বিরাট জংলি কলার কাঁদি ঘিরে দাঁড়ানো আদিবাসীদের। খালি পা, খালি গা, পরণে লুঙ্গি, কানে গোঁজা ফুল। দেখতে অনেকটা আমাদের দেশীয় সাওঁতালদের মতো। বাজাবে নারকেল, কুমড়ো, আলু, আনারস, পেঁপে, লংকা, আরও বিভিন্ন ধরণের সবজি ও ফলে ভর্তি। ব্যবসায়ীদের মধ্যে অধিকাংশই মহিলা।

বাজারে হাঁটতে হাঁটতেই কানে আসে মেয়েদের হাসির আওয়াজ। এরা হাসতে জানে বটে, বাজারে কথার চেয়ে হাসির আওয়াজটাই যেন বেশী।

মেয়েরা খুবই পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। পরণে রংচঙে পারো আর মাথায় ফুলের মুকুট। তাহিসিয়েনরা ফুল খুব ভালবাসে আর বিভিন্ন ধরনের ফুলের মালা গেঁথে নিজেদের গলায় পরে। ফুল দৈনিক জীবনে অবশ্য-প্রয়োজনীয় অলংকার। শুধু মেয়েরা নয়,

পুরুষরাও ফুল খুব ভালবাসে। হাটে প্রায় প্রত্যেকের গলাতেই দেখতে পাচ্ছি ফুলের মালা।

এখানকার ফুলের বাজার সত্যি দেখবার জিনিস। এত বড় আর রঙচঙে বাজার এর আগে আমার চোখ পড়েনি। গ্রীসে এ্যাথেন্সের রাজবাড়ীর পেছনকার ফুলের বাজার এর কাছে ছেলেমানুষী ব্যাপার। ফুল-বাজারের পসারীরাও সবাই মহিলা। যারা কিনছে আর বিক্রি করছে তাদের মধ্যে যেন রয়েছে এক আন্তরিক সৌহার্দ্য। রঙ-বেরঙের সুগন্ধি ফুল কিনে এ ওর গলায় পরিয়ে দিচ্ছে। পরিবার, বন্ধু, সখা, কেউই বাদ নেই। মেয়েরা নিজেদের মধ্যে রসিকতা করছে, হাসিতে ফেটে পড়ছে, আলিঙ্গন করছে, চুম্বন দিচ্ছে। এই উৎসবে পুরুষরাও বাদ পড়েনি; প্রেমিক-প্রেমিকা থেকে আরম্ভ করে পিতা কন্যা পর্যন্ত সকলেই যেন এক মহা উৎসবে যোগদান করেছে। ফুল-বাজারে যেন ফুলপরীদের মর্তে আগমন হয়েছে। বলাই বাহুল্য যে সিয়ারী পরিবারও সে উৎসব থেকে বাদ পড়েনি। তেমানু গন্ধরাজ ও জবাফুলের কয়েকটা মালা কিনে পরিয়ে দিল তার মায়ের ও বোনের গলায়। আর মাদাম সিয়ারী কয়েকটা মালা কিনে তার ছেলেমেয়েদের গলায় পরিয়ে দিল, আমিও বাদ গেলাম না।

এখানকার মাছ-বাজারও খুব বিখ্যাত। রঙ-বেরঙের সামুদ্রিক মাছ—তাদের অধিকাংশের নামই আমার অজানা।

হাট দেখতে হাজির হয়েছে তাহিতির ট্যুরিস্টরা। ইউরোপীয়ান ও আমেরিকান ট্যুরিস্টদের দেখলেই চেনা যায়। মাথায় গেলপাতার টুপী, পায়ে হাওয়াই চটি, হাফ-প্যান্ট পরণে—আর হাতে ক্যামেরা। ক্যামেরা দিয়েই তারা দেখছে অরিয়েন্টকে। মেয়ে-ট্যুরিস্টরা আমার মতে একটু উৎকট ধরণের। ছোট ছোট জাঙ্গিয়া আর কোনরকমে বুক ঢাকা ফ্যাসানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এদের মধ্যে এক একটি মেয়ের পরণে মিনি বিকিনি অর্থাৎ নিতম্বের মধ্যে হারিয়ে গেছে পর্দা আর কুচযুগলের ওপর যেন সূতোর ছোঁওয়া। এরা এসেছে সান্-ট্যান্ হতে। দেহকে যতটা উন্মুক্ত রাখা সম্ভব। লজ্জা? সেটা নেহাৎই অরিয়েন্টের ভাষা, অস্‌সিডেন্ট মেয়েদের লজ্জা মানে কম্‌প্লেক্সিটি। নারীর ভূষণ তো নয়ই, বরং লজ্জা থাকাটাই একটা লজ্জার কারণ। তাহিতিব বাজারে বলতে গেলে কিছুরই অভাব নেই—গাড়ী থেকে শুরু করে মেয়ে পর্যন্ত ভাড়া পাওয়া যায়।

বাজারে শুধু তাহিসিয়েন নয়, সেই সাথে আছে, চীনা, অর্ধচীনা ও ফরাসীরা তো বটেই। মাংসের বাজারে অপেক্ষাকৃত কম ভীড়— তাহিসিয়েনরা সাধারণতঃ মাংস বিশেষ পছন্দ করে না।

আমাদের প্রত্যেকের হাতেই ব্যাগ। মাদাম সিয়ারীই আসলে কেনা-কাটার মালিক। প্রয়োজনমত তিনি জিনিসপত্র কেনা-কাটা করছেন আর আমরা রয়েছি সেগুলো বহন করবার জন্য।

চলতে চলতে হঠাৎ মুখোমুখি ধাক্কা খেলাম। মুখ তুলে তার দিকে তাকাতেই দেখি মঁসিও কুর্বে। বুঝলাম তিনি ইচ্ছে করেই আমাকে ধাক্কা দিয়েছেন। আমি তাঁরা দিকে তাকিয়ে রসিকতা করে বললাম,

—কি মশাই। এত বড় হয়েছেন অথচ পথ চলতে শেখেননি!

—না; আপনার কাছ থেকে শেখবার জন্যই আমি এসেছি।

রগুরে লোক—ওর সাথে কথায় পেরে ওঠা মুশকিল। ফরাসীরা সাধারণতঃ এরকমই। আমি উৎসাহিত হয়ে বললাম,

—আসুন, আপনার সাথে পরিচয় করিয়ে দিই—জিল্, তার মা মাদাম সিয়ারী। জিলের দুই বোন তেমানু-আতাপু। এদের সাথেই আমি আছি। তারা পরস্পর করমর্দন করল—এবার কুর্বের দিকে তাকিয়ে বললাম,

—ইনি হচ্ছেন অভিযাত্রী ক্যাপ্টেন কুর্বে, এনার কৃপাতেই আমি তাহিতিতে এসেছি। বাজারের ঠেসাঠেসির মধ্যে আমাদের কথাবার্তা চলল। তারপর বিদায় সম্ভাষণ জানালাম। যাবার আগে ক্যাপ্টেন কুর্বে আমাকে অতি অন্তরঙ্গতার ভঙ্গিতে বললেন,

—মেয়ে দুটো চমৎকার—একেই বলে তাহিসিয়েন বিউটি, মেয়ে নয়তো যেন মুক্তো!

আমি তেমানু ও আতাপুর দিকে তাকিয়ে বললাম—শুনলেতো আমার বন্ধুর উক্তি। তেমানু তার মাথাটা একটু নীচু করে বলল, —আপনার প্রশংসার জন্য ধন্যবাদ।

কথাটা ঠিক। তাহিসিয়েনদের স্ত্রী-সৌন্দর্য অবর্ণনীয়। এদের রূপের মধ্যে একটা মাধুর্য আছে, বিশেষ করে চোখগুলো যেন নীল ও গভীর সাগরের প্রতিবিম্ব—যার চ্ছটা নেই, কিন্তু আছে আকর্ষণ। বাজারে নারকেলের কথা না লিখলে আমাব লেখা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। প্রচুর নারকেল, নারকেলের পাহাড়। তাহিসিয়েনরা নারকেলের ব্যবহারও খুব জানে। নারকেল কোরা সরবতের সাথে মিশিয়ে এরা সুন্দর পানীয় তৈরী করে—অনেকটা আমাদের দেশীয় ঘোলের সরবৎ বা লস্যির মত। সুস্বাদু ও শীতল পানীয়। সকাল থেকে আমরা তিনবার এই ধরণের পানীয় পান করেছি; অনেকটা চা-এর মতই। এই দেশীয় লোকেরা এই সরবৎ পান করে। বাজারে প্রচুর আমও চোখে পড়ে। পেঁপে আর পেয়ারার তো ছড়াছড়ি।

বেলা দুটো নাগাদ আমরা কোন-কাটা শেষ করলাম। বাজার তাহিসিয়েনদের এক বিরাট মিলনকেন্দ্র, এখানেই তারা তাদের বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনদের সাথে দেখাশুনা করে আর মেয়েরা ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে তাদের মনের কথা বলে। এক কথায় বলা চলে যে এই হাটই হচ্ছে তাহিসিয়েনদের প্রাণকেন্দ্র। যাদের কিছু কেনা-বেচার নেই তারাও হাটে আসে এই মিলনোৎসবে যোগ দিতে। আমার মনে হয় যে তাহিতির এই রবিবারের হাটে এলেই তাহিতি সম্পর্কে একটা সুন্দর ধারণা এসে যায়। পর্যটকদের কাছে এ এক নতুন জগৎ।

তাহিতির ইতিকথা

যে কোন দেশের বর্তমান অবস্থা নির্ভর করে সেই দেশের ইতিহাসের ওপর; কারণ ইতিহাসই গড়ে তোলে ঐতিহ্য। কাজেই তাহিতির কথা আরও লেখার আগে আসা যাক তাহিতির ইতিহাসে।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অন্যান্য দ্বীপগুলোর মতো তাহিতির উৎপত্তি হয়েছে আগ্নেয়গিরির উৎপতনের ফলে। ভূ-গর্ভস্থ তরল রাসায়নিক পদার্থ আস্তে আস্তে জমে গিয়ে রূপ নিয়েছে বিভিন্ন প্রকার পাথরের। এইভাবেই সৃষ্টি হয়েছে বর্তমান তাহিতির। তারপর বহুকাল ধরে জলবায়ুর প্রভাবে সেই তপ্ত তরল পদার্থগুলোই আজ সুন্দর সবুজ পাহাড়ে পরিণত হয়েছে। ভূ-তাত্ত্বিকেরা বলেন যে, আগ্নেয় লাভা যে কি চমৎকারভাবে সাধারণ মাটিতে পরিণত হতে পারে—তাহিতি ও অন্যান্য দ্বীপগুলো না দেখলে তা বোঝা যায় না।

লক্ষ লক্ষ বছর ধরে প্রকৃতির রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে রূ-লাভা ও ঝামাপাথরগুলো আজ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দ্বীপ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। সাগর এখানকার রহস্য-ভাণ্ডার। পাহাড়, উপত্যকা, ঝরণা আর সবুজ বনভূমি যেন নন্দন-কানন। পৃথিবীর এই নন্দন-কাননের কে বা কারা ছিল ভাগ্যবান আদি পুরুষ, তাদের বিষয়ে এখনও কোন তথ্য আবিষ্কৃত হয়নি। সম্ভবতঃ প্রকৃতির পূজারী সেই আদি পুরুষেরা তাদের জীবন-যাপনের কোন রকম সাক্ষ্য রাখবার কল্পনাও করেনি। প্রাকৃতিক জীবনের একমাত্র সাক্ষী প্রকৃতি। আজ পদার্থ বৈজ্ঞানীরা সে কথা স্বীকার করেন বটে, তবুও জাগতিক প্রমাণ তাঁদের চাইই। তাই মাটি খুড়ে খুঁজছেন মাটি, আর পাথর ভেঙ্গে খুঁজছেন পাথর। আর্কিওলজিস্টরা এখানে হতাশ হয়েছেন। তাহিতির আশে-পাশের কয়েকটি দ্বীপে, অর্থাৎ মপিতি ও মারকুয়েসাতে কিছু ভাঙ্গা পাথরের বেদী তাঁরা খুঁজে বের করেছেন। মানুষের তৈরী এই বেদীগুলো সম্ভবতঃ তিনশ থেকে আটশ খৃস্টাব্দের মধ্যে তৈরী হয়েছে, কিন্তু তাদের বিষয়ে বিশদ বিবরণ এখনও জানা যায়নি।

ষোড়শ শতাব্দী থেকে ইউরোপীয়ানরা পলিনেশিয়ার দিকে যেতে শুরু করে। এই সময় থেকেই শুরু হয় ইউরোপীয়ানদের প্রশান্ত মহাসাগর অভিযান। ইউরোপীয়দের মধ্যে প্রথম এই দ্বীপ পরিক্রমা করেন পরিব্রাজক মাজেলান। ১৫২১ খৃস্টাব্দে মাজেলান তুয়ামোতু দ্বীপ আবিষ্কার করে প্রথম ঘোষণা করেন যে মহাসাগরের এই অঞ্চলে বসবাস-যোগ্য ভূমি বর্তমান।

তাহিতিতে প্রথম ইউরোপীয়ানদের মধ্যে আসেন ক্যাপ্টেন সামুয়েল ভালী। ১৭৬৭ খৃস্টাব্দে হিজ মেজেষ্টিস্ সার্ভিস-এর ডলফিন জাহাজে করে তিনি এই দ্বীপে আসেন। দ্বীপটি আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই ক্যাপ্টেন ভালী এই দ্বীপটিকে ইংল্যান্ডের অধীন বলে ঘোষণা করেন। এইভাবেই শুরু হল বিদেশীদের আগমন। ১৭৬৮ খৃস্টাব্দে বুগেনভিল নামক ফরাসী নেভিগেটর তাহিতিতে পদার্পণ করেন। তিনি জানতেন না যে এক বছর আগে ইংরেজরা এই দ্বীপটি আবিষ্কার করে ইংরেজদের অধীন বলে ঘোষণা করেছে।

অভিযাত্রী বুগেনভিল ছিলেন সখের নাবিক। ফরাসীর তরফ থেকে শুভেচ্ছা ও প্রীতি বিনিময়ই ছিল তাঁর সমুদ্র-যাত্রার মূল কারণ। এই দ্বীপের প্রথম দিকের অভিযাত্রীদের মধ্যে বুভেনভিলের নাম চিরস্মরণীয়। দ্বীপের অধিবাসীরো তাঁকে গ্রহণ করেছিল অন্তর দিয়ে; আর অন্যান্যরা এসেছিল এই দ্বীপটি দখল করতে।

১৭৬৯ খৃস্টাব্দে ভালীর পথ অনুসরণ করে এই দ্বীপে এসে হাজির হন ক্যাপ্টেন কুক্। পরবর্তী কালে ক্যাপ্টেন কুক্ আরও দুবার এই দ্বীপে তাঁর জাহাজ ভেড়ান। ক্যাপ্টেন কুকের সমুদ্রাভিযানে তাহিতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ক্যাপ্টেন কুক্ই প্রথম ঘোষণা করেন যে, তাহিতিই পৃথিবীর সুন্দরতম দ্বীপ।

তাহিতিকে কেন্দ্র করে ক্যাপ্টেন কুক্ পলিনেসিয়ার অন্যান্য দ্বীপগুলো আবিষ্কার করেন। ক্যাপ্টেন কুকের সমুদ্রাভিযানের মূল লক্ষ্য ছিল 'Resolution and Adventure'। তিনি তাঁর এই অ্যাড্ভেঞ্চারের নামে অনেক অত্যাচারও করেছেন, কিন্তু তিনি ছিলেন রাণীর সুনজরে, কাজেই তাঁর সে সব কীর্তিগুলো ইংল্যান্ডে সু-কীর্তি বলেই প্রশংসা পেয়েছে।

ক্যাপ্টেন কুক্ ১৭৭৪ সালে তাহিতির এক বাসিন্দাকে জোর করে ইংল্যান্ডে ধরে নিয়ে যান। পরবর্তী কালে এই তাহিসিযেন বাসিন্দাকে নিয়ে অনেক উপন্যাস রচিত হয়েছে—ইংরেজিতে যার নাম দেওয়া হয়েছিল Noble Savage।

ক্যাপ্টেন কুক্ যখন প্রথম তাঁর জাহাজ ভেড়ান, দ্বীপবাসীরা তাঁর জাহাজী কামানের কেরামতি দেখে অবাক হয়ে যায়। এই প্রথম তারা বন্দুক বা কামান দেখে। দ্বীপের এক গ্রাম-প্রধান কৌতুহল দমন করতে না পেরে জাহাজে এসে হাজির হয়। কামানটাকে সে ভেবেছিল বিরাট লৌহপিন্ডমাত্র। তাহিতির লোকেরা সেই সময় লোহার ব্যবহার জানতো বটে, কিন্তু দ্বীপে লোহাব একান্তই ছিল অভাব। কাজেই সে কামানটিকে বার বার হাত বুলিয়ে দেখছিল। ক্যাপ্টেন কুকের একজন নাবিক তাকে দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে তাকে কামানের সামনে রেখে কামান দেগে তার দেহটাকে টুকরো টুকরো করে উড়িয়ে দিল। আশে-পাশের নৌকা থেকে আর দ্বীপ থেকে অনেকেই সে দৃশ্য দেখল আর অবাক হল তো বটেই! সেই কথা সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল সমগ্র দ্বীপে।

দ্বীপের বিধবা রাণী ছিলেন কামাকাহেলি। রাণীর কাছে সর্দারেরা এসে সে কথা জানালো—তারা যুদ্ধ করতে চায়। তারা জাহাজটির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল, কিন্তু রাণী সবাইকে শান্ত করে তাদের স্থির হতে বললেন। যুদ্ধ মানেই রক্তারক্তি আর তাতে জীবন হানি তো বটেই। রাণী জাহাজটির সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাইলেন। সকলেই একবাক্যে বলল,

—জাহাজের নাবিকেরা সবাই মেয়ে—নারী জাত নিঃসন্দেহ।

রাণী অবাক হলেন—তাঁর কৌতুহল হ'ল। শুধু মেয়েরা এসেছে জাহাজে করে বিদেশ থেকে? অবাক কাণ্ড! আসলে রহস্যটা ছিল ক্যাপ্টেন কুক্ ও জাহাজের উর্ধতন কর্মচারীদের নিয়ে। কারণ সেই যুগে তার সবাই সাদা লম্বা ও কোঁকড়ানো

পরচুল ব্যবহার করতো। সেটাই ছিল অষ্টাদশ শতাব্দির রয়াল ফ্যাসান। দূর থেকে তাহিতিয়েনরা তাই তাদের মেয়ে বলে ধরে নিয়েছিল।

কামানটা দ্বীপবাসীদের কাছে এক অলৌকিক বস্তু বটে। রাণী ব্যাপারটাকে ভালভাবে চিন্তা করলেন—তারপর সিদ্ধান্ত নিয়ে বললেন—এই জাহাজের লোহাটা নিশ্চয়ই যাদুকর বস্তু। আর এই অদ্ভুৎ ধরণের মেয়েগুলোও নিশ্চয়ই অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারিণী—নয়তো, এতদূরে আসতে পারতো না। এরা নিশ্চয়ই দেবতা— এদের সাথে যুদ্ধ করা ছেলেমানুষি মাত্র।

রাণীর কথা— অতএব মানতেই হবে। অর্থাৎ যুদ্ধ নয় শান্তি। রাণী তাঁর সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ ফল ও উপহার পাঠালেন সেই দেবতুল্য বিদেশীদের জাহাজে। ক্যাপ্টেন কুকের সাথে তাদের হৃদ্যতা ও বন্ধুত্বের সূত্রপাত হ'ল। রাণী শক্তিশালী জাহাজে শুধু সামগ্রী পাঠিয়েই ক্ষান্ত হলেন না—তাদের সাথে স্থায়ী বন্ধুত্ব রক্ষার জন্য রাণী কামাকাহেলি তাঁর মেয়ে লেলেমাহোয়ালানিকে জাহাজে পাঠলেন তাদের আমোদের জন্য। বলাই বাহুল্য যে ক্যাপ্টেন কুকের নাবিকেরা সেই মহামূল্য উপহার পেয়ে হাতে যেন স্বর্গ পেল। রাজকন্যা লেলেমাহোয়ালানি অচিরেই পরিণত হ'ল জাহাজের বারবণিতা হিসেবে। তাহিতির ইতিহাসে এইভাবেই শুরু হ'ল প্রস্টিট্যুশন্।

পরবর্তীকালে লেলেমাহোয়ালিনির ছোট বোন কময়ালি তাহিতির রাণী বলে ঘোষিত হয়, কিন্তু তাকে রাণী না বলে বিদেশীদের পুত্তলিকা বলাই সংগত।

ক্যাপ্টেন কুক্ তাঁর শেষবারের তাহিতি সফর করেন ১৭৭৭ খৃস্টাব্দে। তার পরবর্তী এগারো বছরের মধ্যে তাহিতি আর কোন বিদেশীর মুখ দেখেনি।

১৭৮৯ খৃস্টাব্দে পুনীরায় এখানে হিজ্ মেজেস্টিস্ সার্ভিসের 'বন্টি' নামক জাহাজ এসে নোঙ্গর ফেলে। সেই জাহাজটির ক্যাপ্টেন ছিল ব্লাই। তাহিতি থেকে ব্রেড্ ফ্রুট্ (Bread fruit) নামক এক রকম ফলের গাছ ওয়েষ্ট ইন্ডিজের দ্বীপগুলোতে সরবরাহ করাই ছিল; তার আগমনের মূল উদ্দেশ্য।

জাহাজেই কুখ্যাত নাবিক বিদ্রোহের কথা কে না জানে—ইংরেজদের ইতিহাসে যাকে বলে— Mutiny on the Bounty। ব্রেড় ফ্রুটের চারাগাছের জন্য জাহাজকে কয়েকমাস সেখানে অপেক্ষা করতে হয়। এই সময়েই নাবিকদের মধ্যে দেখা দেয় উচ্ছৃঙ্খলতা; দ্বীপবাসীদের মতে—নাবিকেরা তাহিতির সুন্দরীদের প্রেমে পড়ে যায়। অবশ্য দ্বীপবাসীদেরও তাতে কোন রকম বাধা বা আপত্তি ছিল না। ইংরেজ নাবিকদের মতে এমন ফ্রি এন্টারটেইন্‌মেন্ট তারা কোনদিন কল্পনাও করতে পারেনি—তাদের কাছে এটা একটা নতুন জগৎ।

কিন্তু ক্যাপ্টেন ব্লাই এসব মোটেই বরদাস্ত করতে পারছিলেন না। খুব কড়ালোক ও বদ্‌মেজাজী হিসেবে তাঁকে আসলে কেউই পছন্দ করতো না। কাজেই মাসখানেক পরে ফলগাছগুলো জাহাজে ভর্তি করে তিনি যখন অর্ডার দিলেন, 'এবার যেতে হবে', তখনই শুরু হল গন্ডগোল। ক্যাপ্টেন ব্লাই রেগে লাল হয়ে কড়া হুকুম দিলেন— 'যদি আমার কথা না শোনো তাহলে ইংল্যান্ডে গিয়ে সবাইকে হাজত

বাস করাবো।' ব্যাস্—আর যায় কোথায়! নাবিকেরা তাঁকে মধ্য সমুদ্রে নিয়ে গিয়ে, একটা ছোট ডিঙ্গি নৌকো করে ছেড়ে দিল জলে।

পরের ঘটনা অবশ্য সবাই জানে—ক্যাপ্টেন ব্লাই কোন রকমে অন্য এক জাহাজের সাহায্যে ভাগ্যক্রমে রক্ষা পেয়ে ফিরে যান ইংল্যান্ডে। সেখানে গিয়ে তিনি নালিশ জানান রাণীর দরবারে। ক্যাপ্টেন সব সময়ই ক্যাপ্টেন—তাঁর চরিত্র যত খারাপই হোক না কেন; তিনিই হচ্ছেন জাহাজের সর্বেসর্বা। হিজ্ মেজেস্টিস্ সার্ভিস্ পাঠালেন আর একটি জাহাজ—উৎশৃঙ্খল নাবিকদের গ্রেপ্তারের জন্য। 'বনটি' ও তার নাবিকদের পরে ইংল্যাণ্ডে নিয়ে গিয়ে কারাদণ্ড বিধান করা হয়।

প্রায় ১৮০০ খৃস্টাব্দ থেকে তাহিতির বন্দরে দেখা দেয় লণ্ডন মিশনারী সোসাইটির পাদ্রীদের। সম্পূর্ণ দ্বীপটাকে খৃস্টান ধর্মে পরিণত করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। তারও বছরখানেক পরে সেই দ্বীপে হাজির হ'ল ফরাসী জাহাজ আর ফরাসী পাদ্রী। শুরু হ'ল সংঘর্ষ। ইংরেজদের সাথে ফরাসীদের কুটনৈতিক যুদ্ধ; ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স তাহিতির থেকে অনেক দূরে—যে কোন রকম সিদ্ধান্তের জন্য জাহাজের নাবিকদের কম করেও আট-ন মাস অপেক্ষা করতে হ'ত। অধিকাংশ সময়ই জাহাজের ক্যাপ্টেনকে যুদ্ধ বা শান্তির জন্য সিদ্ধান্ত নিতে হ'ত।

এই মিশনারী ও বাণিজ্যিক যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত জয় হল ফরাসীর। প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে বাণিজ্য ও বসতির জন্য ফবাসীরা পুরোপুরি দখল কবল তাহিতি। আসলে যাদের জন্য এই যুদ্ধ, সেই তাহিতিরা কিন্তু এতে মোটেই অংশ গ্রহণ করেনি। তাহিসিয়েনরা নিরীহ ও শান্তিপ্রিয়। অনেকের মতে সেই সময় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মাধ্যমে ইংল্যাণ্ডের নজর ছিল—ভারতের দিকে যদি শক্তি প্রয়োগ করতে হয় তাহলে বৃহৎ কারণেই তার প্রয়োগ ভাল; কাজেই ফরাসীদের তাহিতি দখলে হিজ্ মেজেস্টিস্ সার্ভিস মোটেই চিন্তিত ছিল না।

১৮৪১ খৃস্টাব্দ থেকে ফরাসীরা তাহিতিতে তাদের প্রথম কন্সাল স্থাপন কবে; সেই কন্সালই পরে গভর্ণর হিসেবে পবিচিত হন। সরকারী ভাবে ১৮৪৭ খৃস্টাব্দে তাহিতির রাণী পোমারে (Queen Pomare) তাহিতিকে ফরাসী প্রটেক্টরেট্ বলে ঘোষণা করেন; আর তাহিতির সাথে সাথে অন্যান্য দ্বীপগুলো নিয়ে তৈরী হ'ল ফরাসী পলিনেশিয়া বা Polinesie Francais. এখন অবশ্য তাহিতি ফরাসীরই একটি দ্বীপ, যেমন ভারতবর্ষের আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, সেই সময়, প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে প্রায় হারানো একটা ছোট্ট দ্বীপ নিয়ে এই যে টানাটানি, তার কারণটা কি? কারণটা অতি সহজ। ব্রিটিশদের কারণ হচ্ছে অভিযান ও উপনিবেশ। প্রশান্ত মহাসাগর দিয়ে নিউজিল্যাণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়া যাবার পথটা এক বিরাট দূরত্বের। এই বিরাট জলপথটা পাড়ি দেবার জন্য তাদের দরকার মাঝপথে একটা দাঁড়াবার জায়গা—যেখানে নাবিকেরা সমুদ্রের একঘেয়েমি যাত্রার থেকে থেমে একটু বাতাস পরিবর্তন করতে পারবে, আর সাথে সাথে বিশ্রামতো বটেই। আর জাহাজের জন্য রসদ। তাহিতি সব দিক থেকেই আদর্শ।

ফরাসীদের কারণটা কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। নেভিগেটার বুগেনভিল্ এখানে এসেছিল সমুদ্র-হাওয়া খেতে—তাহিতি একটা সুন্দর দ্বীপ, তাকে হাতে রাখা ভাল। এই সময় ফরাসীরা প্রশান্ত মহাসাগরের এই অঞ্চলে তিমি শিকারের জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে। তিমি শিকার ফরাসীদের ছিল একটা বিরাট লাভজনক ব্যবসা। কিন্তু ফ্রান্স থেকে তাহিতি অনেক অনেক দূরে, কাজেই তিমি শিকারের জন্য প্রায়ই তাদের রসদ যেতো ফুরিয়ে। তাহিতি সেদিক থেকে একটা বিরাট প্রতিশ্রুতি। তিমি শিকারের জন্য তাহিতিই হবে বিশ্রাম ও রসদকেন্দ্র। অতএব যেমন করেই হোক তাহিতি তাদের চাইই। অবশেষে তাহিতিবাসীদের সদিচ্ছায় ও নৌযুদ্ধে ফরাসীরা ইংরেজদের আস্তে আস্তে দূরে সরিয়ে দিল।

এবার আসা যাক তাহিতির চীনা অধিবাসীদের কথায়।

বিংশ শতাব্দির মাঝামাঝি আমেরিকায় সিভিল ওয়ার শুরু হয়, আর তার শেষে হঠাৎ বাজার থেকে তুলো উধাও হয়ে যায়। আমেরিকা তুলোর চাহিদা পূর্ণ করতে পারছিল না। তাই দেখে একজন আইরিশ অ্যাড্ভেঞ্চারার উদ্যোগী হ'লেন তুলোর ব্যাবসা করতে। তার নাম ছিল উইলিয়াম স্টুয়ার্ট। মিঃ স্টুয়ার্ট তাহিতি সফরে এসে হঠাৎ ভাবলেন যে, এটাই হচ্ছে তুলো উৎপাদনের উপযুক্ত স্থান। বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের সাথে যোগাযোগ করে তিনি সকলকে আশ্বাস দিলেন যে, পৃথিবীব তুলোর চাহিদা তিনি মেটাবেনই। তুলো চাষ করবার জন্য তিনি পেয়ে গেলেন উপযুক্ত সরকারী অনুগ্রহ।

মিঃ স্টুয়ার্ট ভেবে দেখলেন যে, তুলো চাষ করবার জন্য তাঁর দরকার উপযুক্ত সংখ্যক কর্মী, আর অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তাহিতির বাসিন্দাদের এই বিষয়ে কোনরকম অভিজ্ঞতাই নেই। কাজেই চাষেব জন্য লোক চাই। বাইরের থেকে লোক আনতে হবে, কমপক্ষে এক হাজার লোক। এবারও তিনি পেয়ে গেলেন সরকারী অনুমতি। মিঃ স্টুয়ার্ট ছিলেন বিচক্ষণ ব্যক্তি, সব ঠিকঠাক করে তিনি চলে গেলেন হংকঙে। সেখানে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে নিয়ে এলেন এক হাজার চীনা কর্মী। এই চীনা কর্মীদের সকলেই তুলো চাষে অভিজ্ঞ আর মাটিতে খাটতেও তাদের আপত্তি নেই— আর্থিক দিক থেকে বিচার করলে সস্তা তো বটেই।

তাহিতির মাটিতে এইভাবেই এক হাজার চীনা অধিবাসী এসে হাজির হয়। তাদের মধ্যে অনেকেই ছিল বিবাহিত— সবশুদ্ধ চৌদ্দশ মানুষ। তাহিতির দক্ষিণে আতিমায়োনো নামক স্থানে শুরু হ'ল তুলোর চাষ।

মিঃ স্টুয়ার্ট আসলে ছিলেন অ্যাড্ভেঞ্চারার ইয়ংম্যান, কিন্তু ব্যবসায়ীর দূরদৃষ্টি তাঁর ছিল না। বছরখানেক পর অর্থাৎ ১৮৬৬ খৃস্টব্দে, তাঁর চাষ বন্ধ হ'ল। ব্যাঙ্কক্রাফ্ট! মিঃ স্টুয়ার্টের দুর্ভাগ্যতো বটেই, সেই সাথে সাথে সেই চৌদ্দশ চীনা অধিবাসীদের মধ্যেও দেখা দিল বিপর্যয়। তাদের মধ্যে অর্ধেকের মত ফিরে গেল নিজের দেশে, আর বাকী অর্ধেক থেকে গেল তাহিতিতে; কারণ দেশে যাওয়ার মত মনোবল ও অর্থ কিছুই তাদের নেই। সেই চীনারাই পরে তাহিতিতে তুলো ব্যবসা শুরু

করে আর বর্তমানে তারা তাহিতির বাজারে যাকে বলে ঝানু ব্যবসায়ী। তুলোর চাষ ও ব্যবসা ছাড়া অন্যান্য ব্যবসাতেও চীনারা তাহিতিতে সুনাম করেছে।

১৯৪০ খৃস্টাব্দে জার্মানরা যখন ফ্রান্স দখল করে, তখন তাহিতি ফরাসীর অধীনতা থেকে নিষ্কৃতি পায়, এবং এই সময়ই ধীরে ধীরে তাহিসিয়েনদের মধ্যে গড়ে ওঠে স্বাধীনতাপ্রীতি, এই সময়ই গড়ে ওঠে তাহিতির মুক্তি সংগ্রাম সমিতি, যার স্থানীয় নাম পুভানা কমিটি। পুভানা কমিটিই ঘোষণা করে স্বাধীন তাহিতি। এই পুভানা কমিটির জনবল ছিল বটে, কিন্তু তাদের কোন রকম হাতিয়ার ছিল না। পাঁচ বছর পর ফরাসী যখন জার্মানীর কবল থেকে মুক্তি পেলো তখন আবার তাহিতি পড়ল ফরাসীদের অধীনে। তাহিতির পুভানা কমিটির বিদ্রোহ, ফরাসীদের শাসন এড়াতে পারলো না। পরন্তু যারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল তাদের যেতে হ'ল, কারাগারে। পুভানা কমিটির জাগরণ একেবারে বিফলে যায়নি; তাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল নবজাগরণ। ফরসীরা দেখলো যে স্থানীয় লোকদের বাদ দিয়ে এ রাজ্য শাসন করা মুসকিল। শেষে তারা বাধ্য হ'ল সরকারি শাসন ব্যবস্থায় তাহিসিয়েনদের নিয়োগ করতে, ১৯৫৭ খৃস্টাব্দে। তাহিতির শাসন ব্যবস্থা নতুন করে গঠিত হ'ল, এবং স্থাপিত হ'ল একটা গভর্ণমেন্ট কাউন্সিল। তাহিতির শাসন ব্যবস্থা পুরোপুরি এল তাহিসিয়েনদের হাতে। তাহিতি ও তার দ্বীপগুলো নিয়ে তৈরী হ'ল ফরাসী পলিনেসিয়া অর্থাৎ তাহিতি ফরাসীরই এক সামুদ্রিক দ্বীপ বলে স্বীকৃতি পেল। পরিবর্তনটা হ'ল এই যে, তাহিতির শাসন ব্যবস্থা পুরোপুরি এল স্থানীয় লোকদের হাতে; কিন্তু মূলতঃ ফরাসীরাই হয়ে রইল তাদের আসল মালিক।

তাহিতির ভৌগোলিক অবস্থানটা খুবই চমৎকার আর লাভজনক। ফরাসীরা যদি তাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেয় তাহলে সেই স্বাধীনতাকে রক্ষা করবার মত উপযুক্ত হাতিয়ার তাহিতির নেই। আমেরিকা তো দূরের কথা, ইউরোপেরে যেকোন ছোট-খাটো দেশের পক্ষে তাহিতি দখল করা মাত্র কয়েক ঘণ্টার কাজ। কাজেই সব দিক থেকে বিবেচনা করে দেখা গেল যে ফরাসীর অধীনে থাকাই ভাল। বর্তমান তাহিতি ফরাসীরই একটি প্রদেশ।

এই প্রসঙ্গে তাহিতির আর একটা অধ্যায়ের কথা না লিখে পারছি না। ১৯৬৩ সাল। ফরাসীরা শুরু করল তাদের নিউক্লিয়ার টেস্ট্, আর তার জন্য তারা বেছে নিল পলিনেশিয়ার শুদ্ধ ও পবিত্র নীলাকাশ, আর শান্ত সাগরকে। তুয়ামোতু দ্বীপপুঞ্জকে বাছাই করা হ'ল আণবিক শক্তির বলি হিসেবে। তাহিতি থেকে সে দ্বীপটি শ'খানেক মাইল দুরে।

পারমাণবিক পরীক্ষা একটা বিরাট ব্যাপক পরিকল্পনা। এ নিয়ে তাহিতির রাজধানী পাপীতে শুরু হ'ল কর্মতৎপরতা; ফরাসী সৈন্যরা তাহিতির বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের ঘাটি বসালো। তাহিতির অধিবাসীরা এই পারমাণবিক কেন্দ্র বসাবার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু করল, কিন্তু শেষে জেনারেল দ্য-গ্যলের যুক্তি ও পরামর্শের কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হ'ল।

এই পারমাণবিক কেন্দ্রের জন্য চাই কয়েক'শ কর্মী আর তাদের দেওয়া হবে উপযুক্ত মাহিনা; তাহিতির বন্দরকে নতুন ও বিরাট করে গঠন করা হ'ল, আর ট্যুরিস্টদের আকর্ষণ করবার জন্য গড়ে তোলা হ'ল বিরাট বিরাট হোটেল আর নয়নাভিরাম বাংলো। এইসব কাজে লেগে গেল তাহিতির যুবক সম্প্রদায়। এইভাবে পারমাণবিক কেন্দ্রের বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল তারা সবাই কাজ পেয়ে গেল, কাজেই বিদ্রোহ করবে কে?

১৯৬৬ সালে মুরুরোয়ার অ্যাটোলে প্রথম ফরাসী আণবিক বিস্ফোরণ ঘটল। মরণ বিষে ভরে উঠল আকাশ।

১৯৬৮ সাল থেকে তাহিতি আরও অনেকগুলো শাসন ব্যবস্থার সুবিধা অর্জন করল। প্যারিসে তাহিতি প্রাদেশিক সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে এক তাহিসিয়েনকেই নিয়োগ করা হ'ল। বলা বাহুল্য যে ফরাসী পারমাণবিক কেন্দ্রের স্থায়ী রক্ষার জন্য ফরাসী সরকারের বিরাট নৌ-বাহিনী বর্তমানে এখানে মোতোয়েন আছে। সৈন্য সংখ্যা চার হাজার, আর চার'শ সিভিলিয়ান; তারা সবাইই এসেছে ফ্রান্স থেকে। বেকার সমস্যা আজকাল আর নেই। অবস্থা ঠিক বিপরীত—এখানে চাই আরও, আরও কর্মী। বেকার সমস্যার সমাধান হ'ল বটে, কিন্তু সেই সাথে সাথে শুরু হ'ল বিংশ শতাব্দির দানব পল্যুশন!

তাহিতির আকর্ষণ

তুয়ামোতু দ্বীপপুঞ্জের হুয়া ও মুরুরোযা দ্বীপে পারমাণবিক বিস্ফোরণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। আর তাকে কেন্দ্র করে সেখানে গড়ে উঠেছে বিরাট শহর। তাহিতি থেকে সেই দ্বিপ অনেক দূরে, তাই তাহিতির আবহাওয়া সেদিক থেকে রক্ষা পেয়েছে। তবে এর ফলে তাহিতির তথা সমগ্র ফরাসী পলিনেসিয়ার রাজধানী পাপীতের ওপর ভীষণ চাপ সৃষ্টি করেছে। তাই পাপীতের জীবন কর্মব্যস্ত। এখানকার বিরাট এয়ারপোর্ট আর বন্দর সব সময়ই ভরপুর।

তাহিসিয়েনদের মধ্যে যারা এখনও তাহিতিতে থাকে তারা তাদের জীবনের পুরনো ছন্দ আবার ফিরিয়ে এনেছে। পাপীত থেকে মাত্র কয়েকমাইল দ্বীপের ভিতর গেলেই তা স্পষ্ট চোখে পড়ে। ঠিক কলকাতার সাথে যেমন কাকদ্বীপের তফাৎ। পাপীত থেকে মাত্র তিন মাইল দূরে—শহরের এত কাছে থেকেও যেম অনেক দূরে।

দেশ থেকে অনেক দূরে— হাজার হাজার মাইল দূরে, মহাসাগরের এক ক্ষুদ্র দ্বীপে বসে আমি যেন ফিরে পেয়েছি আমার দেশকে। এখানকার আবহাওয়াতো বটেই, বিশেষ করে এই পরিবারটির কথায় আমার ডায়েরীর পাতা ভরিয়ে ফেললেও তার শেষ হবে না। মাদাম সিয়ারী, জিল্, তেমানু, আতাপু, আভেয়া, সকলের সাথেই আমার আন্তরিকতা এখন প্রায় আত্মীয়তায় এসে দাঁড়িয়েছে। আমি কলকাতা ছেড়েছি ১৯৬৭ সালে আর এখন ১৯৭১ সাল, পৃথিবীর অর্ধেকেরও অনেক বেশি

ঘুরে এসেছি— যাচ্ছি বাড়ির পথে। এর মধ্যে পরিচিত হয়েছি বহু পরিবারের সাথে আর তাদের মায়ায় ধরা পড়েও শেষে বাঁধন ছিড়েছি। বার বার চলার পথে হোঁচট খেয়ে এখন শক্ত হয়েছি। সিয়ারী পরিবার আমাকে খুবই ভালবেসে ফেলেছে, আমিও তাদের কাছে অতি সহজ। তবে সব সময়ই নিজেকে সংযত রাখতে হচ্ছে। বার বার নিজেকে বলছি— সাবধান, অনেক হয়েছে, আর মায়ার জালে ধরা পড়ো না।

কোন একটা দেশকে জানতে হলে তার শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে, সেই দেশবাসীদের মারফৎ জানা। সিয়ারী পরিবার সেদিক থেকে আমার বিরাট সুবিধা। সাইকেল করে তো এদিক-ওদিক বেড়াচ্ছিই, আর তা ছাড়াও এই পরিবারের সাথে সাথে আমন্ত্রিত হয়েছি তাহিতির অন্যান্য আরও বহু পরিবারের মধ্যে।

সেদিন, বলতেই হবে যে আমার ভাগ্যটা ছিল অত্যধিক ভাল। সকালবেলা চা-জলখাবার খেয়ে বাইরের বাগানে ওদের কুকুরটার সাথে খেলছি। এমন সময় প্রায় দৌড়তে দৌড়তে তেমানু আমার কাছে এসে দাঁড়াল। তারপর হাসিমুখে দুষ্টুমি করে বলল,

—খুব ভাল খবর—হ্যাঁ, তোমার জন্য একটা ভাল খবর এনেছি।

আমি তার দিকে তাকিয়ে বললাম,

—বেশ বলেই ফ্যালো না, আমি ভাল খবরের জন্য সব সময়ই প্রস্তুত। তবে আমি জোর করে বলতে পারি যে তুমি চেষ্টা করলেও তোমার এমন সুন্দর মিষ্টি মুখ দিয়ে খারাপ খবর বার করতে পারবে না— অতএব বিনা দ্বিধাই বলে ফেল।

—আজকে আমার ছুটি, আর দাদার গাড়িটাও পাওয়া যাবে, কাজেই চল তোমাকে ভাল করে যা কিছু দর্শনীয় সব দেখাব।

—বেশ ভাল, এর চেয়ে ভাল খবর আর হতে পারে না, বিশেষ করে তোমার মত গাইড্ পেলে এ সুযোগ কে ছাড়ে বলো? তা তোমার বোনও আসবে নিশ্চয়ই।

না, ওর অন্য কাজ আছে—নাও, তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে পড়।

প্রস্তুত আমি হয়েই ছিলাম। দেশ ছাড়ার আগেই আমি প্রস্তুত হয়ে বেড়িয়েছি, কাজেই নতুন করে আর কি প্রস্তুত হব!

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম। ভেবেছিলাম মা হয়তো রাজি হবেন না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখলাম যে একটা বিদেশীর সাথে তাঁর যুবতী কন্যাকে ছেড়ে দিতে তাঁর এতটুকু দ্বিধা নেই। মনে মনে ভাবলাম, যে হয় আমার ওপর এদের অগাধ বিশ্বাস, আর নয়তো এরা অতি সহজ ও সরল মানুষ। কারণ যাই হোক না কেন, আমি কিন্তু খুব খুশী।

তেমানু, তাহিতির আধুনিকা, দেখতে সুন্দরী, কথায় মধুর, কাজে চতুর, ড্রাইভিংএ দেখছি বেশ ভালই হাত। কাছাকাছি সাইকেলে করে প্রায় সব জায়গাই গেছি, কাজেই ঠিক হল যত দূরে যাওয়া যায় ততই ভাল।

আমরা গ্রাম থেকে বেরিয়ে বাঁ দিকের রাস্তা ধরলাম। ডানদিকে পড়ল লাগুণ আর সাগর। তাহিতির রাজধানী অর্থাৎ পাপীত থেকে দূরে গেলে রাস্তা খুব বেশি চোখে পড়ে না। একটাই মাত্র বড় রাস্তা সমগ্র দ্বীপ পরিক্রমা করে আবার এসে পড়েছে শুরুতে। এই দ্বীপে হারানোর সম্ভাবনা নেই। দ্বীপের মাঝখানে রয়েছে বিরাট উঁচু পাহাড় আর জঙ্গল।

আমরা এগিয়ে চললাম দক্ষিণ-পূর্ব দিকে। আমাদের বাঁদিকে চোখে পড়তে লাগল সুন্দর সবুজে ঘেরা বনানী, মাঝে মাঝে ঝরণা আর নদী। গাড়ী চলছে ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে— মাঝারি গতিতে। তাহিতির সৌন্দর্যকে বার বার প্রশংসা করলেও যেন তার শেষ নেই। চোখের সামনে সিনেমার পর্দায় মত একের পর এক অনেক কিছুই ভেসে যেতে লাগলো। আর তেমানু মাঝে মাঝে আমাকে তা ব্যাখ্যা করে বোঝাতে লাগলো।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে আমরা এসে থামলাম, নারকেল ও আনারস গাছে ঘেরা একটা গ্রামে। রাস্তার ধারেই রয়েছে সুন্দর একটি পার্কিং প্লেস। দেখেই মনে হয় এটা একটা সুন্দর পিক্‌নিক স্পট্। গাড়ীটাকে পার্ক করে আমরা নেমে দাঁড়ালাম। সামনেই চোখে পড়ল একটা দরমা ঘেরা দোকান, এক বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা আনারসের রস বিক্রি করছেন। আমাদের দেখেই বৃদ্ধা উঠে দাঁড়ালেন। তেমানুকে দেখে আনন্দে বলে উঠলেন— 'কম্যাঁ ভা তু মা সেরী ?' অর্থাৎ কেমন আছিস রে খুকি ?

বুঝলাম এরা পরস্পর পরিচিতা। তেমানু আমার সাথে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিল।

—ইনি হচ্ছেন তাআমাতা, আমাদের পারিবারিক বন্ধু।

তেমানু ভদ্রমহিলার সাথে তাহিতিয়েন ভাষায় কথাবার্তা শুরু করলো। মনে হ'ল নেহাৎই সাধারণ কথাবার্তা। আমি আনারস ও কলার কাঁদিগুলো ঘুরে-ফিরে দেখতে লাগলাম—বিরাট বিরাট আনারস আর তারই গন্ধে বাতাস ভরপুর। আমি তারই মধ্য থেকে একটা বড় আনারস বেছে নিয়ে, জিজ্ঞেস করলাম,

—এটা নিতে পারি কি ?

—অবশ্যই, নেবার জন্যই তো রাখা। ভদ্রমহিলা হেসে জবাব দিলেন। আমি পকেট থেকে কিছু পলিনেসিয়ান ফ্রাংক বের করে জিজ্ঞাসা করলাম, —কত দাম ?

—সে কি কথা, তুমি তেমানুর সাথে এসেছো, আর দাম দেবে ? সে হয় না।

ভদ্রমহিলার বদান্যতা দেখে আমি মুগ্ধ হলাম। তবুও জোর করে বললাম,

—আপনার আন্তরিকতা আমি ভুলবো না, কিন্তু আপনি দাম না নিলে আমি এটা গ্রহণ করতে পারবো না।

ভদ্রমহিলা বাধ্য হলেন দাম গ্রহণ করতে। আনারসটা গাড়িতে রেখে কিছুক্ষণ পর সেখান থেকে আমরা একটা কাঁচা রাস্তা ধরে এগিয়ে চললাম। সামনেই পড়ল একটা পাহাড়ী নদী, নদীর ধার ধরে এবার চলতে লাগলাম। তেমানু বলল,

—গাছের ফাঁক দিয়ে সামনে তাকিয়ে দেখ।

তেমানুর কথা অনুযায়ী সেদিকে তাকাতেই নজরে পড়ল অতি সুন্দর একটি ঝরণা। এই ঝরণাটার উৎস হচ্ছে পাহাড়ের ওপরকার ভাইহিরিয়া হ্রদ। ওপরকার এই হ্রদ থেকে তাহিতির বিভিন্ন দিকে অনেক নদী নেমে এসেছে সমতলের দিকে, আর নীচে নামবার পথে সৃষ্টি করেছে বড় ঝরণা। তাহিতির প্রত্যেকটি ঝরণাই দেখবার মত।

ঝরণাটার কাছে আসতেই নজরে পড়ল আরও কয়েকজন ট্যুরিষ্ট, তারা চোখ দিয়ে দেখার চেয়ে ক্যামেরা দিয়েই যেন দেখতে এসেছে! ঝরণাটা ওপর থেকে নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে। অসংখ্য পাতাবাহারের গাছ আর শিমূল জাতীয় গাছের এই বনভূমির মধ্যে লুকানো এই ঝরণাটা যেন স্বর্গভূমি সৃষ্টি করেছে।

কিছুক্ষণ পরে আমরা গাড়ীতে উঠলাম। গাড়ীতে স্টার্ট দিয়ে তেমানু আমাকে জিজ্ঞাসা করল,

—তোমার যদি বিশেষ কোথাও যাবার ইচ্ছে তাকে অথবা বিশেষ কোন বাসনা থাকলে অবশ্যই আমাকে বলতে কোন দ্বিধা করো না কিন্তু।

আমি বললাম— তাহিতির সব কিছুই আমার কাছে নতুন। কাজেই যেখানে নিয়ে যাবে, যা কিছু দেখাবে, সব কিছুই আমার কাছে আকর্ষণীয়।

তেমানু এবার একটু নড়ে চড়ে বসে চিন্তা করার ভান করলো; তারপর ফার্স্ট গিয়ারে ইঞ্জিনটাকে সংযোগ কবে বলল,

—ভাল আইডিয়া—বোটানিকেল গার্ডেনে যাওয়া যাক। এখান থেকে খুব কাছে। আমার মনে হয় তোমার খুব ভাল লাগবে।

দশ মিনিটের মধ্যেই আমারা এসে হাজির হলাম পাপেয়ারি নামক আর একটি গ্রামে। পাপীতের থেকে এর দূরত্ব মাত্র পঞ্চাশ কিলোমিটার। আমাদের সামনেই নজরে পড়ল একটা বিরাট সাইন্‌বোর্ড, তাতে লেখা ম্যুজে দ্য গগাঁ এ যারদাঁ বোটনিক— অর্থাৎ গগাঁ যাদুঘর ও বোটানিকেল গার্ডেন। গাড়ীটাকে পার্ক করে আমরা ঢুকলাম সেই বাগানে। গগ্যাঁ (MONSIERUR GAUGUIN) ফ্রান্সের বিখ্যাত শিল্পী। বলাই বাহুল্য যে, তাহিতির জলবায়ু ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যই তাঁর প্রেরণার উৎস। এখানে বসেই তিনি তাঁর মাস্টারপিস্‌গুলো এঁকেছেন। তেমানু আরও জানালো যে, এই শিল্পীর সংগ্রহশালাটি রক্ষণাবেক্ষণ করেছে ফ্রান্সের একটি সঙ্গীত সংগঠন। প্যারিসের মিউজিয়ামে তাঁর কয়েকটি চিত্র দেখেছি। আর ফ্লোরেন্সে, রোমে, ভেনিসে এক শিল্পীর সাথে সাথে ঘুরেও অনেক শিল্প কর্মই দেখেছি। এ বিষয়ে আমার বিশেষ ঝোঁক নেই। আর ঠিক শিল্পকে বোঝার মত ক্ষমতাও আমার নেই। তাই তেমানুকে বললাম,

—মর্সিঁও গগাঁতো ফরাসীর শিল্পী, তাই না?

জবাবে তেমানু বললো— হ্যাঁ, তিনি ফরাসীর একজন অমর শিল্পী।

তারপর আমি তাকে অনুরোধের সুরে বললাম,

—তাহিতিতে এসে তাহিতির বৈশিষ্ট্যগুলোকেই জানতে চাই, কাজেই মিউজিয়ামে আর ঢুকবো না, কি বলো?

তেমানু বললো,— তুমি ঠিক কথাই বলেছো, বোটানিকেল গার্ডেনটা দেখবার মত, কাজেই চল গার্ডেনেই ঘোরা যাক।

গগ্যাঁ মিউজিয়ামটা বোটানিকেল গার্ডেনের ভিতরেই অবস্থিত। অতি সুন্দর একটি বাংলো। বাড়ীটাকে দেখলেই মনে হয় যে এটা এই অঞ্চলের একটা আকর্ষণীয় বস্তু। তার স্থাপত্য নিদর্শন চোখ এড়াতে পারে না। প্রকৃতির সাথে খাপ খাইয়েই এটা তৈরী। বাংলোটার চারপাশে ঘুরে তারপর আমরা ধরলাম দক্ষিণের একটি আনারস বনের পথ। বোটানিকেল গার্ডেনটাকে দেখলেই বোঝা যায় যে এর চারিদিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা। এখানকার গাছগুলোকে অন্য জায়গা থেকে আনা হয়নি, এগুলো এখানকারই অরিজিনাল।

বিরাট বিরাট গাছের ওপর অসংখ্য পাখীর কূজন, আর সেই কূজনের সাথে তবলার মত সমানে ঠেকা দিয়ে যাচ্ছে কাঠ্ঠোক্রার ঠোক্কর। এই কাঠ্ঠোক্রাগুলোকে বলা হয় মীনা পাখী। তাহিতির এটা দক্ষিণাঞ্চল। বাগানটা সম্পূর্ণ সমতল নয়। আমরা হাঁটতে হাঁটতে আরও দক্ষিণের দিকে এগিয়ে এলাম। লোকজন প্রায় নেই বললেই চলে। চারপাশে নির্জন জঙ্গল আর বুনো ফুলে ভর্তি। জীবনের ছন্দ এখানে যেন সম্পূর্ণ অন্য ধরণের; বুনো পাতা-বাহারের গাছগুলো বাতাসে কেঁপে কেঁপে উঠছে, আর তারই ফলে সৃষ্টি হচ্ছে এক অদ্ভুত শব্দ। তেমানুকে বার বার দেখছি— ওর খোলা চুল, সহজ হাসি, কি অপরূপ দেখাচ্ছে ওকে— মনে হয় তাহিসিয়েনদের রূপ খোলে বনে। যত দেখছি ততই অবাক হচ্ছি, এ মেয়ে শহরের নয়— ওর তনু যেন এ বাগানেরই একটি অংশ।

একটা টিপির মত জায়গা পেরিয়ে আসতেই সামনে পড়ল উন্মুক্ত সাগরের দৃশ্য। এখান থেকে সাগরের সেই অনবদ্য রূপ দেখে অবাক হয়ে গেলাম। বিরাট সৈকতে ছোট ছোট ঢেউগুলো এসে ভেঙে পড়ছে— মনে হচ্ছে যে সাদা পাড়, ছোট্ট ছোট্ট ঢেউগুলো সব সময় গাঢ় সবুজ রঙের শ্যাওলার সাথে খেলা করছে, আর দূরে জল থেকে পাঁচিলের মত জেগে রয়েছে কোরাল। এখানে সমুদ্রের সেই গভীরতা নেই, তার ভীষণ দাপটের ঢেউগুলোও এখানে অদৃশ্য। অতি দূরে মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে পালতোলা নৌকো। আর আমাদের বাঁদিকে সারি সারি অজস্র নারকেল বন।

অনেকক্ষণ ধরে আমরা এদিক ওদিক ঘুরে এই চমৎকার জায়গাটায় এসে দাঁড়িয়েছি। তেমানু বলল,

—একটু বিশ্রাম করা যাক। কি বলো?

—নিশ্চয়ই। এমন সুন্দর পরিবেশ আমি তো কল্পনাও করতে পারিনি। এখানে না এলে আমি তো কিছুতেই অনুভব করতে পারতাম না। —তোমাকে ধন্যবাদ তেমানু।

আমার কথা শুনে তেমানু আমার মুখের কাছে তার গালটা প্রায় ঠেকিয়ে অনুরোধের সুরে বলল,

—তাহলে দাও একটা চুমু। —আমি দ্বিধা না করে সঙ্গে সঙ্গে তার গালে একটা আদরের চুমু দিয়ে দিলাম। আমাদের দেশের নমস্কারের মত বিদেশে চুমু দেওয়াটাও একটা সাধারণ ব্যাপার। আমি আজকাল এতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি।

একটা শুকনো জায়গা দেখে আমরা বসলাম। তেমানু বসল প্রায় আমার গা-ঘেঁসে। তারপর নিজের থেকেই আমাকে শোনাতে লাগলো তাহিতির অন্যান্য তথ্য :

—জানো, তাহিতিতে ইউরোপের মত মোটেই শীত পড়ে না, এখানকার শীতকাল হচ্ছে জুন জুলাই আগষ্ট, অর্থাৎ উত্তর গোলার্দ্ধে যখন গরম, আমাদের এখানে তখন শীত। শীত মানে প্রায় এখনকার মতোই, তবে টেম্পারেচার আরও কম। জানো, তাহিতিকে, ইউরোপের লোকেরা বলে চির-বসন্তের দেশ। দ্বীপের অন্যদিকে, তার মানে পাপীতে অবশ্য মাঝে মাঝে ঝড়ো হাওয়া দেখা যায়, দক্ষিণ-পূর্ব বাতাসই তার কারণ— যাকে চলতি কথায় বলে ট্রেড উইণ্ড। সাইক্লোন, তুষারপাত, এসবের অত্যাচার আমাদের দেশে একদম নেই। ......ঘাসের ওপর কখনও চিৎ হয়ে কখনও উবুর হয়ে গড়াগড়ি খেতে খেতে তেমানু বলে যেতে লাগলো। তার কথায় একটু ছেদ্ টানার জন্য বললাম,

—জঙ্গলের মধ্যে অমন গড়াগড়ি দিচ্ছ, তা সাপ-টাপের ভয় নেই তো?

আমার কথায় সে খিল-খিল করে হেসে উঠল— তারপর বললো,

—সাপ? হ্যাঁ, সাপ আছে বটে তবে সে সাপের কোন বিষ নেই। শুধু তাই নয়, এখানকার জঙ্গলে কোন রকম হিংস্র জন্তুও নেই। এখানকার জঙ্গলে খুব বেশী হলে বনমুরগী আর কাঠবিড়ালী ছাড়া অন্য কিছু নজরে পড়বে না। জানো বিমল, আমাদের এই দ্বীপে কোনদিন মহামারী হয়নি, রোগ শোক প্রায় ছিলই না বল্‌তে হবে। আজকাল যে-সব রোগ তাহিতিতে দেখ্‌ছো সে-সব এসেছে বিদেশীদের মাধ্যমে। আমেরিকান, জার্মান, ফরাসী ইত্যাদি— তারা সব এক একটা আধুনিক রোগের ধাড়ী...।

—তার মানে? আমি অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

—এই দেখ না— তাহিতিতে যত ডিস্‌পেন্সারী আছে তার সবগুলোই প্রায় ইউরোপীয়ান, নয়তো আমেরিকান রোগীতে ভর্তি। যারা এখন এদেশে প্রথম এসে পৌঁছায় তাদের সাথে নিয়ে আসে রোগ। তাহিতির বন্দরে বা এয়ারপোর্টে ট্যুরিষ্টদের সাথে সাথে আসে বিরাট বিরাট ওষুধের ব্যাগ। ওরা কথায় কথায় ওষুধ খায়। মনে হয় ওষুধই হচ্ছে ওদের প্রধান খাদ্য— এই বলে অকারণেই তেমানু আবার

হি-হি করে হেসে উঠল, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললে— তুমি রাগ করছো না তো? তোমার কথা অবশ্য আলাদা— কারণ তুমি তো আমাদেরই মতো; শুনেছি আমাদের অরিজিনাল হচ্ছে ভারত। যাই হোক বলো-না তুমি আর কতদিন থাকবে? তেমানু আমার দিকে তাকালো; তার চোখ দুটো যেন মুক্তো, জ্বল-জ্বল করছে। ভাবটা গদ-গদ। যতটা সম্ভব আন্তরিকতার সুর টেনেই সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল।

তেমানুর দেহের দিকে তাকালুম— ওর রূপ যেন উপ্‌চে পড়ছে। উঠ্‌তি যুবতী, মনে হয় এখনও কুড়ির কোঠা পার হয়নি, এ বয়সে কে না রঙিন স্বপ্ন দেখে!

আমিও যতটা সম্ভব সহজ ভাবেই ওর কথার জবাব দিলাম—

—তোমরা যতদিন রাখবে।

আমার কথা শুনে সে আরও কাছে এগিয়ে এসে বল্‌ল,

—জানো, আমাদের বাড়ীর সবাই তোমাকে পছন্দ করে। মা তো প্রায়ই বলেন, সব বিদেশীরা যদি বিমলের মতো হোতো তাহলে...

—তাহলে বেশ ভালই হতো, তাই না? আমি ওর মুখের কথাটা কেড়ে নিয়ে জবাব দিলাম।

আমাব জুতোর ফিতেটাকে নিয়ে সে খেলতে খেলতে হঠাৎ বলে ফেলল— তোমাব কি কোন ইচ্ছে নেই?

সে আল্‌তো ভাবেই কথাটা ছাড়লো— আর আমার বুকের ভিতরটা হঠাৎ ধক্ করে উঠল। আমি ইচ্ছে করলে অবশ্য ওর কথাটা এড়াতে পারতাম অথবা রোমান্টিক্ হতে পারতাম। কিন্তু সেটা না করে সরাসরি জবাব দিলাম— মানুষ মাত্রেরই ইচ্ছা শক্তি বর্তমান, তবে সে ইচ্ছাটাকে ঠিক পথে চালানো দরকার।

—বাঃ! তাহলে আর... তেমানু অনেকটা কাঁপা গলায় আমাকে আকর্ষণ করল— বুঝলাম যে সে আমার কথাটা ঠিক বুঝতে পারেনি। ওর গলার স্বরে কাঁপ ধরেছে, কুচযুগল ঘন ঘন ওঠা-নামা করছে, প্রেমের শেষ প্রকাশ। শুকনো ঠোঁটে বার বার জিভ বুলিয়ে ভেজাতে লাগলো।

আমি পুরুষ, মনে হয় এমন পরিবেশ আর জীবনে হয়তো পাবো না,— কিন্তু নিজেকে হঠাৎ সংযত করে নিলাম— সাবধান! —সাবধান।

মনের দারুণ উচ্ছ্বাসকে চেপে রেখে বললাম— দাঁড়াও, দাঁড়াও তেমানু, অত তাড়াতাড়ি এগিও না— ধীরে।

আমার মধ্যে দেখা দিল বিচার, মনটা হঠাৎ দুভাগে ভাগ হয়ে গেল। এই সুন্দর জগৎ, এত সুন্দর পরিবেশ, আবহাওয়া অনুকূল, চারপাশে অজস্র বুনো ফুল পরস্পর পরস্পরের সাথে হেলাহেলি করে আমাকে যেন তাদেরই পথে টানছে। সমস্ত জগৎ ও প্রকৃতি আমার অনুকূল। আমার মন কামাবেগে পূর্ণ হতে লাগলো। আর দেহে

আস্তে আস্তে বিস্তার করতে লাগলো তার প্রভাব। মনের একদিক বললো— ঠিক আছে, স্রোতের অনুকূলে গিয়ে উপভোগ কর— দেশ, বাড়ী, সমাজ পরিবার থেকে অনেক দূরে— বাধা দেবে কে? সমস্ত প্রকৃতিই যেন আমার অনুকূল..।

মনের আর একদিক বলছে,— সব কিছু অনুকূল হওয়া সত্ত্বেও সাবধান! ভুলে যেও না তোমার বিবেক, কিছুক্ষণের আনন্দে যেন পরে আপশোষ না করতে হয়। মোহের কারণে বিচারকে ভুলো না...

তেমানু এগিয়ে এসে আমার গলাটা জড়িয়ে ধরলো, আমি হাত দিলাম ওর কাঁধের নগ্নাংশে। কি সুন্দর মসৃণ ওর গা। মনে হচ্ছে ও সমস্ত দেহটা দিয়ে আমাকে চাইছে। ওর গালে আর দুটো চুমু দিয়ে, আস্তে আস্তে পাশে বসলাম। তেমানু দ্বীপের একটি সহজ মেয়ে, পুরুষের প্রতি মেয়েদের আকর্ষণ— অথবা মেয়েদের প্রতি পুরুষের আকর্ষণ— এটাকে সমাজ যত বাধাই দিক না কেন, এই আকর্ষণটা যেন চিরন্তন সত্য, তাকে অগ্রাহ্য করবে কে?

তেমানুর পিঠে আদরে হাত বোলাতে বোলাতে জিজ্ঞাসা করলাম,

—সত্যি করে বলতো, তুমি কি আগে থেকেই ভেবেছিলে যে, এখানে আসবে?

—হ্যাঁ, ঠিক বলেছো।

তার কথা শুনে অনেকটা কৃত্রিম রাগের ভান করে বললাম,

—আমাকে আগে থেকে হুঁসিয়ার করে দেওয়া তোমার উচিৎ ছিল।

আমার কথা শুনে সেও অভিমানের সুরে বলল—

—তাহলে কি আসতে নাকি ছাই! আভেয়া আমাকে বলেছে যে তুমি একেবারে ঠাণ্ডা।

কথাটা শুনে আমি হো হো করে হেসে দিলাম, তারপর বললাম,

—কথাটা ঠিক্! আমি মাথাটা সব সময়ই ঠাণ্ডা রাখার চেষ্টা করি বটে। যাই হোক, শোন তেমানু লক্ষ্মী মেয়ে, তুমি তো খুব চালাক— মনে হয় আমার কথাটা বুঝতে পারবে— মন দিয়ে শোনো, আমার মনের মধ্যে যখন ভাল-মন্দের দ্বন্দ্ব দেখা দেয় সেই সময় আমি কোন রকম সিদ্ধান্ত নিই না। আমি তো তোমাদের এখানেই আছি, কাজেই একটু ভাববার সময় দাও।

আমার কথা শুনে তেমানু অবাক হ'ল,— অনেকটা ন্যাকামির সুর করে বললো— এতে ভাববার কি আছে, তোমার যদি জল পিপাসা পায় তাহলে কি চিন্তা করে জল খাও?

ওর কথাটা অদ্ভুত ভাবে আমার মনে লাগলো, তাইতো, পিপাসার সময় কেই বা জল খেতে দোমনা করে! কিন্তু জল আর প্রেম তো এক কথা নয়।

—জান তেমানু— তোমার দাদা আমাকে প্রথম দিনই সাবধান করে দিয়েছে, কাজেই সে বিশ্বাস ভাঙা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

আমার কথায় তেমানু আরও অবাক হ'ল।

—শোনো, এখানে সম্পর্কটা তোমার আমার মধ্যে, কাজেই দাদা এখানে কি করবে? আমার দাদা যখন তার ফিয়াঁসের সাথে যায় তখন আমরা তো কিছু বলি না।

—তোমার যুক্তিটা আমি মেনে নিচ্ছি— কিন্তু তোমার মা কি মনে করবেন?

—আমি তো তোমাকে আগেই বলেছি যে তিনি তোমাকে খুব প্রশংসা করেন। তিনি বরঞ্চ খুশীই হবেন, আমি মাকে ভালভাবে জানি।

—জানো তো, পরিব্রাজকদের সাথে প্রেম করতে নেই, কারণ, তারা প্রেমেব দাম দিতে পারে না। আমি তাহিতি থেকে চলে যাওয়ার পর তুমি মানসিক অশান্তিতে ভুগবে।

—মোটেই না। —ও জোরের সঙ্গে বলল— তুমি চলে গেলে তোমার স্মৃতি থাকবে আমার সঙ্গী হয়ে। —আহা! কি কথা— একেই বলে প্রেমিকা!

চালাক বটে মেয়েটা! আমার সব কথারই ও সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়ে দেয়। কথায় ওব সাথে পেবে ওঠা দায়।

অগত্যা আমাকে আরও স্পষ্টভাষী হতে হ'ল। মিষ্টি করে অথচ ভারী গলায় ওকে বললাম,

—এখন নয়, পরে।

আমার কথাটা ওর কাছে যেন এক নিরুৎসাহের বাণীর মত শোনালো। মনে হ'ল, সুন্দর একটি ফোলানো বেলুন থেকে নিঃশেষে হাওয়াটা বেরিয়ে গেল। তেমানু অনেকটা নিস্তেজেব মত হয়ে গেল। ওব আকর্ষণীয় তনু আর লাবণ্যভরা মুখে ফুটে উঠল হতাশার ভাব। নিজেকে হঠাৎ মনে হ'ল খুব রুক্ষ পাষাণ— আমাব মধ্যে যেন প্রাণ নেই। পাঁচ মিনিটের স্পর্শে ওকে হয়তো আনন্দ দিতে পারতাম, আর আমার তৃপ্তি তো বটেই। বুক ফুলিয়ে বলতে পারতাম— এই যে দেখছো— মন মাতানো যুবতীটি, এ আমারই। কিন্তু নাঃ— ঝোকে পড়ে কিছু না করাই ঠিক— বিশেষ করে হাতে যখন সময় আছে।

তেমানুকে বললাম— কি, রাগ করলে নাকি? আমার স্বভাবটা সত্যি খারাপ, আমি একগুঁয়ে আর ভী-ষণ স্বার্থপর। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে তুমি আমাকে ঠিক বুঝতে পারবে। ভাল কথা, প্রসঙ্গক্রমে তোমার কাছ থেকে কিছু জানতে চাই।

—বেশ বলো। তেমানু অনেকটা আহত গলায় জবাব দিল।

জিজ্ঞাসা করলাম,

—তাহিতির মেয়েদের সম্পর্কে কিছু বলো, বিশেষ করে যৌন মিলন সম্পর্কে তাদের কি ধারণা। এই যেমন ধর, আমেরিকা বা ইউরোপে ষোল বা আঠারো বছরের উর্ধে উঠলেই তারা স্বাধীন; যার সঙ্গে খুশী যেতে পারে শুতে পারে,

তাতে অভিভাবক বা সমাজের কোনরকম বাধার গণ্ডি নেই। দোকানে চকোলেটের মতই কিনতে পাওয়া যায় বিভিন্ন ধরণের ট্যাবলেট ও প্রটেক্‌শন— ছেলে-মেয়েরাও এ বিষয়ে খুব ফ্র্যাংক— তোমাদের দেশেও কি তাই?

তেমানু আমার কথাটা শুনে একটু ভাবলো; তারপর মাথার এলো চুলগুলোকে একটু গুছিয়ে নিয়ে তাতে ক্লিপটা আটকে দিয়ে জামাটা হাঁটু পর্যন্ত টেনে দিয়ে পা টেনে বসল। তারপর নিজেকে অনেকটা সহজ করে নিয়ে বললো—

—অবশ্যই! ওদিক থেকে বিচার করলে আমরাও ইউরোপীয়ানদের মতই খুব আপ্-টু-ডেট্। তাহিতিতো আসলে ফ্রান্সেরই একটি বহিঃপ্রদেশ। আমাদের সমাজও খুব উদার। আমরা যার সাথে খুশী শুতে বসতে পারি। এখানকার ট্যুরিস্টরাতো তাহিতি কুমারীদের জন্য পাগল। আমরাও সে কথা জানি। এখানকার মেয়েরাও সাদা চামড়া ট্যুরিষ্টদের সাথে মেলামেশা করতে কুণ্ঠিত নয়, তবে আমেরিকান বা ইউরোপীয়ানরা প্রেম বা ভালবাসাকে একান্তই দেহগত ক্রীড়া ভাবে, তাদের মধ্যে ঠিক বন্ধুভাবটাই নেই। কাজেই যারা ভদ্রঘরের মেয়ে তারা বিদেশীদের এড়িয়ে চলে। তবে ফরাসীদের কথা আলাদা, তারা মন বোঝে।

—তোমার কথার ওপর কথা বলছি বলে কিছু মনে করো না। (এটা হচ্ছে ফরাসী ভদ্রতা) আমার জানতে ইচ্ছে করছে তেমানু— এই ধর, রাস্তায় একটা বিদেশী ছেলে তোমার সৌন্দর্যে আকর্ষিত হয়ে যদি তোমাকে প্রপোজ করে তাহলে তোমার মনোভাবটা কি হবে আমাকে জানাবে কি?

—বলা মুশকিল— আমি যদি একটা লোকের সাথে সহবাস করি তাহলে আমার দাদা বা মা কিছু বলবে না— সেটা ঠিক, তবে আমার মন যদি চায় তবে উপোসীই বা থাকবো কেন?

একটু ঢোক গিলে সে আবার আরম্ভ করলো,

—আমাদের মধ্যে কোন রকম বাধা নেই বটে, কিন্তু সব সময় খুব সাবধানে থাকতে হয়, লোকে যেন মনে না করে যে আমরা নিতান্তই রাস্তার মেয়ে। সাধারণতঃ পুরুষেরা খুব স্বার্থপর, কাজেই বুঝতে পারছো...

—হ্যাঁ, তোমার কথাটা আমি খুব পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারছি। তুমি এত সহজভাবে ও খোলাখুলিভাবে আমাকে সব জানাচ্ছো যে এর চেয়ে সহজ আর কিছু হতে পারে না। যদি তাহিতির সব মেয়েরাই এমন সহজভাবে মেলামেশা করে তাহলে— সত্যিকারের ভার্জিন কুমারীর একান্তই অভাব, তাই না?

—অবশ্যই। ভার্জিন থাকা কি ভাল নাকি? জীবনে যত পুরুষদের সাথে মেলা-মেশা করা যাবে ততই লাভ, ততই অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞতা ছাড়া যারা বিয়ে করে তারা বোকা আর বিয়ের পর হয় ডাইভোর্স।

আমি বুঝলাম যে এটা নেহাৎই ইউরোপীয়ান কন্‌সেপসন্। ইউরোপে দেখেছি যে বিয়ের আগে যুবক বা যুবতীরা কম করেও ডজনখানেক বার তাদের সঙ্গী

বা সঙ্গিনী পাল্টেছে; এটাই নিয়ম, এটাই সামাজিক রীতি। তেমানু ঠিক কথাই বলেছে— পিপাসার সময় যদি কেউ জল খায় তাতে পাপ পুণ্যের কোন প্রশ্নই আসে না।

তেমানুর কাছে গোপনীয় কিছু নেই। তাহিসিয়েন মেয়েরাও তার মতই। ক্ষুধা-পিপাসার মত যৌন-সংগমও দেহের একটি চাহিদা; যে যত চতুর সে তত লাভবান। ভাল-মন্দের বিচার যারা করে তারা বোকা, সংস্কারাচ্ছন্ন; তবে হ্যাঁ, সব সময়ে সাবধান থাকাই ভাল, যত কম হয় ততই মঙ্গল, তাতে মনের শক্তি বাড়ে আর সৌন্দর্য রক্ষা হয়।

আগে বুঝিনি, ভেবেছিলাম— এশিয়ার অন্যান্য দেশের মত এরাও কুমারীত্ব রক্ষায় নিজেদের সাবধানে রাখে। কিন্তু এখন দেখছি ঠিক তার বিপরীত। এখন পরিষ্কার বুঝতে পারছি যে ইউরোপ ও আমেরিকায় তাহিতি-কুমারীদের কেন এত নাম। এ নন্দন-কানন শুধু যে ফুলে ফুলে ভর্তি তাই নয়, এখানে রয়েছে আকর্ষণীয় উর্বশী মেনকার ছড়াছড়ি। হয়তো সে কারণেই শিল্পী গগ্যাঁ তাহিতি ছেড়ে যেতে চাননি। ক্যাপ্টেন কুক্ থেকে আরম্ভ করে বর্তমান কুর্বে-কুস্ত পর্যন্ত সকলেই তাহিতির নামে পাগল।

তেমানু থামলো আমার দিকে তাকিয়ে বললো— তুমি শুধু বোকাই নয় আস্ত পাঁঠা। খিদের সময় যে খাবার কুড়িয়ে খেতে পারে না সে মহামূর্খ।

অভিমানে ভরা তেমানুর মুখশ্রীটা। রূপ যেন ফেটে পড়ছে— মনে হয় এক্ষুনি ওকে জড়িয়ে ধরে বলি— ওগো উর্বশী আমি তোমারই...

এ ধরণের পবিবেশ এই প্রথম নয়— মনকে সংযত করার মত ক্ষমতা এখনো হারাইনি— তেমানুকে আবার সান্ত্বনার স্বরে বললাম,

—তুমি যা বলছো তা' ঠিক। কিন্তু মন দিয়ে শোনো, আমাকে বুঝবার চেষ্টা কর— তোমার এই যে দেহটা এর মধ্যে লুকিয়ে আছে এক মহাসৌন্দর্য। তোমার প্রত্যেকটি অঙ্গে অঙ্গে রয়েছে রহস্য, তাকে আবিষ্কার করা চাই— তার মধ্যে আছে আনন্দ। এই যে দেখছো চারদিকে অসংখ্য বনফুল— তার মধ্যে রয়েছে এক শুদ্ধ পবিত্র সৌন্দর্য। এখন সেটাকে নিয়ে আমি যদি চট্‌কে ফেলি তাহলে সেই সৌন্দর্যকে অপমান করা হয়। আমি যত তোমাকে দেখছি ততই অবাক হচ্ছি, তোমার মত উঠতি বয়সের রূপসীর পাশে বসে নিজেকে ধন্য মনে করছি। আমি যদি শুধু তোমার দেহটাকে চাই সেটা হবে আমার ক্ষণিকের পাওয়া— সেই পাওয়ার থেকে জন্মায় নেশা আর সেই নেশা আমার মনকে আবদ্ধ করবে এক গণ্ডীর মধ্যে। কিন্তু আমি যদি তোমার স্পর্শের বাইরে থেকে তোমার মনের পবিত্রতাকে আর সহজ সরল ভাবকে প্রশংসা করি, তাতে আসবে আমার মুক্তি, তাতেই আনন্দ। তোমাকে আমি যদি শুধু তেমানু বলে ধরি তাহলে সেটা হয় ব্যক্তিগত সম্পত্তি, আর যদি মনে করি তুমি এই সহস্র বনজ সৌন্দর্যেরই একটি অঙ্গ— তাতে তোমার

ব্যক্তিত্ব রূপান্তরিত হবে এক বিশ্ব মহত্বে। একটা জন্তু, সে তার কামপ্রবৃত্তিকে দমন করতে পারে না— তাই সে জন্তু। একটা মানুষ, প্রয়োজনবোধে সে তার কাম-শক্তিকে ইচ্ছানুসারে অন্যদিকে চালনা করতে পারে, তাই সে মানুষ। কিন্তু যে মানুষ তার সংযম শক্তিকে নিজ ইচ্ছায় চালাতে না পারে— সে মানুষ হয়েও অমানুষ।

তেমানু হঠাৎ আমার কথায় বাধা দিয়ে বললো,

—তোমার কথাবার্তাগুলো ঠিক বুঝতে পারছি না।

—বুঝতে পারছো না— এটা খুব সাধারণ কথা, আরও সহজ করে বলি শোন— তুমি তো গাড়ী চালাও, গাড়ী চলে তার নিজেব শক্তিতে, তাই না?

—হ্যাঁ।

—যে গাড়ীটা চালাতে পারে সে আনন্দ উপভোগ করে। আর যে আনাড়ি অর্থাৎ চালাতে জানে না, সে এ্যাক্সিডেন্ট করে হাসপাতালে নিরানন্দে দিন কাটায়।

আমার কথায় তেমানু খিল্-খিল্ করে হেসে উঠলো।

—আমাদের মধ্যেও ইচ্ছাশক্তি বলে একটা শক্তি আছে; সেই শক্তিটাকে যে ঠিকপথে চালাতে পারে সে আনন্দ উপভোগ করে, আর যে জানে না সে নানারকম মানসিক রোগে ভোগে। যাই হোক, প্রেমে আনন্দ আছে, তবে তার চেয়েও বেশি আছে মাদকতা, মোহ আর মায়া। কি তাড়াতাড়ি যে সময় কেটে যায় তা ধারণা করা যায় না।

আমরা বোটানিকেল গার্ডেনে ঢুকেছি প্রায় সাড়ে ন'টা নাগাদ, আর এখন বাজে প্রায় একটা। এবার একটু পায়চারী করা যাক। দূরে নিস্তব্ধ সাগরের দিকে তাকিয়ে বললাম— কি শান্ত সুন্দর তোমাদের এই দেশ— তুমি ধন্য!

আমরা গা ঝাড়া দিয়ে উঠলাম। তেমানু বললো— খিদে পেয়েছে, চল কিছু খাওয়া যাক।

—অবশ্যই, সে কথা আর বলতে!

লাগুণের ধারেই অনেকটা গোলপাতার ছাউনির মত একটা বাংলোতে আমরা এসে ঢুকলাম, বলাই বাহুল্য যে এটা একটা স্থানীয় হোটেল।

আমরা ঢুকতেই ভেতর থেকে একটি দেহাতি মেয়ে বেরিয়ে এসে আমাদের সাদর আপ্যায়ন জানালো— বসুন বিশ্রাম করুন।

জানালার ধারের একটা টেবিল টেনে নিয়ে আমরা বসলাম। জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য নয়নাভিরাম। কি শান্ত পরিবেশ! এখানে বসলেই মনের সব চাঞ্চল্য দূর হয়।

আমরা বসা মাত্রই একটি লোক এসে দুটো খোলা ডাবের জল এনে দিল। এখানে ডাবের জল যে কোন শরবতের থেকে সস্তা। তেমানু জিজ্ঞাসা করলো— কি খাবে বলো।

—তুমি যা খাবে।

—ঠিক আছে। ভাহিন এদিকে এস। এই বলে সে ডাকল দেহাতি মেয়েটাকে। তারপর সে তাকে বিভিন্ন রকম মাছ ও রুটির অর্ডার দিয়ে দিল।

আমাদের দেশে 'দিদি' ডাকের মত এদেশে ভাহিন ডাকটা খুব চল। যে কোন মেয়েকে ভাহিন বলে সম্বোধন করলেই ওরা খুশী। ঠিক আমাদের বোন শব্দের মতই, কি আশ্চর্য মিল!

কিছুক্ষণের মধ্যেই টেবিলের ওপর ভাহিন দিয়ে গেল বিরাট দুটো ভাজা মাছ। এক একটা মাছের ওজন প্রায় এক কিলোগ্রাম; এরকম একটা মাছ আমাদের দেশে একটা পুরো পরিবারের খাদ্য। মাছটা দেখতে অনেকটা বাঙলার মাছের মতো, তবে রঙটা লাল। তেমানুকে জিজ্ঞাসা করলাম— একটা নিলেই হোতো; আমি তো এর অর্ধেকটাও খেতে পারবো না। সে বললো— যা পারো খাও, অর্ধেক মাছ এখানে বিক্রি হয় না— বাকিটা খাবে কে? পাপীতে এত সস্তায় পাবে না, সেখানে লোক বেশী, কাজেই খদ্দেরের অভাব নেই, টুকরো টুকরো করে বিক্রি করা চলে।

মাছের সাথে এল দু বোতল বিয়াব, লঙ্কার চাটনি, পাউরুটি আর আলুভাজা। আরম্ভ করলাম খাওয়া। আমি লক্ষ্য করতে লাগলাম তেমানুর খাওয়া, ওর খাওয়াটা সত্যি আভিজাত্যপূর্ণ। মাছের পিঠের মাঝামাঝি থেকে সামান্য অংশমাত্র সে কাঁটা দিয়ে আলতোভাবে তুলে তুলে খেল— এক পিঠের অংশটা শেষ হলে সে মাছটাকে উল্টে অন্যদিকের থেকেও তেমনি সামান্য অংশমাত্র নিলো। ঐ অংশটাই মনে হয় এ মাছের সেরা অংশ। আমি যতটা পারলাম খেলাম— অবশ্য লেজ আর মাথা বাদ দিয়ে।

দাম সত্যি সস্তা, সবকিছু মিলিয়ে পড়ল পাঁচ ডলারের মত, অর্থাৎ চারশ পলিনেসিয়ান ফ্রাংক। পাপীতে এ ধরনের খাবারের দাম কম করেও তিনগুণ বেশী। ভাহিনকে ধন্যবাদ দিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। রেস্টোরেন্টের দামটা তেমানুই দিতে চেয়েছিল কিন্তু আমি তাকে দিতে দিইনি। ওরা আমার জন্য অনেক করছে, তার ওপর আরও চাপানো ঠিক নয়। আমি তো খুব খুশী। বেশ গুরুভোজনই হ'ল।

আমরা রওনা দিলাম। বলতে গেলে এই অংশটাই হচ্ছে দ্বীপের ঠিক বিপরীত। এই রাস্তাটাই এখন ঘুরে আবার পাপীতে গিয়ে শেষ হয়েছে। অবশ্য ডানদিকে আরও একটা রাস্তা এগিয়ে গেছে, কিন্তু সেটা মাত্র কুড়ি কিলোমিটার গিয়েই শেষ হয়ে গেছে।

ফুরফুরে হাওয়ায় হাল্কা গতিতে আমরা এগিয়ে চলেছি।

তেমানুকে জিজ্ঞসা করলাম— এখন আমাদের গন্তব্য কোথায়? তেমানুর পরিকল্পনা ঠিক করাই ছিল— আমার প্রশ্ন শুনেই জবাব দিল— তুমি গ্লাস বটোম বোটে করে ঘুরেছো কি?

—গ্লাস বটোম বোট— না, মনে হয় না আমি কোনদিন তাতে পদার্পণ করেছি বলে।

—তাহলে চল, তোমার খুব ভাল লাগবে— আমারও খুব সখ। পথে আরও একটা নদী ও ঝরণা পড়ল। দৃশ্য আগের মতই নয়নাভিরাম। এবারে আমরা এসে হাজির হলাম একটা গ্রামে। গ্রামটির নাম মাহায়েনা। গাড়ীটা দাঁড় করিয়ে আমরা ঢুকলাম মাঝারি ধরনের রেস্টোরেন্টে। তেমানুর সব মুখস্ত, সোজা সে ডেস্কের কাছে এগোতেই এক ভদ্রলোক এগিয়ে এল— কি খবর তেমানু?

—ভাল আছি জঁ, এ হচ্ছে আমাদের ভারতীয় বন্ধু বিমল।

—আপনার সাথে পরিচিত হয়ে ধন্য হ'লুম, আমি বললাম।

তেমানু বললো— গ্লাস বটোম বোটের টাইম-টেবিলটা আমাকে দিতে পাবো, আমরা একটু বেড়াতে চাই।

—নিশ্চয়ই। ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি টেবিলের ওপর থেকে একটা ছোট লিফলেট বের করে দিল। তেমানু সেটার থেকে বিভিন্ন সময় দেখতে লাগলো, তারপর বললো— তিনটি পনেরো— ঠিক আছে।

মঁসিও জঁ-এর সাথে আমরা আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে, বেরিয়ে পড়লাম। তেমানু জানালো যে মঁসিও জঁ-এর স্ত্রী মণিকা তেমানুর বন্ধু। আমাদের পরবীর্তী স্টপেজ হচ্ছে পাপীত। পয়েন্ট ভেনাস।

পাপীতে ঢোকবার মিনিট পনেরো আগে আমরা আবার থামলাম পয়েন্ট ভেনাস নামক একটা জায়গায়। এখানে দ্বীপের খানিকটা অংশ মনে হয় সাগরের দিকে এগিয়ে গেছে। তেমানু আমাকে স্থান-মহাত্ম্য বুঝিয়ে দিল। এখানকার হাওয়াটা খুবই উপকারী; রোজ বিকেলে দু'ঘন্টা এখানে কাটালে অনেক দূরারোগ্য অসুখও নাকি সেরে যায়। তাহিতির এটা একটা বিশেষ দর্শনীয় স্থান। ট্যুরিস্টদের জন্য এখানে একটি সুন্দর পার্কও রয়েছে। ফটো নেওয়ার জন্য জায়গাটা খুব প্রসিদ্ধ।

এখান থেকে সাগর ও পাপীতের এক অতি মনোরম দৃশ্য চোখে পড়ল। সাগরের ধার ধরে রয়েছে অসংখ্য নারকেল গাছের বন। আব দূবে বালু-চড়ায় ঢেউ ভাঙার দৃশ্য। অনতিদূরেই নজরে পড়ে দ্বীপের চারিদিকে ঘেরা মালার মত কোরাল-ভূমি। এই পয়েন্ট ভেনাসকে তাহিতির অবজারভেটরি বলা যেতে পারে। এমন দৃশ্য দেখে মনে হয়, মাসের পর মাস কাটালেও একঘেয়েমি লাগবে না। প্রকৃতি যেন উদার করে দিয়েছে তার সৌন্দর্য ভাণ্ডার। আমি অবাক হয়ে সেই দৃশ্য দেখতে লাগলাম। তেমানুর কথায় হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিরে পেলাম। সে আমার হাত টেনে ধরে বললো— চল এবার ফেরা যাক। গ্লাস বটোম বোট ছাড়ার প্রায় সময় হয়ে এসেছে।

সাগরতল— পাপীতে এসেই আমরা গ্লাস বটোম বোটের জন্য দুটো টিকিট কিনে নিলাম। এক একটা টিকিটের দাম প্রায় দশ ডলারের মত— দু' ঘন্টার সফর।

গ্লাস বটোম বোট ঠিক যেমন নাম— ছোট-খাটো একটা লঞ্চের মত বোট যার তিনভাগের দু'ভাগই জলের তলায়। পঁচিশটা সিট, ওপরের তলাতেই মেসিন বসানো, তবে ফ্যানের মত হালটা রয়েছে পিছনের একটা স্বতন্ত্র লোহার বারের

সাথে ফিট করা। জলের নীচে একটি কাঁচঘর। (কাঁচের বদলে অবশ্য প্লাস্টিক) আমাদের চারপাশেই খোলা কাঁচের জানলা, এমনকি ভূমিটা পর্যন্ত। জলের তলায় যারা ডুব দিয়ে সেই জগৎ দেখতে পায় না তাদের জন্য এ ব্যবস্থা। যারা মুখোস পরে অক্সিজেন নিয়ে সাগর-তল দেখে তাদের কাছে অবশ্য এ জগৎ নতুন নয়, কিন্তু আমার মত যারা কোনদিনই স্কুবা ডাইভিং (Scuba Diving)-এ অংশগ্রহণ করেনি তাদের কাছে এ এক নতুন জগৎ। বোটে পঁচিশটা সিট আছে, কিন্তু আমরা মাত্র সতেরোজন— পনেবোজন আমারিকান ট্যুরিস্ট আর আমরা দু'জন।

যথাসময়ে বোট ছাড়লো। মনে হ'ল একটা লঞ্চের নীচে বিরাট একটা কাঁচঘব আটকানো। প্রথম প্রথম মনে হতে লাগলো ঠিক যেন হেলিকপ্টারে করে যাচ্ছি। আমাদের বোট যত গভীর জলে যেতে লাগলো, ততই আমরা আশ্চর্য হতে লাগলাম। কি অদ্ভুত সেন্‌সেসন! জলের নীচে যে একটা আশ্চর্য জগৎ লুকিয়ে আছে সেটা আস্তে আস্তে আমাদের চোখের সামনে ফুটে উঠতে লাগলো। এখানকার জলটা পরিষ্কার স্বচ্ছ, মাঝে শুধু শ্যাওলা ও শামুক জাতীয় প্রাণীদের বুদ্‌বুদ্ দেখা দিচ্ছে। জলেব মধ্যে আমরা রয়েছি, জলেব আভ্যন্তরীণ জগৎকে আমরা দেখছি— কিন্তু জলকে দেখতে পাচ্ছি না। এখানেই বোঝা যায় যে জলের সত্যি কোন রঙ নেই। আমাদেব চারপাশে যেন এক বিরাট চলচ্চিত্রেব জগৎ।

আমাদের মধ্যে একমাত্র তেমানু ও গাইড ভদ্রলোক ছাড়া সকলেই নতুন। কি আশ্চর্য! সমুদ্রের ওপর দিয়ে আমি দিনের পব দিন চলেছি— তার বিচিত্র ঢেউ-এব রূপ দেখে বার বার মুগ্ধ হয়েছি। উপরিভাগের ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ন্ত ও রঙিন মাছ দেখে অবাক হয়েছি। কিন্তু এ দৃশ্যকে বর্ণনা করবো কি করে! যে কোনদিন তুষারপাত দেখেনি, তাব কাছে তুষারপাতের বর্ণনা বাস্তব থেকে তাকে দূরেই সরিয়ে নিয়ে যায়। তবুও আমি লিখছি কারণ মানুষের স্পর্ধা সত্যিই শিশুসুলভ। আমাকে লিখতেই হবে। গাইড মাইকটা ঠিক করে শুরু করলো তার নাটকীয় ভঙ্গিতে লেক্‌চার: ওয়েলকাম টু আওয়ার গ্লাস বটোম ট্যুর এক্‌স্‌কারশান.. পলিনেসিয়া তথা তাহিতির সাগরতলে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দৃশ্য জগৎ। আমেরিকা বা ইউরোপের কোথাও পাবেন না এ দৃশ্য। স্থলভাগ থেকে জলভাগের দৃশ্য এক রকম, কিন্তু জলের ভেতর দেখুন সেই জগতের মধ্যে লুকিয়ে আছে আর এক জগৎ। ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ! আপনারা জানেন যে, তাহিতির নেচার হচ্ছে ভল্‌কানিক আর্কিপেলাগোস (Archipela-gos)। কাজেই তাহিতিতে যেমন দেখেছেন অসমতল পাহাড়, সেই সবটাই ছিল একদিন জলের নীচে ঢাকা। বিবাট অগ্ন্যুৎপাতের ফলে সেই ভূমি জেগে উঠেছে সাগর ছাড়িয়ে উর্ধে, সৃষ্টি হয়েছে তাহিতি। ভালভাবে লক্ষ্য করে দেখুন, আমরা সেই জিনিষই দেখছি, উঁচু-নীচু অসমতল ভূমি। ডানদিকে দেখুন সুন্দর কোরাল বন। স্পঞ্জের মতো এই যে সব ঢিপির মতো বনগুলো দেখছেন, সেগুলোই হচ্ছে কোরাল। পলিপ্‌স্ নামক অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজাণু দল বেঁধে বাস করছে এই শ্যাওলাগুলোর মধ্যে। শ্যাওলাগুলোই তাদের হাজার হাজার বছরের বাড়ী, তাদের জন্ম-মৃত্যু সব

এখানেই। এক অদ্ভুত রকমের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে সৃষ্টি হচ্ছে এই কোরাল। চেয়ে দেখুন, আমরা এখন দু'পাশের প্রবাল দেওয়ালের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। সবুজ, নীল আর সামান্য লাল রঙের খেলাগুলো ভালভাবে লক্ষ্য করুন।

—অসমতল ভূমি, নাতিশীতোষ্ণ জল, পরিষ্কার ও স্বচ্ছতা, এখানকার কোরালভূমি প্রকৃতির সুন্দরতম দৃশ্য। আমি বার বার বলছি— এমন রঙচঙে দৃশ্য আর কোন সাগরতলে পাবেন না। এখানে সাগরের ঢেউ নেই, দ্বীপের অদ্ভুত অবস্থানের দরুণ এখানে সমুদ্র শান্ত। আমাদের বোটটা কয়েক মিনিটের জন্য থামছে— ভালভাবে দেখুন বিউটিফুল কোরাল ফরমেশন। অদৃশ্য পলিপ্‌স্ নামক ব্যাক্‌টেরিয়া এখানে দিন-রাত কাজ করছে, বাজারে এই প্রবাসগুলোই পরে বিক্রি হয়। কোরাল অবশ্য সব ডুবুরীরাই কুড়োতে পারে না। এর জন্য চাই সরকারী অনুমতি। এটা তাহিতির একটা খুব ভাল ব্যবসা।

—ভদ্রমহোদয় এবং ভদ্রমহিলাদেব এবার অন্যদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি— এখন আমাদের বিষয় হচ্ছে মাছ। মাছ আপনারা অনেক দেখেছেন, অনেক খেয়েছেন— এবার দেখুন মাছের জগৎ, এটা মাছের বাজার নয়, কিন্তু মাছের জগৎ— স্বাধীনভাবে মাছেরা যেখানে আনন্দকেলি কবে। দেখুন এদের ভঙ্গি সাবলীল আর ছন্দবদ্ধ। আমাদেরই মত সমাজবদ্ধ জীব। এরা সব সময়ই তাদেব লিডারকে ফলো করে।

—আপনাদের বাঁ দিকে দেখুন দুটো বিরাট বিরাট মাছ, মনে হচ্ছে শূন্যের ওপর পাখীর মত উড়ছে। লম্বায় প্রায় সাত থেকে ন' ফুট। এ ধরণের মাছকে বলা হয় মাহিমাহি— এটা এখানকার স্থানীয় মাছ। যারা স্কুবা ডাইভিং-এ অভ্যস্ত তাদের কাছে এ ধরণের মাছ শিকার করা এক সৌভাগ্যের বিষয়। এই মাছগুলোর ওজন সাধারণতঃ কুড়ি থেকে সত্তর পাউন্ড পর্যন্ত। মাহিমাহি মাছগুলো সব সময়ই জোড়ায় জোড়ায় থাকে, অর্থাৎ মেল্ ফিমেল টুগেদার— একটাকে কোন রকমে ধরলে অন্যটাকে ধরতে খুব সুবিধে।

—ওই দেখুন, দূরে আর কয়েকটা বিরাট বিরাট মাছ। আমাদের গ্লাস বটোম বোট দেখে দেখে ওরা অভ্যস্ত হয়ে গেছে, কাজেই ওরা আর ভয় পায় না, মনে হয় ওরা আসে আপনাদের গুড মর্নিং জানাতে।

—এই মাছগুলোর নাম ওয়াহু। ভীষণ ওজন। গত মাসে পাপীতের এক জেলে খুব বড় একটা এ ধরণের মাছ শিকার করেছিল, যার ওজন একশ তিরিশ পাউণ্ড।

—তুনা মাছ হচ্ছে ফরাসী পলিনেসিয়ার বিশেষ মাছ। অনেক রকমের তুনা মাছ আছে, তার মধ্যে বিগ আই তুনা মাছ বেশ উল্লেখযোগ্য। এই ধরণের এক একটা মাছের ওজন হবে প্রায় চারশ পাউণ্ড পর্যন্ত। ইয়েলো ফিন তুনা খেতে খুব ভাল। ওপরের দিকে যে ছোট ছোট মাছের ঝাঁকগুলো দেখছেন সেগুলোই হচ্ছে ফ্লাইং ফিস্। এরা খুব বেগে জলের ওপরের দিকে উঠতে থাকে, তারপর জলের সীমা যেখানে শেষ হয়ে গিয়েছে সেখানে কিছু ওপরে উঠেই শূন্য থেকে

জলের ওপর আছড়ে পড়ে। আসলে নামেই ফ্লাইং ফিস্, এদের কিন্তু ঠিক ডানা নেই, তবে সাঁতারের জন্য যে পাখা আছে সেটাই ওরা কয়েক সেকেণ্ডের জন্য ডানা হিসেবে ব্যবহার করে। স্থানীয় লোকেরা বড় বড় মাছ ধরাব জন্য এগুলোকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করে। এ মাছের ঝোল অবশ্য খেতে খারাপ নয়। অন্যান্য মাছের মধ্যে নামকরা হচ্ছে, জ্যাক্ ক্রেভালি, রেইন্‌বো রানার, বরাকুডা ও ওসেন বেনিতো...।

গাইডের সব মুখস্ত। তোতাপাখীর মতো সে বলে যাচ্ছে আব আমরা বাধ্য ছাত্রের মত শুনে যাচ্ছি— তার কথামত তাকাচ্ছি বাঁয়ে ডাইনে বাঁয়ে নীচে ওপরে। তার কথা শুনতে শুনতে একটু একঘেয়েমি এসে গেল— তাই তার কথাকে উপেক্ষা করে নয়নভরে দেখতে লাগলাম এ সাগব রহস্যকে। মনে হচ্ছে আমরা যেন— ফরাসী জীপ করে বেরিয়েছি জঙ্গল পবিক্রমায়। এগিযে চলেছে আমাদেব জীপ, আর দুধারে আবিষ্কাব করছি নিত্য নতুন জীব-জন্তুকে।

কখনো কখনো মনে হচ্ছে সাগবতলের ভূমিটা হঠাৎ আবও অনেক অনেক নীচে নেমে গেছে। আবাব কখনো মনে হচ্ছে আমবা এগিয়ে চলেছি সুড়ঙ্গ পথে গুপ্তধনের সন্ধানে অথবা বনের মধ্যে লুকানো রাজপ্রাসাদের সন্ধানে। বোটটা কিন্তু সব সময় জলের ওপর দিয়েই চলছে, কিন্তু আমাদেব ঘরটা বয়েছে বোটেব নীচে জলের তলায়, কি চমৎকাব বুদ্ধি! কি অদ্ভুৎ সেন্‌সেশন!

এই প্রথম দেখছি জগতের মধ্যে লুকিয়ে থাকা আর এক জগৎকে। সাধাবণতঃ স্পঞ্জগুলোকে দেখেছি নরম তুল্‌তুলে আব এখন দেখছি জীবিত। সাবানের ফেনার মত সেগুলো জলেব তলায় জমে বয়েছে— তাবা নড়ছে, মনে হচ্ছে, বঙিন তুলোব মত দেহটা যেন হাওয়াব সাথে সাথে দুলছে। হঠাৎ চোখে পড়ল এক ডুবুবি, সে তাব বেঁকানো ছুবি দিয়ে প্রবাল কাটছে। প্রবাল বা কোরাল একই জিনিস, শুধু ভাষার তফাৎ। ডুবুরিব পীঠে বাঁধা অক্সিজেনের বোতল— মুখোস পরা, পাযে রবারের কৃত্রিম পাতা। লোকটি প্রজাপতিব মত এক কোরাল থেকে আর এক কোরালে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমাদের বোটের শব্দ পেয়ে সে আমাদেব দিকে তাকিয়ে হাত নড়ে সম্ভাষণ করতে লাগল। গাইড বুঝিয়ে দিতে লাগল— যে, প্রবাল অনেক রকমের হয়। জলেব তলায় নদীর ধারে, জলের ওপর— ইত্যাদি। স্থানভেদে তাদেব আকৃতিও বিভিন্ন। পৃথিবীর বাজাবে কোরালের দাম অনেক, তবে সব কোরালই কিন্তু দামী নয়। কোরালদের মধ্যে অনেকগুলি বিষাক্ত, তাদের ধরা মাত্রই হাতে ফোস্কা পড়ে যায়। কোন কোনটার স্পর্শে গায়ে চুলকানি দেখা দেয়, কোন কোনটার গন্ধে মানুষ অজ্ঞান হয়ে পড়ে। ডুবুরীরা কোরাল-বিশেষজ্ঞ, তারা জানে কোন ধরণের কোরাল বাজারে চলবে, আর তারা একমাত্র সেগুলোই কেটে আনে যেগুলোর মধ্যে কোন রকম বিষাক্ত পদার্থ নেই।

হাজার হাজার বছরের পুরোনো এক ধরণের কোরাল দামী পাথরে পরিণত হয়। ইউরোপের বহু প্রাসাদ ও গীর্জার দেওয়াল এই ধরনের কোরাল পাথরে তৈরী,

অনেকটা তাজমহলের শ্বেতপাথরের মত সেগুলোকে দেখতে। কোরাল পাথর চাষ হয় না, কারণ এক একটা কোরাল পাথরে তৈরী হতে লাগে হাজার হাজার বছর। সেগুলোকে সাগর থেকে সংগ্রহ করা হয় মাত্র। তাহিতির এই কোরাল পাথরের জগৎ-বিখ্যাত। তাহিতির এটা একটা বিরাট ব্যবসা।

আমাদের বোট আবার এগোতে শুরু করল। আহা! কি অপূর্ব দৃশ্য! মাছের বাজারে মাছের সমারোহ প্রচুর দেখেছি, কোলকাতার বাজার থেকে আরম্ভ করে পাপীতের বাজার পর্যন্ত সর্বত্র মাছ দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। পৃথিবীর সেরা সেরা অ্যাকুরিয়াম প্রচুর দেখেছি— কিন্তু সে সম্পূর্ণ অন্য রকম ব্যাপার। যারা আঙ্গুরের খেত দেখেনি তাদেব কাছে সে গল্প বলে বোঝানো মুশকিল। আমার সামনে হাজার হাজাব লক্ষ লক্ষ মাছগুলোকে— দেখছি তাদেরই রাজত্বে। হঠাৎ যেন ঢুকে পড়েছি পাতালে মাছের রাজত্বে। বাজা, প্রজা, কৃষক, মালিক সবাই এখানে মাছ। তাবা হাসছে নাচছে গাইছে— আর কোন কোনটা অবাক হয়ে আমাদেব কাচঘরে ধাক্কা খেয়ে হঠাৎ হোচট্ খাওয়াব মত বেকুব বনে যাচ্ছে। এখানেও রয়েছে স্থলভাগের মত বন জঙ্গল ফুল পোকা-মাকড়, শুধু তাদের বঙ আব আকৃতি আলাদা। মাছের এই জগতে তাদের শোভা আর সৌন্দর্য যেন অতুলনীয়। মাছের সাথে আমাদের সম্পর্ক খাদ্য-খাদকের। এখানে তাদের এই অবাধ বিচরণ দেখে মনে হয় আমরা সত্যই নিষ্ঠুর— এই সুন্দর সুন্দর জীবগুলোকে জলের থেকে তুলে ধরাই যেন এক মহাপাপ। আমি জোর করে বলতে পাবি যে, যারা মাছেব বাজত্বে ডুব দিয়ে তাদের অপরূপ সৌন্দর্য ও লীলা দেখছে তারা তাদের ডাঙায় তুলতে নিশ্চয়ই দ্বিধা বোধ কববে— ঠিক একটি রূপসী বলিকাকে কেউ যদি জলের তলায় ডুবিয়ে তার রূপ দেখতে চায় তাহলে যেমন অবস্থা দাঁড়ায়।

আমাদের বোট মাঝে মাঝে দাঁড়ায় আবার চলে ; এইভাবে আমরা বেড়াতে লাগলাম তাহিতির লাগুণে। দেখতে দেখতে দু'ঘণ্টা কেটে গেল। গাইড হঠাৎ আমাদের নিরাশ কবে দিয়ে বলল— আমরা এখন ফিরে এসেছি আবার পাপীতে। লেডিজ এণ্ড জেন্টল্‌মেন, আপানদের সহযোগিতার জন্য বিশেষ ধন্যবাদ— আবার নিশ্চয়ই দেখা হবে।

বোটের থেকে নেমে আমরা নীচে এসে দাঁড়ালাম। মনে হ'ল হঠাৎ যেন স্বপ্ন দেখে উঠলাম। জানি না আবার কোনদিন এ দৃশ্য দেখতে পাব কি না। যদি না দেখি তবে আপশোষ থাকবে না। —এ দৃশ্য কোনোদিনই ভুলতে পারব না। জলেব নীচের জগৎকে দেখতে হলে দরকার স্বচ্ছ ও পরিষ্কার জল— যার নীচে নেই কোনোরকম স্রোত। ফরাসী পলিনেসিয়ার সাগরতল সব দিক থেকেই ডুবরিদের আদর্শ।

পাপীতের একটা চীনা চায়ের দোকানে ঢুকে আমরা দু'কাপ চা পান করে বেরিয়ে পড়লাম। ধরলাম বাড়ীর পথ। সূর্য প্রায় অস্তগামী। তাকালাম তেমানুর দিকে— সূর্যের আলোয় তার শ্যামলী রাঙা মুখশ্রীটি অপূর্ব লাবণ্যে ভরে উঠেছে— চোখ

গাল আর ঠোটে ভরা যৌবনের দীপ্তি। সম্পূর্ণ একটা দিন— এই একটা দিনের বিবরণ দিয়ে সম্পূর্ণ একটা রাসভারী উপন্যাস লিখে ফেলতাম। স্থান কাল পাত্র সবই ছিল আমার অনুকুলে, হয়তো নাম দিতাম তেমানুর প্রেম। সাধারণভাবে যাকে বলে চান্স, সেটা ছিল সম্পূর্ণ আমার আয়ত্ব, হারালাম কি? মনে হয় হারানোর চেয়ে পেলাম আরও বেশী। যেটা হারালাম সেটা পার্থিব— আর যা পেলাম সেটা অপার্থিব— কোনটা লাভ?

—শুনছো। ভারী মজায় কাটলো দিনটা—

হঠাৎ কাণে এল একটা সুর— আমি তেমানুর দিকে তাকিয়েই এই সব চিন্তা করছিলাম, তার কথা শুনে নিজেকে সংযত করে নিলাম—

—অ্যাঃ কি বললে।

—ভারী মজায় কাটলো দিনটা— তাই না? সে একই কথাটাকে আর একবার বলল?

—মজা মানে? এ তো আমার কল্পনার বাইরে ছিল। সত্যি তোমাকে কি বলে যে ধন্যবাদ দেবো...

—ধন্যবাদ আর দিতে হবে না— যদি তুমি থাক তাহলে সামনের সপ্তাহে আর একবার বেরোনো যাবে, কি বলো?

আমি ওর কথায় সায় দিয়ে হেসে বললাম— তেমানু, তুমি অতুলনীয়, কিন্তু খুব সাবধান! বার বার বলছি ভবঘুরের প্রেমে পড়োনা যেন...

আমার কথা শুনে ও খিল-খিল করে হেসে উঠল, তারপর সামলে নিয়ে বলল— সে দেখা যাবে।

গাড়ী টার্ন নিল। ফা-এর রাস্তা থেকে আমরা বাঁ-দিকে গ্রামের পথে পড়লাম, সামনেই দেখা দিল তাদের বাংলো।

হারানো দেশ

সপ্তাহখানেক দেখতে দেখতে কেটে গেল। আমি ইতিমধ্যে তাহিতিতে, বিশেষ করে পাপীতে পরিচিত হয়ে উঠেছি। আমার আগে অনেক ভারতবাসী নিশ্চয়ই এখানে এসেছেন বা তাহিতি সফর করেছেন, তবে সাইকেলে করে এ পর্যন্ত যাঁরা পৃথিবী দেখতে বেরিয়েছেন তাঁদের মধ্যে নিশ্চয়ই আমি প্রথম*। আমি আগেই লিখেছি যে আমার সাইকেল সাঁতার জানে না— কাজেই সাগর, মহাসাগর পার হবার জন্য আমাকে বার বার যানের সাহায্য নিতে হয়েছে। এখানকার সরকারী পর্যটক বিভাগ আর শিক্ষা দপ্তরই আসলে আমার বিষয়ে ফলাও করে প্রচার করেছে।

ইতিমধ্যে মঁসিও আতা সাহেবের সাহায্যে আমার ভিসার মেয়াদও বাড়ানো হয়েছে; কাজেই থাকবার কোন অসুবিধাই নেই। স্থানীয় বেতার কেন্দ্রের সৌজন্যে আমি দু'বার সেখানে আমন্ত্রিত হই। প্রায় প্রত্যেক দিনই বিকেল বেলার দিকে তেমানু আতাপু বা জিল্‌কে সঙ্গে নিয়ে যাই। তাতে সিয়ারী পরিবারও খুব আনন্দিত, আর সব জায়গায়ই বলি যে আমি এখানে আমার দ্বিতীয় দেশ খুঁজে পেয়েছি, তেমানু আতাপু এরা যেন আমার ঠিক আপন জন— আমার সাথে এরাও সম্মানিত। পাপীত ইউরোপের যে-কোন শহরের তুলনায় নেহাৎই ছোট: কাজেই এখানকার চার-পাঁচটি সভায় গেলেই সম্পূর্ণ পাপীতের লোক তাকে চিনে ফেলে। রোটারী ক্লাব, ইয়াট্ ক্লাব, ইউথ্ এডুকেশন হল আর ট্যুরিষ্ট রিক্রেয়েশন সার্ভিস— এ কয়টি প্রতিষ্ঠানই বলতে গেলে এখানকার সবচেয় বড়। তাছাড়াও আছে ছোট-খাটো প্রায় ডজনখানেক বনেদি ক্লাব।

মাননীয় আতা সাহেব ও ট্যুরিস্ট বিক্রিয়েশন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই পরিচিত হলাম এখানকাব শিক্ষা-সচিব মঁসিও দেলপিয়াস-এর সাথে। ভদ্রলোক সেই সভায় সভাপতিত্ব করেন, আর আমার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ছোট্ট করে ভারত ও তাব মহান ঐতিহ্যের কথা তিনি উল্লেখ করেন। তাঁব মুখে ভারতের সুনাম শুনে নিজেকে খুবই গর্বিত মনে করলাম। সভার শেষে কথা প্রসঙ্গে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম,

—আপনি দেখছি ভারতবর্ষ সম্পর্কে খুবই জ্ঞানী, আপনি কি ভারতে গিয়েছিলেন?

—ভাবত ও তার ঐতিহ্য হচ্ছে বিশ্বের এক রত্নভাণ্ডার সে কথা কে না জানে? আমি কোনদিন ভারতে যাইনি, কিন্তু সে দেশ সম্পর্কে খুবই উৎসাহী— তিনি হেসে জবাব দিলেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম— আপনাদের এদেশে এসে অবধি বার বার আমার নিজেব দেশের কথা মনে পড়ছে, বিশেষ করে অসম বলে যে রাজ্যটি আছে তাহিতির সঙ্গে তার হুবহু তুলনা করা যেতে পারে; এমন কি এখানকার নাগরিকদের চেহারা এবং পোষাক ঠিক অসমীয়াদের মত...

ভদ্রলোক আমাকে থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন— কি, কি নাম বললেন?

—অসম পূর্ব-ভারতের একটি পার্বত্য প্রদেশ—তাঁকে বললাম। মঁসিও দেলপিয়াস আমার কথাটা শুনে একটু মাথা চুল্‌কালেন, তারপর বললেন,

—আচ্ছা নাগা এলাকাটা কোথায়?

আমি বললাম— নাগাল্যাণ্ড অসমেরই একটা বিচ্ছিন্ন অংশ বলতে পারেন। অসমের উত্তর-পূর্বে এই নাগাল্যাণ্ড, নাগাল্যাণ্ডের পর মণিপুর, তারপরই বার্মার সাথে ভারতের সীমান্ত। আপনি দেখছি সবই জানেন, ভূগোলটা মনে হয় আপনার মুখস্থ।

মঁসিও দেলপিয়াস হেসে আমার কথাটা উড়িয়ে দিয়ে বললেন

—না হে না, আমি অত জানি না, তবে ভারতবর্ষ সম্পর্কে সব সময়ই আমি খুব উৎসাহী। হ্যাঁ ভাল কথা, আপনি বুধবার দিন সন্ধ্যের পর কি করছেন?

তাঁর প্রশ্ন শুনে আমি জিলের দিকে তাকালাম— কারণ আমার যাবতীয় কর্মসূচী জিল্ অথবা তেমানু ঠিক করে। জিল্ একটু চিন্তা করে বললো— মনে হয় আমাদের কোন রকম এন্‌গেজমেন্ট নেই।

মঁসিও দেলপিয়াস— ঠিক আছে, আপনারা দু'জনে আমাদের বাড়ীতে চলে আসুন, আপনারা দু'জনেই— মনে থাকে যেন, ডিনারের জন্য নিমন্ত্রণ রইল কিন্তু। তাঁর কথা শুনে জিল্ একটু আম্‌তা আম্‌তা করতে লাগলো; ওর মনের ভাবটা বুঝতে আমাব মোটেই অসুবিধা হ'ল না, ভাবটা— আমাকে আবার এর মধ্যে কেন... কাজেই জিলের হয়ে আমিই মঁসিও দেলপিয়াসকে উত্তরটা জানিয়ে দিলাম,

—আমি যদি যাই জিল্ অবশ্যই যাবে, আমি ওকে রাজি করিয়ে নেবো; আপনি এরজন্য মোটেই চিন্তা করবেন না। আমার কথা শুনে জিল্ সম্মতির হাসি হাসল।

পাপীতেই মঁসিও দেলপিয়াসের বাংলো বাড়ী। সময়মতে আমি ও জিল্ তাঁদের বাড়ীতে এসে হাজিব হলাম। অনেকটা স্পেনদেশীয় ঢালাই ছাদেব বাড়ী, চারপাশে বাগান, আর গেটের দুপাশে রয়েছে অতি সুন্দর মিশ্র রঙের বেগণভিলিয়া গাছ। দরজার কাছে বেল টিপ্‌তেই স্বয়ং মঁসিও রোজে দেলপিয়াস নিজে দরজা খুলে দাঁড়ালেন, আমাদের সাথে করমর্দন কবে সহাস্যে ও আন্তরিকতাব সঙ্গে আমাদেব অভ্যর্থনা জানালেন। ভেতরে ঢুকতেই আরও অনেকের সাথে পরিচিত হলাম, তাঁরাও ডিনারে আমন্ত্রিত হযেছেন। মাদাম দেলপিয়াস নিজেই অতিথিদের দেখাশুনো করছেন; তিনিও সুন্দরী ও বিদুষী, তবে দেখলেই বোঝা যায় যে তাঁরা ঠিক তাহিতির আদিবাসী নন, তাঁদের রক্তে রয়েছে ফরাসীব ছোঁয়াচ্।

খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন চলেছে সম্পূর্ণ ফরাসী স্টাইলে, দু'জন ম্যাড্‌মোয়াজেল পবিবেশনে ব্যস্ত। মাছভাজা, মাছের স্যুপ্, বীফ্‌টেক্, লেগুম্, গাতো, ফ্রোমাজ ইত্যাদি কোনটারই ত্রুটি নেই; আর পানীয় হিসেবে রয়েছে ফ্রান্সের বিখ্যাত লাল মদ— যাকে বলে ভ্যাঁ দা বরদো। খেতে খেতেই আমাদের আলাপ জমে উঠল।

দেলপিয়াস মহাশয় নিজেই প্রসঙ্গটা তুললেন; আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

—আপনি তো অনেক দেশ ঘুরেছেন— আর পৃথিবীর পুরোনো শহরও প্রচুর দেখেছেন, তাই না? তাব সম্পর্কেই কিছু বলুন। —তাঁর কথা শুনে আমি বিনীত ভাবে বললাম,

—আপনাবা সবাই বিদ্বান এবং গুণীজন, কাজেই আপনাদের কাছে নতুন করে আব কি বলবো— তবুও জিজ্ঞাসা যখন করলেনই, তাহলে বলি। আমার মতে পৃথিবীর সবচেয়ে পুরোনো দেশ কোনটা ঠিক করে বলা মুশকিল, তবে তাদের মধ্যে যেগুলো খুবই নাম করা তা হচ্ছে— ইউকাটান ঈজিপ্ট বা প্রাচীন মিশর, বাবিলন বা বর্তমান ইরাক, মিনোস বা ক্রীত্, আর ভারতবর্ষতো বটেই। বর্তমানে ইথিওপিয়ার বালিতে মানুষের সবচেয়ে পুরোনো হাড় পাওয়া গেছে, গোবিতে বহু পুরোনো মামুথের কঙ্কাল পাওয়া গেছে। আমি ঐতিহাসিক নই, কাজেই এই সব সভ্যতার নিদর্শনগুলোকে জেনেরালাইজ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। মায়া মিনোস্,

অসুর, মহেঞ্জোদারো ও পিরামিড সভ্যতার যুগগুলোকে আমরা ইতিহাসের গোড়া বলে মনে করি। কিন্তু বিজ্ঞান যে গতিতে তার নিত্য নতুন আবিষ্কারের অভিযান চালাচ্ছে তাতে মনে হয় খুব শীগগিরই এই সব থিওরির ভুল ভাঙবে। তারও আগে সভ্যতা ছিল হয়তো, কিন্তু তার রূপ ছিল অন্যরকম। আজ থেকে দশ-বারো হাজার বছর আগেকার মানুষের ইতিহাস আমরা জানিনা, হয়তো একদিন সে সব কথা আমরা জানতে পারবো কে জানে এই মাটির তলায় অথবা সাগরের নীচে কি রহস্য লুকিয়ে আছে। আট্‌লান্টিকের মূল রহস্য এখনও আমাদের অজানা। শুনেছি এই ফরাসী পলিনেসিয়ার সমুদ্রতটে ডুবে আছে আর এক মহাদেশ যার নাম 'মূ' (Mu)। আমি অবশ্য সে কথা শুনেছি মাত্র, কিন্তু তার সম্পর্কে কিছুই জানি না। এই বলে আমি থামলাম। তারপর মঁসিও দেলপিয়াসের দিকে তাকিয়ে বললাম— বলুন না কিছু এই হারানো দেশ 'মূ' সম্পর্কে। আজকের তাহিতি ও ফরাসী পলিনেসিয়া প্রাচীন-হারানো সেই 'মূ' কি?

মঁসিও দেলপিয়াস আমার প্রশ্নের জবাব দেবার জন্য বললেন,

—তা ঠিক। এক কথায় বা কয়েকঘন্টার মধ্যে পৃথিবীর ইতিহাস বলা অসম্ভব। আপনি যখন জিজ্ঞাসাই করলেন তখন বলি— বছরখানেক ধবে আমি হঠাৎ হারোনো দেশ 'মূ'-এর সম্পর্কে জানতে উৎসাহিত হয়েছি। তবে তথ্যের খুবই অভাব ; এদিক-ওদিক থেকে বিচ্ছুরিত সংবাদ আহরণ করে আর কল্পনার সাহায্য নিযে মোটামুটি একটা ধারণা করেছি মাত্র, তবে তাকে সিদ্ধান্ত বলা যেতে পারে না। বিখ্যাত ইংরেজ পরিব্রাজক কলোনেল জেম্‌স্ চার্চওয়ার্ড এ সম্পর্কে কয়েকটা বইও লিখেছেন, 'দি লস্ট কন্‌টিনেন্ট অফ্ মূ', 'সিক্‌রেট ইউনিভার্স অফ্ মূ'। এ বই দুটো খুবই তথ্যবহুল। এ ছাড়াও অন্যান্য লেখকদের বই আছে, তবে সেগুলোকে ঠিক সিরিয়াস বলা যায় না।

এক ভদ্রলোক হঠাৎ প্রশ্ন করলেন— আপনি কি সত্যি বিশ্বাস করেন যে এই দেশটা একালে ছিল?

মঁসিও দেলপিয়াস— প্রথম প্রথম ঠিক বিশ্বাস করতে চাইনি, কিন্তু এ সম্পর্কে যত পড়ছি আর ভাবছি, মনে হয় আজকাল তাকে আর উপেক্ষা করা যায় না; আজকাল আমি বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছি।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম— ঠিক কোন্ অঞ্চলে এই মহাদেশটা ছিল বলে আপনাব বিশ্বাস? আমি হয়তো নাবালকের মতো প্রশ্ন করছি, কিছু মনে করবেন না আশা করি।

মঁসিও দেলপিয়াস— না না, এতে মনে করার কি আছে— আমি বল্‌ছি, প্রশান্ত মহাসাগরের ঠিক মাঝখানে অর্থাৎ তার সীমা হিসেবে ধরা যেতে পারে যে, 'মূ'-এর পূর্বে আমেরিকা, পশ্চিমে এশিয়া, দক্ষিণে অস্ট্রেলিয়া ছিল। অর্থাৎ প্রশান্ত মহাসাগরের ঠিক মাজখানে ছিল এই বিশাল 'মূ' নামক স্থলভাগটি। একে দেশ না বলে বলতে হবে মহাদেশ। পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ অগ্নি ও প্রলয়ের ফলে

আমরা সেই মহাদেশটিকে হারিয়েছি। ভূ-খণ্ডটি ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছিল আর তারই ফলে সম্পূর্ণ মহাদেশটি টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে সমুদ্রের ওপর; তারই ফলে সৃষ্টি হয়েছে ছোট ছোট অসংখ্য দ্বীপ। পাক্ দ্বীপ—তাহিতি—বোরো বোরো—হাওয়াই ইত্যাদি শয়ে শয়ে দ্বীপগুলোর সৃষ্টি হয় সেই বিস্ফোরণের ফলেই।

আর একজন হঠাৎ বলে উঠল— কিন্তু ঐতিহাসিকরা তো সে কথা বিশ্বাস করতে চাইছেন না।

মঁসিও দেলপিয়াস— বিশ্বাস করতে চাইছেন না, তাব কাবণ এখনও উপযুক্ত প্রমাণ সংগৃহীত হয়নি, আর এ বিষয়ে ব্যাপক গবেষণাও এখন পর্যন্ত কেউ করেনি। পৃথিবীর ইতিহাস আব সভ্যতাব ভিত্তি নিয়ে আমাদের ঐতিহাসিকবা অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে, তাদেব বুদ্ধি দিযে, আর কোটি কোটি টাকা খবচ কবে, বছবের পর বছব ধবে গবেষণা চালিয়ে বর্তমান সিদ্ধান্ত খাড়া করেছেন। ঠিক সেরকমভাবেই মনে হয় আস্তে আস্তে 'মূ' বা সেই হারানো মহাদেশের বিষয়েও গবেষণা শুরু হবে। ঐতিহাসিকরা বর বৈজ্ঞানিকরা এখনও এ বিষয়ে ভাবতে শুরু করেননি, কিন্তু মনে হয় খুব শীগ্‌গিরই তাঁবা এ বিষয়ে সিরিয়াস্‌লি ভাবতে আবম্ভ কববেন। আমি নিজেই কি আগে বিশ্বাস কবতুম নাকি?

—আপনাব বিশ্বাসেব মূল কারণটা কি? —আমি ফস্ কবে প্রশ্ন করে বসলাম।

—কারণ— ভূগোল-বিশেষজ্ঞেরা সবাই একমত যে পৃথিবীব এই বিচ্ছিন্ন মহাদেশগুলো এককালে সন্নিবদ্ধ ছিল, তাবপর প্রাকৃতিক দুর্যোগেব ফলে অথবা আভ্যন্তবীণ ভীষণ বিস্ফোবণেব ফলে সেগুলো ফুটি-ফাটাব মত ছড়িয়ে পড়েছে। এইভাবে নতুন দেশ যেমন জেগে উঠেছে, ঠিক তেমনি বহু দেশ সাগবের তলায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। আটলাণ্টিড ও 'মূ' নামক দুটি মহাদেশ সেই ভাবেই আটলাণ্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগবের বুকে বিলীন হয়ে গেছে। গুয়াডেমালাব 'মায়া'-সভ্যতার প্রাচীন প্রস্তবলিপিতে এই হারানো মহাদেশেব বহু উল্লেখ আছে। মিশবেব পিরামিডে আর সূর্যমন্দিরের দেওয়ালেব লেখা থেকেও এই হারানো মহাদেশেব উল্লেখ পাওয়া যায়। কলোনেল চার্চওয়ার্ড লিখেছেন যে ভাবতবষের বহু পৌরাণিক গল্পে ও তাদের মহাকাব্য রামায়ণে এই হাবানো দেশেব উল্লেখ আছে। আপনি কি এ বিষয়ে কিছু বলবেন— এই বলে মঁসিও দেলপিয়াস হঠাৎ আমার দিকে তাকালেন। আমিও সহাস্যে বললাম— রামায়ণ আমাদের মহাকাব্য আর অন্যতম প্রধান ধর্মগ্রন্থও বটে। ছোটবেলা থেকেই আমরা রামায়ণের সাথে পরিচিত, বহু রূপকথা আর অলৌকিক ঘটনায় তা' পূর্ণ, তার সাথে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে ভারতীয় দর্শন। রামায়ণের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি তথ্য আমার মুখস্ত নেই, কাজেই ঠিক বলতে পারছি না— তবে রামায়ণের মধ্যে বহু দেশ-বিদেশের কথা আমরা জানতে পারি, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। আমাদের দুটো মহাকাব্য রামায়ণ আর মহাভারত— ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে এর তুলনা নেই। শুধু ভারবর্ষেরই নয়, তার আশ-পাশের বিভিন্ন দেশ ও তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থার অনেক বিবরণ আমরা তাতে পাই।

—তোমাদের ভারতবর্ষের মূল ধর্ম কি?— এক ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন।

—বর্তমানে ভারতবর্ষ সেকুলার কান্ট্রি, সব ধর্মকেই আমরা সমানভাবে শ্রদ্ধা ও স্বীকার করি। বহুকাল ধরে ভারতবর্ষ বিদেশীদের অধীনে ছিল, তাই বিদেশী ধর্মের প্রভাব খুবই বেশী। মুসলমান রাজত্বের সময় ভারতবাসীদের অনেক সময় জোর করে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়— বিদেশী অত্যাচারের কথা আমি আর নাই বা বললাম। তবে অধিকাংশ ভারতবাসীর ধর্ম হিন্দু। হিন্দু কথাটা অবশ্য এসেছে সিন্ধু থেকে— এককালে যেটা ছিল ভারতের সীমা। আদি ধর্ম বলতে বলা হয় সনাতন ধর্ম। এই দেহস্থ আত্মার সাথে বিশ্বাত্মার মিলনই হ'ল সেই ধর্মের মূল কথা। বহু রূপের মধ্যে সেই এক ব্রহ্মকে উপলব্ধি করাই ভারতবাসীদের ব্রত। বহু পথ দিয়ে সেই একই লক্ষ্যে পৌঁছানোই হচ্ছে আমাদের আদর্শ। জগতের প্রত্যেকটি পদার্থের মধ্যে যেমন লুকিয়ে আছে অণু-পরমাণু, ঠিক তেমনি আমরা বিশ্বাস করি যে প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে লুকিয়ে আছে সৃষ্টিকর্তার রহস্য, আর তাকে জানলেই হয় ঈশ্বরানুভূতি বা শুদ্ধ আনন্দ।

আমি আমার কথা আর বাড়াবো না—জানেন তো পরিব্রাজকরা সাধারণতঃ বেশী কথা বলে। মঁসিও দেলপিয়াস, আপনি সেদিন বলছিলেন যে আপনি নাগাল্যাণ্ডের কথা শুনেছেন— তাদের সাথে নাকি আপনাদের অনেক কথার মিল আছে—

—অমি ঠিক সেই কথা বলিনি, আমি বলেছিলাম বিভিন্ন সিম্বল বা প্রতীকের কথা। মধ্য আমেরিকার 'মায়া' সভ্যতাব সাথে ভারতীয় সভ্যতার অনেক মিল, 'মায়া' শব্দটার অর্থ ঠিক কি এদেশের কেউ তা জানে না, অথচ ভারতীয় দর্শনে 'মায়া' একটি রহস্যজনক শব্দ। বিভিন্ন সর্পাকৃতির চিহ্নকে বলা হয় 'নাকাল'। ভারতবর্ষে নাগ একটি দেবাতার স্থান অধিকার করে আছে। ভাবতের 'নাগা' আর মায়া সভ্যতার 'নাকাল' এই দুটো শব্দ সম্ভবত একই উৎস থেকে এসেছে। শুধু তাই নয়, আমি গত বছর ক্যালিফোর্ণিয়ার এডিসনে অদ্ভুত একটা ছবি দেখেছি। ছবিটা এখনও আমার চোখের ওপর ভাসছে—সেই ছবিটা ছিল ভারতীয় কোন এক দেবতার। আমি তার বর্ণনা দিচ্ছি... ...চারিদিকে জল—মনে হয় একটা মহাসাগর, তারই ওপর একটা বিরাট সাপের দেহ জলে ভাসছে। সেই দেহের ওপর শুয়ে আছেন একটি রূপবান পুরুষ আর তাঁর নাভি থেকে বেরিয়েছে একটি পদ্মফুল, সেই ফুলের ওপর বসে আছেন একটি তিন-মুখী পুরুষ। তাঁদের সকলকে ছায়ার মত রক্ষা করছে পাঁচ-মাথাবিশিষ্ট একটি বিরাট সাপ। আমি আসলে ছবিটার কিছুই বুঝিনি, কিন্তু মায়া সভ্যতার অনেক পিরামিড আমি ঘুরেছি, কাজে এই ছবিটা পরিষ্কারভাবে 'মায়া' সভ্যতারও পূর্বে 'মূ' সভ্যতার কথাই ব্যক্ত করছে। আপনার কি মনে হয়?

—আমি প্রথমেই বলেছি যে 'মূ'-এর প্রসঙ্গে আমি কিছুই জানি না, দু'একবার তার কথা শুনেছি বটে। তবে মেক্সিকোর চিচেন ইচ্ছায় 'মায়া' সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ দেখেছি। সেখানে প্রাসদের ভগ্নাবশেষের এদিক ওদিক, বিশেষ করে প্রাচীর-গাত্রে সাপের মূর্তি আমি লক্ষ্য করেছি। আপনি যে ছবিটার বর্ণনা দিলেন সেটা হিন্দুদের

একটা পরিচিত দেবমূর্তি। সেই ছবিটার নাম হচ্ছে অনন্ত শয্যা। পৃথিবীতে প্রথমে কিছুই ছিল না—তারপরে এসেছে জল, সেই জলের ওপর ভগবদিচ্ছায় দেখা দিল জীবাত্মা তারপর আস্তে আস্তে শুরু হ'ল এই জগৎ। আদি পুরুষ নারায়ণ; তাঁরই ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে প্রকৃতির ওপর মায়া-বলে শুরু হ'ল সৃষ্টি...

—এক মিনিট! আপনি বললেন 'মায়া'—এই জিনিসটা কি? মাদাম দেলপিয়াসের প্রশ্নে আমি আবার শুরু করলাম—

—আমি দার্শনিক নই, তবুও চেষ্টা করছি দু-এক কথায় বোঝাতে। ইংরেজিতে অনেক সময় মায়াকে বলা হয় ইল্যুশন। কথাটা ঠিক নয়; ভারতীয় ধর্মের মত মায়ারও কোন ইংরেজি প্রতিশব্দ নেই, রেলিজিয়ান আর ধর্ম এক কথা নয়—মায়া আর ইল্যুশনও এক নয়। এই বিরাট বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে প্রতি মুহূর্তে ভাঙ্গা-গড়ার খেলা চলছে। নদীর এক পার ভাঙছে আর অন্য পার গড়ছে, জল তার রূপ পালটে ঢেউ হচ্ছে; মেঘ চল হচ্ছে, কুঁড়ি পরিবর্তিত হচ্ছে ফুলে; আমাদের দেহে প্রতি মুহূর্তে লক্ষ লক্ষ কোষ পরিবর্তিত হচ্ছে। আরও আশ্চর্য দেখুন—মরুভূমির যেখানে জল নেই সেখানে ভুলবশতঃ দেখছি মরীচিকার হ্রদ, দড়িকে সাপ ভেবে চমকে উঠছি, কল্প জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে আনন্দ পাচ্ছি, পরক্ষণেই আবার দুরবস্থায় দুঃখে কেঁদে উঠছি.. ...এই ধরণের বহু বহু উপমা আর ঘটনায় আমাদের জগৎ ভরপুর। এই যে বিরাট পরিবর্তন, এই যে চঞ্চলতা, তার পিছনে নিশ্চয়ই আছে এক ক্রিয়াশক্তি, অদৃশ্য বল, যাকে দেখা যায় না, ছোঁয়া যায় না, অথচ তারই ফলে এ জগৎ চঞ্চল। আমরা তাকে বলি মায়া-বল। পুরুষ আর প্রকৃতি মায়া-বলে চগৎ সৃষ্টি করেছে। আবার জগতের যাবতীয় আকর্ষণই হচ্ছে যাবতীয় পদার্থ ও সরায়ন প্রক্রিয়ারমূল কারণ। কাজেই অদৃশ্য সৃষ্টির মূল কারণস্বরূপকেই বলে মায়া। মধ্য আমেরিকার এই যে বিরাট সভ্যতা এককালে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল, মনে হয় সে যুগের পণ্ডিতেরা এই মায়া শব্দের যথার্থ ব্যাখ্যা জানতে ন। তাঁরা জানতেন যে এককালে তা ধ্বংস হয়ে যাবে, কাজেই এই বিরাট প্রাসাদ আর স্থাপত্যের প্রতি অতি-আকর্ষণ না থাকাই ভাল; কারণ জগতের সব পদার্থেরই ধ্বংস অনিবার্য। আকর্ষণের ফলে সৃষ্টি হয় ভালবাসা, মমতা, স্নেহ—এ সবই আসলে মায়া। কারণ এই চিরচঞ্চল জগতে কোন কিছুই স্থায়ী নয়; ছোট অণু থেকে আরম্ভ করে বিরাট সূর্য পর্যন্ত সবই চঞ্চল আর অস্থির। পরিবর্তনশীল জগতে স্থায়ী কথাটাই একটা বিরাট মিথ্যা। বিজ্ঞানী আইনস্টাইন অতি সুন্দরভাবে সে কথাটা পাশ্চাত্য ভাষায় বলে গেছেন—সবই রিলেটিভ অর্থাৎ তুলনামূলক। সেই বিরাট মহাদেশ 'মূ' হয়তো একদিন ছিল, কিন্তু তার চিহ্ন বিলুপ্ত হয়েছে, সৃষ্টি হয়েছে নতুন জগৎ—এরই নাম 'মায়া'। যদি সম্ভব হয় আমি দেশে গিয়ে আপনাদের লাইব্রেরীর জন্য এই সম্পর্কে কয়েকখানা বই পাঠাবো। ভারতবর্ষের অন্যতম অমর দার্শনিক শ্রীশংকরাচার্য প্রবর্তিত মায়াবাদের অনেক ইংরেজি সংস্করণ আছে, ফরাসী ভাষায়ও নিশ্চয়ই থেকে থাকবে, কিন্তু আমি তা জানি না। ফিরে আসা যাক নাগের কথায়। প্রাচীন ইতিহাসে

সর্পদেবতার প্রাধান্য ছিল অপরিসীম—মিশর, ক্রীত্, ভারতবর্ষ, চীন, থাইল্যাণ্ড ইত্যাদি দেশগুলির পৌরাণিক ইতিহাস ও মিউজিয়ামগুলিই তার সাক্ষী।

—হ্যাঁ, সেটাই ইতিহাসে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য স্বাক্ষর।— মঁসিও দেলপিয়াস সুর টেনে বললেন— পৃথিবীর যে সব দেশে পুরোনো স্থাপত্যের নিদর্শন আছে সে সব জায়গাতেই সর্প দেবতার ভগ্ন-স্তূপ অথবা ছোট-খাটো চিহ্ন বর্তমান। ভারতবর্ষ, ক্রীত্, ঈজিপ্ট, এ সবের ইতিহাস শুরু হয়েছে বড় জোর তিন হাজার খৃস্টপূর্বে, কিন্তু হারানো দেশ 'মূ'-এর ইতিহাস তারও অনেক অনেক আগেকার কথা। প্রায় দশ-বারো হাজার খৃস্টপূর্বে 'মূ'-এর কথা আমরা পাই। যেহেতু এই 'মূ' মহাদেশে সর্পদেবতা, সূর্যদেবতা, ধরিত্রী দেবতা ইত্যাদির প্রভাব ছিল অত্যধিক রকমের—সেহেতু তার পরবর্তী কালের সভ্যতাগুলোতে তারই স্পষ্ট ইঙ্গিত পাই।

—আপনি 'মূ' নামক সেই হারানো মহাদেশের সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলুন না। আমি তাঁকে অনুরোধ করলাম। তিনি আমার কথা শুনে বললেন—

—আমার বলতে কোন আপত্তি নেই, কিন্তু এই বিকেলে আমার কথাই প্রধান হয়ে উঠছে—আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে তো... এই বলে দেলপিয়াস মহাশয় এদিক ওদিক সকলের দিকে তাকালেন— উপস্থিত সকলেই মনে হয় এ-বিষয়ে উৎসাহী এবং দেলপিয়াস মহাশয়ের জ্ঞানভাণ্ডারেও তাঁদের অগাধ আস্থা—আস্তে আস্তে দেখলাম সকলেই রাজি হয়ে গেলেন।

ভদ্রলোক ফরাসী মদের গ্লাসটায় চুমুক দিয়ে আল্তো করে ভেজা গোঁফের ওপর সৌখিন রুমালটা বুলিয়ে তারপর শুরু করলেন,

—আমি জানি যে অনেকেরই হয়তো একঘেয়ে লাগছে, কিন্তু দে মশাই হচ্ছেন আমাদের প্রধান অতিথি, কাজেই তাঁর অনুরোধ রাখতে আমি বাধ্য; তবে আমি যতটা সম্ভব সংক্ষেপেই বলবো।

'মূ' মহাদেশের অবস্থান সম্পর্কে আমি আগেই বলেছি, তার কথা আমরা বিভিন্ন প্রাচীন সভ্যতার শিলালিপিতে এখনও পাই। সেই মহাদেশটা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়ে সমুদ্র-গর্ভে বিলীন হয়েছে আর তার কিছু কিছু অংশ ছোট খাটো দ্বীপের আকারে এখনও সাক্ষী আছে। বিশেষ করে মানগাইয়া, তোংগাতাবু, পানামে, পাক্দ্বীপ— এই সব দ্বীপগুলোর বিভিন্ন ভগ্নাবশেষ এখনও তার প্রমাণ। অবশ্য 'মূ' ইতিহাসের সবে সন্ধ্যা মাত্র।

উত্তরে হাওয়াই আর দক্ষিণে পাক্দ্বীপ (ইস্টার আইল্যাণ্ড), তারই মধ্যে ছিল বিরাট সমতলভূমি, পূর্ব থেকে পশ্চিমে তার দূরত্ব ছিল প্রায় আট হাজার মাইল, আর উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত ছিল প্রায় পাঁচ হাজার মাইল। সোনালী সবুজে ঘেরা ছিল এই দ্বীপটি। মানব সভ্যতার গোড়াপত্তন হয় আসলে এই দ্বীপে; আধুনিক বিজ্ঞানীদের ক্রমবর্ধমান 'বাঁদরের থিওরি' এক্ষেত্রে সত্যি অচল। যারা মনে করে যে মানুষের উৎপত্তি হয়েছে বনমানুষের থেকে, তারাই আসলে এই 'মূ' মহাদেশ তত্ত্বসন্ধানের বিরোধী, কারণ তাদের সেই থিওরি আসলে একটা ধারণা মাত্র। উপস্থিত

বন্ধুরা আমাকে মাপ করবেন, আমি এ কথাটা বলতে বাধ্য হচ্ছি। বনমানুষের সঙ্গে যত নিকট সম্বন্ধই থাকুক না কেন, আসলে মানুষের উৎপত্তি বাঁদরের থেকে হয়নি। মানুষের প্রথম আবির্ভাব ঘটেছে এই মূ-মহাদেশে, সহজ সরল আর ছন্দময় ছিল তাদের জীবন-যাত্রা। ভগবান সরাসরি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির সেই আদিকালে মানুষ ছিল দার্শনিক, প্রকিতির সাথে ছিল তার নিকট সম্বন্ধ। তারপর যত দিন যেতে লাগলো ততই মানুষের মনে আস্তে আস্তে ঢুকলো পাপ, হ'ল ছন্দপতন। বন-মানুষের থিওরিটা আমাদের আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতবাদ—সব ঐতিহাসিকরা সে কথা স্বীকার করেন না। প্রাচীন দেশগুলির মাইথ'লজি স্টাডি করলেই পাওয়া যায় পৃথিবীর সত্যিকারের ইতিহাস, পৌরাণিক গল্পগুলো যতই অলৌকিক ঘটনাপূর্ণ হোক না কেন, তারই মধ্যে পাওয়া যায় মানুষের ইতিহাস। পুরানো বাইবেল, ভারতবর্ষের রামায়ণ মহাভারত, ঈজিপ্টের নীল নদীর রূপকথা, গ্রীসের আদি ইতিহাস আর 'মায়ার' ধ্বংসাবশেষ, সব এক কথাই বলে; অর্থাৎ মানুষকে সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সরাসরি সৃষ্টি করেছেন; কোন ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানুষকে আসতে হয়নি। যত দিন যাচ্ছে ততই আমরা তার প্রমাণ পাচ্ছি। সে অবশ্য অন্য প্রসঙ্গ। আসা যাক্ অবার মূ-এর প্রসঙ্গে।

সেই মহাদেশটির লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ৬৪,০০০,০০০; নৌবিদ্যায় তারা ছিল খুবই উন্নত, স্বাস্থ্য সৌন্দর্যে তাদের দেহ ছিল উজ্জ্বল, ধরিত্রী দেবী ছিলেন তাদের প্রধান উপাস্য দেবতা। অর্ধসূর্য ছিল তাদের নিশান-চিহ্ন। সেই 'মূ'-বাসীদের ভাষা ছিল খুবই উন্নত ধরণের, মায়া ও নীল সভ্যতার অনেক শিলালিপিতে তার উল্লেখ আছে। তারা আস্তে আস্তে সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো—আর তাদেরই সাথে সাথে মূ-সভ্যতাও।

মূ-এর মানুষরাই পৃথিবীর আদি মানুষ—সে কারণেই পৃথিবীর যেখানেই তারা বসবাস করেছে সেখানেই তাদের সেই চিহ্ন রেখে গেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের এই বিরাট দূরত্ব সত্বেও তাই আমরা পাই একই সূত্র অথবা একই দেব-দেবী বা রূপকথা। আপনি কি বলেন দে মশাই?— এই বলে ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে একটু বিশ্রাম নেবার জন্য থামলেন। আমি তাঁর এই ধরণের কথায় সত্যি অবাক হয়ে গিয়েছি; তাঁর ব্যাখ্যাগুলোকে অস্বীকার করতে পারি না। তাঁরই সুরে সুর মিলিয়ে বললাম—

—আপনার যুক্তিগুলো খুবই চমৎকার। কথাটা ঠিক, কারণ ক্রীত্ দ্বীপের ন্যাস্‌নাল মিউজিয়ামে আর আমাদের দিল্লীর ন্যাসনাল মিউজিয়ামে রাখা অনেকগুলো ছোট-খাটো প্রাচীন মূর্তির গঠন ও প্রকাশভঙ্গী একই রকম দেখেছি, বিশেষ করে মহেঞ্জোদারোর কয়েকটি ছোট ছোট মডেল ও অলঙ্কারের সাথে মিনোসের অনেক বস্তুর অদ্ভুত সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছি। আবার হরপ্পার একটি পুরুষমুখের মডেলের সাথে মেক্সিকোর মায়ার ধ্বংসাবশেষের প্রাচীরের কয়েকটি মুখেরও অদ্ভুত রকম মিল লক্ষ্য করেছি, বিশেষ করে গঠন ও আকৃতি দেখে মনে হয় যেন একই শিল্পীর তৈরী।

আড়াই হাজার খৃস্টপূর্বে তখন কিভাবে যে এই দুই সভ্যতার মধ্যে যোগাযোগ ছিল; তা ভাবলেও আশ্চর্য লাগে। আবার ইস্টার আইল্যাণ্ড বা পাক্ দ্বীপের পাহাড়ের গায়ের কিছু প্রচীন লেখার সাথে নীল নদের সভ্যতা, বিশেষ করে সেখানকার কয়েকটি দেয়ালের প্রাচীন লেখারও হুবহু মিল দেখেছি। আমি অনেক ভেবে শেষে বুঝলাম যে, মানুষ যেখানেই থাক না কেন, তাদের মধ্যে কোন রকম ভাবের আদান-প্রদান না থাকলেও প্রকৃতির গুণেই তারা শেষ পর্যন্ত একই ভাবনা ভাবে অর্থাৎ একই সত্যে তারা উপনীত হয়। কারণ জগতের সৃষ্টি রহস্যযত মতবাদেই বিভক্ত হোক না কেন, মূল সত্য তো একই। যেমন— দেশ কাল ভেদে মানুষ যত রকম ধর্মের সৃষ্টিই করুক না কেন, আসলে মূল সত্য এক অর্থাৎ ঈশ্বর এক, একমেবাদ্বিতীয়ম্। মঁসিও দেলপিয়াসের কথায় এখন আমিও একমত যে এক বিরাট প্রলয়ের ফলে এই 'মূ' ও পৃথিবীর অন্যান্য ভূ-খণ্ডে এক বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হয় আর তাতেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে সেই মূ-সভ্যতা, কিন্তু তার অস্পষ্ট ইঙ্গিত এখনও পৃথিবীর বুক থেকে লুপ্ত হয়ে যায়নি। পৃথিবীর সৃষ্টি-রহস্যে যে মূলতঃ ভগবানের হাত এবং মানুষকে যে ভগবান সরাসরি মানুষ হিসেবেই সৃষ্টি করেছেন সে কথা প্রত্যেক হিন্দু মাত্রেই স্বীকার করে। আমাদের উপনিষদ্ রামায়ণ মহাভারত সেই কথাই বলে।

শুধু একবার নয়, পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি হওয়ার পর অনেকবার এই ভূ-খণ্ডের ওলোট-পালট হয়ে যায়। বৈজ্ঞানিকরাই সেই কথা বার বার বলেছেন— কাজেই মূ-এর অনেক প্রমাণ হয়তো সমুদ্রগর্ভে এখনও পাওয়া যাবে। সমুদ্রগর্ভ অভিযান আজকাল সবে শুরু হয়েছে; মনে হয় খুব শীগগিরই এ সম্পর্কে নতুন আবিষ্কার জগৎকে স্তম্ভিত করে দেবে। মঁসিও দেলপিয়াস আমার বক্তব্যের সঙ্গে তাঁর মন্তব্য জুড়ে দিলেন।

রাত বেশ হয়েছে, অনেকেরই দেখছি ঘন ঘন হাই উঠছে— চোখ রগরাচ্ছেন কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে কিছু বলতে পারছেন না। বিকেলটা মঁসিও দেলপিয়াস ও আমার কথাবার্তার মধ্যেই কাটলো। তাই আমি বিনীতভাবে অন্যান্য ভদ্রলোকদের উদ্দেশ্যে বললাম,

...আপনারা নিশ্চয়ই একঘেয়েমির মধ্যে আজকের সন্ধ্যেটা কাটালেন, তাই না? আমার আগেই সে কথাটা ভাবা উচিৎ ছিল— অপরাধ নেবেন না কিন্তু...

—না না, কি যে বলছেন—এই ধরণের আলাপ-আলোচনার জন্যই তো আজকের এই আমন্ত্রণ ছিল। আসলে এরা সবাই আমার বন্ধু, এরা জানেন যে একবার আমি যদি 'মূ'-এর কথা আরম্ভ করি তাহলে আর কেউ আমাকে থামাতে পারেন না—'মূ' সম্পর্কে জানা—এটা আমার একটা নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তিনি থামতেই আমি জিজ্ঞেস করলাম—

—এ সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ, আপনার আলোচনা আমাকে একটা নতুন পথের সন্ধান দিল—- এর জন্য সত্যি অজস্র ধন্যবাদ। হ্যাঁ, ভাল কথা, এ সম্পর্কে লেখা কয়েকটা বই-এর নাম আমায় দিতে পারেন?

—নিশ্চয়! নিশ্চয়! এই বলে ভদ্রলোক তাঁর পাশের ঘরে গিয়ে কয়েকমিনিটের মধ্যেই ফিরে এলেন; তাঁর হাতে কয়েকটি বই। তিনি আমার কাছে এসে বললেন,

—আমি দুঃখিত, আমার কাছে কোন ইংরেজি বই নেই, কিন্তু ফরাসী বইগুলোর কয়েকটির নাম বলছি। এসবের ইংরেজি অনুবাদ নিশ্চয়ই বাজারে আছে বলে মনে হয়।

আমি তাড়াতাড়ি পকেট থেকে নোটবইটা বের করে বইগুলোর নাম লিখে নিলাম।

Mu, le Continent Perdu, L'univers Secret de Mu এ দু'টো বই-এর লেখক Colonel James Churchwood। অরিজিনাল বইটা ইংরেজিতে লেখা। অন্যান্য বইগুলো সবই ফরাসী লেখকের।

তাঁর আতিথেয়তার জন্য বার বার ধন্যবাদ দিলাম; মাদাম দেলপিয়াসকে আমি ছোট্ট একটা ভগবৎগীতা দিয়ে বললাম— এটা ইংরেজিতে লেখা— মূল ভাষা সংস্কৃত। আপনারা দু'জনেই তো মনে হয় প্রাচীনের পক্ষপাতী, তাই এটা ছোট একটা স্মারক, যদি সময় হয় পড়বেন।

—ভগবৎগীতা! বলো কি—অনেক দিন যাবৎ আমার ইচ্ছা এই বইটা পড়ার। ভালই হলো, আমরা দু'জনেই ওটা পড়বো।

একে একে সবাইকে আর একবার ধন্যবাদ জানিয়ে বন্ নুই বা গুড্ নাইট জানালাম।

বাড়ীর বাইরে আসতেই জিল্ আমাকে প্রায় জড়িয়ে ধরলো, বললো—সত্যি দারুণ হ'ল— তোমার মাধ্যমে মঁসিও দেলপিয়াসের সাথে পরিচিত হলাম। তিনি আমাদের দেশের একটা স্তম্ভ বলতে পারো। এই ধরনের লোকেদের সাথে পরিচয় হলে বিপদে-আপদে খুব সাহায্য দেয়... তবে আমার কিন্তু ভাই খুব ঘুম পেয়ে গিয়েছিল।

—-আমারও— চল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিছানায় গিয়ে পড়তে পারলেই বাঁচি।

জিলের গাড়ীটা স্টার্ট দিল; আমরা সাগরের ধারের প্রশস্ত পথ ধরে বাড়ির দিকে চললাম।

চলতে চলতে জিল্ বলল— দেলপিয়াস মশাই খুবই বিদ্বান আর তাঁর কথাগুলোর সত্যাসত্য যাচাই করা আমার পক্ষে উচিত নয়, কিন্তু স্কুলে আমরা পড়েছি যে—পলিনেসিয়ার বাসিন্দারা প্রাচীন যুগে মালয়েশিয়া বা ভারতবর্ষ থেকে এসেছে।

—তাই নাকি? কি সুখবর—এতদিন বলোনি কেন? তাই বলি, তোমাদের সাথে আমার এত মিল দেখতে পাচ্ছি কেন! মূলতঃ তোমরা ভারতীয়— কি বলো—তোমার আমার মধ্যে একই রক্ত আর একই সভ্যতার ছাপ!

—থামো থামো, অতো উত্তেজিত হয়ো না। সে অনেক অনেক দিনের কথা, এখন তার কোন চিহ্নই নেই।

—আছে, নিশ্চয়ই আছে, হাব-ভাব আচার-ব্যবহার আর রঙ, গঠন সবই—আমি তোমাকে অনেকবার বলেছি যে, আমাদের অসম এলাকায় তুমি এলে কে বলবে যে তুমি সুদূর তাহিতির লোক। যাই হোক, বাড়ী এসে গেছি, আমারও ঘুম পেয়েছে। কালকে এ সম্পর্কে আরও আলোচনা করা যাবে— কি বলো?

শেষের কয়েকটা দিন

কথাটা ঠিক যে তাহিতি বা পলিনেশিয়ায় অনেকবারই আগ্নেয়গিরি ও ভূমিকম্পের ফলে এখানকার মূল চিহ্নগুলো প্রায় অবলুপ্তির পথে; আশ-পাশের দ্বীপগুলোতে এখনও অনেক অব্যাখ্যাত ধ্বংসস্তূপ রয়েছে। শহর হিসেবে পাপীত এবং দ্বীপ হিসেবে তাহিতি সত্যি ছোট্ট, কিন্তু ফরাসীদের কল্যাণে এখানে আধুনিকতার কোন অভাবই নেই।

ইউরোপ ও আমেরিকা থেকে প্রতিদিন দলে দলে ট্যুরিস্টরা আসছে শান্তিতে কয়েকটি দিন কাটাতে। তাহিতি, ট্যুরিস্টদের স্বপ্ন। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বালির চড়ায় মেয়েরা গড়াগড়ি খাচ্ছে— উদ্দেশ্য তামাটে হওয়া। সূর্যের তাপে চামড়া পোড়ানো, এটা ইউরোপীয়ান ও আমেরিকানদের একটা প্রবল নেশা। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ানদের তো কথাই নেই, সূর্যের তাপমাত্রা যদি একটু শরীরে সহনীয় হয় তাহলে ওরা উলঙ্গ হয়ে চলতেও দ্বিধাবোধ করে না। ফ্রান্স ও গ্রীসের অনেক জায়গায় সমুদ্রে বালির চড়ায় আজকাল ন্যু-ক্লাব গড়ে উঠেছে। উলঙ্গ হয়ে সমুদ্রের ধারে সপরিবারে ঘুরে বেড়ানো, এটা ইউরোপীয়ানদের একটা নতুন নেশা। দশ-পনেরো বছর থেকে আরম্ভ করে ষাট বছর বয়সের এক ধরণের নর-নারীরা এই নতুন নেশায় এখন মশগুল হয়ে আছে। তাদের মতে এই ধরনের ন্যুডিটি মোটেই সেক্‌সুয়াল নয়, এটা নিতান্তই ফ্রি লাইফ্; সহজ ও স্বাধীন হয়ে প্রকৃতির সাথে নিজেকে খাপ খাওয়ানোতে একটা নতুন মজা আছে।

তাহিতিতে এই ধরনের কয়েকটি নগ্ন সংস্থা আছে, তবে সেগুলো পাপীত থেকে একটু দূরে। স্থানীয় অধিবাসীরা সেদিকে খুব বেশি একটা ঘেঁসে না—কারণ সেগুলো বিদেশী সংস্থা। তাহিতির বাসিন্দারাও অবশ্য সহজ ও সরলতার পক্ষপাতী, শহর থেকে একটু ভিতর দিকে ঢুকলেই চোখে পড়ে মেয়েদের খোলা বুক। লোকে দেখলেও তারা লজ্জিত নয়— এটাই তাদের স্বাভাবিক অবস্থা। সেটা বোধহয় ঠিকই, আসলে আমরা শহরে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েই এই প্রাকৃতিক অবস্থাকে বিকৃত করে ফেলেছি। তেমানুকে একদিন আমি এ বিষয়ে সরাসরি জিজ্ঞাসা করেছিলাম। জবাবে সে বলেছিল—আমাদের হাত-পা-এর মত স্তনও দেহের একটি অঙ্গ; তাকে ঢেকে লুকিয়ে রাখা প্রকৃতির বিরোধ। যারা আমাদের এই অবস্থা দেখে মনে কামের ভাব আনে, তাদের মন মোটেই সহজ নয়। কথাটা ঠিকই। আমাদের দেশে সাঁওতালদের এবং কোহিমার কাছে নাগা উপজাতিদেরও দেখেছি। তাদের সহজ ও সরল গতিবিধি আর নারী-পুরুষদের প্রায়-নগ্ন দেহ প্রকৃতির সাথে ঠিক খাপ খাইয়ে আছে— সেটাই তো আসলে আমাদের আদিম স্বভাব। সেই প্রবৃত্তিটাকে হেয় বলা উচিৎ কি?

আভেয়া আতাপু তেমানু জিল্ মাদাম সিয়ারী— তাদের সাথে আজকাল আমি প্রায় একাত্ম হয়ে উঠেছি। আমি মাঝে মাঝে আভেয়াকে নিয়ে বাজারে যাই— আর যা মনে ভাল লাগে তাই কিনি ঠিক বাড়ীর মতো। রবিবার দিন সপরিবারে বাজারে কাটাই আর তেমানু বা আতাপুর ছুটি থাকলে ওদের সাথে ঘুরতে বেরোই। যদিও আগের মতোই আমি পেয়িং গেস্টই আছি, তবুও আমাদের সম্পর্ক সেই গণ্ডির মধ্যে আর সীমাবদ্ধ নেই। পেরোগ নামে এখানকার স্থানীয় নৌকোগুলো বড় চমৎকার। সাগর ও মহাসাগরে এই ধরনের নৌকোর উল্টে যাওয়ার সম্ভাবনা কম। আর শান্ত জলে পাল তুলে চলায় যে কি আনন্দ তা লিখে বোঝানো মুশকিল। সাধারণ নৌকোর সাথে দুটো থাম দিয়ে সমান্তরালভাবে আর একটা তক্তা বসিয়ে এই পেরোগগুলো তৈরি। দূর থেকে দেখলে মনে হয় এগুলো জোড়া নৌকো।

সেদিন সন্ধ্যার পর জিল্ ও আমি এই ধরনের একটা নৌকোয় চড়ে পূর্ণিমার চাঁদের কিরণ উপভোগ করতে বেরিয়ে নীল কোরাল আর সাগরের এক নতুন রূপ দেখলাম। চাঁদনি রাতের সে মায়াবী দৃশ্যকে আমি লিখবার চেষ্টাও করবো না, শুধু হৃদয় দিয়ে অনুভব করলাম। মনে হল আমি আর এই দৃশ্য জগৎ যেন এক হয়ে গিয়েছি। সাগরের নিস্তরঙ্গ জলে স্নিগ্ধ চাঁদের কিরণ আর দূরে আকাশের গায়ে পেঁজা তুলোর মত মেঘের সারি, দুই-এর মাঝখানে রয়েছে দিগন্তে সারি সারি নারকেল গাছের বন। তাহিতির সবকিছু বাদ দিয়ে শুধু যদি এই দৃশ্য দেখবার জন্যই আমাকে এতদূরে আসতে হতো, তাহলেও বলবো আমার এ যাত্রায় এই বিশেষ ভ্রমণ খুব সার্থক।

সেই রাতেই নৌকোয় বেড়াতে বেড়াতে দূরে নজরে পড়ল সাগরের ওপর আলো দিয়ে সাজানো একটা বাড়ী। জিলের নজর সেদিকে আকর্ষণ করে জিজ্ঞেস করলাম—ওটা কি ভাই?

উত্তরে জিল্ বললো— একটা জাহাজ, আজকেই ওটা নোঙর করেছে।

—বাঃ—দূরের থেকে চমৎকার দেখাচ্ছে, তাই না?

—কথাটা ঠিক—জিল পেরোগের দিক পরিবর্তন করতে করতে জবাব দিল।

—ভাল কথা জিল্—তুমি তো ট্রাভেলিং এজেন্সিতে কাজ কর, এখান থেকে সবচেয়ে সস্তায় অস্ট্রেলিয়ায় কিভাবে যাওয়া যায় তার একটা বুদ্ধি দিতে পারো?

জিল্ একটু ভেবে নিয়ে বললো—

—সবচেয়ে সস্তা হচ্ছে, যে সব চার্টার্ড কোম্পানী এখানে যাত্রী নিয়ে আসে তাদেরই সাথে যোগাযোগ করা। অধিকাংশ চার্টার্ড প্লেনেই দু-একটা সিট খালি থাকেই। অস্ট্রেলিয়া বা নিউজিল্যান্ড থেকে প্রায়ই এই ধরনের প্লেন এখানে আসে অথবা আমেরিকা থেকেও তাহিতি হয়ে অনেক প্লেন অস্ট্রেলিয়ায় যায়। তাদের সাথে যোগাযোগ করা ভাল। তুমি কালকে আমার সঙ্গে অফিসে এসো, আমি এ সম্পর্কে বিশদ জানিয়ে দেব।

—ঠিক আছে, তাই হবে।

—এখন কি তোমার যাওয়ার পরিকল্পনা করছো নাকি? জিল্ আগ্রহে জিজ্ঞেস করলো।

—অবশ্যই। যেতে তো একদিন হবেই— তোমাদের কল্যাণে তাহিতিটা খুব ভালভাবেই দেখলাম— তাহিতির স্মৃতি এখন বড়ই রঙিন আর মধুরতো বটেই। খুব বেশিদিন থাকলে হয়তো সেই মধুরতা আস্তে আস্তে একঘেয়েমিতে এসে দাঁড়াবে। জানোতো, সাধারণ মানুষের স্বভাবটাই বড় জটিল, মধুরকে সে চিরদিন মধুর করে রাখতে পারে না।

জিল্ একটু হাসলো, তারপর বললো—

—কিন্তু তুমি তো সাধারণ মানুষ নও!

আমি হেসে তার দিকে তাকিয়ে বললাম— সাবধান, আমাকে ওপরে তুলে দিও না—পড়ে গেলে ব্যথা পাবো।

দু'জনেই একসাথে হেসে উঠলাম।

সেদিনের মতো আমরা বাড়ী ফিরলাম।

পরের দিন আমি জিলের সাথে ওর অফিসে চলে এলাম। উদ্দেশ্য—এখান থেকে অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার একটা বন্দোবস্ত করতে হবে। এখানে পর্যটন সংস্থার অভাব নেই, এয়ারলাইনস্, ইউ টি এ, ফ্রেঞ্চ এয়ারলাইনস্ ইত্যাদি অনেকগুলো পরিবহন সংস্থা রয়েছে। আমার কাছে অবশ্য যথেষ্ট ডলার রয়েছে, কিন্তু তবুও সব সময়ই সস্তায় চেষ্টা করা ভাল। ইউরোপ বা আমেরিকায় জাহাজে পর্যটন করা একটা বিরাট খরচার ধাক্কা আর সময়ও লাগে অনেক, তাই সাধারণ লোকেরা বিমানই পছন্দ করে— তাতে খরচ কম আর সেই সাথে সময়ও সংক্ষেপ হয়। কাজেই অস্ট্রেলিয়া যাবার জন্য হাওয়াই জাহাজের পরিকল্পনা করাই উচিত।

জিল ও তার সহকর্মীদের সাথে আমি ইতিমধ্যেই পরিচিত হয়েছি। অফিসের সবাই আমাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। এদিক-ওদিকে টেলিফোন করে শেষ পর্যন্ত অতি সস্তায় অস্ট্রেলিয়া যাবার বন্দোবস্ত ঠিক হ'ল—তাহিতি অক্ল্যান্ড ক্যান্‌বেরা—চারশ কুড়ি ডলার। আমি রাজি হলাম বটে, কিন্তু এখনই টিকিট কাটলাম না। কারণ আমার উদ্দেশ্যতো আর ক্যানবেরা পর্যন্ত নয়—তার পরের কথাও ভাবতে হবে।

জিল্ আমাকে নিয়ে এল ওর অফিসারের কাছে; তিনি নাকি জিল্‌কে আগে থাকতেই বলে রেখেছিলেন যে, আমি এলে যেন তাঁর সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। ভদ্রলোক এ অফিসের সর্বেসর্বা অর্থাৎ আজন্স মারিটিম্ এ ভয়াজ্-এর ডিরেক্টর। ভদ্রলোক খুবই হাসিখুশি এবং তাহিতিয়েনতো বটেই। নাম মঁসিও নুয়ামু। তিনি আমাকে চেয়ারে বসিয়েই আগে জিজ্ঞেস করলেন— চা না কফি— কি চলবে বলুন?

আমাকে তাঁর অফিসে পৌঁছে দিয়ে জিল্ চলে গেল তার নিজের টেবিলে। আমাদের কথাবার্তা বেশ জমে উঠল। ভদ্রলোক ভ্রমণে খুবই উৎসাহী, কিন্তু তিনি আফশোষ করে বললেন যে তিনি দু'বার আমেরিকা হয়ে প্যারিসে গেছেন মাত্র, তা ছাড়া তিনি আর কোথাও যাননি। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি মেয়ে চা দিয়ে গেল; মেয়েটি নিচেই বারে কাজ করে বলে মনে হ'ল। আমাদের আলাপ জমে উঠল অর্থাৎ আমি কোন কোন দেশে গেছি, কি করে চাক্‌রী জোগাড় করেছি, ভাষার সমস্যা সমাধানের জন্য কি উপায় অবলম্বন করেছি, ইত্যাদি। প্রসঙ্গক্রমে আমি তাঁকে বললাম— তাহিতির মতো এত সুন্দর ও আপন করা দেশ আমি আগে পাইনি। আর কয়েকদিনের মধ্যেই আমাকে এর মায়া কাটাতে হবে। আমার যাওয়ার প্রায় সবই ঠিকঠাক, তবে টিকিট এখনও কেনা হয়নি।

কথা প্রসঙ্গে তিনি জানতে চাইলেন— আমার কোন অসুবিধা আছে কিনা। সঙ্গে সঙ্গে জানালুম—অসুবিধা আর কিছুই নেই, তবে জলপথে অস্ট্রেলিয়া যাবার ইচ্ছা ছিল; মনে হয় সেটা আর হয়ে উঠবে না— মানুষের সব ইচ্ছাই কি পূরণ হয় নাকি? জলপথে অনেক খরচ।

তিনি আমাকে অনেকটা স্বস্তির সুরে বললেন— ব্যাপারটা খুলেই বলুন না। আমরা তো এ লাইনেই আছি, দেখা যাক না যদি কোন একটা বন্দোবস্ত করতে পারি। তাঁর আশ্বাস পেয়ে আমি আমার পরিকল্পনাটা খুলেই বললাম।

—কম খরচার ওপর জলপথে অস্ট্রেলিয়া হয়ে দেশে ফেরার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু জাহাজে যা খরচ মনে হয় সে আশা আমাকে ত্যাগ করতে হবে।

—দাঁড়ান দাঁড়ান, অত সহজে হাল ছেড়ে দেবেন না। আমাদের দেশে যখন একবার এসেই পড়েছেন— কাজেই আমাদেরও একটু সাহায্য করবার সুযোগ দিন। ভদ্রলোক রসিক বটে।

তিনি আরও বললেন,

—আপনাকে খুব বেশি একটা আশ্বাস দিতে পারছি না, তবে আমাকে দুটো দিন সময় দিন, দেখি কি করতে পারি।

—অবশ্যই, আমার থাকার কোন অসুবিধাই নেই। আমি জোর করে বলতে পারি নে, তবে আপনার মতো লোক যখন একবার চেষ্টা করবেন বলেছেন তাতেই আমার ইচ্ছা পূরণ হবে।

ভদ্রলোককে বিশেষ ধন্যবাদ দিয়ে বেরোতে যাচ্ছি, এমন সময় তিনি আমাকে একটা অনুরোধ জানালেন,

—এই দেখুন, আমাদের স্থানীয় খবরের কাগজে আপনার ফটোসমেত সংবাদটা। এর ওপর দয়া করে একটা অটোগ্রাফ দিয়ে দিন, আমার ছেলের অটোগ্রাফ সংগ্রহ করার হবি আছে।

আমি তাঁর অনুরোধমত ইংরেজিতে ও বাংলায় আমার নাম ও তারিখ লিখে দিলাম।

জিলের টেবিলে আসতেই সকলে আমাকে ঘিরে ধরলো। এই অফিসটা অনেকটা কলকাতা কর্পোরেশনের মতো। একটা আকর্ষণীয় কিছু পেলেই সকলে তার ওপর হুমরি খেয়ে পড়ে। অফিস ডিসিপ্লিন বলতে যা বোঝায় তার নাম-গন্ধও নেই। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, এই বিশৃঙ্খলার মধ্যেই পাওয়া যায় সহজ মনের আন্তরিকতার স্পর্শ। জিল্‌কে আমি সব খুলে বললাম। জিল্‌ আমার কথা শুনে বললো— খুব ভাল করেছো তাঁকে বলে, কারণ তাঁর সাথে এখানকার সব ট্রাভেল এজেন্সির বিশেষ জানাশুনা, একটা বন্দোবস্ত হয়ে যাবেই। আমি আরও কিছুক্ষণ ওদের অফিসে কাটিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

* * * * *

তিনদিন পর সকালবেলা মুখ ধুয়ে ওদের ডাইনিং রুমে এসে ব্রেকফাস্টের জন্য বসেছি, সেই সময় টেলিফোনটা বেজে উঠল। মাদাম সিয়ারী টেলিফোন ধরলেন; কিছুক্ষণ কথাবার্তায় পর তিনি টেলিফোনটা ছাড়লেন, তাবপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—ডিরেক্টর সাহেব তোমাকে আজ দেখা করতে বলেছেন। সকালের দিকে গেলেই ভাল হয়; সম্ভবত তোমার যাবার ব্যাপারে তিনি কথাবার্তা বলতে চান।

—ওঃ তাই নাকি? হ্যাঁ, যেতে তো একদিন হবেই, তাই তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম সস্তায় একটা বন্দোবস্ত যদি তিনি করতে পারেন।

মাদাম সিয়ারী টেবিলের ওপর—ক্রোয়াস্‌সঁ আর কর্ণাফত্যুর রাখতে রাখতে বললেন—সে তো ঠিকই, বাড়ীর ছেলে বাড়ীতে ফিরে যাবে বৈকি!

তাঁর গলার স্বরটা ভারী বলেই মনে হ'ল, কিন্তু আমি আর এ প্রসঙ্গে কিছু না বলে মুখ নীচু করেই খেতে আরম্ভ করলাম। খাওয়ার শেষে সাইকেলটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম মঁসিও নুয়ামু-র অফিসের উদ্দেশ্যে।

যথাসময়ে আমি ডিরেক্টর সাহেবের দপ্তরে এসে হাজির হ'লাম। তিনি আমাকে দেখেই আগের মত দুহাত বাড়িয়ে অভ্যর্থনা জানালেন—আসুন! আসুন! গ্লোব ট্রটারকে চা না কফি কি অফার করবো বলুন!

আমি চেয়ারে বসার সাথে সাথেই তিনি প্রয়োজনীয় কথা শুরু করলেন,

—ভাল কথা, আপনিতো সস্তায় অস্ট্রেলিয়া যেতে চাইছেন, তাই না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ; জলপথে হলে ভাল হয়, আপনার সহকর্মীরা অবশ্য আমাকে প্লেনের একটা এস্টিমেট দিয়েছে।

—তা জানি; ও কথা এখন থাক, আমার প্রপোজালটা খুলে বলছি শুনুন— গতকাল আমার সি জি এম্‌ (Compagnie Generale Maritime)-এর এক বন্ধু টেলিফোনে জানালো যে, হল্যান্ড আমেরিকা লাইনের একটা কার্গো এখানে এসেছে।

কার্গোটি যাবে অস্ট্রেলিয়ার দিকে, পথে অক্ল্যাণ্ডে কয়েকদিনের জন্য থামবে। আমার বন্ধু কার্গোর ক্যাপ্টেনকে আপনার কথা বলেছে এবং অনুরোধ করেছে যে সে যদি আপনাকে তার জাহাজে নিয়ে যায় তাহলে খুব ভাল হয়। আমি ঠিক জানি না সে কি ভাবে এ্যাপ্রোচ্ করেছে, তবে ক্যাপ্টেন রাজি হয়েছে। অস্ট্রেলিয়া থেকে জাহাজটা যাবে মালয়েশিয়ার দিকে। যে কোন একটা বড় বন্দরে সে আপনাকে নামিয়ে দেবে। এর জন্য ভাড়া কিছু লাগবে না। বুঝতেই পারছেন যে এটা একটা মালবাহী জাহাজ, তবে ভাড়ার পরিবর্তে সম্ভবতঃ সেখানে ছোটখাটো কাজ করতে হবে, অর্থাৎ আপনি বেসরকারী ভাবে নাবিকদেরই একজন হয়ে সেখানে যাবেন। আপনার যা নথিপত্র আছে তাতে পোর্ট অথরিটির তরফ থেকে কোনরকম আপত্তি হবার সম্ভাবনাই নেই। আপনিতো অ্যাড্‌ভেঞ্চারার— কাজেই মনে হয় এতে রাজি আছেন, তাই না?

—রাজি মানে! আনন্দের আবেগে আমার বাক্‌রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে —আপনি আমার ঠিক উপযোগী বন্দোবস্তই করেছেন— আমি এই মুহূর্তে তৈরি।

—ঠিক আছে, আমি বিস্তারিত সংবাদ নিচ্ছি। কখন কিভাবে যোগাযোগ হবে, সে সব জিল্‌কে জানিয়ে দেব। তবে কার্গো জাহাজের ব্যাপার, বুঝতেই পারছেন তাদের সময় জ্ঞান একদম নেই; অর্থাৎ এই মুহূর্তেই জাহাজ ছাড়তে পারে অথবা আরও সাতদিন লাগতে পারে।

—তাতে আমার কিছু আসে যায় না; আমি তো চলার জন্যই পথটাকে বেছে নিয়েছি। যাই হোক, আপনার এই সাহায্যের জন্য অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ— আপনার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ হয়ে রইলাম।

আবার পথের চিন্তা আমার মাথায়। ঢুকলো সমুদ্রের হাওয়া। ঢেউ, তিমি মাছের খেলা আর জাহাজের দোলা এখনই যেন আমাকে দোলা দিতে শুরু করেছে। পানামা থেকে পাক্‌দ্বীপ হয়ে এখানে আসার পথে ক্যাপ্টেন কুর্বের ছোট ইয়াট্ থেকে তিমি মাছের ভাসমান দৃশ্য খুব বেশি একটা দেখতে পাইনি, তার বোট্টা ছিল নিতান্তই ছোট। কিন্তু এবার জাহাজের উঁচু ডেক থেকে সে দৃশ্য অতি চমৎকারভাবে দেখতে পাব। আর তাছাড়াও দেখতে পাব উড়ন্ত মাছের ঝাঁক। তিমি মাছ শিকার আমি আইসল্যান্ডের সমুদ্রে কয়েকবার দেখেছি, কিন্তু শুনেছি দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের তিমিগুলোর জলের ফোয়ারা আরও অনেক উঁচু ও দেখবার মতো। সাইকেলটায় প্যাডল করতে করতে এইসব চিন্তা করতে লাগলাম। হঠাৎ মনে পড়ল—তেমানুর কথা। বুকের ভেতরটা ধক্ করে উঠল— তেমানু যদি শোনে যে এই মুহূর্তেই আমাকে যেতে হবে, তাহলে নিশ্চয়ই হতাশায় ভেঙে পড়বে। ওর ইচ্ছা আমি আরও সপ্তাহ খানেক থেকে এখানকার বোরা বোরা দ্বীপটা ঘুরে আসি— সেটা নাকি খুবই রমণীয়। কিন্তু তার কথা রাখতে গেলে আমার এই জাহাজের পরিকল্পনাটাকে

বাদ দিতে হয়। আমার পক্ষে সেটা বিরাট ক্ষতি। সেদিন বিকেলে খেতে বসে জিল্ নিজেই কথাটি তুললে। তার মার দিকে তাকিয়ে বললো—

—জান মা, বিমলকে যাবার জন্য এখন প্রস্তুত হতে হবে। আমাদের ডিরেক্টার সাহেব একটি জাহাজের ক্যাপ্টেনের সাথে কথাবার্তা বলেছেন, ওর ভাগ্য ভাল, বিনা পয়সাতেই শেষ পর্যন্ত সব ঠিক হ'ল। —ওর কথাটা কানে পৌঁছাতেই তেমানুর চামচের সুপটা মুখ পর্যন্ত উঠেই নেমে গেল— আমি সেটা ভালভাবেই লক্ষ্য করলাম।

মাদাম সিয়ারী অনেকটা আফ্‌শোষের সুরে বললেন,

—যেতে যখন হবেই তখন আর ওকে আটকাবে কে? ভালয় ভালয় ও ঘরে ফিরুক সেটাই আমবা চাই।

—এইতো ঠিক উপযুক্ত কথা—তবে ঘরের বাইরেই হচ্ছে আমার ঘর। বাউন্ডুলেদের ঘর বলতে আছে মুক্ত আকাশ আর পথ। আমি মাদাম সিয়ারীর কথার জবাব দিলাম।

তেমানু হঠাৎ মুখ তুলে বললো—

—তবে আরও কয়েকটা সপ্তাহ থেকে গেলে হ'ত না! তুমি তো নিজেই বললে তোমার জন্য কেউ হাঁ করে বসে নেই!

আমি বললাম— কিন্তু তেমানু, সপ্তাহখানেক পবে ঐ একই প্রশ্ন এসে দাঁড়াবে, অর্থাৎ আরও কিছুদিন থেকে গেলে পারতে। তোমাদের আন্তরিকতার তুলনা নেই, কিন্তু এখন থেকে যত দিন যাবে ততই মায়ার বাঁধনে আরও আমাকে বাঁধবে। জানো তো, স্নেহ-প্রেম-ভক্তি ভালবাসা, এগুলোর কোন সীমা নেই; যত দেবে, চাওয়ার মাত্রা ততই যাবে বেড়ে। আজকের এই আমাকে যে দেখছো, বেশিদিন থাকলে দেখবে যে আমাব সব গুণগুলো আস্তে আস্তে দোষে পরিণত হতে শুরু করবে। কোন একটা জিনিসকে খুঁটিয়ে দেখলে জান তো তার গলদ সহজেই ধরা পড়ে।

তেমানু বাধা দিল— কথাটা ঠিক নয়; ভালভাবে বিচার করলে তার ঢাকা গুণগুলো আরও দৃষ্টিগোচর হয়, পরিষ্কার হয়ে ওঠে। আতাপুর অবশ্য বলার কিছু নেই, ওর স্বভাবটা একটু চাপা গোছের। তবে জিল্ আমাকে বার বার করে বলেছে— তুমি চলে গেলে আমাদের বাড়ীটা একদম ফাঁকা হয়ে যাবে।

—আর তোমাদের অবর্তমানে আমার হৃদয়টা হবে শূন্য— আমি অনেকটা কবিত্ব করে শোনালাম। মনে মনে ভাবলাম যে, এ বিষয়ে আর বেশি কথাবার্তা না বলাই ভাল। প্রসঙ্গ ফেরাবার জন্য জিজ্ঞেস করলাম— এই মাছের ঝোলটা কিন্তু অপূর্ব হয়েছে; এটার কি নাম? খাবারের টেবিলে বসে খাবারের কথা বলেই কাটিয়ে দেওয়া যায় ঘন্টাখানেক; তার জন্য মোটেই ভাবতে হয় না।

পরের দিনই যাবার সময় ঠিক হল, রাত এগারোটা নাগাদ কার্গো ছাড়বে। আমাকে জাহাজে রাত দশটার মধ্যেই পৌঁছতে হবে। আমি অবশ্য মনে মনে তৈরি হয়েই

ছিলাম, আর মালপত্র গুছিয়ে সাইকেলে বাঁধতে সময় লাগে খুব বেশি হলে তিরিশ মিনিট। যদিও পাপীত রাজধানী ও প্রধান বন্দর, কিন্তু সব জাহাজ এখানে আসে না; বড় বড় জাহাজগুলো দূরে গভীর জলে নোঙর করে আর অপেক্ষাকৃত ছোট বোটগুলো, তাদের যাত্রী বা মালপত্রের জন্য বন্দরের সাথে যোগাযোগ করে। জাহাজটা অনেক দূরে, এখান থেকে দেখা যায় না। ডিরেক্টর সাহেবই যাবতীয় বন্দোবস্ত করেছেন, তাঁর নিজের কোম্পানীর বোট আছে, তিনি নিজেই আমাকে সেই জাহাজে তুলে দিয়ে আসবেন বলে কথা দিয়েছেন। কাজেই আমার আর কোন চিন্তা নেই।

যাবার দিন। জিল, আতাপু ও তেমানু ছুটি নিয়েছে— শেষের দিনটা একসাথে কাটানোই উদ্দেশ্য। সকলে বাড়ি থাকলে মাদাম সিয়ারী ও আভেয়ার ওপর কাজের চাপটা খুব বেশি পড়ে। তাহিতির কয়েকরকম বিশেষ মাছ আমার খাওয়া হয়নি, তাই তারা বাজার থেকে সেই সব মাছ কিনে এনেছে।

সারাটা দিন বাড়িতেই কাটাতে হবে, বাইরের কোন প্রোগ্রামই নেই। ক্যাপ্টেন কুর্বে সপ্তাহখানেক এখানে থেকে হাওয়াইয়ের দিকে চলে গেছে, কাজেই ঠিক বিদায় জানাবার মতো কেউ নেই। সকালবেলা এদিক ওদিক টেলিফোন করে আমার যাত্রার কথা সবাইকে জানিয়ে দিয়েছি। স্থানীয় রেডিওতে আমাকে রাতেই সেকথা ঘোষণা করতে হবে। সকালটায় ওদের আনন্দ দেবার জন্য আমি টেবিলের চারপাশে ওদের নিয়ে বসলাম— উদ্দেশ্য, কিছু হাত সাফাইয়ের খেলা দেখানো। রাউরকেল্লার ম্যাজিসিয়ান বোস অর্থাৎ আমাদের বোসদার কাছ থেকে কিছু ম্যাজিক শিখেছিলাম— আর পথে জিপ্‌সিদের কাছ থেকেও বেশ কিছু সংগ্রহ করেছি। কাজেই ঘরে জমিয়ে বসবার জন্য এর চেয়ে উপযোগী আর কিছুই নেই। পয়সা উধাও, সিগারেট না ধরিয়ে তার থেকে ধোঁয়া বার করা, রুমাল নাচানো ইত্যাদি খেলাগুলো শুধু ছোটদের নয়, বড়দেরও অবাক করে দেয়।

শেষের দিনে ওরা সবচেয়ে আশ্চর্য হয়ে গেছে আমার হাতের ঘুসিতে নারকেল ভাঙা দেখে। আমার মধ্যে যে এত শক্তি আছে সে কথা ওরা চিন্তাও করতে পারেনি। তেমানুকে অবশ্য কানে কানে বলে দিয়েছি যে এটাও একটা কৌশলমাত্র, এর মধ্যে গায়ের জোরের কোন ব্যাপার নেই।

মোটের ওপর খুব হৈ চৈ করেই আমাদের দিনটা কাটতে লাগলো। আমি যতই বাইরের কথা ভাবছি এরা ততই আমার কথা ভাবছে। মনে হচ্ছে, শেষের দিকেই এরা আমাকে সম্পূর্ণভাবে আবিষ্কার করে ফেলেছে। মনে মনে ভাবলাম যে সত্যি আমার ভাগ্য ভাল; আর কয়েকদিন আগে যদি এরা এদের এই স্নেহ-প্রীতি ও প্রেমের ভাবটা এমনভাবে আমার কাছে প্রকাশ করতো তাহলে তাহিতিতেই আমাকে সারাটা জীবন থেকে যেতে হত— এ মায়ার গণ্ডী ছাড়িয়ে আমার মতো ছোট্ট ভবঘুরের পক্ষে পালানো মুসকিল হতো।

আভেয়া এদের বাড়িতে কাজ করে— আসে সকালে, বাড়ী ফেরে বিকেলবেলা। মাদাম সিয়ারী ওকে নিজের মেয়ের মতোই দেখেন। সেদিন আভেয়াও থেকে গেল— বিকেলে আমি না যাওয়া পর্যন্ত থাকতে চাইল। আপত্তির কোন কারণ নেই।

রাত্রিতে খাওয়া-দাওয়ার পর, আমি ৺দুর্গা নাম স্মরণ করে তাদের বাড়ি ছাড়লাম। আমি সাইকেলেই পাপীতের পথ ধরলাম, আর ওরা সবাই জিলের মোটরে করে রওনা দিল— সকলেই বন্দর পর্যন্ত আসবে, মাদাম সিয়ারীর মতে ফাঁকা বাড়িতে এখন থাকা মুশকিল। বিদায়কালে ওদের কুকুটাকেও গুড্ বাই জানাতে ভুলিনি— পাড়া-প্রতিবেশীরাও রাস্তার দুপাশে এসে ভীড় করেছিল— রেস্টোরেন্টের সেই ছেলেটাও।

পাপীতে জিলের অফিসের সামনে এসে আমরা সবাই আবার মিলিত হলাম। ডিরেক্টর সাহেব তাঁর স্ত্রী ও দুই ছেলেকে নিয়ে সেখানে আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন; আমাকে দেখেই তিনি দু হাত বাড়িয়ে আগের মতোই হাসিমুখে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর আমার মালপত্রগুলোর দিকে তাকিয়ে বললেন—

—এই-ই সব? বাঃ চমৎকার সংগঠন! এই বলে তিনি ঘড়ি দেখলেন, পৌনে নটা—অতএব এখান থেকেই সকলকে বিদায় জানাতে হবে।

আমি সকলের দিকে তাকালাম— কার কাছ থেকে বিদায়ের পর্ব আরম্ভ করবো! হঠাৎ কানে এলো রুদ্ধ কান্নার শব্দ। সেদিকে তাকাতেই দেখি আভেয়া কান্নায় সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। আমি কিন্তু কিছুতেই ভাবতে পারিনি যে আভেয়াও আমার প্রতি আসক্তা! আমি আভেয়ার হাত দুটো নিজের হাতে ধরে বললাম— তোমার কথা আমার চিরদিন মনে থাকবে— তুমি যে সকালে আমার জলখাবার আনতে তার মধ্যে আমি তোমার প্রাণের স্পর্শ পেতাম— কিন্তু তোমাকে তা আমি মুখ ফুটে বলিনি— মনের ভাবটা সব সময় তো আর প্রকাশ করা যায় না— এই বলে তার গালে দুটো চুমু দিতেই সেও রুমালে চোখের জল মুছে আমার গালে চুমু দিল। মাদাম সিয়ারী অবশ্য সব সময়েই হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর গালে চুমু দিতেই তিনি বললেন— খুব সাবধানে থেকো, শরীরের প্রতি যত্ন নিও। মনে পড়ে চার বছর আগে আমি যখন (ইছাপুরের) বাড়ী ছাড়ি আমার ঠাকুমা এই একই কথা বলেছিলেন। বলাই বাহুল্য, তেমানুর রুমালটা চোখের জলে সম্পূর্ণ ভেজা। ভালভাবে তাকালাম ওর মুখের দিকে— কি সুন্দর যে ওকে দেখাচ্ছে তা বলে বোঝাতে পারবো না। আতাপু সব সময়ই একটু চাপা— সে এগিয়ে এসে হঠাৎ আমার গলা জড়িয়ে ধরে ছোট্ট বোনের মতো বললো—

—আসবে কিন্তু, আমাদের ভুলে যেও না যেন। আতাপু মনে হয় এই কথাটা বলবার জন্য অনেকক্ষণ ধরেই মনে মনে নিজেকে প্রস্তুত করে রেখেছিল। বিদায় মুহূর্তটা এমন চোখের জলে ভরে উঠবে ভাবতে পারিনি।

হঠাৎ ডিরেক্টর সাহেব এগিয়ে এলেন; তারপর সকলের উদ্দেশ্যে বললেন— আমি কিন্তু তোমাদের এই দৃশ্য দেখবার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না— শোন,

আমার কথা শোন, সবচেয়ে ভাল হয় চল একসাথে আমার বোটে উঠে পড়ে জাহাজ পর্যন্ত সবাই মিলে বিমলকে পৌঁছে দিয়ে আসি। আমাকে তো যেতেই হবে আর বোটেও জায়গা আছে— আর সাগরের হাওয়ায় তোমাদের মনটাও হালকা হয়ে যাবে। উত্তম প্রস্তাব— এই মুহূর্তে এর থেকে ভাল প্রস্তাব আর কিছু হতে পারে না— সকলেই প্রস্তুত।

ডিরেক্টর মঁসিও নুয়ামুর বোটে আমরা সবাই উঠে এলাম। বোটের চালক মনে হয় ডিরেক্টরের নিজেরই লোক। সাদা নীল রঙের চমৎকার বোটটি, একত্রিশ ফুটের বারট্রাম, ডিজেলের ডবল ইঞ্জিনযুক্ত।

আমাদের বোটটি তাহিতির বন্দর ছাড়লো। শেষবারের মত অনিন্দ্য-সুন্দর তাহিতিকে দেখতে লাগলাম। সাগর থেকে তাহিতির রাতের দৃশ্য বড় চমৎকার— আলোয় আলোময়— যেন উৎসবের জন্য তাকে সাজানো হয়েছে। রাস্তাটাকে বিরাট একটা মালার মত মনে হচ্ছে। আস্তে আস্তে সে দৃশ্য ক্ষীণ হতে লাগলো। ডিরেক্টর সাহেব ঠিকই বলেছেন— সমুদ্রের হাওয়ায় মনকে হাল্‌কা করে দেয়। আভেয়া তেমানুর মুখে স্বাভাবিক হাসি ও কথা ফুটেছে— বোটটা ছুটে চলেছে দক্ষিণের দিকে গভীর জলে। প্রায় আধঘণ্টা চলার পর আমাদের সামনে পড়ল একটা বিরাট আলোব মালা, মনে হয় শূন্যের ওপর সেটা যেন দুলছে। মঁসিও নুয়ামু সেদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন—

—ওই দেখ, জাহাজটা গ্লোব-ট্রটারের জন্য অপেক্ষা করছে। কিছুক্ষণ পরই বোটের সার্চলাইট পড়লো জাহাজের ওপর, তারপর বিনিময় হ'ল উভয়ের আলোক সঙ্কেত। আস্তে আস্তে আমাদের বোটটা সেই বিরাট দৈত্যাকৃতি জাহাজটার গায়ে ঠেকলো। জাহাজের পাশে সিঁড়িটা আটকানোই ছিল, আর মনে হ'ল ওপরে কয়েকজন লোক আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। এবার এল সত্যিকাবেব বিদায় মুহূর্ত। আমি কোন ভূমিকা না করেই তেমানুকে জড়িয়ে ধরে আল্‌তো করে একটা চুমু দিয়ে বললাম— তুমি আমার জীবনের একটা স্বপ্ন হয়ে থাকবে; আমি পরিব্রাজক, কাজেই আমার জন্য মন খারাপ করো না; আমাদের এই যোগাযোগকে একটি ছোট শুভ মুহূর্তেব চিহ্ন বলেই মনে রেখো। তারপর একে একে মাদাম সিয়ারী, মাদাম নুয়ামু, তাঁর ছেলে, আভেয়া ও আতাপুকে আর একবার বিদায় জানালাম। জিল্‌কে আন্তরিকভাবে বুকে জড়িয়ে ধরে বললাম—

—তোমার আন্তরিক সাহায্যেই আমি এত সুন্দরভাবে তাহিতিকে আমার মধ্যে পেয়েছি— তোমার কাছে আমি চিরঋণী রইলাম। আমি অবশ্যই যোগাযোগ রাখবো।

সকলেই দেখলাম হাসিমুখেই আমাকে ছাড়লো। তাদের দিকে হাত নাড়তে নাড়তে আমি ওপরে উঠে এলাম। সাইকেলটাকে তোলার জন্য জাহাজের থেকে দু'জন নাবিক বোটে উঠে এল; তারাই সেটাকে ওপরে তোলার বন্দোবস্ত করবে। ডিরেক্টর

মঁ নুয়ামু আমাকে ক্যাপ্টেন রুরদা (Capt. Rurda)-র সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ক্যাপ্টেনের চেহারায় একটা বিরাট ব্যক্তিত্বের ছাপ।

তিনি আমাকে ওয়েলকাম জানিয়েই পাশপোর্টটা দেখতে চাইলেন; আমি তাঁর হাতে আমার পাশপোর্টটা দিলাম। তিনি সেটাকে ভালভাবে উল্টে পাল্টে দেখে বললেন—

—অস্ট্রেলিয়া বা অন্য কোন দেশেরই ভিসা নেই দেখছি।

মঁসিও নুয়ামু তাঁর কথাটা কেড়ে নিয়ে বললেন,

—আমি আপনাকে এ বিষয়ে আগেই বলেছি। এই দেখুন আমি দুটো প্রশংসাপত্র আপনার হাতে দিচ্ছি; একটা হচ্ছে আমাদের পর্যটন বিভাগীয় মন্ত্রী ওর সম্পর্কে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। আর দ্বিতীয়টি আমাদের পোর্ট কমিশনারের একটা চিঠি, বিমল দে তাহিতিতে এসেছিল বিনা ভিসায়— পরে সব বন্দোবস্ত ঠিক হয়ে গেছে। আর ওতো এখন আপনার জাহাজেরই একজন টেম্পোরারি সিম্যান হয়ে যাচ্ছে—ভিসার ব্যাপারটা ওর হাতেই ছেড়ে দিন, ও ঠিক ম্যানেজ করে নেবে।

—ঠিক, ঠিক! আপনারা সবাই যখন ওর হয়ে এতখানি করেছেন তাহলে আমার এই বিবাট জাহাজেও এই ছোট্ট মানুষটির জন্য এক কোণে একটু জায়গা হয়ে যাবে।

পনেরো মিনিটের মধ্যে ক্যাপ্টেন রুরদা (হল্যান্ডবাসী) আমাকে তাঁব জাহাজে এক্সেপ্ট করলেন। তিনি আমার সাথে পরে কথাবার্তা বলবেন, এই বলে মঁসিও নুয়ামুকে বিদায় জানালেন।

আর একবার ধন্যবাদের পালা। ডিরেক্টর সাহেবকে আমি মিলিটারী কায়দায় একটা স্যালুট জানিয়ে বললুম— আপনার কর্ম-তৎপবতার তুলনা হয় না— আমি কলকাতায় গিয়ে সকলকে আপনার এই সাহায্যের কথা বলবো। একজন ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন।

ভদ্রলোক হো হো করে হেসে উঠলেন— তোমাকে সাহায্য করা এটা আমার সৌভাগ্য। তিনি গুড্ বাই জানিয়ে বোটে নামার জন্য সিঁড়িতে পা দিলেন। আমার সাইকেলটি ইতিমধ্যে ওপরে উঠে এসেছে। রাতের আধা-আলো আধা অন্ধকারে বোটের ছাদের ওপর লক্ষ্য করলাম সকলকে— তারা আমার দিকে রুমাল নাড়াচ্ছে। ডেকের রেলিংএর ওপর ঝুকে পড়ে শেষবারের মত এক এক করে সকলের মুখগুলো দেখবার চেষ্টা করলাম। সকলের উদ্দেশ্যে বললাম— তোমরা সকলেই আমার মনে গভীরভাবে জড়িয়ে আছো— কাজেই তোমাদের আমি সঙ্গে নিয়েই চল্‌লাম। বোট থেকে জাহাজের দড়ি ফিরে এল, ওদের বোট ছাড়লো পাপীতের উদ্দেশ্যে।

বোটটা আস্তে আস্তে অদৃশ্য হলো— ওরা যতই দূরে যেতে লাগলো ততই ওদের মুখগুলো স্পষ্ট হয়ে সামনে দেখা দিতে লাগলো। কি অদ্ভুত পরিব্রাজকের মন— এই বিচ্ছেদে এতটুকু আফ্‌শোষ নেই —না, আফ্‌শোষ আমার অভিধানে

নেই, বর্তমানকে নিয়েই আমার জগৎ, অতীত আমার অভিজ্ঞতা; ভবিষ্যৎ আসে আশা আর আলো নিয়ে। ক্যাপ্টেন রুর্দার কণ্ঠস্বর ভেসে এল—চলুন, সকলের সাথে পরিচয় করিয়ে দিই। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমরা বন্দর ছাড়বো নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার উদ্দেশ্যে।

বিদায় তাহিতি! প্রেম ও সৌন্দর্যে ভরা এই স্বর্গরাজ্যে আবার আসবো কি না জানি না, কিন্তু যা পেয়েছি তাতেই আমার হৃদয় পরিপূর্ণ হয়েছে। এত দেশ ঘুরেছি, কিন্তু এমন আপন করে আর কোন মাটিকেই আমি স্পর্শ করিনি। এ যেন আমার দেশের মাটি। মন ও দেহ দুইই বলছে যে তারা তৃপ্ত। আহা! কি আনন্দ! সে কারণেই এ বিচ্ছেদে নেই দুঃখ, নেই হারানোর হাহাকার।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

কেনেডি এয়ারপোর্ট

প্লেনের অটোমেটিক সবুজ আলোটা মিটমিট করে জ্বলে উঠে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। —মাথার ওপরে লাল আলোয় একটা লেখা ভেসে উঠলো— 'FASTEN YOUR SEAT BELT' অর্থাৎ আপনার সিট— বেল্টটা কোমরে বাঁধুন...,

তারপরেই জেট্ প্লেনের একঘেয়েমি গোঙানিব মধ্যে মেয়েলি শব্দ ভেসে উঠলো 'আমরা কুড়ি মিনিটের মধ্যেই কেনেডি এয়ারপোর্টে অবতরণ করছি। আবহাওয়া পরিষ্কার, স্থানীয় সময় বেলা ১০টা ২৯ মিনিট। আপনাদের বন্ধুত্বের জন্য বিশেষ ধন্যবাদ জানাই। আশা করি আবার দেখা হবে। গুড বায়'।

বুকের ভেতরটা আনন্দে লাফিয়ে উঠলো, ওঃ! বহুদিনের অপেক্ষার পর শেষকালে সত্যি আমি আমেরিকায় পৌঁছচ্ছি! আনন্দে লাফাতে ইচ্ছে করছে, চিৎকার করে সবাইকে বলতে ইচ্ছে করছে, শেষ পর্যন্ত আমি আমেরিকায় পৌঁছচ্ছি। ভারতের মাটি আমি যখন ছাড়ি তখন আমার পকেটে ছিল মাত্র আঠারো টাকা, তারপর তিন বছরের অনেক ধাক্কা সামলিয়ে শেষ পর্যন্ত আমি এখন আমেরিকার আকাশে।

দোলনার মতো প্লেনটা হু-হু করে নীচের দিকে নামছে, মাথার ভেতরটা কেমন যেন ঘুরপাক খাচ্ছে— কি জানি বাপু হয়তো একেই বলে মাথাঘোরা। বিরাট গতিতে প্লেনটা নামছে; এসময় অনেকেরই মাথা ঘোরে—গা বমি-বমি করে। আমার এর আগে কোনদিন এমন হয়নি, কিন্তু আজ এই প্রথম—জানি না মানসিক উত্তেজনার কারণে কি না। হঠাৎ বিরাট ঝাঁকুনি খেলাম—সাইকেল চালাতে চালাতে হঠাৎ গর্তে পড়ার মতো, বুঝলাম আমাদের মহাযান আমেরিকার মাটিতে নেমেছে। যাকগে বাবা, শেষ পর্যন্ত নির্বিঘ্নে পৌঁছলাম, চোখ বুজে ভাগ্যবিধাতাকে স্মরণ করলাম— হে ঠাকুর! তোমার কৃপায় আজ আমি এখানে পৌঁছলাম, তোমার ভরসাতেই আমি রইলাম।

রবিবার ২৪ মে ১৯৩০ সাল সকাল ১০টা ৩০ মিনিট। হোস্টেস্‌কে ধন্যবাদ জানিয়ে নেমে এলাম নীচে, একটা সুরঙ্গ পথের মতো চারদিক ঢাকা রাস্তা দিয়ে যেখানে এসে পৌঁছলাম সেটা হচ্ছে লাগেজ হল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সেখান থেকে আমার পিঠের ঝুলি ও সাইকেলটা সংগ্রহ করলাম। সাইকেলটার আসলে দুটো চাকা খুলে আমি ছোট করে রেখেছিলাম; তাই খুব তাড়াতাড়ি সেটাকে জুড়ে নিলাম। এবার ব্যাগটাকে যথারীতি তার পেছনে রেখে এগিয়ে চললাম কাস্টমস-এর দিকে। এখানে বেশ ভীড়। আমি যথারীতি ম্যানেজ করে আরও এগিয়ে এলাম।

—পাসপোর্ট?

তাড়াতাড়ি পকেট থেকে পাসপোর্টটা তার হাতে দিলাম। বর্ডার পুলিশ ভদ্রলোক এবারে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,

—নির্দিষ্ট স্থান?

—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র— জবাব দিলাম।

—আপনি এখন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে, কিন্তু কোথায় যাবেন?

—সম্পূর্ণ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ঘোরাই আমার উদ্দেশ্য।

—সঠিক করে বলুন কি উদ্দেশ্য?

—ভ্রমণ।

—পকেটে তাহলে নিশ্চয়ই টাকা আছে?

আমি সরাসরি জবাব দিলাম— নিশ্চয়ই।

—কত?

—যথেষ্ট।

—সঠিক কত? তিনি আবার প্রশ্ন করলেন।

আমি উত্তর দিলাম— যথেষ্ট, অর্থাৎ নিজেকে চালাবার মতো।

—আপনার রির্টান টিকিট আছে?

—না।

—আপনার এখানে পরিচিত আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধব কেউ আছেন?

—না।

—আপনার এখানে চেনা-জানা একজনের ঠিকানা দিন।

—আমি তো আগেই বলেছি এখানে আমার চেনা-জানা কেউ নেই। তবে হ্যাঁ— আপনি যদি জোর করেন তাহলে আমি বলতে পারি, একমাত্র আপনাকেই আমি চিনি।

ভদ্রলোক ঠোট দুটোকে কাণের কাছে টেনে মিচ্‌কি হেসে বললেন— তাই নাকি?

ভদ্রলোক আবার আগের প্রশ্নে এলেন—

—কত টাকা পকেটে আছে? ডিক্লেয়ার করুন।

আমি পকেট থেকে এবার প্রায় $ 7.30 cents (সাত ডলার তিরিশ সেন্ট) গুণে তাঁর কাছে রাখলাম। মুখে বললাম— এই সব।

—এই সব? মানে আপনি কি বলতে চান এই সাড়ে সাত ডলার দিয়ে আপনি আমেরিক ঘুরবেন?

আমি হেসে বললাম— বিশ্বাস করুন এই যা কিছু আছে তাই সম্বল।

বর্ডার পুলিশ এবারে একটু অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন। আমার পেছনে প্রায় একশ' জন দাঁড়িয়ে, যদিও পাশাপাশি এ রকম আরও পাঁচটা কাউন্টার, কিন্তু বিদেশীদের জন্য মাত্র তিনটি। পেছন থেকে ক'একজন চেঁচিয়ে উঠলো— তাড়াতাড়ি করুন মশায়।

বর্ডার পুলিশ ভদ্রলোক পাশে অপেক্ষারত আরেকজন সহকর্মীকে ডেকে আমাকে তার হাতে সঁপে দিলেন। আমাকে তিনি তাঁদের অফিসারের ঘরে এনে হাজির করলেন। অফিসার ভদ্রলোক গোলগাল ও লাল্চে ধরণের দেখে মনে হলো শান্ত স্বভাবের।

তিনি আমার পাসপোর্টটা ভালোভাবে পরীক্ষা করে শেষে জিজ্ঞেস করলেন— ব্যাপারটা কি খুলে বলুন।

আমি বললাম— ব্যাপারটা আসলে খুব সাধারণ, এই দেখুন আমার ভিসার মেয়াদ পুরোপুরি রয়েছে। এই দেখুন, আমার হেল্‌থ সার্টিফিকেট সব ঠিক-ঠাক। আসল কথা হচ্ছে যে আমার পকেটে মাত্র সাড়ে সাত ডলার আছে, তাই আমি ভেতরে ঢোকবার ছাড়পত্র পাচ্ছি না।

অফিসার ভদ্রলোক বললেন— সেটা ঠিক কথা। মাত্র সাড়ে সাত ডলার এখানে কিছুই না। এই এয়ারপোর্ট থেকে শহরে একবার বাসে যাতায়াত করলেই সাত ডলার খতম। তারপর আপনি খাবেন কি, থাকবেন কোথায়?

আমি একটু চিন্তিত হয়ে বললাম— তাইতো, কোথায় থাকব, কি খাব সেকথা তো ভাবিনি। তবে এখন আমি এমন অবস্থায় যে যদি আমাকে আপনি ঢুকতে না দেন তাহলে আমি করব কি? এখান থেকে আমার ভারতে ফেরার টিকিট নেই।

পাশের শূন্য চেয়ারটা দেখিয়ে ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলাম— আমি একটু বসতে পাবি কি?

—অবশ্যই। ভদ্রলোক জবাব দিলেন।

আমি এবার আমার ইতিহাস খুলে জানালাম—সংক্ষেপে তাঁকে বললাম— আমি একজন ভবঘুরে। মানুষের মনুষ্যত্ব আর ভগবানের ওপর আস্থা রেখে এই সাইকেলটা নিয়ে আমি ভূ-পর্যটনে বেরিয়েছি। আমি অনেক দেখেছি, দেখেছি লণ্ডন, প্যারিস, রোম আর সব জায়গাতেই পেয়েছি আদর অভ্যর্থনা আর খাতির। আপনারা পয়সায় চড়ে বিদেশ দেখেন আর অমি বিদেশ দেখছি আত্মবিশ্বাসের ওপর ভরসা করে। আপনি যদি বিশ্বাস না করেন তাহলে এই দেখুন বিভিন্ন দেশের সাংবাদিকরা আমার সম্পর্কে কি বলেন—এই দেখুন এখানে নাগরিক সম্বর্ধনার কিছু নমুনা। হ্যাঁ, এই দেখুন আমাদের ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের মন্তব্য রয়েছে, পড়ে দেখুন।

ভদ্রলোক আমার কাগজপত্রের ওপর নজর দিলেন। আমি অবশ্য নিজের মুখে কিছু বলি না— অনেক সময় দেখেছি, নিজের মুখে নিজের কথা বললে অনেকে ভাবে অহংকারী, অনেকে ভাবে বাহাদুরী নিচ্ছি— কিন্তু এমতাবস্থায় আমি বলতে বাধ্য হলাম; নয়তো ছাড়পত্র মেলা ভার।

বেশ কিছুক্ষণ পরে ভদ্রলোক মুখ তুললেন। হাসি মুখে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন, করমর্দন করে বললেন, —কনগ্রাচুলেশন! ওয়েলকাম টু দা স্টেট্‌স (Congratulation! Welcome to the States)।

আমি হেসে তাঁকে ধন্যবাদ জানালাম।

বিমান বন্দরের জনারণ্য থেকে বেরিয়ে এলাম বাইরে। পেট্রোলের গন্ধে ভরা বাতাসে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম—যাক্ গে বাবা, সব ঝামেলা মিটলো, এবার আমার যাত্রা হলো শুরু।

ম্যাপ বার করে দেখলাম তাতে নিউ ইয়র্ক শহর আছে কিন্তু শহরতলীর কোনো চিহ্ন নেই। ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে গিয়ে ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলাম— আচ্ছা স্যার, এখান থেকে সিটিতে যাওয়ার রাস্তাটা বলতে পারেন?

—রাস্তা দিয়ে কি হবে, ভেতরে বসুন আমি আপনাকে নিয়ে যাব।

আমি আমার সাইকেলটা দেখিয়ে বললুম— না না, আমি ট্যাক্সিতে যাচ্ছি না, এই দেখুন না আমার সাইকেল রয়েছে।

ড্রাইভার ভদ্রলোক হো হো করে হেসে উঠলেন। হাসি থামলে বললেন— কাম্ অন্ বয়, ইউ কিডিং— অর্থাৎ বালকের কথা শোনো।

—অ্যাঁ, ঠাট্টা করছ?

আমি আর কথা না বাড়িয়ে— আরও এগিয়ে এলাম। তারপর যেদিকে অধিকাংশ গাড়ী যাচ্ছে সেইদিক লক্ষ্য করে রাস্তা ধরলাম। কিছুদূর এগোতেই রাস্তায় নজরে পড়লো— নিউ ইয়র্ক শহরে যাবার নিশানা। আরও একটু এগোতেই রাস্তাটা হঠাৎ চওড়া হয়ে এলো, শুরু হলো হাইওয়ে— এখানে ফুটপাত নেই, বিরাট রাস্তার মাঝখান দিয়ে কংক্রিটের তিন ফুট উঁচু পাঁচিল তুলে যাওয়ার ও আসার পথ ভিন্ন করা হয়েছে। আমি তারই একটা পথ ধরে চলতে শুরু করলাম। মাত্র কয়েক চাকা এগিয়েছি, হঠাৎ পেছনে গাড়ীর হর্ন শুনতে পেলাম— প্রায় সব গাড়ীগুলোই আমাকে ক্রস করার সময় একবার করে হর্ন বাজিয়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটা কি? এরা কি বলতে চায়? পেছনের ব্যাগটা পড়ে যায়নি তো— না সব ঠিক ঠাক। আবার একটু এগোতেই পাশে একটা গাড়ী প্রায় আমাকে ছুঁয়ে— ড্রাইভার মুখ বার করে চেঁচিয়ে আমাকে এ পথে চলতে নিষেধ করে দিল। কি বিপদ! আর আমি চলেছি একদম ধার ধরে, তাতেও বাধা— হঠাৎ একটা চেভরোলেট্ (Chevrolet) আমার পেছনে এসে দাঁড়ালো। ভদ্রলোক আমাকে বললেন— তোমার কি জীবনের ভয় নেই? কেন বাবা মিছিমিছি জীবনটা দেবে, এই হেভি ট্রাফিক ধরে এগোনো মানে সাক্ষাৎ মৃত্যু, সে তুমি যত ভালো সাইক্লিস্টই হও না কেন!

ভদ্রলোক খুব দয়ালু। তিনি আমাকে প্রায় কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়েই আমার মালপত্র ও সাইকেল সমেত তাঁর গাড়ীর পেছনে তুলে নিলেন।

গাড়ীতে স্টার্ট দিয়ে ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞেস করলেন— কোথায় যাবে?

—নিউ ইয়র্ক সিটি।

—চল, আমিও সেখানে যাচ্ছি।

কথায় কথায় আমি ভদ্রলোককে বললাম যে আজকে এইমাত্র আমি এখানে নেমেছি। ভদ্রলোক বললেন— তা আমি তোমাকে দেখেই বুঝেছি। শোনো বাছা, আমার ছেলেও সাইকেলে করে গত বছর ফ্রান্স ও জার্মানি সফর করেছে ঠিক তোমার মতোই। কিন্তু এই হাইওয়েতে সাইকেল চালানো আর ইউরোপে সাইকেল চালানো অনেক তফাৎ। শুধু তাই নয়, এখানকার হাইওয়েতে সাইকেল চালানো আইনত নিষেধ। তুমি এক কাজ কর, নিউ ইয়র্ক থেকে তুমি ম্যাপ দেখে সেকেন্ডারী রোড ধরে তারপর তোমার সফর শুরু কর, বুঝলে?

ভদ্রলোক সত্যি অমায়িক। তাঁর উপদেশ আমি শিরোধার্য করে নিলাম। মনে মনে ভাবলাম, ঠিক আছে, আমি নিউ ইয়র্কের ভারতীয় দূতাবাস ভবন থেকেই শুরু করব আমার সাইকেল চালানো। প্রায় দেড়ঘণ্টা পর ভদ্রলোক থামলেন, আমাকে একটা বাস্তা বাৎলে দিয়ে বললেন— তুমি এই রাস্তা ধরে সরাসরি এগিয়ে গেলেই পাবে সেন্ট্রাল পার্ক— হার্ট অফ নিউ ইয়র্ক। ভদ্রলোক করমর্দন করে বিদায় জানালেন। মজা মন্দ নয়! আমেরিকায় পা দিতেই শুরু হলো আতিথেয়তা। দেশটা শুভ বলেই যেন মনে হচ্ছে। যাই হোক আমি ভদ্রলোকেব কথামতো এগিয়ে চললাম। ভাগ্য ভালো এটা হাইওয়ে নয়।

ভদ্রলোক বললেন সেন্ট্রাল পার্ক হচ্ছে নিউ ইয়র্ক শহরের প্রাণকেন্দ্র। কাজেই তাঁর নির্দেশ মতো আমি পা বাড়ালাম অর্থাৎ প্যাডেলে পা দিলাম। আমি এখন নিউ ইয়র্ক শহরে— দু'পাশে উচু উচু বাড়ির পাঁচিল— তার ভেতর দিয়ে মন্দ গতিতে এগিয়ে চললাম। এভাবে প্রায় আধঘণ্টা চলার পর একটা রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়ালাম। জলতেষ্টা পেয়েছে আর তার সঙ্গে পেটের মধ্যে মনে হচ্ছে ছুঁচোয় ডন মারছে, তাই আশপাশে একটা বারের সন্ধান নিলাম।

হ্যাঁ, কাছেই দেখছি একটা চায়ের দোকান। সাইকেলটা একটা ল্যাম্প-পোস্টের সাথে ঠেস দিয়ে রেখে আমি পাশের বারে মানে চায়ের দোকানে ঢুকলাম।

সামনে টাঙানো বিরাট একটা বোর্ডে মেনু লেখা রয়েছে। নজরে পড়লো মিল্ক-সেক চকোলেট-সেক টি-কফি ইত্যাদি। দোকানদার কালো ভদ্রমহিলাকে জিজ্ঞেস করলাম, এই মিল্ক সেক জিনিসটা কি। তিনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝিয়ে বললেন, জমাট দুধ আর বরফের মিশ্রণ।

—ঠিক আছে, আমাকে একটা মিল্ক-সেক দিন আর একটা ডবল ডিমের সফট্ ওম্লেট।

লম্বা একটা টুলের ওপর বসে এদিক-ওদিক দেখতে লাগলাম। আশেপাশে আরও তিনজন খদ্দের পাউরুটির মধ্যে মাংসের পোটলা গোঁজা স্যান্ডউইচ পরমানন্দে কোকাকোলার সাথে গিলছিল। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ভুরু কুঁচকে একজন বলে উঠলো— হে.... মানে অনেকটা বাংলায়, ভালো তো? আমিও একটু মুচকি হেসে মাথা নাড়লাম।

একটা আধসেরি গ্লাসে বরফ ও দুধের ঘন মিশ্রণ এল আর তার সাথে ওম্‌লেট। ওমলেটটা গালে দিয়ে ভদ্রমহিলাকে জিজ্ঞেস করলাম— আচ্ছা এখানে সেন্ট্রাল পার্কটা কোথায়?

—এদিকে এসো, ওই যে লম্বা গাছগুলো দেখছো, ওইটাই সেন্ট্রাল পার্ক— তার মানে এর পরের ব্লক। পকেট থেকে এক ডলার সত্তর সেন্ট গুণে দিয়ে আবার হাঁটা ধরলাম সেন্ট্রাল পার্কের দিকে। তার মানে আমি এখন নিউ ইয়র্কের প্রাণকেন্দ্রে।

বড় বড় শহরে এই ধরণের পার্কগুলো থাকাতে আমাদের মতো ভবঘুরেদের খুব একটা বিশ্রামেব অসুবিধা নেই— এই একটা বিবাট সহায়। বড় বড় সব শহরেই বিরাট বিরাট পার্ক ও ময়দান। লন্ডনে পেয়েছি হাইড্ পার্ক, প্যারিসে লুভ্‌স, রোমে তিভেবা পার্ক, এথেন্সে সিন্দাগ্‌মা পার্ক। আর সব জায়গাতেই দেখেছি যে পার্কগুলো ট্যুবিস্টদের এক মিলনকেন্দ্র। পার্কেব একটা গাছতলায় সাইকেলটাকে শুইয়ে দিয়ে আমি বসলাম। শেষ পর্যন্ত আমি আমেরিকায়, বিশ্বাস হচ্ছে না সত্যিই কি এটা আমেবিকা! এতক্ষণ পরে ভালোভাবে আশপাশেব দিকে নজব দিলাম।

ছোটবেলায় ভূগোলে পড়েছিলাম কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার। পঞ্চদশ শতাব্দীর সেই অভিযাত্রীর নৌকোটা এখানে কোথায় এসে ঠেকেছিল কে জানে। নিউ ইয়র্ক সম্পর্কে অনেক অনেক গল্প রহস্য শুনেছি বটে—ভেবেছিলাম নিউ ইয়র্ক মানে কুবেরের দেশ। আমাদের কলকাতা অতি ছোট্ট জঘন্য আর নোংরা। আর নিউ ইয়র্ক মানে অতি সুন্দর আর পরিচ্ছন্ন। অনেকের মুখেই আমি তা শুনেছি। আমি কলকাতার ছেলে, কাজেই কলকাতাকে চিনি। এখন নিউ ইয়র্ক চিনছি— অথচ প্রভেদটা ঠিক চোখে পড়ছে না, তবে হ্যাঁ, এই তো সবে শুরু।

হ্যাঁ, আমি মাত্র ঘণ্টা চারেক হলো আমেবিকায় পৌঁছেছি; তাই আমার প্রথম অভিজ্ঞতার কথা বলছি। এই ধরা যাক, সামনের এই রাস্তাটা কলকাতার বড়বাজারের কাছে হ্যারিসন রোডের দৃশ্য; তবে হ্যাঁ, হ্যারিসন রোডের দুপাশের বাড়ীগুলোর সঙ্গে আরও যদি পঞ্চাশ তলা জুড়ে দেওয়া যেতো তাহলে ঠিক আমার এই সামনের দৃশ্যটাকে বড়বাজার বলতে ভুল হতো না। ডানদিকে দেখতে পাচ্ছি ডাস্টবিনে ময়লা উপছে পড়ছে, ছোট্ট একটা ঠেলা গাড়িতে একজন ডিম তরকারীর পিঠে বিক্রি করছে। পাশের বেঞ্চিতে একজন নিগ্রো মাথায় জুতোর বালিশ দিয়ে দিব্যি নাক ডাকাচ্ছে! আমার দৃষ্টি যতদূর যায় তাতে ভারী একটা কিছু আশ্চর্যজনক বলে মনে হচ্ছে না। সেন্ট্রাল পার্কের এই অংশটাকে অনেকটা ধর্মতলা স্ট্রীট ও মৌলালীর কাছাকাছি যদি ইডেন গার্ডেনটা থাকতো তাহলে যেমন দেখাতো আমি ঠিক তেমনি বলবো। সত্যি কথা বলতে কি—আমেরিকার এই দুরবস্থা আগে যদি জানতাম, কে আসতো রে বাবা অত কাঠখড় পুড়িয়ে এই সাত সমুদ্র পারে।

পাঠকদের আমি অনুরোধ করছি, হতাশ হবেন না, এটা আমার মাত্র চারঘন্টার অভিজ্ঞতা, দয়া করে বাকিটাও পড়ুন, তাহলে বুঝবেন আমেরিকা জিনিসটা কি?

পার্কের মধ্যে গাছের ছায়া, দুব্বো ঘাস আর গরমকালে ঠাণ্ডা বাতাস, এসব কিছু মিলিয়ে সত্যি আমি ঘরোয়া মনে করে দেহটাকে বিছিয়ে দিলাম। গত দুদিন যাবৎ ঘুম নেই; প্লেনে একবার ঘুমোনোর চেষ্টা করেছিলাম বটে, কিন্তু ওই জেটের গোঙানির শব্দে ঘুমের সাধ্য কি আমার কাছে ঘেঁসে— তাই ভাবলাম নিউ ইয়র্ক ঘোরার আগে একটু ঘুম দেওয়া যাক তো! ছোট ব্যাগটা মাথায় রেখে আর বড় পিঠের ব্যাগটাকে কোল-বালিশ করে একটু চোখ বুজবার চেষ্টা করলাম। ওঃ! সত্যি আমি ক্লান্ত।

হঠাৎ অনেক লোকের হাততালি ও ঢোলের শব্দে আমার ঘুম ভাঙলো। কি জানি স্বপ্ন দেখছি না তো —ভালো করে চোখটা রগড়িয়ে উঠে বসলাম। ওঃ, বেশ ঘন্টা খানেক ঘুমিয়েছি বলে মনে হচ্ছে, তাই শরীরটা খুব হাল্কা ঠেকছে। এমন বিনি পয়সার হোটেল সব সময় পাওয়া মুশকিল। কিছুটা দূরে নজরে পড়লো— তাইতো— ছোট-খাটো একটা ভীড় জমা দেখছি। গড়েব মাঠের মতো বাঁদরের নাচ নয়তো! তম্বুরাব শব্দের সাথে গীটারের সংমিশ্রণ, তার সাথে আরও কয়েকটা বাদ্যযন্ত্র, তার সাথে মিলে এক অদ্ভুত ধরনের বাদ্য কাংস্য ঝংকারের সৃষ্টি করছে। এই ধবনের বিদেশী ঝংকারের সুর আমি ঠিক বুঝি না, আমার হৃদয়কে ঠিক দোলা দেয় কি না জানি না, কিন্তু মাথায় যে ঝংকার তোলে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ।

আমি এবার উঠলাম, নিউ ইয়র্ক শহবে একবার চোখ বোলানো যাক। সকালে ভালভাবে ঠিক উপলব্ধি করতে পারিনি—কিন্তু এখন এখানকার বাড়ীগুলো যেন নতুন করে ধরা দিল।

রাস্তার দুপাশের বাড়ীগুলো এত উঁচু আগে লক্ষ্য করিনি, আকাশচুম্বী, একে প্রাসাদ বলা যায় কিনা জানিনা, তবে বাড়ীর পাহাড় বললে ভুল হবে না। সাইকেলটাকে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আরও কিছুদূর এগিয়ে এলাম, এবার জায়গাটাকে আমার বহু পরিচিত ছবিতে দেখা নিউইয়র্ক বলে মনে হলো, চারদিকে শুধু বাড়ী বাড়ী আর বাড়ীর পাহাড়! বাড়ীর জঞ্জালে এখানে আকাশ ঢাকা পড়েছে; আমার বাঁদিকে, ডানদিকে আর সামনে পেছনে রাস্তার দুধারে বাড়ীর পর বাড়ী দাঁড়িয়ে আকাশকে যেন ধিক্কার দিচ্ছে। এক-একটা বাড়ী ক'তলা হবে কে জানে? গোনা যাক্—এক-দুই-দিন... ১০-১৫-২০-২৫-৩০, ওঃ নাঃ বারবার গুণেও ঠিক সংখ্যা দাঁড় করানো মুশকিল, সব কিছু মিলিয়ে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। গুণতে গুণতে মাথাটাকে ওপরে তুলে চোখের দৃষ্টিকে রাস্তার সাথে লম্বা করে দিয়েও যেন অকূল— ক'তলা বাড়ী কে জানে! যাই হোক, এ নিয়ে আমার মাথাব্যাথা কেন? ঘাড়ে হাত দিয়ে ঘাড়ব্যাথা সামলিয়ে হাঁটা ধরলুম সামনের দিকে। রাস্তাটা অনেকট কলকাতার ল্যান্সডাউন

রোডের সাথে তুলনা করা যায়। দুপাশের আকাশছোঁয়া বাড়ীর পাঁচিল ডিঙিয়ে সূর্যদেব এখানে প্রবেশ করেন কি না সন্দেহ। পাশে একটা চতুর্দশ শতাব্দীর কাজ করা গীর্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করে বিকেল চারটে ঘোষণা করলো। দেখতে দেখতে চারটে বেজে গেল—এবার একটু ক্ষিদের ভাবটা জেগে উঠলো। আশেপাশে দোকানপত্র কিছু চোখে পড়ছে না। দোকান খুঁজতে খুঁজতে সামনে চোখে পড়লো, বিরাট অক্ষরে লেখা রকফেলার প্লাজা— তার মানে আমেরিকার প্রতিপত্তিশালী মহামান্য রকফেলার সাহেবের বাড়ীর সামনে এখন আমি দাঁড়িয়ে। সামনেই চোখে পড়লো বিরাট এট্‌লাসের স্ট্যাচু, গ্রীক রূপকথার নায়ক এট্‌লাস পৃথিবীটাকে কাঁধে বহন করে দাঁড়িয়ে আছে। অনেক রূপকথায় আছে যে এই মহাদানব যখন ক্লান্ত হয়ে এ পৃথিবীটাকে এক কাঁধ থেকে আর এক কাঁধে নেয় তখনই শুরু হয় ভূমিকম্প। অবশ্যই এটা গ্রীক রূপকথা। রকফেলার সাহেবের ইচ্ছে ছিল তাঁর বাড়ীর সামনে থাকবে পৃথিবীর বৃহত্তম স্ট্যাচু। টাকায় কি না করা যায়! তিনি ভেবেছিলেন টাকায় পৃথিবীটাকে কিনে কাঁধে করে রাখবেন আর তারই প্রতীক হিসেবে হয়তো এই এট্‌লাসের বিরাট মূর্তি। তবে আশে-পাশের বাড়ীর বেড়া ডিঙিয়ে এই মূর্তিটাকে দেখা সম্ভব নয়। ব্রোঞ্জের মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে এই ইটপাথরের তৈরী আকাশছোঁয়া বাড়ীটার তলায় হয়তো এখনি গ্রীকবীর এট্‌লাস চাপা পড়ে মরবে। বাড়ীটা পঞ্চাশ ষাট অথবা সত্তর তলা হয়তো হবে, মানে আমাদের কলকাতার সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিংএর আরও প্রায় কয়েকগুণ উঁচু। ভেবে আশ্চর্য হই, এত চুন-সুরকিও পৃথিবীতে ছিল!

গুরুদেব বলেছেন, মানুষ নির্মাণ করে প্রয়োজনে আর সৃষ্টি করে আনন্দে— কিন্তু এই আকাশচুম্বী বাড়ীগুলোকে নির্মাণ বলবো না সৃষ্টি বলবো বুঝে উঠতে পারছি না। পাশের একটা উঠোনের মতো রাস্তা দিয়ে এবার বাড়ীটার অন্যদিকে এলাম। মাটির থেকে অনেক নিচে একটা বড় উঠোন দেখতে পেলাম। তার চারপাশে বিভিন্ন দেশের পতাকা উড়ছে, আর মাঝখানে সুসজ্জিত টেবিল চেয়ার পাতা—আর সাদা পোষাকের সাথে কালো বাটারফ্লাই টাই পরে বেহারার দল কর্মব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটি করছে, তার মানে অনেকটা রাজপ্রাসাদের উঠোনে চায়ের বৈঠক। আর তার একপাশে সোনালী রঙের একটা বাষ্পমান মানুষের স্ট্যাচু সম্পূর্ণ পরিবেশের আভিজাত্য বাড়িয়ে তুলেছে।

আমি রেলিঙের ওপর ভর দিয়ে চারদিক দেখতে লাগলাম। উঠোনটার চারপাশে বিরাট বিরাট ফুলের টবে ফুল ও ঝাউগাছের বোঝা, শুকনো আভিজাত্যের মধ্যে সৌন্দর্যের প্রকাশ। পাশের ভদ্রলোক তাঁর ক্যামেরা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সাধারণ জিনিসের অসাধারণ ফটো তুলতে ব্যস্ত; তাঁর ওই ব্যস্ততার মধ্যেই আমি হঠাৎ বললাম,

—ব্যাপার কি দাদা? এই উঠোনে কি কোনো চা-পর্বের অনুষ্ঠান হচ্ছে?

—আরে না, এটা কফির উঠোন, এ সকলের জন্য খোলা, বিশেষ করে ট্যুরিস্টরা এখানে বসে এক কাপ চা খেতে খেতে রকফেলার-এর গল্প করে।

—ওঃ তাই না কি? ভালোই হলো, আমারও এক কাপ চায়ের দরকার। আচ্ছা ধন্যবাদ দাদা।

কোটিপতি রকফেলার বাড়ীর মহামূল্য পাথরের দেয়ালে আমার দুর্মূল্য সাইকেলটাকে ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে আমি চা-চক্রের উঠোনে নেমে এলাম। চেয়ারে বসবার সাথে সাথে একজন বেয়ারা সামনে এসে হাসিমুখে দাঁড়ালো—

—কি দেবো স্যার?

—এক কাপ চা।

—লেবুর সাথে না দু'ধের সাথে?

দুধের স্বাদ কি ঘোলে মেটে? তাই আমি বললাম,

—দুধের সাথে।

চা এলো। চা-এর থেকে চা-এর সরঞ্জাম এলো বেশী, চা পান করলাম মহানন্দেই। তারপর বেয়ারাকে জিজ্ঞেস করলাম,

—কত দাম ভাই?

—সাড়ে তিন ডলার।

আঁতকে উঠলাম, কিন্তু কি আর করা যায়, সিড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে আমার ছেঁড়া জুতোটার দিকে তাকালাম, মনে মনে ভাবলাম— কলকাতায় থাকলে চায়ের পয়সা দিয়ে একজোড়া জুতো হয়ে যেতো।

সাইকেলটার কাছে আসতেই একজনের সঙ্গে প্রায় মুখোমুখি, মনে হলো ভারতীয়। বিশেষ করে তাঁর সঙ্গে শাড়ীপরনে ভদ্রমহিলাকে দেখেই যেন মুখ দিয়ে ফস্ করে বেরিয়ে পড়লো,

—নমস্কার দাদা, দেখে ভারতীয় মনে হচ্ছে।

—হ্যাঁ আমরা ভারতীয়, আপনি?

—আমিও।

ভদ্রলোক আমার পোষাক ও সাইকেলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন,

—তা এখানে আপনি... মানে—

—মানে একটু বেড়াতে বেরিয়েছি।

—একটু বেড়াতে বেরিয়েছি—একটু বেড়াবার জন্য শেষকালে নিউ ইয়র্কে আসতে হলো!

ভদ্রলোক অনেকটা তির্যকছলে কথাটা ছুঁড়লেন। আমি ভদ্রলোককে খুলে বললাম আমার ব্যাপার। তিনি খুব খুশী হলেন, তারপর আশ্চর্য হলেন। শেষে বললেন,

—আমি খুবই দুঃখিত ভাই, আমরা এখানে খুবই নতুন। এই বছরখানেক হলো এখানে এসেছি। আমাদের ঘরটা খুবই ছোট, নয়তো আপনাকে নিমন্ত্রণ করা যেতো।

আমিও সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলাম— নিমন্ত্রণ করলেই কি হলো, আমার সময় কোথায় যাবার, আমিও দুঃখিত। তারপর নমস্কার জানিয়ে পা বাড়ালাম। এই ধরণের ফালতু আলাপ আমার কাছে নতুন নয়, লন্ডনে এই ধরনের প্রচুর মানুষ দেখেছি। যদি তারা দেখে যে, আমার ছেঁড়া প্যান্ট, ব্যস তাহলেই অন্য পথ এমন কি পেছন থেকে ডাকলেও তাদের কর্ণরন্ধ্রে তখন মোম ঢালা।

এবার কোথায় যাওয়া যাবে তাই ভাবছি, হঠাৎ একজন পুলিসম্যান চোখে পড়লো। কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম কোথায় যাওয়া যাবে,— তিনি আপশোষ করে বললেন,

—আজ রবিবার সব কিছুই বন্ধ, কোথায় আর যাবেন!

তাইতো— আজ রবিবার সে কথা মনেই ছিল না—তাইতো বলি —সব কিছু যেন কেমন ফাঁকা ফাঁকা মনে হচ্ছিল। যাই হোক পুলিশম্যান ভদ্রলোক আমাকে রবিবারে খোলা গ্রেহাউন্ড বাস স্টেশনের ইনফরমেশন অফিসের ডিরেকশন বাৎলে দিলেন।

অনেকগুলো রাস্তার লাল সবুজ আলো ডিঙিয়ে শেষে আমি এসে হাজির হলাম গ্রেহাউন্ড বাস টারমিনাসে। ভেতরে ঢুকতেই চোখ চড়কগাছ। এই কি বাস টার্মিনাস অর্থাৎ বাস ডিপো। বিরাট হলঘরের ভেতর এ যেন অন্য এক জগৎ, কলকাতার যে কোন বাস ডিপোকে এর তুলনায় বাস স্টপেজ বলা চলে।

গ্রে হাউন্ড হচ্ছে কোম্পানীর নাম। বাস টারমিনাসটা তিনতলা। বিভিন্ন তলা থেকে বিভিন্ন দিকের বাস ছাড়ে। এই বাস টারমিনাসটাকে আমি হাওড়া স্টেশনের ওই বিরাট হলের সাথে তুলনা করতে পারি। তার মানে বাস টারমিনাস যে এত বড় হতে পারে তা আমার আগে কোন ধারণাই ছিল না। সেখানে ইনফরমেশন নিয়ে জানলাম যে, আজ রবিবার প্রায় সব কিছুই বন্ধ। তবে ডাউন টাউনে অর্থাৎ শহরতলীতে বিশ্বমেলা কেন্দ্রে একটা আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী হচ্ছে; সেখানে ইচ্ছে করলে যেতে পারি। সেটা অবশ্য এখান থেকে খুব কাছে নয়, তবে খুব দূরেও নয়, ইনফরমেশন অফিসার আমাকে একটা ম্যাপ দিয়ে সেখানে যাবার পথ বলে দিলেন।

ভেবেছিলাম পথটা খুব দূর নয়, কিন্তু রাস্তা ধরে অনেকদূর এগিয়ে এবং কয়েকটা ব্রীজ পেরিয়েও যখন দেখলাম যে এখনও প্রায় আধা রাস্তা বাকি, তখন সত্যি মনে হলো অনেকদিন যাবৎ পেটে কিছু পড়েনি। শুধু চায়ের ওপর কি আর দিন চলে? কিন্তু আশেপাশে থাকা-খাওয়ার অন্য উপায় আছে বলে মনে হলো না। ইনফরমেশন অফিসার বলেছেন যে এই প্রদর্শনী রাত একটা পর্যন্ত। রবিবার দিন খোলা থাকে, কাজেই ভাবলাম এগিয়ে যাওয়াই ভালো। প্রায় ঘন্টাখানেক সাইকেল চালানোর পর আমি ঠিক জায়গায় এসে পৌঁছলাম। বিরাট আলোর খেলা, প্রচুর

লোকজন গেটের সামনে জড়ো— একটা অর্ধবৃত্তাকার গেটের ওপর লেখা রয়েছে—World Fair 1964-65— তার মানে ১৯৬৪-৬৫-র বিশ্বমেলা এখন গত, আর তারই মঞ্চ ব্যবহার করা হয়েছে পরবর্তী ছোটখাটো প্রদর্শনীর জন্য। লাইটের বাহার এর আগে অনেক দেখেছি— মেলাও অনেক দেখেছি, কাজেই ও সবে আমার দরকার নেই, ঠিক এই মুহূর্তে এখন আমার যা দরকার তা হচ্ছে সস্তায় পুষ্টিকর পেটভর্তি খাবার।

গেট দিয়ে ঢুকতে গিয়েই বাধা পেলাম, তাব মানে টিকিট কিনতে হবে। টিকিটের কত দাম?

—দশ ডলার, ছোটদের ও ছাত্রদের পাঁচ। অবস্থা সঙ্গীন! এতদূর এসে এখন যদি আবার ফিরতে হয় তাহ'লে আপশোসেব ব্যাপাব। আমি ঘাবড়াবার পাত্র নই। শুধু একটু চিন্তার দবকার। হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি জেগে গেল। গেটকিপারকে সবাসবি বললাম, আমি প্রোগ্রাম অফিসারেব সঙ্গে দেখা করতে চাই। বিদেশে প্রায় প্রত্যেক মেলা-ই একজন প্রোগ্রাম অফিসার থাকে, সেটাই স্বাভাবিক।

— প্রোগ্রাম অফিসার তাঁর অফিসে আছেন। তিনি জবাব দিলেন।

—-আমি তাঁব সঙ্গে দেখা করতে চাই।

—আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে?

—ক'টা বাজে এখন? সাড়ে আটটার মধ্যেই তাঁব সাথে আমার দেখা করা দরকার।

ভদ্রলোক আমাকে গেট ছাড়লেন। ভেতরে ঢুকে মনে হলো একবার যখন প্রোগ্রাম অফিসারের কথা মনে এসেছে তখন তাঁব সাথে একবার দেখা করা যাক। মেলাব মধ্যে প্রত্যেকটি রাস্তার মোড়ে বিভিন্ন জায়গায় যাবার নক্সা দেওয়া রয়েছে, কাজেই সরাসরি মেলার এড্‌মিনিস্ট্রেটিভ হলে যেতে আমার কোনো অসুবিধা হলো না।

দেখা হলো প্রোগ্রাম অফিসার মিঃ ওয়াকারের সঙ্গে, তিনি আমাকে সম্মান দিয়ে বসতে বললেন। তারপর যখন শুনলেন যে আমি সাইকেলে বিশ্ব ভ্রমণে বেরিয়েছি তখন তিনি খুব অবাক হয়ে গেলেন। ভদ্রতা করে তিনি বললেন-— এক কাপ কফি খান। আমি বললাম— বেশ ভালো কথা, তবে আমি শুধু কফি খাই না, তার সাথে ছোট-খাটো স্যান্ডউইচ হলে ভালো হয়। অবশ্য স্যান্ডউইচ যদি না পাওয়া যায় তাহলে এই ছোটখাটো একটা ডবল ডিমের ওম্‌লেট। ভদ্রলোক একটু থমকালেন বটে, কিন্তু শেষে একটা ওম্‌লেটের সাথে কফিব অর্ডার দিলেন।

ভদ্রলোক আমাকে মেলা সম্পর্কে বোঝাতে লাগলেন। এ জায়গাটা আন্তর্জাতিক মহলে বিশেষ পরিচিত। ১৯৬৪-৬৫ সালে এখানে পৃথিবীর একান্নটা দেশ থেকে তাদের বৈশিষ্ট্য এসেছিল.... জাপানের প্যাভেলিয়ানটা সত্যি দেখবার মতো ছিল। অবশ্য ভারতবর্ষের টি-স্টলটাও খারাপ ছিল না.... ইত্যাদি। বর্তমানে এখানে এই প্রদর্শনীটা বেসরকারী আর অধিকাংশই হাল্কা কাজের প্রদর্শনী, অধিকাংশই দৈনন্দিন

আসবাবপত্র, খেলনা আর বিলাস সংক্রান্ত সরঞ্জাম। ভদ্রলোক বলতে লাগলেন, আমিও উৎসাহী হয়ে শুনতে লাগলাম— শেষে কফি এলো, তার সঙ্গে টাও বটে। প্রায় আধঘণ্টা ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলে হাতে একটা প্রোগ্রাম নিয়ে এবং তাঁর আতিথেয়তার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে পড়লাম মেলা দেখতে, সাইকেলটাকে একটা দোকানের পেছনে রাখলাম, তবে বড় ব্যাগটা আমার সঙ্গেই রইল।

এদিক-ওদিক ঘুরতে ঘুবতে শেষে ডান দিকের মোড় ঘুরতেই চোখে পড়ল বিরাট সাইনবোর্ডে লেখা— 'ডু ইট ইওরসেলফ অফাবস্ ওরিয়েন্টাল ডিস' অর্থাৎ প্রাচ্য রন্ধন নিজের হাতে করুন। ব্যাপারটা কি? একটু এগোতেই ছোট-খাটো একটা ভীড় দেখতে পেলাম। একজন আমেরিকান ভদ্রমহিলা বিনা পয়সায় ভারতীয় রান্না শেখাচ্ছেন। দুটো টেবিলের উপর গ্যাসেব উনুন, হাঁড়ি, কড়া, খুন্তি সব সাজানো, তার পাশে কয়েকটা আলু, টমাটো, বেগুন আব গাজর। সামনে দর্শকদের জন্য প্রায় পঞ্চাশটা চেয়ার পাতা। সব স্থান পূর্ণ, যাবা বসতে জায়গা পায়নি তাবা পেছনে দাঁড়িয়ে। দর্শকদেব দেখে মনে হলো, সবাই খুব মনোযোগী ছাত্র-ছাত্রী। পাশেব একটা টেবিলে রাখা কিছু কাগজপত্র হাতে নিয়ে দেখি এগুলো ভদ্রমহিলার নিউ ইয়র্কের রান্নাব স্কুলের প্রচারপত্র। বুঝলাম ভদ্রমহিলা মিসেস মিলার, তিনি নিউ ইয়র্কের কোনো একটা স্কুলে রান্না শেখান। তিনি অনেক ঘুরেছেন, বিশেষ করে প্রাচ্য রন্ধন প্রণালীতে তিনি অভিজ্ঞা। এই প্রদর্শনীতে তিনি বিনা পয়সায় দর্শকদেব রান্না শেখান। আমি আমার কায়দামতো আস্তে আস্তে ভেতরে ঢুকলাম—এবার নজরে পড়লো, টেবিলের পাশে সাজানো ছোট ছোট নানা রকমের শিশি। ভদ্রমহিলা সমানে লেকচাব দিয়ে যাচ্ছেন আর সাথে সাথে তাঁর হাতে চলছে আলু বেগুন আর ছুরির মধ্যে। তিনি জনসাধারণকে বিশেষভাবে নোট করতে বলছেন মশলার কথা। রান্নার মধ্যে মশলার ব্যাপারটাই আসল, মশলার মাত্রা একটু কম বেশি হলেই ব্যস—সম্পূর্ণ পরিশ্রমটাই জল। কোন্ তরকারীতে কোন্ ধরনের মশলা কত পরিমাণ লাগবে সব তিনি তাঁর খাতা দেখে দেখে বোঝাতে লাগলেন। এ ধরনের রান্নার এক্জিবিশন এর আগে আমি কখনও দেখিনি, তাই দাঁড়িয়ে তা দেখতে লাগলাম। জনসাধারণের মধ্যে অধিকাংশই মেম মানে মেয়েমহল— সাহেব যে ক'জন দেখছি আমার মনে হয় তাঁরা তাঁদের স্ত্রীর সাথেই এসেছেন। সবাই মনোযোগী, অধিকাংশই নোট নিতে ব্যস্ত। এবার আরম্ভ হলো বেগুনী ভাজা। ময়দার মধ্যে একটু অলিভ তেল দিয়ে তার সাথে জল মিশিয়ে তাকে বেশম বানানো হলো। এবার তিনি কাটা বেগুনটাকে তার মধ্যে চুবিয়ে চুবিয়ে ফুটন্ত সূর্যমুখী ফুলের তেলে ছাড়তে লাগলেন। ভাজার শব্দে চারদিক ভরে উঠলো—তবে গন্ধটা যাতে খুব বেশি ছড়িয়ে অপরের বিরক্তি না ঘটায় তার জন্য স্টোভের উপরে বাষ্পাকর্ষণ যন্ত্র বসানো। সব কিছু হলে তিনি বললেন —এটাকে প্রাচ্য ভাষায় বলে ভাজি; এবার তিনি জাপানী ভাত রাঁধা শেখানো

আরম্ভ করলেন। আরেকটা স্টোভে অনেকক্ষণ আগে থেকেই কি যেন ফুটছিলো। ভদ্রমহিলা এবার ঘড়ি দেখে বললেন হাল্কা আগুন, ২০০ গ্রাম চাল, ২৫ মিনিট সময় যথেষ্ট। এবারে তিনি স্টোভ থেকে ফুটন্ত চালটা নামিয়ে তারমধ্যে দুটো টমেটো চার ভাগে কেটে দিলেন, তারপর টেবিলের পাশে সাজানো লাল-নীল শিশি থেকে প্রায় পাঁচ-ছ' রকমের মশলা ছোট চামচে করে তার মধ্যে যোগ করলেন। একটু পরে সেটাকে উনুনে চড়িয়ে তারমধ্যে একটা ডিম ভেঙে তার কুসুমটা ওর মধ্যে সন্তর্পণে ছেড়ে দিলেন যাতে ভেঙে না যায়। এবার আরও পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করতে হবে। তিনি নিপুণ শিল্পীর মতো রান্না-রতা। আমি তাঁর খুব কাছাকাছি না হলেও চোখের সরাসরি দৃষ্টির উপরেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ আমার চোখে তাঁর চোখ পড়তেই ভদ্রমহিলা একটু মুচকি হাসলেন, যেন অনেক দিনের পরিচিত। আমি তাঁর দিকে আরও এগিয়ে এলাম। তিনি এবার আমার কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন,

—আপনি কি পাকিস্তানী ?

—না, ভারতীয়।

—তাই নাকি ? তা বেশ, আমি বোম্বেতে তিন মাসের জন্য রান্না শিখতে গিয়েছিলাম। আপনিও কি রান্নার স্পেশালিস্ট নাকি ?

—ঠিক স্পেশালিস্ট না, তবে বন্ধু-বান্ধব মহলে ভালো রাঁধুনে বলে আমি সুপরিচিত, আমি সলজ্জভাবে বললাম।

—তাহ'লে আসুন না আমাকে একটু সাহায্য করুন।

—নিশ্চয়ই। আমি কাঁধের ব্যাগটা মাটিতে রাখলাম।

ভদ্রমহিলাকে আমার নাম জানালাম। আমি তাঁর নাম জানলাম— মিসেস মিলার, ওরিয়েন্টাল কুকিং স্পেশালিস্ট। ভদ্রমহিলা জাপানী ভাজো শেষ পর্বটা সেরে সবাইকে বললেন—এবার তিনি একটা নতুন সারপ্রাইজ দিতে চান। একজন ভারতীয় রাঁধুনে আজ তাদের মধ্যে উপস্থিত এবং এই মিঃ দে আপনাদের কিছু শেখাবেন। ভদ্রমহিলা এবার সরে দাঁড়ালেন। কানের কাছে মুখটা এনে বললেন— বাঁচালেন মশায়। সেই বিকেল ছ'টা থেকে বক-বক শুরু করেছি।

আমি সকলের সামনে এসে দাঁড়ালাম। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কোন্ প্রসঙ্গে বলি। শেষে একসময় আরম্ভ করলাম— প্রথমে আমি তাদের ভারত তথা প্রাচ্য রন্ধনপ্রণালীর উপর অনুরাগের ভূয়সী প্রশংসা করলাম। প্রাচ্যের খাদ্য সম্পর্কে তাদের আগ্রহের জন্য আমি ভারত ও প্রাচ্যের তরফ থেকে তাদের অভিনন্দন জানালাম। শেষে বললাম, রান্না সম্পর্কে আমি আর বিশেষ কি বলবো, ওরিয়েন্টাল কুকিং স্পেশালিস্ট মিসেস মিলারই আপনাদেব এ বিষয়ে সবিশেষ জানাচ্ছেন। তবে হ্যাঁ, রান্নার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে আছে খাওয়া। আপনারা বলবেন খাওয়ার মধ্যে আর নতুনত্ব কি ? আমি বলবো, নতুনত্ব আছে কি না জানি না, কিন্তু তার মধ্যে বৈশিষ্ট্য

লুকিয়ে আছে প্রচুর। আমাদের দেশে খাওয়ার মধ্যেও একটা ঐতিহ্য লুকিয়ে আছে, বসার ভঙ্গি ও অঙ্গ-চালনার মধ্যে আপনারা পাবেন শান্ত, সৌম্য ও সৌন্দর্যের প্রকাশ। বিদেশে এখানে যেমন ধরুন চা পান করার মধ্যে এমন কিছু বাহাদুরী নেই। কাপে চা আসে আর তা গলাধঃকরণ করি— সঙ্গে সঙ্গে বলি, আপনাদের মধ্যে কেউ জাপান গেছেন কি? আমি জনতার দিকে তাকালাম, তার মধ্যে দেখলাম তিনজন হাত তুললেন। মিসেস মিলারকে নিয়ে চারজন।

—আপনারা জানেন নিশ্চয়ই, জাপানে চা খাওয়াটা হচ্ছে স্যাক্রিফাইস, চা পর্বের মাধ্যমে সেখানে আমরা পাই জাপানী শিল্প ও কলার প্রকাশ, সেই সাথে সাথে সংযমী হয়ে আমরা নীরবতাকে পর্যবেক্ষণ করি, নীরবতা আমাদের জীবনের এক বিরাট অধ্যায়, এই নীরবতার থেকেই উৎপত্তি হয় যাবতীয় শিল্প, সাহিত্য ও সৃজনশক্তি— তাই নয় কি? এই বলে চারদিকে আমি তাকালাম, দেখলাম সকলেই আমার কথা মন দিয়ে শুনছেন। আমি আবার শুরু করলাম,

—যাই হোক আমি এবার শুরু করছি—'এক মিনিট', এই বলে আমি নিম্নস্বরে মিসেস মিলারকে জিজ্ঞেস করলাম যে, আমি খাওয়ার ডেমনস্ট্রেশন দেবার জন্য যদি তাঁর রান্না করা ভাত-তরকারী ব্যবহার করি তাতে তাঁর আপত্তি আছে কিনা? তিনি অতি উৎসাহিত হয়ে বললেন— না না মোটেই না। আপনি ইচ্ছেমতো তা ব্যবহার করুন, তবে হাঁ, ভাজিটা হয়তো কেউ কেউ টেস্ট করতে পারে। আমি এবারে সকলের কাছে জিজ্ঞেস করলাম তারা খাঁটী ভারতীয় পদ্ধতিতে খাওয়া দেখতে চান কিনা।

দেখলাম সকলেই রাজি আছে— ঠিক আছে, আমিও রাজি। মিসেস মিলারকে আমি উঁচু টেবিলটার ওপর খাবারের প্লেটগুলো সাজাতে বললাম। তিনি সেগুলি আর একজনের সহায়তায় সাজিয়ে দিলেন। এবার আমি দর্শকদের উদ্দেশ করে বললাম— যদিও এখানে আমাদের সেই ঘরোয়া পরিবেশ নেই তবুও আমি চেষ্টা করবো যতদূর সম্ভব সবিশেষ আপনাদের দেখাতে। খাওয়ার ব্যাপারে দুটো জিনিসের একান্ত প্রয়োজন। এক নম্বর হচ্ছে—ঠিক কায়দা মতো বসা এবং দ্বিতীয়, আঙুলের সঞ্চালন। খাবার সময় আমরা কখনই দু'হাত ব্যবহার করি না। আমি এই টেবিলটার ওপর ভারতীয় ভঙ্গিতে বসে খাওয়া আরম্ভ করবো। আপনারা লক্ষ্য করে দেখুন আমার অঙ্গভঙ্গি, নিশ্বাস-প্রশ্বাস এবং বিশেষ করে মুদ্রা— হাতের পাঁচটা আঙুলের কারসাজি। ট্রাডিশনাল ভারতীয়রা খেতে বসে কথা বলে না, তাই আমিও কথা বলবো না, আপনাদের যদি কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে তাহলে পরে জানাবেন। এই বলে আমি টেবিলের ওপর জোড় আসন কেটে বসলাম, পাশে গামলার জলে ভালো করে হাতটা ধুয়ে চোখে মুখে জলের ছিটে দিয়ে পাশে রাখা তোয়ালেটায় মুখ মুছলাম, তারপর খানিকক্ষণ চুপচাপ মৌন থেকে তারপর শুরু করলাম আমার খাওয়া— ওঃ সারাদিনের ক্ষিদেয় পেটটা জ্বলে যাচ্ছিল! যদিও ঘণ্টাখানেক আগে একটা ওমলেট

খেয়েছি, কিন্তু টেবিলের ওপর ভাতের থালা দেখে মনে হয় সব যেন বৈশ্বানরে সেবন করেছে।

প্লেটের ওপর চামচে করে জাপানী ভাত রাখলাম আর তার পাশে বেগুন ভাজা। আশেপাশে নুন লঙ্কার কোনো বালাই দেখছি না, একটা কাঁচা লঙ্কা হলে বেশ ভালোই হতো। যাইহোক, যা আছে তাই অমৃত! প্রায় আধঘন্টা ধরে আমার খাওয়া চললো, যেহেতু প্লেটের ধারে হাত চাঁচানো সম্ভব নয় তাই আমি প্রত্যেকটা আঙুলকে অতি সন্তর্পণে চুষে পরিষ্কার করে ফেললাম। আর মোটামুটি বিনি পয়সার ভোজটা ঠাকুরের কৃপায় ভালোই হলো। হাতটা ধুয়ে মুছে সকলের দিকে এবারে তাকালাম— সকলেই আমার আর্টের প্রশংসা করে উঠলেন। মিসেস মিলার এসে আমাকে আমার সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ দিলেন। আমার কাজ সারা হলো, এখন আর বেশিক্ষণ এখানে না থাকাই মঙ্গল— আমি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলাম।

কিছুদূর এসে একটু ফাঁকা জায়গা পেয়ে নিজের মনেই হো-হো করে হেসে উঠলাম— ওঃ হাসিতে পেট ফেটে যাবার উপক্রম! নেহাৎই আমেরিকা তাই রক্ষে, আর ভাগ্য ভালো দ্বিতীয় কোনো ভারতীয় সেখানে ছিল না। ভালোই হলো, খাওয়ার কৌশল দেখিয়ে খাওয়াটাতো হলো। আগে বুঝিনি, কিন্তু এখন চলতে গিয়ে বুঝেছি যে খাওয়াটা একটু বেশিই হয়েছে। তা হোক, সকালবেলা প্রাতরাশ না খেলেই চলবে। দেখতে দেখতে অনেক রাত হয়ে গেছে; এখন রাত প্রায় বারোটা। এবার বেরোনো যাক। আসবার সময় একটা ভালো জায়গা দেখেছি, সেখানেই রাত কাটানো যাবে। সাইকেলটা সংগ্রহ করে বেরিয়ে পড়লাম। পথ ঠিক করে সহরের পথ ধরলাম, কিছুদূর আসতেই একটা ব্রীজ পেলাম। এবার বড় রাস্তা ছেড়ে তার পাশে একটা পায়ে চলা পথ ধরলাম—ভালোই হলো, ব্রীজের নিচে আসতে কোনো অসুবিধা হলো না। এবার আমি ঠিক ব্রীজের নীচে— ওঃ আবহাওয়া অতি চমৎকার! চারদিকে বড় বড় ঘাস আর ঝোপ-জঙ্গল, তার মানে এখানে আমাকে বিরক্ত করতে কেউ আসবে না বলেই মনে হচ্ছে। কাঁধের ঝোলা নিচে রেখে স্লীপিং ব্যাগটা খুললাম। ওঃ! ঘাসের ওপর পালকের বিছানা, যেন গদির ওপর মখমলের বিছানা। ঢুকে পড়লাম আমার বিছানায়। ওঃ কি সুখ— যদিও মাথার ওপর মাঝে মাঝে বিরাট শব্দ করে ব্রীজ কাঁপিয়ে দু-একটা বোঝাই ভারী গাড়ী যাচ্ছে, কিন্তু তা মোটেই আমার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাবে না বলে মনে হচ্ছে। ওম্ শান্তি! ঠাকুর আমার প্রতি সত্যি যত্নশীল।

ঘুম ভাঙলো, চেয়ে দেখি সুন্দর ফুটফুটে রোদ পাশের জঙ্গলের ওপর নিজেকে বিছিয়ে দিয়েছে আর ছোট ছোট ফুলগুলো সেই বিছানায় যেন নাচানাচি করছে। মনটা অতি প্রফুল্ল, তার মানে ঘুমটা খুব ভালোই হয়েছে। মালপত্র গুছিয়ে নিলাম, ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে সাইকেলটাকে ঠেলতে ঠেলতে ওপরে তুললাম, ব্রীজের ওপর উঠতেই দিগন্তে চোখের সামনে এক নতুন দৃশ্য ভেসে উঠল।

আকাশ ছুঁয়ে সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে স্কাই-স্ক্রেপারএর দল। স্কাই-স্ক্রেপার মানে আকাশ চেরা—ফরাসী ভাষায় একে বলে গ্রাৎ সিয়েল বা আকাশে আঁচড় কাটা বাড়ী। আকাশের অর্ধেকটা জুড়ে ওরা দাঁড়িয়ে আছে, আকাশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে যেন এক বিরাট চক্রান্ত। বাড়ীগুলোর মাথা তীরের ফলার মতো, যেন হাজার হাজার রকেট চাঁদে যাবার জন্য তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে, শুধু আগুনের অপেক্ষা। আমি যে নদীর ব্রীজের ওপর দাঁড়িয়ে সেটা নিঃসন্দেহে ইস্ট রিভার, ব্রীজের নামটা ঠিক জানি না। পাশে একটা বেঞ্চি পাতা রয়েছে—নিশ্চয়ই এখানে বসে শহর দেখার জন্য। ওঃ চমৎকার রোদ্দুর! খানিকক্ষণ বসে একটু রোদ পোয়ানো যাক—ম্যাপটা খুলে ভালোভাবে দেখে বুঝলাম এটা একটা শহরতলী, তার মানে এখান থেকে এয়ারপোর্ট খুব বেশি দূরে নয়। এলাকাটার নাম কুইনস্।

আজ সোমবার ২৫এ মে, ১৯৭০ সাল। আমেরিকা সম্পর্কে আরও কিছু লেখার আগে আসা যাক একটু পূর্ব কথায়: আমেরিকায় প্রথম প্রভাত। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইটালীয়ান নাবিকের আবিষ্কৃত এই আমেরিকা, অবশ্য কলম্বাস যদিও নাগরিকত্বে ইটালীয়ান ছিলেন কিন্তু তাঁর কৃতিত্বের মূলে ছিল স্পেনের রাজার মানসিক, শারীরিক ও বিশেষ করে আর্থিক সাহায্য, তাই কলম্বাসকে অনেকে স্পেনীয় বলে মনে করে। কলম্বাস সাহেব অবশ্য নিউ ইয়র্কে তাঁর তরী ভেড়াননি, তিনি অতলান্তিক সমুদ্রের দক্ষিণ ক্রান্তি স্রোতের টানে যেখানে হাজির হয়েছিলেন সেটা আসলে মধ্য আমেরিকা, তবে ইউরোপবাসীদের আমেরিকা যাত্রার তিনিই প্রথম পথপ্রদর্শক। তারপর কেটে গেছে অনেকগুলো বছর...।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বদিকের বন্দরগুলো হচ্ছে— রোড দ্বীপ— কানেক্টিকাট —নিউ জার্সি—ডেলাওয়ার ইত্যাদি। পূর্বদিকটা খুবই নাব্য। ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইউরোপ থেকে দলে দলে আসতে লাগলো নাবিক, তাদের মূল উদ্দেশ্য বাণিজ্য-বসতি। তারা ভেবেছিলো সাগরের ওপারে যে দেশ আছে তা সোনায় ভরা। ঐ একই উদ্দেশ্যে তারা গিয়েছিল ভারতে— প্রথমে বসতে চেয়ে পরে শোবার জায়গা। তারপর রাজত্বের জন্য নিধনযজ্ঞ। আমেরিকার আদিবাসীদের কলম্বাস ভেবেছিলো ভারতবাসী। সেই থেকেই আমেরিকার আদিবাসীদের বলা হয় ইন্ডিয়ান— বর্তমানে আমেরিকান ইন্ডিয়ান। এই আদিবাসীদের ছলে বলে কৌশলে হাত করে আমেরিকায় ইউরোপীয়রা প্রথম বসতি স্থাপন করে। এদের মধ্যে তিনটি দেশের রাজশক্তি ছিল প্রবল— প্রথম ফরাসী, দ্বিতীয় ইংরেজ, তৃতীয় স্পেনীয়। পরে ইংরেজদের সঙ্গে কূটনীতিতে অপারগ হয়ে ফরাসী ও স্পেনীয়রা ইংরেজের অধীনতা স্বীকার করে। আর এইভাবে ইংরেজরাজ সৃষ্টি করলো এক বিরাট কলোনি— উত্তর আমেরিকার প্রথম ইংরেজ উপনিবেশ। আসলে ইংরেজরা তখন তাদের রাজত্ব চালাতো প্রবাসী ইউরোপীয়দের ওপর। তার মানে দলে দলে যে সব ইউরোপীয়রা নতুন জীবনের আশায় সেখানে জাহাজ ভিড়িয়েছিল ঠিক তাদেরই

ওপর। কিন্তু ইংরেজদের এই রাজত্ব চিরদিন টিকলো না— তাদের করভারে জর্জরিত হয়ে ১৭৩৩ সালে শুরু হলো প্রতিবাদ, তারপর প্রত্যক্ষ সংগ্রাম।

১৭৮৯ সালের ৪ঠা মার্চ, শেষে ব্রিটিশরাজ হার মানতে বাধ্য হয়। আর সেই দিনই ফিলাডেলফিয়ার চুক্তি অনুসারে আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়। এখানে একটু মন্তব্য করি; আমেরিকার স্বাধীনতা মানে প্রবাসী ইউরোপীয়রা, যারা ইংরেজ রাজত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, এবং ইংরেজ উপনিবেশের বিরুদ্ধে। এই প্রবাসী ইউরোপীয়রাই এখন আমেরিকান বলে পরিচিত আর আদিবাসীরা এখনও ইন্ডিয়ান নামে নিজেদের মাটিতে পরের রাজত্বে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অল্প কথায় এই হলো আমেরিকার গোড়ার কথা। নিউ ইয়র্ক শহরটি ঘোরার আগে এইবার আসা যাক এই শহরের ইতিকথায়। নিউ ইয়র্ক শহরের সঙ্গে আমাদের কলকাতার ইতিহাসের অনেকটা তুলনা করা চলে। যেমন কলকাতা শহরের গোড়াপত্তন হয় তিনটি আদিগ্রাম নিয়ে, কলকাতা, সূতানুটী ও গোবিন্দপুর। নিউ ইয়র্কের সূচনা হয় পাঁচটি দ্বীপের মতো আদিগ্রাম নিয়ে, মান্‌হাতন (Manhattan), ব্রোনজ্ (Bronx), কুইনস্ (Queens), ব্রুক্‌লিন (Brooklyn) ও রিচমন্দ্ (Richmand)। ১৬২৬ খৃস্টাব্দে, হল্যান্ডের সম্রাট রেড ইন্ডিয়ানদের কাছ থেকে এই জায়গাটা কিনে নেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল নতুন ও পবিত্র আমস্টার্ডাম তৈরি করার জন্য। তারপর ১৬৬৪ সালে এগুলি ইংরেজের অধীনে আসে আর সেই সময়ই ডিউক্ অফ্ ইয়র্কের (Duke of York) সম্মানার্থে এই পাঁচটি গ্রামের সম্মিলিত এলাকার নাম দেওয়া হয় ইয়র্ক শহর। আর সেই ইয়র্ক শহরই এখন নিউ ইয়র্ক— তার মানে কলকাতার গোড়াপত্তন যেমন হয় ইংরেজেদের হাতে। ১৭৯০ সালে যার লোকসংখ্যা ছিল মাত্র ত্রিশ হাজার, আজ তা দাঁড়িয়েছে প্রায় পনেরো লক্ষের মতো।

ভারতীয় দূতাবাস ভবন

নাঃ অনেক বেলা হতে চললো; এবার যাওয়া যাক শহরের দিকে। আমার এখানকার প্রথম কর্তব্য হচ্ছে ভারতীয় দূতাবাস ভবন খুঁজে বার করা। দেখা যাক সেখান থেকে আশপাশের খবরাখবর পাওয়া যায় কিনা। লন্ডনে থাকতেই এখানকার ঠিকানাটা জেনে নিয়েছিলাম। আর সেখানে শুনেছি— ইন্ডিয়া হাউস ঠিক সেন্ট্রাল পার্কের কাছেই। কাজেই খুঁজে পেতে খুব অসুবিধা হবে না দেখছি। শেষ পর্যন্ত আমি এসে পৌঁছলাম ৩নং ইস্ট ৬৪নং স্ট্রীট (3 East 64th St.) India Houseএ। নিউ ইয়র্কের ভারতীয় দূতাবাস। রিসেপ্‌শনে একজন গোলগাল ভদ্রলোক বসেছিলেন। তিনি আমার তাপ্‌পি মারা প্যান্ট ও গেঞ্জির ওপর কাঁধে ঝোলানো ব্যাগটা ভালোভাবে নজর দিয়ে তাকিয়ে শেষে বললেন— কি চাই?

আমার পূর্ব অভিজ্ঞতা অনুযায়ী আমি জানি যে, আমি যদি সরাসরি আমার কথা তাদের বলি তার মানে আমার চাহিদা যদি চাই তাহলে চাওয়া মাত্রই সরাসরি

তারা বেরোবার দরজা দেখিয়ে দেবে। কারণ এখানে রাজার থেকে প্রহরীর ভার বেশি। আমি অনেকবার ধাক্কা খেয়েছি আর অনেক দূতাবাসের দরজায় ঠোক্কর খেয়ে এখন মাথা শক্ত হয়ে গেছে। আমি যদি এখন সরাসরি বলি যে, আমি একজন ভবঘুরে, সাইকেলে করে দুনিয়া চক্কর লাগাচ্ছি, তাহলে প্রথমে ভাববে আমি রসিকতা করছি, নয়তো ভাববে নিশ্চয়ই এদের কাঁধে বোঝা হতে এসেছি, কাজেই সরাসরি এড়িয়ে যায়। অবশ্য সব সময় ভারতীয় দূতাবাসের দোষ দেওয়া যায় না, কারণ মাঝে মাঝে দূতাবাসের ওপর অযথা ঝামেলা এসে পড়ে। যাই হোক, আমাকে চুপচাপ দেখে রিসেপশনের ভদ্রলোক আবার জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার কি চাই?

আমি এবার তাঁর টেবিলের ফোনটা দেখিয়ে বললাম,

—আমাকে ইনফরমেশন সেক্রেটারীর নাম্বারটা দিন।

—তাঁর সঙ্গে কি আপনার এপয়েন্টমেন্ট আছে?

—না।

—আপনাকে তিনি চেনেন?

—না।

—তাহলে আপনার কি বক্তব্য আমাকে বলুন, দেখি কি করতে পারি।

এবার আমি তাঁকে গম্ভীরভাবে বললাম,

—আমাকে আপনি কিছু করতে পারবেন বলে মনে হয় না, আমি ইনফরমেশন অফিসারের সঙ্গে কথা বলতে চাই। আপনি তাঁর লাইনটা দেবেন কি না বলুন।

—অবশ্যই। ভদ্রলোক অতি নম্রভাবে তাড়াতাড়ি আমাকে ইনফরমেশন অফিসারের লাইনটা দিলেন। আমি জানি সোজা আঙুলে ঘি ওঠে না। ইন্ডিয়ান এমবাসীতে অধিকাংশ সময়েই দেখেছি যে নম্রতাকে এরা দীনতা মনে করে, অবশ্য আমি পোষাকে সব সময়ই দীন এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ। এদেশে ছেঁড়া প্যান্ট পরনে ইউনিভার্সিটির প্রফেসরকে এরা দেখতে অভ্যস্ত, কিন্তু টাই-স্যুট ছাড়া ভারতীয় দেখতে আমাদের দূতাবাসবাসিগণ অভ্যস্ত নন।

একটু পরে ইনফরমেশন অফিসারের লাইন পেলাম। ভদ্রলোকের নাম 'আগরওয়ালা। তার সাথে সাক্ষাতে বিস্তারিত জানাবার জন্য একটু সময়ের অনুরোধ জানালাম। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই তা মঞ্জুর করলেন। তিনি বললেন, আধঘন্টা পরে আসতে। আমি এর মধ্যে মুখ ধুয়ে এককাপ চা খেয়ে আগরওয়ালা সাহেবের সঙ্গে দেখা করবার জন্য প্রস্তুত হলাম, তারপর সময়মতো ভদ্রলোকের দরজায় আঘাত করতেই তিনি বেরিয়ে এসে আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত তাকিয়ে বললেন— আসুন, বসুন। তাঁর সুরে আহ্বানের চেয়ে বিতাড়নের সুরটাই যেন বেশি ছিল। আমি তাঁকে নমস্কার জানিয়ে চেয়ারে বসলাম, পরিষ্কার হিন্দিতে বললাম —আমাকে দেখে কি ভাবছেন জানি না তবে আমি হিপ্পি নই, আমি ভারতীয়, পশ্চিমবঙ্গের ছেলে, বর্তমানে পর্যটক। হ্যাঁ আমি সাইকেলে ভূ-পর্যটনে বেরিয়েছি, নাম বিমল দে।

ভদ্রলোক এবারে একটু অবাক হলেন; তারপর বললেন, তাই নাকি! আরে আরে, আসুন আপনাকে স্বাগত জানাই। এইতো কয়েকদিন আগেও আপনার নাম খবরের কাগজে দেখছিলাম। তিনি এবার চেয়ার ছেড়ে উঠে আমার সঙ্গে করমর্দন করে বললেন— তাহলে চলুন আপনাকে আমাদের কনস্যাল সাহেবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই, তিনি আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশীই হবেন।

—চলুন। আমিও রাজি হয়ে গেলাম।

আগরওয়ালা সাহেব আমাকে নিয়ে এসে কনস্যাল সাহেব শ্রী ভি কে আহুজার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন— আপনি মিঃ আহুজার সঙ্গে কথা শেষ করে আমার অফিসে আসবেন। তিনি চলে গেলেন। আহুজা ভদ্রলোককে বেশ স্পোর্টিভ বলেই মনে হলো। তিনি আমার সাথে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলাপ শুরু করলেন, বিশেষ করে তিনি আমার দুঃসাহসিক অভিযানের প্রশংসা করে বললেন— আমি চাই আমাদের দেশের শিক্ষিত যুবকরা এইভাবে বেরিয়ে গিয়ে জগতের বিষয় জানুক আর বিদেশে ছড়িয়ে দিক আমাদের ঐতিহ্য। কিছুক্ষণের মধ্যেই চা এলো, তার সাথে বিস্কুট। চা খেতে খেতে আমাদের আরও আলাপ চললো। তারপর বিদায়ের আগে তিনি আমার হাতে একটা অভিনন্দন বাণী ধরিয়ে দিলেন। তাঁকে বিদায় জানিয়ে আবার নেমে এলাম একতলায় আগরওয়ালা সাহেবের অফিসে।

আমাকে দেখেই আগরওয়ালা সাহেব বললেন—বসুন, এবার বলুন মিঃ দে আমি কি ভাবে আপনার উপকার করতে পারি।

—আপনি যে আমাকে এক কাপ চা খাওয়ালেন এটাই তো একটা বিরাট উপকার; তার ওপর আপনার বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার, সেটাতো উপরি— আমি হেসে জবাব দিলাম।

—শুনুন—আমি অ্যাম্বাসাডর সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলাম—কিন্তু তিনি খুব ব্যস্ত তাই সম্ভব হলো না।

—অ্যাম্বাসাডর, তার মানে মিঃ ঝা, তিনি তো ওয়াশিংটনে, তাই না?

—না, না— আমি মিঃ সমর সেনের কথা বলছি। তিনি এখানকার অর্থাৎ নিউ ইয়র্কে রাষ্ট্রসংঘে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত। আমাদের ইন্ডিয়া হাউসে দুটো অফিস— একটা কনস্যুলার সেকশন, আর একটা রাষ্ট্রসংঘের জন্য।

—তাই নাকি? আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম। হ্যাঁ, আগরওয়ালা সাহেব, এবারে আসা যাক একটু আমার নিজের প্রসঙ্গে। আমার কয়েকটা বিষয় জানবার দরকার— আপনি যদি পারেন তো আমাকে এ বিষয়ে উপদেশ দিলে খুবই উপকৃত হবো।

—অবশ্যই; বলুন।

—এক নম্বর হচ্ছে, এখানে বিনা পয়সায় কয়েকদিনের জন্য থাকার কোনো বন্দোবস্ত করা যায় কি না আমায় বলুন।

আগরওয়ালা সাহেব সত্যি চিন্তিত হলেন। একটু ভেবে তিনি বললেন— এখানে বিনা পয়সায় থাকা, নাঃ— সে রকম কিছু আছে বলে মনে হয় না। তবে হ্যাঁ আপনি ওয়াই এম সি এতে থাকতে পারেন।

—সেখানে কি বিনা পয়সায় থাকতে দেয়, আপনি ঠিক জানেন কি?

—নাঃ ঠিক বিনা পয়সায় নয়, তবে সস্তা।

—শুনুন আগরওয়ালাজী, বিনা পয়সা আর সস্তা দুটো আলাদা জিনিস— তাই নয়কি?

তিনি একটু ইতস্তত করে বললেন— আচ্ছা এবার দ্বিতীয় সমস্যাটা বলুন— দেখি কি করতে পারি।

—প্রথমটা যদি আপনি সমাধান না করতে পাবেন তাহলে দ্বিতীয়টা জেনে কি হবে। প্রথমটাই আসল।

—আচ্ছা, আপনিতো এখন শহর দেখতে যাচ্ছেন; তা যান, বিকেলের দিকে আমার সঙ্গে দেখা করবেন, দেখি কি করতে পারি।

—বিকেল মানে ক'টার সময়?

—এই পাঁচটা থেকে সাড়ে পাঁচটার মধ্যে।

—ঠিক আছে। আমি সেখান থেকে বিদায় নিলাম। এবার একটু ঘোরা যাক শহরে। নিউ ইয়র্ক পৃথিবীর অন্যতম সেরা বন্দর, সেরা শহর। লোকে বলে 'ক্লাসিক কস্‌মোপলিটান বিউটি'। দেখা যাক classic cosmopolitan beauty জিনিসটা কি।

ইন্ডিয়া হাউস থেকে দু'পা এগোতেই পড়লাম সেন্ট্রাল পার্কের চিড়িয়াখানার সামনে। এবার সেখান থেকে বাঁদিক ধরে সরাসরি এগিয়ে চললাম ম্যাপ ধরে— ঠিক এই রাস্তাটার নীচেই চলছে মেট্রো রেলওয়ে অর্থাৎ ভূগর্ভস্থ রেলগাড়ী, মাঝে মাঝে তাই দেখা যাচ্ছে সিঁড়ি ফুটপাত থেকে সোজা মাটির নিচে নেমে গেছে। আমি সাইকেলটাকে ইন্ডিয়া হাউসেই রেখে এসেছি। এ রাস্তাটা দিয়ে গতকাল একবার হেঁটেছি, কিন্তু আজকের মতো এত বেশি লোকজন, গাড়ীঘোড়া গতকাল দেখিনি— প্রত্যেকটা বাড়ী যেন আজ ঘুম থেকে জেগে উঠেছে, রাস্তায় মানুষের চেয়ে গাড়ীর সংখ্যাই বেশি। প্রত্যেকটি রাস্তার মোড়ে রয়েছে লাল নীল সঙ্কেতগুলো, কিন্তু তা কেউ মানছে বলে মনে হলো না। রাস্তায় এক নজরে বলতে গেলে সাদা মানুষের চেয়ে কালো মানুষের সংখ্যাই যেন বেশি। কলকাতার চেয়ে এখানে লোকসংখ্যা বেশি আছে বলে মনে হয় না, তবে মনে হচ্ছে পুলিশের সংখ্যা নিঃসন্দেহে বেশি। শেষ পর্যন্ত যেখানে এসে পৌঁছলাম গতকালও সেখানে একবার ঘুরপাক খেয়ে গেছি— বিশেষ করে এক কাপ চা খেয়ে এখানে পকেট খালি করতে হয়েছে—অর্থাৎ এটি

রকফেলার সেন্টার (Rockfeller Center), এই বিরাট প্রাসাদোপম বাড়ীটাকে ইংরেজিতে R.C.A. Building বলে। বিরাট লৌহকপাট খোলাই ছিল। ভেতরে ঢুকতেই চক্ষুস্থির! এ এক বিরাট বাজারের মতো। এর ভেতর ছোট বড় অনেক রাস্তা— একটা আর একটাকে ক্রস করে বেরিয়ে গেছে, দু'পাশে নানা ধরনের দোকান পসার অফিস ঘর। এবার দেখা যাক উপরে উঠবার লিফট্‌টা কোথায়—এদিক-ওদিক একটু তাকাতেই পড়লাম একজন পুলিশের পাল্লায়। তার সাথে চোখাচোখি হতেই আমি একটু মুচকি হাসলাম— পুলিশ ভদ্রলোক অবশ্য হাসলেন না— জানিনা তাঁদের ট্রেনিংএ হাসি শব্দটা আছে কিনা। তিনি আমার পিঠে হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন,

—ব্যাগের মধ্যে কি আছে?

—আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি।

—তার মানে, ভদ্রলোক ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন।

—তার মানে, এই জামা কাপড়, টুথ্‌ব্রাস, চিরুণী, কয়েকটা বই, রাতে থাকবার জন্য ছোট একটা তাবু, শোবার ব্যাগ, রান্নার জন্য ছোট্ট একটা স্টোভ, কয়েকটা বাসনপত্র, আর— আর, একটু ভেবে তাবপর বললাম, কিছু চাল কয়েকটা আলু আর সুইস চকোলেট।

—ওঃ তার মানে ট্যুরিস্ট, ভদ্রলোক এবারে একটু হাসবার ভান করলেন।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আপনার ন্যাশনালিটি?

—ভারতীয়, কিন্তু কেন বলুন তো, এখানে ঢুকতে গেলে কি বিশেষ ন্যাসনালিটির প্রয়োজন হয় নাকি?

—না না, তা নয় তবে এটা হচ্ছে নিউ ইয়র্ক শহর, তাই সব সময় আমাদের সতর্ক থাকতে হয়। যাই হোক, আপনি বাঁ দিকের রাস্তা দিয়ে আর একটু এগিয়ে গেলেই ট্যুরিস্ট অফিস পাবেন।

পুলিশ ভদ্রলোকের কথামতো আরও একটু এগোতেই চোখে পড়লো একটা বোর্ডে লেখা কনডাক্‌টেড ট্যুর। জায়গামতো দাঁড়াতেই এক ভদ্রমহিলা (অনেকটা এয়ার হোস্টেসের পোষাক পরনে) এগিয়ে এলেন। তিনি স্মিতহাস্যে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আমি এই রকফেলার বিল্ডিংটা দেখতে চাই কিনা। 'অবশ্যই'—আমি জবাব দিলাম।

তিনি সঙ্গে সঙ্গে একটা রসিদ কেটে আমায় ধরিয়ে দিয়ে বললেন —দুই ডলার।

আমি চমকে উঠলাম! দুই ডলার মানে—এটাতো মিউজিয়াম নয়, এ বাড়ীটা দেখতে গেলেও পয়সা লাগবে নাকি?

—না এ বাড়ীর জন্য নয়, এটা গাইডের জন্য। মিচকি হেসে আমেরিকান মহিলা জবাব দিলেন।

—ভালো, এখানে বিনা পয়সায় কি দেখা যায় তাই বলুন।

—বিনা পয়সায়? এই নিউ ইয়র্কে? হুঃ! ভদ্রমহিলা একটা বিরাট দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

আমাদের কথাবার্তা পাশ থেকে আর এক ভদ্রলোক লক্ষ্য করছিলেন। তিনি এবার একটু এগিয়ে এসে তাঁর পকেট থেকে দুটো ডলার বের করে ভদ্রমহিলাকে দিয়ে বললেন— এই নিন ওনার টিকিটের দাম। আমি তো অবাক! চেনা-শোনা নেই, হঠাৎ গায়ে পড়ে উপকার। আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, সে কি, আমার জন্য আপনি খরচ করতে যাবেন কেন? ভদ্রলোক আমার কাঁধে হাত দিয়ে বললেন— চালিয়ে নাও হে। এটা আমেরিকার চলতি কথা— টেক ইট ইজি ম্যান (Take it easy man)।

কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রায় কুড়িজন পর্যটক জুটে গেল, তারপর ভদ্রমহিলা ছোট্ট একটা মাইকের সামনে এসে বললেন— আমাদের পরবর্তী কনডাকটেড ট্যুর এখন শুরু হচ্ছে, আপনাদের গাইড মিস্ থর্নবে। মিনি স্কার্টস পরনে, ঠোঁটে ও চোখের পাতায় পেইন্ট করা মিস থর্নবে (Thornbey) আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন, তারপর তাঁর ইঙ্গিতে আমরা তাঁকে অনুসরণ করলাম।

বিরাট লিফ্‌ট— একসঙ্গে আমরা প্রায় ষাটজন দাঁড়িয়ে অর্থাৎ একটা পুরো বাস সরাসরি ওপরে উঠতে শুরু করলো....। লিফটের ভিতরে আলোর সংকেতে জানিয়ে দিচ্ছে আমরা এখন কোন তলায়, দশ, পনেরো, কুড়ি— তিরিশ— পঞ্চাশ... ওরে বাবা! এ উঠছে তো উঠছেই, যেন একটা এক্সপ্রেস ট্রেন, এর মধ্যে একটা ছোট গল্প পড়া হয়ে যেতো। শেষ পর্যন্ত লিফ্‌ট থামলো। মাথার ওপর তাকিয়ে দেখি লাল আলো জ্বলছে সত্তর, তার মানে আমরা এখন সত্তর তলায়! আমাদের গাইড সমানে বকে চলেছে। কোথায় রকফেলার জন্মেছিলেন, কি তাঁর বৈশিষ্ট্য, এই বিল্ডিংটার কবে গোড়াপত্তন হলো ইত্যাদি। আমার ওসব ইতিহাসে বিশেষ ঝোঁক নেই, তবে তার থেকে যতদূর জানলাম তা হচ্ছে— এই সত্তর তলা হচ্ছে এই বিরাট অট্টালিকার ছাদ, তবে ছাদের বদলে ছাদের ওপর কাঁচঘর অর্থাৎ অবজারভেটরী।

ভালোভাবে দেখলাম— সত্যি, এখান থেকে নিচের দিকে তাকিয়ে নিচের মানুষগুলোকে দেখলাম, কালো-কালো বিন্দুর মতো তাদের মাথার টুপিগুলো নজরে পড়লো। একটু দূরে প্যান আমেরিকান (Pan American) এর বিরাট বাড়ী। আগে নাকি এই বাড়ীটার ওপর ছোটখাটো প্লেন নামতো, কিন্তু কোনো একসময় একটা এক্সিডেন্টের পর তা এখন বন্ধ। গাইড এখান থেকে আশপাশের কিছু কিছু আকাশচেড়া বাড়ীর ইতিহাস বলতে লাগলো। এই সত্তর তলাতেই একটু পরে আমার এলাম রেডিও স্টেশন, তারপর আবার নামার পালা। Rockfeller Buildingটা এত বড় ও বিশাল তা এর ভেতরে না ঢুকলে বুঝতে পারতাম না। এর মধ্যে রয়েছে একটা বিরাট প্রদর্শনীশালা বা exhibition hall. তা ছাড়াও রয়েছে টাকার যাদুঘর, সে

বিরাট ব্যাপার— সবই টাকার খেলা। এইভাবে প্রায় পয়তাল্লিশ মিনিট ওই বাড়ীর ভেতর গোলকধাঁধার মতো ঘুরে শেষ পর্যন্ত গাইড বিদায় জানালো। বুঝলাম সবই টাকার খেলা, টাকার দুনিয়া, অসংখ্য টাকায় তৈরী এই মজবুত আর-সি-এ (RCA)43 বিল্ডিং। আমার জলতেষ্টা পেয়েছে, দেয়ালের গায়ে একটা ঠাণ্ডা জলের মেসিন থেকে পেট ভর্তি জল খেয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম; ভাগ্য ভালো, জলটা নেহাৎই বিনা পয়সায় পাওয়া গেল। বাইরে বেরিয়ে বাঁচলাম, বাড়ীর ভেতরটা যেন বাতাসশূন্য একটা বিরাট যমপুরী। এবার ফেরা যাক ইণ্ডিয়া হাউসের দিকে, আমাকে ওখানে পাঁচটা থেকে সাড়ে পাঁচটার মধ্যে ফিরতে হবে।

ইণ্ডিয়া হাউস। আগরওয়ালা সাহেবের অফিসে এসে শুনলাম তিনি নেই, তাঁর সেক্রেটারীকে তিনি আমার সম্পর্কে কোনো নির্দেশই দিয়ে যাননি। ভালো— আমি অপেক্ষা করবো— যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি আসেন। রিসেপ্শনের কাছে কয়েকটা চেয়ার পাতা ছিল, সেখানেই আমি বসলাম। রিসেপ্শনিস্ট ভদ্রলোক অর্থাৎ আগের দেখা সেই গোলগাল ভদ্রলোক আমাকে দেখেই হেসে বললেন–– আপনিই কি— মানে ভূ-পর্যটক...

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আপনার সাইকেলটাকে ভেতরে তুলে আনুন, জানেনতো নিউ ইয়র্ক শহর বোম্বের চেয়েও অধম।

ভদ্রলোকের কথামতো আমি সাইকেলটাকে ভেতরে তুলে আনলাম। এবার তাঁর সঙ্গে আলাপ শুরু হলো, বুঝলাম ভদ্রলোক আসলে এই বিল্ডিং-এর অন্যতম সিকিউরিটি। আরও দু'জন আছেন। ভদ্রলোক ইউ-পির, নাম বানারসী। বানারসীভাই আমাকে এককাপ চা ও বিস্কুট খাওয়ালেন, তাঁর সঙ্গে আমার বেশ কথা জমে উঠলো। এইভাবে কথায় কথায় বেশ সময় কেটে গেল— পাঁচটা সাড়ে পাঁচটা ছ'টা। এর মধ্যে আমি কয়েকবার খোঁজ নিলাম— কিন্তু আগরওয়ালা সাহেবের পাত্তা নেই। এবার অফিস বন্ধ হবার সময়, বানারসী সিং আমাকে বললেন— আচ্ছা দাদা এবার তাহলে আসুন, আমি অফিস বন্ধ করবো। অবশ্য লাইব্রেরী রুম খোলা থাকবে আটটা পর্যন্ত, আপনি ইচ্ছা করলে সেখানে বসে অপেক্ষা করতে পারেন। আগরওয়ালা সাহেব বিকেল পাঁচটার পর আসেন না, তবে আপনি এক কাজ করুন, কাল সকালবেলা অফিস খোলার সঙ্গে সঙ্গে আসুন।

—ভালো, আসলে কথা কি জানেন, আগরওয়ালা সাহেব বলেছিলেন তিনি আমার থাকার জন্য একটা বন্দোবস্ত করবার চেষ্টা করবেন। আসলে আমি কোথায় থাকবো তার এখনও ঠিক নেই। যাই হোক, আমি তা'হলে উঠি, যদি এখানে থাকি তা'হলে কাল সকালে আসা যাবে, কিন্তু আমার থাকার এখনও কোন ঠিক নেই। যাইহোক আসি তা'হলে।

এই বলে আমি আমার সাইকেলটা নিয়ে বেরোবো, এমন সময় বানারসীভাই আমাকে থামিয়ে বললেন,

—কিন্তু দাদা আপনি রাতে থাকবেন কোথায়?

—থাকবো কোথায়? বিরাট পৃথিবীতে এই উদার নীল আকাশের নীচে আমার এই পাঁচ ফুট দেহটা রাখবার জায়গার অভাব কি? আচ্ছা চলি ভাই।

আমি বাইরে বেরিয়ে সামনের দিকে এগোচ্ছি, পিছন থেকে বানারসীভাই এসে আমার সাইকেলটা টেনে ধরলেন। ওর দিকে তাকাতেই উনি আমাকে অনুরোধের সুরে বললেন—

—আচ্ছা দাদা, আপনি আমাদের সঙ্গে থাকতে রাজি আছেন?

—কোথায়?

—এই ইণ্ডিয়া হাউসের নীচের তলায় আমরা মানে আমরা তিনজন সিকিউরিটি গার্ড থাকি। দুটো ঘর আছে, তবে আলাদা কোনো খাটিয়া নেই, আসুন কোনো রকম বন্দোবস্ত করা যাবে।

ফিরে এলাম ইণ্ডিয়া হাউসে, বানারসীভাই-এব দিকে তাকিয়ে বললাম— ভালোই হলো— একসঙ্গে অনেকদিন পর রুটী তরকারী খাওয়া যাবে, কি বলো ভাই? তারপর আমি ও বানারসীভাই অফিস ঘর দরজা বন্ধ করে নীচের তলায় নেমে এলাম। একটি বড় গুদাম ঘরের মাঝখানে শক্ত পিচবোর্ডের বেড়া দিয়ে দু'খানা ঘর তৈরী করা হয়েছে। আর সেই দেয়ালে ঝুলছে— কালী শিব দুর্গা ও অন্যান্য বিভিন্ন দেবদেবীর ছবি, কয়েকটি তক্তা সাজিয়ে পড়ার টেবিল তৈরী হয়েছে। দড়ির ওপর ভেজা একটা ল্যাঙ্গট ঝুলছে। বহুদিনের ব্যবহৃত তৈলাক্ত একটা তোয়ালে একটা পেরেকের সঙ্গে ঝুলছে। আমি চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। বানারসীভাই লজ্জিত হয়ে বললেন,— দেখছেন কি দাদা, গরীবের ঘর কোনোরকমে দিন কাটাবার মতো।

আমি তার দিকে চেয়ে অনেকটা অভয়ের সুরে বললাম— শোনো বানারসীভাই, আমি অনেক ঘুরেছি, আর ইণ্ডিয়ান এম্‌বাসীর অনেক দরজাতেই আঘাত করেছি, বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সঙ্গে মিশেছি আর সব সময়ই আমি দেখেছি উঁচুমহলরা আমাকে দেখে করমর্দন করে প্রশংসা করে, সম্মান দেয়, আর তার সঙ্গে বিরাট ভাষাবহুল অভিনন্দন বাণী ছাড়ে, কিন্তু ব্যস— ওই পর্যন্তই। কিন্তু সত্যিকারের আন্তরিকতা পাই একমাত্র নীচুমহল থেকেই, কাজেই ভাই তোমাদের এই ঘরের অবস্থা যাই হোক না কেন, আসলে তোমাদের মন অতি উঁচু, তোমাদের কাছ থেকে যে আন্তরিকতা, যে হৃদ্যতা পাই, যে সহজ ও সরল মন আমার পথের ক্লান্তি দূর করে তার তুলনা চলে না। আসলে তোমরাই আমার আপনজন। যাইহোক কোন অসুবিধা নেই, আমি এই বড় টেবিলটার আবর্জনা সরিয়ে সেখানেই আমার শোবার বন্দোবস্ত করে নেব— বিছানার কোনো অসুবিধা নেই, আমার শ্লিপিংব্যাগ আছে।

থেকে গেলাম সেখানে, ভারতীয় দূতাবাস ভবনের অতি সাজানো গোছানো কেতাদুরস্থ দফ্তরগুলোর নীচের তলাকার আবর্জনাবহুল গোডাউন ঘরের এক কোণে আমার কাঁধের ব্যাগ ও সাইকেলসহ বেনারসীভাইদের সহধর্মী হলাম।

বেনারসীভাই-এর আরও দু'জন সহকর্মী সেখানে থাকে, একজনের নাম নয়ান, নৈনীতালের লোক, আর একজনের নাম কিশোর, পাহাড়ী গাড়ওয়ালের কুস্তিগীর। তাছাড়াও আর একজন মাঝে মাঝে আসে আড্ডা দিতে— সর্দারজী। রান্নাঘরে রুটী ও আলু-পেঁয়াজের তরকারীকে ঘিরে অনেকদিক পর আমি খাঁটী ঘরোয়া পরিবেশ পেলাম। সত্যি রুটী-তরকারীর যে এত স্বাদ এর আগে কোনদিন ভাবতেই পারিনি।

পরের দিন ভোরে ঘুম ভাঙলো একটা গানের সুরে। উঠে বসলাম বিছানায়— দূরে টেবিল ঘড়িটায় সকাল সাতটা। গানের কলিটা বেশ জোরালো মনে হচ্ছে— 'জয় জগদীশ হরে, প্রভু জয় জগদীশ হরে' —কলের জলের সাথে খাপ খাইয়ে শব্দটা বাথরুম থেকেই ভেসে আসছে। গলার আওয়াজ মনে হচ্ছে কিশোরের। একটু পরেই ভিজে চুল কিশোর এসে উপস্থিত— 'জয় রামজী', 'জয়রাম ভাই' জবাব দিলাম।

ঘুমটা বড় সুন্দর হয়েছে। খানিকক্ষণের মধ্যেই সবাই এসে হাজির হলো রান্না ঘরে। ওদের সাথে চা ও আলুভাজা রুটি খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম শহর দেখতে।

নিউ ইয়র্ক শহরটি আমার কাছে যেমনই বেখাপ্পা লাগুক না কেন, কিন্তু এর রাস্তাঘাট আমার খুবই মনোমতো। এখানে হারাবার কোনো সম্ভাবনা নেই। আমাদের চণ্ডীগড় অনেকটা এই ধরণের তৈরী। প্রত্যেকটি রাস্তা একটা আরেকটাকে সব সময় সরাসরি ক্রস করে গেছে— ঠিক সতরঞ্চি মার্কা বলা যেতে পারে। মাঝখানে ব্লক। এখানকার রাস্তার নাম মনে রাখার কোন অসুবিধা নেই। রাস্তাগুলোর নাম সাধারণতঃ সংখ্যা দিয়ে। বড় রাস্তাগুলোকে এভেন্যু ও ছোট রাস্তাগুলোকে স্ট্রীট বলে। ছোট রাস্তাগুলো আড়াআড়ি আর বড় রাস্তা লম্বালম্বি। যেমন আমাদের ভারতীয় দূতাবাস হচ্ছে তিন নম্বর পূর্ব চৌষট্টি নং ছোট রাস্তা। সেন্ট্রাল পার্কটা শুরু হয়েছে উনষাট নং থেকে ও একশ দশ নং ছোট রাস্তা থেকে। বিয়াল্লিশ নং ছোট রাস্তার ওপর রাষ্ট্রসংঘের অট্টালিকা। পাঁচ নম্বর বড় রাস্তাটার নাম খুব শুনেছি, তাই ম্যাপ দেখে সেদিকেই প্যাডেল চালালাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পৌঁছলাম— ফিফ্থ এভেন্যুতে (Fifth Avenue); ম্যাপে দেখতে পাচ্ছি একটা বিরাট বাড়ীর সংকেত— নিশ্চয়ই ওটা বিশেষ কোনো বাড়ীর ঠিকানা, সেদিকেই যাওয়া যাক। দুপাশে বাড়ীর পাহাড়। শেষে এসে পৌঁছলাম পাঁচ নম্বর বড় রাস্তার ৩৪ নং ছোট রাস্তায়। অসম্ভব রকমের ভীড়। এ বাড়ীটার চারপাশে যেন হাট লেগেছে। এখন অফিস টাইম, বিরাট ভীড়— মনে হচ্ছে অনেকটা শিয়ালদহ স্টেশনে একসঙ্গে পাঁচটা অফিস ট্রেন এসে পৌঁছেছে। কেতাদুরস্থ একজন কালো

পুলিশ-ম্যানকে (নিগ্রো) দেখে জিজ্ঞেস করলাম,— আচ্ছা স্যার, এই বাড়িটার নাম কি?

ভদ্রলোক আমার দিকে আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে বললেন,

—এম্‌পায়ার স্টেট বিল্ডিং।

এম্‌পায়ার স্টেট বিল্ডিং— মনে করতে পারছি না— অথচ নামটা খুব চেনা চেনা বলে মনে হচ্ছে। হ্যাঁ মনে পড়েছে— কোথায় যেন পড়েছিলাম World's Tallest Building অর্থাৎ পৃথিবীর উচ্চতম বাড়ী। খুব সম্ভবতঃ নিউ ইয়র্ক শহরের বিজ্ঞাপনে এই বাড়ীটার ছবি দেখেছি। সাইকেলটাকে পুলিশদাদার পাশেই একটা ল্যাম্পপোস্টের সঙ্গে দাঁড় করিয়ে দিয়ে এবার মাথার ওপর তাকালাম— ওরে বাবাঃ, এ বিরাট বাড়ীটার উচ্চতা দেখতে গেলে ফুটপাতের ওপর চিৎ হয়ে মেঘ দেখার মতো করে দেখতে হবে। কাজেই এর উচ্চতা দেখে দরকার নেই, ভেতরে ঢোকা যাক। ভেতরে ঢুকতেই সামনে নজরে পড়লো লিফ্‌ট— সারি সারি লিফট-বাস দাঁড়িয়ে আছে, প্রত্যেকটা লিফ্‌টের কাছে সুসজ্জিত লিফ্‌টমান, লিফ্‌ট ভর্তি হবার সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ। আমি যে লিফ্‌টায় চড়েছি সেটাতে লেখা পঞ্চাশজন, আর এ লিফ্‌টটা সব তলাতে থামছে না, ১০ তলা, ২০ তলা, ৩০ তলা করে উঠছে। মানে মেইল সার্ভিস! আশি তলায় এসে লিফ্‌ট থামলো। এখানে প্রায় সবাই নামতে আমিও তাদের অনুসরণ করলাম। সামনেই নজরে পড়লো অনুসন্ধান অফিস। এখন আমি আশিতলায়, এখান থেকে আরও ছ'তলা ওপরে মানে ছিয়াশিতলায় অবজারভেটরী আছে। এবার আর একটা লিফ্‌টে উঠলাম। এই লিফ্‌টা লোকাল অর্থাৎ সব তলাতেই থামছে। R.C.A. বিল্ডিং-এর মতো এখানেও গাইড ট্যুর আছে তবে আমি আর তাতে যোগ দিলাম না। প্রথম কারণ পকেটে পয়সা নেই, দ্বিতীয় কারণ গাইডের ওই একঘেয়েমি বক্‌বক্‌ আমার পছন্দ হয় না। এখানকার অবজারভেটরী থেকে নিউ ইয়র্ক শহরের এক অদ্ভুত ছবি পেলাম। রাস্তায় বাস ও লোক দেখে মনে হচ্ছে চৌকো ক্যারামের ঘুঁটি, রাস্তাগুলো ফিতের মতো। চারদিকে শুধু বাড়ী বাড়ী আর বাড়ী, বাড়ীর পাহাড়। আমার মন হচ্ছে এই বাড়ীর চাপে সম্পূর্ণ শহরটাই হয়তো মাটির নীচে ঢুকে যাবে অথবা সামান্য একটু ভূমিকম্পেই তাসের বাড়ীর মতো ধ্বসে পড়বে। আর এখান থেকে যদি কেউ নীচে পড়ে তাহলেও অন্ততঃ আধঘন্টা সময় তার লাগবে, অর্থাৎ আপশোষ করার মতো যথেষ্ঠ সময়। অবশ্য পড়ার সম্ভাবনা নেই— কারণ চারদিক কাঁচে ঢাকা।

এবার আরও ওপরে উঠে এলাম। লিফ্‌টের আলোয় দেখতে পেলাম— একশ' দুই তলা, এখানেও আগের মতো চারদিকে কাঁচের ঘর। সম্পূর্ণ নিউ ইয়র্ক শহরকে এরকম পরিষ্কারভাবে একমাত্র প্লেন থেকেই দেখা সম্ভব। একশ দুই তলা, ওঃ ভাবলে মাথা ঘুরে যায়। আমি এখন পৃথিবীর সবচাইতে উঁচু বাড়ীর ছাদে, ছাদ বললে অবশ্য ঠিক ঠিক বলা চলে না, কারণ এর পরে আরও কয়েকতলা আছে।

তারপর আছে টেলিভিশন টাওয়ার। উচ্চতায় একহাজার দু'শ পঞ্চাশ ফুট (১২৫০ ফুট)। টেলিভিশন টাওয়ার নিয়ে একহাজার চারশো বাহাত্তর ফুট (১৪৭২ ফুট)। এখানে দেখলাম টিকিটের কোন ব্যাপার নেই, ভালোই হলো। এবার আস্তে আস্তে লোকাল ও মেইল লিফ্‌ট ধরে নীচে নেমে এলাম। বাড়ীর চারপাশটা একবার ঘুরে এলাম— মানে এই ব্লকটার চারপাশে শক্ত পাথরের আঁট বাঁধনের ওপর তৈরী, ওঃ কি জিনিস না দেখলে বিশ্বাস হয় না।

এবার পাঁচ নম্বর বড় রাস্তা ছেড়ে, ছোট রাস্তা ধরে এসে পৌঁছলাম সেভেন্থ এভেন্যুতে, মানে সাত নম্বর রাস্তা। রাস্তাটা ধরে এবার একটু পেছুতেই পড়লাম পোষাকের বাজারে। দু'পাশে বিরাট বিরাট শো-কেসে আধুনিক পোষাকের বাহার। আমি ফুটপাথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে ভাবছি সত্যি পোষাকের বাহার দেখা আর হাতে পয়সা থাকলে শুধু ওড়াবার ধান্দা। এত বাহারেব দরকারটা কি বুঝি না, এইতো আমার এই একটা প্যান্টে দিব্যি সাত মাস কেটে যাচ্ছে। তবে হ্যাঁ, হাঁটু ও পেছনদিকটায় যদি আজকালকের মধ্যে তালি না দিই তাহলে হয়তো প্যান্টের সেকেণ্ড পার্ট ও থার্ড পার্টটা খুলে পড়ে যাবে। দুপাশে শুধুই আকর্ষণ। নাঃ এ ভাবে চলা মুশকিল। শো-কেস দেখতে গিয়ে এর মধ্যেই দু'বার ধাক্কা খেয়েছি। কাজেই এবারে রাস্তায় নামা যাক। হঠাৎ নজরে পড়লো আমস্টার্ডাম এভেন্যু। এতক্ষণ এভেন্যুর নাম সব সংখ্যায় পেয়েছি, হঠাৎ এভেন্যুর নাম শহরের নামে কেন? ম্যাপটা খুলে দেখতে হচ্ছে— না একেবারে বেখাপ্পা নয়, মাঝে মাঝে বিভিন্ন নামে এভেন্যু ও স্কোয়ার রয়েছে। রাস্তাগুলো অনেক সময় হাইটিনিউস-এর মতো, যখন কোণাকুণি ভাবে চলে গেছে তখন তার নামগুলো সংখ্যা দিয়ে নয়। আমি একটা বিরাট চার্চ দেখে তার কাছে নামলাম, চার্চটা এখনও অসম্পূর্ণ। এটা মেরামত হচ্ছে না তৈরী হচ্ছে বোঝা মুশকিল, আর্ট দেখে মনে হচ্ছে গোথিক স্টাইল, আমেরিকায় সবই নতুন। ঐতিহাসিক বলতে এখানে এমন বিশেষ কিছু নেই শুনেছি। অবশ্য থাকবেই বা কি করে, আমেরিকায় ইউরোপীয় সভ্যতার আমদানী হলোতো এই সেদিন মাত্র। তবুও গোথিক স্টাইল দেখে আমি থামতে বাধ্য হলাম, বলা যায় না কলম্বাসের আগেও হয়তো কোনো যীশুভক্তের আগমন হয়ে থাকবে।

চার্চটার চারপাশে ভালো করে ঘুরতেই সব পরিষ্কার হলো, এটা আসলে তৈরী হচ্ছে। হ্যাঁ তৈরী হচ্ছে পৃথিবীর বৃহত্তম গোথিক স্টাইলের ওপর ক্যাথিড্রাল চার্চ। Cathedral Church of St. John the Divine—এর শুরু হয়েছে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে, খুব সম্ভবত শেষ হবে ১৯৯২ সালে, তার মানে একশ বছর লাগবে এই বিরাট জন দেবের মন্দির প্রতিষ্ঠায়। এই চার্চের এক কোণায় দেখতে পাচ্ছি উঠতি যুবক-যুবতীদের ভীড়। ব্যাপারটা পরিষ্কার হলো, এখানেই কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির চত্বর। সাইকেলটাকে হ্যাংগারে রেখে এগিয়ে গেলাম ইউনিভার্সিটির দিকে। দলে দলে ছেলে-মেয়েরা ইতস্তঃত ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ভারতীয় দূতাবাসে আমার ছেঁড়া প্যান্টের যতই অনাদর থাক না কেন— আমি জানি ইউনিভার্সিটির দরজায় তার সম্মান অনেক। চারপাশে ছাত্র-ছাত্রীদের জিন-প্যান্ট দেখে একনজরে মনে হয় এটাই এদের জাতীয় পোষাক। আমি ইউরোপ-ফেরতা, কাজেই এ দৃশ্য আমার কাছে নতুন নয়, ময়লা ও শতছিন্ন প্যান্ট পরে শুধু কলেজে কেন পাড়ায় বেরোতেই আমাদের লজ্জায় মাথা কাটা যায়, আর এখানে এটা ফ্যাসান। কলকাতায় থাকতে ভাবতাম এটা নিতান্তই হিপ্পিগত কিন্তু যত ঘুরেছি ততই আমার চোখ খুলেছে। ইউরোপ বা আমেরিকায় শতছিন্ন প্যান্ট পরা অনেকটা নেশাগত। হয়তো দীর্ঘকাল ধরে কোট প্যান্ট ও টাই-এর বন্ধনে থেকে থেকে এরা হাঁপিয়ে উঠেছে। হাঁপিয়ে উঠেছে সুশৃঙ্খল ভদ্রজীবন যাপনে; পোষাক-পরিচ্ছদের শক্ত বাঁধনের বিরুদ্ধে এখন যেন এক বিরাট সংগ্রাম। পোষাকের কৃত্রিম ভদ্রতার খোলস ছেড়ে এরা এখন বেরিয়ে এসেছে আঙিনায়। এরা এখন সহজ— যার যখন যেখানে খুশী বসছে, অঙ্গভঙ্গিও এখন হয়ে এসেছে সহজ।

আমি আশেপাশে খোঁজ নিয়ে সরাসরি চলে এলাম এদের রিডিং রুমে। আমি জানি এখন কি করতে হবে। রীডিং রুমের এককোণে একজন যুবতীকে দেখে মনে হলো তিনিই এখানকার কর্ণধার। সরাসরি তাঁর কাছে গিয়ে আমি জানালাম আমার পরিচয় আর তার কাছ থেকে দশ মিনিট সময় নিলাম অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলার জন্য। অল্পসময়ের মধ্যেই আমি প্রায় পঞ্চাশ-ষাটজনের একটা ছোট-খাটো দর্শকদল পেলাম আর তাতেই যথেষ্ট। আত্মপরিচয় দিয়ে আমি ভ্রমণবৃত্তান্তের একটা সরস গল্প তাদের ছাড়লাম।

এসে গেল পকেটে কিছু পয়সা। অবশ্য সব সময়ই যে পকেটে আসে তা নয়, এটা সম্পূর্ণ নির্ভর করে স্থান, কাল ও পাত্রবিশেষের ওপর— অবশ্যই ভাগ্যের খেলা তো বটেই। লাইব্রেরী থেকে বেরিয়ে মাঠের ওপর রুমাল খুলে খুচরো পয়সাগুলো গুনে দেখলাম মোটামুটি মন্দ নয়, অন্ততঃ হেসে খেলে স্বচ্ছন্দে সাতদিনের খোরাক চলবে। এখন একটু ঢোকা যাক ক্যান্টিনে, পকেটে পয়সা দেখে সাথে সাথে ক্ষিদেটা যেন তিনগুণ মাত্রায় চেপে বসল। এত সহজে লক্ষ্মী আসবে ধারণা করিনি— যাক এ পর্যন্ত দেখছি দেশটা নেহাৎ খারাপ নয়, অন্যান্য দেশের মতো এখানে হয়তো সপ্তাহভোর একাদশী করতে হবে না।

দেখতে দেখতে বেলা গড়িয়ে গেল, পৌঁছতেই নয়না বা নয়ান ভাইয়া জানালো যে, মিঃ আগরওয়ালা আমাকে তলব করেছেন। তাঁর অফিসে এসে পৌঁছতেই তিনি বললেন— আসুন বসুন মিঃ দে, তারপর খবর কি? আমরা তো ভাবলুম আপনি আবার উড়েছেন।

—তাই নাকি? তা অবশ্য ভাবতে পারেন তবে, আপনাদের ভাবনার গণ্ডির মধ্যে আমি নেই, আমি হাসতে হাসতে বললাম।

—হ্যাঁ শুনুন, এই দেখুন আমি আপনার জন্য কয়েকটা প্রোগ্রাম তৈরি করেছি। কাল বিকেলে তিনটে দশ মিনিটে টেলিভিশন অফিসে আপনি যাবেন। তার পরদিন সকাল সাড়ে দশটায় নিউ ইয়র্ক টাইমস্ অফিসে একটা ইনটারভিউ-এর বন্দোবস্ত করা হয়েছে। আর বিকেলে স্থানীয় একজন বিশেষ সম্মানীয় ভারতীয় আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান— কি, খুশীতো? আগরওয়ালা সাহেব তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করলেন।

আমি হাসি মুখে বললুম— সত্যি আপনি খুবই অ্যাকটিভ দেখতে পাচ্ছি, আমার জন্য আপনি সত্যি অনেক করলেন— ধন্যবাদ মিঃ আগরওয়ালা। আসল কথাটা কি জানেন— আপনি দেখছি আমাকে এন বি সি টেলিভিশন অফিসে ও টাইমস অফিসে পাঠাবার বন্দোবস্ত করছেন— তা ভালোই, তবে আমার তাতে মত নেই।

—সে কি? আপনি কি প্রচার চান না?

—প্রচার চাই না একথা বলতে পারবো না। তবে আমার প্রিন্সিপল হচ্ছে এই যে, আমি প্রেসের পেছনে ছুটি না, তবে প্রেস যদি আমার পেছনে ছোটে তাতে আমার আপত্তি নেই। খববের কাগজের অফিসে গিয়ে নিজের বাহাদুরী বলায় আমার মনে হয় তাতে প্রচার যতটাই হোক না কেন আসলে দুর্বল মনোবৃত্তিরই পরিচয়। তবে হ্যাঁ, যদি রিপোর্টাররা এখানে আসেন তাহলে আমাব আপত্তি নেই।

—দেখুন মিঃ দে, আমি অনেক চেষ্টা করে এই ইন্টারভিউটা ম্যানেজ করেছি, আপনি দেখছি সেটা মিস করতে বসেছেন।

—শুনুন আগরওয়ালা সাহেব— আমি আপনাকে প্রেস মিট-এর জন্য অনুরোধ করিনি; আমি আপনাকে শুধু আমার মাথা গোঁজবার একটা বন্দোবস্ত কবতে বলেছিলাম, অবশ্য সেটা যদি আপনার সাধ্যমতো হয়, নচেৎ নয়।

ভদ্রলোক এবার একটু লজ্জিত হয়ে বললেন— তা ঠিক, কিন্তু আমি সত্যি কোনো সুবিধা করতে পারলাম না।

—ওঃ তাই বুঝি আপনি লজ্জায় গতকাল আমার আসবার আগেই চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন! যাইহোক, সত্যি মিঃ আগরওয়ালাজী আমি আপনাকে অভিযোগ করছি না, কারণ আমি এ পর্যন্ত প্রায় পঁচিশটা ইন্ডিয়ান এম্‌বাসী ঘুরেছি আর সব ক্ষেত্রেই প্রায় একই অবস্থা। আমি জানি আপনার করার কিছু নেই— সরকারী চাকুরীতে সবই সীমিত, তাই না? আপনি চিন্তিত হবেন না, আমার থাকার একটা বন্দোবস্ত হয়েছে। আমার নিউ ইয়র্কে আজকে নিয়ে তৃতীয় দিন।

—তাই নাকি? আমি জানি আপনার মনোবল দারুণ আর সেই জোরেই ভূ-পর্যটনে বেরিয়েছেন—আপনার জয় হবেই, হ্যাঁ শুনুন, এক কাপ চা খাওয়া যাক।

—অবশ্যই, তার সঙ্গে কয়েকটা বিস্কুট বা ভাজি হলে মন্দ হয় না। ভদ্রলোক হো হো করে হেসে উঠলেন। আমিও তাঁর হাসিতে যোগ দিয়ে আমাদের ভারী আবহাওয়াটার পরিবর্তন করলাম।

সন্ধ্যের পর ইন্ডিয়া হাউসের লাইব্রেরিতে এসে গেলাম— অনেক দিন যাবৎ ভারতীয় সংবাদপত্রের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই, তাই একটু দেশের খবরের জন্য স্টেটস্‌ম্যানটা হাতে নিলাম। লাইব্রেরিয়ান ভদ্রলোক ভালো, সাদাসিধে বিনয়ী ভদ্রলোক, তিনি আমাকে দেশের বিভিন্ন সংবাদ দিয়ে সাহায্য করতে লাগলেন। সত্যি ইতিমধ্যে দেশের রাজনীতির একটা বিরাট পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। যাই হোক, এবার একটু খবরের কাগজের দিকে চাওয়া যাক। খবরের কাগজের মধ্যে প্রায় ডুবে গিয়েছিলাম, হঠাৎ পাশের ভদ্রলোক আলতোভাবে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন,

—আপনি কি আমেরিকান?

আমি খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে ভদ্রলোকের দিকে তাকালাম— মাথা থেকে পা পর্যন্ত সুসজ্জিত ভারতীয় সাহেব। হেসে তাকে মৃদুস্বরে বললাম—

—আমাকে দেখে কি আমেরিকান বলে মনে হয়?

—না, তবে ... ভদ্রলোক একটু তির্যকভাবে তাকালেন।

—তবে... আমি তার সুরটা ধরিয়ে দিলাম—

—তবে আপনাব মাথার লম্বা চুল— ছেড়া প্যান্ট জামা দেখে মনে হয়— কি জানি হয়তো হিপ্পি হলেও হতে পারেন। তা ভালো, এখানে কি করা হয়?

—কিছু না— এই ঘুবে বেড়াই।

—তাই বলুন— বাবা নিশ্চয়ই আমেরিকায় বড় চাকরি করেন। তা আজকাল অনেক ভারতীয় বড়লোকের ছেলেবাও হিপ্পি হচ্ছে।

—না-না আসলে তা নয়, আমি বাউন্ডুলে যাযাবরের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি, আমার পোষাকের বাহার বজায় রাখবার ক্ষমতা নেই, আর দেখেছি, একবার চুল কাটবার পয়সায় একদিনের খাবার জুটে যায়। তাই আর কে নাপিতকে পয়সা দেয়। আমি আমার চুলকে বইবার ক্ষমতা বাখি মশায়।

ভদ্রলোক এবার হেসে জবাব দিলেন— তাই নাকি—চুল কাটবার পয়সা নেই অথচ আমেরিকায় ঘুবে বেড়াবার পয়সা আছে, হাসাবেন না মশাই— হুঁ ভদ্রলোক আর একবার তির্যক দৃষ্টি ছেড়ে স্থান ত্যাগ করলেন।

একটু পরেই দেখলাম ভদ্রলোক লাইব্রেরিয়ানের সঙ্গে বেশ কথায় মত্ত আর বারবার আমার দিকে তাকাচ্ছেন। কিছুক্ষণ পরেই তিনি আবার ফিরে এলেন আমার কাছে। আমার হাতটা জড়িয়ে ধরে বললেন— ক্ষমা করবেন, আমি ভুল বুঝেছি, আপনিই সেই নামকরা ভূ-পর্যটক। আমি বুঝতে পারিনি—কিছু মনে করবেন না স্যার।

বুঝলাম এবার আমাব পালা— কিছু ছাড়া যাক, আমিও খবরের কাগজটা গুটিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে অতি বিনয়ের সঙ্গে বললাম—

না-না, তাতে কি আছে— আপনার যা মনে এসেছে বলেছেন আর সব সময়ই যে সব ধারণা সত্যি হবে তার কি মানে আছে! তবে হ্যাঁ আপনার যদি সময় হয় এ প্রসঙ্গে আমি কিছু বলতে পারি।

—অবশ্যই বলুন স্যার।

—আপনার নিশ্চয়ই কয়েকটা ডিগ্রী আছে, তাই না— ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন—'ভালো, আমরা শিক্ষিত বলে খুব গর্ব করি, নিজের ডিগ্রীর ফলে অপরকে তুচ্ছ ভাবি— কিন্তু কেন বলতে পারেন? আর এই নিউইয়র্ক শহরে নিশ্বাসের সাথে সাথে যেমন দুর্গন্ধযুক্ত ও ময়লা হাওয়া নাকে অনবরত ঢুকছে ঠিক তেমনি শিক্ষার সাথে সাথে অনেক সংস্কারও আমাদের মগজে ঢুকছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে মগজে কোনো ফিলটারের বন্দোবস্ত নেই তাই।

—আমি আজ প্রায় তিন বছর যাবৎ বিদেশে ঘুরছি, আজ পর্যন্ত কোন বিদেশী লোকই আমার চেয়ে আমার পোষাককে বড় করে দেখেনি— অথচ আপনাকে নিয়ে প্রায় ডজনখানেক ভারতীয় যাঁরা আমাকে আমার পোষাকের জন্য কয়েকটা বাণী ছাড়তে ভোলেননি। যাই হোক, আসল কথাটা কি জানেন? আমি অতি সহজ ও সাধারণ আর আমার কাছে জগৎটাও অতি সহজ ও সাধারণ।

—আচ্ছা আপনার কি মাঝে মাঝে মনে হয় না সবুজ ঘাসের ওপর দিয়ে খালি পায়ে হাঁটতে, রাস্তায় চলতে চলতে নিজের মনে গানের কলি ভাঁজতে অথবা ফুরফুরে হাওয়ায় খালি গায়ে ঘুরতে? আমি জানি আপনার ইচ্ছে করে কারণ সেটাই স্বাভাবিক— সেটাই প্রকৃতিগত। প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের মিলন—এটাই প্রাকৃতিক, এর মধ্যে রয়েছে সহজ ও সরলতার প্রকাশ। আপনিই বলুন না— গলা ছেড়ে হো-হো করে হাসার মধ্যে যে একটা উজ্জ্বল আনন্দ তা কি ওই মিটমিটে হাসিতে পোষায়! আপনি বলবেন— না আমরা পারি না কারণ সেটা অভদ্রতা, অসামাজিক। আসলে তা নয়, শুনুন মশায়, আপনি যতই শিক্ষার দোহাই দেন না কেন আমি তা মানতে রাজি নই— আসলে আমরা উচ্চশিক্ষিত ভীরু ও দুর্বল। আমরা শিক্ষার নামে আসলে সহজ ও সরলতাকে দূরে সরিয়ে ফেলছি, কৃত্রিমতাকে বলছি এটাই ভদ্র ও সামাজিক।

ভদ্রলোক একটু রুখে উঠলেন— তার মানে আপনি কি বলতে চান...।

—শুনুন-শুনুন— ভদ্রলোককে আমি থামালাম— আমি জানি আপনি আমার সঙ্গে একমত নন, আমি এও জানি যে আপনারও এ বিষয়ে নিজস্ব ভাবধারা রয়েছে— কিন্তু ওই সব তর্কের আবোহ ও অবরোহ ছেড়ে সরাসরি আসুন সহজ পথে। আমরা বিশেষ করে ভারতীয়রা, অবশ্য সবাই নয়— কিন্তু এই আপনার মতো ভারতীয় সাহেবদের কথা বলছি আর কি?

—পঁচিশ বছরের একটানা শিক্ষার পর আমরা যখন টুপী ও টাই পরে সার্টিফিকেট নিয়ে বেরোই তখন থেকেই শুরু হয় আমাদের কমপ্লেকসিটি। জোরে হাসতে ভয়

পাই, ছেঁড়া প্যান্ট পরতে লজ্জা পাই, রাস্তায় গান করতে ভুলে যাই, আমরা সব সময় ভয়ে জড়োসড়ো, পাছে আমাদের ভেতরকার কমপ্লেকসিটিটা বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু আসলে আমরা সবাই মানুষ— তাই যখন একটা সহজ ও সরল মানুষকে সামনে দেখি, তখনই তার স্বাধীনতা দেখে ভেতরকার পরাধীন আত্মা ফোঁস করে উঠে ছোবল মারে। পরাধীন স্বত্বার স্বাধীন হবার নতি-প্রকাশ।

—যাই হোক, আমি অনেক বলে ফেললাম— আমাদের মানে পর্যটকদের স্বভাবই এই, একটু সুযোগ পেলেতো ব্যস— ঝুড়ি-ঝুড়ি কথা।

ভদ্রলোক এতক্ষণ ধরে আমার কথা গিলছিলেন; এখন ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন— আচ্ছা এখন চলি, আমার আবার এপয়েন্টমেন্ট আছে।

—নিশ্চয়ই, কথা রাখবেন বই কি? এই দেখুন তো একটু মনের সুখে যে সময় নিয়ে আলোচনা করবেন তারও সময় নেই— হতভাগ্য সময়বদ্ধ জীব। আচ্ছা তাহলে আসুন। আবার দেখা হবে, কি বলেন। মনে মনে ভাবলাম পারতপক্ষে ভদ্রলোক আর আমার দিকে এগোবেন না। লাইব্রেরী বন্ধ হয় নটার সময়, কাজেই বাধ্য হয়ে নীচে নামতে হলো। বানারসী ও কিশোরভাই ইতিমধ্যে একটা আলু টমাটোর দম করে ফেলেছে, তাই সঙ্গে হাতে সেঁকা গরম রুটি যোগ হলো— এর মধ্যে আরও দু'জন সহকর্মী এসে জুটেছে। বেশ মজায় আছে, সবকিছু মিলিয়ে বেশ আনন্দেই আমাদের ভোজ হলো। আমার সাইকেলটা অবশ্য আমার সাথে নীচের তলাতেই আছে। পরে আমরা দলবেঁধে বেরোলাম শহর ঘুরতে। এটা ওদের একটা নৈমিত্তিক ঘটনা।

রাস্তায় চলতে চলতে কিশোরভাই আমাকে জিজ্ঞেস করলো— দাদার কি শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার স্বভাব আছে?

—তার মানে? আমি এখনো বিয়ে করিনি ভাই, জবাব দিলাম।

—তারজন্যই তো বলছি— মানে এখানে অনেক ....

—ওঃ বুঝলাম, না-না, তবে তোমরা গেলে যেতে পারো, আমার আপত্তি নেই।

—না, আমরাও যাই না, তবে গলিতে ঘোরাঘুরি করে একটু মজা করি— এই আর কি।

—ভালো তো— আরে মজা করতে বাধা কি?

আমরা এসে পৌঁছলাম টাইম স্কোয়ারে। বানারসী আমাকে বুঝিয়ে দিল এটা টাইম স্কোয়ার, টাইম স্কোয়ারের নাম সময় সময় পালটায়। পৃথিবীর গণ্যমান্য ব্যক্তিদেব স্মরণার্থে এই স্কোয়ারের নাম রাখা হয়, অবশ্য তা কয়েকদিনের জন্য মাত্র। যেমন মহাত্মা গান্ধীর তিরোধানের সময় এই টাইম স্কোয়ারের নাম ছিল গান্ধী স্কোয়ার,

লেনিনের মৃত্যুর সময়ে এর নাম ছিল লেনিন স্কোয়ার। এই ধরণের সেভেন্থ্ এভেন্যু ও ব্রডওয়ের সঙ্গমস্থল হচ্ছে এই টাইম স্কোয়ার। এই রকমের বিভিন্ন রাস্তার সংযোগে বহু স্কোয়ার আছে। আমরা ব্রডওয়ে ধবে এগোতে লাগলাম, দু'পাশে অসংখ্য নিওন লাইটের মহোৎসব। রাস্তার দু'পাশে রয়েছে অসংখ্য সিনেমা হাউস, বার, ক্যাবারে। অধিকাংশ সিনেমা হলেই দেখতে পাচ্ছি নায়িকার আকর্ষণীয় নগ্ন মূর্তি অথবা ঘোড়ার ওপর পিস্তল হাতে কাউ-বয়। সব সিনেমা হলেই অতি সস্তা দরের ফিল্ম চলছে। দু'পাশের বাড়ীগুলো খুব উঁচু নয়, তবে অনেক উঁচু। দু'পাশে অসংখ্য দোকান— আমি উৎসুক হলাম দোকানের জানালায় সাজানো বইগুলোর দিকে। বানারসী ভাই বললো— আরও একটু এগিয়ে চলুন দাদা, ওদিকের দোকানগুলো খুব বড় বড়, দেখে মজা পাবেন।

মিনিট খানেকের মধ্যেই আমরা এসে হাজির হলাম নির্দিষ্ট এলাকায়। দু'পাশে সারি সারি বই-এর দোকান আর সেই সঙ্গে রয়েছে অসংখ্য রং-বেরঙের ছবি। আমরা সবাই ঝুঁকে পড়লাম এরকম একটা বড় দোকানের কাঁচের জানলায়। ভালো করে নজর দিতেই দেখি এসবই কেলি-সূত্র। নগ্ন দেহের অমন বিচিত্র অঙ্গ-ভঙ্গি সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করার পক্ষে যথেষ্ট। যুবক-যুবতীর নগ্ন মিলনচিত্র ছাড়াও আছে পুরুষ ও নারীর গোপন অঙ্গের চিত্রিত ও বর্ণাঢ্য ছবি। আমাদের কামসূত্র এর কাছে ছেলেমানুষ। এসব ছবির মধ্যে শিল্প মাধুর্য কতটা আছে বলতে পারবো না। তবে এই দোকানগুলোর কাঁচের জানালায় যে অনবরত গুণগ্রাহীদের নাক ঠুক্‌ছে তাদের সংখ্যা অসংখ্য। অবশ্য আমি ছবি বলতে ফটোর কথা বলছি— তার মানে সব ব্যক্তিগত দেহভঙ্গির সরাসরি ফটো। দোকানটার ভেতরে বিরাট একটা উঁচু ডেস্‌ক ও উঁচু চেয়ারে বসে দোকানদার খুব কড়া নজর রেখেছে অর্থাৎ বিনামূল্যে কেউ ছবি সরিয়ে না ফেলে। আমাদের কলকাতায় দেখেছি এর দু'একটা মাঝে মাঝে সেখানে ছিটকে পড়ে আর নিউ মার্কেটের আশে-পাশের গলিতে নিষিদ্ধভাবে অতি উচ্চ মূল্যে সেগুলো বিক্রি হয়। এখানে এসব আইনতঃ সিদ্ধ। নিউ ইয়র্ক শহরের শতাধিক এই ধরনের দোকান শহরের মাঝে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—লোকে বলে পোর্নোগ্রাফি (pornography); এটাও সভ্যতা ও সংস্কৃতির আধুনিক সংস্করণ। রাস্তার দু'ধারে কালো মেয়েরা ঘোরাঘুরি করছে, মাঝে মাঝে মদখোর মাতালের সঙ্গে ধাক্কা খেতে খেতে আমরা আরও এগিয়ে চললাম— মাঝে মাঝে রাস্তার ওপর গায়ে পড়ে আমাদের আকৃষ্ট করবার জন্য দালালদের চেষ্টা চলতে লাগল। আমরা তারই মধ্য দিয়ে আরও এগিয়ে চললাম। রাস্তার পাশে একটা সুন্দরী মেয়ে অর্ধনগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে পথিকদের আকর্ষণ করছে— আমরা তার পাশ দিয়ে হাঁটতেই সে আমাদের ডেকে বলল —আসুন আজকের স্পেশাল শো, সিনসিনাটির নাম করা নায়িকা আপনাদের তার দেহভঙ্গি দেখাবে— আমি জোর করে বলতে পারি যে আপনারা পাঁচ মিনিটের মধ্যেই একসাইটেড হবেন.... ইত্যাদি ইত্যাদি। দু'পাশে আরও রয়েছে ছোটখাটো ডার্কশো— নাচঘর আরও এরকম অনেক কিছু। নিউ

ইয়র্ক কেন সমগ্র আমেরিকায় এধরনের জিনিস আইন অনুযায়ী গড়ে উঠেছে। তার মানে আইন তার উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাদের অতি সাবধানে রক্ষা করছে। শহরের জীবনে যাতে কারও একঘেয়েমি না আসে তারই বিবিধ আয়োজন। রাস্তার দু'ধারে সুসজ্জিত সিটি পুলিশ সবসময় সতর্ক। এই রাস্তায় বুকে চাকু বসানো বা কপালে গুলি বিদ্ধ করা একটা ছেলেখেলার ব্যাপার। আমরা হঠাৎ ধাক্কা খেলাম। একদল মেয়ের সাথে পরনে মিনি, হাতে সিগারেট আর কদমছাঁট চুলে— বানারসী আমাদের মধ্যে বেশ উঁচু লম্বায়, তার কাছে একটা মেয়ে সিগারেট ধরাবার জন্য আগুন চাইল—বেনারসী আগুনটা দিতেই মেয়েটা হঠাৎ ওর মুখের কাছে মুখ এনে কি যেন বলল আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না, কিশোর ভায়ের দিকে তাকিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম— তোমাদের চেনা নাকি?

কপালে দু'হাত ঠেকিয়ে ও কানমলা দিয়ে ও বললো— রাম কহো দাদা—ইয়ে বহুৎ গন্ধ্যা হায়— হামলোগ্ কভি নেহি যাতা; লেকিন দাদা ঘুমনে মজা আতা হায়।

—ভালো, রাত এখন প্রায় একটা হতে চলল, এবার ফেরা যাক কি বল?

—ওঃ নিশ্চয়ই। আমরা বাড়ীর পথ ধরলাম।

আজকে সাইকেলটা সঙ্গে নিলাম না। একটু এদিক-ওদিক ঘোরা যাক। সেন্ট্রাল পার্কের দিকে একটু পা বাড়াতেই হঠাৎ মনে হল, তাইতো—এখানে শুনেছি একটি রামকৃষ্ণ মিশন আছে—কাজেই খোঁজ করা যাক। খোঁজ নিয়ে দেখলাম সেটা বেশি দূরে নয়, কাছেই, সেদিকেই পা বাড়ালাম। সরাসরি পথে প্রায় পঁচিশ মিনিট হাঁটার পর মিশনের দরজায় এসে পৌঁছলাম। একটা পুরোনো বাড়ীর একাংশ জুড়ে এই মিশন। দরজার ওপর লেখা রয়েছে রামকৃষ্ণ বেদান্ত মিশন। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে দরজায় কলিং বেল টিপলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই একজন প্রৌঢ়া আমেরিকান ভদ্রমহিলা দরজা খুললেন—আমি তাকে নমস্কার জানিয়ে জিজ্ঞেস করলাম— আমি স্বামীজির সাথে একটু দেখা করতে চাই। ভদ্রমহিলা বললেন যে, আমাদের স্বামীজি একটু বাইরে বেরিয়েছেন, তবে আমাদের এখানে আর একজন স্বামীজি বর্তমানে এসেছেন, তাঁর সাথে দেখা করবেন কি?

—অবশ্যই যে কোন স্বামীজি—আমার কাছে সব স্বামীজিই সমান, কারণ আমি কাউকেই চিনি না—

—আচ্ছা, তাহলে আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি দেখছি তিনি এখন ফ্রি আছেন কি না।

—বেশ, আমি অপেক্ষা করছি।

—আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি তার ঠিক সামনে থেকেই একটা সিঁড়ি ওপর দিকে উঠে গেছে, বাঁ পাশে একটা দরজা আর ডান দিকে একটা সাজানো ঘর,

অনেকটা লাইব্রেরীর মতো। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি অথচ কারও আসার নামগন্ধ নেই। কাজেই পাশের বেঞ্চিতে বসলাম— জানি না আদৌ কেউ আসবেন কি না। চারদিকে নিঃশব্দ। হঠাৎ দেখি সিঁড়ির ওপর থেকে একজন নীচে নেমে আসছেন। প্রথমে নজর পড়ল তাঁর পায়ের চক্‌চকে জুতো, পরনে দামী গরম প্যান্ট কোট; আস্তে আস্তে ভদ্রলোক নীচে নেমে এলেন। এবার তাঁর মুখের দিকে তাকালাম, মুণ্ডিত মস্তক আর অতি প্রশান্ত দেবসুলভ সদাহাস্যময় মুখ, কোথায় যেন দেখেছি বলে মনে হচ্ছে অথচ ঠিক মনে করতে পারছি না। ভদ্রলোক এতক্ষণে ঠিক আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ভদ্রলোক আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন—বিমল না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—জবাব দিলাম।

—আমাকে ঠিক চিনতে পারলে না বুঝি, আমি* স্বামী (সোঽহং আনন্দ) সবাই সোহানন্দজী বলেন।

—স্বামীজি? আমিও হঠাৎ আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম, আপনি এখানে!

—হ্যাঁ, বর্তমানে আমি আমেরিকায় এসেছি, আমি এখন আছি স্যানফ্রান্সিস্‌কোতে, এখন আমি বিভিন্ন মিশনে ঘুরছি। ওঃ তুমি আমার পোষাক দেখে হয়তো ভাবছো— ব্যাপার কি? আসলে আমরা বিদেশে প্রায়ই স্যুট-প্যান্ট পরি। তার মানে —যস্মিন্ দেশে যদাচার।

আমি ঠিক কোন প্রসঙ্গে যে স্বামীজির সাথে আলাপ করবো তা ঠিক ভেবে পাচ্ছি না—হয়তো আমার মনোভাবটা বুঝতে পেরে স্বামীজিই আবার আরম্ভ করলেন,

—আমি জানতাম যে, তুমি পারবে। দিল্লিতে মনে আছে তোমায় আমি বলেছিলাম যে তোমার এ যাত্রায় কেউ বাধা দিতে পারবে না, তোমার মনোবল দারুণ। আত্মবিশ্বাস একবার জন্মালে অনেক অসাধ্য সাধন করা যায়।

—আমি ঠিক জানি না আত্মবিশ্বাসের জোরেই আমার সফলতা এসেছে কি না— তবে আপনাদের আশীর্বাদই আমার প্রেরণা।

এইভাবে স্বামীজির সাথে প্রায় ঘণ্টাখানেক আলাপ করার পর আমি উঠলাম, স্বামীজীকে আর বেশীক্ষণ আটকে রাখা ঠিক হবে না।

—আচ্ছা তুমি আছো কোথায়? হঠাৎ স্বামীজি জিজ্ঞাসা করে বসলেন।

—এই বিরাট আকাশের তলায় থাকবার জায়গার অভাব কি স্বামীজী!

—তা ঠিক অবশ্য।

অবশেষে স্বামীজিকে বিদায় জানালাম। স্বামীজিকে প্রণাম করে মাথা তুলতেই তিনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন— মনের জোর বজায় রেখো, দেহের মধ্যে যে আত্মা তিনিই ভগবান, কথাটা মনে রেখো, হ্যাঁ আর একটা কথা, তুমি যখন চিকাগো যাবে তখন আমাদের মিশনেই থেকো। ওখানে স্বামী বৈশ্বানন্দজী আছেন— আর স্যানফ্রান্সিস্কোতে কোন অসুবিধা হবে না, সেখানে আমি আছি। ভগবান তোমার সহায় হোন্।

ঠিক বেরোবার জন্য পা বাড়াতেই স্বামীজি আমার হাতটা টেনে ধরলেন, —এক মিনিট, আমার হাতে দশ ডলারের একটা নোট গুঁজে দিয়ে বললেন,— না না, কিছু বলতে হবে না। দরজার বাইরে বেরোলাম। ফুটপাতের ওপর দাঁড়িয়ে আর একবার তাকালাম মিশনের দরজায়। দেখলাম শান্ত সৌম্যমূর্তি স্বামীজি জোড়হাতে নমস্কারের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন।

প্রায় এক ঘণ্টার মতো আমি স্বামীজির সাথে কথাবার্তা বলেছি কিন্তু তাতে মনে মনে যে প্রেরণা ও উৎসাহ পেলাম তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়, সত্যি স্বল্পম্ অল্পস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।

সেন্ট্রাল পার্কের কাছাকাছি আসতেই কানে বাজলো ঢাক-ঢোলের কাংস্য ঝংকার। শব্দ যে কেবল শব্দই করে তা নয়, শব্দের একটা আকর্ষণীয় ক্ষমতাও আছে। কাজেই এ শব্দ কানে যত বিঘ্নই ঘটাক না কেন, আমাকে তার দিকে টেনে আনবার পক্ষে তা যথেষ্ট নিঃসন্দেহ। বাঁদর নাচের ভীড়ের মতো একটা ছোটখাটো ভীড় ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম। ও —এই ব্যাপার! চারটে ছেলে আর তিনটে মেয়ে— সবাই যুবক-যুবতী; তাদের কারো হাতে গীটার, দুটো লম্বা কংগো গোছের বঙ্গো আর তার সাথে প্যাও-প্যাও শব্দ করা একটা বিদ্ঘুটে যন্ত্র। এদের মধ্যে একজন নিগ্রো ছেলেও রয়েছে এবং সবাই পোষাকে হিপ্পি। এটা অনেকটা যাযাবরদের যাত্রার দলের মতো। ব্যাপারটা বুঝলাম; গানের সঙ্গে এই যন্ত্রের শব্দ মিশিয়ে তৈরি হচ্ছে এক অদ্ভুত শব্দ-তরঙ্গ— আর জনতার উদ্দেশ্যে সেটা বিতরণ করা হচ্ছে অতি সস্তা দরে অথবা বিনা পয়সায়। আমার পূর্বাভিজ্ঞতানুযায়ী আমি জানি এদের চরিত্র, আধুনিক ধনিক পরিবারসৃষ্ট সখের ভিখিরী সন্তান। শব্দের সঙ্গে দেহের এক অপরূপ ভঙ্গির মিশ্রণে তৈরী হচ্ছে নাচ। এর মধ্যে মধুরতা কতখানি আছে জানি না, তবে মাদকতা আছে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ। ওখানে একটা বাড়তি বিহারী ঢোল দেখতে পেয়ে আমিও সেটাকে গলায় ঝুলিয়ে তাদের দলে ভিড়ে গেলাম। কাজে লাগিয়ে দিলাম তবলার কয়েকটি বোল। আস্তে আস্তে ভীড় আরও জমে উঠলো। এইভাবে প্রায় ঘণ্টাখানেক আমরা শব্দ ও ভঙ্গি বিতরণ করে থামলাম। মেয়েরা হাতে টুপি নিয়ে জনতার দিকে এগিয়ে গেল। এরা কেউ পয়সা চায় না তবে কেউ যদি খুশী হয়ে দেয় তো দিক।

ভীড় ভাঙলে আমরা খুচরো পয়সা গুনতে বসলাম। আমার ঢোলের শব্দে এরা খুশী— তাই আমাকেও কিছু অংশ দিল— প্রায় ন' ডলার (৭০ টাকার মতো)। খুচরো পয়সার এক ভারী পকেট নিয়ে ওদের বিদায় জানালাম।

ফিরে এলাম ইণ্ডিয়া হাউসে। ওখান থেকে সাইকেলটা নিয়ে বেড়াতে যাচ্ছি, এমন সময় লাইব্রেরিয়ান ভদ্রলোক আমাকে ডাকলেন— তিনি আমার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন নিউইয়র্কের একজন প্রতিপত্তিশালী ভারতীয় ব্যবসায়ীর সাথে। পাঞ্জাবী ভদ্রলোক মিঃ সিং। ভদ্রলোকের সাথে অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা চললো— আমার বিদেশ সফরের তিনি ভূয়সী প্রশংসা করলেন— পঞ্চ আবের দেশের অধিবাসীরা স্বভাবতই স্পোর্টস্‌ম্যান। তিনি আমাকে উপদেশ দিয়ে বললেন, আমি যদি ফিলাডেল্‌ফিয়ায় যাই তাহলে ওখানে একজন বাঙালী ভদ্রলোক মিঃ হালদাবেব বাড়ীতে থাকতে পারি। যদি আমি রচেস্টারে যাই তাহলে মিঃ চ্যাটার্জীর সাথে পরিচিত হয়ে খুব লাভবান হবো....ইত্যাদি। ভদ্রলোককে পরে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ভাল কথা— ওদিকে যখন যাবো দেখা যাবে। আপাততঃ আমি এই শহরে আছি, আমার একটা থাকার বন্দোবস্ত করে দিতে পারেন কি?

ভদ্রলোক ওপবের ঠোঁটটাকে নীচের দাঁত দিয়ে খানিকক্ষণ কামড়ে তারপর জবাব দিলেন— ঠিক করে ভেবে দেখি। ভাল কথা, এ ব্যাপারে আপনি মিঃ আগরওয়ালা সাহেবের সাথে কথাবার্তা বলুন, তিনিই হচ্ছেন রাইট পারসন্। ভদ্রলোকের জবাবে বুঝলাম, আসলে সবাই সেই এক পরিবারভুক্ত, বিনা পয়সায় উপদেশ দিতে পারেন বটে, বিনা স্বার্থে পরোপকার করা হয়তো তাঁদের চরিত্রবিরুদ্ধ। যাইহোক, এখানে এমনভাবে সময় নষ্ট করার চেয়ে রাস্তায় বেড়িয়ে এ শহর সম্পর্কে নতুন আরও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা ভাল। তাই ভদ্রলোককে তাঁর পরামর্শের জন্য বিশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে নমস্কার জানালাম।

শহরে দেখার অনেক কিছু আছে, পৃথিবীখ্যাত জিনিসের এখানে অভাব নেই; সব কিছু খুঁটিয়ে দেখতে গেলে বেশ কয়েক মাস এখাতে থাকতে হবে। কাজেই বেছে বেছে আমি দর্শনীয় বস্তু ও স্থান দেখতে লাগলাম— তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য: বিয়াল্লিশ নং রাস্তার, নিউ ইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরী ও তার অতি সাজানো-গোছানো কেতাদুরস্ত শিল্পনৈপুণ্য, ফিফ্‌থ এভেন্যুতে আছে পৃথিবীর সেরা লাইব্রেরী, রাস্ট্রসংঘ বা ইউনাইটেড নেশনস্-এর হেডকোয়ার্টার, প্রায় বিশ একর জমির ওপর, সুন্দর পূর্ব নদী বা ইস্ট রিভারের তীরে অতি আধুনিক ইমারত, বিশ্বশান্তি ও মৈত্রীর প্রতীক। এই বাড়ীটার ভেতরটাও একটা এলাহি কাণ্ড। যদিও এটা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সম্পত্তি, ভারত যার সদস্য, তবুও বাড়ীর ভেতরে ঢুকতে গেলে লাগে পয়সা। অবশ্য আমি পয়সা খরচ করে বাড়ী দেখতে রাজি নই, সে যত বড়ই হোক না কেন। ভাগ্যচক্রে আমি ইন্‌ফরমেশন্ অফিসারের সাথে সাক্ষাতের একটা বন্দোবস্ত করলাম আর তার দৌলতেই বিনা পয়সায় জাতীয় প্রাসাদের অন্দরমহলে

ঢোকবার অনুমতি পেলাম। ভদ্রলোক অতি প্রভাবশালী, তিনি আবার সেক্রেটারী জেনারেলের (উ.থান্ট) অন্যতম সহযোগী।

সিটি হলটা দেখবার মতো। অনেকের মতে এটা স্থাপত্য ও সৌন্দর্যের প্রতীক। আসলে এটা হচ্ছে গভর্নর হাউস। শহরের মণিস্বরূপ এই বাড়ীটার ভেতরে ঢুকে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। বাড়ীটার নিজস্ব রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য ছাড়াও ভেতরে রয়েছে শিল্পনৈপুণ্যের এক বিরাট ভাণ্ডার। বিশেষ করে অতি মূল্যবান অয়েল পেন্টিং-এর সংগ্রহ অনেকটা লণ্ডনের বাকিংহাম প্যালেসের মতো। এই City Hall-এর কাছেই রয়েছে ব্রুকলীন ব্রীজ (Brooklyne Bridge), ১৮৮৩ সালের তৈরী নিউ ইয়র্ক শহরের প্রাচীনতম সেতু।

ব্যাটারী পার্ক (Battery Park): নিউ ইয়র্ক শহরের আকাশচুম্বী প্রাসাদের এক পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যায় এই ব্যাটারী পার্ক থেকে। শুধু তাই নয়, এখান থেকে নিউ ইয়র্ক বন্দরের দৃশ্যও অতি চমৎকার। এখান থেকে আমি ফেরী বোটে করে দেখতে গেলাম আমেরিকার স্বাধীনতার প্রতীক চিহ্নস্বরূপ লিবার্টি স্ট্যাচু— মাথায় বিজয় চূড়া আর হাতে মশাল নিয়ে ঘোষণা করছে মানবজাতির স্বাধীন সত্তা।

ওয়াল স্ট্রীট (Wall Street): পৃথিবীখ্যাত স্টক এক্সচেঞ্জ, শুধু আমেরিকার নয়, পৃথিবীর ব্যবসায়ী মহলের এক তীর্থক্ষেত্র। লোকের ছোটাছুটি চিৎকার আর মারামারির এক জমকালো চিত্র। এরই একদিকে রয়েছে জর্জ ওয়াশিংটনের এক বিরাট স্ট্যাচু, যেখান থেকে তিনি শপথ বাক্য নিয়েছিলেন ঠিক সেই জায়গাটায়। অর্থ-জগতের ভাগ্যনির্ধারক এই স্টক এক্সচেঞ্জের ঠিক পিছনেই রয়েছে ঐতিহাসিক ত্রয়োধার্মিক গীর্জা (Trinity Church)। বর্তমান অর্থ-জগতের সাথে ধর্ম-জগতের বা আধ্যাত্ম-জগতের সামঞ্জস্য বজায় রাখবার জন্যই হয়তো পাশাপাশি এই দুই-এর অবস্থান -।

এবার আসা যাক শহরের আর এক দিকে।

নিউ ইয়র্ক একটা তাজ্জব শহর— এখানে না আছে কি! সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যে নিউ ইয়র্ক শহরের অধিকাংশই হচ্ছে বিদেশী— শুধু ট্যুরিস্ট নয়, কর্মী শ্রেণীর প্রায় নব্বই ভাগই হচ্ছে আগন্তুক। আমি নিউ ইয়র্ক শহরকে আগেই কলকাতার সঙ্গে তুলনা করেছি, শিয়ালদহ হাওড়া স্টেশনে কুলির দল অথবা বড়বাজারের মারওয়াড়ীর প্রভাব অথবা চৌরঙ্গীতে বিদেশীদের আমদানি দেখে অনেক সময় আমরা ভুলে যাই যে এটা বাংলাদেশেরই রাজধানী। নিউ ইয়র্ক শহরের ব্যাপার আরও তাজ্জব। এখানে প্রায়ই দক্ষিণ আমেরিকা ও দক্ষিণ ইউরোপ থেকে দলে দলে লোক আসছে কাজের সন্ধানে। এখানে তাই বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন ভাষীদের এক-একটা এলাকা। কোনটার নাম চায়না টাউন, গ্রীক ভিলেজ, পোর্টোরিকান কলোনি, ইটালীয়ান এরিয়া, রাশিয়ান এরিয়া, পোলিশ ভিলেজ, জুইস গারডেন, ইসরায়েলিয়ান। ম্যানহাটন এলাকাটা আসলে আকাশচুম্বী প্রাসাদের জন্য বিখ্যাত আর

সেখানে কাজ করবার জন্য দরকার হয় হাজার হাজার কর্মীর। তাই ঠিক আপার ম্যানহাটন (Manhattan's)-এ গড়ে উঠেছে বিরাট দুটো নিগ্রো ডিস্ট্রিক্ট— একটার নাম হারলেম (Harlem), অপরটি ব্রুকলিনের বেড্‌ফোর্ড স্টুইভেসান (Bedford Stuyvesant)। অবশ্য সে কারণে মাঝে মাঝে সংঘাত বেঁধে উঠেছে। ভারতীয়রা এখানে অধিকাংশই অস্থায়ী ব্যবসায়ী; অল্প কিছু চাকরীজীবি।

সকালবেলা আমার সাইকেল নিয়ে শহরে চলা মুশকিল, খালি পায়ে হাঁটার তো প্রশ্নই ওঠে না; এটা যে আসলে আইন-বিরুদ্ধ তা নয়, বিপজ্জনকও। নিউ ইয়র্কের অধিকাংশ রাস্তাই সকালবেলা ভাঙা বোতল ও কোকোকোলা জাতীয় কৌটোর ছড়াছড়ি। সন্ধ্যের পর, যখন শহরের অফিস দপ্তর ও কারখানা বন্ধ হয় তখন মদ ও পানীয় বোতলের দোকানে লাগে ভীড়। আর সকালবেলা তাই খালি কৌটো ও ভাঙা কাঁচের সমারোহ। আমাদের কলকাতার রাস্তায় যদি এই ভাঙা কাঁচের সিকি পরিমাণও থাকতো তাহলে— কাঁচসংগ্রহকারীদের এক স্বর্গরাজ্য গড়ে উঠতো। যাই হোক, পৃথিবীর আর্থিক রাজধানী এই নিউ ইয়র্ক শহরের নিন্দা আমি করতে পারি না। রাস্তার কোণে উপচে পড়া আবর্জনার প্রসঙ্গেও আমি কিছু বলব না। ফুটপাত ও রাস্তার ভাঙা বোতলের নিন্দার বদলে তাদের শতাধিক আকারের বিভিন্ন গঠন ও রঙের প্রশংসা করাই ভাল। হ্যাঁ, সেকারণেই বলছিলাম যে, নিউ ইয়র্ক শহরে সকালবেলা সাইকেল চালানো মুশকিল। তার মানে প্যাডল করার আগেই চাকা বার্স্ট অথবা লিক!

কাজেই পায়ে চলাই ভালো। কাঁধের ব্যাগটা অনেকটা হাল্কা করে নিয়েছি, অধিকাংশ মালপত্র নয়ান সিং-এর ঘরে জমা দিয়ে এসেছি, কাজেই হাঁটতে কোনো অসুবিধা নেই। প্রায় আধঘন্টা হাঁটার পর বে'এরিয়া বা বন্দর এলাকায় এসে পড়লাম। বন্দর মানে বিরাট ব্যাপার, ক্রেন-মালগাড়ী-ট্রাক আর কুলিদের চীৎকার, সেদিকে না গিয়ে আমি উল্টো দিকে হাঁটা ধরলাম।

পোর্ট বেসিন এলাকা। সারি সারি হাজারে হাজারে নানা রঙের ও নানা আকৃতির নৌকো বোট ও লঞ্চের সমাহার। এক নজরে মনে হয় হঠাৎ যেন হংকঙে এসে পৌঁছেছি। দেখতে দেখতে বেলা গড়িয়ে এল। একটা পার্কের মতো জায়গা পেয়ে সেখানে একটা গাছের নীচে কাঁধের ব্যাগটা নামলাম। ওঃ— বেশ গরম, প্রায় কলকাতার মতো। মনে হয় বেলা বেশ গড়িয়েছে। আশে পাশে লোকজন বিশেষ নেই, মাঝে মাঝে দু-একজন যাতায়াত করছে— বন্দরের প্রহরী।

ব্যাগের ভিতর থেকে ছোট্ট স্টোভটা ও রান্নার সরঞ্জাম বার করে আহারের বন্দোবস্ত করা যাক। কয়েকটা আলু ও ডিম সিদ্ধ হলেই একটা মহাভোজ হয়ে যাবে। সুইজারল্যাণ্ডের তৈরী ক্যাম্পিং স্টোভ, ফ্রান্সের তৈরী রান্নার সরঞ্জাম। আমেরিকার আলু ও ডিম। আধঘন্টার মধ্যেই তৈরী হয়ে গেল খাবার।

আশে পাশে কাউকে চোখে পড়ছে না। গরমের ফুরফুরে হাওয়ায় ঘাসের ওপর দেহটা এলিয়ে নিয়ে খাওয়া শুরু করলাম। হঠাৎ দেখি দুটো মেয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। যুবতী নয়, নেহাৎই বাচ্ছা— বারো-তেরোর কোঠায়। দেখতে ফিরিঙ্গি গোছের অর্থাৎ সাদা-কালোয় তৈরী। আমার ঠিক কাছে এসে ওরা থামলো। ওদের মধ্যে একজন মনে হচ্ছে আর একজনের চেয়ে চালাক। আমি খাওয়া থামিয়ে দিয়ে ওদের দিকে তাকালাম। দেখে ক্ষুধার্ত বলে মনে হল না— তবে পোষাকে দরিদ্রতার লক্ষণ। অপেক্ষাকৃত রোগা মেয়েটি তার সঙ্গিনীকে কনুই দিয়ে গুঁতো দিয়ে বললো— তুই-ই বল না।

—না, তুই বল।

শেষে রোগা মেয়েটা আমার দিকে আরও এগিয়ে এলো।

—একটা সিগারেট দেবেন?

আমি এবার ভালো করে লক্ষ্য করলাম, সত্যি বাচ্ছা, সবে বুকের জামায় ময়লা আঁকড়াতে শুরু করেছে। আমি হেসে জবাব দিলাম,

—আমি সিগারেট খাই না।

—তাহলে ২৫ সেন্টিম দিন (১ ডলারের চার ভাগের এক ভাগ)।

—কি করবি?

—সিগারেট কিনবো।

—আমি সিগারেটের জন্য পয়সা দেব না।

—কিন্তু আমাদের খিদে পেয়েছে।

—তাই নাকি? খিদে পেলে তোরা বুঝি সিগারেট খাস্?

—অত কথায় কাজ কি? পয়সা না দেবেন, না দেবেন। মেয়েটা বেঁকে বসল। আমিও বেঁকে বসলাম, সেদ্ধ ডিমে একটা কামড় বসিয়ে বললাম,

—অতএব ভেগে পড়, বিরক্ত করিস না।

ওরা সরে পড়ল, আমি ওদের দিকে তাকিয়ে মনে মনে হাসলাম। কিন্তু না— ওরা আবার দেখছি ফিরে আসছে— এবার অপর মেয়েটি আমার কাছে এসে সরাসরি বসে পড়ল— যেন অনেক দিনের পরিচিত। এর চেহারাটা অপেক্ষাকৃত ভালো। সে আমার সেদ্ধ আলুর দিকে তাকিয়ে বলল— আমাকে একটা আলু দেবেন। —অবশ্যই। আমি ওকে দুটো আলুসেদ্ধ দিলাম; খোসা ছাড়াতে লাগল— ওর বন্ধুও ওর দেখাদেখি এসে বসল। আমি অর্ধেক খাওয়া ডিমটা ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম—

—এই নে, ধর— মেয়েটা সঙ্গে সঙ্গে লুফে নিল। যাই হোক, ভাগাভাগি করে খাওয়া হল। এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না ওদের উদ্দেশ্যটা কি। আমি ওদের সঙ্গে কথা না বলে চীৎ হয়ে শুয়ে পড়লাম, একটু বিশ্রামের দরকার।

—আপনি কি ট্যুরিস্ট? একজন জিজ্ঞেস করলো।

—না। আমি উত্তর দিলাম। আমি জানি যে কোনো শহরে ট্যুরিস্ট শব্দটা অনেক সময় বিপদ ঘটায়।

—তাহলে—

—তাহলে আবার কি? যা যা, বিরক্ত করিস না।

মেয়ে দুটো হঠাৎ যেন নিরাশ হলো! অনেকটা অনুরোধের সুরে বললো,

—তার মানে আমাদের আপনি চান না?

—কি বললি? আমি উঠে বসলাম। ভড়কে গিয়ে দু'জনেই উঠে পড়ল, একজন মরিয়া হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে একটা ঢোঁক গিলে বলল,

—মানে খুব সস্তায়...

—খুব সস্তায়— দাঁড়া দেখাচ্ছি মজা, ধরতো রে— উঠে একটা বাঁদর তাড়া দিতেই ওরা ভেগে পড়ল।

কি অবস্থা! এটা নিউ ইয়র্ক কুবেরের দেশ অথচ বদনাম কেবল কলকাতার।

মালপত্র গুছিয়ে আবার হাঁটা ধরলাম। সামনে দু'জন প্রহরী দেখে তাদের দিকে এগিয়ে এলাম; জায়গাটা সম্পর্কে একটু খোঁজ নেয় যাক।

জানলাম—পোর্ট বেসিন এলাকার এই হাজার-হাজার বোটগুলোর অধিকাংশই শহরে থাকবার বিকল্প ব্যবস্থা। বোটের মালিকেরা সকাল সন্ধ্যে কাজ করে শহরে আর এটা তাদের রাতের আস্তানা। শহরে গৃহ-সমস্যা একটা বিরাট সমস্যা। তাই অনেকে বোট কিনে তারমধ্যে তৈরী কবেছে হাউস বোট। অবশ্য এটাও খুব সস্তা নয়, এরজন্য বন্দরে ভাড়া দিতে হয় প্রায় ৩০০ থেকে ৫০০ ডলার প্রতি বছর। এই টাকার বদলে এরা পাচ্ছে বিনা পয়সায় খাবার জল আর চৌকিদার। টয়লেটের ব্যাপারটা জলের ওপরেই চলে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় ভাসমান পদার্থ। এই বোট বেসিনে রাতের বেলা আগমন ঘটে বহু অস্থায়ী বান্ধবীর। আমি আগেই বলেছি সিটি পুলিশ এ ব্যাপারে অতি প্রশান্ত। অবশ্য উইক-এণ্ডে এইসব বোটগুলো চলে যায় মাঝ দরিয়ায় হাওয়া খেতে। দিনেরবেলা বোটগুলো ঘুমন্ত আর রাতের বেলা জেগে ওঠে, বন্দরের দৃশ্য যায় পাল্টে। জলের ওপর অসংখ্য মিট্‌মিটে আলো। বন্দরের পাশের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে গেলে মাঝে মাঝে নাকে ভেসে আসে হালকা গন্ধ, মারিজুয়ানা, হাসিস অথবা ঐ ধরণের ওপন সিক্রেট দ্রব্যের একটা কিছু।

দেখতে দেখতে পাঁচদিন কেটে গেল। সকাল থেকে সন্ধ্যা শহরময় ঘুরপাক খাই আর রাতের বেলা, ইণ্ডিয়া হাউসে আশ্রয় নিই। এবার নিউ ইয়র্ক থেকে বিদায় নিতে হবে, কিন্তু যাব যাব করেও যাওয়া হয়নি। নয়ান সিং, কিশোর, ওরা সবাই বিশেষ অনুরোধ করেছে অন্ততঃ শনি-রবিবারটা ওদের সাথে কাটাবার জন্যে। ওরা বিদেশী গল্প শোনার জন্য পাগল, রবিবার দিন বেশ জমিয়ে আড্ডা মারা যাবে।

শনিবার আমাদের আড্ডা অনেক রাত পর্যন্ত চলল। দেশ-বিদেশের আমার বিচিত্র ও সরস গল্পের সাথে ওদের কাছ থেকে বিদেশী ভারতীয়দের সম্বন্ধে অনেক তথ্য মিশিয়ে প্রায় রাত দুটো বাজালাম। পরের দিন উঠতে একটু দেরী হয়ে গেল। চা জলখাবার খেয়ে আমরা সবাই বেড়িয়ে পড়লাম সেন্ট্রাল পার্কের দিকে। সেন্ট্রাল পার্কটা ছুটির দিন কাটাবার পক্ষে উপযোগী।

সেন্ট্রাল পার্কটা সত্যি মজাদার। রবিবার দিন কর্মক্লান্ত নাগরিকদের হাওয়া খাওয়ার একটা বিরাট মিলনকেন্দ্র। কোনদিকে চলেছে হিপ্পিদের নাচ-গান, কোনদিকে নিগ্রো স্পিরিচুয়াল কালচার, ওদিকে হরেকৃষ্ণ সম্প্রদায়ের কীর্তন— ছোট-খাটো সভা-সমিতি— আইস্ক্রীম, বাদামভাজা ও চা বা ঠাণ্ডা জলের ঠেলা গাড়ী। এছাড়াও চোখে পড়ছে শোয়াবার যুবক-যুবতীদের আলিঙ্গন— মধুর দৃশ্য।

এসব দেখে শুনে হঠাৎ একটা প্ল্যান মনে হল। বানারসী, নয়ান ও কিশোর ভাইদের আমার প্ল্যানটা বলতেই ওরা লাফিয়ে উঠল— ঠিক— ফার্স্ট ক্লাশ আইডিয়া দাদা— আমরা যাচ্ছি আপনার পেছনে। আমাদেব পরামর্শানুযায়ী ওরা রইল পার্কে, আমি ফিরে এলাম ইণ্ডিয়া হাউসে। মালপত্র গুছিয়ে সাইকেলে বাঁধলাম— পরে নিলাম আমাব জমকালো দেশবিদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দেওয়া মেডেল ভর্তি স্পেনদেশীয় জামাটা, তারপর আবাব এসে ওদের সাথে সেন্ট্রাল পার্কে এসে যোগ দিলাম।

আমরা এবার পার্কের আরও ভেতরে ঢুকলাম। জায়গাটা লোকে লোকারণ্য। ছোট-খাটো একটা বাঁকানো চত্ববে এসে আমরা দাঁড়ালাম। আমি একটা উঁচু সিমেন্টের বেঞ্চিতে দাঁড়িয়ে ওদের সাথে কথাবার্তা আরম্ভ করলাম। দেখতে দেখতে ভীড় জমে উঠল। চারদিক থেকে নানা রকমের মানুষ এসে আমার চারদিকে জড়ো হতে লাগলো—বানারসী—কিশোর—নয়ান সিং এরা সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়লো দর্শকদের নিয়ে, এরা সবাইকে বোঝাতে চাইল যে আমি ভারতীয়—ভূ-পর্যটক। সাইকেলে কবে পৃথিবী ঘুরতে বেড়িয়েছি। জনতা আস্তে আস্তে বাড়তে লাগল। আমাকে ঘিরে চাবদিকে জনতার অসংখ্য প্রশ্ন। ভীড়ের ভেতর থেকে একজন ঠেলে ঠুলে আমার কাছে এগিয়ে এল—আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সে জিজ্ঞেস করল,

—আপনি কি সাইকেলে ভূ-পর্যটনে বেরিয়েছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। জবাব দিলাম।

—সাইকেলে করে আটলান্টিক পেরোলেন কি করে?

—আজ্ঞে আমার সাইকেল সাঁতার জানে না তাই প্লেন নিতে বাধ্য হয়েছি।

—তাই বলুন।

—এটা সাধারণ কথা। সাইকেলে বিশ্ব পর্যটন মানে, সাইকেলে করে বিশ্বের স্থলভাগটা অতিক্রম করা।

ভিড়ের মধ্য থেকে আর একজন প্রশ্ন জুড়ে দিলেন,

—আপনার উদ্দেশ্য কি?

—অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করাই আমার মূল উদ্দেশ্য।

আরেকজন ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বললেন,

—আপনি গ্রীসে গেছেন?

—অবশ্যই।

—তাহ'লে জবাব দিন— তি কালিস্ (গ্রীক্ ভাষায় আছেন কেমন)।

—পলি কালা, ফা রিস্তো মে পাবা পলি, জবাব দিলাম। (মানে— খুব ভাল, আপনার প্রশ্নের জন্য ধন্যবাদ)

আমার জবাবে খুশী হয়ে ভদ্রলোক আমার করমর্দন করলেন। তিনি বললেন যে, তিনি গ্রীসের অধিবাসী, এখানে কাজ করেন। কথায় কথায় গ্রীস প্রসঙ্গ উঠলো, আমি গ্রীসের আতিথেয়তা ও প্রাচীন সভ্যতার ভূয়সী প্রশংসা করলাম। আমাদের কথাবার্তা একটু জোর গলাতেই চলতে লাগল যাতে উৎসাহী জনতাও আমাদের কথাবার্তায় অংশগ্রহণ করতে পারে।

ভীড়ের মধ্য থেকে এবার আর একজন এগিয়ে এলেন,

—আপনি তুরস্কে গেছেন।

—এবেৎ, আমি তুরস্কীয় ভাষায় জবাব দিলাম। অর্থাৎ অবশ্যই। ভদ্রলোক আনন্দিত হয়ে বললেন, —ও, আপনি তুর্কী ভাষা জানেন দেখছি।

বির আচ্ তুরক্চা বিলিপর অর্থাৎ আমি অল্প সামান্য তুর্কী ভাষা জানি। 'তুরকি আরকাদাস চোক্ চোক্ ইহ্য''— অর্থাৎ আমার তুরস্কীয় ভাইবা খুব ভাল। তুরক— কীজ কারদেশলার চোক্ গুজাইল অর্থাৎ তুরস্কীয় বোনেরা অতি সুন্দরী। ভদ্রলোক আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। আমি জানি, একঘেয়েমী লেকচারে এখানে কোন কাজ দেয় না, আসলে কথাবার্তায় ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ভীড় জমা করা সহজ। এভাবে আরও দু'চারজন আমার দিকে এগিয়ে এসে নানা বিষয়ে আমাকে যাচাই করতে লাগলেন। একজন আমেরিকান ভদ্রমহিলা এসে আমার সিগনেচার ও শুভেচ্ছা বাণী চাইলেন। সাথে সাথে লেগে গেল ভীড়— আমি জানি যে এমতাবস্থায় একবার সই করতে আরম্ভ করলে হাতের কব্জি অবশ হবার আগে নিস্তার নেই। অথচ তাদের ফেরাতেও পারি না, তাতে অনেকে ভাবে আমি আত্মকেন্দ্রিক। এ অবস্থার থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য বানারসী ভাইকে ডাকলাম। ওরা কাছাকাছিই ছিল, আমি হিন্দিতে ওদের বললাম— আমার সামনে এসে দাঁড়াও ও আমাকে নানারকম প্রশ্ন কর, তাতে অন্ততঃ এই সিগনেচার দেওয়ার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবো।

আমার কথামত বানারসী ভাই সামনে এসে দাঁড়ালো— সিং মশায় ভীড় ঠেলে আমার পেছনে হাজির— ঠিক যেন বডি গার্ড।

ইতিমধ্যে আর একজন বিরাট চেহারার মোচ্‌ওলা ভদ্রলোক আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন। ভদ্রলোক আমাকে অতি মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করলেন,

—আপনি ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাসী?

আমি সব রকম প্রশ্নের জন্য সব সময় প্রস্তুত, তাই জবাব দিলাম,

—আমার বিশ্বাসে আপনার কোনো লাভ হবে কি?

—নিশ্চয়ই লাভ হবে।

—তাহলে শুনুন— আমি ঈশ্বরে বিশ্বাসী কি না বলা শক্ত, কারণ ঈশ্বর জিনিসটা অতি উচ্চ মার্গের, তবে আমি মানবাত্মার মহত্ত্বে বিশ্বাসী; আমার কাছে আত্মাই ভগবান। এ জগতে প্রতিটি জীবের অণু ও পরমাণুর মধ্যে যে শক্তি লুকিয়ে আছে আমি সেই শক্তিকে মহাশক্তি বলে মনে করি। এখন এই যে আমার সামনে বিরাট জিজ্ঞাসু জনতা তাদের অন্তরাত্মাই আমার ভগবান।

—তাব মানে বলতে চান আমিই আপনার ভগবান, —একজন আমেরিকান বিজ্ঞগোছের ভদ্রলোক আমাকে প্রশ্ন করলেন।

—হ্যাঁ, আপনি আমার ভগবান, আমি আপনার ভগবান, অথবা বলতে পারেন আমার আত্মাই আমাব ভগবান।

—লা-লা। ভদ্রলোক মুখ দিয়ে একটা টক্ শব্দ করে বললেন, —ওঃ গণ্ডগোলে ব্যাপার দেখছি, আপনার কথাটি ঠিক বুঝলাম না।

এবার মোচওলা পূর্বের ভদ্রলোক এগিয়ে এসে দ্বিতীয় ভদ্রলোকের সাথে আলাপ শুরু করলেন। তিনি বললেন— গণ্ডগোলের কিছু নেই। শুনুন আমি আপনাকে বুঝিয়ে বলছি। তাঁরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা শুরু করলেন।

—আচ্ছা, আপনি আপনার সফর সময়ে কোনো বিপদে পড়েছেন? একজন যুবতীর জিজ্ঞাসা।

—বিপদ মানে? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

—বিপদ মানে— এই ধরুন রাস্তাঘাটে কোনো রকম ঝঞ্ঝাট, চোর, দস্যু ও হয়রাণি— অথবা ওই ধরনের একটা কিছু।

—না— শুনুন, আমি পর্যটক, আমার চলার পথে যাই-ই ঘটুক না কেন তা হচ্ছে আমার অভিজ্ঞতা। তাকে বিপদ-আপদ বলে আমি মনে করি না, সেগুলো আমার চলার অঙ্গ-স্বরূপ। চলার পথে যদি বৈচিত্র্য না থাকে তাহলে অভিজ্ঞতাটা আসবে কোত্থেকে বলুন।

এইভাবে আমাদের কথাটা আরও এগিয়ে চললো— বিভিন্ন ধরণের মানুষকে তাদের অসংখ্য প্রশ্নের জবাব দিতে হচ্ছে। ইতিমধ্যে একজন ভীড় ঠেলে কাছে এগিয়ে এলেন, আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন একগ্লাস ঠাণ্ডা সরবৎ গোছের, এখানকার চলতি ভাষায় মিল্‌ক সেক। ইনি দেখছি পূর্বপরিচিত গ্রীক ভদ্রলোক। তিনি আমার

দিকে সেটা এগিয়ে দিয়ে বললেন— ধরুন, নিশ্চয়ই বক্-বক্ করতে করতে আপনার গলা শুকিয়ে গেছে, তাই না?

—সত্যি তাই।

বানারসী ভাই ভীড়ের মধ্য থেকে হিন্দিতে চেঁচিয়ে উঠলো,

—আভি খতম্ করো দাদা, বহুৎ হুয়া।

—ঠিক হায়!

আমার জবাবের সাথে সাথে সে এগিয়ে এলো, আমার কাছে এগিয়ে এসে অনেকটা জনতাকে দেখিয়ে সে একটা পাঁচ ডলারের নোট আমার হাতে গুঁজে দিল। আমি না-না করেও সেটা গ্রহণ করলাম। বলাই বাহুল্য এটা আমাদের পবামশানুযায়ী। এই পাঁচ ডলারের নোটটা আমি আগেই ওর হাতে দিয়েছিলাম। একটু পবে নয়ানও একটা এক ডলারের নোট হাতে দিল। এবার জনতার মধ্যে একটু সাড়া পড়লো। অনেকে সরে পড়লো— অনেকে এড়িয়ে গেল, কিন্তু যারা সত্যিকাবের গুণমুগ্ধ তারা থেকে গেল— আমার পকেটটা ডলারের কাগজে ভবে উঠ্লো, আমি অবশ্য অতটা আশা করিনি। তারপর ছোটখাটো জনতার ছোটখাটো প্রশ্নের কয়েকটা জবাব দিয়ে পথ ধরলাম।

ইন্ডিয়া হাউসের ঘরে ঢোকামাত্র আমাকে সবাই জড়িয়ে ধরলো—বানারসী, নয়ান সিং, কিশোর ও তাদের আরও কয়েকজন বন্ধু মিলে সবাই আনন্দে আত্মহাবা। ওরা হঠাৎ যেন আমাকে আবিষ্কার কবে বসেছে। আরে দাদা ক্যায়া বাৎ— বহুৎ খুব, কেৎনা হুসিয়ার আদমী— ইত্যাদি শব্দে আমার বাহাদুরী ঘোষণা করতে লাগল।

সিং সর্দারজী আপশোষ কবে বলল— দেখ দাদা, এই বিদেশীরা তোমার গুণের এত প্রশংসা করে, তারা তোমাকে মদৎ করে, অথচ আমাদের.... ব্যস, আমি ওকে থামিয়ে দিলাম।

পকেট থেকে এবার কাগজের দোমড়ানো মোচড়ানো নোটগুলো বাদামভাজা বার করার মতো করে ওদের সামনে টেবিলে রাখলাম। বানারসীও তার কোটের পকেট থেকে একগাদা খুচরো পয়সা বার করে টেবিলের উপর রেখে বলল— দাদা এও তোমার জন্য পাওয়া। এবার নয়ান সিং নোটগুলোকে আস্তে আস্তে সাজিয়ে গুছিয়ে ও পয়সাগুলো আলাদা আলাদা করে গণে হিসাব করে বলল— মার দিয়া দাদা— পয়তাল্লিশ ডলার ষাট সেন্টস।

—তা'হলে ভালোই চাঁদা উঠেছে— বানারসী বলল।

আমি বললাম— না, চাঁদা নয়, ওটা আমার অভিজ্ঞতা ও গল্প বিক্রির মূল্য।

—তা ঠিক।

ওর থেকে আমি অর্ধেকটা আলাদা করে বললাম—এটা তোমাদের জন্য, মিষ্টি খেও, আর বাকীটা আমার।

নয়ান জিভ বার করে বলল— কি বলো দাদা! রাম কহো— তোমার কাছ থেকে আমরা পয়সা নেব? তুমি আমাদের কি ভাই বলে মনে কর না? আমাদের সৌভাগ্য যে তুমি আমাদের সাথে আছো—ব্যস তাতেই আমরা ধন্য কিন্তু...

—ঠিক আছে তাই সই— তোমাদের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

পরের দিন নয়ান সিং আমার ঘুম ভাঙাল, কি ব্যাপার —না একজন ভদ্রলোক আমার সাথে দেখা করতে চান। চোখ রগড়ে উঠে বসলাম। সকাল সাতটা, বলতে গেলে এখানকার ভাষায় এটা ভোর। রিসেপশন ডেস্কে আসতেই দেখি গতকালকের সেন্ট্রাল পার্কে দেখা সেই মোচওয়ালা ভদ্রলোক। আমি কাছে আসতেই ভদ্রলোক তার বিরাট শরীরটাকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে গড় হয়ে প্রণাম জানালেন।

—করেন কি, করেন কি মশায়— আমি চেঁচিয়ে উঠলাম।

—আপনি মহামানব। আপনার দর্শনেই আনন্দ।

এই দেখ, সকালবেলাই ভদ্রলোক গ্যাস দিতে আরম্ভ করেছেন!

ভদ্রলোক আত্মপরিচয় সূত্রে জানালেন যে, তিনি খাঁটি আমেরিকান। বর্তমানে আছেন নিউ ইয়র্কে। গত বৎসর ভারতবর্ষে গিয়েছিলেন বোম্বেতে অবতার মেহের বাবা দর্শনে। ভারতবর্ষই এখন একমাত্র দেশ যা পৃথিবীকে চিরশান্তির পথ দেখাতে পারে। ভারতবর্ষের মানুষদের ভ্রাতৃত্ববোধ দেখে তিনি খুব মুগ্ধ হয়েছেন। ভদ্রলোক তাঁর অপূর্ব অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে বললেন যে, তিনি সত্যি কোনদিন কল্পনাই করতে পারেননি যে জন্তু-জানোযার পর্যন্ত ভগবানসৃষ্ট, এ পৃথিবীতে মানুষদের মতো তাদেরও বাঁচবার অধিকার আছে। একমাত্র ভারতবর্ষেই তিনি দেখেছেন যে রাস্তায় নির্বিঘ্নে গরু চবতে, শহরের লোক তাতে এতটুকু বিরক্ত নন। আহা! সহাবস্থানের এমন চূড়ান্ত নমুনা আর কোন দেশে আছে কি? ইত্যাদি। ভদ্রলোক শেষে তাঁর পকেট থেকে একটা বিরাট ফর্দ বার করে বললেন— এই নিন, এর মধ্যে প্রায় তিরিশটা ঠিকানা আছে, স্টেট্স-এর (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে সংক্ষেপে States বলা হয়) বিভিন্ন জায়গায় আমার পরিচিত আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব। আপনার সফরকালীন সময়ে যদি সম্ভব হয় এই ঠিকানায় থাকতে পারবেন, আর এই নিন একটা রেফারেন্স লেটার আপনার জন্য লিখে এনেছি।

ভদ্রলোক বলে চললেন— গতকাল আমি রাত একটা পর্যন্ত এসব জোগাড় করে ঠিক-ঠাক করে রেখেছি, কারণ জানি না আপনি এখানে থাকবেন কি আবার রওনা হবেন। তাই তো খুব ভোরবেলা থাকতেই চলে এসেছি। আপনাকে বিরক্ত করিনি তো?

—না না, কি যে বলেন, আপনার সহানুভূতির জন্য সত্যি ধন্যবাদ! আমি অতি বিনীত হয়ে তাঁকে জানালাম।

—আপনার যদি নিউ ইয়র্কে থাকবার অসুবিধা থাকে তা'হলে আসুন আমার সাথে থাকবেন।

—না, ধন্যবাদ, আমি সম্ভবতঃ আজই চলে যাচ্ছি।

—আপনি নিউ ইয়র্ক শহর সম্পূর্ণ দেখেছেন?

—মোটামুটি।

আমি ইতিমধ্যে তাঁর লেখা রেফারেন্স লেটারটায় একটু চোখ বোলালাম— খামটা দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম।

—সে কি, আপনার নাম বাবা চিক্, ভারতীয় নাম দেখছি।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ওটা আমার পরমারাধ্য গুরুজী অবতার মেহের বাবার দেওয়া নাম। ভদ্রলোক অতি বিনীতস্বরে বললেন।

—কিন্তু আপনি আমাকে চেনেন না অথচ আমার নামে দেখছি খুব বিশেষণ লাগিয়ে দিয়েছেন আপনার চিঠিতে।

—আমি গতকাল আপনার কথা শুনেছি, আপনাকে জানার পক্ষে তাই যথেষ্ট।

—যাই হোক, আসুন এককাপ চা খাওয়া যাক। আমি ভদ্রলোককে নেমন্তন্ন করলাম। কিন্তু ভদ্রলোক অতি বিনয়ের সঙ্গে বললেন— তাঁর সময় হবে না, তিনি এখন অফিসে যাবেন। খানিকক্ষণের মধ্যেই ভদ্রলোক বিদায় জানালেন। আমরা উঠলাম। তাঁর অফিসের ও বাড়ীর ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর দিয়ে বিশেষভাবে অনুরোধ করলেন আমি যদি থাকি তা'হলে যেন তাঁর সাথে যোগাযোগ করি।

অফিসের সময় হয়ে এলো। ইন্ডিয়া হাউসের দপ্তরখানায় লোকজন আসতে শুরু করেছে। আজকেই আমি যাত্রা শুরু করবো। আমেরিকা বিরাট দেশ, দেখতেও অনেক সময় লাগবে— কাজেই নিউ ইয়র্কে আর বেশী সময় নষ্ট করা উচিত নয়।

বেলা দশটার সময় আগরওয়ালা সাহেবের অফিসে আমার ডাক পড়লো। ঘরে ঢুকতেই তিনি আমাকে চেয়ারটা এগিয়ে দিলেন, ব্যাপার কি মিঃ দে—আপনার পাত্তাই নেই! এদিকে আপনার সাথে দেখা করবার জন্য প্রচুর লোকজন আসছে— অথচ...

—আমি ভবঘুরে মানুষ, আমাকে যদি সব সময় এম্বাসীতেই বসে থাকতে হয় তা'হলে তো মহা মুশকিল। যাই হোক, শুনুন, আমি আজকেই রওনা হচ্ছি।

—সে কি? কোথায়?

—ঠিক জানি না—তবে খুব সম্ভবতঃ দক্ষিণে ওয়াশিংটনের দিকে।

—তা'হলে কখন রওনা হচ্ছেন?

—এই ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই।

—তা'হলে এক কাজ করুন; আপনি ফার্স্ট সেক্রেটারী মিঃ সুদের সাথে একবার দেখা করুন; তিনি আপনার খোঁজ করছিলেন।

মিঃ সুদ। ভদ্রলোক সত্যি অমায়িক। তাঁর সাথে অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা চলল— তিনি আমাকে একটা রেফারেন্স লেটার দিয়ে বললেন যে যদি আমি মেক্সিকো যাই তাহলে সেখানে তাঁর বন্ধুর সাথে থাকতে পারি। তিনি সেখানে ইন্ডিয়ান এমবাসীতে কাজ করেন। চা ও বিস্কুটের সাথে আমাদের কথাবার্তা বেশ জমে উঠল। ঘণ্টাখানেক পরে নমস্কার জানিয়ে আমি উঠলাম।

বাইরে আসতেই নয়ান সিং-এর সাথে প্রায় ধাক্কা খাবার জোগাড়— আরে দাদাজি আপনি এখানে? আর এক ঘণ্টা ধরে আমি আপনাকে খুঁজছি। হাঁপাতে হাঁপাতে সে বলল।

—তা ব্যাপার কি ভাই?

—আরে দাদা, ব্যাপার আপনি ভাগ্যবান মানুষ, আপনার খোঁজ সবাই করে— আমরা গরীব মানুষ, আমাদের কে খোঁছে কে বলুন?

—তা ব্যাপারটা কি খুলে বল।

—আরে দাদা, একজন মানে একজন আমেরিকান মেম আপনার সাথে দেখা করবার জন্য ওদিকে পাগল হয়ে গেল।

—চলো দেখা যাক।

ওয়েটিং হলে আসবামাত্র নজরে পড়লো একজন সুবেশা আমেরিকান তরুণী— হঠাৎ মনে হ'ল এড্‌না (Edwina White*) মতো দেখাচ্ছে যেন।

আর একটু কাছে এগোতেই আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো মেয়েটা— দু হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল— বিমলজী?

—এড্‌না, আমিও আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম।

আনন্দের আতিশয্য কাটিয়ে উঠতে বেশ কিছু সময় লাগল। তারপর এড্‌না আমাকে অভিমান করে বলল— তুমি নিউ ইয়র্কে এসেছ সপ্তাহখানেক হ'ল, তাই না?

—হ্যাঁ।

—অথচ আমার কথাটা তুমি একদম ভুলে গেছ।

—না, এড্‌না ভুলিনি— আসল কথাটা কি জানো— আমি ভেবেছিলাম যে তুমি তো আমারই মতো বাউণ্ডুলে হিপ্পি, কাজেই এখন কোথায় আছো কে জানে?

এড্‌না তার মিনি পোষাকের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল,

—আমাকে কি এখনও হিপ্পি বলে মনে হয়?

---

* Edna Edwina White, মাতালা দ্বীপে আমরা একসঙ্গে ছিলাম আন্তর্জাতিক হিপ্পি সম্মেলনের ব্যাপারে।

"দ্বীপের নাম ক্রীত" পড়ুন, তাতে বিশদ্ বিবরণ আছে।

আমি ভালো করে তার অপাদমস্তক লক্ষ্য করে বল্‌লাম,

—নাঃ মোটেই নয়, তুমি এখন খাঁটি আপ-টু-ডেট।

—তা' শোনো, এড্‌না, তুমি কি করে জানলে যে আমি এখানে?

—তুমি কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে একদিন গিয়েছিলে কি?

—হ্যাঁ, তা ঠিক।

—সেখানে ব্রাউনা হোয়াইট্ বলে কোনো মেয়েকে মনে পড়ে?

—ঠিক মনে করতে পারছি না।

—সেখানকার লাইব্রেরী অ্যাসিস্ট্যান্ট, পাত্‌লা লম্বা চুল, তোমাকে যে এককাপ কফি এনে দিয়েছিল।

—ওঃ হ্যাঁ হ্যাঁ— তা বটে—আমি জবাব দিলাম।

—ও আমার রুম মেট— আব খুড়তুতো বোনও বটে।

—কি আশ্চর্য, কি অদ্ভুত যোগাযোগ— আমি সত্যি অবাক্ হয়ে বললাম। আমার কথাটা লুফে নিয়ে এড্‌না বলে উঠল— না—এ পৃথিবীতে আশ্চর্যের কিছু নেই, সবই তাঁর ইচ্ছা তাই না।

—সত্যি বটে এড্‌না।

আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিস্‌ফিস্ করে এড্‌না বলল— এটা কিন্তু আমার কথা নয়, তোমারই বুলি— মনে পড়ে সেদিনের কথা? আমরা দু'জনে হেসে উঠলাম।

আমার নিউ ইয়র্ক ছাড়ার কথা শোনা মাত্র এড্‌না লাফিয়ে উঠল— অসম্ভব, অন্ততঃ তাদের সাথে কয়েকদিন না থেকে নিউ ইয়র্ক ছাড়া চলবে না। আমি ওকে কথা দিয়েছিলাম।

ঠিক হ'ল এড্‌নার ওখানে দু'একদিন থেকে তারপর যাত্রা করবো।

এড্‌নাকে বললাম— আচ্ছা ঠিক আছে, তা'হলে তুমি এখন যাও আমি বিকেলে তোমার ওখানে আসছি।

—অসম্ভব! একবার যখন তোমার সন্ধান পেয়েছি তখন কি আর ছাড়া চলে— ও বেঁকে বসল।

—কিন্তু...আমাকে কথা বলতে না দিয়েই ও বলল—

—না—কোনো কিন্তু নেই—আমি আজকাল আর বেকার হিপ্পি নই, আজকাল আমি কাজ করছি, তোমার মালপত্র কোথায়? আমি এখন গাড়ী কিনেছি, তুমি তোমার সাইকেল শুদ্ধু অনায়াসে ভেতরে ঢুকে যাবে।

অতএব আমাকে ইণ্ডিয়া হাউস থেকে বিদায় জানাতে হচ্ছে। এড্‌নাকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বলে আমি এলাম মিঃ আগরওয়ালার অফিসে। আগরওয়ালা সাহেবকে

বিদায় জানাতেই, তিনি তাঁর সেক্রেটারীকে ডাকলেন। সেক্রেটারী ঘরে ঢুকতেই তিনি জিজ্ঞেসা করলেন— কত কালেক্সন হয়েছে?

—সাইত্রিশ ডলার।

—ঠিক আছে, দাও।

মিঃ আগরওয়ালা আমার হাতে একটা এন্‌ভেলপ গুঁজে দিয়ে বললেন— এই সামান্য কিছু আপনার জন্য কালেক্সন করেছি।

—বিশেষ ধন্যবাদ আগরওয়ালাজী। আমি আপনাদের সবাইকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

বেরিয়ে এলাম। বানারসী ও নয়ান সিং দুইজন কাছাকাছি ছিল, তাদের জানালাম বিদায়। —সত্যি তোমাদের ছেড়ে যেতে ঠিক মন চাইছে না, কিন্তু আমায় যেতে হবে। কিশোরকে আমার শুভেচ্ছা জানিও।

এডুইনা আমার ব্যাগটা তুলে নিল আর আমি সাইকেলটা নিয়ে ইণ্ডিয়া হাউস ছাড়লাম।

দরজার বাইরে আসতেই নজরে পড়লো বিরাট নীল রঙের একটা সেভ্‌রোলেত, এডুইনা তার দরজাটা খুলে সহাস্যে বলল— আসুন বিমলজী।

গাড়ীতে বসে ইণ্ডিয়া হাউসের দরজার দিকে তাকিয়ে দেখি বানারসী ও নয়ান এসে দাঁড়িয়েছে। আমি হাত তুলে ওদেব বিদায় জানালাম। নিউ ইয়র্কে ওরাই আমার পরম বন্ধু।

ওয়াশিংটন

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী

নিউ ইয়র্ক থেকে ওয়াশিংটনের পথে

নিউ ইয়র্ক থেকে ওয়াশিংটনের পথ বিরাট দূরত্বের নয়। সেকেণ্ডারী রোড হয়ে মাত্র দু'শ ষাট মাইল মতো। টোল রোড বা হাইওয়ে ধরে চলার প্রশ্নই ওঠে না—বিশেষ করে আমেরিকায় সাইকেল মানে ছেলেখেলা। প্রথমে যেই শোনে যে আমি সাইকেলে বিশ্বভ্রমণে বেরিয়েছি সেই হাসে। প্রথম প্রথম সবাই মনে করে আমি ঠাট্টা করছি, কিন্তু পরে সবাই আমাকে উৎসাহিত করে। আমি কয়েকবার ভুল করে হাইওয়ের রাস্তা ধরেছিলাম, কিন্তু প্রত্যেকবারই দরজায় ঠোক্কর খেয়ে ফিরতে বাধ্য হয়েছি। অটো রুট (Auto Route) বা ন্যাশনাল হাইওয়েতে চলা মানে সাক্ষাৎ মৃত্যু। কাজেই সেকেণ্ডারী রোড ধরে চলার মজা আছে। শহরতলী গ্রাম ও খামাবের পাশ দিয়ে চলেছে এই রাস্তা। চলায় কষ্ট আছে বটে কিন্তু একঘেয়েমি নেই। মনে পড়ে আমেরিকায় আমার প্রথম দিনের কথা, সত্যি নিউ ইয়র্কে থাকাকালীন ভাবতেই পারিনি যে 'সুজলা সুফলা'র এদেশেও আবির্ভাব ঘটে। ওঃ সত্যি শ্বাসরুদ্ধ করা বাড়ীর পিঞ্জর! এখন যতই আমেরিকার ভেতরে ঢুকছি ততই এর বৈচিত্র্যের পরিচয় পাচ্ছি। চলার পথে প্রায়ই পাচ্ছি নদী, খাল, কোন কোন সময় নদীর ধার ধরে এঁকে বেঁকে রাস্তাটা মাইলের পর মাইল এগিয়ে চলেছে।

ফিলাডেল্‌ফিয়া যখন অতিক্রম করি সেখানে পেয়েছি বহু ঐতিহাসিক স্বাক্ষর, অবশ্য ঐতিহাসিক বলতে আমেরিকাব ইতিহাস, তার মানে শ'খানেক বছরের বেশী পুরানো নয়। এই একশ বছর ভবিষ্যতে একদিন একহাজার বছরে এসে দাঁড়াবে, আমেরিকার এই স্বল্পদিনের ইতিহাস একদিন হয়তো রোম বা গ্রীক সভ্যতার মতো অতুলনীয় হয়ে দাঁড়াবে। তাই আজকের আমেরিকান নাগরিকেরা খুব যত্নে প্রত্যেকটি স্মৃতি বেশ জমাট পাথরে বাঁধিয়ে রাখবাব চেষ্টায় ব্যস্ত।

ফিলাডেল্‌ফিয়া, আমেরিকার ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য। ঠিক যেমন বাংলাদেশের পলাশী। রাস্তার দুধারে ছোটখাটো গ্রামগুলো যেন ইউরোপের বিভিন্ন ছোটখাটো শহরের প্রতিমূর্তি।

আটলান্টিকের তীরবর্তী আমেরিকার শহরগুলো সবই আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদের দখলীকৃত জায়গা। আমেরিকার আদিবাসী ইণ্ডিয়ানরা অনেকবার খণ্ডযুদ্ধে বিদেশী

বণিকদের বাধা দিয়েছে, কিন্তু কূট ও প্রতিপত্তিশীল ইউরোপীয়ের বন্দুকের মুখে কোনবারই সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। মাঝে মাঝে তাই পাচ্ছি ছোটখাটো শহীদবেদী— বিগত দিনের স্বাক্ষর। যদিও সেকেণ্ডারী রাস্তা কিন্তু চমৎকাব। অনেকটা যেমন পেয়েছি জার্মানীর রাইন নদীর তীরে।

চলার অসুবিধা নেই, রাতের অধিকাংশ সময়েই কোনো খামারের এক কোণে আশ্রয় নিই। কোনো কোনো সময় কুকুরের চিৎকারে চাষীরা* বাইরে বেরিয়ে আসে; এতে অবশ্য আমার সুবিধাই হয়। তারা আমাকে খাতির করে। শোবার বন্দোবস্ততো করেই, তার সাথে সাথে খাওয়াটাও চলে—বিনা পয়সায় ভোজ। তাদেব আমি শোনাই আমার চলার কাহিনী। অধিকাংশ সময়েই পাই উঠতিবযসী শ্রোতা। কোনো কোনো সময় এক রাতের পরিবর্তে অনুরোধে থাকতে হয় কয়েক রাত। কয়েকদিনের জন্য আমাকে ঘিরে গড়ে ওঠে গ্রামীণ ছেলেমেয়েদের গোলচক্র।

আমেরিকায় আমার আর একটা সুবিধা হচ্ছে যে এখানে আমাকে ভাষা সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে না। সর্বত্রই আধুনিক ইংরেজী।

সেদিন বিকেলবেলা— বাল্‌টিমোরের (Baltimore) কাছাকাছি একটা গ্রাম ধবে এগোচ্ছি— হঠাৎ পাশের রাস্তা দিয়ে আর একটা ছোটখাটো সাইকেল বাহিনী আমাব রাস্তায় এসে মিশলো। ছেলেমেয়েদের একটা দল, কম কবেও প্রায় ষাট-পঁয়ষট্টি বলে মনে হচ্ছে। বুঝলাম স্কুলের ছেলেমেয়েরা একসাথে সাইকেল ট্যুরে বেবিয়েছে। আমিও তাদের দলে ভিড়লাম।

দলনেত্রীর সাথে পরিচয়ে জানলাম যে এটা সাইকেল ক্লাব— নাম পেডাল পিওপিল** (Pedal Peoples)। সবাই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী। এরাও যাচ্ছে ওয়াশিংটনে।

দলনেত্রী একজন ক্যাম্প মনিটর, মিসেস অ্যানি, প্রায় তিরিশের কাছাকাছি, তাকে সাহায্য করবার জন্য রয়েছে আরও পাঁচজন কাউন্‌সেলার; এই পাঁচজনেব তিনজন ছেলে ও দু'জন মেয়ে, এরা সবাই কলেজ স্টুডেন্ট। মিসেস অ্যানি প্রথমটায় আমার গায়ে পড়ে আলাপে কিছুটা বিরক্ত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু পরে আমার পরিচয় পেয়ে আনন্দে সাইকেল থামিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। তিনি খবরের কাগজে আমার কথা পড়েছেন। একটা মাঠের মতো খোলা জায়গা পেয়ে তিনি সবাইকে জড়ো হতে বললেন; তারপর অতি আনন্দে ও গর্বে ঘোষণা করলেন আমার উপস্থিতি...। ভালোই হলো। শেষে ঠিক হলো আমি তাদের সাথে যাবো। আর পথে থাকা খাওয়ার সব দায়িত্ব তারা নেবে। আমিও রাজী হয়ে গেলাম— বিশেষ করে আমি ছোট ছেলেমেয়েদের ভালোবাসি। তাদের সাথে মিশে তাদের সম্পর্কে জানার এ মহাসুযোগ ছাড়া চলে না।

পেডাল পিওপিল খুব সুন্দর প্রতিষ্ঠান। চলার পথে কোথায় থাকা হবে, কোথায় খাওয়া হবে, সব ছকে বাঁধা। এমন কি রাতে মজলিশের বন্দোবস্ত পর্যন্ত পাকা। সর্বশেষে আছে চারটে ছোট বাস। যদি কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ে বা হাঁপিয়ে পড়ে অথবা বিপদ-আপদের সহায় হিসেবে এই গাড়ী। এর মধ্যে একটা গাড়ী সাজানো গোছানো— যেন ছোট্ট একটা সাইকেলের দোকান। ওদের সাথে হই-হই করতে করতে এগিয়ে চললাম— গন্তব্য ওয়াশিংটন, জাতীয় রাজধানী।

বাল্‌টিমোর থেকে ওয়াশিংটন মাত্র চল্লিশ মাইল। অনায়াসে বিভিন্ন জায়গা ঘুরে আমরা শেষে এসে পৌঁছলাম ওয়াশিংটনে। বাত এখন প্রায় ৮টা। মেরিল্যাণ্ডের পার্কে চিড়িয়াখানা দেখতে গিয়ে দেরী হয়ে গেছে। "পেডাল পিওপিল" আমাকে ছাড়তে রাজি নয়, বিশেষ করে অ্যানি ছোটদের কাছে বলে রেখেছে আমি ওদের এস্কিমোদেব গল্প বলবো। পনেরো নম্বর রাস্তার ওপব একটা গীর্জাঘরে ওদের থাকাব বন্দোবস্ত হয়েছে। গাড়ীতে বান্নাবান্নার সরঞ্জাম সমেত অ্যাডভান্স পার্টী আগে থেকেই ওখানে প্রস্তুত কবে রেখেছে। কাজেই আমরা ঢোকামাত্র দেখি খাবাব প্রস্তুত। ছোটরা প্রত্যেকেই ক্লান্ত, বিশেষ করে মেয়েরা— অ্যানি ও আমি ওদের তদারকি করতে লাগলাম। খাওয়া-দাওয়ার পর সবাই এসে হাজির হলো কনফারেন্স হলে। সেদিন রাত এগারোটা পর্যন্ত চললো আমার গল্প, বিশেষ করে শেষ দিন— কাজেই সহজে ওরা ছাড়ে না। ভাগ্যিস ওরা নেহাৎই ক্লান্ত ছিল, নয়তো ওদের হাত থেকে ছাড়া পাওয়া মুশ্‌কিল হতো।

রাজধানীতে প্রথম প্রভাত। ছোটদের বিদায় জানালাম। অ্যানি ও তার কাউন্সিলার সবাই বিশেষভাবে অনুরোধ জানালো তাদের ওখানে গিয়ে বেশ কিছুদিনের জন্য বিশ্রামের জন্য। আমি হাসিমুখে তাদের বললাম— আমি পথিক, পথ চলাই আমার বিশ্রাম।

এখন সকাল আটটা— কোনদিকে যাই! মনে মনে ঠিক করলাম ভারতীয় দুতাবাসে গিয়ে অন্ততঃ রাজধানী সম্পর্কে কিছু তথ্য সংগ্রহ করা ভালো। অবশ্য অধিকাংশ সময়েই রাস্তার লোকেরাই পরম সহায়ক। তবুও ভারতীয় দূতাবাস, শত হলেও দেশের প্রতিনিধি। ম্যাপটা সঙ্গেই ছিল, পুলিশের কাছ থেকে জেনে নিলাম ঠিকানাটা। এগিয়ে চললাম ম্যাসাচুসেট্‌স এভেন্যু ধরে।

ওয়াশিংটন শহরটা যা ভেবেছিলাম ঠিক তা নয়— অর্থাৎ নিউ ইয়র্কের মতো আকাশচুম্বী প্রাসাদের কারখানা নয়— বরং ঠিক উল্টো। মাঝে মাঝে সারকেল গারডেন ও রাস্তার দুধার গাছে ভর্তি। আর সত্যি কথা বলতে কি, এখন পর্যন্ত স্কাই স্ক্রেপার (Sky Scraper) চোখে পড়েনি। মাসিভ হাউস (Massive house)-ই

এখানকার বৈশিষ্ট্য। মানে ওয়াশিংটনের রাস্তায় আলো বাতাসের যথেষ্ট যাতায়াত আছে বলেই মনে হচ্ছে।

দু'পঁ (Du Pont) নামে একটা বিরাট গোলপার্ক পেরোতেই ডানদিকে নজরে পড়লো ভারতীয় পতাকা ও ইণ্ডিয়ান এম্বাসী। বাইরে সাইকেলটা রেখে ভেতরে ঢুকলাম। রিসেপ্‌শনিস্ট ভদ্রমহিলা পদ্মিনীর কাছে আমার পরিচয় দিতেই তিনি সাহাস্যে স্বাগতম্‌ জানালেন, সেকেণ্ড সেক্রেটারী ডঃ মিসেস থায়রাণী আগে থেকেই জানতেন আমার আগর্মনবার্তা, তিনিই তাই রিসেপ্‌শনে বলে রেখেছিলেন।

ডঃ থায়রাণী বিদুষী হাসিখুশী ভদ্রমহিলা। তাঁর ঘরে ঢুকতেই তিনি এগিয়ে এসে আমায় অভ্যর্থনা জানালেন। আমার পর্যটন সময়ে এই প্রথম আমি ভারতীয় দূতাবাসে বিনা বাধায় চেয়ার পেলাম। অন্যান্য সব জায়গাতেই আমাকে জোর করে কাজ আদায় করতে হয়েছে। ডঃ থায়রাণী আমাকে দূতাবাসের শিক্ষাদপ্তরের প্রধান সচিব ডঃ গাঙ্গুলী মশায়েব সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। গাঙ্গুলীবাবুর ঘরে একটা ছোট-খাটো চা-চক্রের আয়োজন হলো। ভদ্রলোক যদিও ভারিক্কিগোছের, কিন্তু বেশ সদালাপী। আমি এত সহজে তাঁদের সাথে দেখা পাব আশা করিনি। গাঙ্গুলীবাবু আমাকে অ্যামবাসাডরের তরফ থেকে অভ্যর্থনা জানালেন ও আমার এই দুঃসাহসিক অভিযানের অদ্ভুত ক্ষমতার প্রশংসা কবলেন। সেই সাথে সাথে তিনি এই কথাও আমাকে জানালেন যে, আমিই প্রথম ভারতীয় সাইক্লিস্ট যে আমেরিকার মাটি ছুঁয়েছি। আমার আগে অনেকেই সাইকেলে ইউরোপ সফর করেছে বা লণ্ডন পর্যন্ত গেছে। কিন্তু সরকারী মতে আমেরিকার মাটিতে আমিই প্রথম ভারতীয় সাইক্লিস্ট। প্রথম বাঙালী সাইক্লিস্ট রামনাথ বিশ্বাসের কথা কে না জানে— তিনিও অনেক সফর করেছেন বটে, কিন্তু তিনি আমেরিকা পর্যটন করেননি। আমি ডঃ গাঙ্গুলীকে বাধা দিয়ে বললাম যে, এতদিন কেউ আসেননি বটে, কিন্তু খুব শীগগীরই আরও কয়েকজন বাঙালীকে আপনি দেখতে পাবেন। এইভাবে আমাদের আলাপ চললো। কথাপ্রসঙ্গে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম— আচ্ছা গাঙ্গুলীবাবু, কিছু মনে করবেন না যেন— আমার জানতে কৌতূহল হচ্ছে যে, কিভাবে আপনি জানলেন যে আমি এখানে আসছি?

—ওঃ তা জানেন না বুঝি— এই দেখুন— এই বলে গাঙ্গুলীবাবু তাঁর ফাইল থেকে একটা কাগজ বার করলেন। সেটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন— পড়ে দেখুন এই সারকুলেশনটা। আমি তাঁর কাছে থেকে সেটা নিয়ে পড়তে লাগলাম। তার সারমর্ম হচ্ছে—

"ভারতের প্রাক্তন সেনাধ্যক্ষ জেনারেল কারিয়াপ্পা, বর্তমানে যিনি সর্বভারতীয় ক্রীড়া পরিষদের সভাপতি, তিনি ভারতীয় দূতাবাস সমূহকে আমাকে বা আমার ভূ-পর্যটনে সাহায্য করবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানিয়েছেন—।"*

মনে পড়ে গেল অনেকদিন আগেকার কথা— আমার যাত্রার প্রাক্কালে একদিন জেনারেল কারিয়াপ্পা দিল্লীতে তাঁর সর্বভারতীয় ক্রীড়া পরিষদের অফিসে ডেকে আশীর্বাদ করেছিলেন। সে সময় চা-চক্রে উপস্থিত ছিলেন, হকি পরিষদের সভাপতি রাজা ভলেন্দর সিং এবং হকির যাদুকর ধ্যানচাঁদ। পাতিয়ালার ন্যাশানাল ইন্‌স্টিট্যুট অফ স্পোর্টস-এর প্রিন্সিপাল মহাশয়ও সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। আমি তাঁর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানালাম; সত্যি তিনি এতদিন আমাকে মনে রেখেছিলেন।

গাঙ্গুলীবাবু আরও জানালেন যে, আমি নিউ ইয়র্কে পৌঁছবার আগেই অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস ঘোষণা করেছিল আমার আগমন বার্তা। কাজেই গাঙ্গুলীবাবু আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলেন। গাঙ্গুলীবাবুর অফিসে বসেই আমাদেব কথাবার্ত চলছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমেরিকাস্থ ভারতীয় সাংবাদিকরা সেখানে এসে হাজির হলেন। চললো ইন্টারভিউ— যথারীতি চারদিক থেকে প্রশ্ন আসতে লাগলো—

—আপনার এ ভ্রমণের উদ্দেশ্য কি?

—কবে কোথা থেকে যাত্রা কবেছেন?

—বিশ্ব-ভ্রমণের প্রথম প্রেরণা আসে কি করে অথবা কার থেকে?

—ভ্রমণকালীন আপনার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা কি?

—কোন দেশটা সবচেয়ে ভালো?

—কোন দেশটা সবচেয়ে খারাপ?

—কত টাকা নিয়ে বেরিয়েছিলেন— কি করে পাথেয় যোগাচ্ছেন?

—কবে দেশে ফিরবেন?

—চলার পথে কোন কোন সময় নিঃসঙ্গ বোধ করেন কিনা? ইত্যাদি ধরণের।

সাংবাদিক বৈঠকের ঝামেলা কাটলো ঘন্টাখানেক পরে— ডঃ গাঙ্গুলীকে বিদায় জানাতেই তিনি আমাকে পাঠালেন ডঃ মিসেস থায়রাণীর কাছে। মিসেস থায়রাণীব অফিসে ঢুকতেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন— সব ঠিক-ঠাক তো?

—হ্যাঁ, শুনুন মিঃ দে, গৌতম গুপ্ত বলে একজন ভদ্রলোক আপনার থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত করবেন বলে কথা দিয়েছেন, এই নিন তাঁর ঠিকানা—ও টেলিফোন নম্বর।

—তাই নাকি? না চাইতেই জল, এখানে দেখছি সব কিছুই উল্‌টো। নিউ ইয়র্কে থাকার জন্য অনুরোধ জানিয়েও সুবিধা হয়নি। আর এখানে আসবার আগেই সব বন্দোবস্ত হয়ে গেছে! সত্যি ডঃ থায়রাণী আপনারা করিৎকর্মা বটে।

মনে মনে অবশ্য আমি জেনারেল কারিয়াপ্পা সাহেবকে ধন্যবাদ দিলাম। বুঝলাম সবই তাঁর রেকমেণ্ডশনের ফল— সোজা কথায় যাকে বলে ব্যাকিং। তবে আমি ব্যাকিং কোনদিনই পছন্দ করি না, আর ব্যাকিংর সাহায্য নিতেও প্রস্তুত নই। আমার আত্মপরিচয়ে যদি কেউ সাহায্য করতে আসেন সেটাই বড় কথা। আমি অগণ্য ভারতীয়েরই একজন— সেটাই আমার বড় পরিচয়।

যাই হোক, আমি ওয়াশিংটন সম্পর্কে বিশেষ কিছু তথ্য সংগ্রহ করে ভারতীয় দূতাবাস থেকে বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমে একটা আস্তানার বন্দোবস্ত করা যাক। শ্রীগৌতম গুপ্তের ঠিকানা তো সম্বল রইলই। দেখা যাক, আমেরিকানদের সঙ্গে থাকার কোন বন্দোবস্ত করা যায় কিনা।

ওয়াশিংটনের রাস্তাগুলোর নাম নম্বর ও অক্ষর দিয়ে, যেমন আড়াআড়ি ভাবে রাস্তাগুলোর নাম যথাক্রমে A, B, C, D ইত্যাদি ও লম্বালম্বি রাস্তাগুলোর নাম 1, 2, 3, 4 ইত্যাদি। কোণাকুণি রাস্তাগুলোকে বলা হয় এভেন্যু। আর এইসব এভেন্যুর নাম আমেরিকার বিভিন্ন শহরের নাম অনুযায়ী। যেমন আমাদের এম্‌বাসী হচ্ছে ম্যাসাচুসেট্‌স ও 'Q' স্ট্রীটের সংগমে।

স্ট্রীট ধরে এসে ১৬ নং স্ট্রীটে পড়লাম। ষোল নম্বরে, কার্ণেগী ইন্‌স্টিট্যুটের ঠিক উল্টোদিকেই পেলাম ইয়ুথ হোস্টেল। আমার পকেটে পয়সা থাকলে আমি সাধারণতঃ বিভিন্ন দেশে ইয়ুথ হোস্টেলেই রাত কাটাই, শহরে সস্তার ওপরে যুবকদের এক চমৎকার আড্ডাখানা। আমাদেব দেশে যেমন আছে চায়ের দোকান, তুরকীতে আছে কাফে-রুম, কোপেনহেগেনের তিভলি— তেমনি বিভিন্ন শহরে এই ইয়ুথ হোস্টেল। অল্প খরচায় থাকা, খাওয়া ও আড্ডা দেবার চমৎকার জায়গা— শুধু তাই নয়, এখানে পাওয়া যায় আপ-টু-ডেট সব রকমের খবর। কর্মখালি, শিক্ষামূলক, বন্ধু বা বান্ধবী সংগ্রহ— *পর্যটন* আর রাজনীতি। অর্থাৎ আমাদের রকবাজির ভাষায় যাকে বলে পেঁয়াজি থেকে শুরু করে নেতাজী রহস্য সব সংবাদ।

ইয়ুথ হোস্টেলের ওয়ার্ডেনের কাছে আমার আন্তর্জাতিক ইয়ুথ হোস্টেল কার্ডটা দেখাতেই তিনি দরজা খুলে দিলেন। একটা ঘর পেয়ে গেলাম। ঠিক হ'ল সেখানে কয়েকদিন থাকবো। ইয়ুথ হোস্টেলটা রাজধানীর ঠিক প্রাণকেন্দ্র বলা যায়। এখান থেকে ১৬নং স্ট্রীট ধরে সরাসরি এগোলেই এক মাইলের মধ্যে হোয়াইট হাউস বা আমেরিকার রাস্ট্রপতি ভবন। ইয়ুথ হোস্টেলে থাকলে এখানকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গেও যোগাযোগ করার সুবিধা হবে। খাওয়ার অসুবিধা নেই, এখানে সরকারী রন্ধনশালা রয়েছে। বাইরের থেকে জিনিস কিনে এনে এখানে নিজের হাতে রেঁধে খাও। সব ঠিক-ঠাক হয়ে গেল। ওয়ার্ডেনের সাথে যোগাযোগ করে সেদিন রাত্রিতে যুবক-যুবতী মহলে একটা ছোটখাট বক্তৃতা দেবারও বন্দোবস্ত হয়ে গেল। সব ঠিক-ঠাক করে বেরিয়ে পড়লাম শহর দেখতে।

এই ওয়াশিংটনকে বলা হয়— ওয়াশিংটন ডি-সি (Washington D.C) অর্থাৎ District of Columbia। আমেরিকা যুক্তরাস্ট্রের উত্তর-পশ্চিমে আর এক প্রদেশের নামও ওয়াশিংটন। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন শহর। এই প্রদেশটা হচ্ছে ডিস্ট্রীক্ট্‌ অব কলম্বিয়া বা সংক্ষেপে ডি. সি.।

১৭৯১ সালে ফরাসী ইঞ্জিনীয়ারের পরিকল্পনায় এই শহরের গোড়াপত্তন হয়। ফরাসী ইঞ্জিনীয়ার পিয়ার লঁফাঁ (Pierre L'enfants) অবশ্য তাঁর পরিকল্পনার রূপদান

চোখে দেখে যেতে পারেন নি, শহর গড়ার শুরুতেই তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল ওয়াশিংটনকে পৃথিবীর সেবা নগর তৈবী করার। তাঁর স্বপ্ন আজ সার্থক।

মেজর পিয়ার চার্লস লঁফাঁ, তিনি আমেরিকা যুক্তরাস্ট্রের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ফরাসী জেনারেল লাফাইয়েত-এর সঙ্গে এদেশে এসেছিলেন। স্থপতি ও ইঞ্জিনীয়ার লঁফাঁর কল্পনা ও উদ্ভবনী শক্তি ছিল অসাধারণ। সে সময়কার প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন তাঁর এই প্রতিভা কাজে লাগাবার জন্যই তাঁকে যুক্তরাস্ট্রের রাজধানী নির্মাণের এক পরিকল্পনা পেশ করতে বলেন। পরে বৃটিশমুক্ত (স্বাধীন) আমেবিকার প্রথম রাষ্ট্রপতির নামানুসারেই এই শহবের নাম দেওয়া হয় ওয়াশিংটন সিটি।

ইয়ুথ হোস্টেল থেকে বেরিয়ে আমি সরাসরি ১৬ নং রাস্তা ধরে হোয়াইট হাউসের দিকে এগিয়ে চলেছি, সাইকেলটা সঙ্গে নিইনি কাবণ পায়ে চলে একটু রিল্যাক্সেসন দরকার। রাস্তার দুধারে বিরাট সাজানো গাছ আব পার্ক ঘিবে শহবটাকে সত্যি বাগানবাড়ী করে গড়ে তুলেছে। অনেকগুলো গোল চক্কর পাব হবাব পব ঠিক সামনেই একটা সাদা বাড়ী ভেসে উঠলো, দূর থেকে দেখে মনে হয় যেন রাস্তাটা সরাসবি বাড়ীটার ভিতর ঢুকে গেছে। হাতের ম্যাপটা খুলে দেখলাম, তাইতে— ঠিক সামনেই White House, রাষ্ট্রপতি ভবন। বর্তমানে রাষ্ট্রপতি নিক্সন এই বাড়ীতেই থাকেন। সামনে একটা পাবলিক পার্ক যাব মাঝখানের একটা পরীওয়ালা ফোযাবা থেকে অনববত জল গড়াচ্ছে, তার ঠিক নীচে একটা বিরাট আলো দিয়ে ঝর্ণাটাব বাহার কবা হয়েছে। তার মানে এখন সন্ধ্যা গড়িয়ে এসেছে। আশেপাশে একটু ঘোবাফেবা কবে আমি আবার ফেববাব রাস্তা ধরলাম। ৮টার মধ্যে ইয়ুথ হোস্টেলে ফিরতে হবে, আমার জন্য সবাই বসে থাকবে।

সেদিন রাতে আমি হোস্টেলে শহর ও শৃঙ্খলা সম্পর্কে একটা বক্তৃতা দিলাম। শ্রোতা পেয়েছিলাম প্রায় পঞ্চাশ জন। প্রত্যেকে আমাকে এক ডলার করে সাহায্য করল— আমার পর্যটনের জন্য। অথবা বলা যেতে পারে আমাব বক্তৃতাব ফি। ধন্যবাদ দিয়ে তাদের গুড নাইট জানালাম। সকালবেলা প্রাতরাশ সেরে টেলিফোন করলাম শ্রীগৌতম গুপ্ত মহাশয়কে। টেলিফোন পাওয়া মাত্র তিনি লাফিয়ে উঠলেন— অবশ্যই, আমি এক্ষুণি আসছি আপনাকে নিতে।

—না, না গুপ্তবাবু শুনুন, আপনি ব্যস্ত হবেন না। আপনি আমার থাকার জন্য নাকি সব বন্দোবস্ত করেছেন— ডঃ থায়রাণী আমাকে বলেছেন।

—হ্যাঁ নিশ্চয়ই, আপনি আমার সঙ্গে থাকবেন। আমি ব্যাচেলার মানুষ, কোনো অসুবিধা হবে না।

—আপনাকে বিশেষ ধন্যবাদ গুপ্তবাবু, সত্যি আপনি খুব করিৎকর্মা দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ শুনুন, আজ বিকেলে আসুন এখানে, আমি বর্তমানে ইয়ুথ হোস্টেলে আছি, সাক্ষাতে বিশদ আলোচনা করা যাবে।

—ঠিক আছে, শুনুন, আপনার কোনো অসুবিধা হচ্ছে নাতো— হ্যাঁ, খোলাখুলি ভাবে সব বলুন মশায়।

—সব ঠিক, কোনো অসুবিধা নেই, তাহলে বিকেলে আসছেন— পাঁচটা নাগাদ — ঠিক আছে?

—ঠিক—ধন্যবাদ।

—ধন্যবাদ—নমস্কার তাহলে...।

টেলিফোনটা রাখলাম। ভদ্রলোক বেশ রসিক বলেই মনে হচ্ছে। সাইকেলটা নিয়ে বেরোতে যাচ্ছি, এমন সময় পিছন থেকে ওয়ার্ডেন মশায় ডাক দিলেন,

—মিঃ দে— টেলিফোন। আমি আসলাম। ওয়ার্ডেন সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়ে আমি টেলিফোনটা ধরতেই ইণ্ডিয়ান এম্‌বাসীর গলা পেলাম—

—মিঃ দে, হ্যাঁ শুনুন, আমি আম্‌বাসাডারেব সেক্রেটারী বলছি, আপনি আজ তিনটে নাগাদ এখানে আসতে পারবেন কি? অ্যাম্‌বাসাডর আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।

—তাই না কি? তা বেশ আমি ফ্রি আছি, আসবোখন।

—আপনি ডঃ গাঙ্গুলীর অফিসে আসবেন, সেখান থেকে তিনিই আপনাকে লিড্ করবেন।

—ঠিক আছে। টেলিফোনটা রেখে আমি বেড়িয়ে পড়লাম।

ওয়াশিংটন সিটি এবং তার শহরতলী নিয়ে গড়ে উঠেছে ডিস্ট্রীক্ট্ অফ কলম্বিয়া। হোয়াইট্ হাউস দেখার পারমিশনের জন্য বিরাট কিউ। এই শহরে দিন-রাত ট্যুরিস্ট আসছে, কম করেও প্রতি মাসে দশলক্ষ আগন্তুক এই শহর দেখতে আসছে। হোয়াইট হাউসের পেছনে গড়ের মাঠের মতো বিরাট মাঠ, তারই মাঝখানে বিরাট জেফারসন মনুমেন্ট। মাঠের মাঝখান দিয়ে সিমেন্ট ঢালা পায়ে চলা রাস্তা ধরে আমি এগিয়ে চললাম। নজরে পড়লো আকাশের দিকে— অসংখ্য পাখীর মতো মনে হচ্ছে— ভালো করে নজর করে দেখি— না এসব পাখী নয় ঘুড়ি। আমেরিকানরাও ঘুড়ি ওড়ায় তাহলে!

ভালো কথা, অসংখ্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাদের বাপ-মায়েরাও ঘুড়ি ওড়াচ্ছে। নায়লনের সুতো আর প্লাস্টিকের ঘুড়ি। আর একটু এগোতেই একটা নদীর ধারে পড়লাম; এটা ঠিক নদী নয়, অনেকটা বালিগঞ্জেব লেকের মতো। এই শহরটির তিনদিক ঘিরে রয়েছে পটোম্যাক রিভার, তারই একটা খাল কেটে এখানে লেকের সৃষ্টি করা হয়েছে। অবশ্য আগে একটা প্রায় মরা নদী এখানে ছিল। নদীর ধারে সারি-সারি অস্থায়ী ঘুড়ির দোকান, বলা যায় চলতি ঘুড়ির দোকান। ভালোভাবে লক্ষ্য করে দেখলাম এখানকার ঘুড়িগুলো ঠিক আমাদের দেশের ঘুড়ির মতো নয়। নায়লনের সুতো আর প্লাস্টিকের কাগজে তৈরী ঘুড়ি। এই ঘুড়িগুলো শুধু হাওয়ায় ভেসে থাকার পক্ষে উপযুক্ত কিন্তু তাতে প্যাঁচ খেলা যায় না। আমি একটি ঘুড়ির

দিকে তাকিয়ে আমার ছোটবেলাকার কথা ভাবছি— এমন সময় পেছন থেকে একজন ভদ্রলোক এসে বললেন,—

—তুমি ঘুড়ি ওড়াতে ভালোবাসো?

—হ্যাঁ, খুব।

—এই নাও। বলে ভদ্রলোক তাঁর হাতের সুতোর কাঠিমটা ধরলেন। তাঁর ঘুড়িটা অনেক উঁচু আকাশে। আমি সাইকেলটা ঘাসের ওপর শুইয়ে, ভদ্রলোকের হাত থেকে ঘুড়িটা নিলাম। ভাবলাম ভদ্রলোক শিশুকে ও দয়ালু বটে।

—তাহলে ঘুড়ির দামটা নিন—ভদ্রলোক না-না করে উঠলেন। আমি পরে জানলাম যে, এখানকার অধিকাংশ লোকই এখানে এসে ঘুড়ি কিনে ওড়ায়, তারপর যাবার সময় মাঠে ফেলে রেখে যায়। সুতো শুদ্ধ একটা ঘুড়ির দাম প্রায় পঞ্চাশ সেন্টস-এর মতো। সবই বড়লোকি ব্যাপার। আমি অনেকক্ষণ ঘুড়ি উড়িয়ে তারপর কাছে একটা ছেলের হাতে সেটা ধরিয়ে দিয়ে আবার প্যাডেল মারলাম।

ওয়াশিংটনে কোন আকাশচুম্বী প্রাসাদ নেই— কাবণ তা আইনত নিষিদ্ধ, তাই শহরেব অন্য দিকের কথা বলতে পারছি না— তবে এদিকটা বেশ সাজানো-গোছানো, পরিষ্কাব রুচির পরিচয়। ওখান থেকে আমি এগিয়ে এলাম ক্যাপিটল হিলের দিকে। একটা বিরাট উঁচু টিপির ওপর এই ক্যাপিটল হিল—অনেকটা কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের মতো; তবে আকারে তার চেয়ে বেশ কয়েকগুণ বড়। ক্যাপিটল হিল হচ্ছে পার্লামেন্ট ভবন। এই পার্লামেন্ট ভবনের নিচেব তলায় রয়েছে পৃথিবী-বিখ্যাত কংগ্রেস লাইব্রেরী। ক্যাপিটল হিলের ভেতরে বিনা পয়সায় ঢুকতে দেয় আর লাইব্রেবী অফ কংগ্রেসেও ফ্রি রিডিং রুম বয়েছে। শুধু আমেরিকা নয়, পৃথিবীর অন্যান্য বহু দেশ থেকে পাঠকরা আসছে এখানে পড়াশুনা ও গবেষণাব ব্যাপারে। লাইব্রেবী তো নয় যেন বই-এর রাজপুরী। এর সব ডিপার্টমেন্টগুলো ঘুরতে বেশ কিছু সময়ের দরকার। আমি মোটামুটি একটু চোখ বুলিয়ে বেরিযে পড়লাম।

দেখতে দেখতে অনেক বেলা গড়িয়ে গেছে, এবার ফেরা যাক। এমবাসীতে তিনটের আগেই পৌঁছনো দরকার। বলাই বাহুল্য এখানকার এমবাসী আমাকে যথাসাধ্য সহযোগিতা করছে।

এমবাসীর নিচের তলায় ক্যান্টিন, ঠিক যেমন লন্ডনের ইন্ডিয়া হাউসে। ক্যান্টিনে পরিচয় হল মিঃ ডনের সাথে। ভারতীয় খৃষ্টান ভদ্রলোক চেহারায় ও রঙে দূর থেকে অনেকটা আয়রনম্যান নীলমণি দাসের মতো। আমিতো ভেবেছিলাম— হঠাৎ নীলমণিদা এখানে কি করছেন? তাঁকে সম্বোধন করতেই থমকে দাঁড়ালেন— সেই সূত্রেই আলাপ। ভদ্রলোক আমাকে সাদরে তাঁর টেবিলে ডাকলেন, কথায় কথায় তিনি বললেন—শুধু আমি নই অনেকেই ভুল করে তাঁকে আয়রনম্যান ভাবে।

ক্যান্টিন থেকে খাওয়ার পর উঠে এলাম ওপর তলায়। ডঃ গাঙ্গুলী আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন— তিনি আমাকে বুঝিয়ে দিলেন অ্যাম্বাসাডরের সাথে আলাপের

তাৎপর্য ও প্রসঙ্গ। আমি এর আগে আরও প্রায় বারোজন অ্যাম্বাসাডরের সাথে আলাপ করেছি, কাজেই ভয় নেই। ডঃ গাঙ্গুলী কথা প্রসঙ্গে আমাকে জানিয়ে দিলেন— বর্তমানে ওয়াশিংটনে ভারতীয় অ্যাম্বাসাডরের নাম মিঃ এল কে ঝাঁ; তিনি আগে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর ছিলেন। মনে পড়ে গেল টাকার নোটে তাঁরই সই যেন দেখেছি।

যথাসময়ে অ্যাম্বাসাডরের ঘরে ঢুকতেই তিনি উঠে এসে আমাকে স্বাগত জানালেন। মিঃ গাঙ্গুলী আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনি আমাকে আমার অভিযানের সফলতা কামনা করে— কথাবার্তা চালালেন। তিনি আমার সফরকালীন কিছু অভিজ্ঞতা শুনতে চাইলেন, আমিও সংক্ষেপে আমার ইরান ও গ্রীসের কিছু মজাদার কাহিনী শোনালাম। প্রায় বিশ-পঁচিশ মিনিট কথাবার্তার পর তিনি আমাকে একটা অভিনন্দনপত্র দিলেন। আমিও তাঁকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে উঠে পড়লাম। সেখান থেকে আমি এলাম পাবলিক রিলেশনস্ অফিসারের ঘরে। তিনি ইতিমধ্যে শহরের বিভিন্ন পত্রিকার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। বিশেষ করে আমেরিকার স্বনামধন্য পত্রিকা 'ওয়াশিংটন পোস্ট' আমার ইন্টারভিউ নিতে চায়। ওদিকে ওয়াশিংটনের মেয়রের কাছ থেকেও একটা সাক্ষাতের অনুরোধ এসেছে। এখন আমার অসুবিধা হচ্ছে যে, এ সকলের মন রক্ষা করতে গেলে এদিকে আমার শহর দেখা চলে না। আবার ওদিকে তাদের সঙ্গে দেখা না করলে ভারতীয় হিসেবে মান রক্ষা হয় না। কাজেই সবদিক থেকে বিবেচনা করে এবং পি-আর-ও'র সাথে পরামর্শ করে বিভিন্ন জায়গায় সময় মতো অ্যাপয়েন্টমেন্ট ঠিক করে বেরিয়ে পড়লাম।

ওঃ ঝামেলা বটে! নিউ ইয়র্কে সহযোগিতা পাইনি বলে ওদের ওপর অভিমান করেছি আর এখানে সহযোগিতার ফলে হাঁপিয়ে উঠেছি। আমি পি-আর-ও সাহেবকে অনুরোধ করেছিলাম রেহাই দিতে, কিন্তু তিনি রুখে উঠেছিলেন, —পাগল হয়েছেন মশাই! আপনি এখানে প্রথম ভারতীয় সাইক্লিস্ট, কাজেই আপনাকে অত সহজে ছাড়া চলে! শোনো কথা— যাই হোক দেখা যাক ক'দিনে ঝামেলা মেটে।

গুপ্তবাবু বিকেলবেলা ইউথ হোস্টেলে ঠিক সময় মতোই এসে হাজির হলেন, আমরা পরস্পর পরিচিত হলাম। গুপ্তবাবু মানে আমি গৌতম গুপ্তের কথা বলছি। তিনি সাদাসিধে চটপটে মানুষ এবং সদাহাস্যময়। পরিচয়ে জানলাম, তিনি এখানে ক্যাথলিক ইউনিভার্সিটিতে রসায়নশাস্ত্রের কোন এক নিগূঢ় রসের বিষয়ে গবেষণা করছেন। ভাগ্য ভালো, ভদ্রলোক রসতত্ত্বের অতল রহস্যে থাকলেও আপন রসিকতা ভোলেননি। কাজেই তাঁর সঙ্গে অনেকদিন পর খাঁটি বঙ্গমতে আমাদের আলাপ জমে উঠলো। কিছুক্ষণ আলাপের পর গৌতমবাবু তাঁর গাড়িতে করে আমাকে নিয়ে গেলেন শহর দেখাতে। শহরের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে ফিরে গৌতমবাবুর ডেরায় এসে হাজির, আগোছালো ব্যাচেলারের ঘরে— অভাব কিছু নেই। মুসুর ডাল থেকে আরম্ভ করে চাটনি পর্যন্ত। গৌতমবাবু দেশে থাকতে কোনদিন রাঁধেননি বটে, কিন্তু

আমেরিকায় রেঁধে রেঁধে এখন পাকা রাঁধুনি, অবশ্য পেশাদার নন। গৌতমবাবু বদ্যিবাটীর ছেলে আর আমি ইছাপুরের, গঙ্গার এপার আর ওপার। কথা প্রসঙ্গে আমাদের উভয়ের চেনাজানাও অনেক বেরিয়ে পড়লো। গৌতমবাবুর বাড়ী থেকে আমরা আরও এক বাড়ীতে গেলাম, সেখানে আগে থেকেই আরও দু'চারজন বাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচিত হলাম। আমাদের ভরা পেট সত্বেও সেখানে সরকার বৌদির রান্নার তারিফ করতেই হলো। সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত আমরা গল্প করে— তারপর তাঁদের গুড নাইট জানালাম। গৌতমবাবু অবশ্য আমাকে পৌঁছে দিলেন। তিনি বারবার করে বলে গেলেন আমার কোনো অসুবিধা হলে অবশ্যই যেন তাঁকে জানাই। আমিও তাঁকে আশ্বাস দিলাম। পবে আবার দেখা হ'বে বলে সেদিনকার মতো তিনি বিদায় নিলেন।

ইতিমধ্যে টেলিভিশনে আমি ২৫ মিনিটের জন্য একটা ইন্টারভিউ দিই। 'ওয়াশিংটন পোস্ট' (দৈনিক পত্রিকা)-কেও এড়াতে পারলাম না। প্রচারের পক্ষে এই দুটোই যথেষ্ট। ....চারদিক থেকে ডাক আসতে লাগল। একদিন জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটিতে 'মানুষ ও মনুষ্যত্ব' (Human and Humanity) সম্পর্কে একটা বক্তৃতা দেওয়ার পর আমার বক্তৃতার চাহিদা আরও গেল বেড়ে। এমন হবে, আমি আগে ভাবতে পারিনি। ইউরোপে অবশ্য এ ধরনের সাড়া যে না পেয়েছি তা নয়, কিন্তু এখানকার তুলনায় তা কিছু নয়। আমেরিকানদের এটা একটা চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য। অনেকে বলে এরা অনেকটা হুজুকে বাঙালীদের মতো। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের হুজুক অধিকাংশ সময়েই কাজের থেকে বিঘ্ন ঘটায় বেশি, কিন্তু এদের হুজুক পুরোপুরিটাই কাজের। আমার পর্যটক জীবনের সবটা অভিজ্ঞতাই এরা যেন সম্পূর্ণ নিংড়ে নিতে চায়। জানবার নেশায় এরা সত্যি পাগল। আমি এদের কাছে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বরাবরই এদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানিয়েছি।

ছোটবেলায় পড়েছি 'ভ্রমণ শিক্ষারই একটি অঙ্গ', এসম্পর্কে রচনাও লিখেছিলাম প্রচুর। কিন্তু যেদিন ভ্রমণের উদ্দেশ্যে স্কুল পালালাম, পরের দিন কান ধরে তিন পিরিয়ড্ বেঞ্চির উপর দাঁড়িয়ে থাকতে হলো, আর বাড়িতে ছোড়দার হাতে বেদম প্রহার। হাড়ে হাড়ে সেদিন বুঝেছিলাম, ভ্রমণ সত্যি শিক্ষারই অঙ্গ। তারপর দুটো যুগ পার হয়ে গেছে, কিন্তু আজও ভুলিনি সে কথা। আমেরিকায় বারবার সে কথাটা আমার মনে পড়ছে। ওয়াশিংটন কলেজে বক্তৃতা দেবার সময় মনে পড়ে একজন উঠতি ছাত্র আমাকে প্রশ্ন করেছিল—

—আচ্ছা আপনি মাত্র কয়েকটি ডলার (টাকা) হাতে সম্বল করে কি করে এই বিরাট দুনিয়া দেখতে সাহস করে বেরোলেন? তাও মাত্র দু'চাকার ভরসা করে—আমার দ্বারা কি সম্ভব নয়?

আমাকে সে প্রশ্নের জবাব দিতে হয় নি, একজন প্রফেসর আমার হয়ে জবাব দিয়েছিলেন।

তিনি বলেছিলেন, —ওহে খোকা, কথা না বাড়িয়ে, সরাসরি সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ে দেখ কি হয়। বি প্রাকটিকেল— টাকার জন্য ভাবছো কেন, মনের জোরে এই মুহূর্তেই বেরিয়ে পড়া না কেন।

আমার মনে পড়ে জার্মানীর স্টুটগার্ট-এ আমার সাথে একটা সম্পূর্ণ জার্মান পরিবার সফরে বেরিয়ে প্রায় পঁচিশ কিলোমিটার পর্যন্ত এগিয়েছিল। যাইহোক, যা বলছিলাম অর্থাৎ আমেরিকানদের জানবার আগ্রহ প্রচুর, কাজেই কোন প্রকারে একবার সুযোগ পেলে তা এরা সহজে ছাড়ে না। কয়েকদিন ধরে আমার বকতে বকতে গলা ধরে গেল— অবশ্য বিনা পয়সায় নয়।

হঠাৎ একদিন ওয়াশিংটনের মেয়রের তরফ থেকে ডাক এলো, তিনি আমাকে শুভেচ্ছা জানাতে চান।

সকাল ১০টায় আমার যাবার কথা, তাই চা ও টোস্ট খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম টাউন হলের দিকে। মেয়রের অফিসটাকে (ব্যজ দপ্তরখানা) ডিস্ট্রিক্ট বিল্ডিং (District Building) বলা হয়। হোয়াইট হাউসকে ডানদিকে রেখে একটু যেতেই আমি ডিস্ট্রিক্ট বিল্ডিং-এ গিয়ে হাজির হলাম। বাড়ীটা অনেকটা আমাদের কলকাতা ইউনিভার্সিটির পুরোনো বাড়ীর মতো (দ্বারভাঙা বিল্ডিং), চারপাশে ফুলের বাগিচার ওপর রোমান টাইপের। সামনে একটা লাইটপোস্টের মত দেখতে পেয়ে সাইকেলটাকে তার পাশে দাঁড় কারিয়ে দিয়ে সরাসরি সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এলাম। সিঁড়ির মাথায় পৌঁছতেই কেতাদুরস্ত একজন প্রহরী আমার পথ আটকে ধরলো। মুখ তুলে তাকাতেই তিনি গম্ভীর মেজাজে বললেন— ওই সাইকেলটা কি তোমার?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—ওটা সাইকেল রাখবার জায়গা নয়।

—তাহলে কোথায় রাখবো বলুন?

—জানি না— গম্ভীর স্বরে জবাব দিলেন মূর্তিমান যম।

আমি যমদূতকে বুঝিয়ে বললাম—আমার মেয়রের সাথে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, কাজেই বুঝতে পারছেন......। কালো বিরাট চেহারার নিগ্রোমূর্তি আমার কথায় হা-হা করে হেসে উঠলো; সে বিশ্বাসই করতে চায় না যে আমার সঙ্গে মেয়রের সাক্ষাৎ হতে পারে। আমি তাকে আরো একবার বোঝাবার চেষ্টা করতেই সে সরাসরি বলে বসলো। (অনেকটা) —কেন বাবা ইয়ার্কি করছো, ইয়ার্কির আর জায়গা পেলে না, সরাসরি কেটে পড়। —আমি তার ইংরেজির বাংলা মতে তর্জমা করলাম।

কি অবস্থা! হাতে মাত্র আর ১৫ মিনিট আছে, আমাকে অন্ততঃ ১০ মিনিট আগে থাকতে তাঁর সেক্রেটারীর সাথে দেখা করতে হবে, তিনি আমাকে মেয়রের ঘরে নিয়ে যাবেন। হাতে সময় কম। অথচ এই যমদূতবাবুর চোখ এড়িয়ে ভিতরে প্রবেশ প্রায় অসাধ্য। তার মানে সাইকেলটাকে দূরে না সরিয়ে তার কৃপালাভ করা মুশকিল, আবার ওদিকে সাইকেলটাকে দূরে সরানো মানে, ১৪নং স্ট্রিটের ফুটপাতের ওপর রাখার বন্দোবস্ত করা— তাও এখান থেকে অনেক দূরে। কিন্তু কি করা যায়। হঠাৎ বুদ্ধি খেললো— কাছেই একটা টেলিফোন কেবিন দেখতে পাচ্ছি, কাজেই সেখানে চলে এলাম! মেয়রের এক্‌জিকিউটিভ সেক্রেটারীর টেলিফোন নাম্বারটা আমার নোট বই-এ লেখা ছিল, কাজেই সরাসরি তাঁকে জানালাম আমার কাহিনী— অর্থাৎ আমার সাইকেলটাকে এখানে রাখতে দিচ্ছে না আর সাইকেলটাকে না সরানো পর্যন্ত আমার ভেতরে ঢোকা অসাধ্য, বিশেষ করে সিকিউরিটি গার্ড আমার কথা তো বিশ্বাসই করতে চায় না।

মিঃ স্যুলার আমার টেলিফোন পেয়ে সত্যি লজ্জিত হলেন। তিনি আমাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, —কিছু ভাববেন না, আমি বন্দোবস্ত করছি, আপনি মেন গেটের কাছে এসে দাঁড়ান— আমি গার্ডকে বলে দিচ্ছি।

আমি তাঁর কথামতো কেবিন থেকে বেরিয়ে আবার সেই বিরাট সিঁড়ির কাছে দাঁড়ালাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখি সিঁড়ির ওপর থেকে ঠক্‌ঠক্ করে সেই বিরাট লোকটি নেমে আসছে। আমার কাছে এসে পড়তেই হে হে করে বত্রিশটা দাঁত বার করে হেসে দিয়ে এক সেলাম ঠুকে বললো,

—আপনি বুঝি ভূ-পর্যটক (Globe Trotter)?

আমিও অনেকটা তারই মতো দাঁত বের করে বললাম,

—আজ্ঞে হ্যাঁ। মনে মনে ভাবলাম, ব্যাটা হাসছে দেখো, লজ্জা নেই —যেন গণ্ডারের চামড়া।

সে সরাসরি আমার সাইকেলের কাছে এগিয়ে গিয়ে একহাতে সাইকেলের রডটা ধরে আলগা করে তুলে সরাসরি সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে চললো। আমি তাকে অনুসরণ করলাম। এবার সাইকেলটাকে শ্বেতপাথরের বারান্দায় অতি সন্তর্পণে রেখে বললো— এটা অতি মূল্যবান সাইকেল—বিশেষ করে এই সাইকেলটা সারা পৃথিবী চষে বেড়াচ্ছে, এটা ছোঁয়াও একটা মহাভাগ্য। তাইতো আপনাকে বলছিলাম—ওরকম হেলা করে বাইরে রাখবেন না— বলা যায় না শত হলেও শহুরে ব্যাপার তো! আমি অবাক হয়ে ভদ্রলোকের গদ্‌গদ্‌ভাব লক্ষ্য করতে লাগলাম—যেন ভিজে বেড়াল। সত্যি কি অদ্ভুত পরিবর্তন! বুঝলাম উপরওলার টেলিফোন পেয়েছে। সর্বশেষে আমি ঠিক সময়মতোই এক্‌জিকিউটিভের ঘরে এসে পৌঁছলাম; ভদ্রলোক আমাকে সম্বর্ধনা জানালেন, করমর্দন করে আত্মপরিচয় দিলেন—

—আমি মারটিন।

—আমি বিমল।

—খবর কি? ভালোতো—ওয়েলকাম টু ওয়াশিংটন!

—ধন্যবাদ।

আমেরিকানদের স্বভাব অতি মিশুকে, সাধারণতঃ এদের কম্‌প্লেকসিটির কোনো বালাই নেই। উঁচু-নীচুর কোনো প্রভেদ নেই। আমাদের দেশে বা বিলেতে যেমন প্রথম পরিচয়ে আমরা টাইটেলটা বলে থাকি, যেমন— মিঃ গাঙ্গুলী, মিঃ দত্ত বা মিঃ গ্রাহাম ইত্যাদি, আমেরিকানরা ওসব কার্ট্‌সির ধার ধারে না, সরাসরি অমল, বিমল, মারটিন ইত্যাদি নাম ধরেই কাজ চলে, সে যত বড়ই হোক না কেন।

সেক্রেটারী ভদ্রলোকের পুরো নাম হচ্ছে Mr. Martin K. Schuller। ঠিক সময়মতো তিনি আমাকে মেয়র মহাশয়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটন আর এই শহরের মেয়রের টাইটেলটাও ওয়াশিংটন, পুরো নাম Walter E. Washington, ওয়াল্টার ওয়াশিংটন, বিরাট চেহারার নিগ্রোজাত। ভদ্রলোক আমাকে আপ্যায়ন জানিয়ে বসলেন। ওই বিরাট ব্যক্তিত্বের সামনে অনেকটা হালকা হবার জন্য আমি রসিকতা করে বললাম— আপনার টাইটেলটা দেখছি ঠিক শহরের নাম অনুযায়ী, নাগরিকরা ঠিক যোগ্য ব্যক্তিকেই মেয়র করেছে দেখতে পাচ্ছি।

ভদ্রলোক হেসে উঠলেন— না ওটা আমার পূর্বপুরুষের ফ্যামিলি নাম।

তিনি আমাকে, বিশেষ ভাবে আমার অভিযানের প্রশংসা করলেন ও সেই সঙ্গে আমাকে উৎসাহিত করলেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বললেন যে, আমি গান্ধীর দেশের লোক, মানবদরদ ও বিশ্বভ্রাতৃত্বই আমাদের দর্শন। কাজেই আমার বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের জন্য ভূ-পর্যটন সার্থক হবেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর আরও চারজন সহকর্মী এসে হাজির হলেন। আমি সকলের সঙ্গে পরিচিত হলাম, অবশেষে তিনি ওয়াশিংটন শহরের 'প্রতীক-পতাকা' আমাকে উপহার স্বরূপ দান করলেন। তাঁদের সকলকে আমি আমার ও আমার দেশবাসীর তরফ থেকে শুভেচ্ছা জানালাম, আর প্রশংসা করলাম তাঁর প্রীতির।

বেরিয়ে এলাম তাঁর ঘর থেকে। ওখান থেকে মিঃ স্যুলার সাহেব আমাকে তাঁর অফিসে নিয়ে এলেন, এক সঙ্গে কফি পান করার জন্য।

মিঃ স্যুলার আমাকে ওয়াশিংটন শহরের ইতিহাস শোনাতে আরম্ভ করলেন,—

যদিও জর্জ ওয়াশিংটন ফরাসী ইঞ্জিনীয়ার পিঁয়ার লঁফাঁ সাহেবের পরিকল্পনানুযায়ী শহরের গোড়াপত্তন করেন ১৭৭১ সালে, কিন্তু আসলে সরকারীভাবে তা ঘোষিত হয় ১৮০০ সালে। ১৮১৪ সালে ব্রিটিশ ট্রুপ একবার শহরটাকে জ্বালিয়েও দিয়েছিল। সেই সময় আমাদের পার্লামেন্ট বসতো জেনারেল পোস্ট অফিস বিল্ডিং-এ। শুধু তাই নয়, এ শহরটা গড়ার সময় আমাদের কাজ বারবার আটকা পড়ে যায় আর্থিক

দুর্গতির জন্য। আপনি কল্পনা করতে পারেন যে যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী তৈরি করার জন্য সরকারকে টাকা ধার নিতে হয়েছে প্রাইভেট কোম্পানী থেকে। অবশ্য সব এখন শোধ হয়ে গেছে। সত্যি সে এক বিরাট ইতিহাস। কিন্তু যাই হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত স্বপ্ন আজ বাস্তবে পরিণত হয়েছে। ওয়াশিংটন আজ শুধু আমেরিকার নয়, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর সাজানো শহর। নদী বন ও পাহাড়ে ঘেরা একটা স্বপ্নময় জগৎ।

প্রায় আধঘণ্টা পর আমি উঠলাম, মিঃ স্যুলার আমাকে কথা দিলেন যে, তিনি রাষ্ট্রপতি নিক্সন-এর সাথে হোয়াইট হাউসে আমার একটা সাক্ষাৎকারের বন্দোবস্ত করবেন। তাঁকে ধন্যবাদ ও নমস্কার জানিয়ে আমি উঠলাম।

এইভাবে ব্যস্ততার মধ্যে আমার দিন কাটতে লাগলো। ইতিমধ্যে একদিন আমি আমাদের রাষ্ট্রদূতের বাড়িতে চা'এর জন্য আমন্ত্রিত হলাম। শ্রী এল কে ঝাঁ যদিও বিহারী কিন্তু তাঁর স্ত্রী বাঙালী। নিরহংকারী ও সামাজিক ভদ্রমহিলা, সেদিন সেই চা-চক্রে, রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সংগঠক স্বামী রঙ্গনাথানন্দজীও উপস্থিত ছিলেন।

ইতিমধ্যে ভয়েস অফ আমেরিকার আহ্বানেও সাড়া দিতে হলো। ভয়েস অফ আমেরিকার স্টুডিওতে খাঁটি বাংলাভাষায় রমেনদা (রমেন পাইন) ইনটারভিউ নিলেন। সেখানে দেবাংশুদা (দেবাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়) ও তাঁর সহকর্মীদের সাথে একসাথে ভয়েস অফ আমেরিকার ক্যান্টিনে বসে মধ্যাহ্ন ভোজন হলো, অবশ্য তার পরেরদিনই দেবাংশুদার বাড়িতে আমাকে নিমন্ত্রণ রক্ষা কবতে হয়, তবে ভাগ্য ভালো গৌতমবাবু আমাকে তাঁর গাড়ীতে করে সেখানে নিয়ে যান।

রমেন বৌদিও ওস্তাদ রাঁধুনে। অনেকদিন পর বাংলা রান্না পেয়ে সত্যি ক্ষিদেটাও রাক্ষসের মতো পেয়েছিলো, ভুরিভোজন ও গল্প সেরে সেদিন অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরেছিলাম। এরমধ্যে একদিন ডঃ ঘোষও আমাকে নেমন্তন্ন করলেন। তিনি ক্যাথলিক ইউনিভার্সিটিতে স্ট্যাটিসটিক্স পড়ান। ওঃ সত্যি এইভাবে অনেকদিন পর বাঙালী সঙ্গ পেয়ে বাংলাদেশকে যেন ফিরে পেলাম।

দেখতে দেখতে বেশ কিছুদিন কেটে গেল। ইউথ হোস্টেলে নিত্য নতুন আগন্তুকদের আমদানী হতে লাগলো, ইউথ হোস্টেলে থাকবার মেয়াদও ফুরিয়ে এলো। সাধারণতঃ পর্যটকদের তিনদিনের বেশি থাকবার নিয়ম নেই তবে, অধিকাংশ সময়েই মেয়াদ বাড়ানো যায়। আমার মেয়াদ বাড়িয়ে বাড়িয়ে প্রায় তিন সপ্তাহ হতে চললো, এখন থাকতে হলে আমাকে একমাসের কনট্রাক্ট বা পারমানেন্ট হিসেবে নাম লেখাতে হবে, কিন্তু আমি তাতে রাজি নই।

ওয়ার্ডেন ভদ্রলোক অতি ভালো। তিনি একদিন অতি বিনয়ের সঙ্গে আমাকে তল্পি গোটাতে বললেন। আমিও রাজি হয়ে গেলাম, তবে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকেল সোসাইটির অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর মিঃ ব্রাউনের সঙ্গে আমার একটা জরুরী বিষয়ে

দৈনিক আলোচনা চলছে, তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও আরও দু'দিন থাকতে হবে। কাজেই ইয়ুথ হোস্টেলের ঘর ছাড়লাম বটে কিন্তু ইয়ুথ হোস্টেলের সীমানা ছাড়লাম না, কারণ এখান থেকে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকেল সোসাইটির হেড-কোয়ার্টার মাত্র দু'মিনিটের পথ। ওয়ার্ডেনের কাছ থেকে সহজেই সামনের বাগানে তাঁবু খাটাবার অনুমতি পেয়ে গেলাম। আমার সাথে সব সময়েই তাঁবু থাকে —বিশেষ করে, বৃষ্টি বাদল অথবা শীতের দিনে একান্তই যদি বাইরে রাত কাটাতে হয় তাহলে তাঁবুটাই আমার একমাত্র ভরসা। ইয়ুথ হোস্টেলটা ওয়াশিংটনের নাম করা রাস্তা ১৬নং এর ওপরেই, কাজেই রাস্তা দিয়ে যে যায় সেই একবার থমকে দাঁড়ায় আমার তাঁবুটা দেখবার জন্য; বিশেষ করে তাঁবুটার ওপরে আমার পরিচয় লেখা ছিল। এই চত্বরে তাঁবু খাটানোতে সাধারণ আমেরিকানদের সাথে আমার মেশবার আরও সুবিধা হয়ে গেল।

দ্বিতীয় দিন খুব ভোরবেলা, তখনও সাতটা বাজেনি, হঠাৎ তাঁবুর বাইরে কে যেন ডেকে উঠলো,

—হরি ওম্—ভেতরে কেউ আছেন কি?

আমি আগেই সজাগ হয়ে ছিলাম কিন্তু ঠিক "হরি ওম্" শব্দটার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। চোখ রগড়ে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। আমার সামনেই একজন আমেরিকান ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে, তিনি আবার বলে উঠলেন— "হরি ওম্, গুড্ মর্নিং"। খাঁটি সাহেবের মুখে "হরি ওম্" শব্দ শুনে সত্যি অবাক হয়ে গেলাম, কিন্তু ঠিক প্রকাশ করলাম না। আমিও হাত জোড় করে তাঁকে নমস্কার জানালাম— মুখে বললাম "হরি ওম্"।

হাসিমুখে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম— আপনি ভারতীয় কোনো ভাষা জানেন কি? তিনি বললেন— না, শুধু "হরি ওম্" আর ওই ধরণের কিছু কিছু শব্দ।

ভদ্রলোক নিজেই আত্মপরিচয় দিলেন—

—আমি কেশব, কেশব আমার গুরুর দেওয়া নাম। আমি আমেরিকান, আমার পূর্ব নাম ফারনান্ডেস। আমি বর্তমানে ওয়াশিংটনের যোগ বেদান্ত সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত কর্মী।

— তাই নাকি? আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম, ভারতের যোগ-বেদান্ত (দর্শন) সোসাইটির সম্পাদক একজন ভারতীয় হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু তিনি খাঁটি আমেরিকান, শুধু তাই নয়, তিনি তাঁর নামটা পর্যন্ত পালটে নিয়েছেন। আমি মনে মনে ভদ্রলোককে প্রশংসা করলাম।

ভদ্রলোক তাঁর পরিচয় দিয়ে আমাকে তাঁর সঙ্গে যেতে অনুরোধ করলেন অর্থাৎ তিনি আমাকে তাঁর ওখানে নিয়ে যেতে চাইছেন। তিনি আমাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন যে, তাঁর ওখানে থাকবার কোন অসুবিধা হবে না। আমি ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম তিনি সত্যি আমাকে আন্তরিকভাবে চান— ভালোই

হলো, অন্ততঃ তাঁদের সাথে থেকে আমি আরও নতুন অভিজ্ঞতা পাবো। সবই তাঁর ইচ্ছে— "সাধা লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে নেই", কাজেই আমিও রাজি হয়ে গেলাম।

চট্‌পট্‌ করে কেশবের সহায়তায় তাঁবুটা গুটিয়ে নিয়ে ব্যাগে পুরলাম, তারপর ব্যাগটা পিঠে করে সাইকেলটা নিয়ে কেশবের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম।

প্রায় আধঘন্টা হাঁটার পর আমরা হোয়াইট হাউসের কাছাকাছি ১১নং রাস্তার ওপর একটা দোতলা বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালাম। দরজার ওপর বিরাট করে লেখা রয়েছে "OM" আর তার ওপরে লেখা 'শিবানন্দ যোগবেদান্ত সোসাইটি'। কেশব দরজার কলিং বেল টেপামাত্র দরজা খুলে গেল, আমরা ভেতরে ঢুকলাম— দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একটা লম্বা মতো খোলা চুলে দাঁড়িয়ে আমেরিকান মেয়ে— আমাকে দেখা মাত্র গড় হয়ে সে আমার পায়ে প্রণাম জানালো। —কর কি? কর কি? বলে সরে দাঁড়ালাম। কেশব মেয়েটার পরিচয় দিলে,

—এ হচ্ছে মরুভিয়া আমাদের সোসাইটির একজন সেবিকা ও ভক্ত।

—মরুভিয়া? আমি অবাক্‌ হলাম।

—হ্যাঁ, মরুভিয়া গুরুর দেওয়া নাম— কিন্তু খাঁটি আমেরিকান, ওর আগের নাম হলো ন্যান্‌সি ডিয়ান (Nancy Diane)।

খাঁটি আমেরিকান মেয়ে অথচ ভারত-দরদী, ভারতীয় নাম, আমি অবাক হয়ে ওর দিকে তাকালাম— লম্বায় প্রায় ছ ফুট, পাতলার ওপর সুন্দরী বলা চলে। পিছনে লালচে রঙের বিরাট চুলের বোঝা, পরণে গেরুয়া প্যান্ট ও পাঞ্জাবী। নীল কার্পেটে ঢাকা সিঁড়ি দিয়ে আমরা ওপরে উঠে এলাম, দরজার পাশে বড় বড় করে লেখা রয়েছে— "জুতো খুলে এখানে রাখুন"। তারই পাশে বিরাট একটা হঠযোগের চিত্র। ভেতরে ঢুকলাম; কেশব অতি বিনয়ের সঙ্গে আমাকে বললে— আপনি এখন আপনাব নিজের বাড়িতে— এখানে আপনি যতদিন খুশী থাকুন।

—ধন্যবাদ কেশব।

কেশব ও মরুভিয়া ইতিমধ্যেই আমাকে বিমলজী বলে সম্বোধন করতে শুরু করেছে।

আমি সোসাইটির ঘরগুলো ঘুরে ফিরে দেখতে লাগলাম। প্রথম ঘরটা হচ্ছে বিশ্রামঘর বা বৈঠকখানা বলা যেতে পারে। বিরাট ও সুন্দর পারসিয়ান কার্পেটের ওপর প্রায় ছ'সাতটা তাকিয়া পাতা, চারদিকের দেয়ালে কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম প্রভৃতি দেবদেবীর ফটো। আমার ঠিক পিছন দিকে তাকিয়ে দেখি শ্রীরামকৃষ্ণদেবেরও একটা ফটো। আলমারীটায় প্রায় শ'খানেক বই, সবই ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন অনুবাদ।

ডানদিকের ঘরটা অফিস ঘর, তিনটে ইলেকট্রিক টাইপ মেশিন, ফটো কপির মেশিন, সাইক্লোস্টাইল ও এড্রেসোগ্রাফির মেশিন, একটা সেলাইকলও রয়েছে দেখতে

পাচ্ছি আর প্যাড ও কাগজপত্রের বাহার। পাশে একটা রান্নাঘর, তাতে সব আধুনিক সরঞ্জামপূর্ণ। পোষাক পরিবর্তনের জন্য ছেলেমেয়েদের জন্য আলাদা গ্রীনরুম ও টয়লেট। তারপরে আমি এলাম সোসাইটির সবচেয়ে বড় ঘরে। এটা একটা বিরাট হলঘর, প্রায় আশিজন একসাথে যোগব্যায়াম করতে পারে। এই হলঘরের এককোণে জড়ো করা রয়েছে একশটা রবারের কার্পেট। যোগব্যায়ামের সময় এই কার্পেটগুলো ব্যবহার করা হয়। হলের ঠিক সামনে একটা বেদী, বেদীর ওপর রয়েছে বিরাট করে বাঁধানো— পাশাপাশি দুটো ফটো কৃষ্ণ ও শিবঠাকুরের। আরও দুটো ফটো নজরে পড়লো, ফটোটা দেখেই বুঝলাম যে ওটা হৃষিকেশের শিবানন্দ মহারাজের। কিন্তু তার পাশের দ্বিতীয় ফটোটা ঠিক চিনতে পারলাম না— মরুভিয়াকে জিজ্ঞেস করতেই সে বললো— ওটা হচ্ছে আমাদের এই সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা স্বামী বিষ্ণুদেবানন্দজীর। তিনি কানাডায় থাকেন, সেখানে তাঁর বিরাট আশ্রম। তিনি স্বামী মহারাজের (শিবানন্দজী) অন্যতম ছাত্র। স্বামী মহারাজ দেহত্যাগ করার পর তাঁর শিষ্যরা বিভিন্ন স্থানে তাঁর নামে আশ্রম খুলেছেন। স্বামী বিষ্ণুদেবানন্দজী ভারতীয়। মরুভিয়া বলতে লাগলো ইতিহাস। পরে মরুভিয়া আমাকে নিয়ে এল আর একটা ঘরে, ঘরের দরজায় লেখা "প্রাইভেট"। মরুভিয়া আমাকে বললো— এই ঘরেই আপনার থাকার বন্দোবস্ত হয়েছে।

সুন্দর সাজানো ঘর— জানলার দিকে এগোতেই নজরে পড়লো এয়ারকনডিশনের মেশিন।

—ঘরটা এয়ারকনডিশন দেখতে পাচ্ছি।

—নিশ্চয়ই, পিছন থেকে জবাব দিল কেশব। —এটা আমাদের গেস্ট রুম, স্বামীজী এলে এঘরেই থাকেন। কেশবের সঙ্গে আলাপে আরও জানলাম যে, ও আমেরিকান ইউনিভার্সিটির গ্রাজুয়েট— আর মরুভিয়াও তাই, তবে পড়াশুনা আরও না করে সরাসরি যোগসাধনে আত্মনিবেদন করেছে। তাদের জীবনের উদ্দেশ্য সুখী হওয়া। সত্যিকারের সুখ টাকা-পয়সা বা ধন-দৌলতে আসে না, —আত্মোপলব্ধির মাধ্যমেই আসে পরম সুখ ও শান্তি। তাই এরা এ পথ বেছে নিয়েছে।

মাতালা দ্বীপে (গ্রীস) থাকাকালীন আমি এই ধরণের উঠতি যুবক-যুবতীদের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হই। সেখানেই আমি প্রথম জানি যে, আমেরিকায় উঠতি যুবক-যুবতীরা অধিকাংশই হিপ্পি। পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে বাউণ্ডুলে হওয়া এদের একটা স্বভাব বলা যায়। খাঁটি আমেরিকান ভাষায় যাকে বলে ড্রপ আউট (Drop out)। এই ড্রপ আউটের সময়ই অধিকাংশ আমেরিকানরা হয় ছন্নছাড়া বাউণ্ডুলে বা হিপ্পি। তাবে হিপ্পি হয়ে এরা বেশিদিন থাকে না, বেছে নেয় কোন একটা পথ ভবিষ্যতের জন্য। সবাই অবশ্য পথ বেছে নিতে পারে না, পথ বেছে নিতে কারও কারও দশ বছর কেটে যায়। মরুভিয়া বা কেশব পথ বেছে নিয়েছে, কেশবের বয়স সাতাশ বছর আর মরুভিয়া একুশ।

আমি মালপত্র নামিয়ে ওখানে ঠিক হয়ে বসলাম। মনের মধ্যে সব সময়ই একটা কথা ঘুরপাক খেতে লাগলো, অনেকক্ষণ ধরে নিজের মনেই ভাবতে লাগলাম ব্যাপারটা কি? পরিব্রাজকের ভাগ্যে না চাইতেই জল সব সময় পাওয়া যায় না। অথচ এখানে শুধু জলপানী নয়, দিব্বি এয়ারকনডিশনের ঘর আর তাও একেবারে ওয়াশিংটনের বুকে। "সবই তাঁর ইচ্ছা" জানি— তবুও জানতে ইচ্ছে হচ্ছে কি করে ও কোন পথে আমার কথা কেশবদের কানে পৌঁছালো। উৎকণ্ঠাকে সংযত করতে না পেরে কেশবকে জিজ্ঞাসা করলাম,

—আচ্ছা কেশব, কিছু মনে করোনা যেন,— আমার জানতে ইচ্ছে হচ্ছে যে কি করে তুমি সরাসরি আমাকে এখানে আনার কথা ভাবলে?

—আমি নই, আমরা। হ্যাঁ, আমারা সবাই মিলে কয়েকদিন যাবৎ আপনার কথা ভাবছি, শেষে আমাদের সকলের ইচ্ছে অনুযায়ীই আজ আপনি এখানে...কেশব হেসে জবাব দিলে।

—তার মানে কেশব তুমি বলতে চাইছো যে, তোমাদের ইচ্ছাশক্তির বলেই আমার এখানে আগমন?

—অবশ্যই বিমলজী। আমাদের মধ্যে অনেকেই বিভিন্ন জায়গায় আপনার বক্তৃতা শুনেছে অথবা আপনার কথা শুনেছে। আর খবরেব কাগজে পড়েছি যে, আপনি আমাদের মানে আমেরিকানদের সঙ্গে থাকতে চান...কাজেই বুজতে পারছেন?

—অবশ্যই। আমি জবাব দিলাম। —জানো কেশব, আমরা সব সময় তাঁকে অর্থাৎ পরমেশ্বরকে স্মরণে রাখি না বটে কিন্তু মাঝে মাঝে অতি সাধারণ আশ্রয় চাইলেও তিনি আমাদের মহাশ্রয় জুটিয়ে দেন। সত্যি তিনি করুণানিধি করুণাময়। এই বলে তাঁর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালাম।

হঠাৎ, টেলিফোনটা বেজে উঠলো। কেশব উঠে গিয়ে টেলিফোন ধরলো, কিছুক্ষণ কথাবার্তর পর কেশব আমাকে জানালো, রুবী আমার সাথে কথা বলতে চাইছে। আমি অবাক হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম,

—রুবী! সে আবার কে— আমার ঠিক মনে পড়ছে না তো?

—রুবী। মানে আমাদের রুবী ব্লু (Mrs. Ruby Blue)। যান না গিয়ে আলাপ করুন, বুঝবেন।

আমি তাড়াতাড়ি টেলিফোনটা তুলে নিলাম।

—হ্যালো, আমি বিমল বলছি।

—বিমলজী? ভালো। আমাদের সোসাইটির তরফ থেকে আপনাকে স্বাগতম্ জানাচ্ছি।

—ধন্যবাদ রুবী।

—হ্যাঁ শুনুন, আপনি কিন্তু এখানেই থাকবেন অর্থাৎ সোসাইটিতে থাকার অসুবিধা হবে না, মরুভিয়া আপনার জন্য রান্না করবে আর কেশব তো রয়েছেই, আপনার যাবতীয় প্রয়োজনে ওকে বলবেন।

রুবী ব্লুকে ধন্যবাদ দিয়ে আমি টেলিফোন ছাড়লাম। কেশবকে জিজ্ঞসা করলাম— এই রুবী ব্লু ভদ্রমহিলাটি কে? জবাবে কেশব বললে— এই সোসাইটির প্রধান পৃষ্ঠপোষিকা।

যাইহোক, ঠাকুরের কৃপায় একটা বেশ ভালো ঠাঁই জুটে গেল, ভাবলাম বাঁচা গেল, ইয়ুথ হোস্টেলে আমি কাউকেই এখানে আসবার সময় বলে আসিনি, কাজেই আশা করি এখান আগন্তুকের ভীড় হবে না। অর্থাৎ এখন আমি সম্পূর্ণ স্বাধীন। দুপুরবেলা আলু ও ফুলকপি সেদ্ধ ও তার সাথে ঘি, গরম ভাত তৈরী হ'ল। খেতে বসে মরুভিয়াকে বললাম— তুমি ঠিক আমার মনের মতো রান্না করেছো।

—স্বামীজীও এই রকমই পছন্দ কবেন— জবাব দিল মরুভিয়া। আমি কথা-প্রসঙ্গে কেশব ও মরুভিয়াকে বললাম— যাই হোক আমি যখন তোমাদের সাথে এইখানেই থাকবো কাজেই তোমাদের কাজেরও কিছু অংশ নেব। আমাকে একেবারে বসিয়ে খাওয়ালে কুঁড়ে হয়ে যাবো।

মরুভিয়া হেসে জবাব দিল— সেইটাইতো স্বাভাবিক, তবে এ ব্যাপারে সে কেশব ও রুবীর সাথে কথা বলবে।

কেশব আমাকে সোসাইটি সম্পর্কে তথ্য জানালো—

এই সোসাইটিতে প্রতিদিন বিকেল বেলা ৭টা থেকে ৮-৩০ মিনিট পর্যন্ত হঠযোগের ক্লাশ হয়, তারপর আধঘন্টা সংকীর্তন, তারপর প্রসাদ বিতরণ। সব কিছু সাঙ্গ হতে প্রায় দশটা বেজে যায়। তবে ভক্তরা আরও ঘন্টাখানেক থাকে, কাজেই রোজই শুতে শুতে প্রায় বারোটা-একটা বেজে যায়।

অবশ্য তাতে আমার কিছু অসুবিধা নেই, আমার সব অভ্যাস আছে।

আমি, কেশব ও মরুভিয়া খাওয়া দাওয়া শেষ কবে বেরিয়ে পড়লাম, ওরা আমাকে শহরটা সম্পর্কে আরও তথ্য জানাবে। কেশব হাফ-প্যান্ট, চটী পায়ে ও একটা হাওয়াই সার্ট গায়ে, আমি আমার বহু তাপ্পি-মারা প্যান্টটা পরে নিলাম আর গায়ে চড়ালাম একটা হাওয়াই গেঞ্জি। মরুভিয়ার সেই একই পোষাক, ফুলপ্যান্ট ও পাঞ্জাবী গেরুয়া রঙের। খালি পা।

আমি কেশবকে ডেকে বললাম— তাহলে চল একটু মিউজিয়ামের দিকে যাওয়া যাক। মরুভিয়া বেঁকে বসলো— মিউজিয়াম দেখার চেয়ে চিড়িয়াখানা দেখা ভালো। মিউজিয়াম মানে তো সব মৃতদেহের কারখানা।

কিন্তু চিড়িয়াখানা অনেক দূরে, কাজেই আমরা ঘুরলাম জর্জ টাউনের দিকে। জর্জ টাউন ওয়াশিংটনের অন্যতম শহরতলী। কে (K) স্ট্রীটের কাছাকাছি এসে

আমরা বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে* রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে পড়লাম। খানিকক্ষণের মধ্যেই এক ভদ্রলোক তাঁর গাড়ী থামালেন, তিনিও জর্জ টাউনের দিকে যাচ্ছিলেন, কাজেই অসুবিধা হলো না। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের গাড়ীটা বড় একটা ব্রীজ পেরিয়ে থামলো। ভদ্রলোককে ধন্যবাদ দিয়ে আমরা নেমে পড়লাম। ছোট একটা রাস্তা ধরে আমরা একটা খালের কাছে এসে পৌঁছলাম। কেশব আমাকে বুঝিয়ে দিলে, এটা হচ্ছে এই শহরের বহু স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহাসিক ওহিও ক্যানেল (Ohio Canal) বা চলতি ভাষায় যাকে বলে কানাল।

কানালটার যত ঐতিহাসিক গুরুত্বই থাকুক না কেন, আমার কিন্তু তা দেখে মোটেই ভক্তি হলো না। এই কানালের সঙ্গে আমাদের কলকাতাব খালের তুলনা করা যেতে পারে। বিশেষ করে শ্যামবাজারের কাছে আর জি কর হাসপাতালের সামনে থেকে উল্টোডাঙ্গা যাবার পথে। দু'দিকের ছোটখাটো কারখানার যাবতীয় ময়লা এসে পড়েছে, দু'পাশে কয়েকজনকে নজরে পড়লো তার বড়শিতে মাছ ধরছে। খালের পাশে চলতে চলতে মাঝে মাঝে বিষ্ঠা ডিঙ্গোতে হচ্ছে— মনে মনে ভাবছি আমেরিকাতেও তাহলে পচা খাল আছে অথচ এরা বদনাম করে কলকাতার। কেশব আমার মনোভাবটা হয়তো বুঝে থাকবে, তাই সে আমায় আশ্বাস দিল,— ভাবছেন কি বিমলজী —এ কোথায় নিয়ে এলুম, তাই না? কিন্তু সবুর করুন, আরও খানিকক্ষণ এগিয়ে চলুন, দেখবেন এই কানালের স্বরূপ গেছে পাল্টে। আসলে এখানকার লোকেরা খালকে মর্যাদা দিতে জানে না।

সত্যিই তাই; প্রায় পনেরো মিনিট চলার পর খালের রূপ গেল পাল্টে। খালটা এখন অনেকটা নদীর মতো রূপ নিয়েছে আর তারই পাশ দিয়ে সুন্দব রাঙা মাটির পথ। এদের ভাষায় যাকে বলে Canal Towpath। এখানে গাড়ী চালানো নিষিদ্ধ। পায়ে হাঁটা অথবা সাইকেল— ব্যস্ তার বেশি নয়। এখন এই খালটাকে আমি বনগাঁর হরিদাসপুরের কাছাকাছি বয়ে যাওয়া ইছামতীর সঙ্গে তুলনা করতে পারি।

পুরনো চেস্‌পিক ও ওহিও কানালের (Old Ches peake and Ohio Canal) কথা অনেক শুনেছি— বর্তমানে অবশ্য এটা ভ্রমণ বা পদচারীর স্বর্গরাজ্য, কিন্তু ওয়াশিংটনের ইতিহাসে এর গুরুত্ব অনেক। এই খালের মূল উদ্দেশ্য ছিল ওয়াশিংটন ও মেরীল্যান্ড-এর সঙ্গে ওহিও ও মিসিসিপির যোগসাধন করা; জলপথে জিনিসপত্র সরবরাহের সুবিধার জন্যই এই পরিকল্পনা। এই খালের পরিকল্পনা যখন হয় তখন না ছিল ট্রেন, না ছিল গাড়ি। খালের পাশ দিয়ে এখন সেই পায়ে চলা রাস্তাটা এগিয়ে গেছে। সেই পথে আগে ক্রীতদাসরা বিরাট বিরাট বাণিজ্যতরীর গুণ টানতো।

খালের এদিকটা সত্যি সুন্দর, দু'পাশে ঘন জঙ্গল, মাঝে মাঝে ফুলের বাহার অথবা সাজানো বাংলো। মাঝে মাঝে কাঠের বাঁধ। আগে এই কাঠের বাঁধগুলো দরজার কাজ করতো অর্থাৎ প্রত্যেকটি নৌকোকে উপযুক্ত কর দিয়ে তবে ঢুকতে হত। কোন কোন দরজা অবশ্য জল নিয়ন্ত্রণ বা বাঁধের কাজ করতো।

হঠাৎ নজরে পড়লো একটা বিরাট যন্ত্রবিহীন বোট। বোটের ছাদে সারি সারি চেয়ারে বসে আছে প্রায় শ'খানেক লোক। দেখে মনে হলো ট্যুরিস্ট। কেশব আমাকে বুঝিয়ে দিলে যে, এটা ট্যুরিস্ট বোট। এর ইঞ্জিন নেই। কারণ ইঞ্জিনের তেলে জল নষ্ট হয় আর শব্দে নীরবতা ভাঙে, তাই এটাকে গুণ টেনে নেওয়া হচ্ছে। সত্যি তাই— গুণটানা বোট বটে—সুয়েজ খালের জাহাজের গুণ টানে মেসিনে, আমাদের দেশে মানুষে আর এখানে? গাধায়। হ্যাঁ আমাদের ঠিক সামনে দিয়ে দুটো গাধা এই বিরাট ট্যুরিস্ট বোটটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। অবশ্য একজন আমেরিকান গাধার পেছনে ছিপটি হাতে তাকে চালাচ্ছে। বোটের ওপর আরাম কেদারায় সরবতে চুমুক দিয়ে ভ্রমণ বিলাসীরা ভ্রমণের রস কুড়োচ্ছেন আর এদিকে গাধার দফা রফা! মরুভিয়া ও কেশবেব দিকে তাকিয়ে বললাম,

—ভাবতে পাবো? এই গাধার বদলে একদিন মানুষরা এই গুণ টানতো —আর ঠিক একই রাস্তা ধবে— তাই না? সত্যি ধন্য আব্রাহাম লিংকন— এইসব পরাধীন মানুষদের মুক্তিদাতা।

দেখতে দেখতে বেলা গড়িয়ে এলো, কাজেই আমরা ফেরার পথ ধবলাম। ভার্জিনিয়ার কাছাকাছি আমবা বড় রাস্তায় উঠে এলাম, সেখান থেকে অতি সহজেই পেয়ে গেলাম লিফ্ট।

সন্ধ্যের পর অর্থাৎ সাতটার পর সকলের সঙ্গে সোসাইটিতে ভীড় জমতে লাগলো। কেশব ও মরুভিয়া আমাকে পরিচয় করিয়ে দিতে লাগলো। ক্যারি—লেয়ন—গর্ডন—ম্যাক্স ইত্যাদি। নামগুলোর সঙ্গে ভাগ্যিস ইউরোপে থাকতেই পরিচিত ছিলাম, নয়তো এখানে হিমসিম খেতে হতো। বসবার ঘরটা দেখতে দেখতে ভরে গেল। সভ্য-সভ্যাদের মধ্যে অধিকাংশই হচ্ছে উঠতি বয়সের ছেলেমেয়ে, বয়স বলা যেতে পারে পনেরো থেকে আরম্ভ করে তিরিশের মধ্যে। কেউ কলেজ স্টুডেন্ট, কেউ সবে চাকরীতে ঢুকেছে আর অধিকাংশই বেকার। উঠতি বয়সের প্রায় সকলেরই পরনে জীন প্যান্ট— অবশ্য আজকাল ইউরোপ বা যুক্তরাষ্ট্রের এটা খুবই কমন ড্রেস। এখন গরমকাল, কাজেই গা ঢাকার প্রয়োজন খুব বেশি নেই। তবে আমার মতো বাঙ্গাল দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখতে গেলে বলবো যে মেয়েদের ওই অতি স্বল্পবাস যেন কেমন কেমন দেখায়। এদের মধ্যে অনেক মেয়েই এসেছে হাফ প্যান্ট ও সাধারণ গেঞ্জি গায়ে। রাস্তায় এমনভাবে চলুক সে আর এক কথা, তাতে কারও কিছু বলার নেই, সবাই স্বাধীন, কিন্তু এই ধর্মক্ষেত্রে, বিশেষ করে যোগ সোসাইটিতে উঠতি মেয়েদের এই স্বল্পাবাস ঠিক যেন ধর্ম-বিপরীত। এখানে একমাত্র আমি ছাড়া

অন্য কেউ এ ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছে বলে মনে হচ্ছে না, সবাই সহজ। কাজেই আশে-পাশে দেখে-শুনে আমিও সহজ হলাম। মনে মনে ভাবলাম— যাক্‌গে ছাই, এরা মানে মেয়েরা যেমন পোশাকেই আসুন না কেন, তাতে আমার কি? আর বিশেষ করে এটাতো আর জগন্নাথ মন্দির নয়। প্রবাসে ভারতীয় বেদান্ত সোসাইটি।

ঘরে বসে বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলাপ চলছে— যেন বৈঠকখানা। প্রসঙ্গের মধ্যে রয়েছে— খাদ্য ও তার রাসায়নিক প্রভাব; রাস্তার পল্যুশন; সঙ্গীত প্রসঙ্গ আর তার সঙ্গে রয়েছে ড্রাগ প্রসঙ্গ। আমি ড্রাগ প্রসঙ্গকে ইচ্ছে করলে ওষুধ প্রসঙ্গ বলতে পারতাম, কিন্তু তা বললে ঠিক যেন ড্রাগ ব্যাপারটা পরিষ্কার বোঝায় না। আমাদের দেশে ওষুধ বলতে সাধারণতঃ অসুখের প্রতিরোধ হিসেবে যা ব্যবহার করা হয় তাকেই ড্রাগ বা ওষুধ বলে। কিন্তু এখানে এই ড্রাগ শব্দটা আরও ব্যাপক ও চলতি শব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এখানে ড্রাগ প্রসঙ্গ বলতে বোঝায়— যে সব রাসায়নিক দ্রব্য দৈনন্দিন জীবনে এরা ব্যবহার করে তার মধ্যে ধূমপান থেকে আরম্ভ করে মানসিক উত্তেজনা বা স্থিরতাব জন্য ইনজেক্‌সন পর্যন্ত যাবতীয় পদার্থ। এদের এই বিভিন্ন প্রসঙ্গ সত্যি শিক্ষণীয় বলা যায়। এদের কথাবার্তার মধ্যে লক্ষ্য করলাম যে, প্রত্যেকেরই স্ব-স্ব বিষয়ে বেশ ভালো জ্ঞান আছে অর্থাৎ নেহাৎই কথার কথা বা বাজে কথা নয়।

হঠাৎ দরজাব কাছে ছোটখাটো একজন ভদ্রমহিলার আগমন হতেই সবাই রুবী রুবী বলে চেঁচিয়ে উঠলো। অর্থাৎ রুবীর আগমন। মরুভিয়া আমার কাছে এসে বললো— বিমলজি— এই হচ্ছে আমাদের রুবী, আর রুবীর দিকে চেয়ে আমাকে দেখিয়ে বললো—বিমলজি।

আমি হাতজোড় করে রুবীকে শুদ্ধ বাংলায় নমস্কার করে বললাম— আপনার কণ্ঠস্বর সকালেই পেয়েছি, এখন আপনার দর্শনে প্রীত হলাম।

রুবী আমার কথায় কান না দিয়ে সরাসরি সাষ্টাঙ্গ হয়ে পড়লো —ঠিক যেমন সকালবেলা মরুভিয়া আমায় প্রণাম করেছিল।

পঞ্চাশোর্ধ এই ভদ্রমহিলার এই প্রণামে আমি সত্যি খানিকক্ষণের জন্য বোকা হয়ে গেলাম, তবে খুব শীগগীরই নিজেকে সামলে নিয়ে আমিও তাঁর সামনে গড় হয়ে পড়লাম। যদিও খাঁটী আমেরিকান কিন্তু মাতৃতুল্য, আমারই আগে পড়া উচিত ছিল। কিন্তু যাই হোক, বৈষ্ণব বিনয়ে তিনিই জয়ী হলেন। ঘরভর্তি প্রায় চল্লিশজন লোক অবাক হয়ে আমাদের লক্ষ্য করতে লাগলো। রুবীর সাথে পরিচিত হলাম। অন্যান্য সবাই তাকে সরাসরি রুবী নামেই ডাকে তবে আমি আমেরিকান নই, নিতান্তই আমেরিকার মাটিতে এক ভারতীয়। আমেরিকায় একমাত্র বাবা-মা ও ঠাকুর্দা-ঠাকুমা ছাড়া সবাই সবাইকে নাম ধরে ডাকে— এমন কি নামের আগে মিস্টার পর্যন্ত নেই। যাই হোক আমি রুবীকে, রুবীদেবী বলে সম্বোধন করতে লাগলাম।

রুবীদেবী প্রায় দশবছর যাবৎ হঠযোগ চর্চা করছেন। ওনার গুরু স্বামী বিষ্ণু; অবশ্য সকলের মতে রুবীদেবীকে স্বামীজির শিষ্যা না বলে সহকর্মী বলা যায়। এই ওয়াশিংটনে হঠযোগী মহলে রুবীর দান অনেক। অবশ্য মরুভিয়ার মতে এ ধরনের ভারত-দরদীর অভাব কি? অবশ্য ভারত-দরদী বলতে, ভারতীয় দর্শনপ্রেমিক।

কেশব এবার সবাইকে ডাকলো, ক্লাশের সময় হয়েছে। ছেলেমেয়েরা সবাই উঠে গেল যে যার ড্রেস করতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সবাই প্রস্তুত। ছেলেরা খালিগায়ে হাফ প্যান্ট পরা আর মেয়েরা লিওটার্ড (Leotard) পরনে অর্থাৎ জাঙ্গিয়া ও গেঞ্জি, জিমনাস্টিকের ড্রেস। রুবীদেবী আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন হলঘরে কেশবকে সাহায্য করার জন্য। সমবেত ব্যায়াম শুরু হলো; সূর্য নমস্কারের থেকে শুরু হলো ব্যায়াম। রেকর্ডে খুব আস্তে সেতারেব সুর বাজছে আর তার সঙ্গে সঙ্গে কেশবের গলার স্বর ভেসে আসছে, এক-দুই তি-ই-ন্, এবার আস্তের ওপর মাথার ওপর দিয়ে দু'পা শূন্যে তুলে পিছনের দিকে ফেলো, হ্যাঁ চা-র, পাঁচ... এখানে বিভিন্ন ধরনের আসন শিক্ষা দেওয়া হয়, তারমধ্যে প্রধানতঃ সূর্য নমস্কার, শিরসাসন, পদ্মাসন, ভূজঙ্গাসন, হলাসন, বিপরীত করণীমুদ্রা, বক্রাসন ও সহজাসন। যারা এর বেশি শিখতে উৎসুক তাদের জন্য রয়েছে সামার ক্যাম্পের ব্যবস্থা অথবা স্বামী বিষ্ণুদেবানন্দজীর আশ্রম— কানাডায়।

প্রায় দেড়ঘণ্টা পর ক্লাস থামলো। রুবীর কাছ থেকে জানলাম যে যারা আসছে তাদের মধ্যে অধিকাংশই আসে শরীরচর্চা বা ব্যায়ামের জন্য, আর খুবই সামান্য সংখ্যা যারা সত্যিকারের ভারতীয় দর্শনে উৎসুক। প্রায় দশটা নাগাদ, পনেরো মিনিটের নীরবতার পর সেদিনকার সভা সাঙ্গ হল। একে একে সবাই বিদায় জানাতে লাগলো—একদম শেষে রুবীদেবী। কেশব ও মরুভিয়াকে বিশেষ ভাবে বলে গেলেন আমার যত্ন নিতে ও কোনো রকম অসুবিধা হলেই তাঁকে যেন জানানো হয়। আমিও তাঁকে আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে সেদিনকার মতো বিদায় জানালাম।

পরের দিন প্রায় ভোরে মরুভিয়া ও কেশবের কণ্ঠস্বরে ঘুম ভাঙলো। ভোরবেলা রামনামে ঘুম ভাঙা— বিশেষ করে এই আমেরিকার মাটিতে আমি কল্পনাও করতে পারি না— সত্যি এ যেন সরাসরি কাশীতে এসে পৌঁছেছি। যাইহোক, আমিও কম্বল গুটিয়ে ওদের সাথে রামনামে যোগ দিলাম। করতাল, খঞ্জনী ও চিম্‌টে ঘণ্টার সংগমে রামের গুণগান শুরু হলো। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি ভোর প্রায় সাড়ে চারটা। আধঘণ্টা সংকীর্তনের পর কেশব ও মরুভিয়ার সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম বড় মাঠের দিকে— সেখানে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে চলবে সূর্যপ্রণাম ও সূর্য নমস্কারের ব্যায়াম।

কেশব খালি গায়ে হাফ প্যান্ট পরনে, আর আমার পিছনে তাপ্পি মারা প্যান্টের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো হাইয়াই সার্ট, —মরুভিয়ার পরনে ফুলপ্যান্ট ও পাঞ্জাবী। আমরা

মনুমেন্টের কাছে এসে থামলাম। সাজানো চেরী গাছের পাশে এসে কেশব শতরঞ্চি পাতলো— উদ্দেশ্য প্রাতঃব্যায়াম ও ধ্যান করা। আমরা প্রস্তুত হয়ে শুরু করলাম প্রার্থনা—'ওম্ সূরিয়ম্ সুন্দরলোকনাথম্ অমৃতম্ বেদান্তসারং শিবম্.....' —তারপর শুরু হলো সূর্য নমস্কারের ব্যায়াম। মুঙ্গেরের যোগাশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী সত্যানন্দজীর দৌলতে আমার এ ব্যায়ামগুলো জানা ছিল, কাজেই খুব বেগ পেতে হলো না, তবে অনভ্যাসের ফলে বিদ্যা হ্রাস। কেশব সত্যি চমৎকার, ওর দেহটা যেন এর জন্য তৈরি। বিভিন্ন আসনের পর শুরু হলো প্রাণায়াম। প্রাণায়ামে মরুভিয়া খুব ওস্তাদ— আমার কথা ছেড়েই দিলাম, কারণ কপালভাতি করতে গেলে আমার কপাল ধরে, তবে এদের পাল্লায় পড়ে আমাকে তাও করতে হল। এদিকে সূর্যোদয় হলো। কেশব ও মরুভিয়া উভয়েরই ইচ্ছা ধ্যানে বসে। তাদের ইচ্ছা আমাকে জানাতেই আমি অবাক হয়ে গেলাম—বল কি কেশব! এই প্রকাশ্য মাঠে বসে ধ্যান!

আমাদের যোগাসন দেখবার জন্য ইতিমধ্যেই আগন্তুকের সমাবেশ হয়েছে। অনেকেই ভোরবেলা দৌড়তে বা কুকুর নিয়ে পায়চারি করতে এই মাঠে আসে, তাদের মধ্যে অনেকেই আমাদের দেহভঙ্গির রূপ দেখতে এখানে জড়ো হয়েছে। তাদের দিকে তাকিয়ে আমি মরুভিয়াকে বললাম— চারপাশের এই ভীড়ের মধ্যে আমি ধ্যানে বসতে রাজি নই— আমাদের ধর্মটা দেখাবার জন্য নয়, সেটা নিতান্তই ব্যক্তিগত—সেটা একান্তই আত্মিক। মরুভিয়া আমার জবাবে দৃঢ়স্বরে বললো— ভালো কথা, তারই জন্য বলছি এই মুক্তাকাশে ভোরের দক্ষিণ বাতাসে ধ্যান করা ভালো,— আশপাশের লোকে দেখে কি ভাববে বা তারা কি মনে করবে, তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। মরুভিয়ার জবাবে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম— সত্যি কথা, ঠাকুর বলেছেন—'লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, তিন থাকতে নয়রে— তিন থাকতে নয়।' আমি আমার মধ্যে এই তিনের প্রভাব এতক্ষণে প্রবলভাবে অনুভব করলাম। কেশব ও মরুভিয়াকে আমার দুর্বলতা জানালাম না; তাদের দেখাদেখি আমাকে ধ্যানে বসতেই হলো। মরুভিয়া সুখাসনে, কেশব পদ্মাসনে ও আমি সিদ্ধাসনে বসে চোখ বুজলাম।

চোখ বুজলাম বটে কিন্তু আমার সামনের সেই জনতার দৃশ্য আমার চোখে ভেসে রইল। চোখ বুজেই দেখতে লাগলাম আমার সামনের আগন্তুকেরা আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসাহাসি করছে আর তাদের সেই ফিস্‌ফিস্ কথাগুলো পর্যন্ত কানে আসছে— মনে হতে লাগলো চারপাশে যেন আরো লোক জড়ো হতে চলেছে। তাদের পায়ের শব্দ আমাকে বিচলিত করে তুললো। আমি নীরব থাকতে না পেরে চোখ খুললাম; আশ্চর্য বটে, আশপাশে তাকিয়ে দেখি কেউ নেই, একমাত্র আমার বাঁদিকে কেশব ও ডানদিকে মরুভিয়া ধ্যানে মগ্ন। সত্যি কি অপদার্থ আমি, পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে কি দারুণভাবে জড়িত; বুঝলাম আমার লোকভয় আসলে বাইরের লোক থেকে নয়, এ আমার অন্তরসৃষ্ট, আর এইভাবে নিজেই নিজের বিরক্তির কারণ। আমি ভারতীয়, ধ্যান আমাদের ভারতের ধন, অথচ কি লজ্জার বিষয়, ভারতীয় হয়েও

আমি ধ্যানে মন দিতে পারছি না অথচ ওদিকে কেশব ও মরুভিয়া খাঁটি আমেরিকান হলেও ঠিক যেন ভারতের যোগী। স্বামীজীর কথা মনে পড়ে গেল— তিনি বলেছিলেন, —'মন যদি প্রস্তুত থাকে তাহলে ঘরে বাইরে এমন কি ফুটপাতে বসেও ধ্যান করা যায়'। আমি বুঝলাম আমার মন এখনও প্রস্তুত হয়নি। আমি আবার চোখ বুজলাম— আবার ঠাকুরের উপদেশ মনে পড়লো— 'অভ্যাস করলে সকলই সম্ভব।'

আমাদের ধ্যানভঙ্গ হলে আমরা আবার ফেরার পথ ধরলাম। অত্যধিক গরম— ঠিক যেমন গড়ের মাঠে গরমের সকাল। মাঠের ওপর দিয়ে খালি পায়ে হাঁটতে বেশ মজা— এতে আমার পাড়ার কথা মনে করিয়ে দেয়।

—অত্যধিক গরম— এই বলে মরুভিয়াও তার গেরুয়া পাঞ্জাবী খুলে ফেললো, তার ভেতরে ছিল হাত কাটা স্যান্ডো গেঞ্জি। পূর্ণবয়স্কা যুবতীর বুকের ওপরে ছেলেদের স্যান্ডো গেঞ্জি, মানে কোনো রকমে মানরক্ষার ব্যাপার। ওর সঙ্গে হাঁটতেও যেন আমার লজ্জা করতে লাগলো। আমি কিছুক্ষণ চলার পর সরাসরি মরুভিয়াকে বলে ফেললাম—দেখো মরুভিয়া— এখানে মানে এই প্রকাশ্য দিবালোকে ওরকম স্বল্পাবাসে চললে লোকে কি মনে করে বলোতো?

মরুভিয়া হেসে ফেললো। আমার দিকে তাকিয়ে বললো— ওঃ তুমি আমার এই বুকের জন্য বলছো— আমি তাঁতে কিছু মনে করি না। আর লোকে আমাকে দেখে কি মনে করবে তাতে তোমার মাথা ব্যথা কেন— লোকেদের চিন্তা লোকেদের ওপরই ছেড়ে দাও। জবাব শুনে আমি নীরব হয়ে গেলাম। বুঝলাম এদের সাথে চলতে গেলে আরও প্রস্তুত হতে হবে।

এরা অবশ্য রোজ সকালে মাঠে যায় না, তবে মাঝে মাঝে সঙ্গী পেলে প্রাতঃভ্রমণের সাথে সাথে প্রার্থনা ও যোগাসনটাও সেরে আসে। আমাদের ডেরায় ফিরে এলাম। কলা, দুধ ও আপেলের সাথে মধু মিশিয়ে মরুভিয়া ব্রেকফাস্ট তৈরি করলো। উত্তম ব্যবস্থা।

খেতে খেতে আমি ডায়রীটা খুললাম, এইরে! গতকাল বিকেলে আমার মেয়রের অফিসে যাবার কথা ছিল। মিঃ স্যুলার প্রেসিডেন্ট নিকসনের সাথে দেখা করবার একটা বন্দোবস্ত করবেন বলেছিলেন, তাঁকে একটা টেলিফোন করা দরকার। তাঁর সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করে বেরিয়ে পড়লাম।

ওখান থেকে ডিস্ট্রিক্ট বিল্ডিং কাছেই; কাজেই হেঁটে চলে এলাম। হলের সিংহ-দরজায় আসতেই আমাদের সেই পূর্বপরিচিত নিগ্রো প্রহরী হি-হি করে হেসে আমাকে ওয়েলকাম জানালেন। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে বললেন— চলুক একটা। আমিও আমার পকেট থেকে একটা চকোলেট বার করে তার দিকে বাড়িয়ে ধরলাম— আমার সিগারেট চলে না, ধন্যবাদ। আমি ভেতরে চলে এলাম। স্যুলার সাহেব প্রস্তুতই ছিলেন, আমি পৌঁছতেই তিনি আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন মিসেস

এরেকার সাথে। মিসেস এরেকা হচ্ছেন এই District Building-এর পি-আর-ও অর্থাৎ পাবলিক রিলেসনস্ অফিসার। এরেকার সাথে করমর্দন করতেই উনি মিঃ স্যুলারকে বললেন—ওঃ, আমাকে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে না, আমি বিমলকে চিনি।

—আমাকে চেনেন? অবাক হয়ে আমি প্রশ্ন করলাম।

—নিশ্চয়ই, মনে নেই ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটির টি-পার্টিতে সেদিন আমিও ছিলাম।

—ওঃ তাই নাকি? কিছু মনে করবেন না যেন— আমার স্মৃতিশক্তি খুব প্রখর নয়।

মিসেস এরেকা বুদ্ধিমতী ও চট্‌পটে। তিনি আমার সামনেই হোয়াইট হাউসে টেলিফোন করে প্রেসিডেন্টের সাথে আমার একটা ইনটারভিউর বন্দোবস্ত কবে ফেললেন। সেখানে আরও কিছুক্ষণ থেকে তারপর বেরিয়ে পড়লাম। এবার একটু ইন্ডিয়া হাউসে যাওয়া দরকার। আমি তাদেব কথা দিয়েছিলাম যে—ওয়াশিংটনে থাকাকালীন তাদের সাথে যোগাযোগ রাখবো।

আমি ওখান থেকে বেরিয়ে হোয়াইট হাউসের পাশের বাস্তা ধরে এগিযে এসে পড়লাম তের নং রাস্তায়। সেখান থেকে ওপরের দিকে হাঁটতে লাগলাম। কিছুদূর আসতেই রাস্তার দুধারে নজরে পড়লো কাফেটারিয়া, বার, কফি হাউস ও সস্তাদরের সিনেমা হল, তা ছাড়াও রয়েছে প্রচুর পর্ণোগ্রাফির দোকান। কযেকটা দোকানে শুধু যে ছবি বিক্রি হয় তাই নয়, ছোট ছোট সেক্‌সুয়াল মুভি শো দেখানো হচ্ছে, আর পর্ণোগ্রাফির ফিল্‌ম বিক্রি হচ্ছে, অনেকটা নিউইয়র্ক শহরে যেমন দেখেছিলাম। আমি রাস্তার ফুটপাত ধরে আরও এগিয়ে এসে এবার পড়লাম ম্যাসাচ্যুসেট্‌স্ এভেন্যুতে—এ রাস্তা ধরে বাঁ দিকে গেলেই পাবো ইন্ডিয়ান এমবাসী। বাস্তাটাব দুপাশে বিরাট বিরাট গাছ আর বিভিন্ন দূতাবাস ভবন, আরও এগিয়ে এসে পড়লাম দু'পঁ (Dupont) সারকেলে। বিরাট গোলপার্ক— এই পার্কটা এর আগেও কয়েকবাব পেরিয়েছি, কিন্তু হাঁটাপথে এই প্রথম। জেনারেল দু'পঁ এখানে বিপ্লবের সময় এসেছিলেন আর তাঁরই সহায়তায় আমেরিকানরা ব্রিটিশ আধিপত্যের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে— তাঁরই স্মৃতির প্রতীক এই বিরাট গোলপার্ক। মাঝখানে বীর দু'পঁ'র ঘোড়ার পিঠে চড়া বিরাট ব্রোঞ্জের মূর্তি। আমি এই গোলপার্কে পৌঁছতেই দেখি ছোটখাটো একটা দল গীটারের সঙ্গে তাল রেখে কোমর দুলিয়ে নাচছে। এদের মধ্যে অধিকাংশই কদম-চুল নিগ্রো আমেরিকান আর লম্বা চুল সাদা আমেরিকান। আমি আরও এগিয়ে এসে তাদের নাচ দেখতে লাগলাম— নাচের থেকে ঝংকার বেশি। নাচতে নাচতে একটা ছেলে আমার দিকে এগিয়ে এল, আমাকে জিজ্ঞেস করলো—ভালো লাগছে? —অবশ্যই, উত্তর দিলাম। তাহলে একটা ডাইম* ছাড়ো। আমি সঙ্গে সঙ্গে প্যান্টের

পকেটে হাত দিয়ে ছেঁড়া পকেটটাকে উল্টে দেখালাম পকেট ফাঁকা—ছেলেটা হো হো করে হেসে বলল—ইউ কিডিং? মানে, ঠাট্টা করছো? এই কিডিং কথাটাও আমেরিকার একটা বহুল প্রচারিত চলতি শব্দ, অনেকটা আমাদের ভাষায়— কেন বাবা গ্যাস ছাড়ছো!

পরে অবশ্য জেনেছি যে এই দু'পঁ সারকেলটা বেকার ও বাউন্ডুলেদের আড্ডাখানা। কারও যদি কিছু করবার না থাকে তাহলে চলে এসো এখানে, ইচ্ছে মতো গান গাও, ঢোল বাজাও, নাচো, গল্প করো অথবা মেয়েদের উরুর বাহ্বা করো অথবা চিৎপটাং হয়ে ঘাসেব উপব শুয়ে চলতি মেঘ দেখো, জনতা বা পুলিশ কেউ বাধা দেবে না— অবশ্য সেই কারণে এই সারকেলটার দুর্নামও অনেক।

আমি সারকেলটা পেরিযে চলে এলাম এম্বাসীতে। ঢুকতেই বিসেপ্‌সনিস্ট পদ্মিনীদেবী বলে উঠলেন— সে কি, আপনি এখনও এখানে আছেন, আর এই দেখুন এদিকে আপনাকে সবাই খোঁজাখুঁজি করছে।

—বোঝেনই তো বাউন্ডুলে মানুষ, আজ এখানে কাল ওখানে, এই তো আমার জীবন— আমি হেসে জবাব দিলাম।

সেখান থেকে আমি এলাম ডক্টর মিসেস থায়রানীর অফিসে; তাঁকে জানালাম প্রেসিডেন্ট নিক্‌সনেব সাথে আমাব এপয়েন্টমেন্টেব কথা। তিনি আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন।

—তা'হলে তো একটা বিরাট কাজ করে ফেলেছেন। যাই হোক আমরা কিন্তু সেদিন প্রেস মিটেব একটা বন্দোবস্ত করবো—দেখবেন সে বিবাট ব্যাপাব।

—না, বক্ষে করুন, প্রেস এখানে আর নয়, আমার যা প্রচাব হযেছে আমার মতো এক ভবঘুরেকে ব্যস্ত বাখবাব পক্ষে তাই যথেষ্ট, আর নয়! সত্যি আপনি বিশ্বাস করুন, এপয়েন্টমেন্ট বাখতে রাখতে প্রাণ গেল, মনের আনন্দে হাসবার সময়টুকু পর্যন্ত পাই না।

আমি মিসেস থায়রানীকে বিশেষ অনুরোধ করলাম আমার এই খবরটা যতদূর সম্ভব গোপন রাখতে।

তিনি যদিও হতাশ হলেন কিন্তু আমার অবস্থা বিবেচনা করে কথা দিলেন যে প্রেসকে একথা তিনি জানাবেন না। পরে তিনি আমাকে সেদিন তাঁর সাথে খাবার জন্য অনুরোধ জানালেন। নীচের তলায় ক্যান্টিন, তাঁর সাথে এলাম সেখানে। আমাদের টেবিলের চারপাশে সবাই চেয়াব টেনে আনলেন—তারপর শুরু হ'ল কথাবার্তা। বহু জনের বহু প্রশ্ন— আমিও যথাসাধ্য তাদের জবাব দিতে লাগলাম। ডঃ থায়রানী আমাকে ব্যস্ত দেখে বললেন— সত্যি আমি বুঝতে পারিনি যে এখানেও আপনাকে চারদিক থেকে জ্বালাবে।

—না না—মিসেস থায়রানী, এর জন্য কিছু মনে করবেন না, এ তো আমার আনন্দ। আর বিদেশে একসাথে এত ভারতীয় পাওয়া সব সময় আমার ভাগ্যে হয়ে ওঠে না।

খেতে খেতে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ জমে উঠল। পাশ থেকে একজন ভদ্রলোক আমাকে আলতোভাবে ছুঁয়ে বললেন,— কিছু মনে করবেন না তো, একটা কথা বলবো— মানে আপনি যদি কিছু মনে না করেন।

—না না, বলুন। আমি বিনয়ী হয়ে তাঁকে আশ্বাস দিলাম। ভদ্রলোক তাঁর টাই-এর নটটা সামলে বললেন—আপনাকে আমি সব সময়ই ওই ছেঁড়া প্যান্টে দেখতে পাচ্ছি। আমি সঙ্গে সঙ্গে আপত্তি জানালাম—ছেঁড়া প্যান্ট নয় মশায় দিব্বি তাপ্পি মারা। সবাই আমার রসিকতায় হো-হো করে হেসে উঠল। একজন তো প্রায় বিষম খাবার জোগাড়!

—যাই হোক কি বলছিলেন যেন। ভদ্রলোক আর বললেন না, ওখানেই থেমে গেলেন। দেখতে দেখতে দেড়টা বেজে গেল। মিসেস থায়বানী আমাকে বিদায় জানিয়ে অফিসে উঠে গেলেন, আমিও তাঁকে ধন্যবাদ দিলাম তাঁর আতিথেয়তার জন্য। তিনি আমাকে বললেন—না না, আমাকে ধন্যবাদ দেবেন না— আপনার ডিসের জন্য আমাকে পয়সা দিতে হয়নি, ক্যান্টিন ম্যানেজাব আপনার জন্য বিনা পয়সায় ছেড়েছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে উঠে গিয়ে ক্যান্টিন ম্যানেজারকে ধন্যবাদ দিলাম।

খাওয়া শেষে ক্যান্টিন ছাড়লাম। সিঁড়ির মুখেই দেখলাম সেই পূর্ব-পবিচিত ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে। আমাকে তিনি তাঁর অফিসে ডেকে নিয়ে গেলেন। সেখানে এককথা দু'কথার পর আবার সেই পূর্বকথায় ফিরে এলেন ভদ্রলোক — সেই আগের মতোই ভূমিকা করে বললেন—

—দেখুন স্যার, এই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে আপনার মতো লোকের ছেঁড়া প্যান্ট পরে রাস্তায় ঘোরা মানে ভারতের বদনাম।

—তাই নাকি? তার মানে আমিই এখানে ভারতের বদনাম করছি?

—না ঠিক তা নয়, তবে.. ভদ্রলোক আমতা আমতা করলেন।

—তবে কি?

—এরা মনে করে আমরা গরীব।

—কথাটা কি সত্যি নয়? ভারত গরীব সে কথা কে না জানে, নতুন করে সে কথাটা না বললেও চলে।

—না, তবে আপনার মতো একজন নামকরা লোক...

—দেখুন আমি গরীব দেশের ছেলে— আমি দু'তিন বছর ধরে রাস্তায় মানুষ, ভবঘুরে। আমার পোষাক আমার পরিচয় নয়, আমি ভারতীয়, আমার আচার-ব্যবহারই আমার পরিচয়। তবে হ্যাঁ, আপনার সাথে আমি একমত, সময়ে সময়ে একটু ভালো ও পরিষ্কার পোষাক প্রয়োজন বইকি। কিন্তু মাপ করবেন আমাকে —আমি আপনাদের মতো প্লেনে আসিনি বা পরিচর্যার জন্য গিন্নীও সঙ্গে আনিনি। সোজা কথায় আমি ফুটপাতের মানুষ।

—তবে হ্যাঁ, আমার পোষাকের জন্য যদি কোন ভারতীয়কে লজ্জায় পড়তে হয় তার জন্য আমি সত্যি দুঃখিত। হ্যাঁ, আপনি যদি রাস্তায় চোখ খুলে চলেন—তাহলে দেখবেন যে, এদেশে, হ্যাঁ এই যুক্তরাষ্ট্রে, রাস্তায় ছেঁড়া প্যান্টের বহর আমাদের দেশ থেকে অনেক অনেক বেশি। তবে বদনাম শুধু আমাদের দেশের, তার কারণ আমরা গরীব। যাই হোক এই ছেঁড়া প্যান্ট আমাকে দেশ থেকে এতদূরে আনিয়েছে, অনেক গণ্যমান্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তির সান্নিধ্যে এনেছে, কাজেই একে ছাড়তে আমি রাজি নই, তবে হ্যাঁ, এই ছেঁড়া প্যান্ট যদি কোনোদিন আমাকে ছাড়ে, তাহলে আমি কি করতে পারি বলুন?

ভদ্রলোক তাঁর চেয়ারটাকে পেছনের দু'পায়ার উপর ভর দিয়ে নড়ে চড়ে বসলেন; শেষে অতি বিনয়ের সঙ্গে বললেন— আপনি কথাটাকে একেবারে সিরিয়াস ধরে নিলেন দেখছি— আমি কিন্তু আপনাকে কোনো আঘাত দেবার জন্য বা পার্সোনালি বলিনি।

—না না, সেটা বড় কথা নয়—তবে আপনার কথার একটা জবাব নিশ্চয়ই আশা করেন, তাই নয় কি? হ্যাঁ, যাই হোক, আমাকে এবার উঠতে হচ্ছে।—ভদ্রলোককে নমস্কার জানিয়ে তাঁব দিকে আমার ছেঁড়া প্যান্টের তাপ্পি দেখিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

মনে মনে ভাবলাম— হায় পোষাক! বিলেতে আসবার আগে আমাকে যদি বাক্স বোঝাই টাই, কোট কিনতে হতো, তাহলে আমার কোনোদিনই বাইরে বেড়ানো সম্ভব হতো না। যারা দামী পোষাক পরে দুনিয়া দেখে তাদের দেখা আর আমার দেখা সম্পূর্ণ পৃথক।

এম্বাসী থেকে বেবিয়ে ভাবলাম একটু ইউথ হোস্টেলের দিকে যাওয়া যাক, কারণ হোস্টেলটা এখান থেকে কাছেই, তা ছাড়া ওই ঠিকানায় চিঠিপত্র আসাও সম্ভব। হোস্টেলে পৌঁছতেই ওয়ার্ডেন সাহেব আমার নামে চিঠিপত্রগুলো এনে দিলেন। আত্মীয়স্বজনের কয়েকটা চিঠি আর অধিকাংশই আশ-পাশ থেকে আমন্ত্রণপত্র। তার মধ্যে একটা ভাঁজ করা কাগজের উপর বাংলায় আমার নামটা নজরে পড়লো, তাড়াতাড়ি সেটাকেই আগে খুললাম— বাংলায় লেখা—

"বিমলবাবু, আপনার সাথে আমার দেখা করার বিশেষ দরকার, আপনি সরাসরি আমার সাথে দেখা করুন। আমি পাকিস্তান এম্বাসীতে কাজ করি—

ইতি

বদৌজ্জমান আহ্‌মেদ"

চিঠিটা পড়ে আমি তো অবাক! এই নামে পাকিস্তান এম্বাসীতে চেনা-পরিচিত কেউ আছে বলে তো মনে হচ্ছে না— তার উপর বিশেষ করে বাঙালী অর্থাৎ পূর্ববঙ্গীয়। দেখা যাক ভদ্রলোকটি কে! কৌতুহল দমন করতে না পেরে ওখান থেকেই সরাসরি টেলিফোন করলাম পাকিস্তান এম্বাসীতে। যোগাযোগ হল আহ্‌মেদের

সঙ্গে। আমার টেলিফোন পেয়ে ভদ্রলোক লাফিয়ে উঠলেন— আমি এক্ষুণি আসছি বিমলবাবু, আপনি আমার জন্য একটু অপেক্ষা করুন। আমি ভদ্রলোকের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

আধঘন্টা পর ইউথ হোস্টেলের দরজা দিয়ে এক ভদ্রলোক ঢুকতেই আমার মনে হ'ল তিনি স্বদেশী— আমি তাঁর দিকে এগিয়ে এসে বললাম— আপনিই কি...

—হ্যাঁ জনাব, বদৌজ্জমান আহ্‌মেদ, ভদ্রলোক আমার কথাটা লুফে নিয়ে বললেন।

ভদ্রলোক আমাকে প্রায় জোর করে তাঁর সাথে নিয়ে চললেন। রাস্তায় চলতে চলতে ভদ্রলোককে আমি জিজ্ঞাসা করলাম,

—আচ্ছা, আপনি আমার সাথে বিশেষ করে কোন প্রসঙ্গে আলাপ করতে চান?

—আরে সে সব কথা পরে হবে, এখন চলুন দোকান থেকে কিছু খাবার কেনা যাক।

—তারপর?

—তারপর বাড়ীতে বসে সব কথা হবে।

—বেশ ভালো, তা আপনিতো পাকিস্তানী, তাই না?

—হ্যাঁ, আমি চিটাগাঙের লোক মশায়।

—তা বেশ, এখানে বাড়ীতে আপনার স্ত্রী-পুত্র আছে তো?

—আরে মশায় পাগল নাকি? বিদেশে একমাত্র বোকারা বিয়ে করে আর চালাকেরা চরে খায়।

—ভদ্রলোকের কথা শুনে হাসি পেল। তাঁর মুখের দিকে তাকালাম। ভদ্রলোকের ঠিক মনের কথাটা জানতে ইচ্ছে হচ্ছে। ভদ্রলোক লম্বায় মাঝারিগোছের, কালোর উপর চকচকে গাল আর নাকের ডগায় যেন সিঁদুর মাখানো। কথায়-কথায় আমরা সেফ্‌ওয়েতে (Safeway) এসে পৌঁছালাম! সেফ্‌ওয়ে থেকে এখানকার ফল ও কয়েক বোতল বিয়ার কিনে নিলেন; আমরা বাইরে বেরিয়ে এলুম। এবার ভদ্রলোক তাঁর বাড়ীর পথ ধরলেন। দেখে শুনে মনে হয় না যে তাঁর মনে কোন দুরভিসন্ধি আছে, হয়তো নেহাৎ-ই আলাপের জন্য আমাকে তিনি পেতে চান। কিউ স্ট্রীটের ওপর পুরোনো আমলের একটা দোতলা বাড়ীর সামনে এসে ভদ্রলোক থামলেন। আশ-পাশে দেখে-শুনে মনে হয় এটা গরীব এরিয়া। বাড়ীর সামনে ঘাসের ওপর ছড়ানো কয়েকটা খালি মদের বোতল। থমকে দাঁড়ালাম— শেষবারের মতো আমি ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলাম,

—কিন্তু ব্যাপারটা কি, আমাকে আগে খুলে বলুন। আপনি ঠিক কোন প্রসঙ্গে আমার সাথে আলাপ করতে চান?

ভদ্রলোক আমার মনোভাব বুঝতে পেরে বললেন— ভয় পাবেন না মশায়— পাকিস্তানী* হলেও আমি বাঙালী।

তারপর ভদ্রলোক রেফারেন্সের জন্য এমন একজনের নাম করলেন যে, আমি তাঁকে বিশ্বাস করতে বাধ্য হ'লাম। ভদ্রলোকের সাথে বাড়ীর ভেতর ঢুকলাম। ভেতরে ঢুকতেই মাসী গোছের একজন নিগ্রো ভদ্রমহিলা— ভেতর থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন— কে?

—আহ্‌মেদ।

—ঠিক আছে।

আহ্‌মেদের সাথে আমি সিঁড়ি বেয়ে ওপবে উঠে এলাম। দোতলার একটা কোণের ঘবে এসে আহ্‌মেদ তালা খুললেন। ঘরের ভেতর ঢুকে দরজা বন্ধ করলেন। ঘরটা লম্বা চওড়াতে দশহাত বাই বারোহাত হবে, এক কোণে একটা ক্যাম্পখাট। একটা টেবিল চেয়ার আর চারপাশে বোঝাই করা বাংলা ইংরাজী খবরের কাগজ আর বিভিন্ন মাসিক পত্রিকা; তারই এক কোণে একটা রেফ্রিজারেটর, ইলেক্‌ট্রিক স্টোভ, টেপ রেকর্ডের সরঞ্জাম, গীটার ইত্যাদি। দেয়ালে টাঙানো কয়েকটা ক্যালেণ্ডার ও বিশেষ ভঙ্গিতে কয়েকটি মেয়ের ছবি। সোজা কথায় বলা চলে ব্যাচেলার'স ডেন।

—তাহলে বিয়ার খাওয়া যাক, কি বলেন?

—বিয়ার? —না না— চা আছে? একটু চা করুন।

ভদ্রলোক স্টোভের ওপর গরম জল চড়ালেন। তারপর গম্ভীর গলায় বললেন— এবার আপনাকে আমার পরিচয় দিই— আমার নাম জনাব বদৌজ্জমান আহ্‌মেদ, অথাব অফ 'ডলার অ্যাণ্ড দি ওয়ার্লড্'.

—কি বললেন, আপনি অথার, আপনি লেখক শুনে খুব আনন্দ হচ্ছে। তা ভালো, বইযার নাম বললেন ডলার এ্যাণ্ড দি ওয়ার্লড— বইয়ের বিষয়-বস্তুটা কি?

হ্যা আপনাকে আমি বলছি— ভদ্রলোক গলায় গাম্ভীর্য এনে বললেন— আমার ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

—হ্যাঁ, আমিও আপনার মতো ভূ-পর্যটক, হ্যাঁ সাইকেলে....

—তাই নাকি, আগে বলতে হয়। ভদ্রলোককে আমি জড়িয়ে ধরলাম।

আমার দু'জনে একই পথের পথিক, কাজেই অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের ঘনিষ্ঠতা জমে উঠল। দু'জনেরই মাতৃভাষা বাংলা, তার ফলে আমরা পরস্পরকে আরও কাছে পেলাম।

ভদ্রলোক আমার থেকে কম করেও দশ বছরের বড়, কিন্তু আমাদের সখ্যতা আপনি থেকে তুই-এ ঠেকল। বিয়ার ও চায়ের সঙ্গে আমাদের গল্প জমে উঠল। কথা প্রসঙ্গে আমি আহ্‌মেদকে জিজ্ঞেসা করলাম,

—আচ্ছা আহ্‌মেদ তোর ওয়ার্লড্‌ ট্যুর-এর আইটিনারি কি ছিল?

—আইটিনারি— সে দিয়ে কি হবে, আমি হচ্ছি অথার অফ দি ডলার অ্যাণ্ড দি ওয়ার্লর্ড। এই বলে আহ্‌মেদ অনেকদিনের পুরোনো একটা খবরের কাগজ থেকে তোলা ওর বিষয়ে লেখা একটা খবর আমাকে পড়তে দিল। খবরটা প্রকাশিত হয়েছে চট্টগ্রামের কোনো একটি সংবাদপত্রে। তাতে মোটামুটি ভাবে জানলাম—

"আহ্‌মেদ ইন্দোনেশিয়া ও সৌদি আরব সাইকেলে সফর করেছে এবং আরব সফরকালীন কায়রোতো প্রেসিডেন্ট নাসেরের সাথে ওর সাক্ষাৎকার হয়। শ্রীনাসের পুরস্কার স্বরূপ ওকে কিছু টাকা দেন ও অভিনন্দন জানান।"

— আর একটি খবরে প্রকাশ— "তিনি এখন আমেরিকায় পাকিস্তান এম্‌বাসীতে ভূ-পর্যটক হিসেবে পরিচিত— তাঁর সাইকেলটি ঢাকা মিউজিয়ামে রাখার পরিকল্পনা হচ্ছে।"

খবরের কাগজটা পড়ে আহ্‌মেদকে জিজ্ঞাসা করলাম—

—তুই তাহলে ইন্দোনেশিয়া ও উত্তর আফ্রিকা সফর করেছিস কিন্তু ইউরোপ বা আমেরিকায় নিশ্চয়ই সাইকেল সফর করিসনি— বিশেষ করে পাকিস্তান বা ভারতের যে ক'জন সাইকেল নিয়ে ভূ-পর্যটনে বেরিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে তোর নামটা কোনোদিন পাইনি। আহ্‌মেদ কথা ঘুরিয়ে আমাকে বললো— আরে আমি হচ্ছি অথার অফ্‌ দি ডলার অ্যাণ্ড দি ওয়ার্লড্‌, অত প্রশ্নের কাজ কি? আমি ভূ-পর্যটনের সময় কলকাতায় ভূ-পর্যটক রামনাথ বিশ্বাসের আশীর্বাদ নিতে যাই, তাঁর একটা শুভেচ্ছা বাণী পর্যন্ত আমার কাছে আছে।

—ওঃ! রামনাথ বিশ্বাসের কথা বলছিস, তিনি সত্যি নমস্য ব্যক্তি। সেই সময়ে তিনি যে কত ধকল সয়ে তারপর দেশে ফিরেছিলেন তা কে না জানে। বাঙালীর ভূ-পর্যটনের ইতিহাসে তাঁর নাম উল্লেখযোগ্য, তবে আসলে তিনিও কিন্তু সমস্ত পৃথিবী ঘোরেননি। আফ্রিকা ও এশিয়া ঘুরে তিনি যখন ইউরোপ আসেন তখন মানসিক অবসাদ ও শারীরিক অসুস্থতার জন্য তিনি ফিরে যেতে বাধ্য হন। তবে একথা সত্যি যে সেই সময়ে একজন সাধারণ বাঙালী হয়ে তাঁকে যে পথশ্রম ও ধকল সহ্য করতে হয়েছে, তাতে নিঃসন্দেহে তাঁকে ভূ-পর্যটক বলা যায়। হ্যাঁ ভালো কথা, তুই কলকাতার বিমল মুখার্জীর নাম শুনেছিস?

—না।

—বিমল মুখার্জী রামনাথ বিশ্বাসের আগে সমস্ত ইউরোপ সাইকেলে দু'বার ঘুরেছেন।

—যাই হোক, এসো কিছু খাওয়া যাক্‌। আহ্‌মেদ কথার মোড় ঘোরালো। ফ্রিজ থেকে বিরাট একটা বিফ্‌টেক বার করে বললো—চালাও।

—আমার চলে না।

—সে কি? ট্যুরিস্টদের আবার বাধা-নিষেধ আছে না কি? এই দেখ না, আমি মুসলমান অথচ পেটের মধ্যে শুয়ারের মাংস ভর্তি।

—আমার ব্যাপার অন্য, খাবার ব্যাপারে আমি জানি না, তবে নিজের রুচি অনুযায়ীই খাই। শুধু তাই নয়, আমি ছোট-খাটো মানুষ, ও সব বড়ো জন্তু কি আমার পোষায়?

আমার জবাবে আহ্‌মেদ একটু অসন্তুষ্ট হ'ল বটে, কিন্তু তাতে আমার কিছু যায় আসে না।

আহ্‌মেদ দু'বোতল বিয়ার সাবাড় করে মাংসের সাথে লাল বোতল চালাতে লাগলো, আর আমি ওর স্টোভে গরম ভাত ও চট্টগ্রাম থেকে আনা চাটনির সাথে আমেরিকান মাখন দিয়ে চালিয়ে নিলাম। আমি এবার অনেকটা জেরার মতো করে ওকে প্রশ্ন করতে লাগলাম। ওর সম্পর্কে আমাকে স্পষ্ট করে আরও কিছু জানতে হ'বে। শেষে নেশার ঝোঁকে ও বলতে লাগলো ওর পর্যটন :

আহ্‌মেদ আসলে ইন্দোনেশিয়া ও আরবদেশগুলো ছাড়া আর কোথাও সাইকেলে ঘোরেনি। তবে জাহাজে করে সে কোনরকমে আমেরিকার মাটিতে পা দেয়। ওর ইচ্ছা ছিল যুক্তরাষ্ট্রে কয়েক বছর কাজে করে কিছু টাকা সঞ্চয় করে আবার শুরু করবে সাইকেলে ভূ-পর্যটন। কিন্তু একবার যে টাকা আর বিদেশিনীর প্রেমে পড়েছে তার পক্ষে আবার নতুন করে যাত্রা শুরু মুশকিল। অবশ্য ও ঠিক বিদেশিনীর প্রেমে পড়েছে বলা যায় না, ওর প্রেম মানে টাকার বদলে যা আসে— প্রত্যেক বছরই ও ভাবে পরের বছর যেমন করেই হোক আবার যাত্রা করবে, আজ-কাল করে এইভাবে ওর অনেকগুলো বছর কেটে গেছে, কিন্তু যাত্রা শুরু করা হয়নি।

খাওয়া-দাওয়া করে আমরা বেড়িয়ে পড়লাম। আহ্‌মেদ আমাকে বুঝিয়ে বললো যে, পরিব্রাজকদের কোনো বিশেষ পথে চললে হবে না, সব পথে চলতে হবে, সবরকমের অভিজ্ঞতায় অংশগ্রহণ করতে হবে আর এই হচ্ছে দেশ ও দেশবাসীকে জানার শ্রেষ্ঠ উপায়। আমি শান্ত ছেলের মতো ওর সব উপদেশ শুনতে লাগলাম। ওর সাথে এসে পৌঁছলাম একটা বার-এ— সোজা কথায় একে নাইট ক্লাব বলা চলে। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই সিগারেটের জমাট ধোঁয়ায় চোখে ধাঁধাঁ দেখলাম। চারদিকে টিমটিমে লাল বাতি, তাতে কোনো রকমে পয়সা গোনা যায় কিন্তু খবরের কাগজ পড়া চলে না। তারই সাথে খাপ খাইয়ে জাজের রেকর্ড চলছে। আহ্‌মেদের সঙ্গে আমি একটা টেবিলে বসলাম। আহ্‌মেদ মিনির দিকে তাকিয়ে দু'বোতলের অর্ডার দিল--- মানে দু'বোতল বিয়ার। এ ধরণের নাইট ক্লাব বা ক্যাবারের সব সময় সেই একই আবহাওয়া, শুধু মানুষ ও ভাষা আলাদা। এখানে সাদার চেয়ে কালোর সংখ্যাই বেশী। আমাদের পাড়ার চায়ের দোকানের মতো এখানেও প্রসঙ্গের অভাব নেই। আমার পাশের ভদ্রলোকের সাথে আহ্‌মেদ আমার পরিচয় করিয়ে দিল— মিঃ কার্বি, নিগ্রোবংশীয়, সবে ওকালতি পাশ করে একটা কোম্পানীতে ঢুকেছে? কার্বি আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলে— তুমি কি অথারের বন্ধু— পাকিস্তানী।

—বন্ধু বটে, তবে পাকিস্তানী নই, ইণ্ডিয়ান। —জবাব দিলাম।

—তাই নাকি—দেশে তোমরা পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করো বটে, কিন্তু এখানে দেখছি দিব্বি মিল।

—যুদ্ধ মানে পলিটিক্স, কিন্তু আসলে আমরা সবাই মানুষ, রাজনীতি ছেড়ে দিলে আমরা ভাই-ভাই। ১৯৪৭ সালের আগে কোনো পাকিস্তান ছিল না, ছিল এক অখণ্ড ভারত— তাইতো যখনই সুবিধা হয় আমরা ভাই-ভাই-এ মিলে যাই। একমাত্র ধর্ম ছাড়া আমাদের ঐতিহ্য সব সমান।

—তুমি মনুষত্বের কথা বলছো— তা ঠিক, পৃথিবীর সব মানুষই সমান, কিন্তু পলিটিক্স— সে তো মানুষেরই সৃষ্টি.....কার্বি প্রসঙ্গটা চালিয়ে গেল। আশ-পাশের আরও কয়েকজন এসে যোগ দিল, আহ্‌মেদ বাংলায় আমাকে বললে— নোট করে নে, এ-সব একটা অভিজ্ঞতা। আমি পারতপক্ষে রাজনীতি এড়িয়ে চলি, কাজেই প্রসঙ্গ যদিও চলতে লাগলো কিন্তু আমি এড়িয়ে গেলাম। তাদের সেই কথাব ফাঁকেই আমি কার্বিকে জিজ্ঞেস করলাম,

—তুমি এই অথারকে চেন? আমি আহ্‌মেদকে দেখিয়ে বললাম।

—নিশ্চয়ই।

—ওর লেখা বই তুমি পড়েছো?

—না।

—বইটা তুমি দেখেছো?

—না।

—তাহ'লে বুঝলে কি করে যে ও অথার।

—ও নিজেই সবাইকে বলেছে।

অথারের ব্যাপারটা বুঝলাম। হয়তো বা ভাগ্যচক্রে একটা বই প্রকাশ করে থাকবে আর তারই ফলে 'আপন গুণগানে আপনি মুগ্ধ।' বারের ওই বদ্ধ ঘরের জমাট ধোঁয়ায় আমার চোখ জ্বালা করতে লাগলো— মনে মনে ভাবলাম যে অভিজ্ঞতা জ্বালা ধরায় সে অভিজ্ঞতায় আমার প্রয়োজন কি? কাজেই আহ্‌মেদের অনুরোধ সত্বেও আমি বেরিয়ে এলাম বাইরে। বেরিয়ে আমি যেন বাঁচলাম— আমার পিছন পিছন আহ্‌মেদও বেরিয়ে এসেছে; আমার কাঁধে আন্তরিকতার ভর দিয়ে বললো—কালো আমেরিকানদের বুকগুলো কি রকম বলতো? সত্যি মাল বটে।

—খুব সাবধান আহ্‌মেদ, আমরা পরিব্রাজক বটে কিন্তু সব পথই আমাদের পথ নয়। সব পথই অভিজ্ঞতা আনে বটে, কিন্তু যে পথে তলিয়ে যাবার সম্ভাবনা সে পথে গিয়ে লাভ কি?

—বলে কি দেখ— আরে আমি হচ্ছি অথার, আমার সব অভিজ্ঞতার প্রয়োজন— বুঝলে, আমি কি অত সহজে তলাই? আহ্‌মেদের কণ্ঠে গর্বের ভাব। আমরা দেখতে

দেখতে এগারো নম্বর রাস্তায় এসে পড়লাম। রাত অনেক হয়ে গেছে, প্রায় বারোটা, এগারো নম্বর রাস্তাটা ধরে বরাবর গেলেই পাবো আমার আস্তানা— বেদান্ত সোসাইটি। এখান থেকে প্রায় কুড়ি মিনিটের পথ। আমার রাস্তায় এসে আহ্‌মেদ বললে— ওদিকে চললে কোথায়?

—যাই এখন, কি বল, অনেক রাত হয়ে গেছে।

—ওদিকে কেন? ইউথ হোস্টেল তো এদিকে।

—না, আমি এখন ইউথ হোস্টেলে থাকি না।

—তাই নাকি? তার মানে থাকার ম্যানেজ হয়ে গেছে, সত্যি তুমি চতুর বটে— তা এখন থাকা হয় কোথায়?

—হোয়াইট হাউসের কাছাকাছি— আমি ইচ্ছে করেই সঠিক বললাম না।

—বেশ, তাহ'লে এসো একবার, অথার-এর সাথে শেষ অভিজ্ঞতাটা নিয়ে যাও।

—শেষ অভিজ্ঞতা মানে? আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

—চলো এসো, এটা একটা বিরাট অভিজ্ঞতা— রাতের ওয়াশিংটন— সে আর আর এক রূপ, এদিককার মেয়েগুলো নাম করা।

—না ভাই আমি চলি। আমি বুঝলাম ওর নতুন অভিজ্ঞতা বলতে কি বোঝায়। কিন্তু অত সহজে ছাড়া পাবার উপায় নেই। সে প্রায় নাছোড়বান্দা হয়ে বললো,

—আরে চলে এসো ভাই, আধঘন্টার ব্যাপার। আরে পয়সার জন্য ভাবছো কেন, সে আমি দেবো। রাস্তার মধ্যে সে প্রায় হাত ধরে টানাটানি শুরু করে দিল। ভারী মুশকিলে পড়লাম— ওর মুখের গন্ধে বুঝলাম যে নেশায় ধরেছে। কাজেই ছলনার আশ্রয় নিতে বাধ্য হ'লাম। আহ্‌মেদকে বললাম— ঠিক আছে চলো। তুমি আগে পছন্দ করো, আমি পরে নিচ্ছি।

ঠিক গলির কাছে আসতেই চারদিক থেকে ডাক আসতে লাগলো। আহ্‌মেদ সরাসরি একজনের সাথে দর ঠিক করে ফেললো। আমার দিকে তাকিয়ে বললো— পকেটে পয়সা আছে তো? নয়তো আমার কাছ থেকে নিতে পারো। আমি ওকে আশ্বাস দিলাম— আমার জন্য ভাবতে হবে না, তুমি যাও আমি পরে যাচ্ছি।

আহ্‌মেদ ওর দেহ থেকে অনেক বড় একটা দেহী ধরে এগিয়ে চললো। বাড়ীটার ভেতরে ঢোকবার আগে একবার চেঁচিয়ে বললো— এদের সঙ্গে সব সময় খুব সাবধান ভাই— অভিজ্ঞতার দরকার। ভুলে যেও না আমি অথার, অথার অফ দি ডলার অ্যাণ্ড ওয়ার্ল্ড...।

আমার চোখের থেকে অদৃশ্য হ'ল আহ্‌মেদ, আমি ফেরার পথ ধরলাম। চলতে চলতে ভাবতে লাগলাম, সত্যি অভিজ্ঞতা, অভিজ্ঞতাই বটে। আহ্‌মেদের চরিত্র আমার কাছে একটা বিরাট অভিজ্ঞতা, শিক্ষণীয় বটে। আহ্‌মেদের আমি দোষ দেখি না—

নিঃসঙ্গ জীবনে অন্ততঃ একটা অবলম্বন দরকার আর বিভিন্ন লোকের আছে বিভিন্ন পথ, আহ্‌মেদ বেছে নিয়েছে ওর দিক।

আমি এগিয়ে চললাম আমার ডেরার দিকে। এগারো নম্বর রাস্তা ধরেই আমি এগোচ্ছি, পথ প্রায় নির্জন, মাঝে মাঝে বিরাট গাড়ীগুলো উৎকট শব্দ করে এগিয়ে যাচ্ছে। একটা সিগন্যাল পোস্টের কাছে আসতেই পাশে নজরে পড়লো একজন ভদ্রলোক বেঞ্চিতে বসে তাঁর বোতল থেকে শেষ বিন্দুটি পান করবার চেষ্টায় ব্যস্ত। কাছাকাছি এগোতেই ভদ্রলোক বোতলটা নামিয়ে আমার দিকে তাকালেন। তারপর ধরা গলায় বললেন,

—দেখছো বাছা, এই বোতলটার ভেতরে আব এক ফোঁটাও কিছু নেই—স্টুপিড বাট্‌ল। এই বলে ভদ্রলোক বোতলটাকে রাস্তার ওপর ছুঁড়ে ফেললেন— একটা আর্ত চীৎকার কবে বোতলটা চৌচির হ্‌য়ে পড়লো। আমি যদি বোতল হ্‌তাম তাহ্‌লে নিশ্চয় কবে বলতে পাবি আমি কি বলতাম— নিষ্ঠুর মানুষ! আমি যথাসাধ্য ওর পানীয় জুগিয়েছি অথচ তা সত্বেও আমার ওপর ওর এতটুকু কৃতজ্ঞতা নেই— অকৃতজ্ঞ প্রাণী!

সিগন্যালে লাল আলো পড়ায় আমি দাঁড়াতে বাধ্য হ্‌লাম। বেঞ্চিব ওপর থেকে ভদ্রলোক টলতে টলতে উঠে এলেন— আমার কাছে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,

—কেন বাবা এখানে দাঁড়িয়ে?

—লাল আলো দেখতে পাচ্ছেন না?

—ওঃ তাই নাকি! ভদ্রলোক হো হো করে হেসে উঠলেন। তারপর অনেকটা তিরস্কারেব ভঙ্গিতে বললেন,

—কাপুরুষ! হ্যাঁ তুমি একটা কাপুরুষ— লাল আলো দেখে যে এগোতে ভয় পায় সে একটা আস্ত স্টুপিড।

ইতিমধ্যে আলোর রঙ পাল্‌টালো— আমিও রাস্তায় পা বাড়ালাম, রাস্তা পার হয়ে পেছন ফিরে তাকালাম— ভদ্রলোক আমার দিকে তখনও তাকিয়ে। তাঁর কথাটা কানে বাজ্‌তে লাগ্‌লো— লাল আলো দেখে যারা এগোতে ভয় পায় তারা আস্ত স্টুপিড। গীর্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজল। সত্যি, আজকে সমস্ত দিনটাই ব্যস্ততার মধ্যে কেটেছে, ঘরে গিয়ে আরামসে ঘুমানো যাবে। সোসাইটির বাড়ীর সামনে আসতেই নজরে পড়লো দোতলার জানলার দিকে এখনো আলো জ্বলছে। তার মানে নিশ্চয়ই ওরা আমার জন্য বসে আছে। আমার কাছে ডুপ্লিকেট চাবি ছিল, দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতেই কেশব এগিয়ে এলো—এই যে বিমলজী!

—ব্যাপার কি? আমার জন্য সবাই বসে আছো দেখছি। আমি সত্যি দেখছি...

কেশব আমার কথায় বাধা দিয়ে বললো,

—না-না তার জন্য কিছু নয়, এসো তোমার সাথে পরিচয় করিয়ে দিই— এর নাম হচ্ছে ম্যাক্।

পেছন থেকে ম্যাককে দেখে ভেবেছিলাম একটা মেয়ে। কিন্তু ম্যাক্ আমার দিকে তাকাতেই আমার ভ্রম পরিষ্কার বুঝলাম। দাড়ি-গোঁফ সমেত ম্যাক্ এগিয়ে এসে আমার করমর্দন করলো।

ম্যাকের চুলটা দেখবার মতো— অতি পরিষ্কারভাবে আঁচড়ানো চুল পিঠের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে— তাইতো পেছন থেকে দেখে আমি ভুল করেছিলাম। ওর কপালের ওপর একটা দড়ির হেড্-ব্যাণ্ড দিয়ে চুলগুলোকে সামলানো হয়েছে। লম্বায় প্রায় ছ ফুট হবে, কিন্তু আমার চেয়েও রোগা, খালি গা আর পরনে জিনস্। ম্যাক্ আমার দিকে তাকিয়ে অতি বিনয়ের সঙ্গে বললো,

—তাহলে আপনি আসছেন?

—কোথায়? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

কেশব এগিয়ে এসে বললো—ওঃ! তোমাকে বলা হয়নি। ম্যাকের গার্ল ফেণ্ড কুড়ি নম্বরে ডুবে আছে, সেখানে আমাদের একটু যাওয়া দরকার—

—কুড়ি নম্বর বাড়ী— সেখানে ব্যাপারটা কি ঠিকমতো জানা দরকার কেশব, আর আমি এ ব্যাপারে কিছুই জানি না—

—চল, ওখানে গেলেই সব পরিষ্কার বুঝবে। কেশব আমাকে আশ্বাস দিল। ইতিমধ্যে মরুভিয়াও ঘর থেকে বেরিয়ে এলো, আমি ভালোভাবে ব্যাপারটা বোঝবার আগেই সবাই তৈরী হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সারাদিনের পর কোথায় একটু বিশ্রাম করবো তা নয় এখন চললো নব অভিযান— তাও এই রাত-দুপুরে।

—তা জায়গাটা কোথায় মরুভিয়া, আমি জিজ্ঞেস করলাম।

—জর্জ টাউনে।

—জর্জ টাউন, সে অনেক দূর— হেঁটে যেতে হবে নাকি?

—অসুবিধা হবে না, ম্যাকের গাড়ী আছে।

একটা বিরাট স্কাইলার্ক মার্কা গাড়ীর সামনে এসে আমরা দাঁড়ালাম। বুঝলাম এইটাই ম্যাকের গাড়ী। ম্যাক্‌কে দেখে মনে হয় দুর্ভিক্ষের কাঙাল, আর এই গাড়ীটা ঠিক তার বিপরীত। কলকাতার যে কোনো মারওয়াড়ী এই ধরণের গাড়ী পেলে নিজেদের ধন্য মনে করবে। গাড়ীর ভেতর অনায়াসে আটজন বসতে পারে।

কুড়ি মিনিটের মধ্যে আমরা জর্জ টাউনের একটা পোড়ো বাড়ীর সামনে এসে থামলাম। মোটরটা রাস্তার পাশে পার্ক করে আমরা ভিতরে ঢুকলাম। বাড়ীর ভিতরে ঢুকতেই একটা গন্ধ নাকে এলো— অনেকটা মন্দিরে ঢুকতেই যেমন ধুনোর গন্ধ। বুঝলাম, আমরা এখন আড্ডাখানায়। আড়চোখে মরুভিয়ার দিকে তাকালাম, তারপর কেশবের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম— গন্ধটা যেন হাসিস্ বলে মনে হচ্ছে। কেশব নির্বিঘ্নে জবাব দিল— অফ্ কোর্স।

সিঁড়ি দিয়ে আমরা উঠে এলাম তিনতলায়। দরজাটা খোলাই ছিল। আমি, কেশব ও মরুভিয়া ম্যাক্‌কে অনুসরণ করে ভিতরে ঢুকলাম। ঘরটাকে একটা বড় হলঘর বলা যায় অর্থাৎ পাশাপাশি ষাটজনের শোবার জায়গা। সম্পূর্ণ হলঘরে মাত্র একটা নীল আলো জ্বলছে। আধো আলো ও আধো অন্ধকারের সাথে ধোঁয়া ও ধোঁয়ার গন্ধ মেশানো। চলতি কথায় যাকে বলে রোমান্টিক অ্যাটমোসফিয়ার। বুঝলাম এটা গাঁজা ও আফিমখোরদের একটা আড্ডাখানা। সর্বপ্রথমে আমি মাতালা দ্বীপে আন্তর্জাতিক হিপ্পি সম্মেলন দেখেছি, সেখানে আমি এই ধরণের নেশাখোরদের সংস্পর্শে আসি। তারপর জার্মানির ফ্র্যাংফুর্ট ফ্রান্সের লিল্, ডেন্‌মার্কের কোপেনহেগেনে কংপার্ক, লণ্ডনের পিকাডেলি স্কোয়ার, ডাবলিনের নর্থ স্ট্রীট ইত্যাদি প্রত্যেকটি বড় বড় শহরেই পেয়েছি যুবক-যুবতীদের এই ধরণের মিলন কেন্দ্র। কাজেই এ দৃশ্য আমার কাছে নতুন নয়। কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছি না যে এখানে স্পিরিচুয়াল অর্গানাইজেসনেব কি কর্তব্য। মরুভিয়া ও কেশবের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম— এখানে আমাদের কর্তব্যটা কি? কেশব আমাকে বুঝিয়ে বললো, এখানে আমাদের করার অনেক কিছু আছে— বিশেষ করে স্পিরিচুয়াল হেল্প। কেশব ও মরুভিয়াকে প্রায়ই এই ধরণের যুবগোষ্ঠীতে যেতে হয়— বিশেষ করে অনেক সময় যারা মরফিন্, গাঁজা, আফিমের নেশায় প্রায় মৃত তাদের উদ্ধারের জন্য। আমি জিজ্ঞেস করলাম— প্রায় মৃত ব্যক্তিব জন্য পুলিশে খবর দেওয়া ভালো নয় কি? মরুভিয়া আমার কথা শুনে প্রায় রেগে উঠে বললো—

—পুলিশ! ওদের কথা বলো না, ওরা হচ্ছে পিগ, ওদের দিয়ে কোনো উপকার হয় নাকি?

—কিন্তু আইন অনুযায়ী ওরা যাবতীয় সাহায্য করতে বাধ্য, বিশেষ কবে হাসপাতালের বন্দোবস্ত ওরা করবে— আমি জবাব দিলাম।

—হ্যাঁ সে কথা ঠিক, কিন্তু তাতে কি সমস্যার সমাধান হবে? পুলিশের সাহায্যে এরা প্রথমে হাসপাতালে গিয়ে সুস্থ হ'বে, তারপর সেখান থেকে যাবে জেলখানায়, তারপর সেখান থেকে ফিরে আসবে তখন আবার শুরু হ'বে তাদের নেশা।

—কিন্তু মরুভিয়া, এ অবস্থায় আমরাই বা কি কবতে পারি— এ অবস্থায় এদের যদি কোনো সুপরামর্শ দিই তাহলে এরা কি তা পালন করবে? এই যেমন ধরো ওই পাশের মেয়েটা যে মরফিন ইনজেকশন নিচ্ছে ওকে যদি এখন বাধা দিই তাহলে আমাকে ও সিরিঞ্জ ছুঁড়ে মারবে।

মরুভিয়া আমার কথায় বাধা দিয়ে বললো,

—না, আমরা ওকে কিছু বলতে চাই না, তবে এর মধ্যে অনেকে আমাদের কথা শুনতে প্রস্তুত, আমরা তাদেরই বলবো। যেমন ধরো মার্কের গার্ল ফেণ্ড। মরুভিয়ার কথাটা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। আমার সোজা কথা— মাতালকে মদ খেতে নিষেধ করার কোন অর্থ নেই, কারণ সে মাতাল, সে তার মনের ভারসাম্য হারিয়েছে, তাকে উপদেশ দেওয়ার কোন অর্থ দেখি না, বরঞ্চ তার মন

যখন সুস্থ হবে সেই সময় তাকে পরামর্শ দিলে কাজ হলেও হতে পারে। যাই হোক— দেখা যাক ব্যাপারটা কি? ম্যাক্ আমাদের ঘরের এক কোণে নিয়ে গেল— সেখানে পাঁচ-ছ'জনের একটা গোলচক্রের মতো বসেছে। আমরা সবাই একটা স্লিপিং ব্যাগ পেতে বসলাম, ম্যাক্ সকলের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিল। ওর গার্ল ফ্রেণ্ডের নাম সুজান, দেখে মনে হ'ল খুব বেশী হলেও ওর বয়স আঠারো, মুখটি অতি কচি, ভাসা-ভাসা চোখ, সুন্দরী বলা চলে। আমি চারদিকের অন্যান্য ছেলেমেয়েদের দেখতে লাগলাম, অধিকাংশই বাইশের নীচে আর এদের মুখে স্পষ্ট বনেদীর চিহ্ন। বুঝলাম এরা সবাই বনেদী ভিখিরী। আমি এদের সখের ভিখিরী বলি। আমরা প্রায় আধঘন্টা ধরে চুপচাপ বসে। কারও মুখে এতটুকু শব্দ নেই। অনেক সময়ে ঠিক প্রসঙ্গের অভাবে এই ধরণের অবস্থা হয় বটে। তবে এখানে ঠিক প্রসঙ্গের অভাব বলে বোধ হচ্ছে না। মরুভিয়াকে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলাম,

—ব্যাপারটা কি?

মরুভিয়া ঠিক সেইভাবে ফিসফিস করে জবাব দিল,

—মেক্সিকান মাশরুম ও হাসিস,* এরা এখন-মুডে আছে।

---

* Mexican Mashroom and Hashis :-

এ সম্পর্কে কিছু বলা দরকার,— তাতে এই মুড-মেকারদের সম্পর্কে জানার একটু সুবিধে হবে বলে মনে করি।

মেক্সিকান মাশরুম* (Mexican Mashroom)— এর ঠিক বংলা করলে বোঝাবে মেক্সিকোর ব্যাঙের ছাতা। ইউরোপ বা আমেরিকায় ব্যাঙের ছাতা একটা প্রিয় খাদ্য। কম করে হলেও প্রায় একশ রকমের মাশরুম বা ব্যাঙের ছাতা পাওয়া যায়। অবশ্য সব রকমের ব্যাঙের ছাতাই খাওয়া চলে না। আমাদের দেশে বর্ষাকালে ঝোপ-জঙ্গলে এই ধরণের মাশরুম প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

মেক্সিকোর উপজাতিরা এক রকমের বিশেষ মাশরুম বিভিন্ন পূজা-পার্বণে ব্যবহার করে। অনেকটা আমাদের দেশে যেমন বিভিন্ন শিব উৎসবে গাঁজার ব্যবহার অথবা তান্ত্রিক সাধনে মদ বা ঐ ধরণের পদার্থের ব্যবহার। মেক্সিকোর এই উপজাতিরা এই মাশরুম ধর্মীয় ব্যাপারে ব্যবহার করে। ওদের ভাষায় একে বলে তেওনানাকাট (Teonanacat) অর্থাৎ ভগবানের মজ্জাস্বরূপ। এই মাশরুম খাওয়ার পর মস্তিষ্কে এর বিরাট প্রভাব বিস্তার করে, তার ফলে অনেকে দার্শনিক তত্ত্ব আওড়ায়। ফারমাকোলোজি'র ভাষায় একে বলে Psilocybine অথবা Psilocybe Mexicana। মেক্সিকোর আজটেক সম্প্রদায়ের মধ্যে এই মাশরুম খুব চলতি।

হাসিস (Hashis)—সোজা বাংলায় যাকে বলে গাঁজা অথবা গাঁজা ধরণের। কানাবি গাছের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নাম। অনেকে ইংরাজীতে Canabis অথবা ডাক্তারী ভাষায় যাকে বলে Cannabis Satival. এই গাছগুলো সাধারণতঃ ১৫/২০ ফুট লম্বা হয়। তার ফুল থেকে অথবা কচি পাতা থেকে তৈরী হয় হাসিস্। এর শিকড় থেকে তৈরী হয় বিভিন্ন ধরণের পানীয়। তবে ফুল থেকে তৈরী হাসিস্ বিড়ির আকারে অথবা কল্‌কেতে খাওয়া এদেশে প্রচুর চলছে। হাসিস্-এর সাথে সাথে চোরাবাজারে ছিলিমও পাওয়া যায়। আমেরিকা বা ইউরোপে অনেকে আজকাল এর চাষ করছে! হাসিস্ গাছ বা গাঁজা গাছ বললে পুলিশে ধরবে, কাজেই এরা এর রসায়ন পদার্থের নামেই গাছকে বলে Tetrahydrocannabinal (টেট্রাহাইড্রোকানাবিনাল) সংক্ষেপে কেমিস্টরা যাকে বলে TEC. এর ধোঁয়ায় অনভ্যস্তের মাথা ঘোরে, অভ্যস্তের মেজাজ আসে।

—আমরা আরও কিছুক্ষণ এইভাবে চুপচাপ বসে আছি, এমন সময় মার্শা (একটি মেয়ে) অনেকটা ভাবুকের মতো বললো— কি অদ্ভুত এই সোল— একে দেখবার কি কোন উপায় নেই?

কেশব আমার দিকে তাকিয়ে বলল— বিমলজী তুমিই জবাবটা দাও।

কেশব আমাকে সোল সম্পর্কে কিছু বলতে বললো। আমি উঠে পড়লাম। কারণ আমার অল্পবুদ্ধিতে ইংরেজী সোল (Soul) শব্দের ঠিক বাংলাটা কি হবে তা ভেবে পাচ্ছি না, তবে কাছাকাছি শব্দের মধ্যে একমাত্র আত্মা কথাটাকে ধরতে পারি। আমি খুব বেশী একটা উৎসাহ প্রকাশ না করাতে ম্যাক্ আমাকে এবার অনুরোধ জানালো— কই কিছু বলো! আমি দেখলাম সকলেই আমার দিকে উৎসুক হয়ে তাকিয়ে আছে। আমি তাই বাধ্য হয়ে শুরু কবলাম— প্রশ্নটা যেন কি ছিল?

—সোলকে দেখা সম্ভব কি? জবাব এলো।

—আমি সোল বা সেল্ফ (Soul, Self) সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলবো না কারণ এই ইংরেজী শব্দের ঠিক বাংলাটা কি হবে জানি না, তবে আমি আত্মা সম্পর্কে কিছু বলবো। এই আত্মা হচ্ছে ইংরেজী সোল ও সেল্ফ-এব অন্তর্নিহিত সত্যরূপ— যাব বিনাশ নেই। এই আমিত্ব বলতে আমি চবিত্রেব কথা বলছি না, আমি বলছি আমাদেব এই জীবনেব মূল স্বরূপ।

আমি থামলাম, দেখলাম এরা সত্যি উৎসুক। আশ-পাশেব থেকে আরও দু'চারজন উঠে এসেছে আমার কথা শুনতে।

কেশবকে জিজ্ঞেস করলাম— তা'হলে সবাই শুনতে আগ্রহী দেখছি, তাই না?

—হ্যাঁ নিশ্চয়ই, চালিয়ে যাও।

আমি আবার শুরু করলাম

—সোল বা আত্মাকে দেখবার কোন উপায় আছে কিনা সেই প্রশ্নের জবাবেই আবার আসছি। আত্মাকে দেখবার আগে প্রথমে জানতে হবে আত্মা বলতে জিনিসটা কি— অথবা কি বোঝায়? আমাদের ভারতীয় দর্শনে আত্মা বলে একটা শব্দ আছে— আত্মা ব্যক্তিগত এবং সেই একই আত্মা সর্বব্যাপী। আমাদের শরীরকে চালায় মন, আর মনকে চালায় আত্মা। আত্মা প্রাণশক্তির সাহায্যে শোনে, আত্মা মনের মাধ্যমে চোখের সাহায্যে দেখে, আত্মা মনের মাধ্যমে নাকেব সাহায্যে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে অর্থাৎ আত্মা ছাড়া কিছু করবার উপায় নেই। এখন কথা হচ্ছে আমরা কান, চোখ, নাক ইত্যাদিকে দেখতে পাই কিন্তু মনকে বা আত্মাকে দেখতে পাই না কেন? আমার কথাটা এখন একটু চিন্তা করে দেখ। তারপব আবার আমি বলছি। আমি থামলাম, কিছুক্ষণ পর আবার আরম্ভ করলাম।

—আমাদের এই দেহটা একটি মোটর গাড়ী। দরজা, জানালা, লাইট, চাব চাকা ইত্যাদিকে আমাদের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে তুলনা করা যাক। মোটর গাড়ীর মেশিনটাকে ধরা যাক মোটররূপ দেহের মগজ। এনার্জি বা খাদ্যের সঙ্গে তুলনা

করা যাক পেট্রলকে। সব কিছু আছে কিন্তু তা সত্বেও গাড়ীটা চলে না, চালাবার জন্য দরকার হয় ড্রাইভার— তাই নয় কি? আর এই ড্রাইভারই হচ্ছে মোটরগাড়ীর মন। এই মনের বা ড্রাইভারের ইচ্ছানুযায়ী গাড়ী চলে। —আমি আবার থামলাম, দেখলাম প্রায় সবাই গভীর মন দিয়ে শুনছে— আমি আবার তাদের আমার কথাটা হৃদয়ঙ্গম করবার জন্য অনুরোধ জানালাম। তারপর আবার শুরু করলাম,

—এবার আসা যাক সব চেয়ে জটিল কথায়— এই ড্রাইভারের মনকে আমি গাড়ীর আত্মা বলবো। এখন আসা যাক আমাদের পূর্ব প্রসঙ্গে, আমার প্রশ্নের জবাব দাও— গাড়ীর দ্বারা কি সম্ভব গাড়ীর আত্মা বা সোলকে জানা?

—না।

—কারণ?

—কারণ গাড়ীটা একটা জড়পদার্থ— সুজান জবাব দিল।

—ঠিক ধরেছো।

আমি আবার শুরু করলাম,

—ঠিক —গাড়ীর দ্বারা গাড়ীর আত্মাকে জানা সম্ভব নয়, তার প্রথম মূল কারণ হচ্ছে, গাড়ীটার প্রাণ নেই— দ্বিতীয়তঃ গাড়ী ও গাড়ীর চালক সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। ঠিক তেমনি— 'আমরাও আজকাল প্রাণহীন জড়পদার্থ হয়ে পড়েছি। আধুনিক যন্ত্রযুগে আমরাও যন্ত্র হয়ে পড়েছি, নিজের সম্পর্কে চিন্তা করবার এতটুকু সময় নেই। আমরা বাহ্যিক পদার্থ সম্পর্কে দিনরাত চিন্তা করছি। গবেষণা করছি কিন্তু কই— একবারও তো নিজের সম্পর্কে চিন্তা করি না— আমি কে? কোথা থেকে আমার উৎপত্তি? আমার জন্মের কারণ কি? অথবা আমার ভিতরকার আমিত্ব জিনিসটা কি" এই যে মার্শা আমাকে প্রশ্নটা করলে, এর পেছনে রয়েছে একটা বিরাট জানবার চেষ্টা, একটা আবিষ্কারের প্রেরণা— একটা আধ্যাত্মিকতার প্রকাশ। কি অদ্ভুত সুন্দর এই প্রশ্ন। আমি আমাকে জানবার চেষ্টা করছি।

এবার আমি থামলাম। তারপর অতি মোলায়েম করে বললাম— আমাকে প্রশ্নটা যেন কে করেছো?

—আমি, মার্শা জবাব দিল।

—খুব ভালো...এসো আমার কাছে এসো।

মার্শা কথানুযায়ী আমার কাছে এসে বসল। এবার আমি তার দিকে তাকিয়ে বললাম—

—চোখ খুলে তাকাও ভালো করে— কি দেখছো?

—তোমাকে—

—আর কি দেখছো?

—আরও অন্যান্য সবাইকে।

—ভালো, এবারে চোখ বোজো, কি দেখছো?

—কিছু না—

—ভালো করে দেখ।

—কিছু না।

—হ্যাঁ শোনো— চোখ খুলে যেমন বাইরের জিনিস দেখা যায় তেমনি অন্তর দিয়ে অন্তরকে দেখা যায়, কথাটা একটু ভেবে দেখ। অন্তরদৃষ্টি দিয়ে অন্তরকে দেখা সম্ভব।

আমাদের আত্মা হচ্ছে যাবতীয় শক্তির মূলস্বরূপ (essentiality), মোটর গাড়ীর পেট্রলের মধ্যে যে শক্তি লুকানো আছে তাকে দেখতে পাওয়া যায় কি? আমাদের আত্মাকেও সাধারণ চোখে দেখতে পাওয়া যায় না, কিন্তু তাকে উপলব্ধি করা যায়। হ্যাঁ, তাকে দেখতে হলে চাই অন্তবদৃষ্টি, আত্মোপলব্ধি (Self realisation)। শুদ্ধ অন্তর,— ভক্তি, প্রেম ও আন্তরিক পবিত্রতা থাকলে অবশ্যই তাকে দেখা যায়। পরমহংসদেব শ্রীরামকৃষ্ণের মতো সহজ ও শুদ্ধ চিত্তে সব সময় আত্মার দর্শন ও সান্নিধ্যলাভ সম্ভব। তবে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের পক্ষে সেই আত্মাকে দর্শন করতে হলে চাই নিষ্ঠা, ধৈর্য আর প্রস্তুতি। তাকে জানবার বিভিন্ন পথ, বিভিন্ন উপায়। এ সম্পর্কে আশা করি আমাদের কেশব ভাই বা মরুভিয়া তোমাদের সুপরামর্শ দিতে পারবে।

আমি চুপ করলাম— মরুভিয়া আমাকে আগের মতোই ফিসফিস করে বললো— অতি চমৎকার হয়েছে। আমি মনে মনে ভাবলাম, জানি না, আমি ঠিক জায়গামতো কথাগুলো বললাম কিনা। আমি থামলাম— প্রায় পনেবো মিনিট যাবৎ সবাই নীরব।

এবার মরুভিয়া দু'হাত তুলে সকলকে ডাকলো— একটা মোমবাতি জ্বেলে মাঝখানে রাখা হলো, তারপর শুরু করলো— "ওম্"...ও...ম্— একে একে সবাই মরুভিয়ার কণ্ঠে যোগ দিল ওম্-ম্... ওম্...ওম্...ও...ম্। ঘরের সবাই আস্তে আস্তে যোগ দিল সেই ওম্ মন্ত্রে— ঘরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে উচ্চারিত হতে লাগলো ভারতীয় সনাতন মন্ত্র অ-উ-ম। ওম্ প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো চারদিকে। আমার কানে বাজতে লাগলো— ওম্...ওম্...ওম্। তারই মধ্যে প্রকট হয়ে উঠেছে একটা সুরালা মধুর স্বর আর সেই কণ্ঠটা হচ্ছে মরুভিয়ার।

আমি কল্পনা করতে পারিনি যে ভারত থেকে দুই মহাসাগর পারে পৃথিবীর আর এক কোণে ধ্বনিত হবে আদি ভারতের সুর, আদি ও সনাতন ওম্ মন্ত্র। এমন সুন্দর পবিত্র ও সুরেলা পরিবেশ বুঝি ভারতের মন্দিরেও দুর্লভ। কে বলবে এটা গাঁজাখোরের আড্ডাখানা! ঘরের সেই আনন্দময় ওম্ পরিবেশের মধ্যে আমার মনও ওম্কারে ভরে উঠল। ঘরে যারা ঘুমোচ্ছিল তারাও উঠে বসেছে, প্রত্যেকেই ওম্কারে যোগ দিয়েছে।

অ-উম্ বা ওংকারে শুনেছি সকলের অধিকার নেই— শুনেছি উচ্চারণের আগে অনেক প্রস্তুতির প্রয়োজন। আমার মনে পড়ে কাঠমাণ্ডুর পশুপতিনাথ মন্দিরের বাবাজীর

কথা— তিনি বলেছিলেন, যারা বিড়ি সিগারেট খায়, যারা অমিষাশী, যারা অব্রাহ্মণ, তারা যদি এই পবিত্র ওম্‌কার উচ্চারণ করে তাহলে মাথায় রক্ত উঠে মারা যায়। কিন্তু কই এখানে তো তেমন কিছুই হচ্ছে না! বুঝলাম এই পবিত্র ও শুদ্ধ ধ্বনি থেকে সাধারণকে বঞ্চিত করার এক বিরাট বাণিজ্যিক পরিকল্পনা— সব ব্যবসা। এখানে, এই ওয়াশিংটনের বুকে, বিড়ি-সিগারেট, গাঁজা, আফিমের এই আড্ডাখানায় ওম্‌কারের যে হৃদয়স্পর্শী ঝংকার শুনছি এর আগে তো এমন কোনোদিন শুনিনি।

এখন বুঝলাম ওম্ মন্ত্রে সকলেরই সমান অধিকার। ওম্ অর্থে স্বয়ং জগৎকর্তা— তাঁকে স্মরণ করবার বা ডাকবার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। উপনিষদের কথা মনে পড়লো— ছান্দোগ্যোপনিষদে স্পষ্ট ওম্ উপাসনার কথা উল্লেখ আছে। সমস্ত বিশ্ব তাহাতে ওতঃ, তিনি সমস্ত বিশ্বে ওতঃ, অনন্তকালের যিনি কর্তা, যিনি সর্বোৎকৃষ্ট, যিনি সর্বোচ্চ, যিনি অনন্ত গুণ ও জ্ঞানসম্পন্ন, তাঁকে স্মরণ করার অধিকার প্রত্যেকেবই আছে। ওম্— ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের প্রতীক। ওম্ সচ্চিদানন্দের প্রতীক। সমবেত সেই ওম্‌কার ধ্বনির মধ্যে আমার চিন্তাস্রোত বইতে লাগলো। এই ধরনের সমবেত ওম্‌কার ধ্বনি এর আগে আমার শোনবার সুযোগ হয়নি। জ্ঞানীরা বলেন শব্দই ব্রহ্ম। শব্দের প্রতিধ্বনি—সেটাও শব্দবিশেষ। আমাদের শরীরের মধ্যে, হৃদয়যন্ত্রে যে শব্দের ঝংকার ওঠে এইক্ষণে তা অনুভব করলাম। আমিও সেই মহাশব্দের সাথে গেয়ে উঠলাম —ওম্...অ-উ-ম্...ওম্...।

অনেকক্ষণ পর আমাদের স্বর আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে এল— আমরা থামলাম। আস্তে আস্তে আমরা উঠলাম। দরজার কাছে এসে একবার ফিরে তাকালাম—প্রায় সবাই এলোমেলোভাবে শুয়ে পড়েছে, অনেকে ঘুমিয়ে পড়েছে— মরুভিয়া যেন এদের ঘুম-পাড়ানির গান গেয়ে ঘুম পাড়িয়েছে। আমরা বাইরে বেরিয়ে এলাম। ম্যাক্ আমাদের পৌঁছে দিল আমাদের ডেরায়, গুড-নাইট জানিয়ে সবাইকে বিশেষ ধন্যবাদ দিয়ে ও চলে গেল। আমি অনেকটা যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো হয়ে গেছি— ঘরে ঢুকে ঘড়িতে দেখি চারটে অর্থাৎ ভোর চারটে। আজকে আর কোন কথা নয়, কাল সকালে দেখা যাবে —ভাবা যাবে কুড়ি নম্বরের বিষয়ে। মরুভিয়া, কেশব ও আমি স্ব-স্ব স্থানে চলে গেলাম। নমস্কার— গুড নাইট...।

ঘুমটা যেন ঠিক ভাঙছিল না, কিন্তু পায়ের তলায় কে যেন শুড়শুড়ি দিচ্ছে। চোখ রগড়ে পায়ের দিকে তাকালাম, কি জানি বলা যায় না হয়তো স্বপ্ন-ভাব হবে, কিন্তু না, কে যেন আমার পায়ের কাছে বসে। ভাল করে চোখ মেললাম। চোখ মেলতেই দেখি পায়ের কাছে বসে রুবী ব্লু। তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম—

—গুড মর্নিং মাদার।

—গুড মর্নিং মাই সান। —রুবী দেবী উঠে এসে আমার গালে সস্নেহে চুমু দিলেন। তারপর ফিসফিস করে বললেন— মনে আছে, আজকে আমার বাড়ীতে সবাই খাবে।

—ওঃ তাই তো—এখন কটা বাজে?

—সাড়ে এগারোটা প্রায়— রুবী দেবী উত্তর দিলেন।

—তাইতো, মনেই ছিল না—রুবী দেবীর দিকে তাকিয়ে বললাম— মনে কিছু করবেন না, আমরা রাতে জর্জ টাউনে গিয়েছিলাম, ফিরেছি আজ সকালে, সারারাত আমরা নাম-কীর্তনে ব্যস্ত ছিলাম। রুবীকে বেশী আর বলতে হ'ল না— কারণ কেশব ইতিমধ্যে সব কাহিনী শুনিয়েছে। শুধু তাই নয়, কেশবের মতে এটা হচ্ছে একটা সাক্সেসফুল ট্রিপ। আমরা তাড়াতাড়ি মুখ-হাত ধুয়ে জামা-কাপড় পরে নীচে নেমে এলাম। ফুটপাতের ওপর নামতেই নজরে পড়লো, হলদে রঙের স্পোর্টস্ মডেলের বিরাট একটা গাড়ী। গাড়ীটার কাছেই দাঁড়িয়ে হেনরী ব্লু। অর্থাৎ রুবী দেবীর স্বামী। হেনরী ব্লুর সাথে করমর্দন করে আমরা গাড়ীটার ভেতর ঢুকলাম। গাড়ীর ভেতরটা যেন মখমলের গদী। আমেরিকার ব্যাপার-স্যাপারই আলাদা, সব কিছুই বিরাট বিরাট। সাধারণ মোটরকারগুলো পর্যন্ত বিরাট। ইউরোপের মতো ছোট গাড়ী তৈরি করা যেন এদের নিয়মবিরুদ্ধ। আমি, কেশব ও মরুভিয়া পিছনের সিটে আর সামনে রুবী ও হেনরী। আমাদের নিয়ে স্কাইলার্কটা (Skylark) তার গতি নিল।

হোয়াইট হাউসের পাশ দিয়ে বেরিয়ে স্কাইলার্ক এগিযে চললো। প্রায় দশ মিনিটের মধ্যেই আমরা এসে পৌঁছলাম ভার্জিনিয়া এভেন্যুতে। বিরাট একটা বাড়ীর সামনে এসে আমাদের গাড়ী থামলো। গাড়ী থামার সাথে সাথে দেখি গাড়ীর দরজার সামনে দু'জন চাপরাশি এসে হাজির। আমাদের সেলাম জানিয়ে তারা গাড়ীর দরজা খুলে ধরলো। আমরা গাড়ী থেকে নামলাম। আমি তো অবাক— এ যে দেখছি রাজবাড়ী। মরুভিয়াকে জিজ্ঞেস করলাম— এলাহি ব্যাপার দেখছি— আমরা এলাম কোথায়?

—এখানেই রুবী ব্লু থাকেন। মরুভিয়া জবাব দিল।

আমি তেমনি ফিস্‌ফিস্ করে মরুভিয়াকে বললাম— তার মানে রুবী দেবী বিরাট বড়লোক বলতে হবে।

—নিশ্চয়ই —বড়লোক না হলে কি কেউ ওয়াটারগেটে (Water Gate*) ফ্ল্যাট কেনে?

অট্টালিকার ঠিক সামনে ঝর্ণা থেকে জল বেরিযে বিরাট এক পাত্র থেকে আর একটা পাত্রে অনবরত পড়ছে। সত্যি ওয়াটারগেট উপযুক্ত নাম বটে।

কাঁচের আর একটা দরজার কাছে আসতেই ভেতর থেকে চাপরাশি দরজা খুলে দাঁড়ালো। এইভাবে আরও দুটো বুলেট-প্রুফ (Bullet proof) কাঁচের স্বয়ংক্রিয় দরজা

---

* আমি যে সময়কার কথা লিখছি— সেই সময় ওয়াটারগেট, বাইরের জগতে পরিচিত ছিল না। সবেমাত্র ওয়াটারগেট অট্টালিকার সংলগ্ন ময়দানে, কেনেডি সেন্টার নির্মিত হয়েছে। পরে রাজনৈতিক কারণে এই ওয়াটারগেটের নাম পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে।

পার হয়ে আমরা একটা বারান্দায় এসে পড়লাম। নরম গদীর ওপর দিয়ে হেঁটে আমরা এসে দাঁড়ালাম লিফ্‌টের কাছে। লিফ্‌টের ভিতরে এসে দেখি চারপাশে আয়না আর ঠিক মাথার ওপরে টেলিভিসন ক্যামেরা। অর্থাৎ লিফ্‌টের মধ্যে কারা কোথায় যাচ্ছে তার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। এ বাড়ীর সিকিউরিটি অফিসার— বাড়ীর প্রত্যেকটি মাথার ওপর তার সতর্ক দৃষ্টি। সাত তলার ওপর এসে আমরা লিফ্‌ট ছাড়লাম। রুবী দেবীকে অনুসরণ করে আমরা এসে পৌঁছলাম তাঁর ঘরে। তাঁর ঐ সুসজ্জিত আধুনিক ঘরে— আমরা তিনজন (কেশব, আমি ও মরুভিয়া) যেন ঠিক বেখাপ্পা যোকাব, বিশেষ করে পোষাকে।

রুবীদেবী আমাদের আপ্যায়ন জানিয়ে ঘরে ঢুকতে বললেন। ঘরের ভেতরে নীল রঙের কার্পেটের সাথে খাপ খাইয়ে হাল্‌কা নীলরঙের একটা সেজ বাতি জ্বলছে। বিরাট ঘর, ঘরের এককোণে সোফা। কয়েকটা বাহারী পাতার পাম গাছ, আর কোণে বিরাট টেলিভিশন। আর তার পাশ থেকে সরাসরি উঠে গেছে একটা সিঁড়ি। ওপরে আরও তিনটে ঘর। টেবিলের ওপর সাজানো ফলের ঝুড়ি দেখিয়ে হেনরী বললে— হেলপ্ ইওরসেল্‌ফ (help yourself)। আমি একটা আপেলে কামড় দিয়ে বললাম— বাঃ চমৎকার পরিবেশ বটে। হেনরী এগিয়ে গিয়ে জানলার ভারী পর্দা ও খড়খড়ি সরিয়ে দিতেই ঘরটা দিবালোকে ভরে উঠলো। জানলার পাশে এসে দাঁড়াতেই ভার্জিনিয়া এভেন্যু নজরে পড়লো।

কেশব আমার পাশে এসে দাঁড়ালো— চমৎকার দৃশ্য, তাই না?

কেশবের দিকে তাকিয়ে বললাম— অবশ্যই। হেনরীও আমার পাশে এসে দাঁড়ালো— কি বিমলজী, তোমার এ ঘরটা পছন্দ হয়?

—নিশ্চয়ই— আমি জবাব দিলাম।

—ঠিক আছে, তাহলে চলে এসো যে কদিন ওয়াশিংটনে থাকবে, আমার এখানেই থেকো। কইগো রুবী শুনছো, বিমলজী আমাদের এখানে থাকবে বলছে, সত্যি চমৎকার হবে তাই না? হ্যাঁ আমাদের এখানে গুড ভাইব্রেশনের (Good vibration) অভাব— আর সেই অভাবটা পূর্ণ হবে। আমি হেসে তাঁকে বাধা দিয়ে বললাম— না না ধন্যবাদ। আমার অসুবিধা হলে এখানে চলে আসবো, তবে আপাততঃ কেশব ভাই ও মরুভিয়াকে ছাড়তে রাজি নই।

রান্নাঘরটা হলঘরের সাথেই লাগানো। রুবী রান্নায় ব্যস্ত হয়ে পড়লো। সোফার পাশেই একটা আলমারি, সেখানে বই ঠাসা। আমি সেদিকে এগিয়ে গেলাম। আলমারির দ্বিতীয় সারিতে কয়েকটা বইয়ের ওপর নজর পড়লো— গান্ধীজির দর্শন— ভগবৎ গীতার স্বামী শিবানন্দজীর লেখা ইংরেজী অনুবাদ, ভারতীয় সঙ্গীত ও কলা রবিশঙ্করের লেখা। এই ধরনের আরও কয়েকটা বই। তার মধ্য থেকে একটা বই আমি হাতে নিলাম— পাতা ওল্টাতেই নজরে পড়লো বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে লালকালি দিয়ে আন্ডারলাইন করা— বুঝলাম বইটাকে শুধু ঘর সাজাবার জন্যই কেনা হয়নি—

পড়বার জন্যই রাখা হয়েছে। আমি এই ভারত-দরদীর প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত করলাম। ভারত থেকে অনেক দূরে আর এক মহাদেশে ভারতীয় দর্শনের এমন মর্যাদা ... এত খাতির। হেনরী এতক্ষণে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, তাঁর দিকে তাকিয়ে বললাম— হেনরী, তোমার এখানে দেখছি পুরো ভারতীয় দর্শন রয়েছে।

—ওঃ, তুমি ওই বইএর কথা বলছো—ও সব রুবীর ব্যাপার, আমি ওসব মাথামুণ্ডু কিছু বুঝি না— হেনরী হেসে জবাব দিলেন।

—না না, ওর কথা বিশ্বাস করো না বিমলজী, ও সব বোঝে, কিন্তু সব সময় না বোঝবার ভান করে। —রান্নাঘর থেকে চেঁচিয়ে রুবী জবাব দিল।

আমি এবার হেনরীর দিকে তাকিয়ে বললাম— তুমি সত্যি মহাপুরুষ হেনরী। এই দেখ না, আমি জগতের এই মহাসত্যের কতটুকুই বা জানি, অথচ দিনরাত তারস্বরে চিৎকার করছি, আমি জানি, আমি জানি। এটা আমার অহংকার, আমার 'আমি' ভাব। আসলে আমি কিছুই জানি না। জানো, আমাদের শাস্ত্রে আছে— 'যে বলে সেই মহাসত্যকে আমি জানি সে কিছু জানে না। আসলে মূর্খেরা বলে জানি— আর জ্ঞানী বলে আমি জানি না।'

—না না, বিমলজী, বিশ্বাস করো আমি সত্যি বুঝি না—হেনরী বাধা দিয়ে বলে উঠলেন—এই দেখ না, শঙ্করভাষ্যের এই প্যারাগ্রাফটা লেখক বলছে— 'ধ্যানে বসে আমরা কিছুই করি না' —ধ্যানে বসে যদি আমরা কিছুই না করি তাহলে মিছেমিছি সময় নষ্ট করে লাভ কি?

—ঠিক ধরেছো হেনরী। ঠিক এখানেই আমাদেব ভাবতীয় দর্শনের মূল। ধ্যানে বসে আমরা কিছুই করি না। সম্পূর্ণ নিশ্চল অবস্থা, বাহ্যিক এবং আন্তরিক। সম্পূর্ণ নিষ্কাম, এমনকি সত্যিকারের ধ্যানমগ্ন অবস্থায় আমাদের মেটাবলিক প্রসেস পর্যন্ত থেমে যায়। সেই সময় আমরা বাহ্যতঃ কিছু করি না বটে, কিন্তু অতি সূক্ষ্মস্তরে আমাদের আত্মা বিশ্রাম লাভ করে ও পরমাত্মার থেকে তার এনার্জি নিয়ে আবার ফিরে আসে এই জগতে। ধ্যানভঙ্গ হলে তাই আমরা আগের থেকে আরও বেশি সক্রিয় হয়ে উঠি। এবারে তোমার কথায় আসা যাক— অর্থাৎ সব সময়ে সকলের দ্বারা হয়তো ধ্যানে বসা বা স্থিতাবস্থা লাভ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তবে চেষ্টা করতে ক্ষতি নেই। তবে যারা সেরকম চেষ্টা করতেও সময় পায় না, ক্ষতি নেই, ভারতীয় দার্শনিকরা তাদের জন্যও অনেক পথের নিশানা দেখিয়েছেন। কর্ম করো। জগতে সবাই চঞ্চল; অণু-পরমাণু থেকে আরম্ভ করে এই বিশাল বিশ্ব নক্ষত্র সব চঞ্চল, কাজেই কাজ করো। নিজের জন্য এবং পরের জন্য। তাইতো স্বামীজী কর্মযোগের জন্য বিশেষভাবে উপদেশ দিয়েছেন। এইতো দেখ না, রুবীদেবী আমাদের জন্য রান্নাঘরে কর্মযোগে ব্যস্ত।

আমার কথায় সবাই হো-হো করে হেসে উঠলো।

আধঘণ্টার মধ্যেই আমাদের খাবার তৈরি হলো। রুবীদেবী গরম খিচুড়ীর মতো বা ধরনের একটা কিছু তৈরি করেছে— মশলার গন্ধে ঘর ভরে উঠেছে। তার সাথে পাঁপড়ভাজা ও তরকারী। আমি তো আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম —পাঁপড়—ওঃ কতদিন পর — এই পাঁপড় তুমি কোথায় পেলে রুবী?

—ওয়াশিংটনে কি কিছুর অভাব! এখানে ইন্ডিয়ানদের কয়েকটা বিরাট দোকান। সেখানে কৃষ্ণঠাকুরের বস্ত্রহরণের ছবি পর্যন্ত পাওয়া যায়।

—তা ভালো—আচ্ছা, এবার আসা যাক খাওয়ার দিকে, নয়তো কৃষ্ণঠাকুর আমাদের খাবারের গরমত্ব হরণ করবেন— আমরা সবাই আবার হেসে উঠলাম।

ভগবানের নাম দিয়ে আমরা গরম খাবারে মন দিলাম....।

রুবী শুধু কথায় নয় রান্নাতেও ওস্তাদ। তরকারী, বেগুন ভাজা ও তার সাথে গরম ভাত। খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা বেরিয়ে পড়লাম। আমরা পায়ে হেঁটেই চলতে শুরু করলাম। ভার্জিনিয়া রোড ধরে আমরা হাঁটছি, আমাদের সাথে রুবীদেবী ও হেনরীও যোগ দিয়েছেন। রুবীদেবীর স্বামী হেনরী ভদ্রলোক পেশায় ব্যাবায়ী—জমির ব্যাপারী। এদেব ভাষায় যাকে বলে রিয়েলটি বিজ্‌নেস (Realty Business)। হাঁটতে হাঁটতে আমরা এসে পড়লাম ক্যাপিটাল হিল ময়দানের কাছে। নদীর ধার ধরে আরও একটু এগোতেই আমরা এসে পৌঁছলাম আব্রাহাম লিংকন মেমোরিয়ালের কাছে। বেশ গরম পড়েছে, আমেবিকানরা গরমকে খুব পছন্দ করে— ঠিক যেমন ইউরোপীয়ানরা।

আব্রাহাম লিংকন মেমোরিয়াল হল: বিরাট উঁচু উঁচু থামের ওপরে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিরাট অট্টালিকা। আমরা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এলাম। বাড়ীটা দেখে ঠিক মনে হয় না যে এটাই সেই পৃথিবীখ্যাত মহামান্য লিংকন সাহেবের স্মৃতিসৌধ। বাড়ীর থামের ওপরে বা সিঁড়ির দুদিকে ভালো করে নজর দিয়ে দেখলাম যে তাতে কোনরকম নিখুঁত শিল্পের চিহ্ন নেই। সরাসরি সিমেন্টের বড় বড় চাঁই দিয়ে দাঁড় করানো হয়েছে বিরাট এই সৌধ। তবে হাঁ— আর্কিটেকচারাল পয়েন্ট-অফ-ভিউতে এটা বেশ আশ্চর্যজনক বটে—। সত্যি অতি উঁচু দরের মডার্ন আর্কিটেক্ট।

সিঁড়ির ওপরের ধাপ পেরোতেই সামনে ভেসে উঠলো বিরাট উঁচু আব্রাহাম লিংকনের স্ট্যাচু। চেয়ারের দু' পাশে দু'হাত দিয়ে বসে আছেন মানবদরদী আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ষোড়শ প্রেসিডেন্ট (Sixteenth President) আব্রাহাম লিংকন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে তাঁর কীর্তি। আব্রাহাম লিংকন (1809-1865) নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের এক অসাধারণ চরিত্র। তাঁর প্রথম জীবনে কেউ ভাবতেই পারেনি যে—মাংসের দোকানে কাজ করা এই ছেলেটা একদিন আমেরিকা তথা সমগ্র বিশ্বের মন অধিনায়ক হবে। তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় দান ক্রীতদাস প্রথার বিলুপ্তি।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে তাঁর প্রতিভার চরম প্রকাশ। তিনি ক্রীতদাস প্রথার বিলুপ্তি ঘোষণা করলেন। মানুষ—মানুষ আমরা সব সমান। একজন বিদ্যায় ও অর্থের জোরে অন্যকে জন্তুর মতো দেখবে এটা সত্যি শুধু অন্যায় নয়, মানুষের প্রতি মানুষের এক চরম জিঘাংসা বৃত্তি। এই পৃথিবীতে সব মানুষের বাঁচবার সমান অধিকার। সাদা-কালো রঙের দ্বারা মানুষকে বিচার করা চলে না। মানুষের চরম বিচার তার বৃত্তির। তার মানসিক ও চারিত্রিক গঠনের দ্বারাই যাচাই করা চলে মনুষ্যত্ব। সাদা লোকেরা কালো লোকদের জন্তুর মতো খাটাবে— তাদের কিনবে আফ্রিকা থেকে আর বিক্রি করবে আমেরিকার মাটিতে। আর সেই কেনা চাকরদের কাছ থেকে জোর করে আদায় করা হবে তাদের শ্রম। প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসার বদলে তাদের ওপর চলে অকথ্য অত্যাচার। সত্যি এ সম্পূর্ণ মানবজাতির চরম অপমান। আমরা মানবজাতি একই সূত্রে বাঁধা— আর সেই কারণেই আব্রাহামের মন ব্যথিত হল। ক্রীতদাসের জন্য তাঁর অন্তর করুণায় ভরে উঠলো। তাই প্রবল বাধা-বিপত্তিকে এড়িয়ে অথবা তাদের সাথে সংগ্রাম করে তিনি আইন করে দিলেন দাসমুক্তি। সেই সময় থেকেই আমেরিকার ইতিহাসে ইউরোপীয় সাদা চামড়া ও নিগ্রোদের কালো চামড়া একসাথে মিলিত হ'ল। তাদের সমান অধিকার স্বীকৃত হল এই আমেরিকার মাটিতে। ক্রীতদাস নিগ্রোরা স্বীকৃত হল আমেরিকান নাগরিক হিসেবে।

আমরা ঘুরে ফিরে ওর চারধার দেখতে লাগলাম। আমাদের মতো চারপাশে আরও অগুনতি মানুষ— ট্যুরিস্টদের দল। এবার আমবা সিঁড়ি ধরে নেমে এলাম মাঠের দিকে— মাঠটা বিরাট, অনেকটা যেন কলকাতার গড়ের মাঠ।

আব্রাহাম লিংকন মেমোরিয়াল থেকে সরাসরি ক্যাপিটল হিল্ বা পার্লামেন্ট ভবন দেখা যায়। ওখান থেকে সরাসরি ক্যাপিটল হিলে যেতে পায়ে হেঁটে প্রায় একঘন্টা লাগে। আর এই দূরত্বের মাঝে আর কোনো বাড়ীঘর নেই। অনেকটা আমাদের দিল্লীতে রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে সরাসরি ইন্ডিয়া গেটের দৃশ্য। তবে এখানে রাস্তার বদলে সবুজ ঘাস ও জলের বাহার। জেফারসন মনুমেন্ট আমাদের ঠিক সামনেই। রুবী ও হেনরীর অফিসে যাবার সময় হয়ে এসেছে, কাজেই তাবা 'গুড্ বাই' জানিয়ে চলে গেল। রুবীদেবী ও হেনরী উভয়ের বয়েস পঞ্চাশেব ওপরে, অথচ চলায় ফেরায় ও কথাবার্তায় ঠিক যেন চব্বিশ—আমেরিকানদের এই ছেলেমানুষি স্বভাব চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য। আমি, মরুভিয়া ও কেশব এগিয়ে এলাম মনুমেন্টের দিকে। হাঁটতে হাঁটতে পা ব্যথা হয়ে গেছে, কাজেই মনুমেন্টের কাছে একটা ভালো জায়গা পেয়ে আমরা বসে পড়লাম।

হঠাৎ. মরুভিয়া গলা ছেড়ে গাইতে শুরু করলো— হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে..... কেশবও তার সাথে যোগ দিল, আমিও বাদ গেলাম না। দেখতে দেখতে আশে-পাশে লোক জড়ো হতে লাগলো— কয়েকজন উৎসুক জনতা আমাদের গানে যোগ দিল। দেখতে

দেখতে আমাদের কাছে ভীড় জমে উঠলো। আমরা উঠে দাঁড়ালাম—খানিকক্ষণের মধ্যেই আমাদের রামগান কীর্তনে পরিণত হলো। দু'হাত তুলে আমরা নাচতে শুরু করলাম। আমাদের দলে বেশ কয়েকজন স্যুট-কোট-টাই পরা ভদ্রলোকও এসে জুটেছে। এর মধ্যে লক্ষ্য করে দেখলাম কয়েকজনের মুণ্ডিত মস্তক, অর্থাৎ ন্যাড়া মাথা আর তার সাথে বিরাট চৈতন্য, অর্থাৎ টিকি। কীর্তনে দেখছি ওদের গলাই সবচেয়ে উর্ধ্বে।

যদিও এরা ধুতি ও টিকিধারী, কিন্তু মোটেই ভারতীয় নয়। এরা খাঁটি আমেরিকান, প্রভুপাদ ভক্তিবেদান্তদেবের শিষ্য। গুরু প্রভুপাদ খাঁটি বাঙালী, তবে তিনি তাঁর প্রধান আখড়া করেছেন বোস্টনে, অর্থাৎ এই আমেরিকান বোস্টনকে তিনি বলেন নতুন নবদ্বীপ। বলাই বাহুল্য, ভক্তিবেদান্ত প্রভুপাদ পরম বৈষ্ণব। আমেরিকায় তাঁর শিষ্যের সংখ্যা প্রায় হাজার খানেক তো বটেই। আমেরিকার বিভিন্ন শহরে, এমনকি ইউরোপেরও বড় বড় শহরে তাঁর শিষ্যেরা খোল-করতাল বাজিয়ে গেরুয়া ধুতি ও মুণ্ডিত মস্তকে সেই পরম আবাধ্য জগৎপিতা কৃষ্ণের নাম বিতরণ করছে। এই কলিতে কৃষ্ণের নাম ও মহামন্ত্রই সব পাপ দূর করবার একমাত্র উপায়।

প্রায় একঘন্টা ধরে আমাদের কীর্তন চললো—আমেরিকার মাটিতে মহামন্ত্র চারদিকে ধ্বনিত হতে লাগলো। আমি তো ভাবতেই পারিনি যে এত সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে আমাদের কীর্তন সম্পন্ন হবে। অবশ্য আমাদের এই কীর্তনদলে অধিকাংশই মুড-মেকার (Moodmaker) অর্থাৎ ভড়ং। তা হোক, শাস্ত্রে বলে ঠাকুরের নাম যে যেভাবেই নিক না কেন, তার ফল হবেই— স্বল্পমাত্র ধর্মও মহাভয় দূর করে—'স্বল্পম্ অল্পস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।'

আমরা এবার ফেরার পথ ধরলাম। সাদা বাড়ীর (White House) কাছে পিচের রাস্তায় এসে পড়তেই হঠাৎ আমার জুতোর একটা সোল খুলে বেরিয়ে গেল—অনেকদিন যাবৎই এটার অবস্থা কাহিল হয়ে এসেছিল, কিন্তু বহুজনের বহু পরামর্শ সত্বেও তাকে আমি ফেলে দিতে পারিনি। আমার ক্যাম্বিসের এই ছেঁড়া জুতোটা আমার পথের সাথী। এই একজোড়া জুতো নিয়েই আমি সমস্ত ইউরোপ ঘুরেছি। এই জুতোটা কিনে দিয়েছিলেন এথেন্সের ডাক্তার করিলোস। আমেরিকার মাটিতে যেদিন প্রথম পা দিই সেইদিনই বুঝেছিলাম যে এর দফা-রফা হয়ে এসেছে, অনেকদিন এখানে জুতো সারাবার দোকানে গিয়েছি, কিন্তু তারা যে দাম বলে তাতে জুতো সারাবার বদলে দু'জোড়া নতুন জুতো কেনা হয়ে যাবে— তাই আর সারানো হয়নি। গত কয়েকদিন যাবৎ আমি বুঝতে পারছিলাম যে এ আর বেশিক্ষণ টিকবে না। প্রায় সব সময়ই পায়ের নীচে জুতোর সোলের বদলে রাস্তা পেয়েছি, তার মানে কোনো রকমে গোঁজামিল দিয়ে চলছিল আর কি! যাই হোক, জুতোটা অতি সামান্য ব্যাপার, কাজেই তার বিষয় নিয়ে ডায়েরীর পাতা না ভরানোই ভালো। কিন্তু কি করবো, অনেকদিনের পুরোনো জুতোটার প্রতি আমার যেন মায়া পড়ে গিয়েছিল। গত দেড় বছর যাবৎ যার ওপর আমার পা রেখেছি তাকে কি আর সহজে ভোলা

যায়— তাকে সহজে ত্যাগ করিই বা কি করে? কিন্তু নিরুপায়—জুতোটাকে হাতে করে ভালো করে পরীক্ষা করে বুঝলাম, নাঃ সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। কাজেই ল্যাম্প পোস্টের সাথে আটকানো ময়লা কাগজ ফেলার বাক্সে তাকে রেখে দিতে বাধ্য হলাম।

মরুভিয়া আমার পায়ের দিকে তাকিলে বললো— দেখ তোমার পা-টা ছাড়া পেয়ে কত খুশী— খালি পায়ে হাঁটতে মজা, কিন্তু ভাঙা কাঁচের ভয়। কেশব আমাকে আশ্বাস দিয়ে বললো— ভয় নেই চলো, টেন সেন্টস (Ten Cents)-এর দোকান থেকে একজোড়া জুতো কেনা যাক। টেন সেন্টেস-এর দোকান? সেটা আবার কি জিনিস? ওরা আমাকে বুঝিয়ে দিল, আমি বুঝলাম। টেন সেন্টস (Ten Cents)-এর দোকান মানে আমাদের ভাষায় দশ পয়সার দোকান— অর্থাৎ নিলাম ঘব। এগারো নম্বর রাস্তায় আসতেই পেলাম দশ পয়সার দোকান। বাইরে বিরাট সাইন বোর্ডে লেখা 'Ten Cents Shop' ভেবেছিলাম দোকানের ভেতরে সব কিছুই দশ পয়সা দর। কিন্তু আসলে তা নয়, নামে মাত্র দশ পয়সা। এই দোকানকে সোজা কথায় সারপ্লাস আর্মি স্টোর বলা চলে। আর্মি, নেভী ও এয়ারফোর্সের ব্যবহৃত ও অব্যবহৃত, নতুন ও পুবোনো তৈজসপত্র, জামা-কাপড়ের বিরাট বহর। দেয়ালের বিভিন্ন জায়গায় বড় বড় লেখা— Shop Lifting Prohibited অর্থাৎ চুরি করা নিষেধ। দোকানে সব কিছুই অতি সস্তা দরে পাওয়া যায়। আমরা জুতোর ঘরের দিকে এগিয়ে চললাম— এই এদিকে এসো— মরুভিয়া এতক্ষণে ক্যাম্বিসের একজোড়া জুতো বেছে নিয়েছে। সেদিকে এগিয়ে গেলাম, ও আমাকে জুতো পরতে বললো— হ্যাঁ ঠিক এক্জাক্ট— কত দাম? আমি জিজ্ঞাসা করলাম। জুতোর নিচে দামটা দেখে মরুভিয়া বললে ছ' ডলার। বেশী নয়। বাইরে ঠিক এই জুতোর দাম হবে কম করেও দশ ডলার। আমরা দাম মিটিয়ে দিয়ে বেবিয়ে এলাম।

চলতে চলতে মরুভিয়া বললে— এই দেখ, তোমার জুতোর ওই সাদা রঙটা বড়ো বিশ্রী ধরনের বেমানান্, এদিকে এসো—রাস্তার পাশে একটা গাছকে কেন্দ্র করে কিছু ধুলো মাটি ছিল, মরুভিয়ার ডাকে সেখানে যেতেই ও আমার নতুন সাদা ধবধবে জুতোটার ওপর ধুলো-বালি ছড়িয়ে দিল— আমি করো কি করো কি করে সরে দাঁড়ালাম, ভাবলাম আমার সঙ্গে ও রসিকতা করছে। কেশবের দিকে তাকিয়ে বললাম— মরুভিয়ার কাণ্ড দেখছো? কেশব নির্লিপ্তভাবে বললো—মরুভিয়া ঠিক কথাই বলেছে, ওর সাথে আমি একমত। ওদের দিকে লক্ষ্য করে বুঝলাম সত্যি কথা— ওরা সিরিয়াস। ঠিক আছে, ওদের সাথে যখন আছি—ঠিক হ্যায়, ডু, অ্যাজ রোমানস ডু। এটাও উঠ্‌তি বয়েসি আমেরিকানদের আর একটা বৈশিষ্ট্য। এরা সাদা কাপড়ের জুতো বা সাদা নতুন ক্যাম্বিসের জুতোকে একটু ময়লা না করে পরে না । অদ্ভুত বটে— বিশেষ করে আমার চোখে। অবশ্য পরে বুঝেছি যে সব আমেরিকানদের চরিত্র একরকম নয়, একমাত্র ছেঁড়া ময়লা সার্ট আর নেভী ব্লু জিনস্ যারা পরে তাদের কথাই বলছি।

সন্ধ্যে হয়ে এলো। হঠযোগ ক্লাসের সময় হয়ে এলো, কাজেই সুপার মার্কেট Safeway থেকে একটা বিরাট কালো তরমুজ কিনে আমরা কেন্দ্রের পথ ধরলাম।

দেখতে দেখতে বেশ কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল। আমি ওয়াশিংটনে আছি বেশ মজায়। থাকার জন্য এয়ার-কণ্ডিশনের ঘর, খাওয়ার জন্য কোনো অসুবিধা নেই, কোনদিন রুবী দেবীর বাড়ীতে, যোগ কেন্দ্রে রয়েছে মরুভিয়া, তাছাড়াও দৈনিক বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে আসছে প্রচুর আমন্ত্রণ। আর একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, ওয়াশিংটনে আমাকে যত লোক ভূ-পর্যটক হিসেবে চেনে, তার চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যক লোক আমাকে চেনে যোগী হিসেবে। কোথা থেকে কি করে যে আমি যোগী হলাম আমি নিজেই জানি না। মাঝে মাঝে যখন সময় পাই তখন পটোম্যাক নদীর ধারে বসে বসে ভাবি, আত্মবিচার অথবা আত্মিক চিন্তায় নিজেকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করি। কিন্তু যতই চিন্তা করি না কেন নিজের বিচার-বুদ্ধিতে কিছুতেই বুঝতে পারি না কি করে আমি যোগী হ'লাম। দেশে থাকতে অনেক যোগী বা মহন্তের পিছনে ছুটেছি বটে, কিন্তু তাঁদের স্পর্শ করা তো দূরে থাক তাঁদের কাছ পর্যন্ত ঘেঁসার ক্ষমতা আমার ছিল না।

১৯৬০ সালে আমি বাড়ী থেকে ভূ-পর্যটনের জন্য পা বাড়াই। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত নিজেকে বাউন্ডুলে পর্যটক ভিন্ন কিছু ভাবতে পারিনি। অথচ এই কয়েক সপ্তাহ ধরে চারদিক থেকে আমাকে ভারতীয় যোগী বলে বলে কান-ঝালাপালা করে দিল। আমি যতই এদের বলি আমি মোটেই যোগী নই, আমি পর্যটক মাত্র—কিন্তু এরা নাছোড়বান্দা। আমাকে এরা ধরে বেঁধে যোগী বানাতে চায়। আমি যখন বলি—ভুল করো না, —আমাকে উঁচু আসন দিও না, আমি সাধু নই— এরা বোঝে না— ভাবে এ আমার বিনয়। গ্রীসে এথেন্সে থাকাকালীন ঠিক এই ধরনের পরিস্থিতিতে পড়েছিলাম। তবে আমার পালালে চলবে না— এদের সম্পর্কে আরও জানতে হবে। আমেরিকার এই যে একটা বিরাট জাতি, যাদের অগ্রগতি অব্যাহত, তাদের সম্পর্কে আরও অনেক জানতে হবে— কিসের বলে, কোন যাদুর কৌশলে এরা পৃথিবীর অন্যতম সেরা জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। শুধু অর্থে নয়, বিদ্যায় ও বিজ্ঞানের উপযুক্ত ব্যবহারেও বটে। তাইতো শুধু পৃথিবীতে নয়, এদের যশ প্রতিষ্ঠার ধ্বজা আজ চাঁদে পর্যন্ত পৌঁছেছে। এদের সাথে না মিশলে, এদের সাথে না থাকলে এদের সম্পর্কে জানা মুশকিল। কিন্তু আমি এখন আমেরিকার যে পরিবেশে আছি সেটা সম্পূর্ণ অন্য জগৎ— তার মানে ভিন্ন পরিবেশ। ভিন্ন পরিবেশ হলেও এরা খাঁটী আমেরিকান। সব কিছুকে জানতে হবে; পৃথিবীতে এমন কিছু আছে কি যা জানা অসম্ভব! মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনায় যতদূর যাওয়া চলে এরা যাচ্ছে। আর যতই এগোচ্ছে ততই দেখছে যে এই জানার সীমা অসীম। হোক সে অসীম তবু পা বাড়াতে হবে, এই অসীমকে যতটুকু সীমানার মধ্যে আনা যায় ততই ভালো—সেটাই জ্ঞান।

এই বিরাট জিজ্ঞাসুদের মধ্যে যারা ধর্মকে জানতে চায়, আমি তাদের মধ্যে এখন বাস করছি। আমাকে এরা নতুন ভাবে আবিষ্কার করেছে। আমার মধ্যে যে শুদ্ধ আমিত্ব এতদিন সুপ্ত ছিল এরা সেটাকে জাগিয়ে দিচ্ছে। বাউণ্ডুলে জীবনে আমার অভিজ্ঞতার একটা নতুন দিকের সূচনা হ'ল। এরা যখন আমাকে দর্শনতত্ত্ব শোনাতে বলে, আমি এদের শোনাই বটে, কিন্তু তার চেয়ে বেশী করে আমি নিজে শুনি, মাঝে মাঝে অবাক্ হই— এ কি সত্যি? আমি নিজে তো কোনদিন এ বিষয়ে চিন্তা করিনি, অধ্যয়ন করিনি, অথচ কি করে আমি এদের এই বিরাট প্রশ্নের সমাধান করছি? পরে নিজেই নিজের জবাব দিই, এ আমি নই— আমার অন্তরস্থ শুদ্ধসত্বা আমার হয়ে কথা বলছে। এইভাবে ধীরে ধীরে আমি অনুভব করতে লাগলাম যে আমার মধ্যে শুধু এই ছোট্ট আমিই বাস করে না, তার সাথে আছে আর এক বিরাট পুরুষ তাকে দেখা যায় না বটে কিন্তু তার প্রকাশ ঘটে। আমি তাই ধন্যবাদ দিই আমার বন্ধুদের যারা আমাকে এ ব্যাপারে অহরহ সাহায্য করছে।

এরই মধ্যে একদিন প্রেসিডেন্ট নিক্সনের সাথে দেখা করবার আমন্ত্রণ পেলাম। যোগাযোগ করেছে রুবী ব্লু। আমি আগেই বলেছি যে রুবী ব্লু থাকে Walter Gate Buildingএ। রাস্ট্রপতির অধিকাংশ সেক্রেটারী ও আমেরিকা যুক্তরাস্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচাবপতি ওই একই বিল্ডিংএ থাকেন, অবশ্য এ ছাড়াও অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিদের আড্ডা ওই ওয়াটারগেটে।

এত সহজে রাস্ট্রপতির সাথে দেখা করা সম্ভব হবে আমি কল্পনাই করতে পারিনি।

এগারোই জুলাই (11th July 1933), পরিষ্কার সকাল। আমি সাইকেলটা নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরোতে যাবো— এমন সময়, আমার সামনেই দেখি মরুভিয়া!

—কোথায় চললে বিমলজী?

—হোয়াইট হাউসে মরুভিয়া— জবাব দিলাম।

—হোয়াইট হাউসে কেন? সেখানে আবার কি? মরুভিয়া অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করলো।

—আজকে প্রেসিডেন্টের সাথে আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ, তবে এটা একান্তই ফরমালিটি— কয়েক মিনিটের ব্যাপার। এখন তো সাড়ে নটা, ঠিক দশটায় আমার ওখানে যাওয়া চাই। আচ্ছা এখন চলি, আমি এসে সব বলবো— এই বলে আমি মরুভিয়াকে পাশ কাটাতে চাইলাম। মরুভিয়া আমার দিকে চেয়ে মিচ্‌কি হেসে বললো— বেশ যাচ্ছো যাও, কিন্তু সেখানে যাওয়ার কোন অর্থ আছে বলে আমার মনে হয় না। আমি হেসে উত্তর দিলাম— ঠিক্ কথা, আমরা দৈনন্দিন এমনি অর্থহীন কত কিছুই যে করছি তার কোনো ঠিক্ আছে?— আচ্ছা এখন চলি কি বলো, সময় হয়ে এলো— আমি প্যাডেলে পা বাড়ালাম।

হোয়াইট হাউসের গেটের সামনে আসতেই সঙ্গীনধারী হোয়াইট হাউস গার্ড আমাকে অতি বিনয়ে জিজ্ঞাসা করলো যে আমার ভেতরে যাবার পারমিশন আছে কিনা। আমি পকেট থেকে তাকে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা দেখাতে সসম্মানে সে দরজা খুলে দিল।

তাকে জিজ্ঞাসা করলাম আমার সাইকেলটা রাখবার কোনো ব্যবস্থা করা যায় কিনা। সে হেসে জবাব দিল যে, এই হোয়াইট হাউসে মোটরের ব্যবস্থা আছে বটে, কিন্তু সাইকেলের কোনো ব্যবস্থা নেই— তবে হ্যাঁ, আমি ইচ্ছে করলে গার্ড রুমের পিছনে রাখতে পারি। সাইকেলটাকে তার কথামত সেখানে রেখে আমি হোয়াইট হাউসের দিকে এগিয়ে চললাম। ডান পাশের গোল ফোয়ারাটা পেরোতেই সামনে এক ভদ্রলোকের মুখোমুখি। ভদ্রলোক তাঁর হাতটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন— আমার নাম ম্যাক্‌কার্টন (Mc Carton),

গুড্ মর্নিং, আমার নাম বিমল দে।

হাসিখুশী ভদ্রলোক— সাদা সার্টের ওপর নীল সুট ও হোয়াইট হাউস আঁকা টাইয়ে ভদ্রলোককে চমৎকার মানিয়েছে। পরিচয়ে জানলাম যে তিনিই এখানকার এক্‌জিকিউটিভ ফর দি ভিজিটিং সার্ভিস। এতবড় উঁচু পোষ্টে কাজ করেন অথচ অতি সাদাসিধে ভদ্রলোক, আমাকে আপ্যায়ন করবার জন্য অফিস ছেড়ে সরাসরি বাইরে বেরিয়ে এসেছেন— তাঁকে আমি আমার আন্তরিকতা জানালাম।

ম্যাক্‌কার্টনের অফিসে ঢুকে দেখি সে এক বিরাট ব্যাপাব। টেবিল, চেয়ার, আসবাব-পত্র, সেক্রেটারী, সব কিছু মিলিয়ে এক কথায় বলা চলে যে তিনি নিজেই যেন এক ছোটখাটো প্রেসিডেন্ট। তাঁর অফিসে বসে ফরমালিটির জন্য কয়েকখানা ফরম্ ফিল্-আপ করতে হ'ল— নাম, ধাম, পেশা, জাতীয়তা আর জন্ম তারিখ। কথায় কথায় তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করা কি খুবই কষ্টসাধ্য? ম্যাক্‌কার্টন আমাকে বুঝিয়ে বললেন— যে কোনো দেশের প্রেসিডেন্ট— মানে বলাই বাহুল্য, যে ব্যস্ততার মধ্যে তাঁকে কাটাতে হয়। তবে আমেরিকান প্রেসিডেন্টের দৈনিক রুটিনে একঘন্টা সর্বসাধারণের জন্য খোলা থাকে— তবে এর মধ্যে বিদেশীদেব ক্ষেত্রে প্রায়রিটি থাকে। তবে অনেক বিদেশী যদি একদিনে অ্যাপ্লিকেশন করে তার মধ্যে গুণ ও ব্যক্তিবিশেষে তার প্রায়রিটি (priority)।

ঠিক সময়মতো আমাকে নিয়ে ম্যাক্‌কার্টন মশাই উঠলেন। ডান দিকেব কয়েকটা ঐতিহাসিক প্রদর্শনী ঘর পেরিয়ে আমরা উত্তর দিকের ব্যালকনি পেরিয়ে ভিতর দিকে ঢুকতেই, প্রেসিডেন্টের ঘরের কাছে এসে হাজির হ'লাম। দরজার দুপাশে হোয়াইট হাউস গার্ড। দরজায় মৃদু আঘাত করে আমরা ভিতরে ঢুকলাম।

ঘরে ঢুকতেই মুখোমুখী প্রেসিডেন্ট নিক্সনের সাথে সাক্ষাৎ। মহামান্য প্রেসিডেন্ট চেয়ার ছেড়ে দরজার কাছে উঠে এসেছেন আমাকে আপ্যায়ন করতে। ইউরোপ বা আমেরিকার যে কোনো গণ্যমান্য ব্যক্তিদের দেখেছি, তাঁরা সরাসরি দরজার কাছে

উঠে এসে অভ্যাগতকে স্বাগত জানান। ভারতে আমি ঠিক এই ধরণের অভ্যর্থনা পেয়েছিলাম যখন আমি তদানীন্তন এয়ার মার্শাল অর্জুন সিং মহাশয়ের সাথে দেখা করতে যাই। বায়ুভবনে তিনি ঠিক এমনভাবেই আমাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন।

প্রেসিডেন্ট নিক্সন হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন— হ্যালো গ্লোবট্রটার, ওয়েলকাম টু আমেরিকা— অর্থাৎ এসো ভূ-পর্যটক আমেরিকায় স্বাগতম্।

পাশে একটা গোল টেবিলকে ঘিরে আমরা বসলাম। আমাদের কথাবার্তা চললো:

—তারপর শুনলাম, আপনি সাইকেলে করে ভূ-পর্যটনে বেরিয়েছেন। আপনার মূল লক্ষ্য কি?

—সাইকেলে করে বেরিয়েছি, তারমানে ধীর গতি, আব অধিক অভিজ্ঞতা। আমার মূল লক্ষ্য এই পৃথিবীর বৈচিত্র্য দেখা। এই পৃথিবীর মানুষ, সমাজ, ভূগোল আর ভগবানের সৃষ্টি এই প্রকৃতিকে উপলব্ধি করা।

—আপনি কি লিখছেন আপনার অভিজ্ঞতা?

—অবশ্যই। আমি দৈনিক ডায়রী লিখছি।

—আমেরিকা আপনার কেমন লাগছে?

—আমেরিকা বলতে তো এক বিরাট জগৎ বোঝায়, আসলে আপনি কোন দিকটার কথা বলতে চান?

—আমি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলছি।

—তাই বলুন। সত্যি কথা বলতে কি, আমি এখানে মাত্র মাসখানেক হ'ল এসেছি। কাজেই এতো অল্প সময়ে এমন বিরাট দেশ সম্পর্কে কোন অভিমতই প্রকাশ করা সম্ভব নয়— তবে হ্যাঁ, আমার পর্যটনের পরে যদি সুযোগ হয় বলবো।

—আমি শুনেছি আপনি মাত্র সাত ডলার নিয়ে এখানে পৌঁছেছেন— সত্যি সাহস বটে।

—না, এটা ঠিক সাহস নয়, বিশ্বভ্রাতৃত্বে বিশ্বাস, আমি বিশ্বাস করি যেখানে মানুষ, মানবতা সেখানে।

—হ্যাঁ ঠিক কথা, আপনি তো আবার গান্ধীর দেশের লোক—প্রেসিডেন্ট হেসে উঠলেন।

আমিও হেসে জবাব দিলাম— গান্ধীর দেশে কিন্তু সবাই গান্ধী নয়, তাই নয় কি?

টেবিলের ওপর একটা আলো মিট্‌মিট্ করে জ্বলে উঠলো, বুঝলাম আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে। আমি উঠলাম।

আমি প্রেসিডেন্টকে তাঁর আন্তরিকতা ও সময়ের জন্য বিশেষ ধন্যবাদ দিলাম। তিনিও আমার সফলতা কামনা করে করমর্দন করলেন। তাঁর ঘর ছাড়লাম।

ঘর ছেড়ে বাইরে আসামাত্র দেখি দু'জন ফটোগ্রাফার ও রিপোর্টার আমার সামনে এসে হাজির। তাঁদের আমি বিশেষ অনুরোধ জানালাম আমার নাম যেন কাগজে ছাপানো না হয়— এটা নেহাৎই সামান্য কয়েক মিনিটের গুড্‌উইল ভিজিট।

আমার আমেরিকা সফরের পর যেতে হবে অস্ট্রেলিয়া, তারপর জাপান, তারপর ভারত। দক্ষিণ আমেরিকা সফর শেষে অস্ট্রেলিয়া ও জাপান সবই জলপথের ব্যাপার— তাই বাধ্য হয়ে আমাকে জাহাজ নিতে হবে। এর জন্য প্রচুর টাকার দরকার। অবশ্য কোন কোন সময়ে জাহাজে কাজ পাওয়া সম্ভব, তবে সেটা নেহাৎই ভাগ্যের ব্যাপার। আর এর জন্য অনেক সময় বন্দরে মাসের পর মাস অপেক্ষা করে বসে থকতে হবে— কাজেই সব দিক বিবেচনা করে ঠিক করলাম— একটা চাকরীর বন্দোবস্ত করতে হবে যাতে অন্ততঃ জাহাজের ভাড়ার টাকাটা পকেটে আসে।

সেদিন রুবী ব্লুকে কথায় কথায় আমার পরিকল্পনাটা জানালাম— আসল কথা আমার টাকাব দবকাব। আমি এখানে ছোটখাটো একটা চাকরী পেলে খুব খুশী হ'ব। রুবী ব্লু লাফিযে উঠলো— অতি উত্তম— তুমি আমাদের এই যোগ সোসাইটির ডিরেক্টর হয়ে যাও, তাতে মাসিক বেশ কিছু টাকা আসবে। আমাদের এখানে সত্যি একজন ডিরেক্টবের দবকার। তোমাকে সম্পূর্ণ অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশনের দায়িত্ব নিতে হবে— কি, রাজি আছো?

—না—আমি যোগ সোসাইটির ডিরেক্টব হতে চাই না, তাব জন্য টাকা নেওয়া তো দূবেব কথা। তবে আমি আমার যথাসাধ্য সাহায্য করবো। এটা আমাব আনন্দ এবং আত্মতৃপ্তি। আমি নিজেকে এই বিরাট দায়িত্বের মধ্যে জড়াতে চাই না। আমি রুবী ব্লুকে বুঝিয়ে বললাম, সে যদি বাইরে ছোট-খাটো একটা কাজের বন্দোবস্ত করে দেয় তাহলে খুব খুশী হ'ব।

আমার পক্ষে এখানে চাকরী পাওয়া মুশকিল, চাকরী করতে হলে চাই ওয়ার্কিং পারমিট, পারমানেন্ট অথবা স্টুডেন্টস্ ভিসা অথবা ইমিগ্রেসন সার্টিফিকেট, আমার এর কোনটাই নেই। কাজেই অনেক চেষ্টা সত্বেও কাজ পাওয়া মুশকিল হয়ে দাঁড়ালো। বিভিন্ন সভা-সমিতিতে, স্কুল-কলেজ ও ইউনিভার্সিটিতে আমার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে লেকচাব দিয়ে কিছু ডলার আসে বটে, কিন্তু তা সমুদ্র পাড়ি দেবার পক্ষে মোটেই যথেষ্ট নয়। কেশব ও মরুভিয়া চায় না যে আমি চাকরী করে সময় নষ্ট করি। যদি একান্তই আমার টাকার দরকার হয়ে থাকে তাহলে তারা চাঁদা তুলে তার বন্দোবস্ত করতে রাজি। তবে আমি চাঁদার পক্ষপাতি নই— বিশেষ করে যেখানে আমার কোন দান নেই, সেখানে আমিও কারও দান নিতে চাই না।

তবে আমার ভাগ্যটা পরিব্রাজক জীবনে সত্যি খোলা। সময় সময় দুর্যোগ আসে বটে, আকাশ মেঘলা হয় বটে, কিন্তু আবার তা কেটে যায়। জগতে কোন সমস্যাই চিরদিন থাকে না, শুধু সময়ের ফের। ধৈর্য ধরে থাকলে সবুরে মেওয়া ফলে

বৈকি। কথায় কথায় সেদিন জাফরী (রুবী ব্লু'র বড় ছেলে)-র কাছে জানতে পারলাম যে ওর ব্যবসার ব্যাপারে একজন মেসেঞ্জরের দরকার। আমি হঠাৎ ওকে বলে ফেললাম— আমাকে নিয়োগ করে ফেলো। ও প্রথমটায় বিশ্বাস করতে চায়নি, অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললো— সে কি বিমলজী, তুমি করবে মেসেঞ্জরের চাকরী, সত্যি বলছ?

—সত্যি আমি সিরিয়াস— শোনো জাফরী, আমি হচ্ছি পর্যটক। জগতে সবকিছুর মধ্যে রয়েছে অভিজ্ঞতা, কাজেই কোনরকম কাজকেই অবহেলা করা চলে না— আর শুধু তাই নয়, আমি ডিগনটি অফ লেবারে বিশ্বাসী। ছোট বড় সব কাজই আমার কাছে সবান সম্মানীয়।

পেয়ে গেলাম কাজ— টাকার কোন প্রশ্ন নেই। আমি জাফরীকে স্পষ্ট বলে দিলাম— আমাকে আগে কাজ করতে দাও, তারপর তুমি তার যাচাই করে টাকা দিও। —অলরাইট।

জাফবীর ফটোগ্রাফির ব্যবসা। বিভিন্ন খববের কাগজে অ্যাডভারটাইজ-এর জন্য ও তৈরী করে বিভিন্ন ধরণের ছবি। আর্ট, আর্টিস্ট, ক্যামেরা ও ফটো নিয়ে ওর কারবাব। ওর ভাষায় এটা একটা ছোট্ট ব্যবসা— আমার দৃষ্টিভঙ্গিতে লাখপতি।

হেনবী ও রুবী ব্লুর ছেলে জাফবী ব্লু। আসলে এরা ইহুদী, কাজেই ব্যবসা এদের বক্তের নেশা, ব্যবসাক্ষেত্রে এবা যাদুকব। আমাব কাজটা মোটেই জটিল নয়। ওয়াশিংটনের পথে পথে যোবা। এক স্টুডিও থেকে আর এক স্টুডিওতে ফটোগ্রাফি সংক্রান্ত জিনিসপত্র বহন করা। বিভিন্ন স্টুডিও থেকে ছবি নিয়ে কোন কোন সময় আর্টিস্টদের সাথেও আমাকে যোগাযোগ কবতে হয়। এ ব্যাপারে আমাব সাইকেলটাই আমার প্রধান সহায়। এই কাজেব ব্যাপারে আমি ওয়াশিংটনের প্রত্যেক অলি-গলি প্রায় চিনে ফেললাম।

সকাল আটটা থেকে আমার কাজ শুরু হয়, মাঝখানে একঘন্টা টিফিন, তারপর আবার কাজ সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ট। জাফরী ও সহকর্মী লেয়ন নরটন (Leon Norton), ওরা দু'জনেই প্রায় আমার সমবয়সী— তার মানে প্রায় তিরিশেব (৩০) কাছাকাছি। স্টুডিওতে আরও আটজন কর্মী। নতুন ব্যবসা, কিন্তু দেখে মনে হয় বেশ অগ্রণী অর্থাৎ অল্প সময়ের মধ্যেই বেশ গুছিয়ে নিয়েছে।

আমাকে সারাদিনে প্রায় আটঘন্টা শহরের বিভিন্ন দিকে ছোটাছুটি করতে হয়। এইভাবে শহরের সম্ভ্রান্ত পথ থেকে অন্ধকার গলিগুলো পর্যন্ত আমার মুখস্থ হয়ে গেল। শহরের নামকরা আর্টিস্টদের সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা জমে উঠলো। কাজের ফাঁকে যখন সময় পাই তাদের সাথে কথা বলে, আলোচনা করে আমার অভিজ্ঞতার ঝুলি ভরতে লাগলাম। শহরে সাইক্লিং করার সময়ে অধিকাংশ সময়ই আমাকে 'K.L.M. and Eleventh-Sixteenth and Massachusets Avenue' ব্যবহার করতে হতো, কাজেই আমার মতো যারা অন্য অফিসে মেসেঞ্জারের কাজ করতো তাদের সাথে

বেশ খাতির ও আলাপ হয়ে গেল। আমার এই রাস্তার সঙ্গীদের মধ্যে অধিকাংশই হচ্ছে কালো আমেরিকান অর্থাৎ নিগ্রো, এদের সঙ্গে আমার হৃদ্যতা জমে উঠলো। কোন কোন সময় তারা আমাকে সাহায্যও করতো। যদি কোন সময় জর্জ টাউনে যাবার পথে আর একজনের সাথে দেখা হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে সে জিজ্ঞাসা করে— কোথায় চললে?

—জর্জ টাউন— আমি উত্তর দিই।

—আরে আমিও যাচ্ছি সেদিকে, ঠিক আছে, তোমার কি কাজ ওখানে বলো— আমি যদি তোমার হয়ে করতে পারি। তা'হলে তুমি এই পার্কে বসে সেই সময়টায় একটু হাওয়া খাও।...

যদিও নিগ্রো ছেলেদের সততায় একটু বদনাম আছে কিন্তু আমি কোনদিনই তার পরিচয় পাইনি। আমার কাছে এরা সত্যি সাদাসিধে কর্মঠ মানুষ। এরা যেমন অল্পে রেগে যায়, তেমনি অল্পতেই সন্তুষ্ট। এদের কাছ থেকে আমি অন্যদিকে বিভিন্ন তথ্য জানতে পারতাম— যেদিকে আমার একদম অভিজ্ঞতা ছিল না— যেমন এই শহরের কতগুলো পর্ণোগ্রাফি স্টুডিও আছে তাদের ইনকাম কত, কোথা থেকে সেখানে মেয়েদের আমদানি হয়, কোন শ্রেণীর মেয়েদের কি চরিত্র। তা ছাড়াও জানতে পারলাম এই ওয়াশিংটনের আরও গুপ্ত কথা— এখানকার পুলিশদের কি গলদ— গোয়েন্দাদের কাহিনী আর বিভিন্ন নাম করা ছিন্‌তাই সম্প্রদায়। তবে হ্যাঁ, নামে যতই কালো আমেরিকানদের দোষ থাকুক না কেন, সাদারাও তাদের থেকে দুরে নেই।

আমার কাজের ফাঁকে যখন সময় হতো জাফরীর স্টুডিওতে তখনই ঘুরঘুর করতাম, আমার উদ্দেশ্য খুব ভালোভাবে তাদের আর্ট ও কাজের কেরামতি লক্ষ্য করা। আমার সেদিকে উৎসাহ দেখে জ্যাফ লেওন অথবা তাদের সহকর্মীরাও আমাকে তাদের কাজ সম্পর্কে বুঝিয়ে দিত। আমার কাছে এটা আর এক জগৎ। আর এইভাবে আমার অভিজ্ঞতা এসে গেল। এই স্টুডিওতে আমার প্রিয় হচ্ছে ক্যামেরা গুলো। বিরাট বিরাট ক্যামেরা আর এক-একটার দাম তিরিশ হাজার ডলারের নীচে নয়, অর্থাৎ এই ধরণের একটা ক্যামেরা হলে বালিগঞ্জে বাড়ী হাঁকিয়ে বসা যায়।

স্টুডিওর কাজ হচ্ছে বিভিন্ন ধরণের আর্টকে ব্লো-আপ (Blow-up) করে বড় করা অথবা বড় থেকে ছোট করা, আর্ট-এর মধ্যে গ্রাফিক সংযোগ করে প্রিন্টের জন্য প্রস্তুত করা; তা ছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন ফটোগ্রাফিক আর্ট ও টেক্‌নিক, বাণিজ্যের বাজারে যার মূল্য বহুত।

সেদিন লেবরেটরীতে দু'জন লোক অনুপস্থিত। জাফরীর হাতেও রয়েছে পুরো কাজ। এদিকে একটা আর্জেন্ট কাজ চেয়ে ঘন ঘন টেলিফোন আসছে— মানে কাজের চাপে হিমসিম খাচ্ছে। তাই আমি উপযাচক হয়ে জাফকে (Jeff ডাক নাম) জিজ্ঞাসা করলাম— আমি তার স্টুডিওর কাজে সাহায্য করতে পারি কিনা? জাফ

আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললো— সত্যি তা'হলে খুবই উপকার হোত, কিন্তু তুমি তো ক্যামেরার কিছুই জানো না।

ওকে আমি আশ্বাস দিয়ে বললাম— ঠিক আছে, একবার আমাকে অনুমতি দাও দেখি আমি কিছু করতে পারি কিনা। জাফ অনেকটা পরীক্ষা করবার জন্য আমাকে একটা ফটো দিয়ে বুঝিয়ে বললো— এই নাও এই কাজটা খুব সিম্পল, সেম সাইজ অর্থাৎ হানড্রেড পারসেন্ট।

আমি তার থেকে ফটোটা নিয়ে সরাসরি একটা ক্যামেরার কাছে চলে এলাম। দেয়ালের গায়ে রয়েছে বিভিন্ন বোতাম। বিভিন্ন দিকে ক্যামেরা ঘোরালাম সেট করার জন্য, আমি ক্যামেরা সেট করে জাফরীর নির্দেশ মতো বিশেষ কাগজ তাতে জুড়ে দিলাম, তারপর আলোর সময়ের ফর্দ দেখে বিভিন্ন রকমেব তিনটে সময় (Timing) বেছে নিলাম...

পনেরো মিনিট পরে আমি তিনটে ফটো নিয়ে জাফরীর চেম্বারে এলাম। জাফ আমার দিকে তাকিয়ে বললো—

—কি হে ফটোগ্রাফার, সুটিং (Shooting) করলে?

আমি মিচকি হেসে ওর টেবিলের ওপর তিনটে ফটো বাখলাম, বললাম— তিনটে তিন বকমের টাইমিং-এ তুলেছি, তোমার কোনটা পছন্দ?

জাফ হাঁ করে ফটোগুলোর দিকে চেয়ে রইল, অবাক সত্যি! জাফের চাপ-দাড়ি মুখটা অবাক কাণ্ডে ভরে উঠলো। তারপর আমাব দিকে তাকিয়ে অস্ফূট স্বরে বলে উঠলো,

—ইউ ডিড্ ইট্ (You did it)!

আমার পদোন্নতি হলো, মেসেঞ্জার থেকে আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট ফটোগ্রাফার হলাম।

আজকাল চব্বিশ ঘন্টা সময় বাঁধা হয়ে গেল। খুব ভোর বেলা আমাকে উঠতে হতো— কেশব, আমি ও মরুভিয়া সূর্যপ্রণাম ও সূর্য-নমস্কারের ব্যায়াম করে ধ্যান করতাম, তারপর আধঘন্টার জন্য গীতা পাঠ, তারপর একবাটি দুধ ও একটা আপেল খেয়ে চলে যেতাম কাজে।

কোন কোনদিন টিফিন বাড়িতে খেতে আসতাম আর নয়তো জাফদের সঙ্গে চীনা রেস্টুরেন্টে যেতাম। চীনা রেস্টুরেন্টে নিরামিষ খাবার পাওয়া যায়, সেখানে আমার প্রিয় খাবার হচ্ছে বুদ্ধিস্ট ভেজিটেবল (Buddhist Vegitable)।

বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ ঘরে ঢুকি। মরুভিয়া প্রায় প্রতিদিনই আমার অপেক্ষায় বাইরে এসে দাঁড়িয়ে থাকে, কোন কোনদিন কেশব। হাত-মুখ ধুয়ে তারপর কীর্তন এবং সৎসঙ্গ করি, তারপর শুরু হয় যোগাসনের ক্লাস। আমি অবশ্য যোগাসন ক্লাসের ছাত্র। প্রতি সপ্তাহেই দু-তিন দিন করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে আমাদের ডাক আসে। আমরা উদারপন্থী, যে ডাকে তাদের কাছেই যাই। অধিকাংশ সময়েই

প্রশ্ন-উত্তরের ক্লাস অথবা ভারতীয় সাংস্কৃতিক চর্চা বিষয়ে আমাকে বলতে হয়। তারপর শুরু করি কীর্তন। আমাদের কীর্তনের দল দিন দিন বেড়ে চললো, কোন কোনদিন আমাদের দলে তিরিশ থেকে পঞ্চাশজন পর্যন্ত সঙ্গী জোটে। আমাদের এই দলটা ক্রমে ওয়াশিংটনে সৎসঙ্গ নামে পরিচিত হয়ে উঠলো। এই দলের মুখ্য নেত্রী মরুভিয়া আর সংগঠক রুবী ব্লু ও কেশব, আমি থাকি নামে মাত্র।

ওয়াশিংটনে অনেকগুলো ভারতীয় ধর্মসংস্থা আছে, তারমধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—

শিবানন্দ বেদান্ত সোসাইটি: প্রতিষ্ঠাতা স্বামী বিষ্ণুদেবানন্দজী।

কেশব টেম্পল (মন্দির): প্রতিষ্ঠাতা কেশবজী, ভদ্রলোক অন্ধ্রপ্রদেশীয় পণ্ডিত।

গোল্ডেন লোটাস টেম্পল: (স্বর্ণপদ্ম মন্দির) প্রতিষ্ঠাতা যোগানন্দজী অর্থাৎ পরমহংস যোগানন্দ যোগীবাজ, বাঙালী। তাঁব লেখা আত্মজীবনী 'Autobiography of Yogi' ইউবোপ এবং আমেরিকায় মিস্‌টিক মহলে খুবই পরিচিত, অবশ্য তিনি ১৯৫২ সালে দেহত্যাগ কবেছেন।

তান্ত্রিক ও শিখ ধর্মেব সমন্বয়ে এক সংস্থা এখানে আছে, বাবা ভজনজী তার প্রতিষ্ঠাতা, তিনি পাঞ্জাবের অধিবাসী।

অধ্যাত্ম-পুনরুত্থান কেন্দ্র: প্রতিষ্ঠাতা হৃষিকেশেব মহাঋষি মহেশযোগী, তিনি এলাহাবাদের লোক।

কৃষ্ণচৈতন্য সম্প্রদায় (Krishna Conciousness): যার প্রতিষ্ঠাতা বাঙালী সুপণ্ডিত ভক্তিবেদান্ত প্রভুপাদ, তিনি নবদ্বীপের বৈষ্ণব।

মেহেববাবা সোসাইটি: প্রতিষ্ঠাতা বম্বের যুগাবতার মেহেরবাবা।

আত্মগঠন কেন্দ্র: প্রতিষ্ঠাতা হৃষিকেশের স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী।

গুরু মহারাজ প্রতিষ্ঠান: প্রতিষ্ঠাতা দেরাদুনের অবতার বালক ব্রহ্মচারী গুরু মহারাজজী।

এই ধরণের আরও বহু সংস্থা ওয়াশিংটনে আছে। আর উপরোক্ত সংস্থাগুলোর সভ্যসংখ্যাও প্রচুর।

আমার কাছে সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যে, এইসব সভ্যসভ্যাদের প্রায় অধিকাংশই উঠতি বয়সের ছেলেমেয়ে, তার মানে পনেরো থেকে পঁচিশের মধ্যে, তবে পঁয়ত্রিশের সংখ্যাও কম নয়। আমাদের দেশে দেখেছি যে, আমরা ছাত্রাবস্থায় একমাত্র পরীক্ষার আগে ছাড়া ধর্ম বা ঠাকুরের পাত্তা দিতাম না। ভাবি ধর্মটা একান্তই ঠাকুরঘরের ব্যাপার, সেখানে আমাদের প্রবেশ নিষেধ। আর দুর্গাপূজা বা সরস্বতীপূজায় যে ধর্মপূজা হয় তাতে ধৃ ধাতুর পাত্তা পাওয়া দায়। সবটাই সাজগোজ, মাইক আর উৎসবের ব্যাপার।

ওয়াশিংটনে একমাত্র ভারতীয় বেদান্ত সোসাইটীই পুরোপুরি ভারতীয়দের জন্য। অন্যান্য সোসাইটীতে যদিও সকলের জন্যই দুয়ার খোলা, কিন্তু তাতে ভারতীয়দের

আনাগোনা একেবারে নেই বললেই চলে, সবক্ষেত্রেই আমেরিকানদের আড্ডা। সত্যি ভাবতে অবাক লাগে যে এই যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানীতে কম করেও শ'খানেক ধর্ম প্রতিষ্ঠান— এক কথায় বলা যায় ধর্মান্দোলনের এক বিরাট ক্ষেত্র। অবশ্য ক্যালিফোর্নিয়ায় আরও বেশী।

প্রায় দু'মাস হয়ে গেল— সময়টা যেন দেখতে দেখতে কেটে গেল। এর মধ্যে আমাদের আমন্ত্রণ এলো মনট্রিল থেকে, কানাডায় স্বামী বিষ্ণুদেবানন্দজী কৃষ্ণ-মন্দির স্থাপন উপলক্ষে এক বিরাট উৎসবের আয়োজন করেছেন।

ইণ্ডিয়া ফেস্টিভ্যাল

সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ওয়াশিংটন থেকে আমরা পাঁচটা স্টেশন ওয়াগনে পঁয়তাল্লিশ জন কানাডার দিকে রওনা হলাম। রুবী ব্লু ও কেশব কয়েকদিন আগেই সেখানে চলে গেছে। জাফরীকে বলে আমিও কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে নিয়েছি, অবশ্য সে জানে যে আমি ভবঘুরে মানুষ, কাজেই আমি যদি নাও ফিরে আসি তাতে ক্ষতি নেই।

আমাদের গাড়ীতে আমরা সাত জন— যদিও দশ-বারো জনের বসার সিট; কিন্তু লম্বা দূরত্বে যাতে অসুবিধা না হয় তার জন্যই রবার্টসন কম লোক নিয়েছে। গাড়ীতে যারা আছে তাদের মধ্যে আমি ছাড়া অন্যান্য সকলেরই ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে, কাজেই ঠিক হ'ল ওয়াশিংটন থেকে সরাসরি মনট্রিয়াল (বা মনট্রিল)-এ কোন রকম স্টপেজ না নিয়েই পৌঁছবো। গাড়ী অনবরত চলবে, শুধু ড্রাইভার সময়ে সময়ে পাল্টাবে মাত্র। দূরত্ব প্রায় সাড়ে ছ'শ (৬৫০) মাইলের মতো।

আমরা রওনা দিলাম। আমি রবার্টসনের পাশের সিটে আর পিছনে মরুভিয়া, আরলিন, সুজান, জন আর কের, তার মানে চারজন মেয়ে আর তিন জন ছেলে (Maruvia, Arlene, Sujane, Jaun, Kere)। কথায় বলে United States-এর রাস্তা। রাস্তার রাজা হচ্ছে হাইওয়ে, ইউরোপে যেমন অটোরুট। যেমন চওড়া ঠিক তেমনি আভিজাত্যপূর্ণ। যাওয়া এবং আসার রাস্তাকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করেছে মাঝখানের সবুজ চওড়া মাঠের ফালি দিয়ে। আবার কোন কোন সময় আপ্ ডাউনকে পৃথক করেছে মাঝখানের বিরাট বিরাট গাছগুলো। কোন কোন সময় মনে হচ্ছে যেন সাজানো বাগানের মধ্য দিয়ে এই রাস্তা চলেছে। কোন ক্রসিংএর বালাই নেই, কাজেই থামবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। গাড়ীর সামনের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, যেন একটা বিরাট সবুজ শাড়ী পাতা আর তারই যেন পীচ রাঙা পাড়— মাইলের পর মাইল দূর দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। এখানে মন্থর যানের চলা নিষেধ। আমাদের গাড়ী ছুটে চলেছে ঘন্টায় সত্তর/আশি মাইল বেগে। মাঝে মাঝে অবশ্য আমাদের থামতে হচ্ছে— জল-খাবারের জন্য, গাড়ীর তেলের জন্য, আর নয়তো রাস্তার ট্যাক্স দেবার জন্য। এই রাজকীয় রাস্তায় বিনা পয়সায় ঢোকবার যো নেই। রাস্তার

ওপরেই পুলিশের সদর দরজা— কোন কোন সময় টোলের পয়সা দিয়ে টিকিট কিনলে তবে দরজা খোলা হয়। আর নয়তো আছে অটোমেটিক কাউন্টার। মেসিনে উপযুক্ত পয়সা ফেললে আপনা থেকেই দরজা খুলে যায়। কাজেই উইদাউট টিকিটে চলার উপায় নেই। আমেরিকার রাস্তা সত্যিই অবাক বটে— শুধু যে চওড়া, মসৃণ তাইই নয়, সুন্দরও বটে। এই হাইওয়ে যখন কোন শহরের মধ্য দিয়ে যায় তখন অতি নিখুঁত উপায়ে তাকে বার করা হয়েছে। এতটুকু ট্রাফিক বন্ধ হবার উপায় নেই। কোন সময় শহরের নীচে ভূ-গর্ভস্থ টানেলের মাধ্যমে, আবার কোন সময় শহরের ওপর দিয়ে তিনতলা চারতলা রাস্তার মাধ্যমে। সত্যি আশ্চর্য বটে— বর্তমান বৈজ্ঞানিক স্থাপত্যের এক অদ্ভুত নিদর্শন।

যাই হোক, আমরা প্রায় বারো ঘন্টার মতো রাস্তায় কাটিয়ে কানাডায় এসে পৌঁছলাম। মনট্রিল পার হয়ে আমরা আরও পূর্ব দিকে এগিয়ে এসে পেলাম লারেন্সিয়ান পর্বতমালা। এ জায়গাটা অনেকটা বম্বের কাছে লোনাভালা খাণ্ডোয়ার মতো।

অবশেষে আমরা এসে পৌঁছলাম স্বামী বিষ্ণুজীর আশ্রমে। জায়গাটার নাম— ভাল মরীন। ফরাসী ভাষায় একে বলে ভাল মরাঁ (Val Morin)। কুইবেক্-এর স্থানীয় ভাষা ফরাসী, তার মানে এখানকার অধিবাসীদের শতকরা নব্বই ভাগই হচ্ছে ফ্রেঞ্চ অরিজিনাল। স্বামী বিষ্ণুদেবানন্দের আশ্রমের স্থানীয় নাম যোগ শিবির বা ইংরেজীতে Youg Camp। বিরাট আশ্রম, বিরাট প্রতিপত্তি। প্রায় তিন বর্গমাইল জায়গা নিয়ে আশ্রম।

আশ্রমের দরজার কাছে আসতেই পেলাম বিরাট সমাদর। রুবী দেবী আমাদের জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। যথাসময়ে স্বামীজীর সাথে পরিচিত হলাম। দক্ষিণ ভারতীয় ভদ্রলোক, অতি অমায়িক। বিনয়ের সঙ্গে আমার সাথে আলাপ শুরু করলেন, বুঝলাম তাঁর এই উদার ও বিনম্র ব্যবহারই সকলের মন জয় করার পক্ষে যথেষ্ট।

আলাপে বুঝলাম স্বামীজী আমার সম্পর্কে ইতিমধ্যে অনেক তথ্যই আহরণ করেছেন। আমি তো অবাক্!

ছোটখাটো পাহাড়ী টিপিকে কেন্দ্র করে স্বামীজীর আশ্রম। মাঝখানে ছোট মতন একটা লেকও রয়েছে। আর সেই লেকের মাঝখানে একটা ছোট শিব মন্দির। শিবির এলাকার একদিকে রন্ধনশালা, যেখানে একসঙ্গে এক হাজার লোকের বসবাস ও খাবার বন্দোবস্ত চলে।

আর একদিকে অতিথিশালা। পাঁচ ডলারের বিনিময়ে পাওয়া যায় একটা সুসজ্জিত ঘর। তাছাড়া সর্বজনের জন্য রয়েছে বারোয়ারী মণ্ডপ, যেখানে অনায়াসে আটশ লোকের শোয়া চলে। পূর্বদিকের পাহাড়ের ওপর রয়েছে স্বামীজীর ছোট্ট অনাড়ম্বর কুঁড়ে ঘর। এছাড়াও রয়েছে বিরাট অফিস ঘর, একুশখানা টাইপ মেশিন— অ্যাড্রেসোগ্রাফির মেসিন,— ছাপাখানা ইত্যাদি। স্বামীজীর এখানে অর্থাৎ এই আশ্রমে ঢুকতে গেলে দু' ডলার দক্ষিণা লাগে। ভিতরে শিবির বা ক্যাম্প খাটাতে হলে

জমির ভাড়া বাবদ লাগে আরও তিন ডলার। তবে তাতে খাওয়া ও অন্যান্য যোগ শেখার জন্য কোন পয়সা দিতে হয় না। এই আশ্রমেরই মাঝখানে একটা বিরাট গোল কাঁচঘর। রঙ-বেরঙের প্লাস্টিকের কাঁচ দিয়ে তৈরী— যেন ছোটখাটো একটা প্লানেটোরিয়াম— কিন্তু আসলে এটাই হচ্ছে মন্দির। কৃষ্ণ মন্দির। কানাডা তথা উত্তর আমেরিকায় সর্বপ্রথম বিদেশী স্বীকৃত হিন্দু ধর্মমন্দির।

স্বামীজী আমাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আশ্রমের চারদিক দেখাতে লাগলেন। হঠযোগী যোগীরাজ বিষ্ণুদেবানন্দ। তিনি এখানে আছেন মাত্র দশ বছর ধরে, আর তারই মধ্যে তাঁর নাম ও ঐশ্বর্য দেখে সত্যি মনে হয় ভগবান শিব ঠাকুর তাঁকে সত্যি বর দিয়েছেন বটে!

পরিশেষে স্বামীজী আমাকে একটা গুরু দায়িত্ব দিয়ে বসলেন,— মন্দির উৎঘাটন উপলক্ষে কাল যে বিরাট শোভাযাত্রা ও নগর কীর্তন বেরোবে আমাকে তারই পরিচলনারভার নিতে হবে। আমি তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেলাম, মনে মনে নিজেকে ধন্য মনে করলাম।

পরের দিন নগর-কীর্তন— ওঃ সে এক এলাহি কাণ্ড বটে! আমি কেন স্বামীজী নিজেও এতটা আশা করতে পারেননি। এগারোখানা বাস, একষট্টিখানা মোটর— প্রেস, রেডিও, টেলিভিশনের গাড়ী, আর আগে পরে রয়েছে, কানাডার জাতীয় পুলিশ রক্ষী-বাহিনী। মাঝখানে আমাদের কীর্তন দল। ছোট্ট একটা লরীকে সাজিয়ে তার ওপর রাখা হয়েছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বংশীধারী মূর্তি। শ্বেত পাথরের এই মূর্তিটিকে আনা হয়েছে জয়পুর থেকে মন্দিরে বসাবার জন্য। অবশ্য এরজন্য লেগেছে বেশ মোটা টাকা। আমাদের এই কীর্তনের দলে অধিকাংশই আমেরিকান, বিভিন্ন বয়সের, তবে একনজরে দেখতে গেলে বলা চলে বিদেশী হুজুগে-মাতার দল।

এই নগর-কীর্তনে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় আমন্ত্রিত হয়েছে। কৃষ্ণ কনসাশনেসের (Krishna Consciousness) দল সদলবলে এসেছে, তিনটে খোল ও পাঁচজোড়া করতাল-খঞ্জনী— এমন কি একটা চিমটে টাংও বটে।

আমেরিকানদের মুখে অমন স্পষ্ট মহামন্ত্র উচ্চারণ শুনতে পেয়ে আমি সত্যি অবাক! এর মধ্যে দু'জন আছে যারা বেনারসে আট বছর সংস্কৃত অধ্যয়ন করেছে। মোটের ওপর সবকিছু মিলিয়ে ঠিক যেন নবদ্বীপ ধাম।

আমাদের কীর্তনদল কানাডার রাস্তায় রাস্তায় ছড়িয়ে দিতে লাগলো পরম পবিত্র মহামন্ত্র ধ্বনি— উদার কণ্ঠে দু'বাহু তুলে নাচতে নাচতে আমরা গাইতে লাগলাম—

হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে...
হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে...
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে...
গোপাল জয় জয়, গোবিন্দ জয় জয়...
রাধা রমণ হরে গোবিন্দ জয় জয়

গোবিন্দ জয় জয় গোপাল জয় জয়...
ওম্ নমঃ ভগবতে বাসুদেবায়
ওম্ নমঃ ভগবতে বাসুদেবায়...ইত্যাদি।

নগর কীর্তন শেষে স্বামীজী ভগবান কৃষ্ণের প্রতিষ্ঠা করলেন মন্দিরে। কানাডা তথা উত্তর আমেরিকায় এই প্রথম হিন্দু মন্দির। অবশ্য হিন্দু প্রতিষ্ঠান উত্তর আমেরিকায় কম করেও শ'খানেক হবে।

মন্দির উৎঘাটন উপলক্ষে স্বামীজী ভারতীয় ভাবে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও ব্যবস্থা করেছেন। দক্ষিণ ভারতীয় নটরাজ নৃত্য ও পৃথিবীখ্যাত সেতার-শিল্পী ওস্তাদ রবিশংকর ও আল্লারাখার অনুষ্ঠান; অবশ্য এটা ছিল দ্বিতীয় দিনের প্রোগ্রাম।

রবিশংকর এসেছেন শুনে আমি তো আনন্দে নাচতে শুরু করলাম— ভালো কথা, এবারে একটু নিরিবিলিতে তাঁর সঙ্গে কথা বলা যাবে। খোঁজ নিয়ে জানলাম যে, রবিশংকব, আল্লারাখা ও কমলা এর মধ্যেই এসে পৌঁছেছেন। তাঁরা আছেন এখান থেকে প্রায় আট মাইল দূরেব এক সম্ভ্রান্ত হোটেলে। মরুভিয়ার এ অঞ্চলটা একেবারে মুখস্ত। সে এই আশ্রমে স্বামীজীকে সাহায্য করার জন্য প্রায় বছরখানেক কাটিয়েছে। মরুভিয়াকে জিজ্ঞেস করলাম— কি উপায়ে রবিশংকরের ওখানে যাওয়া যায় বলোতো? এখান থেকে সরাসরি তো কোন বাস যায় না।

মরুভিয়া সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল— এটা আবার একটা সমস্যা নাকি? দাঁড়াও আমি সব বন্দোবস্ত করছি— এই বলে সঙ্গে সঙ্গে ও চলে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখি আমার দিকে এগিয়ে আসছে বিরাট একটা কাডিলাক কার। আমার কাছে আসতেই দেখি এই বিরাট মোটরের চালিকা স্বয়ং মরুভিয়া। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম— এ গাড়ীটা আবার কার?

মরুভিয়া নির্লিপ্তভাবে জবাব দিল— এটা কল্‌বির গাড়ী। আমি বিস্মিত হলাম— কারণ বাইশ বছরের ছেলে কল্‌বিকে দেখে আমি ভেবেছিলাম নেহাৎ-ই বাপ-মা খেদানো ছেলে...সত্যি অদ্ভুত দেশ বটে! মাঝে মাঝে ভাবি, এটা রূপকথার দেশ যেখানে গরীবেরা গাড়ী চড়ে যায় ভিক্ষে করতে।

ওস্তাদ রবিশংকরের সহকারী শম্ভু দাসের সাথে আমাদের আগেই আলাপ ছিল, কাজেই আমরা সেখানে পৌঁছতেই সে ওস্তাদকে আমাদের উপস্থিতির সংবাদ দিল। রবিশংকর মানে রবিদা প্রথমে আমাকে ঠিক চিনতে পারেন নি, কিন্তু পরে চিনতে পেরে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন, তারপর অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন— তা তুই এখানে কি করছিস? আশ্চর্য বটে! তা এখনও কি সেই আগের মতো ভবঘুরে হয়ে ঘুরছিস? তা তোর সাইকেল গেল কোথায়?— ইত্যাদি প্রশ্নে আমাকে ব্যস্ত করে তুললেন। আমিও একে একে তার জবাব দিতে লাগলাম— আমার মনে সন্দেহ ছিল হয়তো আমাকে তিনি চিনতে পারবেন না, কিন্তু দেখলাম, না তাঁর

স্মৃতির বিভ্রম ঘটেনি। প্রায় দু'বছর আগে ওস্তাদ রবিশংকরের সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ। জেনেভায় ভিক্টোরিয়া হলে একই সভায় আমাদের উপস্থিত হতে হয়েছিল, তাও মাত্র ঘন্টাখানেকের জন্য।

রবিদার সঙ্গে আমি মরুভিয়ার পরিচয় করিয়ে দিলুম। মরুভিয়ার পরণে পাঞ্জাবী পায়জামা, খালি পা ও ছাড়া চুল। আমার পরণে একটা গেরুয়া রঙের সার্ট ও শতছিন্ন একটা ফুলপ্যান্ট, পায়ে একটা ন্যাকড়ার জুতো। সে সময় আমার চুল ছিল কাঁধ পর্যন্ত নামা। রবিদা বেশ ভালোভাবে আমাদের লক্ষ্য করে শম্ভুর দিকে তাকিয়ে বললেন— কি রকম ম্যানেজ করেছে দেখেছো— ওঃ, ওস্তাদ ছেলে বটে!

রবিদা সব সময়ই কর্মব্যস্ত লোক, কাজেই তাঁকে আর বিরক্ত না করে আমরা বিদায় নিলাম। আমাদের গাড়ীর কাছে এসে শম্ভু দাস চোখ টিপে ইঙ্গিত করলো— বেশ জমিয়েছো বাবা! অনেকদিন পর খাঁটি বাংলা শব্দ শুনে সত্যি কি যে আনন্দ পেলাম সে আর বলার নয়— তাইতো কবি বলেছেন—

বিনা স্বদেশী ভাষা
মেটে কি আশা।

মন্দিরের পাশে একটা খোলা মঞ্চ তৈরী করা হয়েছে। দর্শকদের বসবার জন্য রয়েছে খোলা মাঠ। উপত্যকার যে কোন জায়গা থেকেই মঞ্চ দেখা যায়। আর মাঠের বিভিন্ন জায়গায় ফুলগাছের আড়ালে রাখা হয়েছে লাউড্ স্পীকারের চোঙা। অতি উত্তম ব্যবস্থা।

আজকের দর্শকদের মধ্যে প্রচুর ভাবতীয় দেখতে পাচ্ছি, তবে তাদের সংখ্যা শতকরা পাঁচভাগও নয়।

ঠিক সময়মতোই ওস্তাদজী এলেন— পবনে চোস্ত পাজামা আর চিকন কাজ কবা লক্নৌর পাঞ্জাবী, ওস্তাদ আল্লারাখারও ওই একই পোষাক।

জোড়হাতে নমস্কার দিতে দিতে হাসিমুখে এসে তাঁর জায়গায় তিনি বসলেন— তাঁর একপাশে তবলার যাদুকর আল্লারাখা ও তানপুরা সমেত কমলা।

রবিশংকরের কোন ভূমিকার প্রয়োজন নেই। তিনি সকলকে নমস্কার জানিয়ে সবুজ কার্পেটের ওপর বসলেন। জনতার উদ্দেশ্যে অতি বিনীতভাবে বললেন— আপনাদের মধ্যে যাঁরা ঘাসের ওপর অর্ধশায়িত হয়ে বসেছেন তাঁদের অনুরোধ করছি সোজা হয়ে বসতে। আর অনুষ্ঠান সময়ে দয়া করে ধূমপান করবেন না।

রবিশংকরের স্টেজে সব সময়ই ধূপকাঠি জ্বলে। যে কোন অনুষ্ঠানই হোক না কেন, ধূপকাঠি ছাড়া তিনি মঞ্চে ওঠেন না। শুরু হল আলাপ—

মানুষের মধ্যে আছে সুপ্ত, ছন্দোবদ্ধ ভাব আর সেই ভাবকে জাগানোই বুঝি আলাপের কাজ, অথবা আসন্ন ভাবের আন্দোলনের জন্য আমাদের বিচ্ছিন্ন মনকে

প্রস্তুত করার জন্যই হয়তো আলাপের প্রয়োজন। সেতারের ঝংকারের সাথে হৃদয়তন্ত্রীর যেখানে মিল ঠিক সেই জায়গাতেই যেন রবিশংকর তাঁর সেতারের সুর বেঁধেছেন...অগণিত দর্শক সবাই যেন মন্ত্রমুগ্ধ।

প্রায় কুড়ি মিনিট আলাপের পর শুরু হ'ল সন্ধ্যারাগে মারওয়ারী। সুরু হ'ল রাগ— ঝংকারের একটা নিজস্ব গতি আছে, আর সেই গতির দিকে সবাইকে সে টানে, আর তারই মোহে সবাই দুলতে লাগলো। সুর দর্শকদের মনে দোলা দিতে লাগলো।

আলাপটা যখন প্রায় ডুবু-ডুবু হয়ে আসছে ঠিক সেইসময়ই হঠাৎ সকলকে চমকে দিয়ে তবলা বেজে উঠলো— তবলা ও সেতারের প্রণয় শুরু হ'ল আর সেই প্রণয়ে যোগ দিল সহস্র দর্শক-মন। প্রণয় থেকে শুরু হ'ল প্রলাপ, তারপর জবাবী, শেষে দুই গুণীর মুখোমুখি লড়াই। একদিকে রবিশংকর আর একদিকে ওস্তাদ আল্লারাখা, ভারতের দুই চূড়ামণি ভারতের সংস্কৃতির সব ভাব ভাষা আর ঐতিহ্য বাতাসে ছড়িয়ে দিতে লাগলেন— ভারতীয় কীর্তিকলার সব রূপ ছন্দোবদ্ধ হয়ে বাজতে লাগলো— আশ্রমেব আকাশে আর দর্শকদের হৃদয়তন্ত্রীতে।

দ্বিতীয় রাগ বেজে উঠলো বৈকালিক ধূনে ভীমপলশ্রী; উদার ও মুক্ত আকাশের নীচে শিল্পীর প্রকাশ। প্রকৃতির কোলে সংগীতের ঝংকার যেমন প্রকাশ পায় তেমন বুঝি আর কোথাও নেই। প্রায় দু'ঘণ্টার মতো প্রোগাম করে ওস্তাদদ্বয় সবাইকে নমস্কার জানিয়ে উঠলেন। দর্শকদের করতালি আর বাহবা বুঝি আর থামতে চায় না। প্রথমে ভেবেছিলাম আমেরিকানরা ভারতীয় ছন্দ আর কি করে বুঝবে! ভারতীয় ক্লাসিক সংগীত হৃদয়ঙ্গম করতে হলে চাই ভারতীয় মন ও ভারতীয় ভাবধারা। কিন্তু এখানে যা দেখলুম তাতে আমার থিওরি সম্পূর্ণ পাল্টাতে হ'ল। সেতারের প্রত্যেকটি রাগ ও ছন্দ আমার চেয়ে তারাই বোঝে বেশী। অথবা বলবো— সংগীতকে বুঝতে হলে চাই ছন্দোময় হৃদয়। হৃদয় প্রসারিত থাকলে সংগীতের ধ্বনি ও ঝংকারই সেখানে নিজের স্থান করে নেয়, স্থান-কাল-পাত্র ও ভাষার সে পরোয়া করে না।

দেখতে দেখতে তিনদিন কেটে গেল। আশ্রমে আসা অবধি রুবি বা মরুভিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন। এখানে তাদের অনেক কাজ। লোককে উপদেশ দেওয়া, ধ্যান শেখানো, ভারতীয় তত্ত্বকথা শোনানো, তাছাড়াও আছে ভারতীয় নিরামিষ রান্নার পরামর্শ, কোন ধরণের মানুষ কোন পথে ধর্ম চর্চা করবে, ইত্যাদি। স্বামীজীর বিভিন্ন শিষ্য-শিষ্যা বিভিন্ন দিকে এইসব ব্যাপারে ব্যস্ত। ছেলেদের মধ্যে যারা আশ্রমে দক্ষিণা দিতে পারেনি তারাও বিভিন্ন দিকে কাজ করে আশ্রমকে সহযোগিতা করছে। কাজের মধ্যে আশ্রমের বাজার করা, অতিথিশালার রক্ষণাবেক্ষণ, পাবলিক রিলেশন সার্ভিস, বাগান দেখা, আশ্রম পরিষ্কার করা— এই ধরণের আরও অনেক কাজ। আমার অবশ্য করার কিছুই নেই। শুধু চারদিকে চোখ খুলে এদের কাজ-কারবার দেখছি। চতুর্থ দিন উৎসব শেষ।

এবার ফেরার পালা— যোগীরাজ আমাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন,

—তারপর— এখান থেকে কোথায় যাবে?

—ফিরে যাব ওয়াশিংটনে।

—কেন?

—সেখানে আমি একটা কাজ করছি, তাদের কথা দিয়েছি আমি ফিরে যাবো। কাজেই আমাকে যেতে হবে। আমি জবাব দিলাম।

স্বামীজীর ইচ্ছা যে আমি সেখানে থেকে যাই। তিনি আমাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন যে, সেখানে আমার থাকা খাওয়ার কোন অসুবিধা হবে না, এমন কি তিনি নিজে আমার ট্যালেন্ট (Tallent)-এর দিকে নজর রাখবেন। কিন্তু আমি গররাজি— কারণ আমার এখনও কোথাও স্থায়ীভাবে থাকলে চলবে না— আমার সেই এক কথা— অর্থাৎ "চরণবৈ মধু বিন্দতে"।

আবার ওয়াশিংটনে:

কানাডা থেকে ফেরার পর থেকে ওয়াশিংটনে আমার আদর ও আপ্যায়ন দ্বিগুণ হয়ে উঠলো। আমাকে আজকাল রীতিমতো রোজ বিকেলে ভারতীয় সংস্কৃতি চর্চা করতে হচ্ছে। ভালোই হলো— ভারতে থাকতে অনেক সময় দর্শনের দিকে মন টেনেছে বটে, কিন্তু সেদিকে পুরোপুরি আমি যেতে পারিনি, দর্শনকে দর্শন করেই ক্ষান্ত হয়েছি। কিন্তু এখানে আমাকে বাধ্য হয়ে ডুবতে হচ্ছে।

ইতিমধ্যে রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম কর্ণধার স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী ওয়াশিংটনে এলেন। ওয়াশিংটনের ভারতীয় বেদান্ত সোসাইটি বিভিন্ন স্থানে তাঁর ভাষণের বন্দোবস্ত করেছে। একদিন তাঁর ভাষণ উপলক্ষে রাষ্ট্রদূত শ্রীঝাঁ মহাশয়ের বাড়ীতে যাবার আমন্ত্রণ পেলাম। মিসেস ঝাঁ (মানে মহামান্য রাষ্ট্রদূত-পত্নী)— তিনি বাঙালী, স্বভাবে নম্র, বিদুষী ভদ্রমহিলা। তিনিই আসলে তাঁর বাড়ীতে এই আয়োজন করেছেন। সেখানে স্বামীজী ভারতীয় সাহিত্য ও পাশ্চাত্য জগৎ এবং তার সঙ্গে ধর্মের সমন্বয়ে এক চমৎকার বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতা শেষে স্বামীজীর সাথে আমি নিজেই উপযাচক হয়ে নিজের পরিচয় দিলাম। আমার সঙ্গে সেদিন কেশব ও মরুভিয়াও সেখানে উপস্থির ছিল। আমি স্বামীজীকে খাঁটি বাংলায় জিজ্ঞাসা করলাম,

—আচ্ছা স্বামীজী, কেউ যদি হঠাৎ খুব বেশী আদর ও সম্মান পেতে থাকে তাহলে তার কি করা উচিত?

স্বামীজী আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,

—এটা কি তোমার নিজের জন্য?

আমি সলজ্জভাবে বললাম— আজ্ঞে হ্যাঁ।

স্বামীজী আমার পিঠে হাত দিয়ে বললেন— এক্ষেত্রে করার কিছু নেই, তবে নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখো, আর মনে করে নাও এটাই পরমেশ্বরের ইচ্ছা।

খুব সামান্য কয়েকটা কথা বটে, কিন্তু আমার কাছে কথাগুলোর গুরুত্ব অনেক। শুধু মনে মনে ভাবলাম এই খাতিরে ও আদরে নিজেকে হারালে চলবে না। সেই দিন সেখানে স্বামীজীর উপস্থিতি আমার কাছে একান্তই প্রয়োজন ছিল। আমার অবচেতন মন এই ধরণেরই একজনের সহায়তা চাইছিল। এদিকে আমার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে জাফরী বা জ্যাফ আমাকে বারবারের জন্য থেকে যেতে অনুরোধ করতে লাগলো, বিশেষ করে তার ডার্ক রুমে কাজ করার জন্য একজন লোকের বিশেষ দরকার। কিন্তু আমি থাকতে রাজি নই, কারণ আমার হাতে তখন স্যানফ্রান্সিস্‌কো থেকে সিডনি যাবার পয়সা এসে গেছে, আমাকে যেতে হবে। একদিকে যোগকেন্দ্রের মায়া আর একদিকে টাকার টান। জ্যাফ অবশ্য আমাকে আশ্বাস দিয়েছে যে আমি যদি সেখানে পারমানেন্টলি থাকি তাহলে সে আমার ওয়ার্ক পারমিট ও যাবতীয় সরকারী ডকুমেন্টের বন্দোবস্ত করবে, কিন্তু আমাকে যেতে হবে, টাকার টানে এখানে থেকে গেলে আমার মিশন ব্যর্থ হয়ে যাবে। কাজেই সেদিন লেয়ন ও জ্যাফ যখন আমার থাকার সম্পর্কে ও চাকরীর ব্যাপারে সঠিক মত জানতে চাইল, আমি সরাসরি তাদের জানিয়ে দিলাম যে— না, আমার আর বেশী টাকার দরকার নেই, আমি অল্পেই সন্তুষ্ট, আমার পকেটে এখন যা আছে তা আমার চলার পক্ষে যথেষ্ট। আমি তাদের সময়োপযোগী সহায়তার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ দিলাম, আর সেই সাথে জানিয়ে দিলাম যে এই সপ্তাহই আমার ওয়াশিংটনের শেষ সপ্তাহ।

লেয়ন ও জ্যাফ শেষ পর্যন্ত ঠিক করলো যে আমাকে আর থাকবার জন্য অনুরোধ করে লাভ নেই। আমি সত্যি বাঁধনছাড়া পাগল ভবঘুরে।

একবার যদি আমার মন বলে যাবো, ব্যস— সঙ্গে সঙ্গে আমার দেহ প্রস্তুত, তাই ওয়াশিংটন থেকে আমার পাত্‌তাড়ি গোটাতে লাগলাম।

রবিবার দিন রাতে আমি যোগ ক্লাসের শেষে ঘোষণা করলাম যে কালকে অর্থাৎ সোমবার দিন সকালেই আমি রওনা হচ্ছি। চারদিক থেকে সবাই আমাকে আরও কয়েকদিন থাকবার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানালো, কিন্তু নাঃ, আমাকে যেতেই হবে, আর একদিন থাকা মানে আরও একদিন মায়াবৃদ্ধি।

সোমবার দিন খুব ভোরবেলা উঠে স্নান করে আমি, কেশব ও মরুভিয়া উপাসনায় বসলাম। তারপর কীর্তন শেষে তাদের বিদায় জানালাম। ব্যাগ্‌টা রাতেই গুছিয়ে রেখেছিলাম। রুবীদেবী আমাকে রাতেই টেলিফোন করে তাঁর শুভেচ্ছা জানিয়ে দিয়েছেন। সকালে আমার বিদায় দৃশ্য দেখবার মতো শক্ত তিনি নন।

রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম— কেশব আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললে— ভগবান তোমার সঙ্গে থাকুন আর আমাদের কথা মনে রেখো। মরুভিয়াকে বিদায় চুম্বন দিতেই যে বললে— তুমি সত্যি পাষাণ। মানুষকে কাঁদিয়ে, এমনি করে তুমি পৃথিবীময় ঘুরে বেড়াচ্ছো কেমন করে বুঝি না— আমাদের ছাড়তে তোমার কি এতটুকু দুঃখ হচ্ছে না?

আমি ওর মাথায় হাত দিয়ে অনেকটা আশ্বাসসুরে বললাম— আমাকে যেতে দাও, পথিকের চাহিদা একমাত্র পথ। আমি জানি তোমরা ব্যথা পাবে কিন্তু আমায় ক্ষমা করো, আমি একটা বাঁধনছাড়া লক্ষ্মীছাড়া ছেলে...।

মরুভিয়া প্রায় ভগ্নস্বরে বললো— "তুমি ঠিক মানুষ চেন না, তুমি আদর ও প্রেম বোঝোনা।"

আমি হেসে জবাব দিলাম— যে প্রেম আমার অগ্রগতিকে বাধা দেয় আমি তার বাঁধনে পড়তে চাই না। স্বাধীন বনের পাখীকে ভালোবাসো, তাতে মহত্ত্ব আছে, কিন্তু লক্ষ্মীটি, তাকে খাঁচায় বেঁধে পরাধীন করোনা। আমাকে তোমরা গালি দাও, পাগল বলো, সেটাই আমার চলার পথের পাথেয়। আমি জানি তোমরা আমাকে ভালোবাসো, তাই আমার বিদায়ক্ষণে এত অভিমান। যাও, ঘরে গিয়ে কেশবের সাথে কীর্তন করো, তাতে মনটা অনেক হালকা হবে। এ আব কিছু নয় মায়ার বাঁধন, তাতে মুক্তি নেই।'

এই বলে আমি তাদেব আমার আন্তরিকতা জানিয়ে সাইকেলের প্যাডেলে পা দিলাম...।

রেড ইন্ডিয়ানদের সাথে

আমাকে থামতেই হ'ল। কারণ সামনের ওই জটলা ভেদ করে এগোনো ঠিক বুদ্ধিমানের কাজ নয়। ডানদিকে কিছুক্ষণ আগেই একটা নোটিশ চোখে পড়েছিল— স্পষ্ট করে লেখা—

Cherokee Indian Reservation
Established by thc United States
For the Eastern Band of Cherokee
After the Removal of 1838

কাজেই আমার বুঝতে অসুবিধা হলো না— এটাই আমার বহু আকাঙ্খিত জায়গা। আমি জটলার আরও কাছে এসে সাইকেলের ওপর বসেই বাঁ পায়ে ঠেকা দিয়ে দাঁড়ালাম। গলার স্বরটা একটু উঁচু করে তাদের উদ্দেশ্যে বললাম —এই যে, দাদারা শুনতে পাচ্ছো —মনে হচ্ছে খুব মজাদাব আড্ডা জমেছে, —তা বেশ, আমাকে একটা চান্স দিয়ে দেখো না। আমিও ভালো জমাতে পারি ভাই।

সঙ্গে সঙ্গে সবাই রাজি না হলেও দু-একজন করে দেখি আমাব দিকে এগোতে থাকলো। এরই মধ্যে একজন মাতব্বর গোছের লোক আমার প্রায় গা ঘেঁষে এসে দাঁড়ালো। তারপর আমার মালপত্র ও সাইকেলটার দিকে বার্ বাব তাকিয়ে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসলো—তোমাব পরিচয়?

—আমি ইন্ডিয়ান, সহাস্যে জবাব দিলাম।

—তা দেখেই বুঝতে পেরেছি—ভালো কথা, তোমার জাতটা কি?

আমিতো অবাক! এই সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে এসেও যে জাতের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে তা আশা করিনি, কাজেই চুপ করে রইলাম— যেন তার প্রশ্নটা বুঝতে পারিনি। কিন্তু মাতব্বর ছাড়বার পাত্র নয়, সে আবার একই প্রশ্ন করে বসল,

—তোমার অরিজিনালিটি কোন্ জাতের? তার মানে তুমি কি হোপী, মারীকোপা, পিমা কিকাপুণ্, মোহক্, সোহান্, সিউক্স্ অথবা অন্য কিছু —এই যেমন ধরো আমি বা আমরা এখানে সবাই শেরকী।

—এবার বুঝলাম ও আসলে আমাকে ওদেরই মতো আমেরিকান ইন্ডিয়ান ভেবেছে অর্থাৎ আমাদের ভাষায় যাকে বলে রেড ইন্ডিয়ান। তাই এবার হেসে জবাব দিলাম

—আমি ঠিক আমেরিকান ইন্ডিয়ান নই, আমি আসলে ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়ান। তোমাদের সঙ্গে আমাদের তফাৎটা হচ্ছে এই যে, তোমরা ইন্ডিয়ান বটে কিন্তু তোমাদের দেশ ইন্ডিয়া নয়, আর আমি ইন্ডিয়ান বটে কারণ আমাদের দেশ হচ্ছে ইন্ডিয়া।

কথাটা কি রকম ধাঁধার মতো হয়ে গেল। মাতব্বর আমার কথাটা ঠিক ধরতে পারলো না। ইতিমধ্যে আমার চারদিকে ছোট-খাটো একটা ভীড় জমে গেছে— এর মধ্যে একটা বেঁটে ও মোটা ধরনের ছেলে অনেকক্ষণ ধরে আমাকে ও আমার সাইকেলটাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করতে লাগলো— ভাবটা এই যে, ও সাইকেল জম্মে কোনদিন দেখেনি। এবার সে সাইকেলের পেছনে লেখা World-Tour from India লেখাটা পড়েই সবাইকে ঠেলে ঠিক আমার সামনে হাজির হ'ল— কোমরে হাত বেখে অনেকটা মাতব্বরী ভঙ্গিতে, আমাকে জিজ্ঞাসা করলো,

—কি হে ছোক্রা, চালাকী করবার জায়গা পাওনি, ভেবেছো তোমাকে চিনতে পারবো না, আরে বাপু তুমি ভেবেছোটা কি? আমাদের বোকা বানিয়ে চলে যাবে?

এবার আমি পড়লাম বিপদে, ওর ভাবটা দেখে মনে হ'ল ও আমাকে অনেকদিন ধরে চেনে, আর আমি ওর পুরোনো শত্রু। কি বিপদ বলো দেখি! এর সাথে শত্রুতা তো দূরের কথা কোনোদিন ওকে দেখেছি বলে মনে হয় না। কি আর করি, কাজেই আমি আগে যার সঙ্গে কথা বলছিলাম সে ভদ্রলোক অপেক্ষাকৃত নম্র ও বয়েসী বলে তার দিকে তাকিয়েই জিজ্ঞেস করলাম— ব্যাপারটা কি আমাকে একটু বুঝিয়ে দেবেন দয়া করে। ভদ্রলোক বললেন অবশ্যই।

তিনি সেই ছেলেটাব সাথে আমার সম্পর্কে আলাপ শুরু করলেন— অর্থাৎ আমাদের মধ্যস্থ হলেন। যদিও তাদের কথাবার্তা ইংরেজিতে কিন্তু তার মধ্যেও অনেক শেরকী উপশব্দ মিশিয়ে ভাষাটাকে অ্যাংলো-শেরকী করা হয়েছে, কাজেই আমার পক্ষে তাদের কথোপকথন বোঝা শক্ত হয়ে দাঁড়ালো। তবে এইটুকু বুঝলাম যে ওরা সবাই যেন একটু উত্তেজিত হয়ে উঠছে— বলা যায় না, আমাব অসর্তকতাতে হয়তো কোনো অন্যায় হয়ে গিয়ে থাকবে। আমার ঠাকুমা প্রায়ই আমাকে চিঠিতে সতর্ক করে দিতেন—'সাবধানে থাকিস বাপু, জানিসতো, এক দেশের গালি আর এক দেশের বুলি।' এখানে হয়তো ব্যাপারটা ঠিক উল্টো অর্থাৎ বুলির বদলে হয়তো গালি হয়ে গেছে— এমতাবস্থায় সট্‌কে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ। সাইকেলের হ্যান্ডেলটা ঘুরিয়ে প্যাডেলে জোর দিলাম। কিন্তু হায়! স্পিড্ নেবার আগেই ওরা টের পেয়ে গেল—ধর ধর করে সবাই ছুটে এলো, পারলাম না। চার-পাঁচবার প্যাডেল ঘোরাবার আগেই ওরা পেছন থেকে সাইকেলটা টেনে ধরলো। তারপর সবাই যেন হুড়মুড় করে আমার ওপর পড়লো, আমার তখন শনিপ্রাপ্ত অবস্থা। ভাগ্য ভালো আমি আহত হইনি। ভীড় ও গোলমালটাকে কিছুক্ষণের মধ্যেই আয়ত্তে আনা গেল— আসলে আমারই ভুল হয়েছে, এটা আসলে এই গ্রামে আমার স্বাগতম্ ও আলিঙ্গনের ধাক্কা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হ'ল। মাত্র চার-পাঁচদিন আগেই নাকি আমার সম্বন্ধে একটা রিপোর্ট এন, বি, সি-র (N. B. C) মাধ্যমে স্থানীয় টেলিভিশনে প্রদর্শিত হয়েছে, আর সেই ছোক্‌রা মতো ছেলেটা আমাকে দেখেই বুঝতে পেরেছিল যে আমিই সেই ভূ-পর্যটক। অবশ্য পরে আমি বুঝেছিলাম যে, ওর কথাবার্তার ধরনই ওই ধরনের, অর্থাৎ দারুণ রুক্ষ।

যাই হোক, আমি সাঙ্গপাঙ্গদের সাথে একটু এগিয়েই একটা বাজারের মধ্যে পড়লাম। এখানে কয়েকজন নজরে পড়লো ঠিক ভূগোল বইতে রেড ইন্ডিয়ানদের ছবি যে রকম দেখেছি। মাথায় পালকের চূড়া, হাতে তীরধনুক, পরনে চামড়ার আলখাল্লা, আব মুখেব ওপর সাদা ও লাল কালি দিয়ে চিত্রিত করা— ওবা রাস্তার এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বাজারের আর এক কোণে সতবঞ্জির এক বিরাট দোকান নজরে পড়লো, আর তার ঠিক সামনেই বুড়ি দিদিমা গোছের দু'জন স্ত্রীলোক মোড়ার ওপব বসে পশমেব কি যেন একটা কাজ করছে। এখন গবমকাল বাইরে বেশ গরম, আমিতো গেঞ্জি পরেই এখানে ঘুবে বেড়াচ্ছি। আব একটু এগোতেই সামনে নজরে পড়লো বিরাট একটা সাইনবোর্ডে লেখা 'কোকো-কোলা'। ওটা দেখেই যেন আমার তৃষ্ণাটা বেড়ে গেল। পাশের দিকে তাকিযে বললাম— তোমরা দাঁড়াও, আমি চট করে একটা কোকা-কোলা খেয়ে আসি। কিন্তু উপায় নেই, ওরা আমাকে ছাড়তে চাইলো না, আমার সাথে সাথে সবাই এসে হাজির হলো (Bar) বার-এ। মাতব্বরেব নাম জানলাম, ওর নাম হচ্ছে ক্লিকিতাত্‌ (Klikitat), তবে ওকে সবাই যো বলেই ডাকে। যো সরাসরি বারে ঢুকে আমা'কে দোকানদারের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল। দোকানদারও আমার পরিচয় পেয়ে কোকো-কোলাটা বিনা পয়সাই ছাড়লেন, তবে দোকানদারকে দেখে মনে হ'ল উনি সাদা আমেরিকান। ছোটো একতলা একটা বাড়ীর ওপর লাইন বাঁধা দোকান— শেরকী ব্যাংক। মণ্টে ইয়ং হচ্ছে পুরোনো পয়সার কারবারী। মোকাসিন স্টোর সতরঞ্চ ও চামড়ার ব্যবসায়ী। আর তার পাশেই ঠিক রাস্তার ধারেই রোস্ট চিকেন সপ। আমরা এগিয়ে এলাম একটা ছোট টিপিব কাছে। টিপিব ওপর সবাই বসলো আর যো অপেক্ষাকৃত একটু উঁচু জায়গায় দাঁড়িযে সকলের উদ্দেশ্যে আমার পরিচয় জানাতে লাগলো আর সেই সাথে একটা মুখবোচক বক্তৃতাও। আমাকে কিছু বলতে হ'ল না, সে সবাইকে বলে দিল বিকেলবেলা ছ'টার সময় স্কুল বাড়ীতে আসতে, সেখানে একটা ছোটো-খাটো সভাব আয়োজন করা হবে। সবাই একে একে বিদায় জানালো, হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। যো আমাকে ছাড়ছে না, ও আমাকে এখানকার গণ্যমান্য সকলের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে, আর আমার এখানে থাকার বন্দোবস্তটাও করবে।

এই শেরকী ইন্ডিয়ান রিজার্ভ প্রসঙ্গ লেখার আগে একটু পূর্বকথা বলা ভালো, তাতে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে বলে মনে করি।

এটা হচ্ছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বদিক। ক্যারোলিনা প্রদেশ— ক্যারোলিনা তামাকের চাষের জন্য খুব বিখ্যাত। তামাকের কারবার ইউরোপীয়ানদের ছিল একটা বিরাট সম্পত্তি, তারই এখন বিরাট ও ব্যাপক প্রসার। উঁচু নীচু উপত্যকার মতো এই ক্যারোলিনা শহর আর তারই এক কোণে এই ইন্ডিয়ান রিজার্ভেশন। ১৭৭৫ খ্রীঃ ইউরোপীয়রা যখন প্রথমে এখানে আসে সেই সময় এখানকার আদিবাসী ছিল শেরকী। শেরকীরা তাদের মাটিতে ইউরোপীয়দের পদার্পণ মোটেই বরদাস্ত করেনি তাই বেঁধেছিল সংঘাত। আর সেই সংঘাত থামে এক চুক্তির মাধ্যমে। আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত ইউরোপীয়দের কাছে তীর-ধনুক-ধারী আদিবাসীদের পরাস্ত হতে হয়েছে। কিন্তু ভবিষ্যতে যাতে এই আদিবাসীরা বিদ্রোহ না করে তার জন্য এক চুক্তির ফলে তাদের ধর্ম ঐতিহ্য ও শৃংখলা রক্ষার জন্য শেরকীদের ইন্ডিয়ান রিজার্ভেশনে রাখা হয়। সোজা ভাষায় যাকে বলে ইউরোপীয়দের নজরবন্দী। অবশ্য চুক্তির ভাষায় বলে স্বাধীন ও নির্বিঘ্ন জীবন-যাপনের জন্য বরাদ্দীকৃত নির্দিষ্ট ভূমিখণ্ড। সম্পূর্ণ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এই ধরনের আটশত রিজার্ভ রয়েছে, আর তাতে কম করেও পাঁচলক্ষ নরনারীর আহার ও বাসস্থান। এক নজরে দেখলে মনে হবে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আর একটা যেন স্বাধীন রাষ্ট্র। আমেরিকার আদিবাসীরা যাতে পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে না যায়, তারা যাতে মানুষের মতো বেঁচে থাকতে পারে, তার জন্য ১৮২৪ সালে তৈরি হয় ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান অ্যাফেয়ার্স (BIA)। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের এটা একটা অন্যতম শাখা। ইন্ডিয়ানদের আরো সুযোগ-সুবিধা দেবার জন্য তাদের আইনকে ১৮৩৫ সালে সংশোধিত করা হয়েছে। আসল কথা হচ্ছে যে, ইউরোপীয়রা আমেবিকার আদিবাসী রেড ইন্ডিয়ানদের পরাস্ত করে তাদের উদ্‌বাস্তু করে আবাব তাদের পুনর্বসতির ব্যবস্থা করেছে। অর্থাৎ এই রেড ইন্ডিয়ানরা নিজেদের দেশেই নিজেরা ভূমিহীন হয়ে রইল। শুধু মাথা গোঁজবার মতো একখণ্ড জমি দিয়ে তাদের সন্তুষ্ট করা হ'ল।

এদের সম্পর্কে আমার অনেক কিছু জানার আছে— তাই আমার প্রথম চেষ্টা হ'ল থাকার ব্যবস্থা, তারপর খাওয়ার, অবশ্য খাওয়ার ব্যবস্থা এরা যদি নাও করে তাতে কিছু যায় আসে না, কারণ আমার পকেটে এখন চলবার মতো পয়সা আছে। যো সেদিক থেকে আমার সহায় হবে বলে মনে হচ্ছে। যো সম্পর্কে আরও জানতে পারলাম ও হচ্ছে এই গ্রামেরই একজন ভ্যাগাবণ্ড, বয়েস প্রায় পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি; যোর পেশা বলে কিছু নেই, তবে চালাক ও ধার্মিক বলে সবাই ওকে খুব খাতির করে। ও রেড ইন্ডিয়ানদেরই একজন বংশধর, শেরকী।

রেড ইন্ডিয়ানরা অনেকটা আমাদের দেশের নেপালীদের মতো দেখতে, অথবা আরও কাছাকাছি মেলাতে গেলে মনে হয় শেরপা গোছের বললেই ঠিক হবে। কথাবার্তা ও চরিত্রও অনেকটা যেন তাই। জানি না, শেরকী ও শেরপা হয়তো একজায়গা থেকেই এসেছে। তবে এদের রঙটা আরও লালচে গোছের। আমার ঠিক চোখের সামনেই পালকের পোষাক পরে কয়েকজন ঘুরে বেড়াচ্ছে, —তাদের দেখিয়ে যোকে জিজ্ঞেস করলাম—ওরা কি সব সময়ই ওই ড্রেস পরে থাকে?

উত্তরে যো আমাকে বুঝিয়ে দিল— মোটেই না— আমরা এখন সবাই আমেরিকান অর্থাৎ আমেরিকানদের পোষাকই আমাদের পোষাক— তবে এই যে দেখছো যারা সঙ সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে— সেটা হচ্ছে ট্যুরিস্টদের আকর্ষণ করার জন্য।

ওর কাছ থেকে জানলাম যে ট্যুরিস্টদের কাছ থেকে পয়সা না পেলে এদের জীবন আরও কষ্টকর হয়ে উঠতো,— নয়তো সরকার যে ডোল দেয় তাতে সংসার চলে না। তাও মাত্র বছরের এই চারমাস অর্থাৎ এই গরমের সময়েই যা লোকজন যাতায়াত করে, তাদের কাছে নাচ দেখিয়ে, হাতে বোনা জিনিস বিক্রি করে আর বিভিন্ন ধরনের গল্প বলে মোটামুটি যা আসে খারাপ নয়।

এই ইন্ডিয়ান রিজার্ভেশনটা প্রায় বিশ বর্গমাইল জায়গা নিয়ে ঘেরা। এরমধ্যে আছে— পুলিশ, সরকারী বাংলো, ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস— ছোটোখাটো কয়েকটা কারখানা, ছোটদের জন্য স্কুলঘর, খেলার মাঠ, ঘোড়দৌড়ের মাঠ, সওয়ারী শিক্ষাকেন্দ্র আরও টুকিটাকি অনেক কিছু। আমি যো-এর সাথে কথা বলতে বলতে পাকা রাস্তা ধরে আরও খানিকটা এগিয়ে যেতেই একটা কাঠের বাড়ী পেলাম, বড় বড় শালবল্লীর ওপর বিরাট একটা হলঘরের মতো— নজরে পড়লো— তারই একপাশে লেখা সিকিউরিটি ফোর্স।

বাড়ীর বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছাই রঙের স্যুট পরা এক ভদ্রলোককে দেখেই যো বললে— যাক্‌গে রবার্টকে পাওয়া গেছে ভাগ্য ভালো। আমি জিজ্ঞেস করলাম— ভদ্রলোক কে?

—রবার্ট বুর্চফিল্ড (Robert Burchfield)। নামটা যদিও আমেরিকান, কিন্তু আসলে ও শেরকী ইন্ডিয়ান। রবার্ট আমার পরিচয়ে অত্যধিক খুশী হয়ে আমার হাত খুব জোর দিয়ে করমর্দন করলো, —আমার হাতটা তাতে ছিঁড়ে যাবার যোগাড়। কিন্তু মুখে হাসি টেনে আমি নেহাৎই ভদ্রতার সুরে বললাম— আই অ্যাম গ্ল্যাড টু মিট ইউ।

রবার্ট ওর রিজার্ভেশনের ট্রাইবাল কোর্টের একজন স্থায়ী সভ্য। তা ছাড়াও ওর কাজ হচ্ছে এখানকার সিকিউরিটি ফোর্সের তদারক করা। অনেকটা এস.ডি.ও.-র মতো। রবার্টের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে যো চলে গেল— তবে যাবার আগে বারবার করে বলে গেল আমি যেন চলে না যাই, অন্ততঃ বিকেলবেলা একটা জনসভার আয়োজনতো করা হবেই— আর বাকিটা কি হয় পরে দেখা যাবে।

রবার্ট-এর বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি। দেখেশুনে খুব চালাক চতুর বলেই মনে হচ্ছে। ওকে আমার সেখানে থাকার ইচ্ছেটা প্রকাশ করতেই ও লাফিয়ে উঠলো— অবশ্যই, সে কথা আর বলতে, তবে ভাই টাকা পয়সা কিছু দিতে পারবো না; আমরা কিন্তু গরীব।

আমার সাইকেল ও মালপত্রগুলো ওর অফিসেই তুলে রাখলাম। এখন হচ্ছে বেলা প্রায় বারোটা, বিকেল পাঁচটার মধ্যেই আবার সেখানে হাজিরা দেবো বলে আমি ওর অফিস থেকে বেরিয়ে পড়লাম, —বসে বসে গল্প না করে নিজের চোখে ঘুরে দেখা ভালো। বাঁ দিকের গলিটা পেরিয়েই একটা চত্বর আর ঠিক তার পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে ছোট্ট একটা পাহাড়ী স্রোত। আমি সেইদিকেই হাঁটা ধরলাম। কিছুদূর আসতেই নজরে পড়লো কয়েকজন লোক মাছ ধরছে। ওদের কাছে আসতেই একে একে সবাই আমার মুখের দিকে তাকালো, তারপর আবার মুখ ঘুরিয়ে সুতোর দিকে নজর। আমি উপযাচক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম— পাচ্ছেন কিছু?

—বড় একটা কিছু নয় —একজন অন্যমনস্ক হয়ে জবাব দিল।

—কি মাছ আছে এখানে? আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, উত্তব পেলাম না। বুঝলাম এরা কথাবার্তা বলে মাছ তাড়াতে চায় না। ওখান থেকে উঠে আমি নদীটার ধার ধরে আরও একটু এগিয়ে গিয়ে একটা জংলা গোছের জায়গা পেলাম, এরকমই চাইছিলাম। প্রায় আট ঘণ্টা একটানা সাইকেল চালিয়ে একটু বিশ্রামের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, তাই একটা গাছের নীচে সটান শুয়ে পড়লাম। ওঃ কি আরাম! সত্যি এরকম নির্জন না হ'লে ঠিক বিশ্রাম হয় না। শরীরটা কাহিল হয়ে পড়েছে। আজকাল কি জানি কি হয়েছে, প্রায়ই মনের মধ্যে হতাশা দেখা দেয়— আর সে কারণে ক্লান্তিটাও যেন তাড়াতাড়ি আসে। একটু ঘুমোবাব দবকার তাই চোখ বুজলাম। বেশ খানিকক্ষণ কেটে গেল কিন্তু কিছুই হচ্ছে না— এদিক-ওদিক জায়গা পালটেও দেখছি সুবিধে হচ্ছে না। চোখ বুজলেই আমার ঠাকুমাকে দেখছি, তিনি যেন দিনরাত আমার কথা ভাবছেন। হয়তো ভাবছেন— আমাব মববাব আগে বিমলকে যেন একবার দেখতে পাই। আমার চোখের ওপব ভেসে উঠলো তাঁর অশ্রুসজল চোখ দুটো, আমার যাত্রার ঠিক প্রাক্‌কালের দৃশ্য। .... দূর ছাই— এ সব কি ভাবছি! নাঃ মায়ার হাত থেকে পরিত্রাণ নেই দেখছি। তাই গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়লাম। শরীরকে বললাম— তোমাকে বিশ্রামের জন্য তো চান্স দিলাম তুমি না নিলে আমি কি করবো।

এবার পাহাড়ের একটা ঢালু গাঁ পেলাম, এটা (পাহাড়) আপলেশিয়ানেরই একটা অংশ। এখান থেকে নদীর ওপারে বিস্তৃত দৃশ্য চোখে পড়ে। অনেকটা সোনালী রঙের, তামাকের খেত চোখের ওপর ভাসছে। এই সেই ইতিহাস-বিখ্যাত ও জগৎখ্যাত তামাকের দেশ। সত্যি তামাকের ইতিহাস ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়।

১৬০৪ (1604) সালে প্রথম যখন তামাক যায় ইউরোপে ঠিক সেই সময়কার কথা। প্রথম কিং জেম্‌স, তামাক পাতাকে হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে দেখলেন, তামাকের উজ্জ্বল সোনালী রঙ দেখে মুগ্ধ হয়ে বললেন— সত্যি চমৎকার রঙ বটে। তারপর আরও খানিকক্ষণ পর হাতের তালুতে তামাক পাতা রগড়ে নাকের কাছে আনতেই তামাকের তীব্র গন্ধে তিনি হেঁচে-কেশে অস্থির হয়ে প্রায় ফিট হবার যোগাড়। পরে

তিনি সুস্থ হলে বণিক তাঁর দিকে উৎফুল্ল হয়ে জিজ্ঞাসা করলো— আমি আগেই বলেছি স্যার এটা একটা অদ্ভুত আবিষ্কার।

—অদ্ভুত আবিষ্কার! দাঁত চেপে ক্রুদ্ধ হয়ে কিং জেমস্ বলে উঠলেন— এ অদ্ভুত আবিষ্কার, ওই জংলী রেড ইণ্ডিয়ানদের জন্য যেন থাকে। এই বিদ্‌ঘুটে, গন্ধওলা, বিষ মেশানো, জংলী পাতাগুলো যেন আমাদের দেশে না আসে। হ্যাঁ আমি বলে রাখলাম এর গন্ধেই বমি আসে, তার মানে বুঝতেই হবে এটা শরীরের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। কিং জেমস্, তিনি মরে গিয়ে বেঁচেছেন, নয়তো আজকাল তামাকের কারবার দেখলে তিনি নিশ্চয়ই হার্টফেল করতেন।

যাক্‌গে সেসব কথা—

এবার আমি হাঁটা ধবলাম গ্রামের পথে। কটা বাজে কে জানে একটু খিদেও পেয়েছে। গ্রামের কাছে আসতেই নজরে পড়লো একটা টিবির মতো ঘর। সামনেই একজন বুড়ো ভদ্রলোক কাজ কবছেন। কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম— এখানে জল পাওয়া যাবে কি? যদিও জল তেষ্টা পায়নি কিন্তু বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সাথে পরিচয়ের এটা একটা মহাসূত্র। ভদ্রলোক তাঁর কাজ থামিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা কবলেন,

—তুমি কি ট্যুরিস্ট (মানে সখের পর্যটক)?

—না আমি একজন সাধারণ ট্রাভেলার (পান্থ)। আমি বিনীত হয়ে জবাব দিলাম,

ভদ্রলোক মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন,

—দেখে ইণ্ডিয়ান বলে মনে হচ্ছে।

—আপনি ঠিক ধরেছেন, জবাব দিলাম, কিন্তু মনে মনে ভাবলাম উনি নিশ্চয়ই আমাকে রেড ইণ্ডিয়ান ভেবেছেন।

ভদ্রলোক টিপির (রেড ইণ্ডিয়ানদের এক ধরনের মাটীর ঘরকে টিপি বলে) দিকে তাকিয়ে টোগা টোগা বলে কাকে যেন চেঁচিয়ে ডাকলেন— সঙ্গে সঙ্গে একটা নাদুস-নুদুস মেয়ে বেরিয়ে এলো, ন দশ বছর হবে বলে মনে হয়। ময়লা ছেঁড়া একটা ফ্রক পরা, দু'পাশে সুবিন্যস্ত বিনুনী, গলায় মোটা পুথির মালা, ফুলো-ফুলো চোখ। আমি অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম— ঠিক যেন আমাদের দেশেরই একটা পাহাড়ী মেয়ে। কে বলবে যে এ সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারের আর এক দেশ! আমার চোখে এই ছোট্ট মেয়েটার সাথে আমাদের শেরপা মেয়েদের সাথে কোন তফাৎ-ই দেখতে পেলাম না, হুবহু মিল— এমন কি গালের সেই টোলটা পর্যন্ত। আমাকে ওরকমভাবে চেয়ে থাকতে দেখে বুড়ো ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞেস করলেন— ওরকম হাঁ করে কি দেখছো বাবা— ওর বিয়ে দেবার বয়স এখনও হয়নি। আমি থতমত খেয়ে গেলাম। ভদ্রলোক রসিকতা করলেন কিনা বুঝলাম না।

—এই ভদ্রলোককে এক বাটী জল এনে দাও। বুড়ো ভদ্রলোকের কথামতো মেয়েটা এক বাটী জল এনে আমাকে দিল।

আমি জল খেয়ে বুড়ো ভদ্রলোককে আমার মনের কথা বললাম অর্থাৎ ওর নাতনি ঠিক যেন আমাদের দেশেরই একটা মেয়ে।

এবার ভদ্রলোক বুঝলেন যে আমি আসলে ওদের জাতের ইণ্ডিয়ান নয়। উপরন্তু খাঁটী ইণ্ডিয়ান। পকেট থেকে আমি একটা ডলার বের করে মেয়েটার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললাম— যাও কিছু চকোলেট কিনে আনোতো, একসঙ্গে খাওয়া যাবে। বুড়ো ভদ্রলোক তাতে দেখলাম গররাজি নন।

আলাপ চলতে লাগলো। আস্তে আস্তে জানলাম টোগা হচ্ছে ছেলের ঘরের নাতনি, ছেলে ও ছেলের বৌ দু'জনেই চাকরী করে। তাদের আরও কয়েকটা ছেলে-মেয়ে আছে, তবে তারা মায়ের সাথেই থাকে। ভদ্রলোকের ছেলের বৌ একটা জামার দোকানে কাজ করে আর সেই সময়ে তার ছেলে-মেয়েরা রাস্তার ওপর খেলা করে। রাস্তায় গাড়ী ঘোড়া সেরকম বিশেষ কিছু নেই কাজেই চিন্তার কি? এই ইণ্ডিয়ান রিজার্ভেশন বা গ্রামে ছোটদের জন্য স্কুল আছে বটে, কিন্তু সেটা খুব সুবিধেব নয়। ছেলে-মেয়েদের ভালো শিক্ষা দিতে হলে তাদের পাঠাতে হবে এখান থেকে দশ মাইল দূরের আর এক স্কুলে— সেও অনেক খরচ।

এই গ্রামে যারা থাকে তারা সম্পূর্ণই আমেরিকান ইণ্ডিয়ান— আমাদের ভাষায় যাকে বলি রেড ইণ্ডিয়ান। এই গ্রামে কয়েকজন সাহেব ব্যবসায়ী আছেন বটে তাবে তাঁরা নেহাৎ-ই কারবারী লোক। একমাত্র ব্যবসা ছাড়া তাঁদের সাথে বড় একটা মিল নেই। এই গ্রামের স্কুলে ইংরেজী ও শেরকী দু'ভাষাই শিক্ষা দেওয়া হয়। এই গ্রামে এদের মধ্যে সেই আদি শেরকী ভাষারও যথেষ্ট চলন আছে। রেড ইণ্ডিয়ানরা নিজেদের ভাষা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে খুব পছন্দ করে— আর এই কারণেই আমেরিকানরা এখানে ট্যুরিস্ট হিসেবে আসে— মূল উদ্দেশ্য এদের হাব-ভাব ও রীতি-নীতি দেখবার জন্য।

আমি এবার বুড়ো ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলাম,

—আচ্ছা দাদু, আপানাদের সাথে এই সাদা চামড়ার আমেরিকানদের মূল তফাৎটা কোথায়?

—খুব ইজি প্রশ্ন। ওরা ভদ্রলোক আমার গরীব, ওদের জীবনযাপন আর আমাদের জীবনযাপন সম্পূর্ণ আলাদা। দাদু জবাব দিলেন।

—আচ্ছা, আপনার যদি এখন হঠাৎ প্রচুর টাকা হাতে আসে তাহলে কি আপনি ওদের মতো জীবনযাপন করবেন না?

—কখ্খনো নয়! দাদু হুমকি দিয়ে উঠলেন— আমিতো আগেই বলেছি যে, ওদের জীবন আর আমাদের জীবনে অনেক তফাৎ,— তবে কি জানো (দাদু এবার একটু নরম হলেন) টাকা-পয়সা থাকলে আমি আমাদের ছেলেমেয়েদের ভালো করে খাওয়াতে পরাতে পারতাম। সরকার যা দেয়ে তাতে ঠিক চলে না।

—সরকার মানে যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলছেন নিশ্চয়ই।

—অবশ্যই, এখন আমরা সবাই আমেরিকান। আমরা এখন আমেরিকান সিটিজেন বুঝলে হে। দাদু হাতের কাজটা থামিয়ে আমার দিকে তাকালেন।

—কিন্তু আপনারা হচ্ছেন আমেরিকার আদি মানুষ, আমেরিকা আবিষ্কারের অনেক আগের থেকেই আপনারা এখানকার অধিবাসী, কাজেই সেদিক থেকে বিচার করতে গেলে আমার মতো আপনারাই হচ্ছেন খাঁটি আমেরিকান। তাই নয়কি?

দাদুর চোখ দুটো চক্‌চক্ করে উঠলো— ঠিক ধরেছো, ঠিক—ঠিক—ঠিক কথা কিন্তু সত্যি কথাটা বলাই হচ্ছে মহাপাপ। এ জগতে ধর্ম বলতে কিছু নেই, জোর যার মুলুক তার...দাদুর কথাটা শেষ হবার আগেই টোগা এসে হাজির— ওর হাত ভর্তি চকোলেট। ওর হাত থেকে একটা চকোলেট নিয়ে মুখে পুরলাম তারপর ওর গাল টিপে আদর করে উঠে পড়লাম।

একটা কাঠের ঘরে চারপাশে কয়েকটা চেয়ার, টেবিল ও কিছু লোকের ভিড় দেখে মনে হ'ল এটা চায়ের দোকান। আমি সেদিকে এগিয়ে গেলাম। হাঁা, আমার অনুমান মিথ্যে নয়। একটা চেয়ার টেনে বসতেই একটা অল্পবয়সী ছেলে এগিয়ে এল— কি চাই?

—পাউরুটি, ওমলেট আর একটা কোকো-কোলা। আমি অর্ডার দিলাম।

আমি ওম্‌লেটটা প্রায় অর্ধেক খেয়েছি, ঠিক এমন সময় একটা লোক ছুটতে ছুটতে এসে হাজির— আমার কাছে এসে প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে বলল,

—আপনার নাম কি...

—বিমল দে— আমি তার কথাটা সমাপ্ত করলাম।

—এই দেখ— আপনাকে আমরা প্রায় একঘন্টা ধরে খুঁজছি।

—কেন, কি ব্যাপার?

—ব্যাপার মানে! আমরা কিছু জানি না, আসলে বুচফিলড্ সাহেব আপনাকে খুঁজছেন।

—তাই নাকি? —আমি আমার খাবারটা শেষ করে দামটা মিটিয়ে দিয়ে, বেরিয়ে এলাম দোকান থেকে।

বুচফিলডের অফিসে আসতেই ভদ্রলোক আমাকে নিয়ে পাশের ঘরে এলেন। সেখানে আরও কয়েকজনের সাথে পরিচয় হ'ল। তারমধ্যে আছে 'যো' বা ক্রিকিতাত্, স্থানীয় স্কুল মাস্টার, শেরিফ বা গ্রামের মেয়র আর একজন গ্রামীন হাতুড়ে ডাক্তার সবাই তাকে ডাকে মেডিসিনম্যান বলে। আসলে এরা সবাই হচ্ছে গ্রামের এক-একজন মাতব্বর। তাদের সাথে পরিচিত হ'লাম। আমার সম্পর্কে এরা সবাই দেখছি অল্প-বিস্তর জানে, কাজেই নতুন করে আর ভূমিকার প্রয়োজন হ'ল না। আজ বিকেল পাঁচটার সময় স্থানীয় স্কুল ঘরে একটা জমায়েতের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। প্রায় পঞ্চাশ ষাট

জনের মতো হবে, সবাই যুবক আর বৃদ্ধ। এই সভায় আমাকে শিক্ষণীয় বিষয় কিছু বলতে হবে।

আমি মনে মনে ভেবে দেখলাম, বিকেল পাঁচটা,— তার মানে আর ঘন্টাখানেকের মধ্যেই। বেশ ভালো কথা, আমি রাজি হয়ে গেলাম। আজকের সভা যদি সাক্‌সেস্‌ফুল হয় তবে আর একদিন ঠিক হবে বাকী সকলের জন্য। তারমানে বুঝলাম আমার সেখানে থাকার অসুবিধে নেই।

রেড ইণ্ডিয়ানদের সভায় আমার প্রথম বক্তৃতা :

কথা ছিল পাঁচটায় কিন্তু আরম্ভ হ'ল ছটার সময়। স্কুলের ভেতরেই এ সভার আয়োজন করা হয়েছে। প্রায় সত্তর-আশি জনের মতো হবে বলে মনে হচ্ছে। বুচফিল্‌ড মশায় সকলের সাথে আমাব পরিচয় করিয়ে দিলেন বটে, কিন্তু তাঁদের নাম ও পেশা আমার এই ছোট্ট মগজে গেঁথে রাখা সম্ভব হ'ল না। তবে এককথায় বলতে গেলে বলা চলে— এই সভায় একমাত্র গ্রামের গণ্যমান্যদের ডাকা হয়েছে। মন্‌টেপ বলে একজন প্রাক্তন (বৃদ্ধ) ইন্‌জিনিয়ার আমার ভূমিকা সমেত ছোট্ট একটা বক্তৃতা দিলেন, তারপরই আমার দিকে চেয়ারটা এগিয়ে দিলেন— আমিও যথাযথ তাঁদের সৌজন্যের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে শুরু করলাম— আমার বক্তৃতা।

আজকের দিনটা আমার পরিব্রাজক-জীবনের একটা অমূল্য সম্পদ। আমি একজন ইণ্ডিয়ান, যার দেশ হচ্ছে ইণ্ডিয়া। আর যাদের মাঝে এখন দাঁড়িয়ে তারাও ইণ্ডিয়ান, তবে তাদের দেশ আমেরিকা। এখন কথা হচ্ছে যে যাদের দেশ ইণ্ডিয়া নয় তারা কি করে ইণ্ডিয়ান হ'ল। সেটা একটা বিরাট ভুল। ভুলটা হয়েছিল কলম্বাসের। তিনি আমেরিকার মাটিতে পা দিয়ে ভেবেছিলেন এটা ভারত, তাই তিনি এখানকার সবাইকে ভারতীয় বলে অভিহিত করেছিলেন— যদিও তাঁর পরবর্তীকালে সবাই বুঝেছিল যে এটা ভারত নয়, কিন্তু তথাপি এই আমেরিকান আদিবাসীদের ভারতীয় নামটা ঘোচেনি— আর সেই নামটা আজও চলে আসছে।

যাই হোক, এ সবই আপনাদের জানা কথা, কাজেই তার পুনরাবৃত্তি না করাই ভালো, কি বলেন? তবে হ্যাঁ, আমার পর্যটনের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে জানা, জানতে হবে— আমি জানি যদিও জানার শেষ নেই তবুও যতটুকু সম্ভব। আমার নেশা হচ্ছে ইতিহাস, ভূগোল, সমাজ ও দর্শন।

আজকে আপানাদের কাছে আমি কিছু ইতিহাসের কথা বলতে চাই— যেদিকটা সকলের হয়তো জানা নেই। বলুন আপনারা যদি রাজি থাকেন...তাহলে আরম্ভ করি—

ক্রীস্টফ্‌ কলোম্ব্‌ (Christof Colombe) আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন— সে কথা আমরা সবাই জানি। কিন্তু কেন তিনি এই বিরাট ঝুঁকি নিয়ে অন্তহীন

না জানা, না শোনা এই ভয়াবহ্ আটলান্টিক পাড়ি দিয়েছিলেন। হ্যাঁ, তার উত্তরে আপনারা বলবেন—

সে অনেক কারণ— নতুন দেশের সন্ধানে;
একটা বিরাট অ্যাডভেঞ্চারের জন্য;
পৃথিবীর ইতিহাসে অমর হবার জন্য;
সেই সময়কার ঘুন ধরা জাতিকে
নতুন একটা দেশে আনার জন্য;
নতুন একটা খৃষ্টান রাজত্বের সন্ধানে;
এক বিরাট গুপ্তধন আবিষ্কারের জন্য;

হ্যাঁ— সত্যি কথা এই প্রত্যেকটা কারণই সত্য। আর এই কারণগুলোই যদি একমাত্র কারণ হয়ে থাকে তাহলে তিনি যখন তাঁর জাহাজ ভিড়ালেন আমেরিকার একটা দ্বীপে তাকে তিনি ইণ্ডিয়া না ভেবে অন্য কিছুও তো ভাবতে পারতেন— সম্পূর্ণ নতুন দেশ, নতুন জগৎ বলে।

হাইতিকে (Haiti) তিনি ভেবেছিলেন ইণ্ডিয়া, তাই নয় কি? ক্রীস্টফার কলম্বাস্ বিশ্বাস করতেন পৃথিবী গোল, আর তাঁর স্থিব ধারণা ছিল অতলান্তিকের (অতল-আন্তিক) ঠিক ওপরেই রয়েছে ইণ্ডিয়া। অর্থাৎ সাগরটা ঘুরে গিয়ে ঠিক ভারতে ঠেকেছে।

আজকাল আমরা সবাই জানি কলম্বাস নিজের হাতে লিখে গেছেন— তিনি ভারতবর্ষের সন্ধানে বেরোচ্ছেন— আর তাছাড়া পৃথিবীর বুকে লুকিয়ে আছে যে রহস্য তাকে জানতেই হবে।

তার মানে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে কলম্বাস ভারতবর্ষ সম্পর্কে বিশেষ ওয়াকিবহাল ছিলেন, তাই না? এবার আসা যাক অন্যদিকে অর্থাৎ ভারতের (ইণ্ডিয়া) দিকে। সেই সময় কলম্বাসের চোখে ভারতবর্ষের রূপটা কি ছিল অথবা তিনি ভারতবর্ষ সম্পর্কে কতটুকু জানতেন— আসলে সেই সময়ে ইউরোপের বাজারে ভারতবর্ষের রূপটা কি রকম ছিল সেটাই এখন আপনাদের বলবো। হ্যাঁ মনে রাখবেন, তখনও জলপথে ভাস্কো ডা গামা ভারতে যাননি— ভাস্কো ডা গামার ভারতে প্রবেশ ১৪৯৮ সালে।

এবার আপনাদের একটা গল্প বলি শুনুন,— আপনারা গ্র্যাণ্ড খানের নাম শুনেছেন কি? শোনেননি তো—

সেই সময় মানে ১২০০।১৩০০ খৃষ্টাব্দের কথা, ভারতের নাম তখন ইউরোপের কাছে এক রূপকথার রাজ্য।

গ্র্যাণ্ড খানের আসল নাম হচ্ছে কুবলাই খান। চেঙ্গিস খানের নাতি। চীনদেশের মোগল বাদশাহ হচ্ছে কুবলাই খান। কলম্বাসের ইচ্ছা ছিল জলপথে এই কুবলাই খানের দেশ আবিস্কার করা, তাইতো তিনি মধ্য আমেরিকার দ্বীপগুলোকে ভেবেছিলেন জাপান আর ভেবেছিলেন ঠিক এর উত্তরেই হচ্ছে এই গ্র্যাণ্ড খানের দেশ এশিয়া—

চীন, ভারতবর্ষ। মণি-মাণিক্যে ভরা এই মোগল চূড়ামণির দেশই হচ্ছে আসল দেশ স্বর্গ রাজ্য ভারতবর্ষ।

এবার আসা যাক সমসাময়িক কালের একটি গল্পে— আপনাদের একটা থারটিন সেঞ্চুরীর গল্প বলি শুনুন—

ভেনিস, সেই সময় ভেনিসের চলছে সুবর্ণযুগ। সেখানকার নাবিকেরা দিক্‌বিদিকে পাড়ি জমাচ্ছে বাণিজ্যের জন্য। ভারতবর্ষও সেই সময় তাদের অজানা ছিল না, নানা রকমের মশলা, সিল্ক ও তুলোর অদ্ভুত সমাবেশ। গিওভানি (Giovani) নামে একজন নাবিক ঘুরতে ঘুরতে একটা ময়ূরপঙ্খীর মালিককে জিজ্ঞাসা করলেন— আচ্ছা আপনাদের এই এত লংকা আসছে কোত্থেকে?

—ইরাক থেকে।

উত্তর শুনে গিওভানি যাত্রা শুরু করলেন ইরাকের দিকে। অনেকদিন পর হিমসিম খেয়ে তিনি এসে উপস্থিত হলেন ইরাকে, সেখানকার বাজারে তিনি দেখলেন প্রচুর লংকা বস্তায় বস্তায় ভর্তি, আনন্দে তিনি লাফিয়ে উঠলেন, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন— কোত্থেকে এই লংকা আসছে ভাই?

—পূর্ব থেকে, তিনি উত্তর পেলেন। ভেনিসের কাছে ইরাক হচ্ছে সম্পূর্ণ পূর্বেব দেশ, আর এই পূর্বদেশের লোকেরা বলছে কি না, আরও পূর্বের কথা, তার মানে বুঝতেই হবে পৃথিবীটা গোল। কাজেই ভেনিস থেকে এতগুলো দেশের মধ্য দিয়ে না গিয়ে সরাসরি যদি সাগর পাড়ি দেওয়া যায় তাহলে নিশ্চয়ই সেই মসলার দেশে পৌঁছানো যাবে। আসল কথা হচ্ছে যে, বহুদিন আগে থেকেই ভাবতেব সঙ্গে ইরাকের সরাসরি জলপথে বাণিজ্য-তরী যাতায়াত করতো মসলা, সূতো ও সিল্কের জন্য। অবশ্য সিল্কের জন্য স্থলপথে যাতায়াতটা বেশী ছিল।

আশাকরি আপনারা হয়তো ভাবছেন আমি আমেরিকায় এসে ভারতের ইতিহাস বলছি কেন, তাই না? আসলে আপনাদের কেন ভারতীয় বলা হয় তারই একটু পূর্ব ইতিহাস মাত্র। আপনারা পরে আমার সম্পূর্ণ তত্ত্বের সূত্রটা খুঁজে পাবেন। আমি সকলের দিকে তাকিয়ে দেখি সবাই নীরব ও মনোযোগী, তাই আবার আরম্ভ করলাম—

আবার ফিরে আসা যাক সেই প্রাচীন যুগে। শুধু ভেনিসে নয়, প্রায় সমস্ত ইউরোপীয় দেশগুলোতেই হঠাৎ যেন ভূইফোঁড়ের মতো একটা গল্প রটিয়ে গেল— প্রিস্টার জন্ (Prister John), প্রিস্টার জন্, জনের পবিত্রভূমি। প্রিস্টার জন্ হচ্ছে সম্পূর্ণ একটা নতুন দেশ। যেখানে বাস করে শুধুই খৃস্টানেরা, যেখানে অধার্মিকের কোন অত্যাচার নেই, যেখানে মহামারী বিদ্রোহ ঘৃণা বিদ্বেষ কিছুই নেই। সেখানে আছে সোনা রূপা দামী পাথর প্রচুর খাবার সব কিছু। ভগবান স্বয়ং সেখানে রাজত্ব চালান— তার মানে সোজা কথায় যাকে বলে স্বর্গরাজ্য। বাণিজ্যের জন্য রয়েছে— মাল-মসলা, রাজার সাহায্য আর সুন্দরী ললনা। তাদের যে শুধু দেহের ভঙ্গিই অপূর্ব তাই নয়, মন ও প্রাণের আকর্ষণও দারুণ— কাজেই এ হেনো দেশকে স্বর্গরাজ্য ছাড়া আর কি বলা যায়।

জন্ প্রিস্টার সম্পর্কে সত্য মিথ্যা অনেক আজব গল্প সে সময় উঠতি যুবক ও নাবিকদের মনের এক মস্ত খোরাক্— সময় কাটাবার এক অদ্ভুত খোরাক্। কথায় কথায় লোকে বলতো— "একি বাবা জন্ প্রিস্টারের দেশ পেয়েছো যে যা চাইবে তাই পাবে।" জন্ প্রিস্টার কারোও কারও মতে অতি পবিত্র এক খৃস্টান রাজাত্ব।

কাজেই কলম্বাসের কানেও একদিন সেই গল্প গেল। তখনকার অন্যান্য উঠতি নাবিকদের মতো সে কিন্তু সম্পূর্ণ হেসে উড়িয়ে দিল না। কারণ সে আগেই প্রতাপশালী মোগল বাদ্‌শাহ্ গ্র্যাণ্ড খানের কথা শুনেছে— এই গ্র্যাণ্ড খান আর প্রিস্টার জন্ এই দুইয়ের মধ্যে যোগাযোগ থাকলেও থাকতে পারে।

এবার আসা যাক এই গল্পের মূল উৎস। কলম্বাস বা তার সমসাময়িক কালে, কুব্‌লাই খানের দেশ, তথা সমগ্র এশিয়ার কথা কারও কাছে অজানা ছিল না; কারণ অষ্টম শতাব্দী হচ্ছে মুসলমান জগতেব সুবর্ণ যুগ। ভূমধ্যসাগরটা সেই সময় মুসলমান রাজত্বেব একটা লেক্ মাত্র। তুরস্ক, এশিয়া মাইনর, ইরান, ভারত, চীন তখন প্রায় মোগলদেব হাতে, কাজেই মুসলমান সুলতানদের কল্যাণে ভারতের কথা সবাই জানে। কিন্তু কলম্বাসের জ্ঞান একটু অন্য সূত্রে। কারণ সেই সময় আটলান্টিক পার হওয়া মানে ইস্‌লাম ধর্মের বিরুদ্ধে যাওয়া। স্থলপথে যদিও তারা প্রায় একাধিপত্য বিস্তার করেছে কিন্তু জলপথটা এখনও তাদের করায়ত্তে আসেনি। তাহলে এই স্বর্গরাজ্যের গল্প কি এই মুসলমানদের কাছ থেকে এসেছে? —না তাও নয়।

আসলে গল্পের নায়ক হচ্ছেন, কলম্বাসের আরও দু'শ বছর আগেকার একজন পথপ্রদর্শক। তিনি হচ্ছেন ভেনিসের সেই নাম করা বণিক ও পরিব্রাজক— ঐতিহাসিক মার্কো পোলো।

মার্কো পোলো: তিনি তাঁর যাত্রা শুরু করেছিলেন ১২৭১ সালে আর ফিরেছিলেন ১২৯৫ সালে।

মার্কো পোলো তাঁর বাবা ও কাকার সাথে স্থলপথে ভারতে গিয়েছিলেন। মাত্র সতেরো বছর বয়েসের তরুণ মার্কো তদানীন্তন পোপ গ্রেগরী (নবম)র বার্তা বহন করে নিয়ে যান— বহু দূরের অচেনা-অজানা দেশের আর এক মহামান্য কুবলাই খানের উদ্দেশ্যে। তিনি স্থলপথে বাগ্‌দাদ পারস্য কাবুল হয়ে পিকিং যান। আর ফিরে আসেন জলপথে ইন্দোচীন, কোচিন, সিংহল, কালিকট, বম্বে, পারস্য হয়ে। তিনি ভেনিসে ফিরে এসে হোটেল রেস্তেরা বা বাজারে যখনই সময় পেতেন সবাইকে বলতেন— সেই বিরাট কুবেরপতি কুব্‌লাই খানের কথা, তাঁর রাজপ্রাসাদের কথা। ভারতের মালাবার বন্দরে মসলার কথা, ধর্ম আর সমাজের কথা। তাঁর সেই বিচিত্র অভিজ্ঞতা তখনকার যুগে সম্পূর্ণ নাবিক জগতে এক বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। তিনি সবাইকে বলেছিলেন জীপাঙ্গু দ্বীপের কথা যে দ্বীপের রত্নসম্ভারের তুলনা চলেনা, জীপাঙ্গু মানে বর্তমান জাপান। মার্কো পোলো চীনে কুব্‌লাই খানের দরবারে বিশেষ

রাজ- অতিথি হিসেবে সম্মানিত হয়েছিলেন, কাজেই তাঁর সেই সময়কার নিখুঁত সংবাদ ইউরোপের বাজারে এক বিরাট আলোড়ন তোলে। আমার মনে হয় প্রিস্টার জনের সেই রূপকথার গল্প প্রথম মার্কো পোলোর মুখ থেকেই বেরোয়। অবশ্য অনেকের মতে প্রিস্টার জনের দেশ হচ্ছে আফ্রিকার ইথিওপিয়া। মার্কো পোলোর সবিশদ বিবরণী বা ভ্রমণকাহিনী— তাঁর মৃত্যুর অনেক পর প্রকাশিত হয়েছে। তিনি সহস্তে তাঁর ডায়েরী লিখে গেছেন— "জগতের সেরা"— বা Le Million.

যাই হোক, পরিশেষে আমি এই কথাই বলবো যে, কলম্বাসের ভারতপ্রেমের উৎস প্রধানতঃ মার্কো পোলো। আর তাইতো ভারত- প্রেমিক কলম্বাস আমেরিকায় আপনাদের দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলেছিলেন,— আমি ভারতে এসে পৌঁছেছি আর তাইতো আপনারা ভারতীয়...। ইণ্ডিয়ান।

একটুখানি তফাৎ রেখে বলা হয়েছে রেড ইণ্ডিয়ান। পরে হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ ইউরোপীয়ানরা এসেছেন এখানে আইনবলে ও ক্ষমতাবলে। তারাই আজ পৃথিবীতে আমেরিকান আর আপনারা আজও ইণ্ডিয়ানই থেকে গেলেন।

পেছন থেকে একজন ইণ্ডিয়ান হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে আমার কথার প্রতিবাদ জানালো,

—কিন্তু আসলে কি আমরা ইণ্ডিয়ান নই?

—অবশ্যই না, আমি সে কথাই তো এতক্ষণ ধরে বললাম— আমি আপনাদের ইতিহাস আপনাদের দেশে বলতে আসিনি— আসলে আমি হচ্ছি খাঁটি ভারতীয়— ইণ্ডিয়ান-ইণ্ডিয়ান। আপনাদের সঙ্গে আমাদের একই নামে অভিহিত করা হয়েছে সেই কথাই বললাম।

—সেই গ্র্যাণ্ড খানের দেশ কি এখনও আছে? একজন প্রশ্ন করলেন।

—অবশ্যই— মাটিটা যাবে কোথায়, তবে কি না তার অনেক অনেক পরিবর্তন হয়েছে, রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক আরও আরও অনেক। সে কি আর আজকের কথা ভাই, আজ থেকে প্রায় পাঁচ-ছ'শ বছর আগেকার কথা, তবে ইতিহাস তার একমাত্র সাক্ষী। অবশ্য সে সব মনুমেন্ট এখনও আছে.....।

আর একটা প্রশ্ন এলো, —আচ্ছা আপনাদের সঙ্গে আমাদের তফাৎটা কোথায়?

—আমার মতে কিছু তফাৎ নেই, আপনারা আর আমরা সবাই মানুষ— একই বিধাতার সৃষ্টি শুধু স্থানকালপাত্রভেদে একটু পরিবর্তন এই আর কি?

—আপনাদের দেশের লোকদের দেখতে কেমন।

—ঠিক আপনার মতন—

আমার উত্তরে সবাই হো-হো করে হেসে উঠলো। পরে আমি রবি ঠাকুরের একটা লাইন দিয়ে বাংলা আবৃত্তি করে শোনালাম...

"শক-হূন্ দল পাঠান মোগল এক দেহে হ'ল লীন..."। ভারতবর্ষে যে যায় সে ভারতের সাথে মিশে এক হয়ে যায়। বিভিন্ন জাতি উপজাতি ভারতে এসেছে

আর তাদের সংমিশ্রণেই হয়েছে মহাভারত। সেখানে সাদা-কালো-তামাটে-লাল সব রকমেরই মানুষ আছে। ভারতবর্ষ চিরশান্তির দেশ, বিশ্ব ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের দেশ, ভারতের দর্শন— সে আত্মার দর্শন। তাই তো কলম্বাস যেতে চেয়েছিলেন এমন একটি দেশে যেখানে নেই কলহ-বিদ্বেষ। ধর্মভিত্তিক রাজত্ব— দি কান্ট্রি অফ প্রিস্টার জন্ (The Country of John Prister)। আমি থামলাম....।

চারদিকে থেকে সবাই ডাকছে তাদের বাড়ীতে শোবার জন্য। আমি বেছে নিলাম ক্লিকিতাত্‌কে যাকে আমি এর আগেই যো বলে অভিহিত করেছি। জনতার ভীড় ঠেলে যো আমাকে বাইরে নিয়ে এল। একটু ফাঁকা জায়গায় গিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম কোথায় যাবো এখন? যো আমার কাঁধে হাত রেখে বললে— আরে বাবা, শুধু লেকচারে কি পেট ভরে? খেতে তো হবে। চলো বাড়ীর দিকে যাওয়া যাক। এই গ্রামের সব জায়গায় ইলেক্‌ট্রিক নেই, শুধু প্রধান রাস্তায় আর যারা ইলেকট্রিকের পয়সা দেবার ক্ষমতা রাখে একমাত্র সেখানেই ইলেকট্রিসিটি।

যো-এর সাথে আমি একটা টিবিমতো ঘরে উঠলাম। চার পাশের কঞ্চি ও ঝোপের গোলাকার একটা ঘর। এ ধরনের ঘরকে ওরা বলে ওয়াগাম্ (Wagam)। যো-এর মা ও এক বোনকে পরিচয় করিয়ে দিল। মেয়েদের পোষাকটাও ঠিক আমাদের দেশের গুর্খাদের মতো। ঢিলে সায়া, ফুলহাতা লম্বা ব্লাইজ আর তার ওপর বড় পুঁথির মালা। পিঠের ওপর ঝুলে পড়েছে লম্বা দুটো বিনুনী। চারপাশে লক্ষ্য করে দেখলাম— আসবাবপত্রের মধ্যে এমন কিছু নেই। একটি টেবিল যার একটা পায়ার ওপর গণ্ডাখানেক পেরেক মেরে তাকে খাড়া করে রাখা হয়েছে, একটি বেঞ্চ ও দুটো চেয়ার। তারই সঙ্গে খাপ খাইয়ে রাখা হয়েছে কয়েকটা চামড়ার কার্পেট, পোড়া সস্‌প্যান আর ওই ধরনেরই কিছু আসবাবপত্র।

যো-এর মা নিজের হাতেই রান্না শুরু করলেন— আটার স্পগেটি টমেটো স্যুপ আর হট্ ডগ্। ওর বোনটি ষোলো-সতেরো বছরের— তাকে দেখে মনে হ'ল ওদের এ গরীবানার জন্য যেন ও খুব লজ্জিত। আমি অবশ্য আমার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য দিয়ে যতটা সম্ভব ওদের মনে সহজ হতে চেষ্টা করলাম।

খাওয়া দাওয়ার পর যো বললো— চল এবার—

—কোথায়?

—চল দেখি কোথায় তোমার শোবার বন্দোবস্ত করা যায়।

—সে কি— তোমার এখানে শোবার বাধা আছে কি?

—না তা নেই, তবে কিনা বুঝতেই পারছো— আমাদের ঘরের যে অবস্থা— ও আমতা-আমতা করতে লাগলো। আমি যো-এর দিকে তাকিয়ে দৃঢ় স্বরে বললাম,— তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করতে পারছো না? যো আমার কথায় আহত স্বরে

বললো— সে কি ভাই, তোমার মত লোক আমাদের কুঁড়ে ঘরে এসেছে এটা যে কতখানি সৌভাগ্যের, তা তোমাকে কি করে বোঝাই বলো?

—তাহ'লে আর কোনো কথা নেই— তোমার মা বা বোনের তরফ থেকে কোনো আপত্তি নেই তো?

—না না।

—তবে ঠিক আছে। আমার জন্য ভাবতে হবে না, আমার বেড্ সঙ্গেই আছে— মানে স্লিপিং ব্যাগ আর কি। ওঃ অনেকদিনের পর যেন আমি ঘর পেলাম! যো-এর পাশে শুয়ে কুঁড়ে ঘরের চামড়ার ছাউনির দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলাম— সত্যি কি আমি এখন ইউনাইটেড স্টেটস্‌এ না সাঁওতাল পরগণায়...।

যো বা ক্লিকিতাত্‌কে ভেবেছিলাম নেহাৎ-ই ভ্যাগাবণ্ড ইয়ং কিন্তু যতই ওর সাথে ঘুরছি ততই অবাক হয়ে যাচ্ছি। ওর আলাদা অনেকগুলো পেশা, এ গ্রামের ও একজন হাতুড়ে ডাক্তার আর চমৎকার পুঁথির শিল্পীও বটে।

আমি তাই একসময় ওকে জিজ্ঞেস করলাম— আচ্ছা যো— তুই এত কাজ যখন জানিস ব্যবসা কর না, তাতে পয়সা আসবে।

যো আমার দিকে তাকিয়ে বললো— তুইও দেখছি আমেরিকানদের মতো কথা বলছিস। বলাই বাহুল্য যে আমাদের বন্ধুত্ব এখন তুই-তুকারিতে এসে পৌঁছেছে। ও বিজ্ঞের মতো আমার দিকে তাকিয়ে বললো— টাকা দিয়ে কি হবে— জগতে টাকা দিয়ে সুখ আসে না, তবে হ্যাঁ খাওয়া-পরার জন্য যা দরকার আমার তা আছে, আমি সুখী সেটাই আমার কাছে বড় কথা।

যো নিজে সুখী ঠিক কথা— কিন্তু আমি দেখেছি এ গ্রামের সবাই ওর মতো উচ্চমনা নয়, তাদের মতে টাকাটাই সব। এই গ্রামে যখন একটা বিরাট ইম্‌পালা বা স্কাইলার্ক ঢোকে তখন সবাই ব্যস্ত হয়ে ওঠে সং সেজে টুকিটাকি জিনিস বিক্রি করে পয়সা পাবার জন্য। এদের মধ্যে সবাই যে খ্রীস্টান তা নয়, অনেকে এখনও সেই প্রাচীন ধর্মে বিশ্বাসী অর্থাৎ টোটেম্‌দেবের ভক্ত। ওদের ধর্মের সাথে অনেকটা এস্কিমোদের ধর্ম এবং এশিয়ার বিভিন্ন ধর্মের সমন্বয় দেখা যায়। এরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেবের পূজা করে— আমাদের দেশের মতো এরাও অগ্নি, জল ও বাতাসের পূজারী। তা ছাড়া আছে বিভিন্ন রোগের বিভিন্ন দেবতা। এরা আরও বিশ্বাস করে যে, ভগবান আত্মা হাওয়ার সাথে সব জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, কাজেই যখন বিশেষ প্রয়োজন তখন ভগবানকে ডাকবার জন্য দৈহিক অঙ্গভঙ্গিটাই যথেষ্ট। অর্থাৎ সোজা কথায় যাকে বলে নাচ। যো'র সাথে ঘুরে ঘুরে আমি ওদের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করতে লাগলাম।

পাড়ায় এর মধ্যেই আমার নাম ভালোভাবে রটে গেছে। যেখানে যাই সেখানেই আমার পেছন পেছন একদল ছেলেমেয়ে, অবশ্য ওরা খুবই মিশুক ও ভদ্র। আমি

যখনই সময় পাই ছোটদের নিয়ে বসে যাই গল্প বলতে। ওদের মধ্যে অনেকে ইংরাজী বোঝে না— যো আমাকে এ বিষয়ে সব সময় সাহায্য করে। সত্যি কথা বলতে কি যো'র সাথে আমি যেন একাত্ম হয়ে গেছি।

সেদিন বিকেলবেলা হাঁটতে হাঁটতে আমি ও যো এসে পৌঁছলাম রবার্টের অফিসে। আমি প্রথমেই বলেছি ও অর্থাৎ রবার্ট বর্চফিল্ড সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্টের হেড। রর্বাট আমাকে দেখেই এগিয়ে এল— খবর কি বিমল? আমাদের গ্রামটা তোমার লাগছে কেমন?

—খু-উব ভালো। আমি সাহাস্যে উত্তর দিলাম।

—চল তোমার সাথে একটু হাঁটা যাক।

আমরা একসঙ্গে সামনের দিকে এগিয়ে চললাম। ববার্ট হাঁটতে হাঁটতে এখানকার যাবতীয় ইনফরমেশন দিতে লাগলো। আমি যতটা সম্ভব ওর কাছ থেকে স্থানীয় সংবাদ ও সার্ভে সংগ্রহ করতে লাগলাম।

শেরকী রিজার্ভেশনে সবশুদ্ধ লোকসংখ্যা হচ্ছে চার হাজার সাতশ'-এর মতো। আর এই রিজার্ভেশনের সম্পূর্ণ এলাকা হচ্ছে ছাপান্ন হাজার পাঁচশ' তিয়াত্তর একর জমির উপর। অর্থাৎ প্রায় পাঁচ হাজার লোকের চাষবাস করে থাকা-খাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

১৯২৫ সালের যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের এক আইনের বলে এই সম্পূর্ণ জমিটাই শেরকীদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, তবে সরকার সব সময়ই এর ওপর নজর রাখছেন যাতে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি না হয়।

এই রিজার্ভেশনের ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমার মনেই হচ্ছে না যে— নিউ ইয়র্কের কাছাকাছি একটা গ্রাম। ঠিক যেন ভারতের কোন এক গ্রামের মধ্য দিয়ে হাঁটছি। ডানদিকে একটা কাঠের বাড়ীর পাশ কাটিয়ে যাচ্ছি ঠিক এমন সময় জানালা দিয়ে একজন বৃদ্ধ গোছের লোক মুখ বাড়িয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন,— এই রবার্ট চললে কোথায়?

—এই একটু এদিকে ঘোরাফেরা করছি। রবার্ট সহাস্যে জবাব দিল। ভদ্রলোক ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। আমাদের প্রায় এক রকম জোর করেই তাঁর বাড়ীতে নিয়ে এলেন। আমার নতুন করে আর পরিচয়ের প্রয়োজন হ'ল না কারণ গতকাল এই ভদ্রলোকই আমাদের সভায় সভাপতির চেয়ারে বসেছিলেন। আমি কিন্তু ভদ্রলোকের আসল পরিচয়টা ঠিক এখনও জানি না— অথচ মুখ ফুটে সরাসরি জিজ্ঞেসও করতে পারছি না যে, মশায়— আপনার নামটা যেন কি?

হঠাৎ মনে হ'ল তাইতো— তাঁর বাড়ীর নেমপ্লেটে যেন একটা নাম লেখা ছিল বলে মনে হচ্ছে— এটা মনে হতেই আমি ভদ্রলোকের বাগান দেখবার নাম করে বেরিয়ে পড়লাম।

দরজার ওপর লেখা রয়েছে— চীফ শেরকী। বুঝলাম— ইনিই হচ্ছেন এই রিজার্ভেশনের সর্বেসর্বা। ভদ্রলোকের বয়স প্রায় পঁয়ষট্টির কাছাকাছি, দেখে মনে হচ্ছে খাঁটি শেরকী। নাম মাহাক্। দশ মিনিটের মধ্যেই কফি এল। কফি-চক্রে বসে আমি নিজেই মাহাক্ মশায়কে জিজ্ঞেস করলাম।

—কিছু যদি মনে না করেন একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবো।

—অবশ্যই—অবশ্যই, প্রশ্ন কর আমি উত্তর দেবো তাতে মনে করার আবার কি আছে, মাহাক্ মশায় ফোকলা দাঁতে হেসে জবাব দিলেন।

—আচ্ছা আপনিতো এখানকার চীফ (প্রধান) তাই না? আপনাদের কিভাবে সিলেক্ট করা হয় সেটা জানতে ইচ্ছে করছে— যেমন ধরুন আমাদের ওখানে ভোট বা বাই-ইলেকশনে মেয়রকে বাছাই করা হয়। আপনাদের এখানে এই ধরনের কিছু নিয়ম-কানুন আছে?

—ওহ্ হো—! ভদ্রলোক আকাশের দিকে মুখ তুলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন— ভালো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছো,— প্রশ্নটা অতি সহজ, আমিতো ভেবেছিলাম কি জানি বাবা কি প্রশ্ন করে বসবে কে জানে। মহাক্ মশায় থেমে থেমে আমাকে বোঝাতে লাগলেন।

বারোজন সভ্য নিয়ে গঠিত এই শেরকী রিজার্ভেশন সরকার। আর তাদের মধ্যে সর্বেসর্বা হচ্ছেন চীফ বা প্রধান। জনসাধারণের ভোটের মাধ্যমে তাদের নিয়োগ করা হয় আর তাদের সময় হচ্ছে চার বছর। আর তাদের কাউন্সিল বা ছোট ঘরের সভ্যদের নিয়োগ করা হয় দু' বছরের জন্য। শেরকী চীফ বা শেরকী সর্দারই আসলে এখানকার সর্বময় কর্তা। অনেক সময় তিনি কাউন্সিলারদের মত ছাড়াই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন।

রিজার্ভেশনের সম্পূর্ণ জমিটাই ধরতে গেলে এদের নিজস্ব আর বাৎসরিক আয় প্রায় চারশ' হাজার টাকা, এর মধ্য থেকে আবার যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে ট্যাক্স দিতে হয়। জংগল ব্যবসা থেকে যা আয় হয় সেটাই এদেরই মূলধন।

এখানকার শিক্ষা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি হতাশ হয়ে বললেন, যে, শেরকীরা সাধারণতঃ শিক্ষিত হতে চায় না। অথচ সবাই বড়লোক হতে চায়। শেরকীরা সাধারণতঃ তাদের প্রাচীন ঐতিহ্য বজায় রাখবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে। সেখানে এই বাহ্যিক স্কুল-কলেজের শিক্ষার কোন দাম নেই। তাই এ গ্রামের সাধারণ শিক্ষিত বলতে যারা ক্লাশ এইট পর্যন্ত পড়েছে তাদেরই বোঝায়। তবে হ্যাঁ— মহাক্ মশায় অতি গর্বের সাথে বললেন যে তাদের এই রিজার্ভেশনে ন'জন শিক্ষিত ছেলে আছে তারা সবাই গ্রাজুয়েট। এই ধরনের টুকিটাকি আরও খবর তাঁর কাছ থেকে পাওয়া গেল।

এবার ভদ্রলোককে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা উঠলাম। রবার্ট আর আমাদের সাথে এগোলো না, সে বিদায় নিল। আমি ও যো হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চললাম। আমরা

একটা বড় রাস্তার সামনে এসে থামলাম। যো আমাকে বুঝিয়ে দিল এটা হচ্ছে ১৯ নং ন্যাশনাল হাইওয়ে। এছাড়া আরও দুটো হাইওয়ে রয়েছে, একটার নাম ৪০ নং আর একটা ৪৪১ নং। কাজেই বড় বড় শহরের সঙ্গে যোগাযোগের কোনো অসুবিধা নেই। এখান থেকে অ্যাস্‌ভিল মাত্র ৫৬ মাইল। ওপর দিকে তাকিয়ে দেখি যে, আকাশের রং বদলাতে শুরু করেছে, তার মানে সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। যোকে বললাম তাহলে এবার ফেরা যাক্‌, কারণ সকাল বেলা কথা দিয়েছি যে, কমিউনিটি সেন্টারে নাচ দেখতে যাবো।

কমিউনিটি সেন্টার হচ্ছে ঠিক যেখানে আমি প্রথম সাইকেল থামাই। সেন্টারের কাছে আসতেই নজরে পড়লো, কয়েকজন পালকের বেশভূষা পরে ঘোরাফেরা করছে, ঠিক আমাদের দেশে যাত্রাদলের জটায়ুর মতো— তবে তফাৎটা হচ্ছে এই যে, এদের পোষাকটা আরও উন্নত ধরণের অর্থাৎ পালকের বাহার ও রঙের উজ্জ্বলতা আরও বেশী। আমি ভালোভাবে পরীক্ষা করতে লাগলাম খালি পা, হাঁটুর সাথে বাঁধা রয়েছে পালকের সাজ, বিরাট পালকের সায়া, বুক ও পিঠেব চামড়ার ওপর লাল ও সাদা রঙের কাজ করা, মাথায় বিরাট পালকের চূড়া, নাকের ওপর সাদা রঙ করা ও চোখেব চারপাশে গোলকের ঘন সবুজ রঙ, গালেব ওপর সূর্যমুখী ফুল আঁকা, আর হাতের সাথে জোড়া রয়েছে বিরাট পালকের ডানা।

দশ জনের বেশী ট্যুরিস্ট জমা হলেই কমিউনিটি সেন্টারে এই নাচ দেখাবার ব্যবস্থা হয় জন্য টিকিট কিনতে হয়, অবশ্য আমার জন্য ফুল কনসেশন। ট্যুরিস্ট, মানে যেসব আমেরিকান বা বিদেশীরা এই শেরকীদের দেখতে আসে তারা সবাই আগের থেকে জায়গা রিজার্ভ করে রেখেছিল। সবাই যে যার জায়গা মতো বসলো।

নাচের আগে সবাই যে যার নিজের সাজ পরে দর্শকদের সামনে ঘুরে ফিরে তাদের পোষাক দেখ্‌তে লাগলো— তারপরই হঠাৎ শুরু হ'ল ঢোলের সাথে তাদের নাচ।

রেড ইণ্ডিয়ানদের নাচ মানে সবটাই স্পিরিচুয়াল ড্যান্স বা আধ্যাত্মিক নৃত্য। নাচ এদের সমাজ ও সংস্কৃতির একটা অন্যতম প্রধান বিষয়। এদের মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য ঈগল-নাচ, সাপ-নাচ, আগুন, বাতাস ও ভূতের নাচ। এছাড়াও অন্যান্য দেবদেবীর নাচ আছে। টুটেম্‌-নৃত্যও বেশ জমকালো ও দেখবার মতো। বাইরে থেকে এদের এই নাচ অনেকটা বাংলাদেশের দুর্গাপূজো বা কালীপূজোর সময় ধুনচী-নাচের মতো, কিন্তু আসল খেলা কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা। শেরকী বা যে কোনো রেড ইণ্ডিয়ানদের নাচ হৃদয়ঙ্গম করতে হলে তাদের সমাজ ও সংস্কার সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন। একটা নাচের এক-একরকম ব্যাখ্যা। যদিও সব নাচই আমার চোখে একই ধরনের, অবশ্য আমার কাছে এদের নাচ এই প্রথম নয়, এর আগে ওয়াশিংটনে রেড ইণ্ডিয়ানদের মেলায় তাদের মন মাতানো ও রঙিন নাচ দেখেছি।

এদের অধিকাংশ নাচই রূপকথা বা গল্পের থেকে উৎপত্তি— তার কয়েকটা নমুনা দেওয়া যাক।

আগুন-নৃত্য: দু-চারজন লোক একসঙ্গে আগুন নিয়ে খেলা করে; আগুনের ওপর দিয়ে লাফানোটাই এই নাচের বৈশিষ্ট্য। এই নাচের উৎপত্তি আগুনের গল্প থেকে।

এই গল্পটা কবে কে কোথায় প্রথম বলেছিল কেউ জানে না, তবে আমেরিকার প্রায় সব জাতের রেড ইণ্ডিয়ানরাই এ গল্প জানে অবশ্য গল্পের চেহারার উনিশ-বিশ তো হবেই। এবার আসা যাক্ আসল গল্পে।

সে অনেক অনেকদিন আগের কথা— তখন শেরকীরা ছিল ধার্মিক ও শক্তিশালী। স্বয়ং ভগবান তাদের কথা শুনতেন। লোকেরা বৃষ্টি চাইলে বৃষ্টি হতো, ফসল চাইলে জমি ভরে উঠতো ফসলে, মানে— না চাইতেই জল। নতুন ফসলের সময় এরা সবাই জড়ো হয় বারোয়ারী মাঠে, সেখানে শুরু হয় নতুন ফসলের নাচ। সেই সময় একমাত্র বারোয়ারী মাঠেই আগুন জ্বলতো। আজকালকার মতো বাড়ীতে বাড়ীতে উনোন জ্বালানো সেই সময় চলতো না। ভগবানের নির্দেশ— একমাত্র বারোয়ারী মাঠেই আগুন জ্বলবে। আর কারও বাড়ীতে আগুন জ্বললে ভগবানের অভিশাপে সে বাড়ী পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে। কাজেই কার সাধ্য যে, ভগবানের বিরুদ্ধে যায়!

প্রত্যেক বছর আগুনের চারপাশে ঘুরে ফিরে তাদের নাচ চলতো। এ নাচে একমাত্র পুরুষেরাই অংশ গ্রহণ করতো। মেয়েরা অন্যান্য গৃহকাজে ব্যস্ত থাকতো। এই নাচের জন্য একজন দলনেতার প্রয়োজন আর প্রত্যেক বছরই নতুন দলনেতা বাছাই করার হত।

সে বছর হঠাৎ দলনেতার ভাঁটা পড়লো। দলনেতা একমাত্র সেই হবে যার পোষাক ও মাথার চূড়ার ডিজাইন হবে একেবারে পাক্কা। দলনেতা হবার জন্য অনেকেই এগিয়ে এলো বটে কিন্তু কেউই সফল হতে পারলো না— কারণ তাদের চূড়ার ডিজাইন একদম নতুন ধরণের নয়। গ্রামের মধ্যে একজন লোকের নাম ছিল খরগোশ, সে যেমন ছিল চালাক তেমনি চটপটে। সে ঘরের মধ্যে বসে বসে ভাবতে লাগলো— তাইতো, তাহলে কি এ বছরের আগুন নাচটা বন্ধ থাকবে? নতুন ধরণের চূড়া না হলে দলনেতা ঠিক করা হবে না, আর দলনেতা না হলে নাচও হবে না। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ খরগোশের মাথায় এক বুদ্ধি এল, ব্যস— যেমন ভাবা তেমনি কাজ। খরগোশ সোজা বনের মধ্যে ঢুকে গেলো, তারপর একটা নির্দিষ্ট গাছের গুঁড়ির কাছে এসে থামলো— ওপর দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে সে বললো, হে ঠাকুর, তুমি আমাকে দলনেতা করে দাও। এই বলে সে গাছের গুঁড়ির সাথে নিজের মাথাটা ঘসতে লাগলো— মাথা ঘসতে ঘসতে ছাল-চামড়া উঠে যাবার যোগাড়, কিন্তু তবু তার থামার নাম নেই। ওপর থেকে ভগবান দেখলেন— নিরুপায়,

তিনি যদি একটা ব্যবস্থা না করেন তাহলে বেচারী মারা পড়বে— আর সে মারা গেলে গ্রাম শুদ্ধ সবাই ভগবানকে দোষী সাব্যস্ত করবে। কাজেই ভগবানকে একটা ব্যবস্থা করতেই হল। দেখতে দেখতে খরগোশের মাথায় চুলগুলো খাড়া হয়ে মাথার ওপর দাঁড়িয়ে পড়ল। আশ্চর্য বটে। মাথার চুলগুলোকে এমনভাবে দাঁড়াতে দেখে গ্রামশুদ্ধ সবাইতো অবাক। বারোয়ারী মাঠে আগুনের চারপাশে যারা দলনেতার জন্য অপেক্ষা করছিল তারা সবাই খরগোশকে জড়িয়ে ধবলো— সত্যি অদ্ভুত মাথার চূড়া বটে। সম্পূর্ণ নতুন! আহা মরি! দলনেতার অভাবে যে নাচ বন্ধ হবার জোগাড়, খরগোশকে পেয়ে তা আবাব শুরু হল।

সে সময় খরগোশ কেন কেউই মাথার চুল কাটতো না, কাজেই ছেলেমেয়ে সকলের চুলই পিঠ ছড়িয়ে পড়তো। খরগোশেরও তাই— এখন সেই চুলগুলো মাথার ওপর খাড়া হয়ে পড়ায় সত্যি অদ্ভুত ধরণের চূড়াব সৃষ্টি হয়েছে। খরগোশতো আনন্দে আত্মহারা! আগুনের চারপাশে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে শুয়ে বসে তাব নাচ চলতে লাগলো। একসময় নাচতে নাচতে মাথাটা যেই আগুনের সামনে এনেছে— ব্যস্ আর যায় কোথায়— সঙ্গে সঙ্গে তার মাথার চুলে ধরে গেল আগুন। খরগোশ এর জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না কিন্তু। তাই মাগো বাবাগো চীৎকাব করতে করতে সেখান থেকে দিল ছুট। সবাইতো ভ্যাবাচ্যাকা খেযে গেল— ব্যাপারটা কি হল। সবাই-ই সাক্ষী খরগোশ আসলে মাথায় আগুন নিয়ে পালালো। মাথায় আগুন লেগে খরগোশেব যে জীবন যাবার যোগাড় সে কথা কেউই ভাবলে না, সবাই এক বাক্যে বলে উঠলো— খরগোশ আগুন চুরি করে পালালো! তাইতো— আগুন চুরি, সর্বনাশ কাণ্ড— কেউ কোনোদিন যা ভাবতে পাবেনি। সবাই শুরু করলো বৃষ্টির আরাধনা— সেটাই একমাত্র উপায়। বৃষ্টিই একমাত্র আগুন ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারে...কাজেই শুরু হ'ল বৃষ্টি...পনেরো দিন পনেবো রাত্রি ধরে চললো সেই বৃষ্টি। খরগোশকে কিন্তু তারপর আর কেউ দেখেনি...

এই হ'ল আগুন-নৃত্যের গল্প।

কমিউনিটি হলে সেদিন রাত বারোটা পর্যন্ত নাচ দেখে তাবপর যো-এর সাথে ফিরলাম। ঠিক হল, যে কদিন ওখানে কাটাবো যো-এর বাড়ীতেই থাকা যাবে। ওরা গরীব বটে কিন্তু ওদের মনটা অতি চমৎকার।

এই শেরকীদের সঙ্গে যত মিশছি ততই জানতে পারছি এদের আভ্যন্তরীণ তথ্য। যদিও এদের এখন দুর্দশা কিন্তু এরকমটা আগে ছিল না। কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের আগে এটা ছিল এদেরই দেশ। উত্তরে আলাস্কা ও গ্রীনল্যাণ্ড থেকে শুরু করে দক্ষিণে বলিভিয়া পর্যন্ত ছিল এদের রাজত্ব। অর্থাৎ রেড ইণ্ডিয়ানদের রাজত্ব। তাদের মধ্যে ছিল ছোট বড় বিভিন্ন উপজাতি, যদিও অধিকাংশই ছিল যাযাবর টাইপের, কিন্তু মাঝে মাঝে বিভিন্ন জায়গায় স্থায়ী জাতিও ছিল প্রচুর। সেখানে ছিল উন্নত ধরণের সমাজ ও শাসন ব্যবস্থা। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—

সাদা পাহাড়ের— (বর্তমান আরিজোনা) আপাষ উপজাতি (Apache Tribe), ওরাইরির— হোপী— ভাষা আজটেকান্। কালাপাহাড়ের— সিউক্স্— ভাষা টেটন্। ঘন জংগলের— ওগ্লালা— ভাষা টেটন্। চেহান্ নদীর তীরবর্তী— চীপেওয়া উপজাতি— ভাষা লাকোটা। গরম ঝরনার— ওয়াস্কো উপজাতি— এদের ভাষাও লাকোটা— এই ধরনের আরও অনেক।

আমি যাদের সাথে আছি তারা হচ্ছে, শক্তিশালী ইরোকুইয়ান্দেরই (Iroquoian) বংশধর। আর এদের ভাষাটাও বেশ শ্রুতিমধুর। অবশ্য প্রাচীনকালে ইরোকুইয়ান্দের ভাষা ছিল বটে, কিন্তু লেখার জন্য তখনও অক্ষর আবিষ্কার হয়নি। বিভিন্ন উপজাতিদের মধ্যে বিভিন্ন ধরণেব ভাষার প্রচলন থাকায় তাদের মধ্যে প্রায়ই ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতো। তাছাড়াও বিভিন্ন কারণে-অকারণে তাদের মধ্যে ঝগডা-বিবাদতো লেগেই ছিল।

কলম্বাস যখন আমেবিকায় প্রথম পদার্পণ করেন সেই সময় তিনি তাদের শৌর্য বীর্য ও সহজ সুন্দর ব্যবহাবের ভূয়সী প্রশংসা কবেছিলেন। তিনি তদানীন্তন স্পেনের রাজাকে বলেছিলেন যে, এদেব সততা ও সবলতাব তুলনা নেই। বাজা হেসে জবাব দিয়েছিলেন— ঠিক এই রকমটাই আমাদেব প্রয়োজন, ওদেব পদানত করতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না, কি বলহে?

মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা পরবর্তীকালে স্পেনেবই অধীনতা স্বীকাব করতে বাধ্য হয়, কিন্তু উত্তব আমেরিকায় স্প্যানিসদের আসতে আবও বেশী সময় লেগেছে। তারা যখন বর্তমান আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বন্দরে জাহাজ ভেড়ালে। তখন তাদের মুখোমুখী ইংরেজদেব সাথে বাধলো সংগ্রাম, অর্থাৎ ইংরেজবা ইতিমধ্যেই সেখানে ব্যবসার ফাঁদ পেতে বসেছে। স্পানিশদের সাথে ইংরেজদের তফাৎ হচ্ছে এই, যে স্প্যানিসরা জোব করে রাজ্য দখল করে আর ইংবেজরা ছলে, বলে ও কৌশলে।

এই শেরকীদের কথাতেই আসা যাক না কেন। শেরকীদের তখন সুবর্ণযুগ। ফ্লোরিডা ও কারোলিনার বিভিন্ন জায়গায় এবং আট্লান্টিকেব তীরবর্তী অনেক জায়গাতেই তখন শেরকীদের বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল। এদের পোষাকের জাঁকজমক ও আদর্শ সমাজব্যবস্থা দেখে ইউরোপীয়ানরা ভেবেছিল যে এরা সত্যি সোনার তৈরী। এদের ভাণ্ডারে নিশ্চয়ই মুঠো মুঠো সোনা ভর্তি। কাজেই চালাও আক্রমণ। স্প্যানিস্দের রণতরী এগিয়ে এল আমেরিকার বন্দরে— তারপর শুরু হ'ল নিরীহ সরল গ্রামবাসীদের ওপর বর্বরদের অত্যাচার। শান্তিপ্রিয় গ্রামবাসীরা সে আক্রমণে যদিও হিমসিম খেতে লাগলো কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের বিষমাখানো তীর ও বর্শার সামনে প্রথম স্প্যানিসদের জান গেল। কিন্তু স্প্যানিসরা ছাড়বার পাত্র নয়, রাজ্য ও সোনার লোভে তখন তারা পাগল; কাজেই আবার শুরু হ'ল দ্বিতীয় দফায় নতুন দলের প্রস্তুতি। ইতিমধ্যে শেরকীরা বুঝে গেছে এই পরপারের লোকগুলোর চরিত্র। কাজেই বর্শা তীর ধনুক সব তৈরী হতে লাগলো। দ্বিতীয় দফায় স্প্যানিসরা আক্রমণ করল, এদিকে এরা

সম্পূর্ণভাবে ছিল প্রস্তুত। বেচারা স্প্যানিসদের সেদিন ভাগ্যটা ছিল নেহাতই খারাপ— তাদের যে শুধু নাজেহাল হতে হ'ল তাইই নয়, তাদের মাথাগুলোকে বিসর্জন দিতে হ'ল, সোনার পরিবর্তে সর্বনাশ। অবশ্য সেদিনের স্প্যানিসরা যত বলবানই হোক না কেন তারা সংখ্যায় ছিল অল্প।

এই ঘটনার কয়েকমাস পরের কথা বলছি অর্থাৎ ১৬০৭ সালের কথা। ইংরেজরা এই ঘটনা বেশ ভালোভাবেই জানে অথচ এই সোনার গ্রামে তাদের আসা চাই-ই— বলা যায় না হয়তো বিরাট এক গুপ্তধন সেখানে লুকিয়ে আছে। জাহাজ থেকেই তারা ভগবান যীশুর নাম নিতে নিতে নামলো। সবাই ভাবলো— সত্যি সত্যি ধার্মিক ও প্রেমিক বটে। স্প্যানিয়ার্ড-এর থেকে এরা নিশ্চয়ই অনেক অনেক ভালো— একেবারে নিরস্ত্র ভালোমানুষের দল। নিরীহ শেরকীর দল এই ভালোমানুষদের তখনও চিনতে পারেনি। কূটনৈতিক ইংরেজরা সরাসরি গ্রামের মাতব্বরের সাথে দেখা করাবার অনুমতি পেয়ে গেল। গ্রামে ঢুকেই সেখানকার সর্দার ওয়াহুন্‌সোনাকুকের মাথায় পরিয়ে দিল এক রাজমুকুট। আর তার সাথে সাথে তাকে এক নতুন নামও দেওয়া হ'ল কিং পহাটন্‌। সাদা মানুষগুলোর কাছ থেকে মুকুট, নাম ও খেতাব পেয়ে সর্দার ওয়াহুন্‌সোনাকুক আনন্দে লাফিয়ে উঠল, তাদের আপনজন ভেবে ভাই ভাই করে বুকে জড়িয়ে ধরলো।

ইংরেজরা ঠিক এই রকমটাই আশা করেছিল— বিনা রক্তপাতে কাজ হাসিল। তারপর ইংরেজদের যা স্বভাব। প্রথমে কোন রকমে দাঁড়াবার জন্য একটু জায়গা চাওয়া হ'ল। রাজা খুশী হয়ে বললেন— তথাস্তু। তারপর একটু বসবার জায়গা...একটু শোবার জায়গা...একটু খেলবার জায়গা...সামান্য একটু চাষবাস করার জন্য জমি। ...তারপর একদিক উল্টে রাজাকে বললে— এতটাই যখন দিলে তখন আর রাজসিংহাসনটা বাকি থাকে কেন— পরিশেষে রাজা হ'ল রিফিউজি।

ইউরোপীয়ানদের আমেরিকার মাটিতে পদার্পণকে— সেখানকার আদিবাসীরা প্রথমের দিকে আক্রমণ বলে মনে করেনি। তাদের সাথে ভাব জমিয়ে, উপরন্তু নতুন এক দেশের বন্ধুত্ব কামনাই ছিল তাদের মূল উদ্দেশ্য। কাজেই কলম্বাসের আমলে আদান-প্রদান ও বন্ধুত্ব বিনিময়টাই ছিল প্রধান। অবশ্য বলাই বাহুল্য যে ইউরোপীয়ানদের সব সময়ই নজর ছিল অনুসন্ধিৎসা। ইন্দোসরা (কলম্বাসের ভাষায়) দিত পশমের তৈরী পোষাক আর তার বদলে পেতো কাঁচ— পুঁথি— লোহার সরঞ্জাম।

তারপর প্রায় দু'শ বছর পার হয়ে গেছে। উত্তরের আদিবাসীরা তখনও বুঝতে পারেনি যে, এই ইউরোপীয়ানরা একদিন তাদের ঘরছাড়া করবে। তার যখন বুঝতে পারলো তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। ইংরেজরা তখন বেশ আঁট করে বাসা বেঁধেছে। আধুনিক গোলাবারুদ ও অস্ত্রশস্ত্রে প্রস্তুত। পুরোনো আমলের সেই তীর ধনুক নিয়ে তাদের সামনে এগোনো ছেলেখেলা মাত্র।

আটলান্টিকের তীরবর্তী প্রায় সবটাই ইংরেজদের দখলে, আদিবাসীরা পিছু হঠতে বাধ্য হয়েছে, কিন্তু আর নয়— অনেক হয়েছে— দিকে দিকে জ্বলে উঠলো বিদ্রোহের আগুন, ইউরোপীয়ানদের সাথে আদিবাসীদের সংঘাত শুরু হ'ল। দক্ষিণে মিসিসিপির বিভিন্ন অঞ্চলে আর উত্তরে গ্রেট্ লেকের ধারের আদিবাসীরা প্রচণ্ড শক্তিশালী। সে সময় বিভিন্ন এলাকার আদিবাসীদের সংখ্যা ছিল প্রচুর কিন্তু তাদের মধ্যে একতার একান্তই অভাব ছিল, কাজেই ইউরোপীয়ানদের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম ঠিক জোরালো কোনদিনই ছিল না— সে আক্রমণ অনেকটা গরিলাযুদ্ধের মতো। অনেক ক্ষেত্রে তারা সত্যিকারের পৌরুষের পরিচয় দিয়েছে বটে, কিন্তু তাতে তাদের মাতৃভূমির এক খণ্ডও উদ্ধার হয়নি।

তবে হ্যাঁ, এই যুদ্ধের ফলে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকমের সন্ধি করতে উভয়পক্ষই বাধ্য হয়েছে। আর তারই ফলে আজকের এই রিজার্ভেশন। সন্ধির সর্তানুযায়ী রিজার্ভেশনের ইণ্ডিয়ানরা তাদের এই এলাকার মধ্যে স্বাধীন। ইংরেজদের সাথে তাদের এই যুদ্ধ আজ রূপকথার মতো তাদের মধ্যে স্থান পেয়েছে। এই যুদ্ধে যেসব রেড ইণ্ডিয়ান নায়ক বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য, তাদের বিষয় একটু বলা যাক—

লিডারদের সম্পর্কে কিছু বলার আগে তাদেব গুণাবলীর কিছু পরিচয় দেওয়া যাক্— ইচ্ছে করলেই কিন্তু এই ইণ্ডিয়ানদের সর্দার হওয়া যায় না, তাদের সর্দার বা নেতা হতে গেলে অনেক গুণের দরকার।

প্রথমতঃ— তাদের শক্তিশালী ও সাহসী হতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ— জ্ঞানী, বিশ্বাসী ও দয়ালু।

তৃতীয়তঃ— অস্ত্রবিদ্যায় দক্ষতা ও বক্তৃতা দেওয়ার ক্ষমতা।

এইগুলো হচ্ছে একজন সর্দারের একান্ত আবশ্যাক গুণ। এইসব গুণ থাকলে একজনকে প্রথমতঃ গ্রামের ডাক্তার হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তারপর বিভিন্ন কাজ-কর্মের মধ্য দিয়ে ডাক্তারকে তার কর্মপটুতার পরিচয় দিতে হবে। তারমানে একজন ডাক্তারই হচ্ছে ভবিষ্যতের সর্দার। গ্রামের বা দলের নানা রকম চিকিৎসা করা থেকে আরম্ভ করে শাসন ও রক্ষণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব সেই সর্দারকে বহন করতে হয়। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, একজন সর্দারকে রুগীর সেবা, লড়াই করা থেকে শুরু করে ঠাকুরের পূজা পর্যন্ত সব কিছুই করতে হয়। অবশ্য সব আদিবাসীদের মধ্যে এ নিয়ম নেই একমাত্র যারা প্রতিষ্ঠিত ও ঐতিহ্যমণ্ডিত তাদের বেলায় এই নিয়ম।

ছোট-খাটো ট্রাইবদের মধ্যে আবার এই নিয়মের ব্যতিক্রম। তাদের বিভিন্ন বিষয়ের জন্য বিভিন্ন নেতা নিয়োগ করা হয়। তবে বড় বড় যুদ্ধের সময় একজন শক্তিশালী নেতার অধীনেই এরা যুদ্ধ করে।

পাগলা ঘোড়া বা Crazy Horse

ঠিক্ যে সময় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে পূর্ব থেকে পশ্চিমে রেল লাইনের জন্য পরিকল্পনা শুরু হয়, সে সময় এই পাগ্‌লা ঘোড়াব জন্ম। ঘোড়ার যাদুকর এই লোকটা— যত বড় ও তেজস্বী ঘোড়াই হোক না কেন এর কাছে সব ঘোড়াই জব্দ। ঘোড়ায় চড়ে এ ছোট-খাটো খাল বিল এমন কি আগুন পর্যন্ত মুহূর্তের মধ্যে পার হয়ে যেতো। কাজেই সবাই একে ডাকতো পাগ্‌লা ঘোড়া বলে।

ছোটবেলা থেকেই বারবার এক কথাই সে ভেবেছে— কেন এই সাদা লোকগুলো তাদের দেশে এসে ভীড় করেছে। দেখতে দেখতে পাগ্‌লা ঘোড়া বড় হয়ে উঠলো।

এমন সময় একদিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার এই সিউক্স (জাতি)দের জমিটা চেয়ে বসলো। কারণ এখানে বসবে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের মিলিটারী ঘাঁটি ও রেললাইন, তাছাড়াও মনে হচ্ছে এই অঞ্চলের মাটীতে বয়েছে সোনা। কাজেই খনির কাজও শুরু হবে। যুক্তরাষ্ট্র সবকার অল্পদামে সেই বিরাট জমিটা কিনে নেবার একটা প্রস্তাব পেশ করলো। কিন্তু সম্ভব নয়— ক্রেজী হর্স তখন সর্দার। সে বেঁকে বসল, এ তাদের মাতৃভূমি, এ জমি তাদের। কাজেই কোনোমতেই একে বিক্রি করা হবে না। সুতরাং শুরু হ'ল যুদ্ধ। পাগ্‌লা ঘোড়া আশে পাশের ছোট খাটো উপজাতিদের নিয়ে গড়ে তুল্‌লো এক গরিলা বাহিনী। ওদিকে যুক্তরাষ্ট্র সরকার (সে সময় আমেরিকা আব ইংবেজ কলোনী নয়, ইউরোপীয়ানরা মিলে গঠন করেছে স্বাধীন সার্মভৌম রাষ্ট্র) লেঃ কঃ জর্জ নামক একজন জাঁদরেল মিলিটারী অফিসারের অধীনে সেভেন্থ ক্যাভালরী (7th Cavalry) নামক বিবাট মিলিটাবী বাহিনী প্রেরণ করলেন। কিন্তু পাগ্‌লা ঘোড়া তখন দুর্দান্ত। বিষ মাখানো তীব ও বর্শার সামনে সেভেন্থ্ ক্যাভালরী দাঁড়াতে পাবলো না। পাগ্‌লা ঘোড়ার অধীনে বেড ইণ্ডিয়ানরা তখন দুর্ধর্ষ জংলী। লেঃ কঃ জর্জ-এর প্রত্যেকটি লোককেই কচুকাটা করা হ'ল। জয়ের আনন্দে পাগ্‌লা ঘোড়ার দল তখন পাগল।

ফিলাডেল্‌ফিয়ায এই সংবাদ যখন পৌঁছলো তখন লজ্জায় ও আক্রোশে সাদা লোকগুলোর মুখ লাল হয়ে গেল।

সত্যি, লজ্জা ছাড়া আর কি? একটা সুসজ্জিত আধুনিক অস্ত্রে পুরো ক্যাভাল্‌রীকে কিনা ওই নেংটা জংলীগুলোর হাতে প্রাণ দিতে হ'ল! ছি ছি ছি— এর চেয়ে লজ্জার আর কি হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র সরকার আক্রোশ ও জিঘাংসায় রুখে দাঁড়ালো। আবার পাঠানো হল সৈন্য, এক ক্যাভাল্‌রী নয়, সম্পূর্ণ একটা ডিভিশন আর সঙ্গে উপযুক্ত অস্ত্র। সেই আধুনিক অস্ত্রের সামনে পাগ্‌লা ঘোড়াকে হার মানতেই হ'ল। সেই যুদ্ধে পাগ্‌লা ঘোড়া যুক্তরাষ্ট্রের হাতে ধরা পড়ে বন্দী হল। তার পরের ইতিহাস অতি সংক্ষেপ। পাগ্‌লা ঘোড়া একদিন জেল থেকে পালাতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। একটা দুর্ধর্ষ জীবনের সমাপ্তি।

জোসেফ সর্দার বা Chief Joseph

জোসেফ সর্দার চিরকাল ইংরেজদের ভক্ত। তিনি ক্রিস্টান ধর্ম নিয়ে অরিগণের আদিবাসীদের ভগবান যীশুর বাণী শোনাতেন। সেই সময় তাঁর জ্ঞাতিভাইরা আমেরিকার সমৃদ্ধ এলাকায় বাস করতো, মানে সেই জমি যেমনি ছিল উর্বর ঠিক তেমনি মাটীর নীচে ছিল সোনার খনি। কাজেই সাহেবদের হুকুম এল তেরোশো মাইল জায়গা ছেড়ে দিতে হবে। জোসেফের অনেক অনুনয়-বিনয়েও তাদের মন গল্‌লো না। সাহেবরা ভেবেছিল যে যীশুভক্ত ও সাহেব-দরদী জোসেফ অনায়াসেই রাজি হয়ে তার লোকজনদের নিয়ে সরে পড়বে। কিন্তু বাস্তবে হয়ে উঠলো উল্টো। "আমাদেব সোনার মাটী কিছুতেই ছাড়বো না, তার জন্য যদি মরতে হয় সেও ভালো।" সবাই একবাক্যে গর্জে উঠলো। শুরু হ'ল যুদ্ধ, মাত্র ৬৫০ জন লোক। তাদের প্রধান সম্বল ঘোড়া, তীর, ধনুক, আর বল্লম— তাই দিয়েই তার লড়াই করে চলল। সে লড়াই চললো চাবমাস যাবৎ কিন্তু তাদের শেষ পর্যন্ত গোলা-বারুদের সামনে হার মানতেই হ'ল। বোঁচা নাকের দল (ফরাসী ভাষায় তাদের নেঁ পারসেঁ বলা হ'ত) শেষে পালিয়ে গেল কানাডায়। এখানেই শেষ নয়, পবে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। মাতৃভূমির জন্য এই লড়াইএ আজও জোসেফ সর্দারব সুনাম সবাব মুখে মুখে।

টেকুম্‌শে (Tecumseh)

আমেরিকান আদিবাসীদের মধ্যে সর্দার ও প্রধান প্রচুর ছিল। কিন্তু তাদেব মধ্যে বক্তা বা বাগ্মীর ছিল একান্তই অভাব। আব ঠিক এই কারণেই ইউরোপীয়ানদের বিরুদ্ধে নানা সম্প্রদায়ের রেড ইণ্ডিয়ানদেব সমবেত করা সম্ভব হয়নি। নিজেদের মধ্যেই তারা ঝগড়া-বিবাদ ও মারামারিতে ব্যস্ত ছিল। ইউরোপীয়ানদের প্রথম আমেবিকা পদার্পণ কবার সময় যদি সব আদিবাসীরা একজোট হয়ে তাদের রুখে দাঁড়াতো তাহলে নিশ্চয়ই আমেরিকার ইতিহাস ভিন্ন রকমেব হ'ত।

টেকুম্‌শে (বা অনেকে বলে টাকুম্‌শা) ছোটবেলা থেকে দেখে আসছে যে তাদের দেশ আস্তে আস্তে বিদেশীদের হাতে গিয়ে পড়ছে। চারদিকে তখন বিদেশীদের উপনিবেশ। আমেবিকাস্থ ইউরোপবাসীরা সবেমাত্র বৃটিশ কলোনী থেকে মুক্তি পেয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। এ সব দেখেশুনে সে আর স্থির থাকতে পারলো না। উঠে-পড়ে লেগে গেল কাজে। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমের যতগুলো শক্তিশালী আদিবাসী দল আছে তাদের বোঝাতে লাগলো— চেয়ে দেখ ভাই সব, আমাদের দেশ আজ বিদেশীর হাতে, আমরা এখন উদ্বাস্ত হতে চলেছি, এখনও সময় আছে— ওঠো জাগো, প্রতিজ্ঞ কর আমাদের দেশকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে বাঁচাতেই হবে। তার ডাকে আস্তে আস্তে সবাই এসে যোগ দিতে লাগলো— চোক্‌টান, চোক্‌টোস্‌, শেরকী, কিরিক্‌, সিপেবাস, সানী, ওসাজ্‌, ভেলারার্চ এবং আরও বিভিন্ন উপজাতি

তার সাথে হাত মিলিয়ে বলে উঠলো— আমাদের মাটি, আমাদের জল ও জঙ্গলকে পরের হাতে কিছুতেই তুলে দেবো না।

ইংরেজদের বিরুদ্ধে এই প্রথম আদিবাসীদের একত্র সমাবেশ। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের কথা। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাদের পরিকল্পনা মতো কাজ এগোবার আগেই টাকুম্‌শার পরলোক প্রাপ্তি হয়। এই ইতিহাসের এখানেই সমাপ্তি। ইউরোপীয়ান্‌দের বিরুদ্ধে আদিবাসীদের মিলিত আক্রমণ হয়নি বটে কিন্তু তাই বলে মনে করবেন না যে, আদিবাসীরা সব সময়ই বিনা প্রতিবাদে পিছু হটেছে। কোন কোন জায়গায় তাদের দারুণভাবে হিমসিম খেতে হয়েছে। বসা ষাড় বা সিটিং বুলের কথাতেই তাহলে আসা যাক্।

বসা ষাঁড় বা Sitting Bull

যদিও তার নাম সিটিং বুল কিন্তু আসলে সে বসে থাকার পাত্রই নয়। আদিবাসীদেব নামগুলোই ওরকম। জন্তু-জানোয়ার অথবা প্রকৃতিকে ঘিরে যেমন লালমেঘ, লাফানো ঘোড়া, পাগ্‌লা নদী, বড় শিং, বাঁকা শিং, ঝোলানো বাবা এই ধরনের আরও অনেক নাম। ১৮৩০ সালে দক্ষিণ ডাকোটায় বসা ষাঁড়ের জন্ম। সম্প্রদায়ের নাম টেটন সিঅক্‌স্ অথবা সিউক্‌স্। বসা ষাঁড়ের বাবার নাম ছিল লাফানো ষাঁড়। তাদের দলের প্রধান কাজ ছিল ঘোড়ায় চড়ে মোষ চরানো। মোষের দুধ মাংস জোগাতো খাদ্য আর চামড়ার থেকে রসদ। তাই এই সিউক্‌স্ সম্প্রদায়ের হাতে ছিল লক্ষ লক্ষ মোষ। তাছাড়াও ছিল গরু, ঘোড়া ও ভেড়া। ঘোড়ায় চড়ে শিকার করা হতো আর যাতায়াতেরও প্রধান বাহক ছিল এই ঘোড়া। কাজেই ছোটবেলা থেকে যে বসা ষাঁড় ঘোড়া চড়ায় দক্ষ হয়ে উঠবে তাতে আর আশ্চর্য কি? তাকে সবাই ব্যঙ্গ করে বলতো শান্ত ছেলে, শান্তই বটে! সেই সময় সিউক্‌স্ ও কাক্ এই দুই উপজাতিব মধ্যে লড়াই বেঁধেই ছিল। একদল আর এক দলের ওপর একটু সুযোগ পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়তো। তা-ছাড়া গুরু চুরি, ঘোড়া চুরি, তীরের মাথায় মশাল বেঁধে শত্রুপক্ষের ঘরে আগুন লাগানো— এসব তো নৈমিত্তিক ব্যাপার।

বসা ষাঁড় যখন মাত্র চোদ্দ-পনেরো বছরের তখন থেকেই তার প্রতিভার কথা দিক্‌বিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে আশে পাশের উপজাতিরা তখন থেকেই তাকে বাঘের মতো ভয় করতে শুরু করেছে। সবাই এক বাক্যে স্বীকার করেছে যে, ভবিষ্যতে এ সত্যি একজন বড় দরের যোদ্ধা হবে।

ঠিক তাই। তবে ছোট বেলা থেকে যুদ্ধ করতে করতে এতে অরুচি ধরে গেছে। কাজেই ১৮৭৪ সালে কর্নেল জর্জ যখন কালো পাহাড়ে তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে প্রবেশ করলো তখন সবাই বসা ষাঁড়কে মন্ত্রণা দিতে লাগলো— তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে। বসা ষাঁড় তাদের দিকে তাকিয়ে বললো— কি দরকার বাপু,

ওদের আসতে দাও— আমাদের এই কালো পাহাড় বিরাট বড়, এর মধ্যে সকলের স্থান হবে। বসা ষাঁড়ের এটাই হচ্ছে বৈশিষ্ট্য। কোনদিন সে শত্রুকে প্রথম আক্রমণ করেনি, কিন্তু কেউ যদি তাকে আক্রমণ করে তাহলে সে জংলী ষাঁড়।

তারও দু' বছর পর ১৮৭৬ সাল। রোজ-বাড্ নদীর ধারে তখন বসা ষাঁড়ের আড্ডা। তার দলবল নিয়ে সে তখন শিকারে মত্ত। ঠিক এমন সময় একজন এসে খবর দিলে যে জেনারেল ক্রুক তার দলবল নিয়ে কালাপাহাড় আক্রমণ করেছে, কালাপাহাড়ের সিউক্স্‌দের উচ্ছেদ করাই নাকি তার একমাত্র উদ্দেশ্য।

ব্যস— আগুনের ফুলকিতে যেন ঘি পড়লো— কালাপাহাড়ের সর্দার বসা ষাঁড় লাফিয়ে উঠলো— কি এতবড় স্পর্ধা, ব্যাটাদের জব্দ করছি দাঁড়াও— সে হুংকার দিয়ে সবাইকে তৈরী হতে বলল।

বসা ষাঁড় একধারে যেমন দুধর্ষ ও সাহসী অন্যদিকে তেমনি চালাক ও চতুর। পাহাড়ের আড়াল থেকে জংলী ফার গাছের মাথায় উঠে সে দেখে নিল শত্রুপক্ষের সংখ্যা ও তাদের রসদ। তারপর ঢুকে গেলে তার পাতার কুটীরে— শুরু হ'ল যুদ্ধের জল্পনা কল্পনা।

জেনারেল ক্রুক্ জাঁদরেল মিলিটারী অফিসার। যুদ্ধের রীতিনীতি তাঁর একদম মুখস্থ। সেই সময় তাঁর মতো কূট অফিসার খুব কমই ছিল। জেনারেল আস্তে আস্তে অথচ দৃঢ়পদক্ষেপে কালাপাহাড়ের ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হেঁটে চলেছেন। তার মতে ওই জংলী আদিবাসীদের সামনে বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করলেই তারা পালাতে পথ পাবে না। কাজেই তিনি সে রকম বিশেষ প্রিকসান কিছু নিলেন না।

জায়গাটার নাম মন্টনা। এই কালাপাহাড়ের প্রত্যেকটি মাঠ-ঘাট গাছ-গাছড়া সব কিছুই বসা ষাঁড়ের মুখস্থ। বসা ষাঁড় গরিলা যুদ্ধের এক মারাত্মক সর্দার। ঠিক ঝোপ বুঝে কোপ না মারতে পারলে উল্টে কাটারীটাই ভাঙতে পারে। সবদিক ভেবে-চিন্তে সে রওনা দিল। জেনারেল সৈন্যদলের ওপর ঠিক সময় মতো ঝাঁপিয়ে পরাই হচ্ছে গরিলা-যুদ্ধের নীতি।

জেনারেল ক্রুক একটা বড় পাহাড়ের গা বেয়ে একটা নদীর ধার ধরে এগিয়ে চলেছে। পাহাড়টা অনেকটা পাঁচিলের মতো, আর ওদিকে খরস্রোতা নদী। ঠিক এই সময় হৈ হৈ করে মোষ তাড়ানোর পদ্ধতিতে চীৎকার করে ঝাঁপিয়ে পড়লো আদিবাসীর দল। পাঁচিলের মতো পাহাড়ের ওপর থেকে হঠাৎ যেন পাথরের ঝড় বইতে আরম্ভ করেছে। এই অকস্মাৎ আক্রমণে জেনারেল বেচারা সত্যি একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়লেন, তিনি একবার অ্যাটেনসন বা ফায়ার কথাটা পর্যন্ত উচ্চারণের সময় পেলেন না। কালাপাহাড়ের এই শান্ত জংগলটা হঠাৎ যেন ক্ষেপে উঠেছে। এই সময় বসা ষাঁড়ের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ছিল পাগ্‌লা ঘোড়া। জংলী নেংটা আদিবাসীগুলো মুহূর্তের মধ্যে সুসজ্জিত বন্দুকধারীদের প্রায় নির্মূল করে দিয়ে আবার উধাও হয়ে

গেল জংগলে। সেদিন রাতে সিউক্‌দের শিবিরে দেশরক্ষার্থে এক বিরাট উৎসব পালিত হ'ল— বসা ষাঁড়-এর বিজয় উৎসব।

এরপর সিউক্‌সরা কিন্তু বসে থাকেনি— কারণ তারা জানে যে, এ ঘটনার পার নিশ্চয়ই তাদের উচ্ছেদ করার জন্য ওয়াশিংটন থেকে সাঁজোয়াবাহিনী আসবে আর তার সামনে টিঁকে থাকার কোন সামর্থ্যই এদের নেই। অতএব সরে পরাই বাঞ্ছনীয়। তাই বসা ষাঁড় তার সম্পূর্ণ বাহিনী ও তাদের স্ত্রীপুত্র-পরিবার সমেত কানাডায় গিয়ে আশ্রয় নিল।

কিন্তু সেখানে তাদের বেশীদিন মন টিকলো না। চিরকাল যে কালাপাহাড়ের জঙ্গলে মানুষ, তার কি আর অপরের রাজত্ব ভালো লাগে? কাজেই কর্তৃপক্ষের সাথে এক চুক্তি করে তারা আবার ফিবে এল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে। ঠিক হ'ল এবা আব যুদ্ধ করবে না। এই চুক্তির ফলে যুক্তরাষ্ট্র সরকার সিউক্‌স্‌দের বসবাসের জন্য একটা রিজার্ভেশনের বন্দোবস্ত কবলো। এই রিজার্ভেশনের ভেতর তারা স্বাধীন। সেখানে তাদেব ঘোড়ায় চড়া, শিকাব কবা, সব কিছুই বজায় রইল। এখানেই কিন্তু গল্পের শেষ নয়— এর পরেও কিছুটা আছে কিন্তু—

এদিকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের— মধ্যে যেখানে এত আদিবাসী ছিল তাদের মধ্যে বটে গেল যে বসা ষাঁড় তাদের মধ্যে আবাব ফিবে এসেছে। চারদিকে শুরু হয়ে গেল ভূতেব নাচ, আগুনেব নাচ আব তার সাথে সাথে সাজ সাজ রব। তাদের মতে এই বিদেশী ইউরোপীয়ানদের তাড়াবার জন্যই সেই দুর্ধর্ষ বীরের পুনঃআগমন। দেখতে দেখতে কথাটা যুক্তরাষ্ট্রের বাজধানীতে গিয়ে পৌঁছাল। সেনাপতিরা সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চারদিকে আদেশ জারী করলেন। বসা ষাঁড়ের কিন্তু এদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। সে এখন শান্ত ও ক্লান্ত— একটু নির্বিঘ্নে বিশ্রামের জন্যই সে ফিরে এসেছে তার প্রিয়ভূমিতে। কিন্তু কে কার কথা শোনে?

অবশেষে ১৮৯০ সালের ১২ই ডিসেম্বর। লেফ্‌টেনন্ট বুলহেড্‌ (আসলে তিনিও একজন আদিবাসী) এগিয়ে এলেন বসা ষাঁড়ের কুটিরের দিকে, হাতে বসা ষাঁড়ের গ্রেপ্তারী পবোয়ানা নিয়ে। তিনি বসা ষাঁড়কে আত্মসমর্পণ করতে তিনদিন সময় দিলেন কিন্তু সে তাতে রাজি হ'ল না। বসা ষাঁড় তাদের বোঝাতে চেষ্টা করলে যে, তার এখন যুদ্ধ করার মোটেই ইচ্ছা নেই; যুক্তরাষ্ট্র সরকার যেন গুজবে কান না দেয়। সে একটু শান্তিতে বাকী জীবনটা কাটাতে চায়।

কিন্তু তার অনুনয়-বিনয়ে সরকারী পরোয়ানায় কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। ২৫ই ডিসেম্বর, সূর্যোদয়ের ঠিক পূর্ব মূহুর্ত। লেফ্‌টানেন্ট বুলহেড্‌ শেষবারের মতো তাকে আত্মসমর্পণ করতে হুকুম দিলেন— ঘরের ভেতর থেকে বসা ষাঁড় এই প্রথম বসে বসে জবাব দিল— আমি এখান থেকে যেতে চাই না। সঙ্গে সঙ্গে লেফ্‌টানেন্টের দল তার ঘরের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়লো— সামনে দাঁড়িয়ে নিরস্ত্র বহুদিনের একচ্ছত্র আদিবাসী সর্দার বসা ষাঁড়, সিটিং বুল।

হঠাৎ পেছন থেকে সর্দার ভালুক-ধরা সরকারী বাহিনীর ওপর গুলি চালাতে লাগলো। বসা ষাঁড়ের সে বহুদিনের সহকর্মী ও বন্ধু, তার সামনে থেকে বসা ষাঁড়কে নিরস্ত্র ধরে নিয়ে যাবে সেটা অসহ্য। লেফ্‌টেন্যান্টের বন্দুকও গর্জে উঠলো—তাদেরই একটা গুলি এসে বিঁধলো বসা ষাঁড়ের বুকে। ব্যস্‌ শেষ! বিরাট একটা সংগ্রামী জীবনের পরিসমাপ্তি। সেদিনকার সেই কিছুক্ষণের গুলি বিনিময়ে ছ'জন অফিসারকেই প্রাণ দিতে হয়েছিল। বসা ষাঁড়ের দেহ রক্তে লুটিয়ে পড়ল— ওদিকে আকাশ ঘোর রক্তবর্ণ করে দিয়ে সূর্যোদয় হ'ল।

আমি ওদের সঙ্গেই আছি— দেখতে দেখতে তিনদিন কেটে গেল। এদের সমাজ, জীবন-যাপন, পোষাক-পরিচ্ছদ, সব কিছুই আমাকে মুগ্ধ করেছে— বিশেষ করে ওদের অন্তর। গ্রীস ছাড়ার পর এই ধরণের মানব-দরদী সমাজ এই প্রথম দেখছি, মনে হচ্ছে আন্তরিকতা— স্নেহ, প্রেম, প্রীতি, গরীবদের ঘরেই যেন তার স্থান।

ইতিমধ্যে গ্রামের মধ্যে প্রায় প্রত্যেকের সাথেই অল্পবিস্তর আলাপ পরিচয় হয়েছে। আমি এখন তাদেরই একজন, খালি পায়ে গেঞ্জি গায়ে আমি এখন এই গ্রামেরই একজন বাসিন্দা। মুকু আমাকে প্রায়ই এদের সম্পর্কে গল্প বলে— অবশ্য সে আগের মতোই আঠার মতো লেগে আছে। আমার সাইকেলটা নিয়ে ও প্রায়ই এদিক-ওদিক যায়। ও যখন আমার সাইকেল চালায় তখন ওর যে কি গর্ব সে লিখে বোঝানো মুশকিল। হ্যাঁ, আমি মুকুর কথা বলছিলাম। ও এই গ্রামের স্কুলের একজন মাস্টার। মুকুকে দেখে ভেবেছিলুম ও এই শিরোকীদেরই একজন, কিন্তু আসলে তা নয়। ও এখানে এই স্কুলে চাকরী নিয়ে এসেছে। ওর বাড়ী আরিজোনায় অর্থাৎ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণে। ওব জাতে হোপী, আদিবাসীদের মধ্যে এক বিশেষ সম্ভ্রান্ত জাত।

মুকুর কাছ থেকে আরিজোনার হোপী রিজার্ভেশন সম্পর্কে জানলাম— বিরাট এলাকা নিয়ে এটা গঠিত। সেখানকার লোকসংখ্যা পাঁচ হাজার আটশ ছিয়াত্তর, আর প্রায় কয়েক লক্ষ একর ঘিরে জমিব সীমা। নিউ মেক্সিকোর নাভাজো রিজার্ভেশন নাকি এর চেয়েও আরও অনেক বড়। সেখানকার লোকসংখ্যা প্রায় এক লক্ষ কুড়ি হাজার। সে যাই হোক, সেদিকে যখন যাবো দেখা যাবে।

গ্রামের মধ্যে সেদিন হৈ-হৈ ব্যাপার। তার মানে পর্বের দিন এসেছে। এরা এখনও পুরোনো পর্ব দিনগুলোর কিছু কিছু উদ্‌যাপন করে। আজকে হচ্ছে টৈটনদেবের পূজা। টৈটন বা চলতি কথায় টোটেম্‌।

টোটেম্‌ আসলে একটা বিরাট কাঠের স্ট্যাচু। বিরাট একটা গাছের গুঁড়ি কেটে তার ওপর খোদাই করা হয়েছে বিভিন্ন জীবজন্তু ও মানুষের মুখ। গ্রামের মাঝখানে সেটাকে গর্ত করে তার ওপর দাঁড় করানো হয়েছে। দূর থেকে দেখে মনে হয়

কাঠের স্ট্যাচু গুলোকে একটার মাথার আর একটাকে বসিয়ে এটাকে দাঁড় করানো হয়েছে। মাটিও ওপর বিভিন্ন রঙ-বেরঙের সঙ্ আঁকা হয়েছে, অনেকটা আল্পনার মতো ; তবে শিল্প হিসাবে মোটেই সূক্ষ্ম নয়, অনেকটা বাচ্ছা ছেলেদের আবোল-তাবোল লেখার মতো। বিভিন্ন বুড়ো-বুড়ী, যুবক-যুবতী ও শিশুরা এতে অংশ গ্রহণ করেছে। রঙিন পিস্‌বোর্ডের একটা ঘোড়ার মডেল ঠিক টোটেম্‌দেবের পাশেই দাঁড় করানো হয়েছে ; এদের জীবনে ঘোড়ার প্রয়োজননীয়তা খুব বেশী। আজকালও এরা ঘোড়ায় চড়ে চাষ-বাস দেখাশুনা এবং গরু ভেড়া চড়ায়।

আজকের এই উৎসবটা যে কিসের ঠিক বুঝতে পারছি না। আগে থাকতে কিছু জানা ছিল না, হঠাৎ আজ সকালেই ঠিক হ'ল। আর সঙ্গে সঙ্গে সবাই টোটেম্ দাঁড় করাতে উঠে পড়ে লেগে গেছে। অবশ্য একই টোটেম্ প্রত্যেক বছর এরা ব্যবহার করে। জো আজকে সকাল থেকেই ব্যস্ত।

মুকুকে একসময় ফাঁকা পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম— ব্যাপারটা কি— হঠাৎ সবাই যেন হুজুগে মেতে উঠেছে। মুকুর কাছ থেকে সবিশেষ খবর পাওয়া গেল, দিনটা আগে থাকতেই ঠিক ছিল, তবে মাত্র পাঁচজন মোড়লই সেই কথা জানতো। প্রত্যেক বছর এই উৎসবটা এই ধরণেরই হয়, অর্থাৎ আগে থাকতে কাউকে কিছু জানানো হয় না, শুধু কমিটি মেম্বাররাই জানে, বাকী সবাই জানতে পারে উৎসবের দিন সকালবেলা।

উৎসবটা আসলে তামাক কাটার পর্ব। শেরকী এবং অন্যান্য আদিবাসীদের মধ্যে তামাকপাতার ব্যবহার অতি প্রাচীন। তামাকপাতা এদের কাছে অতি পবিত্র। এদের যে কোন উৎসবে তাই তামাকের ব্যবহার প্রচুর। সেদিন ছোট বড় সবাই তামাকের ধুমপান অথবা তামাকের শরবৎ খেয়ে নেশায় চূর হয়ে পরে। এদের ভাষায় তামাকপাতাকে তারা-পাতা বলা হয়। এরা বিশ্বাস করে তামাকপাতা ভগবানের নিজের হাতের সৃষ্টি।

অবশ্য তামাকপাতার মুখরোচক একটা গল্প আছে, সেটা বলি— অনেকদিন আগে এক শিকারী যুবক শিকারের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে এসে হাজির হয় এক গ্রামে; সেই গ্রামে ছিল এক সুন্দরী যুবতী। যুবতীকে দেখেই যুবক পড়লো প্রেমে। তারপর যা হয়— প্রেমের পরিণাম হয় পরিণয় অর্থাৎ বিবাহ। মহাসুখে বিভিন্ন দেশ-বিদেশে ও বনজঙ্গলে ঘুরে তারা আবার এসে হাজির হ'ল সেই গ্রামে, যেখানে তাদের প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল। যুবক তাদের সেই পুরোনো ঘরে ঢুকেই আশ্চর্য হয়ে গেল— তারা যেখানে শুয়েছিল ঠিক সেই জায়গায় তারার মতো ফুটে রয়েছে একটা গাছ। সেই গাছের সুন্দর মন-মাতানো গন্ধে যুবক আশ্চর্য হয়ে গেল। গ্রামের সবাইকে ডেকে তার আবিষ্কারের গাছ দেখালো। গ্রামের যারা মাতব্বর তারা অনেক ভেবে চিন্তে এর একটা উপযুক্ত ব্যাখ্যাও বার করে ফেললো। এই তারাগাছটা হচ্ছে ভালবাসা, প্রেম ও ঐক্যের প্রতীক। বীর্যবান শিকারীর সাথে সেই যুবতীর হৃদয় মিলনের এক উজ্জ্বল প্রতীক। গ্রামবাসীরা পাতাটাকে রেখে দিল, তারপর সেটা

শুকিয়ে গেলে তার ধূমপান করে নিজেদের মধ্যে শান্তি ও প্রেমের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলো...। সেই থেকে এ উৎসব আজও চলে আসছে। এদের মধ্যে যখন যুদ্ধ-বিগ্রহ হয় তখন সর্দারেরা এক জয়গায় বসে ধূমপান করতে করতে সন্ধির পরামর্শ করে। আজকালও শেরকীদের মধ্যে তামাক-সেবন, শান্তি, ঐক্য ও বন্ধুত্বের প্রতীক।

উৎসবে সবাই মেতে উঠেছে, দুপুরবেলা আজকে সবাই এগারটার মধ্যেই খাওয়া-দাওয়া সেরে প্রস্তুত হয়ে পড়েছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা নতুন জামা পরেছে, বড়রাও তাদের দামী পোষাক পরেছে। এদের মধ্যে অনেকেরে মাথায় কাউরা টুপি। টোটেম্‌দেবের আশে-পাশে পালকের বিচিত্র পোষাক পরে প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশজন শেরকী ঘোরাফেরা করছে। কারও হাতে বল্লম, কারও হাতে তীর-ধনুক। আস্তে আস্তে সবাই এসে সেখানে জড়ো হতে লাগলো। মাথার ওপব তখন দারুণ রোদ্দুর, আশ-পাশের গাছের নীচে ও ঘরের ছায়ায় মেয়েরা আশ্রয় নিয়েছে; তাদের পরণেও আজ চাক্‌চিক্য, লম্বা বিনুনী দু'পাশে ঝুলে পরেছে, কারও পরণে মোটা জোব্বা অথবা বাড়তি বহরের সায়া, গলায় রং-বেরঙেব পুথির মালা। তাদের হাসি মুখ আব ছোটদের চীৎকার সব কিছু মিলিয়ে সত্যিকারের এক আনন্দমুখর পরিবেশ সৃষ্টি কবেছে।

উৎসব শুরু হ'ল ঘোড়দৌড়েব মাধ্যমে। ঘোড়া এদের জীবনের একটা বিশেষ অঙ্গ। এরা ঘোড়া চড়ায় অতি দক্ষ। প্রথমে, এখানকার প্রধান সর্দার টোটেম্‌দেবের মূর্তির গোড়ায় তার টুপিটা রেখে দিল। টোটেম্‌দেবের কাছ দিয়ে খুব জোরে ঘোড়া চালিয়ে একটা লাঠির সাহায্যে এই টুপীটাকে নিতে হবে, অনেকটা পোলো খেলার ভঙ্গি। প্রথমে লাল ঘোড়ার সওয়ারী এগিয়ে এল, কিন্তু টুপীটা ছোঁয়ার আগেই তার ঘোড়া দ্রুতবেগে বেরিয়ে গেল। দ্বিতীয়জনেরও ঠিক সেই অবস্থা। তৃতীয়জন টোটেমের কাঠের স্ট্যাচুর সাথে ধাক্কা খেয়ে গেল পড়ে।

হঠাৎ সবাই চেঁচিয়ে উঠলো— এবার আসছে খ্যাবা। গত দু'বছরের চ্যাম্পিয়ান খ্যাবাকে দেখতে অনেকটা ক্যাবলা ধবণের, বেঁটে-খাটো মানুষ। সাদা ও ছাই রঙের চুমকী করা একটা ঘোড়া। ঘোড়াটাকে দেখে মনে হয় না সে কৃতকার্য হবে। দেখাই যাক।

সকলের চীৎকার ও উৎসাহধ্বনির মধ্য দিয়ে এগিয়ে এল খ্যাবাব ঘোড়া। খ্যাবা ঘোড়াটার ফুল স্পীর্ড নিয়েই ঘোড়ার ওপর থেকে নামবার ভঙ্গিতে বাঁ পাদানির ওপর সম্পূর্ণ ভর দিয়ে মাটির দিকে ঝুকে পড়লো। আমিতো ভাবলাম নির্ঘাত পড়ে যাবে— টুপিটার সামনে ঘোড়াটা এগিয়ে আসতেই লাঠিব হুক্ দিয়ে টুক করে টুপীটাকে তুলে নিল...চারদিকে সবাই জয়-জয়কার দিয়ে উঠলো— আমিতো অবাক্! সত্যি একেই বলে ঘোড়ার যাদুকর। টুপীটার মধ্যে পিন্ দিয়ে আট্‌কানো ছিল কুড়ি ডলারের একটা নোট— সেই নোটটা আর সর্দারের টুপী এ দুটোই তার পুরস্কার।

দ্বিতীয় খেলাটার নাম আগামাংগা। বিভিন্ন জায়গায় এ খেলাটার বিভিন্ন নাম। টোটেম্‌কে মাঝখানে রেখে চারদিকে দর্শকরা গোল হয়ে ছড়িয়ে পড়ল, তারপর

সর্দারের নির্দেশে আমরা সবাই যে যার জায়গায় বসে পড়লাম, মাঝখানের জায়গাটা ফাঁকা রইল। আমার পাশে মুকু আর সেই প্রথম দিনের দেখা বুড়ো ও তার নাত্নি। এই খেলাটার সম্পর্কে মুকু আমাকে বুঝিয়ে দিতে লাগলো অনেকটা রিলের আকারে। আগামাংগা খেলাটা আসলে অনেক পুরোনো, হাজার হাজার বছর যাবৎ এই খেলাটা ট্রাডিসানের মতো চলে আসছে। ঘোড়ার খেলাটা কিন্তু এসেছে পরবর্তী কালে স্প্যানিয়ার্ডদের থেকে। আমেরিকায় আগে ঘোড়া ছিল না। অর্থাৎ এদেশের আদিবাসীদের যত ঘোড়া সবই এসেছে ইউরোপ থেকে ইউরোপীয়ানদের সাথে।

আগামাংগা খেলাটা বড় অদ্ভুত— এই ধরণের খেলা এর আগে আমি দেখিনি। দু'জন পালোয়ান দর্শকদের সামনে বৃত্তাকার জায়গাটায় এসে দাঁড়ালো— সর্দার তাদের পরিচয় করিয়ে দিলে। আমি তাদের নামগুলো ঠিক্ মনে রাখতে পরালাম না। দু'জন তারপর হামাগুড়ি দিয়ে বসলো, ঠিক নাড়ুগোপালের মতো, খালি গায়ে, প্যান্ট পরণে। তারা দু'জনে এবার মুখোমুখী হ'ল ঠিক ষাঁড়ের লড়াই-এর মতো। এবার সর্দার বড় মালার মতো একটা ফিতে দুজনের গলায় পরিয়ে দিল, ব্যস— শুরু হ'ল টানাটানি। গলার মালা নিয়ে গলায় গলায় টানাটানি। হাত ও হাঁটুর ওপর ভর রেখে ঘাড়ের শক্তিতে লড়াই শুরু হল অনেকটা দড়ি টানাটানির মতো। অনেকক্ষণ ধরে চলল টানাটানি, হঠাৎ এক নম্বরের ঘাড়টা নেমে এল। চারদিকের সবাই চেঁচিয়ে লাফিয়ে উঠলো— ২নং-এর জিৎ। এবার আর একজন এগিয়ে এল। শুরু হ'ল খেলা— ২নং-এর কাছে সেও হেরে গেল। এবার ২নং আমাদের পাশে এসে বসলো বিশ্রামের জন্য, নতুন দু'জন নেমে এল দর্শকের সমানে। সর্দার আগের মতোই তাদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে খেলা শুরু করার ইঙ্গিত দিল, শুরু হ'ল আবার টানাটানি।

এইভাবে প্রায় প্রায় ঘন্টাখানেক করে সে দু'জনকে হারিয়ে ফাইনালে উঠল। এবার দুপক্ষেব লড়াই— সে এক সম্পূর্ণ নতুন পর্ব।

দুদিকে দু'জন পাশাপাশি এসে দাঁড়ালো। বীরত্বে দু'জনেই সমান, সর্দার দু'জনের বাহাদুরীর প্রশংসা করে দর্শকদের উদ্দেশ্যে বললো— আর দশ মিনিটের মধ্যেই স্টার্টিং হবে, আপনারা বাজী ধরতে পারেন।

সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম সবাই যে যার পকেটে হাত দিয়ে পয়সা গুনতে শুরু করেছে। মুকু তার পকেট থেকে পয়সা গুনে পচাত্তর সেন্টস্ বার করলে, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললে— বেট্।

আমি বললাম যে, আমি বাজি ধরার মধ্যে নেই। আমার কথায় মুকু অবাক হয়ে গেল, সেকি! অমন কথা বলতে নেই, এটা আমাদের জাতীয় খেলা, এর সম্মানার্থে তোমাকে বাজি ধরতেই হবে— সে এক ডলার অথবা একশ' ডলার যাই হোক না কেন। দেখছো না এখানে সবাই এখন বাজির নেশায় মত্ত। আমি

চারদিকে তাকিয়ে দেখি সত্যি তাই— সবাই এখন যে যার হিরো পছন্দ করতে ব্যস্ত। শেরিফ, সর্দার, কাউন্সিলার, ব্যবসায়ী থেকে আরম্ভ করে দিন-মজুর ও বেকার পর্যন্ত। মেয়েরা অবশ্য এর মধ্যে নেই আর ছাত্র বা শিশুরাও নয়। ওদের মতে সায় দিতেই হ'ল, পকেট থেকে একটা ডলার বের করে মুকুর সামনে রাখলাম— মুকু অতি প্রশংসায় আমার দিকে চেয়ে বললো— এইতো চাই, এই না হলে মরদ! এই খেলায় সবচেয়ে বড় বাজি ধরলো একজন কাউন্সিলার— চারশো পঁচিশ ডলার।

এবার শুরু হ'ল খেলা। আমি সামনের সারিতে বসে, আমার পেছনের সারি হাঁটু গেড়ে, তার পেছনে সব দাঁড়িয়ে। হৈ হট্টগোল আর সিটি ও চীৎকারের মধ্য দিয়ে খেলা এগিয়ে চলেছে। ভীষণ ব্যাপার— সকলেরই ইন্টারেস্ট, বিশেষ করে বাজির ব্যাপারে। কখনও এক নম্বর টানছে, কখনও দু' নম্বর টানছে। আর যে যার খেলোয়ারকে উৎসাহ দেবার জন্য প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে। আমি আগে ভাবিনি যে, এই খেলাটার এত মাদকতা আছে, কিন্তু এখন দেখছি, এর জনপ্রিয়তা ও অস্থিরতা ফুটবলের চেয়ে অনেক অনেক বেশী। এক কথায় বলতে গেলে রক্ত গরম করা ব্যাপার...। যাইহোক, খেলা এক সময় ঝিমিয়ে এল, দুপক্ষই প্রায় কাহিল হয়ে এল, জনতার উৎসাহ ও চেঁচানিতেও আর এগোনো সম্ভব নয়, দু-নম্বরের ঘাড়টা হঠাৎ নেমে এল— অর্থাৎ পরাজয়। আমি হেরে গেলাম এক ডলার। আমার মতো যারা দু-নম্বরকে সমর্থন করেছিল তাদের অবস্থাও আমারই মতো। মুকুর দিকে নোটটা বাড়িয়ে ধরলাম। মুকু মুচকি হেসে ছোঁ মেরে আমার হাত থেকে সেটা তুলে নিল। মন্দ নয়, মাত্র এক ডলারের ওপর দিয়েই গেছে।

ওদিকে সূর্য প্রায় অস্তগামী, আশ-পাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম এদের এখানে লাইটের কোন ব্যবস্থা নেই। মনে হ'ল এদের উৎসব রাতের আগেই শেষ হবে। হঠাৎ পেছন থেকে কে একজন আমার মাথায় টোকা দিল, ঘাড় ফিরাতেই দেখি জো। জো আজ সত্যি ব্যস্ত, উৎসব ব্যবস্থাপনায় ও একজন অন্যতম প্রধান উপযোগী।

—কেমন লাগছে?

—অদ্ভুত। সত্যি আমি আশাই করতে পারিনি যে, এমন জিনিস দেখা আমার ভাগ্যে ঘটবে— আমি কৃতজ্ঞভাবে তাকে বললাম।

দর্শকরা এবার এলোমেলোভাবে ইতঃস্তত ঘোরাফেরা করতে লাগলো। আমিও এদিক-ওদিক ঘুরতে ঘুরতে একটা চামড়ার তাঁবুর কাছে এসে দাঁড়ালাম। এই ধরণের আরও অনেক তাঁবু এই ঘন্টাখানেকের মধ্যেই উৎসবকে ঘিরে গজিয়ে উঠেছে। কোন কোন তাঁবুতে হাল্কা ধরণের জিনিসপত্র বিক্রি করছে। এক জায়গায় কয়েকটা ইট পেতে একটা চা কফির দোকানও দেখতে পাচ্ছি। আমি যেই তাঁবুটার কাছে এসে থামলাম সেখানে বড় বড় হরফে লেখা— MEDICINE MAN।

তার মানে একটা ডাক্তারখানাও এর মধ্যে উঠে এসেছে! মনে মনে ভাবলাম যে, এটা নিশ্চয়ই কোন ফার্স্ট এইডের পোস্ট হবে। ঠিক আছে, দেখাই যাক ভেতরে ঢুকে। আমি তাঁবুর পর্দা তুলে ভেতরে ঢুকলাম।

তাঁবুর ভেতরে মাটির ওপর দু'জন পাশাপাশি বসে। একজন নবীন আর একজন প্রবীন। নবীনের বয়স মনে হয় কুড়ি-বাইশ বছর হবে আর অপরজন প্রায় ষাটের কাছাকাছি তো বটেই। আমাকে দেখে প্রবীন ভদ্রলোক মুখে আঙ্গুল দিয়ে কোনো কথা না বলতে অনুরোধ করলে। আমিও কোনো কথা না বলে পাশেই বসে পড়লাম। তাঁবুর ঠিক মাঝখানেই একটা কাঠকয়লার মাটির উনুন জ্বলছে আর তারফলে অত্যধিক গরম। আমিও গরমে আস্তে আস্তে সেদ্ধ হতে লাগলাম। ইচ্ছে করলেই কিন্তু বেরিয়ে আসতে পারি। কিন্তু ব্যাপারটা কি দেখবার জন্য বসে রইলাম। মাটির কাছাকাছি একটু জায়গা চাড়া তাঁবুর কোথাও ফাঁক নেই, তারফলেই এই গরম। হঠাৎ প্রবীন বিড়বিড় করে মন্ত্র পাঠের মতো কি যেন বলতে লাগলো আর মাঝে মাজে নবীনের গায়ে হাত বোলাতে লাগলো। এদিকে গরমে ঘামে আমার গেঞ্জি ও প্যান্ট প্রায় ভিজে গেছে। এইভাবে প্রায় আধঘন্টা কাটাবার পর আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম। ওঃ বাঁচা গেল! আমি কিন্তু ওখান থেকে সরলাম না— অপেক্ষা করতে লাগলাম। এইভাবে কিছুক্ষণ থাকার পর, ভেতরকার দু'জন একসময় বেরিয়ে এলো।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম,— ব্যাপারটা কি? এখানে লেখা দেখছি মেডিসিনম্যান, আপনি কি ডাক্তার?

—অবশ্যই, ডাক্তার মানে আমাব এ লাইনে বিরাট অভিজ্ঞতা— চল্লিশ বছরের এক্‌স্‌পিরিয়েন্‌স্‌।

—ভালো কথা, তা আপনি কি যে-কোনো রোগ সারাতে পারেন?

—যে-কোনো রোগ মানে? তোমাদের ঐ শহরের আমেরিকান্ ডাক্তাররা যেসব রোগের নাম জানে না আমি সেসব রোগ পর্যন্ত সারাতে পারি। তবে আমার স্পেশালিটি হচ্ছে পাগল আর মেয়ে-ঘটিত রোগ— তিনি অতি গর্বের সঙ্গে আমাকে তার অভিজ্ঞতা বলতে লাগলেন।

আমি তাঁর অভিজ্ঞতার ভূয়সী প্রশংসা করে বললাম— তা সত্যি বটে, কিন্তু আপনার তাঁবুর মধ্যে ওষুধপত্র তো কিছু দেখলাম না।

ভদ্রলোক হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলেন,

—ওষুধপত্র— আমাকে কি ঠকবাজ পেয়েছ যে, ভাঁওতাবাজি করে একটু পাউডার লাল নীল জলে দিয়ে পয়সা নেবো। ওসব হচ্ছে তোমাদের শহুরে ডাক্তারদের কাণ্ড। আমি হচ্ছি খাঁটি ডাক্তার— স্বয়ং ভগবান তার সাক্ষী, আমার মন্ত্রই হচ্ছে আমার ওষুধ। আর আমার তাঁবুর মধ্যে ঢুকে যখন ঘাম ঝরে তার মানে খারাপ ভূতগুলো ওর মধ্য দিয়ে পালায়।

ভদ্রলোক খুব বিশ্বাসীর ভঙ্গিতে আমার মুখের দিকে ঝুঁকে পরে তাঁর থিওরি বোঝাতে লাগলেন। তাঁর বিশ্বাস যে শরীরে যখন ভূতের আড্ডা হয় তখনই হয় রোগের প্রকাশ। আর তার একমাত্র চিকিৎসা হচ্ছে রোগীকে আগুনের পাশে বসিয়ে মন্ত্রোচারণ করা। ভদ্রলোকের অঙ্গভঙ্গী ও ব্যাখ্যা শুনে মনে হ'ল তিনি হাতুড়ে ডাক্তার ও ভূতের ওঝা। তবে তাঁর কথাকে একেবারে অস্বীকার করতে পারি না। ইউরোপের অনেক শহরে— বিশেষ করে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া ও আইস্‌ল্যাণ্ডে এই ধরণেরই জিনিস আমি দেখেছি, তবে তার নামটা একটু আলাদা, সভ্য জগতে তার নাম সোনা (Sauna) বা ভেপার বাথ। তুরস্কে এই ধরণের ভেপাব বাথের সঙ্গে মাসাজ ও সেন্ট জুড়ে দিয়ে তাকে বলা হয়েছে টারকীস্ বাথ। ঘামের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের অনেক রোগজীবাণু বেরিয়ে গিয়ে শরীরকে হাল্‌কা করে— একথাটা উড়িয়ে দেওয়া অসম্ভব। যাই হোক, আমি সেখান থেকে এবার উঠলাম।

ভদ্রলোক আমাকে ধরে বললেন— সেকি— চিকিৎসা না করেই যাবে নাকি?

—আজ্ঞে না, আসলে আমার কোন রোগ নেই।

—আরে ওরকম কথা সবাই বলে। তোমার দেহে রোগ আছে কিনা তুমি কি করে বুঝবে হে!

আমি বড় মুশকিলে পড়লাম। ভদ্রলোক দেখছি নাছোড়বান্দা, মনে মনে ভাবলাম কি আপদ! তিনি আমার হাতটা শক্ত করে ধরে বললেন— এসো হে ছোকরা!

আমি অনেকটা কাঁদো কাঁদো হয়ে বললাম,

—বিশ্বাস করুন আপনার ভিজিট দেবার মতো পয়সা আমার নেই।

ভদ্রলোক অনেকটা রাগতস্বরে বললেন— আমাকে কি তুমি শহুরে ডাক্তার পেয়েছো যে পয়সা ছাড়া চিকিৎসা হবে না। সেই মহান আত্মার আশীর্বাদে আমার অভাব কিছু নেই। আমার কাছে একবার যখন এসেছো তখন তোমার ভূত আমি ছাড়াবোই।

ওঃ! কি সাঙ্ঘাতিক ওঝারে বাবা! আমার ঘাড়ে ভূত নেই তবু ভূত ছাড়াবে।

এবার পকেট থেকে একটা ডলার বার করে তার দিকে বাড়িয়ে ধরলাম— এই নিন— ধরুন। আপনার পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ, আমি পরে সময়মতো আসবো। এখন আমার সর্দারের সাথে দেখা করার সময়।

আমার এই কথায় সঙ্গে সঙ্গে কাজ দিল। ভদ্রলোক আমাকে ছেড়ে দিলেন। সর্দারের সঙ্গে আমার দেখা হবে সেটা ওঁর কাছে একটা বিরাট ওষুধ। আমার কাছ থেকে শেষ পর্যন্ত ডলারটাও নিলেন না; ওঁর বিশ্বাস আমি আবার সময়মতো আসবো। ওঁর হাত থেকে ছাড়া পেয়ে আমি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লাম।

আজকে সবাই উৎসবের ব্যাপারে ব্যস্ত, তাই আমি একা-একাই এই মেলায় ঘুরতে লাগলাম।

আমি একটা কফির দোকানে ঢুকে একটা কেক ও এক কাপ চা নিয়ে বসলাম। আমার আশ-পাশের টেবিলে দু'একজন করে চেনা মুখ দেখতে পেলাম। তাদের সঙ্গে আমি আলাপ করতে লাগলাম। এখন রাত প্রায় আটটা হবে— দোকানটা ট্যুরিস্টদের জন্যই খোলা থাকে। আজকে আমার মনে হয় এই উৎসবের জন্যই খোলা। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখলাম আস্তে আস্তে সবাই উঠতে শুরু করেছে। পাশের লোকটাকে জিজ্ঞেস করলাম— ব্যাপার কি? এত তাড়াতাড়ি দোকান বন্ধ হচ্ছে কেন?

সে আমার প্রশ্নের উত্তরে জানালো। —সবাই নাচ দেখতে যাচ্ছে টোটেম্ মাঠে। আর আধঘন্টার মধ্যেই নাচ শুরু হবে।

তাই নাকি? তাদের সাথে আমিও ছুটলাম বারোয়ারীতলায় অর্থাৎ টোটেম্ মাঠে।

সকলের সাথে আমি একটা জায়গা বেছে নিয়ে বসলাম। শুরু হ'ল ঈগল-নাচ। এ নাচটা অনেকটা আমার আগে দেখা আগুন-নৃত্যের মতোই, তবে এখানে আরও তিনজন চরিত্র বেশী আর নাচের পোষাকটাও একটু আলাদা। পায়ে হাঁটু পর্যন্ত ঘুঙুর বাঁধা। পিঠে রঙিন পালকেব ডানা। আগের মতোই আমবা চারদিকে বৃত্তাকারে বসেছি। মাঝখানে বিরাট কাঠের আগুন জ্বালিয়ে আলোকিত কবা হয়েছে। ঠিক ক্যাম্প-ফায়ারের মতো, অর্থাৎ যতক্ষণ এই কাঠের আগুন জ্বলবে ততক্ষণ উৎসব চলবে।

হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দে সবাই বাঁ দিকে তাকালো। ঠিক গাছের নীচের অন্ধকারের থেকে ভেসে আসছে তাম্বুরার আওয়াজ ঢোলের মতো। নাচ জমে উঠলো— ঈগলের দৌড়, ঈগলের শিকার, তারপর আগুন-নৃত্য। তাম্বুরের তালে, আব সকলের তালিতে বেশ জমে উঠেছে আগুন-নৃত্য। এই তালের সঙ্গে খাপ খাইয়ে আমার অন্তরও নেচে উঠলো, অনেকদিন পরে মনে হ'ল আমাদের দুর্গা পূজো ও কালীপূজোর কথা। ঠিক এই ধরণেরই পরিবেশে। দর্শকদের প্রত্যেকেই এতে অংশ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে কোনো সূক্ষ্মতার স্পর্শ নেই। যেটা বিশেষ প্রয়োজন সেটা হচ্ছে তাল আর বাঁধনছাড়া আনন্দ। হাতের তালি ও তার সাথে ঢোলের শব্দ— মুখে মুখে হৈ-হৈ শব্দ আর নাচিয়ের ঘুঙুরের শব্দ— এইসব শব্দ মিলিয়ে আমাকে যেন বার বার আহ্বান জানাতে লাগলো। আগুন-নৃত্যটাই শেষ। কিছুক্ষণের মধ্যে সে নাচও শেষ হ'ল।

আগুন নাচটা শেষ হতেই আমি হঠাৎ তাদের সামনে প্রায় লাফিয়ে পড়ে বললাম— কেউ উঠবেন না, আমিও আপনাদের একটা আগুন-নাচ দেখাবো। সবাই তো অবাক!—

যাই হোক, শেষে আমি তাদের অনুমতি পেলাম। আমি পায়ে ঘুঙুর বেঁধে নিলাম আর তাম্বুর-বাদককে বললাম— চালিয়ে যাও যে কোনো ছন্দে। আমি ছোটবেলা থেকেই আরতি দিতে ভালো বাসতাম আর তার সাথে নাচও বটে। আমি অবশ্য

খুব একটা ভালো নাচিয়ে ছিলাম না বটে, কিন্তু লোক জমাবার পক্ষে যা জানতাম তাই যথেষ্ট। আমার সেই অনেকদিনের হারিয়ে যাওয়া দুর্গাপূজোর রাতকে হঠাৎ যেন ফিরে পেলাম। আমার নাচ ঠিক ওদের জন্য নয়— আমার নিজেরই পরিতৃপ্তির জন্য।

নাচতে লাগলাম। ঠিক আরতির মতো শুধু হাতে ধূনুচীর বদলে তুলে নিলাম দুটো জলন্ত মশাল। তারপর জয় মা কালী বলে শুরু করে দিলাম আমার আরতি-নৃত্য। আস্তে আস্তে দেখলাম সবাইয়ের মাথা আমার নাচের ছন্দে দুলতে লাগলো— আরও কিছুক্ষণ পর সবাই হাততালি দিয়ে আমাকে উৎসাহিত করতে লাগলো। ঠিক এই রকমটাই আমি চাইছিলাম। সকলকেই আমি আমার নাচে মুগ্ধ কবতে পেরেছি। প্রায় আধঘন্টা নাচের পর আমি তাণ্ডব-নাচ দেখিয়ে শেষ করলাম। প্রত্যেকেই চেঁচিয়ে তালি দিয়ে আমাকে অভিনন্দন জানাতে লাগলো। আমিও তাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানালাম।

ভেবেছিলাম এখানেই পর্বের শেষ, কিন্তু তা নয়—আসল জিনিসটাই বাকী। তামাকের উৎসবে তামাকপাতাই হচ্ছে আসল। আর সেটাই এখন আরম্ভ হবে।

অর্থাৎ এখন চলবে শান্তি, প্রেম ও ঐক্যের প্রতীক, সেই ধূমপানের মহড়া। এবার পকেট থেকে সবাই যে যার চুরুট বার করে পোড়া কাঠকয়লা থেকে ধরাতে লাগলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই জায়গাটা ফুলঝুরির মতো হয়ে উঠলো। তামাক সেবন তো নয়, এ যেন তামাক সেবনের প্রতিযোগিতা। তামাক, পাইপ ও দোক্তা পাতার এক বিরাট ধ্বংসকেন্দ্র। সেই গন্ধে আকাশ-বাতাস ভরে উঠলো। আর সেই সাথে চললো বিভিন্ন হালকা ধরণের রসিকতা। তামাকের পর্ব শেষ হলে আরম্ভ হলো গাঁজার দম। এদের মধ্যেও যে গাঁজার দম চলে সেটা আগে জানতাম না, ভেবেছিলাম নন্দী ভৃঙ্গী নিতান্তই ভারতীয়, কিন্তু হাজার হাজার বছর আগে আমেরিকাতেও মনে হয় তাদের পদার্পণ ঘটেছিল...। পাশের প্রায় ঝিমিয়ে পড়া লোকটাকে জিজ্ঞেস করলাম— এখানে আর অন্য কোন প্রোগ্রাম নেই?

—নিশ্চয়ই, তবে এখানে নয়, কমিউনিটি হলে আছে—শিশুদের জন্য। উত্তর পেলাম।

তাই ভালো, এখানে তামাকের গন্ধে মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করছে, কাজেই সেখানে যাওয়াই ভালো। আমি পেছন দিক দিয়ে উঠে পড়লাম।

কমিউনিটি হলে এসে দেখি হলটা ফাঁকা ও অন্ধকার, তারই খানিকটা দূরে গাছতলায় মনে হচ্ছে কারা যেন বসে রয়েছে কাঠের আগুনের আলোয়, অন্ততঃ তাই মনে হলো। সেদিকে এগিয়ে যেতেই দেখি, আগের মতোই অর্থাৎ কাঠের আগুনের চারপাশে প্রায় কুড়ি পঁচিশ জনের মতো বসে আছে, তার মাঝখানে একজন বয়স্ক গোছের লোক। হাত-পা ও মুখের বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি করে গল্প শোনাচ্ছে।

আমাকে দেখে প্রথমটা যদিও চিনতে পারেনি কিন্তু কাছে এগোতেই আগুনের আলোয় চিনতে পারলো— আমি ওদের গল্প চালিয়ে যেতে বলে পাশের মাটির ওপর আসন কেটে বসলাম।

আমাকে শ্রোতা হিসেবে পেয়ে ভদ্রলোক দ্বিগুণ উৎসাহে তার গল্প বলতে লাগলো। এটা হচ্ছে চার নম্বর গল্পের শেষের দিক, কাজেই আমি ঠিক ফলো করতে পারলুম না। শুধু ওদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে হুঁ হুঁ করতে লাগলাম। শ্রোতাদের মধ্যে মধ্যে ছোট ছেলে-মেয়ের দল, বয়েস দশ থেকে পনেরো ষোল বছর পর্যন্ত হবে। এরা সবাই রূপকথার ভক্ত, কাজেই এটাকে কমিউনিটি সেন্টারের ফাংসানের পরে একটা বাড়তি অনুষ্ঠান বলা যেতে পারে।

বয়স্ক ভদ্রলোক শুরু করলো তাঁর পাঁচ নম্বর গল্প, আমি তন্ময় হয়ে শুনতে লাগলাম।

গড়ানো মাথার গল্প

অনেক অনেকদিন আগে দূর পাহাড়ের গাঁয়ে দু'ভাই বাস করতো। দু'ভাই-এর মধ্যে ভীষণ ভাব— তারা একসঙ্গে খায়, ঘোরে ও একই সঙ্গে শিকার করে। ঠিক এমনভাবে তাদের সুখেই জীবন কাটাতো।

একদিন তাদেব ঘরের সামনে হঠাৎ এসে হাজির হ'ল একটা সুন্দরী মেয়ে। মেয়েটা সরাসরি তার পরিচয় দিয়ে বললো— আমি এই জঙ্গলেরই মেয়ে, আমি তোমাদের যে কোন একজনকে বিয়ে কবতে চাই। ছোট ভাই বললে— ঠিক আছে, দাদা তুমি আমার বড় ভাই, কাজেই তোমার আগে বিয়ে করা উচিত। বড় ভাই বললে— না ভাই, আমি বিয়ে করতে চাই না— তুমিই বিয়ে কর। মেয়েটা সুন্দরী— আর মনে হচ্ছে কাজেরও বটে, তুমিই তাকে নাও, আমি তোমাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব নেবো। ছোট ভাই মনে মনে তাই-ই চাইছিল। কাজেই ভগবানকে স্বাক্ষী রেখে ছোটভাই তাকে বিয়ে করলো। এখন তাদের জীবন বেশ ভালোভাবেই কাটতে লাগলো।

দু'ভাই-ই শিকারে দক্ষ— একদিন তারা তিনজনে মিলে ঠিক করলে অনেক দূরে বেরোবে শিকারের জন্য। তীর-ধনুক, বর্শা ও দড়ি নিয়ে তারা বেরিয়ে পড়লো। তারা এসে হাজির হ'ল একটা বিরাট লেকের কাছে। বউ হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো— ওই দেখ ওই দেখ! দু'ভাই সঙ্গে সঙ্গে সেদিকে তাকাতেই দেখতে পেলো— একটা অতি বিরাট মাছ জলের ওপর ভাসছে। মাছটা ভাসছে তো ভাসছেই— একটু নড়াচড়ার নাম নেই। দু'ভাই ঠিক করলে এ মাছটাকে মারতেই হবে। মাছটা ডাঙার কাছাকাছি রয়েছে কাজেই তাকে ধরার জন্য কোনো তীর-ধনুকের দরকার হবে না। বড় ভাই ছোট ভাই-এর কোমরে শক্ত করে দড়ি বাঁধলো— তারপর দড়ির আর এক দিকটা ধরে সে ওপরে দাঁড়িয়ে রইলো, ছোট ভাই অতি সন্তর্পণে জলের

কাছে এসেই মাছের ওপর লাফিয়ে পড়লো— সে মাছটাকে শক্ত করে জাপটে ধরবে আর বড় ভাই ওপর থেকে টেনে তুলবে। এটাই হচ্ছে বড় মাছ ধরার কৌশল। কিন্তু ওটাতো আসলে মাছ নয়, মাছের আকারে একটা ভূত। মাছের ওপরে যেই ছোট ভাই লাফিয়ে পড়েছে— ব্যস! সঙ্গে সঙ্গে মাছটা তাকে কপাৎ করে গিলে ফেললো— আর সঙ্গে সঙ্গে এক টানে বড় ভাই-এর হাত থেকে দড়িটা ছিনিয়ে নিল। কি সর্বনাশ! মাছের পেটে ছোট ভাইকে যেতে দেখে বড় ভাই— বাঁচাও বাঁচাও করে চীৎকার শুরু করলো। সেই লেকের চারদিকে কাঁদতে কাঁদতে বড় ভাই ও বৌ ছোটাছুটি শুরু করলো। বনের জন্তু-জানোয়ার যাকে দেখে তাকেই জাপটে ধরে বলে— আমার ভাইকে মাছে খেয়েছে, তাকে তোমরা বাঁচাও।

সেই লেকেই বাস করতো মাছের রাজা; সে সব শুনে বললো— তাই নাকি? মানুষে মাছ খাবে সেটা ভালো কথা, তার জন্যইতো আমাদের জন্ম, কিন্তু মাছে মানুষ খাবে এ কথাতো কোনদিন শুনিনি। মাছের রাজা তার লেকের বিষাক্ত মাছদের ডেকে বললো— তোমরা এই নরখাদক মাছকে তোমাদের বিষাক্ত কাঁটা ফুটিয়ে মেরে ফেলো— কারণ ও মাছ নয়, ও হচ্ছে আসলে মানুষ-খেকো ভূত। বিষাক্ত মাছের দল রাজার কথা শুনেই সঙ্গে সঙ্গে তাদের কাঁটা উঁচিয়ে তেড়ে গেল, সেই বড় মাছের দিকে। তারপর? তারপর আর কি! হাজার-হাজার মাছের বিষাক্ত কাঁটায় তার দফা-রফা। বড় মরা মাছটাকে এবার ডাঙ্গায় তোলা হ'ল। তারপর সঙ্গে সঙ্গে তার পেট কেটে উদ্ধার কবা হ'ল ছোট ভাইকে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়— মাছটা ছোট ভাই-এর প্রায় সবটাই খেয়ে হজম করে ফেলেছে— বাকী রয়েছে কেবলমাত্র তার মাথাটা। ছোট ভাই-এর এই অবস্থা দেখে বড়ভাই ও বৌ হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠলো।

কী আশ্চর্য! সেই মুন্ডটা হঠাৎ নড়ে উঠলো; তারপর অতি বিনীত হয়ে বড় ভাই-এর উদ্দেশ্যে বললো— দাদা, তুমি আমার মাথাটাকে ধুয়ে পরিষ্কার করে ওই গাছের ওপর শুকোতে দাও, আমি এখনও মরিনি। সবাইতো অবাক— বলে কি? তাদের এত দুঃখের মধ্যে এখন আবার ভয় ঢুকে গেল। গাছের ওপর বসে ছিল একটা কাক, সে অকারণে চীৎকার করে উঠলো,— মাছের রাজা লেক থেকে চেঁচিয়ে বলে উঠলো— খুব সাবধান! খুব সাবধান! ওই গলাকাটা মুন্ডটা তোমার ভাই নয়, ওটা হচ্ছে ভূতের প্রাণ।

বড় ভাই সেই কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে বৌকে নিয়ে ঘরে ফিরে গেল। সেই রাতেই বৌ বড় ভাইকে বললো,— এখন আর দুঃখ করে কি হবে বলো? তুমিই আমাকে বিয়ে কর। বড় ভাই ছোট ভাইএর বৌকে বিয়ে করলো।

পরেরদিন সকালে বড়ভাই ও বৌ ঘর থেকে উঠোনে যেই পা দিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে গাছের ওপর থেকে হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ করে কে যেন হেসে উঠলো। ওপর দিকে তাকাতেই তারা দেখে সেই গলাকাটা! কী সর্বনাশ! সেদিন সারাটা দিন গাছের

ওপর থেকে জংলা ফল ফেলে সারাটা উঠোন ভরিয়ে তুললো— আর যখনই বৌ বা বড়ভাই বেরোয় তখনই গলাকাটা হেসে ওঠে আর বলে,— তুই আমার বউ, তুই আমার বউ, তুই আমার বউ; আর তুই আমার দাদা, তুই আমার দাদা, তুই আমার দাদা। ভূতের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বড়ভাই ও বউ ঘর ছেড়ে পালালো। কিন্তু তাতেও রক্ষা নেই— পেছন থেকে গলাকাটা গড়াতে গড়াতে এসে হাজির— হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ— তুই আমার বউ, তুই আমার বউ, তুই আমার বউ, তুই আমার দাদা। কী সর্বনাশ— ভূতের হাত থেকে রেহাই নেই দেখছি। তারা যেখানেই যাক না কেন গলাকাটা ভূতের থেকে রেহাই নেই। কাজেই বাধ্য হয়ে তারা আশ্রয় নিল মাটির যাদুকরের কাছে। মাটির যাদুকর তাদের লুকিয়ে রাখলো ঘরের মধ্যে; কিন্তু গলাকাটাকে তাড়াবার কোন ক্ষমতাই তার নেই— গলাকাটা বাইরের গাছের ডালে বসে দিনরাত হিঃ হিঃ করে হাসে আর, তুই আমার বউ, তুই আমার দাদা বলে সময় সময় ডাক দেয়। শেষে গলাকাটার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য যাদুকর এক চমৎকার ব্যবস্থা করলে। সে বউকে মন্ত্র দিয়ে একটা পুরুষ লোক বানিয়ে ফেললো। এবার আর কোন ভয় নেই— ভূতকে এবার বোকা বানিয়ে তারা বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লো।

বড়ভাই-এর সঙ্গে একটা লোককে যাদুকরের বাড়ী থেকে বেরোতে দেখে গলাকাটা ভূত ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। এবার হাঃ হাঃ করে আর সে হাসলো না, বরঞ্চ বড় ভাইয়ের সঙ্গে শক্তিশালী লোকটাকে দেখে তার সন্দেহ হ'ল, মনে মনে ভাবলো এই লোকটা কে? যাদুকরের মন্ত্রবলে বউ এখন শক্তিশালী একটা মানুষ। সে শিকার করে, তীর ছোঁড়ে— আর ঠিক একটা পালোয়ানের মতোই খায়। গলাকাটা ঘাবড়ে গেলেও কিন্তু তাদের সঙ্গ ছাড়েনি। গাঁড়িয়ে গড়িয়ে সবসময় তাদের পেছন পেছন চলতে লাগলো। এইভাবে কিছুদিন চলার পর তারা যখন একটা লেকের ধারে এসেছে গলাকাটা তাদের সামনে এসে হাজির। জলের মধ্যে গলাকাটার জোর দ্বিগুণ বেড়ে যায়— তাই সে বড় ভাইকে পাশ কাটিয়ে শক্তিশালী লোকটার কাছে এসে চ্যালেন্‌জের সুরে বললো— ওহে, তুমি যদি অতই বলবান হবে তাহলে এসো দেখি— আমার সাথে সাঁতারের পাল্লা দাও। তুমি যদি আমাকে সাঁতারে হারাতে পারো তাহলে আমি তোমাদের ছেড়ে চলে যাবো। এই বলে গলাকাটা গড়াতে গড়াতে গিয়ে জলে পড়লো; তাবপর মাছেব মতো এদিক-ওদিক তোলপাড় করে সাঁতার কাটতে লাগলো।

এদিকে লোকটা কি করবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না; বড়ভাই তাকে আশ্বাস দিয়ে বললে— কোন ভয় নেই বউ, তুমি যাও, আমি বলছি তুমি ঠিক জিতবে। লোকটা এবার ঝাঁপিয়ে পড়লো জলে। বড়ভাই যা ভেবেছে তাই— লোকটা ঠিক যেন দক্ষ সাঁতারু। সাঁতার কাটতে কাটতে গলাকাটা একসময় যেই লোকটার কাছে এসেছে— অমনি সে গলাকাটা ভূতটাকে দু'হাত দিয়ে জলের মধ্যে চেপে ধরলো। ভূতটা নাকানি-চোবানি খেয়ে ছাড়ো ছাড়ো করে চেঁচিয়ে উঠলো। কিন্তু লোকটা

তার কথা না শুনে জলের মধ্যেই তাকে ঠেসে ধরলো। গলাকাটা সেই শক্তিশালীর হাত থেকে রক্ষা পেলো না। শ্বাস বন্ধ হয়ে মারা গেল।

এবার গলাকাটার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে তারা দু'জনে আবার ফিরে গেল মাটির যাদুকরের কাছে। সে সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রবলে সেই শক্তিশালী লোকটাকে আবার সুন্দরী বউ বানিয়ে দিল। তারপর তো বুঝতেই পারছো— মহানন্দে তারা বাড়ী ফিরলো।

এখন প্রায় ভোর— গল্প শেষ হ'ল, সবাই আস্তে আস্তে উঠে যে যার বাড়ীর দিকে ফিরে গেল। গল্প শোনার জন্য আমরা সবাই আগুন ঘিরে বসেছিলাম, সেই জায়গাটা ছাড়তেই বেশ একটু শীত-শীত করতে লাগলো, বিশেষ করে আমার গায়ে একটা মাত্র পাতলা জামা। দিনেববেলা এখানে গরম বটে, কিন্তু রাত্রিবেলা বেশ শীত-শীত ভাব। কাজেই আমি আর কোথাও না গিয়ে আগুনের ধারেই রাত কাটিয়ে দিলাম।

দেখতে দেখতে আবও বেশ কয়েকদিন কেটে গেল। শেবকী রিজার্ভেশনে আমি এদের সঙ্গে মিশে অনেক জেনেছি। এখানে আসার আমার কোন প্ল্যান ছিল না, কিন্তু হঠাৎ এসে পড়ে ভালোই হ'ল। আমেরিকার মাটিতে সেখানকার আদিবাসীদের না জানলে আমার আমেরিকা দেখাই নিস্ফল হতো। আমার আচরণে মাঝে মাঝে আমি নিজেই আশ্চর্য হয়ে যাই। ওয়াশিংটন থেকে যাত্রা করেছিলাম চিকাগোব দিকে, কিন্তু হঠাৎ মনের গতি গেল পাল্টে; তাই চলে এসেছি এই ক্যারোলিনায়।

আমি বিদায় জানালাম আমাব রেড-ইণ্ডিয়ান বন্ধুদের; সকলের সাথে আলাদা আলাদা করে দেখা করা সম্ভব হ'ল না। শুধু জো-কে বললাম— তুমি আমার হয়ে সবাইকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানিও। কথায় কথায় আমরা চা-এব দোকানটার কাছাকাছি আসতেই আরও কয়েকজন এসে ভীড় করলো— আমি সবাইকে আলিঙ্গন করলাম। সাইকেলে চড়ে একবাব মাত্র প্যাডেল ঘোরাতেই পেছন থেকে জো আমার সাথে দৌড়োতে লাগলো। ওর দিকে তাকাতেই ও অনুরোধেব সুরে বললো— একটা কথা— আমি দেখেছি তুমি মাঝে মাঝে ডায়েবী লেখো, একদিন নিশ্চয়ই ওটা ছাপাবে— আমাদের কথাটা লিখো কিন্তু।

—অবশ্যই! তোমাদের কথা জানাবাব জন্যই তো আমার এই লেখা— অল্‌রাইট দেন্— গুড্ বাই অ্যাণ্ড থ্যাংক্স্ এগেইন্।

রেড্-ইণ্ডিয়ানদের শের্কী ভাষার কিছু নমুনা

দেওআকো = নতুন ফসলের দেবতা
গাওহ্ = বাতাসের দেবতা
গিহ্ মানিতো = রাজার রাজা অথবা পরমেশ্বর
দেহিনো = বজ্রের দেবতা
ওরেন্ডো = প্রকৃতির দেবতা
আংপেটুই = সূর্য
আংপাও = খুব ভোরের সময়
গাহ্রু = জলের দেবতা
হাং গেফি = চাঁদের আলো
হেংগা = ঈগল পাখী
হোংগা = মাটির নীচের অধিবাসী অথবা পাতালবাসী
মীমাকে = তারার অধিবাসী
টাহোলসোদী = জলদেবতা
ডেলাগথ্ = নরখাদক
নেশারু = ভাগ্যবান্
নুনিউনুই = পাথরের পোষাক
ওহায়হো ওস্ = অপরিচিতা নারী
পাশিকোলা = খরগোশ
ইত্শালু = তামাক
উক্টেনা = জলসাপ
আমিতোলেন্ = বামধনু
ইনাউলুহা = পুরোহিত।

চিকাগো

এই হচ্ছে চিকাগো, মিচিগান এভেন্যু, ডানদিকে লেক আর বাঁ দিকে শহরের প্রাণকেন্দ্র, তারই ভেতর দিয়ে সিধে বেরিয়ে গেছে এই রাস্তাটা। রাস্তাটার ঠিক নীচেই রয়েছে মেট্রো বা মাটির নীচে ট্রেনের লাইন, মাঝে মাঝে তাই নজরে পড়ছে সেখানে যাবার সিঁড়ি অথবা স্টেশন। এত তাড়াতাড়ি চিকাগো শহরে এসে পৌঁছাবো আশা করতে পারিনি। লণ্ডন-প্যারিস-ওয়াশিংটন বা এই ধরণেব বড় বড় শহরে ঢোকার আগেই আমাকে পরিকল্পনা করতে হয় অথবা একটু চিন্তা কবে ভেবে দেখতে হয় এবং শহরের ম্যাপটাকে ভালো ভাবে দেখে ঠিক করে নিতে হয়, কোথায় প্রথম যেতে হবে, এবং কি করতে হবে, নয়তো দেখেছি যে সব কিছু বজায় রাখতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত আসল কাজটাই যেন বাকী থেকে যায়।

আমি সাইকেলটাকে একটা ল্যাম্প-পোষ্টের সাথে হেলান দিয়ে ফুটপাতের উপব দাঁড়ালাম— হ্যাঁ, প্রথম কথা হচ্ছে যে কিছু খেতে হবে। তাই পাশেব একটা বারে ঢুকে পড়লাম, বারের কাছে একটা লম্বা টুলে বসে পড়ে অর্ডাব দিলাম একট ওমলেট্-হট্‌মিল্ক। কালো মোটা মতো নিগ্রো মেয়েটা সবিনয়ে জবাব দিলো— হট্‌মিল্ক পাওয়া যাবে না। ঠিক আছে, একটা মিল্ক স্যেক। মিল্ক সোক (Milk Shakc) হচ্ছে অনেকটা ঘন ঘোলের ও বরফের মিশ্রণে তৈরী সরবতের মতো। গরমেব দিনে পেট ঠাণ্ডা করবাব পক্ষে এটা সত্যি উপযোগী বস্তু বটে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই অর্ডারমতো খাবার এলো; টেবিলেব উপর আমাব নোটবুকটা খুলে বসলাম। চিকাগো শহরে দেখছি অনেকগুলো রেফাবেন্স রয়েছে— তার মধ্যে এক নম্বর হচ্ছে শিবানন্দ যোগ-বেদান্ত সোসাইটি, দ্বিতীয় পিটাব ম্যাক্স্, তৃতীয় রামকৃষ্ণ মিশন, তা ছাড়াও প্রায় তিন বছর আগেকাব লেখা একটা অস্পষ্ট নামও রয়েছে প্রফেসার বেক্‌টেল, অবশ্য জানি না তিনি আমাকে এখনও মনে রেখেছেন কি না, অথবা তাঁর ওখানে থাকা সম্ভব হবে কি না তাও জানি না। তবে আমাব স্পষ্ট মনে আছে যে, ইস্তাম্বুলে তিনি যখনই আমাকে নেমতন্ন করতেন তখন বিশেষভাবে অনুরোধ করতেন চিকাগো গেলে যেন তাঁর বাড়ীতে উঠি। পাশের এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলাম,

—আচ্ছা, এই ঠিকানাটা ঠিক কোথায় বলতে পারেন? ভদ্রলোক খুব মনোযোগ দিয়ে ঠিকানাটা পড়লেন, তারপর বললেন— হুইটন্? হুইটন্ বলে এখানে কোনো শহর আছে বলে আমার মনে হয় না।

আমি ভদ্রলোককে জানালাম— না, আপনি হয়তো জানেন না, কিন্তু এই ঠিকানাটা ঠিক, কারণ এই ঠিকানায় আমি অনেক চিঠিপত্রে যোগাযোগ করেছি। আমি আমার ডানদিকের ভদ্রলোককে এবার একই প্রশ্ন করলাম। ভদ্রলোক এতক্ষণ ধরে আমাদের কথাবার্তা শুনছিলেন, তিনি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন— হুইটন্ শহরের কথা বলছো, আর সেই জায়গাটা এখানেই কোথাও হবে, একটু খুঁজে দেখ বাবা, তাহলেই পেয়ে যাবে। ...আমি ভদ্রলোকব জবাব শুনে তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে উঠে পড়লাম। অবশ্য খাবারের দামটা দিতে ভুলিনি। সাইকেলটার কাছে এসে দেখি একটা তের-চৌদ্দ বছরের নিগ্রো ছেলে (অবশ্যই আমেরিকান সিটিজেন), আমাব সাইকেলটার উপর হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি সাইকেলটা ধরতেই ও প্রায় ধমকে উঠলো।

—এই সাইকেলটা কি তোমাব?

—হ্যাঁ, আমার তো বটেই— আমি ধীবে জবাব দিলাম।

—তোমাব, তার প্রমাণ কি? ছেলেটা আবাব রুখে দাঁড়াল।

—এটা আমাব ভাই, প্রমাণের কোনো প্রয়োজন নেই। ওই যে পুলিশটাকে দেখছো ওকে ডাকবো? দেখবে সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণ হয়ে যাবে এটা আমাব, তোমার নয়— খুব মেলায়েম স্বরে তাকে বললাম।

ছেলেটা সঙ্গে সঙ্গে সহজ হয়ে এলো— তারপব অতি আপন করা স্ববে বললো— এটা তোমাবই তাহলে?

আমি সাইকেলটা নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আবাব জবাব দিলাম— হ্যাঁ ভাই এটা আমাবই।

—সাইকেলে তুমি তালা লাগাওনি কেন?

আমি তাব প্রশ্নেব কোনো উত্তর না দিয়ে চলতে লাগলাম। ছেলেটা আমার সঙ্গ ছাড়তে যেন রাজি নয়— আমাকে ওর দিকে আকৃষ্ট করে তারপর বলতে লাগলো,

—জানো, তোমাব সাইকেলটা আমি যদি না দেখতাম তাহলে হাওয়া হয়ে যেতো। চিকাগো শহর তো তুমি চেন না, এখানে চোর-ছ্যাচোর ভর্তি, আমি না থাকলে তুমি আব ফিরে এসে পেতে না।

আমি এবার ওকে এড়াবার জন্য সরাসরি বললাম,

—সাইকেলটা দেখেছো ভালো কবেছো— এবার সরে পবো।

—তাহলে একটা ডলার দাও আমি এক্ষুণি চলে যাচ্ছি। আমি এবার ওর দিকে তাকিযে বললাম,— তাহলে ডলারের জন্যই তুই আমার সাইকেলটা দেখছিলি? তাবপব? আসল মতলবটা কি ছিল? দেখ বাপু, আমাকে বেশী বিরক্ত করিসনি কিন্তু, এই শহরে আমি নতুন নয়, আর ডলার চাইছিস— আমি নিজেই চাকরী খুঁজছি পয়সাব জন্য। আমার পেছনে ঘুরে লাভ নেই আমিও তোরই মতো, এই

নে এই চুইনগামটা ধর— এই বলে পকেট থেকে ওকে আমি একটা চুইন্‌গাম বের করে দিলাম। ছেলেটা আমার কাছ থেকে চুইনগামটা নিয়ে থ্যাংক ইউ বলে সঙ্গে সঙ্গে সরে পড়লো। আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম, মনে মনে ভাবলাম চিকাগো শহরটাও দেখছি অন্যান্য শহরেরই মতো— যত বড়ই হোক না কেন তার মধ্যে ফাটলটা থেকেই গেছে।

পাশে একটা খালের মতো নজরে পড়ায় সেদিকে ঘুরলাম, কাছে আসতেই দেখি খালের পাশ দিয়ে একটা রাস্তা মাটির নীচে চলে গেছে। আমি খালের পাশে এসে রাস্তাটাকে ভালোভাবে দেখবার জন্য দাঁড়ালাম— সত্যি রাস্তা বটে তবে একটা নয়, গুনে দেখলাম এক-দুই-তিন— হ্যাঁ— মাটির নীচে প্রায় তিন তলা রাস্তা, তার ওপর দিয়ে গ্রে-হাউণ্ড বাস এগিয়ে চলেছে— হয়তো তারই গ্যারেজ হবে। আমি আবার উঠে এলাম ওপরে, আবার ধরলাম মিচিগান এভেন্যু।

ছেলেটার পাল্লায় পড়ে আমার প্লানিং করা সম্ভব হয়নি, কাজেই একটা পার্ক দেখে সেখানে গেলাম। নোট বই-এর পরের পাতাটা উল্টোতেই দেখি আর একটা রেফারেন্স রয়েছে Government of India Tourist Office। ওয়াশিংটনের ফার্স্ট সেক্রেটারী অফ এডুকেশন অ্যাণ্ড কালচার, মিঃ গাঙ্গুলি আমাকে চিকাগোর ভারতীয় পর্যটন দপ্তরে দেখা করবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন— হ্যাঁ ঠিকানাটা দেখছি এই এভেন্যুর ওপরেই।

একটা কেবিনে ঢুকে সেখানকার টেলিফোন নম্বরটা বার করে যোগাযোগ করলাম।

যোগাযোগ ভালোই হ'ল, অফিসের ভারপ্রাপ্ত অফিসার মিঃ পেরেরা আমার ফোন পেয়েই লাফিয়ে উঠলেন — যেন অনেক দিনের পরিচিত, তিনি আমার সম্পর্কে সব কিছুই জানেন— শুধু তাই-ই নয়, ওয়াশিংটন ইণ্ডিয়ান এম্‌বাসীর তরফ থেকেও অনুরোধ এসেছে যাতে আমার প্রতি যত্ন নেওয়া হয়। আমি সেখানে দু'ঘন্টা পরে যাবো বলে ফোনটা রেখে দিলাম, যদিও সেখান থেকে ট্যুরিস্ট অফিস বিশ মিনিটের বেশী রাস্তা নয়— কিন্তু যেহেতু আমি ঠিক জানি না তাই ম্যাক্সিমাম সময় চেয়ে নিলাম যাতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফেল না হয়।

হাতে যখন সময় আছে, কাজেই লেকের ধারে এগিয়ে গেলাম— লেক তো নয় সাগর। লেক মিচিগান-এর ঠিক ওপারেই হচ্ছে কানাডা। চিকাগো শহরের সমৃদ্ধির মূলে রয়েছে এই লেক— জলপথে ব্যবসা-বাণিজ্যের এক বিরাট সুবিধা। বিরাট বিরাট জাহাজ, বোট, দেখে কে বলবে যে এটা লেক, সাগর নয়। আমি সাইকেলটা রেখে হারবারের একটা পার্কে এসে বসলাম। একটু জিরানো যাক— সটান হয়ে শুয়ে পড়লাম। হারবারের ঘন্টায় মনে হ'ল এখন দেড়টা, রওনা দেওয়া যাক। মিঃ পেরেরাকে কথা দিয়েছি ঠিক দুটোর সময় আমি ওখানে পৌঁছাবো।

এখান থেকে সোজা রাস্তা, কাজেই অসুবিধার কোন কারণ নেই। হঠাৎ দেখি আমার পেছনে একটা পুলিশ কার, থামতে হ'ল। এখানে পুলিশ কারকে চেনার

অসুবিধা নেই, বিবাট ক্যাডিলাক অথবা ইম্‌পালা, মাথাব ওপব অটোমটিক লাইট, অটোমেটিক হর্ন আব গাড়ীর দুপাশে বিবাট কবে লেখা POLICE—কাজেই মহামান্য নগববক্ষীবা লোকের চোখে পড়বেই— আব নেহাৎই যদি কেউ না দেখতে পায়, তা'হলে বয়েছে তাব ভ্যা-পো ধ্বনি। আমি পুলিশ ভদ্রলোককে কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই গাড়ীব দবজা খুলে একজন অফিসাব বেবিয়ে এলেন, আমাকে সেলাম দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন— কবমর্দন কবে আমি তাকে বলতে যাবো— "নই আমি নই চোব নই চোব....," কিন্তু ভদ্রলোক সাহাস্যে জিজ্ঞেস কবলেন— আপনিই কি সেই মহামান্য ভাবতীয় গ্লোব ট্রটার?

আমি বিনীতভাবে বললাম— আজ্ঞে হ্যাঁ, আমাব নাম বিমল।

—আমবা আপনাব জন্যই অপেক্ষা কবছি, আমাদেব গাড়ীকে ফলো করুন— বলে তাঁবা আস্তে আস্তে এগিয়ে চললেন— আব আমি তাব পেছনে পেছনে চলতে লাগলাম— আমাকে চিনতে অবশ্য অসুবিধে নেই— আমাব চেহাবা আব তাছাড়া সাইকেলেব পেছনে ছোট্ট একটা প্লেটে লেখা বয়েছে World Tourist From India।

দশ মিনিটেব মধ্যেই এসে পৌঁছলাম— চিকাগোব প্রায় প্রাণকেন্দ্র। এতক্ষণ আস্তে আস্তেই আসছিলাম। হঠাৎ গাড়ীটাব ভ্যাপো হর্ন বেজে উঠল, নগববক্ষী হাঁকিয়ে উঠল— তফাৎ যাও। গাড়ীটা এতক্ষণ বাস্তাব ধাব ধবে চলছিল, এখন সে বাস্তাব মাঝখানে। দু'পাশেব গাড়ীগুলোকে দু'পাশে কোন-ঠাসা কবে দিয়ে এগোতে লাগলো— ভাবটা এমন যেন বিবাট একটা প্রসেশনেব জন্য বাস্তা কবা হচ্ছে...আমি ঠিক ভাবতে পাবিনি যে, এবকমটা হবে, ব্যান্‌ডল্‌ফ স্ট্রীট আসতেই দু'পাশে দেখলাম এক বিবাট জনতাব ভীড়, সেই ভীড় ঠেলে বেবিয়ে এল একদল বিপোর্টাব— ক্যামেবা— মাইক্রোফোন— আমি আব এগোতে পাবলাম না।

পৃথিবীব অন্যতম কর্মব্যস্ত বোড এই মিচিগান এভেন্যু, আমাব জন্য সেই বিখ্যাত বাস্তায় প্রায় আধ ঘন্টাব মতো যান-বাহন চলাচল বন্ধ হয়ে গেল, আমাকে নিয়ে চললো ক্যামেবাব ক্যাবামতি আব বিপোর্টাবদেব প্রশ্ন আব পুলিশদেব কর্মতৎপবতা....। ঠিক এই ধবণেবই এক পবিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল আমি যখন পাব হই হামবুর্গ।

তাবপব বাস্তা থেকে উঠে এলাম ফুটপাতে— মালা ও ফুল হাতে সেখানে ইলিনয় ইউনিভার্সিটিব ছেলেমেয়েবা অপেক্ষা কবছিল, সেখানেই আলাপ হ'ল মিঃ পেবেবাব সাথে, বুঝলাম এইসব যাবতীয় বিসেপ্‌শনেব ব্যাপাবটা তিনিই কবেছেন; তাঁকে আমাব তবফ থেকে ধন্যবাদ দিলাম।

ভদ্রলোক আমাব সাথে আর্থাবেব পবিচয় কবিয়ে দিলেন। পবে জানলাম যে এই আর্থাবই এসব-কিছুব মূলে, দু'ঘন্টা সময়েব মধ্যে সে সবাইকে এখানে জড়ো হতে বলেছে। ভাবত সবকাবেব যাবতীয় পাবলিক বিলেশনেব কাজ সেই কবে। অবশ্য আর্থাব বিনীত জবাবে বলল— এ অনেকটা লাক,— অনেক সময় বিপোর্টাবদেব

শত অনুরোধ করেও আনা যায় না— আবার অনেক সময় সমান্য টেলিফোনেই সবাই এসে হাজির হয়...। যাই হোক, ফুটপাতের ওপরেই একটু ছোট-খাটো ইন্টারভিউর মতো করে সবাইকে তুষ্ট করে পেরেরার সাথে চলে এলাম ইণ্ডিয়ান ট্যুরিস্ট অফিসে। এই ট্যুরিস্ট অফিসই একাধারে ইণ্ডিয়ান কন্‌স্যুলেটও বটে। চিকাগো শহর দেখা ও থাকা সম্পর্কে একটা মোটামুটি সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম; আপাততঃ রামকৃষ্ণ মিশনে কয়েকদিনের জন্য থাকা যাবে। ফোন করে জানলাম যে, সেখানে স্বামীজী বৈশ্বানন্দজী বর্তমানে নেই, তবে তিনি তাঁর সহকর্মীদের আমার থাকা সম্পর্কে নির্দেশ দিয়ে গেছেন।

চিকাগো মূল শহর থেকে রামকৃষ্ণ মিশন বেশ দূর। চিকাগোর শহরতলীতে ছোট দোতলা বাড়ী। সাজানো-গোছানো, ভিতরে পূজার ঘর, ধ্যানের ঘর, ছোট একটা লাইব্রেরী এবং আরও ছোট-খাটো আলাদা আলাদা অনেকগুলো ঘর। দোতলার ওপর আমার থাকার বন্দোবস্ত হ'ল— টেবিল-চেয়ার, আলমারী, সুন্দর একটা ধবধবে বিছানা— আর বিছানার ঠিক ওপরেই অর্থাৎ মাথার কাছে মা সারদার একটি ফটো। সুন্দর ও পবিত্র পরিবেশ, একাধারে বিশ্রাম এবং প্রেরণা দুটোই পাওয়া যাবে।

পরের দিন বেরিয়ে পড়লাম চিকাগো শহর দেখতে। নিউ ইয়র্কের মতোই এখানেও স্কাই-স্ক্রেপার-এ ভর্তি, তবে তফাৎটা হচ্ছে এই যে, এখানে ইচ্ছে করলে লেকের ধারে এসে উন্মুক্ত আকাশ দেখা চলে, শ্বাসরুদ্ধ হ'বার সেই ভয়টা নেই। কিন্তু লেকের ধার থেকে একটু ভিতর দিকে এগোলেই ব্যস্— নিউ ইয়র্ক আর চিকাগো আমার কাছে সব সমান।

ইলিনয় প্রদেশের ওপর লেক মিচিগানের ধারে অবস্থিত আমেরিকার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। অনেকে এই চিকাগোকে বলে গমের-শহর। এই চিকাগোর আশ-পাশের এলাকায় যেসব খাদ্যবীজ মজুতের ঘর রয়েছে তা দেখে তো আমার চক্ষুস্থির! গম গম আর শুধু গমের পাহাড়— মনে হয় সম্পূর্ণ কলকাতার ওপর যদি এ গম ছড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলে সম্পূর্ণ শহরটাই ঢেকে যাবে। চিকাগোকে তাই অনেকে বলে কর্ন বেল্ট (Corn Belt)। গমের চেয়ে মনে হয় ভুট্টার সংরক্ষণ আরও বেশী, হাজার-হাজার কিলোর ব্যাপার নয়— এসব লক্ষ-লক্ষ টনের ব্যাপার। আর এর জমা-খরচের হিসাব চলেছে কম্‌পিউটারের সাহায্যে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্যজাত সামগ্রী প্রধান সংরক্ষণ হয় এই চিকাগোতে— এসব রিজার্ভারে। অধিকাংশ শহরতলীতে শাখা আছে, তবে তার লেনদেন সবই হচ্ছে এই শহর থেকে।

এছাড়া এখানে রয়েছে শুয়োর চাষের মূল ভিত্তি। দিনে লক্ষ-লক্ষ শুয়োর বেচা-কেনা হচ্ছে এই শুয়োরের বাজারে। পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম শুয়োরের বাজার। শুধু

বড় শুয়োরেরই ব্যাপার নয়, এরা ছোট শুয়োরের ব্যাপারীও বটে। দেশবিদেশে চালান দেওয়ার জন্য এরা সাধারণতঃ ছোট শুয়োর ব্যবহার করে।

আগে কি জানতেন যে শুয়োরের বাচ্চার এত দাম! এইসব আমদানি-রপ্তানির ব্যাপারে এই বৃহৎ লেকের দান অসীম। মিশরকে নীল নদীর দান বলা হয়— তেমনি চিকাগোকে আমি বলবো— এই বৃহৎ লেকের দান।

১৮৬১ সালে চিকাগোতে মাত্র পাঁচটা পরিবার ছিল। আর সেই পাঁচটা ফ্যামিলি থেকে শুরু করে আজ চিকাগোর লোকসংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় সাত মিলিয়ন, তার মানে সত্তর লক্ষ। এরমধ্যে অর্ধেক সংখ্যাই নিগ্রো অরিজিন।

আমি আগেই বলেছি যে আজকের আমেবিকানরা পঁচানব্বই ভাগই ইউরোপীয়ান। চিকাগোর অধিবাসীদের যদি আদি নিবাস খোঁজা হয় তাহলে দেখা যাবে যে এদের মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য ভাবসোভি, চেকোশ্লাভিয়া, জার্মানী, ইটালী, আয়ারল্যাণ্ডের অধিবাসী এবং ফরাসী। এরাই বলতে গেলে চিকাগোর গোড়াপত্তন করে। এদের নতুন উদ্যম, সাহস আর বুদ্ধিবলে আজ চিকাগো পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ আমদানি-রপ্তানি কেন্দ্র। আমেরিকার তো প্রাণকেন্দ্র বটেই। এখানকার খাদ্যবস্তু, সে প্রাণী বা উদ্ভিদ্‌জাত যাই হোক না কেন, পৃথিবীর বাজাব থেকে কুড়োচ্ছে— কোটি কোটি ডলার। খনিজ-কয়লা-ইলেকট্রিক এবং অন্যান্য বহু ইণ্ডাস্ট্রীতে এই চিকাগো শহর কর্মমুখব এবং সদাচঞ্চল।

পঞ্চাশ হাজার বড় ব্যবসায়ী, পঁচাত্তরটা বাণিজ্যকেন্দ্র এবং ন' হাজার পৃথিবীর খ্যাতমান পাইকারী ব্যবসায়ী এই চিকাগোতে, একবার কল্পনা করে দেখুনতো...। নিউ ইয়র্ককে দেখে ভেবেছিলাম সেটাই আমেরিকার প্রাণকেন্দ্র, কিন্তু এখানে এসে সে ধারণা পাল্টে গেছে। নিউ ইয়র্ক আমার মতে সেক্রেটারিয়েট আব এটা হচ্ছে তার কারখানা।

চিকাগো রেল জংসন— সেটাও একটা আশ্চর্য স্থান বটে, পৃথিবীর বৃহত্তম জংসন— অবশ্য আমার যতদুর মনে হয়। প্রতিদিনে চিকাগোতে এক হাজার সাতশ ট্রেন যাত্রীদের নিয়ে যাতায়াত করছে, দু'হাজার ট্রেন মাল সরবরাহ করছে। চিকাগো থেকে দৈনিক সত্তর মিলিয়ন টন মাল বাইরে বেরুচ্ছে। বুঝুন অবস্থাটা— আমাদের কলকাতার সাথে একবার এর তুলনা করে দেখুন। আমার কাছে চিকাগো একটা সম্পূর্ণ জগৎ, অর্থাৎ complete world. এখানে না আছে কি?

চিকাগোর মিউজিয়াম, একোয়ারিয়ম, এখানকার আর্ট ইন্‌স্টিট্যুট অফ চিকাগো (Art Institute of Chicago)— লোকে বলে এটা হচ্ছে জগতের সেরা আর্ট মিউজিয়াম, তার লাইব্রেরী এবং এখানকার আর্ট স্কুল জগৎ-বিখ্যাত।

চিকাগোতে আমি যত ঘুরছি ততই আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। সত্যিই আজব বটে আজব দুনিয়া এই চিকাগো। চিকাগোতে কয়লা খনির কর্মচারী থেকে আরম্ভ করে দার্শনিক পর্যন্ত সকলেরই যেন সমান অধিকার, সমান দান। এখানেই স্বামীজী তাঁর

ঐতিহাসিক চিকাগো বক্তৃতা দিয়ে, জগতের সব প্রাণই সেই মহাপ্রাণ থেকে এসেছে, সে কথা জগৎকে শুনিয়েছিলেন।

চিকাগো যদিও একটা বিরাট শহর তবুও তার মধ্যগত প্রাণকে বলা হয় "লুপ"— চারকোণা কয়েকটা বড় রাস্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ।

১৬৭৩ সালে দু'জন ফরাসী বণিক মঁসিও জলিয়ে ও মঁসিও মাবকেত স্থানীয় আবাসীদের কাছ থেকে বিঘাখানেক জমি কিনে নেন— চামড়ার ব্যবসা করাই হয়তো তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তাঁরা সে সময়কার উপজাতিদের কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলেন— এ জায়গাটা সত্যি চমৎকার, আমরা এখানে থাকতে চাই— তা জায়গাটার নামটা কি ভাই? উত্তরে স্থানীয় অধিবাসীরা বলেছিল শে-কাগ্-ওঙ (She-Kag-On)। সেদিনের সেই শে-কাগ্-ওঙ আজকের শিকাগো ফবাসী ভাষায় এবং ইংরেজীতে চিকাগো। ফরাসী ভাষায় Chi-শি, চি নয় কিন্তু। মে দিবসের উৎপত্তিও এই চিকাগোতে; ১৮৮৬ সালে এবং ১৮৯১ সালের ১লা মেতে যে সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয় তার থেকেই সৃষ্টি এই মে দিবস।

আমি রামকৃষ্ণ মিশনে আছি দুদিন যাবৎ; রোজ সকালে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে যাই, তারপর সারাদিন শহরটাকে দেখি। চিকাগো শহরেব অলিতে-গলিতে রয়েছে জানার জিনিষ, সে ভালো বা মনন্দ যাই হোক। চিকাগোর আব একটা জিনিষ জগৎ-বিখ্যাত। তা হচ্ছে এখানকার গ্যাংস্টার, সোজা বাংলায় যাকে বলে গুণ্ডার দল, নিউ ইয়র্ক এদেব কাছে একান্তই নাবালক ছেলে। আমার আমেবিকার বন্ধুগণ আশা করি আমার এই অভিমতের জন্য কিছু মনে করবেন না। কথাটা যদিও রূঢ় কিন্তু সত্যি বটে।

এখন কথা হচ্ছে যে— তাব প্রমাণ কি? আমি কিন্তু হিচ্ককের মতো গোয়েন্দাকাহিনী লিখতে বসিনি, নেহাৎ-ই আমার ভ্রমণ কাহিনী। অনেকে বলবেন, এখানকার মিউজিয়াম, এখানকার ইউনির্ভাসিটি, সবকিছু ট্যুরিস্টরা দেখতে পাচ্ছে, তাদের অবস্থিতিই তাদের প্রমাণ— যে কোনো লোকই তার সাক্ষী। এই চিকাগোতে কোন গুণ্ডামি এবং রাহাজানি কিছুই দেখিনি, তাই তার সাক্ষ্য দিতে পারবো না। একান্তই যদি কেউ আমাকে চ্যালেঞ্জ করে বসে তাহলে বলবো,— এখানকার যে কোনো দৈনিক পত্রিকা খুলে দেখুন— অনেকের মতে, খুন, রাহাজানি আর ব্যাংক ডাকাতির কথা যদি কাগজে না থাকে তাহলে সেদিনটাই যেন রিপোর্টারদের পক্ষে ফাঁকা দিন।

১৯২৮ সালের একদিন। সেন্ট ভ্যালেন্টাইন উৎসবের দিন। ফুটপাতের ওপর দিয়ে হাজার-হাজার লোক চলেছে, আর ঠিক সেই সময় সাতটা মেসিনগান হাতে সাতজন লোক হঠাৎ যেন ভুঁই ফুড়ে উঠলো। খুব ঠাণ্ডা মাথায় ঠাণ্ডা রক্তে জনসাধারণের পকেটের পয়সা, ঘড়ি আর মেয়েদের গহনা কেড়ে নিয়ে অতি ধীরে ধীরে উধাও হয়ে গেল— ভাবটা যেন এই যে রাজার রাজভাণ্ডারের জন্য কালেকসন করা হচ্ছে। —এটা অনেকদিনের পুরোনো কথা যদিও।

বিখ্যাত দস্যু আল্-কাপন এক সপ্তাহে রোজগার করতো প্রায় দশলক্ষ ডলার— হ্যাঁ, আবার বলছি দ-শ-ল-ক্ষ ডলার তার সাত দিনের রোজগার। অবশ্য পরে সে ধরা পড়ে। এ প্রসঙ্গে ডন্ চিলিংগের কথাও বাদ যায় না...। চিকাগো সম্পর্কে অনেক কিছু বলার আছে, কিন্তু আমি সবিশাদে যাবো না, তাতে অনেকটা এক-ঘেয়েমি আসতে পারে। তাই এখানকার মোটামুটি যেসব জিনিস আমার বিশেষ নজরে পড়েছে তারই কথা আমি লিখছি।

শহর ঘোরার পর রোজই আমি একবার করে মিঃ পেরেরার ওখানে দেখা করতে যাই। সেখানে আর্থার আমার যাবতীয় যোগাযোগের ব্যবস্থা করে। দৈনিক আমন্ত্রণ, সম্বর্ধনা এবং ব্যক্তিগত অভিনন্দন ইত্যাদিতো লেগেই আছে। আমি যতদূর সম্ভব ওদিক থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেবার চেষ্টা করি। কিন্তু কতগুলো ঘটনা কিছুতেই এড়ানো সম্ভব নয়। যেমন শিক্ষামূলক আন্তরিকতা অথবা যেখানে আমার ব্যক্তিগত বা আমাদের ভাবতীয় মর্যাদার সঙ্গে জড়িত সে সব যোগাযোগগুলো কিছুতেই ছাড়ি না।

চিকাগোতে আমার প্রচার যথেষ্ট হয়েছে। চিকাগো ট্রিবুন তো তার পাতায় ফলাও করে আমার কথা লিখেছে, তা ছাড়া— এ-বি-সি, সি-বি-এস ও অন্যান্য টেলিভিশনের মাধ্যমেও আমার বার্তা চারদিকে ছড়িয়েছে। এতটা আমি আশা করতে পারিনি; মিঃ পেরেরা নিজেও না। কি আর করা যায়? ঢাকে যখন কাঠি পড়েছে আমাকে নাচতেই হবে।

চিকাগো নাগরিক সম্বর্ধনাটাও তাই এড়াতে পারলাম না। সেখানেই আমি পরিচিত হই ডনের সাথে। ডন পঁচিশ বছরের তরুণ যুবক। ওর সাথে আমার বেশ মিল হয়ে গেল— ও পেশায় ছাত্র, ওকালতি পড়ছে। আমি চিকাগো শহরে একা-একা ঘুরছি জেনে ও নিজেই উপযাচক হয়ে এগিয়ে এল আমার সাথে ঘুরে আমাকে গাইড করার জন্য। ওর একটা ভালো সাইকেল আছে। তাছাড়া বছরখানেকের মধ্যে ও সাইকেলে উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা সফরে বেরোবে, কাজেই আমার কাছ থেকে ও এই সম্পর্কে কিছু জানতে চায়।

দেখতে দেখতে এর মধ্যে তিনদিন কেটে গেল। আমি ও ডন সেদিন ঘুরতে ঘুরতে মারিনা সিটিতে পৌঁছলাম। মারিনা সিটি যদিও মনে হয় আলাদা শহর কিন্তু আসলে তা নয়। মারিনা সিটি চিকাগো শহরেরই একটা অংশ। মিচিগান এভেন্যু ধরে সরাসরি পশ্চিমদিকে এগিয়ে এসেই পেলাম একটা খালের মতো "চিকাগো নদী"। সেদিকে নজর গেল— গোলাকৃতি দুটো আকাশচুম্বী প্রাসাদ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু কি আশ্চর্য— জানলা দরজা কিছু নেই— একতলা-দোতলা-তিনতলা করে প্রায় সব তলাতেই দেখি সারি সারি মটর দাঁড় করানো। একি স্বর্গের সিঁড়ি নাকি! ডন আমাকে বুঝিয়ে দিল যে এটাই মারিনা সিটির বৈশিষ্ট্য। প্রথম চৌদ্দ

তলার সবটাই গ্যারেজ আর তার ওপর ষাট তলা পর্যন্ত বসতি— অ্যাপার্টমেন্ট বা স্টুডিয়ো। আমি অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আবার জিজ্ঞেস করলাম— কত তলা গ্যারেজ?

—চৌদ্দ তলা গ্যারেজ।

সত্যি আশ্চর্য বটে! পৃথিবীতে শুনেছি অষ্টম আশ্চর্য হয়েই খতম হয়ে গেছে, কিন্তু আমি বলবো এই মারিনা সিটিও তার সঙ্গে যোগ করা যেতে পারে।

আমরা আরও এগিয়ে গেলাম। কাজ এখনও শেষ হয়নি কিন্তু এর মধ্যে এই প্রাসাদে ভাড়াটিয়া উঠে এসেছে। সরাসরি পাহাড়ী রাস্তার মতো ঘুরতে ঘুরতে ওপরে উঠে গেছে সেই চৌদ্দ তলা পর্যন্ত, যার যার নির্দিষ্ট করা জায়গায় গাড়ী পার্ক করে, তারপর ঠিক কেন্দ্রস্থলে রয়েছে লিফট— তাতে করে ওপরে যে যার নিজের ঘরে যেতে পারে। শোবার ঘরের দরজা পর্যন্ত লিফ্‌ট। সত্যি একেই বলে লিফ্‌ট! মারিনা সিটির আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে এখানকার পঞ্চাশ হাজার মধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহসমস্যার সমাধান করা। সম্পূর্ণ কাজ শেষ করতে লেগে যাবে প্রায় দশ বছর, ১৯৩৯ সালে শেষ হবে বলে মনে হচ্ছে।

ধন্য বটে আধুনিক বিজ্ঞান— বিশেষ করে আর্কিটেক্ট বারট্রাণ্ড গোল্ডভারগ্ (Bertrand Goldeberg)-কে বলতে হবে এ যুগের যাদুকর। মিঃ গোল্ডবারগ্ বার্লিনের মানুষ— তার মতে— "এ সময়টা হচ্ছে বিংশ শতাব্দীর— বিজ্ঞান আমাদের সেবা করতে বাধ্য— তবে তাকে ঠিকমতো কাজে লাগাবার ক্ষমতা থাকা চাই।"

কথায় কথায় সেদিন ডনকে জিজ্ঞেস করলাম, সে হুইটন্ জায়গা কোথায় বলতে পারে কি না। সঙ্গে সঙ্গে ও জবাব দিল— ওঃ তুই হুইটন্ ইলিনয়ের কথা বলছিস্? সে এখান থেকে মাইল কুড়ি হবে। আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম! অন্ততঃ একজনকে পাওয়া গেল যে আমাকে সঠিক বললো জায়গাটা কোথায়। অবশ্য ডন কোনোদিন সেখানে যায়নি।

আমি সরাসরি চলে এলাম রেলস্টেশনে। আমাদের কলকাতার মতো এখানেও বিভিন্ন দিকে যাবার জন্য বিভিন্ন স্টেশন। আমি সাইকেলটা সমেতই সেখানকার অনুসন্ধান অফিসে চলে এলাম। সেখানে খোঁজ নিয়ে জানলাম যে, এখান থেকে হুইটন্ ট্রেনে প্রায় চল্লিশ মিনিটের পথ, দোতলা ট্রেনগুলো খুব জোরে যায় না।

—দোতলা ট্রেন! আরেকবার অবাক হবার পালা। অনুসন্ধান অফিসের ভদ্রলোক আমাকে বললেন— কি হে, বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? চলে এসো আমার সাথে। প্ল্যাটফরমে এসে হাজির হলাম। সত্যি দোতলা ট্রেনেই বটে। ঠিক দোতলা বাসের মতো।

ভদ্রলোক আমার সাইকেলটা দেখে বললেন— সাইকেলের জন্য আলাদা লাগেজ টিকিট লাগবে।

আমি হেসে জবাব দিলাম— না, টিকিটের দরকার নেই, আমি সাইকেলেই যাবো। আমার কথা শুনে ভদ্রলোক হো হো করে হেসে উঠলেন। তিনি আমাকে

বুঝিয়ে দিলেন, চিকাগো থেকে বেরোতেই আমার ঘন্টা খানেক লেগে যাবে। ভদ্রলোক সত্যি ভালো। আমি বুঝলাম, নেহাৎ-ই সাহায্য করবার জন্য উনি আমাকে উপদেশ দিচ্ছেন— কাজেই আমাকে খুলে বলতেই হ'ল— আমার পরিচয়।

সব শুনে ভদ্রলোক আমাকে জড়িয়ে ধরলেন— তিনি আমার কথা কাগজে এবং টেলিভিশনে শুনেছেন, তারপর যা হয়— শুরু হ'ল আমাকে নিয়ে জটলা। তবে আমেরিকায় এই ধরণের জটলায় সুবিধে আছে। এখানেও তাই স্টেশন সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট মশায়তো আমাকে ছাড়তেই চান না। তিনি বললেন— সে কখনো হয়, অনেক হয়েছে বাবা! অনেক বাহাদুরী দেখিয়েছো, এইবার চলোতো আমার সঙ্গে। আমাদের বাড়ীতে থেকে মাসখানেক বিশ্রাম করতে হবে। ভদ্রলোক এমনভাবে আমাকে ধরলেন যেন ঠিক আমার ঠাকুরদা, আর অনেকদিনের পর তাঁর নাতিকে খুঁজে পেয়েছেন। তাঁকে অনেক অনুরোধ করে বোঝালাম যে, আমার থাকবার কোন অসুবিধা হচ্ছে না, আমি ঠিকই আছি, আমি হুইটনের আমার বন্ধুকে কথা দিয়েছি। সেখানে না গেলে ওরা খুবই চিন্তায় পড়বে এবং অসন্তুষ্টও হবে— ইত্যাদি কথা বলে এবং ভদ্রলোকের কাছে আবাব আসবো বলে প্রতিজ্ঞা করে কোনরকমে সেখান থেকে ছাড়া পেলাম। রাস্তায় এসে ভাবলাম— ওঃ বাঁচা গেল! পরের দিনই আমি রামকৃষ্ণ মিশন থেকে বিদায় নিয়ে হুইটনের পথ ধরলাম।

হুইটনে প্রফেসর বেক্‌টলের বাড়ীতে

চিকাগো থেকে বেরিয়ে আমি সেকেণ্ডারী রোড ধরে এগিয়ে চললাম। চিকাগো শহরতলীর ম্যাপটা পেয়েছি, কাজেই চলার অসুবিধা নেই। আমি আগেই বলেছি, আমেরিকার রাস্তার এটাই বৈশিষ্ট্য যে সেখানে শহর থেকে বেরিয়ে এলেই সঙ্গে সঙ্গে নিঃসঙ্গ। রাস্তায় লোক-চলাচল বলতে সবই গাড়ীর ব্যাপার। শ'য়ে-শ'য়ে হাজারে-হাজারে গাড়ী পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে, কাজেই কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে হলে হাত দেখিয়ে গাড়ী দাঁড় করতে হবে।

বুঝুন ব্যাপারটা! আমেরিকা মানেই কর্মব্যস্ত জীবন, একমিনিট সময় নেই— কাজেই হাত দেখালেই যে তারা থামবে তার কোন স্থিরতা নেই। ভাববে আমি হিচ-হাইকার, তাদের গাড়ীতে করে একটু এগিয়ে যেতে চাইছি, অথবা কেউ ভাববে অযথা তাদের হয়রাণি করবার জন্য থামতে বলছি।

এই দেখো— আমি আসল কথাটা বলতেই ভুলে গেছি। আমি শহরতলীর এই রাস্তায় কেন গাড়ী থামাতে চাইছি, চলতে চলতে হঠাৎ আমার সাইকেল চেনের একটা রিভেট্ খুলে গেছে। এ ঘটনা নতুন নয়— চলার পথে এসব ঘটনা নিতান্তই তুচ্ছ। তুচ্ছ বটে, কিন্তু আমার চলার পথে বাধা। পায়ের কাঁটার মতো। যত ছোটোই হোক না কেন আমাদের থামিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। চেনের রিভেটটাও তাই। ছোট একটা পিনের মতো জিনিস খুলে পড়ে গেছে। পরোয়া নেই— আমার সাইকেলের

পেছনে লটকানো আছে ছোট একটা টুলস্ বক্স। চামড়ার সেই বাক্সটার মধ্যে ছোট খাটো সব রকমের যন্ত্রপাতি আছে। সেটা খুলে দেখি— কি আশ্চর্য! ভেতরটা ফাঁকা, এমন কি সাইকেল মোছার সেই নোংরা ছেঁড়া ছোট্ট ন্যাকড়াটা পর্যন্ত হাওয়া। কে নিয়েছে— কোথায় গেছে চিকাগোর এই আজব শহরে সে প্রশ্ন না করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

তাই আমাকে গাড়ী থামাতে হচ্ছে— উদ্দেশ্য তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করা— এখান থেকে হুইটন্ আর কতদূর। ম্যাপটার মধ্যে অত ডিটেইলস্ নেই। আশ-পাশের পায়ে-হাঁটা বা সাইকেলে যাওয়া অন্য কাউকে চোখে পড়বে বলে মনে হয় না। অবশেষে একটা সেভ্রোলেত এসে থামলো। ভদ্রলোককে থামার জন্য বিশেষ ধন্যবাদ দিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম,

—এখান থেকে হুইটন্ আর কতদূর বলতে পাবেন? আমার সাইকেলের চেনটা ভেঙে গেছে তাই হেঁটেই যাবো, রাস্তাটা যদি আপনার জানা থাকে...

—নিশ্চয়ই— ভদ্রলোক হেসে জবাব দিলেন— তুমি আব একটু এগিয়ে ডানদিকে একটা জঙ্গল পাবে, তার মধ্য দিয়ে একটা ছোট্ট রাস্তা— মানে কাঁচা রাস্তা আছে। সে বাস্তা বরাবর গেলেই একটা ফারম্ আব ঠিক সেই ফারম্টার পেছন থেকেই শুরু হয়েছে হুইটন।

—আপনি দেখছি সবজান্তা— এখানেই থাকেন বুঝি? আমি যাবো হুইটন্ কলেজেব কাছাকাছি...

—ঠিক আছে— তুমি এ পথে গেলে খুবই সর্টকার্ট হবে, নয়তো এই রাস্তা আবার ঘুরে গেলে প্রায় ন'মাইল। তবে তোমার যদি ইচ্ছে হয় উঠে পড় আমার গাড়ীতে, আমিও সেদিকে যাচ্ছি।

—না, আপনার অফার-এর জন্য বিশেষ ধন্যবাদ, আমি হেঁটে যাওয়াই পছন্দ কার, তাতে এ জায়গা সম্বন্ধে মোটামুটি একটা আইডিয়া এসে যাবে। আপনার ডিরেক্সনের জন্য আবার ধন্যবাদ।

—নট অ্যাট্ অল্—বায়—ভদ্রলোক তাঁর পথ ধরলেন।

ভদ্রলোকের ডিরেক্সন ফলো করে আমিও রাস্তা ধরলাম। প্রায় আধঘন্টার মধ্যে আমি এসে পৌঁছলাম হুইটন্। হুইটন্কে দেখে মনে হ'ল সত্যি মনোরম। চারিদিকে গাছ-গাছড়া; বাড়ীগুলো একটা থেকে আরেকটা অনেক তফাতে। প্রত্যেকটা বাড়ীর সামনে বাগান ফুলে-ফলে ঢাকা। দোতলা তিনতলা বাড়ীগুলো দেখে মনে হচ্ছে যেন শান্তির নীড়। একটা বাগানে ন'দশ বছরের একটা মেয়েকে দেখে জিজ্ঞেস করলাম—

—এখানে ইউনিভারসিটি প্লেসটা কোথায় বলতে পারো?

—নিশ্চয়ই— এই রাস্তা ধরে এগিয়ে যান। হুইটন্ কলেজের কাছাকাছি।

—চমৎকার! ধন্যবাদ।

আমি জানি প্রফেসার বেক্‌টেল— হুইটন্‌ কলেজের ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান,— কাজেই তাঁকে খুঁজে বার করতে অসুবিধা হবে না। মেয়েটা ঠিকই বলেছে, ওর কথামত আমি ঠিক হুইটন্‌ কলেজের সামনে এসে পড়লাম। সেখানে একজন ভদ্রলোক দেখছি একটা কুকুর নিয়ে খেলা করছেন— তাঁকে প্রফেসরের ঠিকানা জিজ্ঞেস করতেই তিনি হাসিমুখে আমাকে এগিয়ে দিলেন, তারপর আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন— ওই যে দেখছেন সাদা দোতলা বাড়ীটা চারিদিকে হেজ্‌ দিয়ে ঘেরা, ওইটাই হচ্ছে প্রফেসর পি-এম বেক্‌টেলের বাড়ী।

পকেটে অনেকদিনের ময়লা রুমালটা বের করে মুখের ঘামটা মুছে নিলাম। রাস্তার কল থেকে ঢক-ঢক করে বেশ খানিকটা জল পান করে নিজেকে প্রস্তুত করে নিলাম— প্রায় তিনি বছর আগেকার দেখা সেই মহামান্য ফুলব্রাইট স্কলারের সঙ্গে মুখোমুখি হবার জন্য। ইস্তাম্বুলেব কথা মনে পড়ে— সত্যই তিনি পদে ও মর্যাদায় একজন কেউকেটা ছিলেন বটে। আমি ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম।

বাড়ীর সামনে একটা কাঠের গেট। বাড়ীটা সত্যিকারের একটা সাজানো বাংলো। গেটে কোন কলিং বেল দেখতে পেলাম না; কাজেই গেটের লক খুলে ভেতরে ঢুকলাম। বাগানে একটা মালী কাজ করছে। তার দিকে এগিয়ে জিজ্ঞেস করলাম,

—আশা করি এটাই প্রফেসর বেক্‌টেলের বাড়ী।

—হ্যাঁ।

—প্রফেসর কি এখন বাড়ী আছেন'' আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

—বাড়ীর পেছনে আছেন, আপনি ইচ্ছে করলে সেখানে যেতে পারেন।

আমি সাইকেলটাকে গেটের ওখানে রেখে ছোট লনের কাঁকর বিছানো রাস্তা ধরে এগিয়ে চলতেই চোখে পড়লো— একজন ভদ্রলোক তারের ওপর জামা-কাপড় রোদে দিচ্ছেন— তাঁর পায়ের কাছে বালতিতে বিরাট কাপড়ের বোঝা। তাঁর দিকে এগিয়ে জিজ্ঞেস করলাম,

—প্রফেসর বেক্‌টেলের সাথে আমি দেখা করতে চাই।

—কেন? ভদ্রলোক আমার দিকে না তাকিয়েই জিজ্ঞেস করলেন।

—আমার সাথে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয়— তাঁর সাথে আমি কিছুক্ষণের জন্য কথা বলতে চাই।

ভদ্রলোক এবার হাতের প্যান্টটা তারের সঙ্গে ক্লিপ দিয়ে এঁটে আমার দিকে তাকালেন। তারপর অনেকটা বিস্ময়ানন্দে বললেন—

—বিমল না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ— প্রফেসর আমাকে জড়িয়ে ধরলেন।

—আমি জানি তুমি আসবে।

তারপর তিনি চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলেন—

—মেরী—মেরী—দেখে যাও কে এসেছে!

মেরী প্রফেসরের স্ত্রী। সাদা গাউনের ওপর অ্যাপ্রণ পরে মেরী ছুটে এলেন। আমাকে চুমু দিয়ে বললেন,

—আমি জানি তুমি আসবে, তোমার চিকাগো আগমন সংবাদ আমরা পেয়েছি, কিন্তু তোমাকে আমরা টেলিফোন করিনি, ভেবেছিলাম তুমি চিকাগোতে খুবই ব্যস্ত।

মিনিট পাঁচেকের মতো কথা বলে, মেরী চলে গেলেন ঘরের ভেতর, ওর অনেক কাজ। প্রফেসরও আমাকে একটু অপেক্ষা করতে বলে তারে কাপড় মেলা কাজটা আবার শুরু করলেন। তিনি একটার পর একটা ভিজে কাপড় তারের ওপর মেলতে লাগলেন। আমি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তারপর জিজ্ঞেস কবলাম,

—আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি কি?

—ইফ ইউ লাইক।

আমি তাঁকে সাহায্য করতে লেগে গেলাম। আমি বালতি থেকে একটার পর একটা জামা তাঁর হাতে তুলে দিচ্ছি, আর তিনি সেগুলো তারের ওপর মেলে দিচ্ছেন।

আমি একটু আশ্চর্য হলাম বৈকী। আশ্চর্য মানে— আমার বাঙালী মন, আমি ভাবছি কই আমাকে তো তিনি ঘরে যেতে অথবা বসতে বলছেন না— এমন কি আমি যে এতটা রাস্তা প্যাডেল চালিয়ে এসেছি তারজন্য এক কাপ চা বা ভদ্রতা কিছুই নেই দেখছি। এমনকি আমার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে যে যার নিজের কাজ করে যেতে লাগলেন। অবশ্য আমি জানি যে এত তাড়াতাড়ি এবং সহজে মানুষকে যাচাই করা ঠিক নয়। তাই আমি ওঁদের দেখে যেতে লাগলাম।

হঠাৎ লণ্ডনের একটা ঘটনা মনে পড়লো— কথায় কথায় দাশগুপ্তবাবু বললেন,— কি করবো বলুন, আমরা দু'জন মানুষ— তিনটে মাত্র ঘর, আপনাকে রাখার জায়গা কোথায়?

অবশ্য এখানে আমার অবস্থাটা একটু আলাদা— প্রফেসর আমাকে থাকতেও বলছেন না— যেতেও বলছেন না। যাই হোক, আমি তাঁদের সঙ্গে টুকিটাকি কাজ করতে লাগলাম।

বেলা প্রায় তিনটের সময় আস্তে আস্তে যে যার কাজ গুটিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে নিলেন। এর মধ্যে আমার কেবলমাত্র প্রফেসার বেক্‌টেল ও তাঁর স্ত্রী মেরীর সাথেই আলাপ হয়েছে, কিন্তু বাকী কারও সাথে দেখা হয়নি, অন্ততঃ তাঁর ছেলে স্টীভকে তো আমি ভালোভাবেই চিনি, আর দু-মেয়ে সুজী ও পাম-এর সাথেও আমার যথেষ্ট আলাপ ছিল। আমি এখানে এসে পৌঁছেছি প্রায় বারোটার সময়— এখন বাজে তিনটে। এর মধ্যে প্রফেসর কাপড় শুকোতে দেওয়া, গাড়ী পরিষ্কার করা

থেকে আরম্ভ করে বাগানে ময়লা ফেলার পাত্রকে রঙ করা পর্যন্ত সব কাজগুলোই ঠিক-ঠাক মতো করেছেন। আমি অবশ্য এতক্ষণ তাঁর সাথেই ছিলাম। কাজের বিষয় ছাড়া আমার ভ্রমণের ব্যাপারে কোন কথাই হয়নি।

প্রায় সাড়ে তিনটের সময় প্রফেসরের সাথে আমি তাঁর বৈঠকখানা ঘরে ঢুকলাম। বিরাট ঘর সাজানো-গোছানো ও দামী কার্পেটে মোড়া। বৈঠকখানা ঘরের সাথেই আরও দুখানা ঘর। একটা খাবার ঘর আর একটা ঘর টেলিভিশন দেখবার জন্য। খাবার ঘরে বিরাট ডাইনিং টেবিল, তার চারিদিকে দামী কিং লুইস চেয়ার পাতা। টেবিলের ওপর শরবৎ, ফল ও অন্যান্য টুকিটাকি খাবার সরঞ্জাম।

প্রফেসরের সাথে ঘরে ঢুকতেই তিনি আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন—ওয়েলকাম টু আওয়াব হাউজ অ্যাণ্ড মেক ইওরসেল্ফ্ ইজি (Welcome to our house and make yourself easy)। মেরী আমার দিকে এবার একটু ঝুঁকে পড়লেন,

—সত্যি, তুমি শেষ পর্যন্ত আমাদের ভোলনি দেখছি— ওঃ সেই কতদিন হ'ল ইস্তাম্বুল ছেড়েছি! তারপব বল কোথায় কোথায় গেলে, কিভাবে কাটালে এতদিন। আমরা তো সুযোগ পেলেই তোমার কথা বলি।

—আগে বিমলেব জন্য কফি করে আন, তারপর কথা হবে। প্রফেসর এরমধ্যে মেরীকে অর্ডাব দিয়ে বসলেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন,

—আপাততঃ তোমার যাওয়ার কোন প্রোগ্রাম নেই তো?

—না। আপনাদের এখানে আসার পোগ্রাম ছিল, এখন এখানে— এর পরের কথা কিছু জানি না।

এতক্ষণে আমি নিশ্চিন্ত হ'লাম— এখন আমি অনেকটা সহজ হয়ে এসেছি। আরও সহজ হবাব জন্য প্রফেসরকে জিজ্ঞেস করলাম,

—ঘন্টা তিনেক হ'ল আমি এসেছি অথচ আপনাদের নির্লিপ্ততা দেখে ভেবেছিলাম যে, আজ বিকেলেই আমাকে রওনা দিতে হবে। সত্যি কথা বলতে কি— আপনাদের হাব-ভাব দেখে ভেবেছিলাম যে আমি আপনাদের কাছে যেন একটা ভার।

—এই দেখ, প্রফেসর গলায় আন্তরিকতার সুর মিশিয়ে বললেন,

—তুমি গ্লোব ট্রটার, এই ধরণের অভিযোগ কিন্তু তোমার মুখে সাজে না। আজ হচ্ছে শনিবার, প্রত্যেক শনিবার আমাদের বাড়ীর কাজে সবাই ব্যস্ত। বাসন ধোয়া, কাপড় কাচা, গাড়ী পরিষ্কার করা, বাগানের হেজ কাটা, নতুন গাছ লাগানো, রঙ করা, ঝাঁট দেওয়া, কার্পেট ঝাড়া, এসব হচ্ছে আমাদের শনিবারের কাজ। তুমি এসে পড়েছো ঠিক আমাদের কাজের মাঝখানে— তুমিই বলো কি করে হাতের কাজ ফেলে তোমার সাথে গল্প করি,— অবশ্য আমি দেখেছি তুর্কিরা একটু আলাদা ধরণের। লোকজন এলেই ব্যস— আর কথা নয়, সবকিছু ফেলে দিয়ে গল্প করতে বসে গেল। —অনেকটা কৈফিয়ৎ দেবার মতো করে তিনি বললেন। আমি মনে মনে বললাম— শুধ তুর্কীরা নয় আমরাও বটে— কিন্তু প্রকাশ্যে বললাম,

—কিছু মনে করবেন না— আমি এটা ঠিক বুঝতে পারিনি, আমার কাছে এটা একটা বিরাট শিক্ষা। বাগানে আর একজন যিনি কাজ করছিলেন তিনি এসে হাজির— প্রফেসর তাঁর সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন।

—এ হচ্ছে ল্যারী, আমার বড় ছেলে।

—আমি তোমার সাথে পবিচিত হয়ে খুশী হ'লাম— আমি করমর্দন করতে করতে বললাম।

ল্যারীকে আমি এই প্রথম দেখছি প্রফেসরের সাথে। ও ইস্তাম্বুলে ছিল না, কাজেই বাগানে ওকে দেখে ভেবেছিলাম মালী বা অন্য কেউ হবে। দেখতে শুনতে সুপুরুষ, তবে মুখে মোটেই হাসি নেই। ইতিমধ্যে কফি ও বিস্কুট এসে হাজির— তার সাথে কিছু বাদামও বটে। হঠাৎ মনে পড়লো— তাইতো, সাইকেলটাকে আমি গেটের কাছে রেখে এসেছি। আমি প্রফেসরকে বলে সাইকেলটার জন্য উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় মেরী বললেন,

—ওর জন্য তোমাব চিন্তা কবতে হবে না, ওটা গ্যারেজে আছে।

—কিন্তু আমার মালপত্রগুলো?

—সে তোমার ঘবে।

—আমার ঘবে? আমি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস কবলাম।

—হ্যাঁ, দোতলায় তোমার জন্য একটা ঘর ঠিক করা হয়েছে, কফিটা শেষ কর, তারপর তোমাকে আমাদের সব ঘর ঘুবিয়ে দেখাবো।

মেরীর সাথে বাড়ীটা ঘুরে-ফিরে দেখতে লাগলাম। নীচের তলায় রান্নাঘর, বৈঠকখানা, প্রফেসরের লাইব্রেরী ও পড়াব ঘর, টেলিভিশন, টেপরেকর্ড ও গ্রামোফোন ভর্তি একটা ঘর, একটা স্টোর রুম। মাটির নীচে দুটো বিরাট হলঘর। তারমধ্যে একটি অনেকটা ছোটখাটো লোহালক্কড়ের দোকানের মতো, মেরামতি করাব যাবতীয় যন্ত্রপাতিতে ভর্তি; আর একটায় বারান্দার দু'পাশে বিভিন্ন ঘর, প্রফেসর ও তাঁর স্ত্রীর ঘর, চার ছেলেমেয়েদের জন্য চারটি ঘর। তা ছাড়াও রয়েছে এক্সট্রা দুটো ঘর; তারই মধ্যে একটা আমার জন্য ঠিক করা হয়েছে। টয়লেট বাথরুম ওপবে নীচে দু'জায়গাতেই আছে। মোটামুটি বেশ বড় বাড়ীই বলতে হবে।

চারদিক ঘুরে আমরা আবার বৈঠকখানা ঘরে এসে বসলাম— তারপর কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করলাম—

—স্টীভ, প্যাম ও সুজীকে তো দেখতে পাচ্ছি না, ওরা কেমন আছে?

—ভালোই, ধন্যবাদ। মেরী জবাব দিলেন, প্রফেসর তাঁর কথার সুর টেনে বললেন,

—প্যাম ও সু (সুজীর সংক্ষেপে নাম) গেছে সাঁতারের ক্লাবে, ওদের এখন আসবার সময় হয়ে গেছে। তবে স্টীভ এখানে নেই, ও সম্প্রতি "ড্রপ্ আউট" করেছে। ও যে এখন কোথায় আছে ঠিক জানি না— তবে মাস তিনেক আগে

ওর একটা চিঠি পেয়েছিলাম। তাতে লিখেছে যে ও এখন ক্যারোলিনায় থাকবে। ও এখন কি করছে কিছুই আমাদের জানা নেই।

প্রফেসর একটা হাঁপ ছাড়লেন।

—তবে তুমি যখন এসেছো— আমার মনে হয় স্টীভকে আবার ঠিক পথে বসানো যাবে— মেরীর উক্তি।

—অবশ্যই, তবে স্টীভ যদি এ সংবাদ জানে তবে তো! প্রফেসরের কথা শুনে আমি জিজ্ঞাসা করলাম,

—আপনাদের কথা শুনে মনে হচ্ছে যে, আমি যেন স্টীভকে ঠিক পথে আনতে পারি— কিন্তু প্রশ্ন করতে পারি কি— আপনাদের এ ধরণার উৎপত্তিটা কোথায়?

প্রফেসর কিছুক্ষণ ভেবে জবাব দিলেন,

—হ্যাঁ তার কারণ আছে বৈকি! তিন বছর আগে যখন স্টীভ তোমাকে প্রথম দেখে ও প্রথম আলাপ হয় তখন থেকেই লক্ষ্য করেছি যে তোমার আদর্শ ও পথকে ও দারুণ শ্রদ্ধা করে...

—ধন্যবাদ। আমি থামিয়ে দিলাম প্রফেসরকে, বুঝলাম স্টীভ এখনও আগের মতোই আছে। ল্যারী আমার দিকে ঝুঁকে বললো—

—তুমি ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হও না?

—ক্লান্তি! কোন ধরণের?

—ক্লান্তি আবার অনেক রকম হয় নাকি?

—নিশ্চয়ই— ক্লান্তি হয় মানসিক অথবা শারীরিক।

—দুটোই।

—আমার মতে মানসিক ক্লান্তি আসে একঘেয়েমি থেকে। আমার চলায় একঘেয়েমি নেই, তাই ক্লান্তিও নেই। আর যদি বল দৈহিক ক্লান্তি। অবশ্যই আমরা মানুষ, আমাদের শরীর বিভিন্ন ধাতুতে গড়া— তার যখন অভাব ঘটে তখনই ক্লান্তি আসে; অত্যধিক পরিশ্রম করলে স্বভাবতই দেহটা একটু বিশ্রাম চায়। তবে সে কখনই স্থায়ী নয়।

—দেখছো কি চমৎকার উত্তর— প্রফেসর তাঁর মতামত জানালেন।

আমি জানি প্রফেসর আমাকে ভালোবাসেন— কাজেই আমার কথাও তাঁর ভালো লাগবে বৈকি। কিন্তু আমার জবাবে ল্যারী খুশী হ'ল কিনা বোঝা মুশকিল। ল্যারী আরও কিছুক্ষণ আমাদের সঙ্গে গল্প করে তারপর বেরিয়ে গেল। খানিকক্ষণের মধ্যেই গেটের সামনে একটা ক্রিস্‌লার গাড়ী এসে দাঁড়ালো। সবাই দেখি সেদিকে ঝুঁকে পড়লো। মেরী ও প্রফেসর দু'জনেই আমাকে সেদিকে আকর্ষণ করলেন। গাড়ী থেকে বেরিয়ে আসছেন দু'জন সুন্দরী যুবতী। আহা-মরি রূপ, সত্যি সুন্দরী বটে...।

মেরী আমাকে জিগ্যেস করলো —চিনতে পারছো বিমল?

—না, ঠিক মনে পড়ছে না।

প্রফেসর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন— প্যাম ও সুজী। ওরা এখন অনেক বড় হয়েছে, তাই না?

—অবশ্যাই। শুধু বড়ই নয়, সুন্দরীও বটে।

মেরীর কানে কথাটা যেতেই তিনি মিচকি হেসে বললেন— চুপ! ওরা এসে পড়েছে, কিছু বলো না আগে।

দরজায় ঢুকেই দু'জনে থ'কে দাঁড়ালো— আমার দিকে বেশ ভালোভাবে নজর দিয়ে তারপর বিরাট বিস্ময়ে দু'জনে চেঁচিয়ে উঠলো—

—ই-উ বিমল?

—অফ কোর্স আই অ্যাম— আমি জবাব দিলাম। ওরা ছোট হলে একটু এগিয়ে গিয়ে চুমু দিতাম— বড় হলেও গালে অথবা হাতে চুমু দিয়ে শুভেচ্ছা জানাতাম। কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে দুটো সম্ভ্রান্ত আমেরিকান যুবতীর প্রতি কোন ধরণের শিষ্টাচার শোভা পাবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। প্যাম ছোটজন এগিয়ে এসে আমার গালে গাল লাগিয়ে একটা চুমু দিল আব দেখতে দেখতে সু-ও। —অনেকদিন পর দাদার সাথে দেখা হলে যা করতে হয়। বুঝলাম— এখন থেকে আমি ওদের বাড়ীরই একজন।

এই হ'ল হুইটনে প্রফেসর ফ্যামিলির সাথে আমাব সাক্ষাৎ। প্রফেসব বেক্টেলের সাথে আমি প্রথম পরিচিত হই ইস্তাম্বুল ইউনিভার্সিটিতে। সেখানে তিনি এক বছরের জন্য ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে ছিলেন। সেদিনকার কথা আমি কোনোদিন ভুলবো না।

ইউনিভার্সিটিতে একটা ভাষণ দিতে গিয়ে তাঁর সাথে আলাপ। ভাষণের শেষে তিনি আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন যে, আমার হাতে যদি কিছু সময় থাকে তাহলে তিনি আমাকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে যেতে চান। সঙ্গে সঙ্গে আমিও বাজি হয়ে গেলাম। সেখানেই তাঁর পরিবারের সাথে আমার পবিচয়। তাঁর ছেলে স্টীভ আমাকে অনুরোধ করেছিল তার ঘরে যাবার জন্য— তারপর তার ঘরে ঢুকতেই দেখি দেয়ালের ওপর লট্কানো একটা খবরের কাগজ। সে আমাকে ভালোভাবে কাগজটা পড়তে অনুরোধ করলো— আরও কাছে গিয়ে কাগজের ওপর নজর দিলাম— সাইকেল সমেত একজন পরিব্রাজকের ছবি, আর তার ঠিক নীচেই লেখা রয়েছে "Globe Trotter Bimal Dey"— তুরস্কের ইংরেজীতে প্রকাশিত একমাত্র সংবাদপত্র ডেইলি নিউজ-এর একটা ক্লীপিং।

বুঝলাম, স্টীভ পর্যটনকে ভালোবাসে।

তারপর আরও অনেকদিন স্টীভকে দেখেছি, আস্তে আস্তে আমাদের পরিচয় বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছে। স্টীভ আমার থেকে সাত বছরের ছোট; কিন্তু মনে প্রাণে এখনই যেন যুবক। ও আমাতে যতটা সম্মান করে তারচেয়ে আমি ওকে আরও অনেক বেশী ভালোবাসি। কেন ঠিক জানি না, ওকে বারবার দেখে আমার যেন মনে হয়েছে আমি নিজেকেই দেখছি। ইস্তাম্বুলে বস্ফরাসের ধারে বসে ও প্রায়ই উদাস হয়ে যেতো, কল্পনা করতো পরপারের আরও, আরও দূরের মানুষদের। একদিন সে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল,

—তোমার যদি পয়সা না থাকে তাহলে ওপারে যাবে কি করে?

—ওপারে যদি আমার একান্তই যাবার প্রয়োজন হয় তাহলে একটা উপায় হয়ে যাবেই।

স্টীভ আমার দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল।

—তোমার কথাটা আমি ঠিক বুঝলাম না বিমল।

—ইচ্ছাশক্তি। ইচ্ছাশক্তিতে সবকিছু হয়, তবে সেই ইচ্ছাটা যেন আমার শক্তির মধ্যে থাকে। —আমি তাকে বোঝাতে চেষ্টা করি।

কিন্তু ওর ওই আমেরিকান মগজে আমার এই ভারতীয় ইচ্ছাশক্তির তত্ত্ব কিছুতেই প্রবেশ করছিল না। শেষ পর্যন্ত ওর বাবা অর্থাৎ প্রফেসরের শরণাপন্ন হতে বাধ্য হয়েছিলাম। এমনি করেই তাঁদের সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। অবশ্য সেখানে আমি তাঁদের সাথে ছিলাম না— আমি ছিলাম অন্য একজন তুরস্কীয় ডাক্তারের বাড়ীতে। সে সময়ই প্রফেসর ও তাঁর পরিবারের সকলে বিশেষভাবে আমাকে তাঁর বাড়ীতে যাবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। তবে আমি বলেছি ~~মম্বন্ত~~ জানি না—আমেরিকা এখন দূর। যদি সেখানে কোনদিন যাই অবশ্যই আপনাদের ওখানে উঠবো।

আজ তাই আমি এখানে...।

ধর্ম

আমি আমেরিকায় এসেছি বেশ কয়েকমাস হয়ে গেল। অধিকাংশ সময়ই কেটেছে উঠতি-বয়সীদের সাথে, তাদের কমিউনিটিতে, ইউথ হোস্টেলে— অথবা ক্যাম্পিং-এ। আমেরিকানদের অনেক পরিবারের সাথে পরিচিত হয়েছি বটে, কিন্তু তাদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেশার সুযোগ হয়ে ওঠেনি। প্রফেসর বেক্‌টেলের বাড়ীতে আমার সেই সুযোগ হয়ে উঠলো, কাজেই এঁদের সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে যতটা জানতে পেরেছি তারই কিছুটা সংক্ষেপে জানাচ্ছি। নতুন কিছু সংবাদ বা তথ্য পরিবেশন আমার উদ্দেশ্য নয়— এদের দৈনন্দিন জীবনের একটা রূপ দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য।

পরের দিন ছিল রবিবার। আমেরিকানরা সাধারণতঃ প্রটেস্টান্ট; প্রফেসর পরিবারও। সকালবেলা চা কফি টোস্ট সিরিয়াল, কমলালেবুর রস ইত্যাদি যার যা খাবার খেয়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম— চার্চে যেতে হবে ন'টার মধ্যে। রবিবার প্রফেসরের বাড়ীর সবাই চার্চে যায়, তাদের সাথে আমার যাওয়া ঠিক হ'ল।

স্যু, লারী ও আমি একটা গাড়ীতে উঠলাম, অন্য গাড়ীতে প্রফেসর, মেরী ও প্যাম। প্যামকে জিজ্ঞেস করলাম— এটা কি তোমার গাড়ী?

—না, এটা ড্যাডের পুরোনো গাড়ী, আমি সবে ড্রাইভিং শিখেছি, কাজেই ড্যাড বলেছে হাত পাকা না হলে নতুন গাড়ী না কেনাই ভালো।

ল্যারীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম— তোমারও কি এরকম পুরোনো গাড়ী আছে?

—নিশ্চয়ই, তবে আমার গাড়ীটা ছোট, বড় গাড়ী অনেক তেল খায়— খরচ অনেক।

গাড়ীটার ভিতবে বসে ও চারপাশে তাকিয়ে মনে হয় না যে এটা পুরোনো, তবে মাইল-মিটারের দিকে তাকালেই একমাত্র বোঝা যায় যে এটা অনেক ঘুরেছে।

খানিকক্ষণের মধ্যেই আমরা চার্চের সামনে এসে দাঁড়ালাম: চার্চের ভিতরটা বিরাট। কম করেও দু'হাজার পাঁচশো লোকের একসঙ্গে বসা চলে। বিরাট হ'লঘরের আশে-পাশে আরও অনেকগুলো ছোট ছোট ঘর, ওগুলো সানডে স্কুলের জন্য। অনেকটা পার্টিশন করা ঘরের মতো। আমি প্রফেসর ও মেরীর সাথে ওদের ক্লাসে যোগ দিলাম। সানডে স্কুল মানে ধর্মসম্পর্কে বিভিন্ন আলোচনা-চক্র। দু-তিনজন বক্তার পর প্রফেসর সকলের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমিও তাঁদের আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানালাম।

প্রায় একঘন্টা পরে সবাই এসে মিলিত হ'লাম আর একটা বিরাট হলঘরে— সেখানে শুরু হ'ল সমবেত প্রার্থনা। এদের পুরোহিতকে বলা হয় প্যাস্টর— নেক্‌টাই পরা একজন চট্‌পটে লোক। ক্যাথলিকদের ক্ষেত্রে অবশ্য আলাদা পোষাক।

গান-বাজনা ও বক্তৃতার মাধ্যমে ভগবান খৃষ্টের গুণগান করা হয়। আমরা ওখান থেকে বেরোলাম আরও একঘন্টা পরে। সানডে স্কুলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য আলাদা বন্দোবস্ত। ছোটদের জন্য বিভিন্ন রিক্রিয়েশনের বন্দোবস্ত আছে। সেখানে তাদের খেলাধুলা থেকে আরম্ভ করে যীশুখৃষ্টর সম্বন্ধে খেলাচ্ছলে বা গল্পের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়। স্যু এই ধরণের একটি ক্লাসের কেয়ারটেকার— এক কথায় বলা চলে সুন্দর ব্যবস্থা। তবে এইখানে একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করলাম— যে, এখানে ধর্মকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চর্চাও চলে। যাই হোক, সে ওদের ব্যাপার, সেখানে আমার নাক না গলানোই ভালো।

চার্চ থেকে বেরোতেই স্যু-এর সাথে দেখা; ও আমাদের জন্য বাইরে অপেক্ষা করছিল। ল্যারী ওখান থেকে অন্য এক জায়গায় চলে গেছে— আমি, প্রফেসর

ও প্যাম এক গাড়ীতে আর একটা গাড়ীতে মেরী ও স্যু আলাদাভাবে রওনা দিলাম। প্রফেসর আমাকে হুইটন্ শহরটা ঘুরিয়ে দেখাতে লাগলেন। হুইটনে শুধু একটাই চার্চ নয়— কম করেও ছোট বড় মিলিয়ে একুশটা। তার মধ্যে পাঁচটা চার্চের পৃথিবী জোড়া নাম। পৃথিবীর বিভিন্ন কোণে তার শাখা-উপশাখা রয়েছে। কোটি কোটি টাকা তাদের বাজেট। যদিও সবগুলো প্রটেস্ট্যান্ট, কিন্তু তাদের মধ্যেও অনেক ভাগ। তবে ও ব্যাপারে জানতে হলে আমাকে আরও অনেকদিন এখানে থাকতে হবে। আমি বিশেষ আগ্রহ্ সহকারে সে সব দেখতে লাগলাম— প্রত্যেকটি চার্চই চমৎকারভাবে সাজানো গোছানো। প্রফেসর আমাকে একটু দূরের বাংলোর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন— ওই যে বাড়ীটা দেখছো— ওটা হচ্ছে থিওসফিক্যাল সোসাইটি। ওর প্রিন্টিং এবং ওভারসিজের যাবতীয় যোগাযোগ সব এখানকার মাধ্যমেই হয়।

হুইটন্ শহরটা আমার সত্যি ভালো লেগে গেছে। চিকাগোর এত কাছে, অথচ সবই বিপরীত। এখানে একটাও স্কাই-স্ক্রেপার নেই। একমাত্র স্টুডেন্ট হোস্টেলটা পাঁচ তলা, তা ছাড়া প্রায় সব বাড়ীগুলোই বড় জোর দোতলা। আর প্রত্যেকটা বাড়ীই চারদিকে বিরাট বিরাট গাছ দিয়ে ঢাকা, আর সামনে পিছনে চমৎকার লনের উপর সাজানো বাগান— যেন ইন্দ্রপুরীতে এসে পড়েছি। সত্যি প্রশংসা না করে পারা যায় না। যত দেখছি ততই মুগ্ধ হচ্ছি, তাই প্রফেসরের দিকে তাকিয়ে বললাম,

—সত্যি এত সুন্দর এই হুইটন্ শহর, আমি কিন্তু কিছুতেই ভাবতে পারিনি।

—ধন্যবাদ বিমল, হুইটন্‌টা সত্যিই সুন্দর। জানো, ১৯৫৭ সালে এই শহরটাকে আমেরিকার অন্যতম সুন্দর সু-শৃঙ্খল শহর বলে পুরস্কৃত করা হয়েছিল!

—আমার অনুমান তাহলে মিথ্যে নয়।

হঠাৎ গাড়ীটা ঘুরে গিয়ে ছোট্ট একটা বাড়ীর সামনে দাঁড়ালো; আমি ভাবলাম হয়তো গাড়ীর তেল ফুরিয়েছে। কিন্তু তা নয়, প্রফেসর গাড়ীর জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে একটা চেক ছোট, একটা মেশিনে ফেললেন— মেশিনটা অনেকটা ছোট পেট্রোল পাম্পের মেশিনের মতো। সঙ্গে বেরিয়ে এল কিছু ডলার ও চেঞ্জ। আমাকে ওদিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে দেখে প্যাম্ বললো,

—ওটা অটো ব্যাংক— কত টাকা লাগবে চেকে লিখে সেটা মেশিনের ওই পকেটে ফেলে দেবার সাথে সাথে দূরে অপারেটারের কাছে সেটা চলে যায়, আর সে সঙ্গে সঙ্গে চেকটা ভাঙিয়ে ডলার পাঠিয়ে দেয়। মেশিনের সাথে ছোট একটা মাইক্রোফোনও রয়েছে, ইচ্ছে করলে কথা বলা যাবে। প্যাম্ থামল— সাথে সাথে প্রফেসর জুড়ে দিলেন,

—এই ব্যাংকের সুবিধে হচ্ছে যে এখানে গাড়ী থেকে নামতে হয় না আব চব্বিশ ঘন্টাই এটা খোলা থাকে। গাড়ীতে পেট্রলের দরকার হলে এ ধরণের একটা গ্যাস স্টেশনও আছে, সেখানে মেম্বার কার্ডটা দিলেই কত দাম হলো সেটা রেজিস্টার হয়ে যায়, দামটার জন্য ওরা পরে বিল পাঠায়।

—তা ঠিক; আমি এই ধরনের গ্যাস স্টেশন ইউরোপে দেখেছি, কিন্তু অটো ব্যাংক এই-ই প্রথম দেখলাম।

প্রফেসর আবার গাড়ীতে স্টার্ট দিলেন। প্রফেসর আমার দিকে ঝুঁকে বললেন,

—তোমাকে একটা কথা বলি বিমল— আমরা, অর্থাৎ আমেরিকানরা নিজেদের প্রথম নামটাই ব্যবহার করি, যেমন তোমার নাম বিমল দে, ডাকি বিমল, ঠিক তেমনি তুমিও পল বলে ডাকতে পারো, প্রফেসর বলার কোন দরকার নেই।

—ধন্যবাদ, সেটা আমি জানি, কিন্তু আমার কাছে আপনার নাম ধরে ডাকা, সেটা আমাদের দেশীয় মতে বেয়াদপি। আপনি প্রথমতঃ বয়োজ্যেষ্ঠ, দ্বিতীয়তঃ পূজনীয় প্রফেসর। আপনাকে প্রফেসর ডাকার মধ্যে একটা পূজ্যভাব অথবা শ্রদ্ধাভাব জড়িয়ে আছে। আমাকে ক্ষমা করবেন, আমি ঠিক আপনাকে আমার মনের ভাবটা গুছিয়ে বলতে পারবো না।

—আমি জানি এটা অনেকটা সেন্টিমেন্টের ব্যাপার। আমি যখন প্যারিসে ছিলাম তখনও দেখেছি ছাত্র-ছাত্রীরা আমাকে কিছুতেই পল বলে ডাকতে রাজি হয়নি। আমার মনে হয় এটা সত্যি চমৎকার— বড়োদের প্রতি ছোটদের আস্থা ও সম্মানের প্রতীক। কিন্তু এখানে এই আমেরিকায় আমরা সে সব এটিকেট্‌কে খুব সহজ করে ফেলেছি।' আমাদের এখানে সবাই সবাইকে নাম ধরে ডাকে।

—তা ঠিক, এখান থেকে যেই ফ্রান্সে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে ভাবটাকেও তো পালটাতে হবে, শুধু স্থান পালটালে চলবে কেন। আপনাদের ইংরেজীতে কোন অসুবিধে নেই, সব সময় শুধু ইউ "You", কাজেই ইউর সাথে ডাক নামের প্রচলন করলে অসুবিধার কিছুই নেই। কিন্তু ফরাসী ভাষায় তু—ও— ভু (তুই ও আপনি)-র সাথে সাথেই আসছে সম্মানের ব্যাপার, তাই সেখানে আনতে হচ্ছে মঁসিও (Monsieur)। এবার জার্মানী অথবা আমাদের দেশের কথায় আসা যাক— সেখানে তুই, তুমি ও আপনি, তিনি রকমের সম্বোধন। অবশ্য এ-সব কিছু নির্ভর করছে সে দেশের সংস্কৃতি ও ভাষার ওপর। অত কথায় কাজ কি— সংক্ষেপে বলছি আপনি যাই মনে করুন না কেন, আমি কিন্তু আপনাকে প্রফেসর বলেই ডাকবো। কিন্তু আপনার স্ত্রীকে আমি নাম ধরেই ডাকবো...

গাড়ী এসে থামলো প্রফেসরের গেটের সামনে। প্যাম্‌ মেয়েটি কথা কম বলে বটে, কিন্তু ভারিক্কি নয় মোটেই— বাগানের দিকে তাকিয়েই চেঁচিয়ে উঠলো,

—ড্যাড দেখ, মম্‌ মনে হয় হাম্‌বুর্গার তৈরী করছে, ওঃ আমার যা ক্ষিদে পেয়েছে!

হ্যামবুর্গার আমেরিকার নামকরা রুচী সম্মতখাদ্য। এর বাংলাটা কি বলবো, মাংসের বড়া বললে ঠিক হবে না, বলা যাক মাংসপিণ্ডের বড়া। গরুর মাংসকে কিমার মত কুচো করে তাতে একটু আটা ও কিছু নুন ছিটিয়ে দিয়ে একটা বড় খোঁকার মত করা হ'ল। এইবার তাকে সরাসরি কাঠকয়লার ওপর রেখে রোস্ট করা। বিভিন্ন

প্রদেশে এর সামান্য এদিক-ওদিক ঘটে বটে, কিন্তু মূলতঃ এই হচ্ছে হ্যাম্‌বুর্গার। হ্যাম্‌বুর্গার কখনও বাড়ীর ভিতর করা হয় না। ধোঁয়ায় অথবা চর্বিতে আসবাবপত্র নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাই বাগানে তার বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

মেরী আমার দিকে এগিয়ে এল, হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলো— তুমি কি এখনও আগের মতো নিরামিষ খাও নাকি?

—না, আমি নিরামিষাসী কোনোদিনই ছিলাম না, তবে আমি বরাবরই টাট্‌কা জিনিসের পক্ষপাতী— আর দ্বিতীয়তঃ, আমি মাংসের থেকে সব্‌জিটাকে পছন্দ করি বেশী, তবে আমার জন্য চিন্তা করবেন না। জানেন তো আমি ভবঘুরে, সব কিছুই আমার চলে। তা ছাড়া আপনার হাতের রান্না— সে তো আমার সৌভাগ্য...।

রবিবার দিন দুপুর ও বিকেলটা আমাদের খাওয়া-দাওয়া, গল্পগুজব ও হৈ-চৈ করেই কাটলো। অনেক প্রসঙ্গ, অনেক প্রশ্ন আর আলোচনাও হ'ল প্রচুর।

সন্ধ্যের পর আমরা সকলে বাগান থেকে বৈঠকখানা ঘরে উঠে এলাম। প্রফেসর, মেরী, আমি, স্যু ও পাম্‌ সবাই গোল হয়ে বসেছি আলোচনা-চক্রে। স্যু এই বছর কলেজে ঢুকেছে আর প্যাম্‌ ক্লাশ টেনে পড়ছে। প্রফেসরের সাথে সাথে তারাও ঘুরেছে প্রচুর, তাই তাদের জিজ্ঞাসাও অনেক। স্যু'র বয়স সতেরো বছর, বব্‌ কাট চুল, চুলের রঙটা কালো— দোহারা চেহারা, সুন্দর মিষ্টি মুখ, দেখলেই মনে হয় বেশ চালাক, কিন্তু অতি সরলা।

প্যাম্‌ পনেরো বছর, লম্বায় পাঁচ ফুট, হঠাৎ দেখলে মনে হয় একজন সু'বেশা যুবতী, কিন্তু মুখের দিকে নজর পড়লেই বোঝা যায়, এ একটা নিতান্তই কচি মেয়ে। লম্বা চুল, চুলের রঙ ব্লনড্‌। মুখটা দেখলেই মনে হয় আদুরে— সাদা রঙের ওপর লাল টুক্‌টুক্‌ করছে গালটা।

মেরীর বয়স যদিও অনেক, কিন্তু মেক-আপে মনে হয় যেন যুবতী। প্যাম্‌ ওর মার মতোই অনেকটা দেখতে। প্রফেসর অবশ্য সাদাসিধে সহজ মানুষ।

মেরী ঘরের যাবতীয় কাজ নিয়ে ব্যস্ত। বাড়ীতে ঝি-চাকর কেউ নেই, কাজেই এই বিরাট সংসারের গুরু দায়িত্ব তাঁর মাথার ওপরে। তা ছাড়াও তাঁকে বাইরে যেতে হয় কাজ করতে। তিনি একটা ইন্টারমিডিয়েট স্কুলের লাইব্রেরিয়ান। দিনে চার ঘন্টা কাজ। তা ছাড়াও রয়েছে সেলাই-এর ক্লাশ ও ফরাসী ভাষার ক্লাশ। এ দুটো ক্লাশে তিনি নিজেই ছাত্রী। তাঁর প্রধান হবি হচ্ছে লেখা। মহিলা বিভাগের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তিনি শিক্ষামূলক প্রবন্ধ লেখেন।

প্রফেসর বেক্‌টেল— তিনি হুইটন্‌ কলেজের অন্যতম চেয়ারম্যান। তিনি পড়ান কন্‌টেম্‌পোরারি আমেরিকান লিটারেচার। তা ছাড়াও তাঁকে কলেজের অনেক অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেটিভ কাজ করতে হয়। সপ্তাহে তিন-চারটে নতুন বই-এর মুখবন্ধ অথবা ইন্‌ট্রোডাক্‌সন তাঁকে লিখতে হয়। তাছাড়াও আছে বিভিন্ন এডিটিং-এর কাজ। অবশ্য তাঁর হবিও লেখা। প্রফেসরের সাথে প্রথম আলাপে মনে হয় তিনি তাঁর বই-এর

জগতের বাইরের কিছু জানেন না। কিন্তু একটু অন্তরঙ্গতা হলেই বোঝা যায় যে, যে কোন সাব্‌জেক্ট-এই তাঁর জ্ঞান অসীম।

গোলচক্রে আমাদের কথাবার্তা শুরু হ'ল। প্রফেসর বললেন— আমাদের এই ঘরোয়া বৈঠকে বিমলের প্ল্যান সম্পর্কে আলোচনা করা যাক, কি বলো— এই বলে প্রফেসর সকলের দিকে তাকালেন, তারপর একে একে সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন,

—তুমি, স্যু-প্যাম্‌-মেরী তোমাদের যার যার নিজস্ব প্ল্যান যদি কিছু থাকে জানাবে।

মেরী কাগজ পেন্সিল নিয়ে বসলেন, তারপর তিনি একে একে সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন কি কি নোট করতে হবে।

প্রফেসর আরম্ভ করলেন— এক নম্বর হচ্ছে,— মেরী, তুমি নোট করছো তো...হ্যাঁ বলছিলাম— প্রথম বিষয় হচ্ছে— এই বলে প্রফেসর আমার দিকে তাকালেন।

—তুমি খুলে বলো তোমার আর্থিক সমস্যা কিছু আছে কি না।

—না, আপাততঃ সে রকম কোন সমস্যা আমার নেই— আমি জানালাম।

—আমি একদিন ওকে আমাদের কলেজে নিয়ে যেতে চাই, সেখানে একটা বক্তৃতার আয়োজন করা যাবে— স্যুর প্রস্তাব।

সঙ্গে সঙ্গে প্যাম্‌ জানালো,

—আমাদের স্কুলেও একদিন আসতে হবে কিন্তু— আমাদের স্কুলের সবাই ওকে টি-ভিতে দেখেছে।

—ঠিক আছে, নোট কর মেরী— প্রফেসর বললেন। প্রায় একঘন্টা ধরে আমাদের প্রোগ্রাম ঠিক করা হ'ল। প্রফেসরের নির্দেশে মেরীই আমার পাবলিক রিলেশনের কাজ করবেন। যাবতীয় যোগাযোগ ও সাবজেক্ট ম্যাটার সিলেকশনের ভারও রইল তাঁরই ওপর।

লেখা শেষে মেরী পড়তে লাগলেন—

মোটামুটি পনেরো দিনের মতো লাগবে এই প্রোগাম শেষ করতে। দু'দিন মেরীর লাইব্রেরীতে, একদিন স্যু'র কলেজে, একদিন প্যামের স্কুলে। একদিন সানডে ক্লাশে। একদিন ওয়াই-এম-সি-এ,— তিনদিন বাড়ীতে তিন দলের পার্টি। প্রফেসরের জন্য বরাদ্দ রইল চারদিন, আর বাকী দুদিন হাতে রাখা হ'ল— বাই চান্স এর মধ্যে যদি অন্য কোন পার্টি এসে পড়ে।

মেরী কাল থেকেই সব ঠিক-ঠাক করতে লেগে যাবেন, ফোন করে সময়, দিন ও জায়গা ঠিক করে নেবেন। বুঝলাম আমাকে নিয়ে এই পরিবারটির একটা নতুন ব্যস্ততা এগিয়ে আসছে— তাই তাদের কাজের যাতে ব্যাঘাত না ঘটাই তারজন্য অনুরোধ করলাম,

—শুনুন, আমাকে নিয়ে আপনারা মোটেই ব্যস্ত হবেন না। আমি আপনাদের বিরক্ত করতে চাই না, আপনাদের দামী সময় আমার জন্য অপচয় করবেন না— তাতে আমি সত্যি অস্বস্তি বোধ করবো...।

—না, এটা শুধু তোমার জন্যই নয়, এটা আমাদের আনন্দ— আর তোমার মতো একজনকে আমাদের মাঝে পাওয়া গর্বেরও বটে।

—এক্স্‌কিউজ মি মেরী— প্রফেসর তাঁর সাথে যুক্ত করলেন— তুমি অনেক দেখেছো, অনেক জেনেছো, তুমি কি চাও না যে তোমার এই অভিজ্ঞতার থেকে এখানকার সকলে লাভবান হোক! তুমি এরজন্য চিন্তিত হয়ো না, আমরা সব ব্যবস্থা করছি।

—শুধু তাই নয় ড্যাড, আমি কলেজের সব বন্ধু-বান্ধবদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি যে বিমল হুইটনে এলেই আমি তাকে আমাদের কলেজে নিয়ে আসবো— স্যুজির উক্তি।

—তোমার চিকাগো পৌঁছানোর খবর এখানকার সবাই জানে। রেডিও, টেলিভিশন, খবরের কাগজের মাধ্যমে তা খুব ভালভাবেই প্রচারিত হয়েছে। তোমার সাথে যোগাযোগের জন্য ইণ্ডিয়ান ট্যুরিস্ট অফিসে অনেকবার টেলিফোনও করেছিলাম, কিন্তু সব সময়ই তারা বলে তুমি খুব ব্যস্ত অথবা তুমি সেখানে নেই...

—আমাকে ক্ষমা করবেন, আমারই টেলিফোন করা উচিত ছিল— এই বলে মেরীকে থামিয়ে দিলাম। —যাই হোক, আসল কথা হচ্ছে যে আমি শেষ পর্যন্ত আপনাদের এখানে এসে পৌঁছেছি— আপনাদের এতগুলো মনের টানে আমি আসতে বাধ্য।

যাই হোক, তাঁদের আমি বিশেষভাবে অনুরোধ করলাম যাতে প্রেস না ডাকা হয়। প্রফেসর হেসে উঠে বললেন— এখানে প্রেসের প্রয়োজনও নেই, সানডে-স্কুলই প্রেসের চেয়ে অধিক জনপ্রিয়।

পরিশেষে তাদের ওপর আমি নিজেকে সঁপে দিলাম, বললাম— অল্‌রাইট, আই ফাইনালি সারেন্‌ডার টু ইউ। ঠিক হ'ল, মাসখানেকের আগে আমি ওখান থেকে নড়ছি না। আমারও এই শহরটাকে বেশ ভালো লেগে গেছে, আর তাছাড়া এদের কাছ থেকে অনেক কিছু জানাও যাবে।

শিক্ষা

পরের দিন দশটায় প্রফেসরের সঙ্গে তাঁর কলেজে এলাম— একতলা ও দোতলা ধরণের আলাদা আলাদা বাড়ী। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বাগানে একটাও কাগজ ফেলা নেই— কলেজ বিল্ডিং-এর দেয়ালে নেই এতটুকু ময়লা, বিজ্ঞাপনের জন্য রয়েছে আলাদা বোর্ড অথবা নোটিশ বোর্ড। প্রফেসর কলেজের অন্যান্য প্রফেসর ও ডাইরেক্টরের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন; চলার পথে তাঁর জানাশোনা ছাত্র-ছাত্রীদের সাথেও বটে।

ঘন্টাখানেক পরে প্রফেসরের সাথে আমি এলাম কলেজ ক্যান্টিনে। প্রফেসরারও এখানে আসেন চা-জলখাবার খেতে। আমরা একটা বড় টেবিলকে ঘিরে বসলাম— প্রায় সাতজন প্রফেসর ও পাঁচ-ছ'জন ছাত্র ও তিনজন ছাত্রী। সকলের সাথে আমি পরিচিত হ'লাম। এই ক্যান্টিনটা সেলফ্-সার্ভিস। একজন প্রফেসর উঠে গিয়ে বিরাট একটা ট্রেতে করে অনেকগুলো 'চা' নিয়ে এলেন— আমরা সবাই তাঁকে বিশেষ ধন্যবাদ দিয়ে এক এক করে নিয়ে নিলাম।

আমেরিকার এই বৈশিষ্ট্যটা আগেও লক্ষ্য করেছি। ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে প্রফেসরদের সম্বন্ধ ঠিক যেন বন্ধু-ভাব। একটুকু জড়তা নেই, নেই কোন সংকোচ।

সেদিন সারাদিনটাই প্রফেসরের সাথে সাথে কাটালাম। তিনি যখন ক্লাসে যান আমিও তাঁর সাথে যাই। তিনি যখন লেক্‌চার দেন আমি তখন ছাত্রদের সাথে বসে শুনি। তাঁর বক্তৃতার ধবণই আলাদা— তাঁর লেকচার শুনে মনেই হয় না যে তিনি পড়াচ্ছেন— যেন সংলাপ। প্রফেসর ও ছাত্র-ছাত্রীদের আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে নতুন জ্ঞান-সম্ভার। প্রথম দিনের ক্লাশে মনে পড়ে প্রফেসরের একটা উক্তি— We are all the creators of the knowledge— we have to create it to have it. সত্যি কি অপূর্ব! জ্ঞানের সৃজনীশক্তি আমাদের সকলের ভিতরেই রয়েছে, তাই জ্ঞানকে সৃষ্টি করতে হবে, তারপর তার থেকে লাভবান হতে হবে। আমেরিকার শিক্ষা জগৎ সত্যি চমৎকার। আমি জানি না এটা জগতের সেরা কিনা। শিক্ষার ডেফিনিশনও আমি দিতে চাই না, তবে স্কুল, কলেজ ও ইউনিভারসিটির মাধ্যমে যে জাগতিক জ্ঞান এরা বিত্‌রণ করছে, বলতেই হবে সেটা যেন তার শিখরে। তাদের এই শিক্ষা জগৎটা দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। আর তারই জন্য এগিয়ে চলেছে এদের শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, সব কিছু। এই তো সেদিন তৈরী হ'ল প্লেন আর এরই মধ্যে তার গতি চাঁদ ছাড়িয়ে ভেনাস গিয়ে পৌঁচেছে।

আমি যতই দেখছি ততই অবাক হয়ে যাচ্ছি। ভাবলে অবাক হতে হয়, ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দে মাসাচুসেট্‌স্-এ প্রথম যখন আমেরিকার মাটিতে ইউরোপীয়ানদের সেটল্‌মেন্ট হয়, তখন তারা তাদের সন্তানদের শিক্ষা দেবার জন্য বিরাট এক চিন্তায় পড়ে যায়। কারণ সে সময় তারা সবে মাত্র আগন্তুক। থাকবার মতো কোন রকম একটা কাঠের বাড়ী ঠিক কবা গেল। বস্তুতঃ সেই সময়কার সদ্য ইউরোপ থেকে আসা লোকদের মধ্যে কোন একটি ভাষা ছিল না। কেউ হল্যাণ্ডবাসী, কেউ ইংল্যাণ্ডের, আবার কেউ ফরাসী। তাদের সাথে রয়েছে স্প্যানিস ও ইটালীয়ান। ভাষার কথা বলতে গেলে বলা যায় একটা জগা-খিচুড়ীর ব্যাপার।

আমেরিকায় যখন থাকতেই হবে তখন একটা ভাষা চাই-ই চাই, ভাষা ছাড়া সমাজ অচল। অনেক আলাপ-আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কের পর ঠিক হ'ল, ইংরেজী ভাষাটাই রাখা ভালো। এখানকার আদিবাসীদের সংগে চলতে হলে চাই একটা মিলিটারী

ভাষা। ফরাসী ভাষাটা একান্তই ক্লাসিক, তাতে কবিতা লেখা চলে বটে কিন্তু শোষণ করা চলে না। কাজেই ভাষার জন্য চাই স্কুল। তাই সেখানে তৈরী হ'ল বিলেতের ধাঁচে টাউন স্কুল। লণ্ডন থেকে শিক্ষক আনা হ'ল সেই স্কুলে শিক্ষা দেবার জন্য। সেই সময়কার সিলেবাস ছিল— ইংরেজী লেখা-পড়া ও অংক করা আর সেই সাথে ধর্ম। তার কয়েক বছর পরে অপেক্ষাকৃত বড় শহরে স্থাপন হ'ল গ্রামার স্কুল— গ্রামার স্কুলের কাজ হচ্ছে ছেলেমেয়েদের হায়ার এডুকেশনের জন্য তৈরী করা।

১৬৩৬ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হ'ল হারভার্ড ইউনিভারসিটি (Harvard University)। ১৬৯৩ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হ'ল উইলিয়াম ও মেরী ইউনিভারসিটি।

এইভাবে দেখতে দেখতে বেড়ে চলল শিক্ষার মান। আজ আমেরিকার চারদিকেই রয়েছে স্কুল, কলেজ আর ইউনিভারসিটি আর তার থেকে প্রতি বছরে বেরোচ্ছে প্রায় পঁচাত্তর লক্ষ ছেলে-মেয়ে। অবশ্য এর মধ্যে বিদেশীর সংখ্যা প্রচুর। অবশ্য হবে নাই বা কেন— এখানে শিক্ষার সুযোগ অনেক বেশী। কেউ যদি সত্যিই শিক্ষিত হতে চায় তারজন্য ব্যবস্থাও অনেক। প্রধানতঃ শিক্ষার জন্য যেটা প্রয়োজন তা হচ্ছে অর্থ— ডলার। এখানকার সব পাবলিক স্কুলই ফ্রি। ক্লাশ ওয়ান থেকে আরম্ভ করে গ্রাজুয়েট পর্যন্ত পড়াশুনার জন্য কোন পয়সাই লাগে না। কমিউনিটি বা স্টেট্ গভর্ণমেন্ট তার বন্দোবস্ত করে— আর সে টাকা আসে সাধারণ মানুষের ট্যাক্সের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে বলাই বাহুল্য যে যুক্তরাষ্ট্রে ট্যাক্সের মাত্রা খুব চড়া। হায়ার এডুকেশনের জন্য যদিও অর্থের প্রয়োজন কিন্তু তা সংগ্রহের উপায়ও অনেক।

সাধারণতঃ বছরে পাঁচশ সাতশ ডলারের মতো আয়ে থাকার জন্য হোস্টেলের খরচা প্রায় ছ'শ ষোল ডলার। স্টেট ইউনিভারসিটিতে সব সময়ই সস্তা। প্রাইভেট ইউনিভারসিটিতে চার্জ আরও বেশী— এটা হচ্ছে মোটামুটি হিসেব।

এই টাকা সংগ্রহের জন্য অনেকে পার্টটাইম কাজ করে— কেউ স্কলারশিপ পায়, আবার অনেকে লোন নেয়। তবে অভিভাবকদের কাছ থেকে সাধারণতঃ হায়ার এডুকেশনের জন্য কেউ টাকা চায় না। পড়ার জন্য গভর্ণমেন্ট এডুকেশন লোন দেয়— অনেক সময় এ লোনের জন্য কোন ইন্টারেস্ট দিতে হয় না। এ ছাড়াও রয়েছে কয়েক-শ সমাজসেবী-সংস্থা, ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্যের জন্য তারা সব সময়ই প্রস্তুত।

এমন অনেক প্রাইভেট অরগানাইজেশন আছে যারা বছরে এক হাজার ডলার স্কলারশিপ অফার করেছে। এহেন অবস্থায় এরা এগোবেই বা না কেন! কোন কোন রাজ্যসরকার এসব দিকে দারুণ হুশিয়ার। ক্যালিফোর্নিয়া এসব দিকে খুব উন্নত। এখানকার বাসিন্দাদের জন্য ইউনিভারসিটি এডুকেশন পর্যন্ত ফ্রি। এমতাবস্থায় ওদের পড়াশুনা হবে নাই বা কেন?

আমেরিকায় শিক্ষাকে মোটামুটি তিনভাবে ভাগ করা যায়— এলিমেন্টারী, সেকেণ্ডারী এবং হায়ার এডুকেশন। নার্সারী স্কুল থেকে আরম্ভ করে ডক্টরেট পর্যন্ত যদিও ইউনাইটেড কিংডমের সাথে প্রচুর মিল কিন্তু তার মধ্যে গরমিলও অনেক। সেটাকে পরিষ্কার করার জন্য পরের পাতায় The United States and British System of Education-এর একটা চার্ট দেওয়া হ'ল।

কয়েকদিনের মধ্যেই হুইটনের প্রফেসরের বাড়ী আমার অফিস হয়ে উঠল। মেরী ইতিমধ্যে চারদিকে যোগাযোগ করে আমার যাবতীয় অ্যাপয়েন্টমেন্ট ঠিক্-ঠাক্ করে ফেলেছেন, আমার সব কিছু এখন ছঁকে বাঁধা।

বাড়ীর দোতলার ওপর আমি আমার জিনিসপত্র ছড়িয়ে বেশ যুৎসই করেই বসলাম— এখান থেকে কবে যাবো তার ঠিক নে । ৭মই

মেরী একসময় পাব্‌লিক রিলেশনের একটা কোর্সও নিয়েছেন, কাজেই এসব দিকে তাঁর হাত পাকা। আমি শান্ত ছেলের মতো তাঁর কথা শুনি অর্থাৎ তাঁর কথামত চলি।

প্রফেসরের কাজটা খুব কাছে— ওখানে আমাকে ঘন ঘন যেতে হয়। প্রফেসরের বন্ধু-বান্ধব ছাত্র-ছাত্রী প্রভৃতির জন্য আমাকে অনেকখানি সময় দিতে হয়। যখনই যাই, সবাই আমাকে ঘিরে ধরে— তাদের হাজারো প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে আমার অবস্থা মাঝে মাঝে সত্যি কাহিল। শেষে এমন অবস্থা হ'ল যে হুইটন্ কলেজের চত্বরে আমি একটা দর্শনীয় বস্তু হয়ে উঠ্‌লাম। প্রফেসর তো একদিন আমার সামনে দুটো ছাত্রকে ধরে ফেললেন— ক্লাশে না গিয়ে আমার সাথে দিব্বি গল্পে মশগুল!

বাধ্য হয়ে আমি মেরীকে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্টের একটু অদল-বদল করতে অনুরোধ করলাম।

ঠিক হ'ল মেরীর স্কুলে যাওয়া যাবে— যদিও মেরী এখন কয়েকদিনের ছুটিতে— কিন্তু আমার জন্য তাঁকে বিশেষ পোগ্রাম করতে হ'ল।

মেরী অর্থাৎ প্রফেসরের স্ত্রী— আমি আগেই বলেছি যে, তিনি লাইব্রেরীয়ান— একটা এলিমেন্টারী স্কুলের। তাঁর স্কুলে ছ'বছর থেকে চোদ্দ বছরের ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা করে।

এই স্কুলের লাইব্রেরীয়ানদের দায়িত্ব অনেক, মেরীর সঙ্গে তাঁর স্কুলে এসেই সেটা বুঝতে পারলাম। আগে ভেবেছিলাম— বইএর লেন-দেন ছাড়া লাইব্রেরীয়ানদের করবার কি-ই বা আছে?

মেরীর রোল্‌স্‌রয়েসে চেপে কুড়ি মিনিটের মধ্যেই চলে এলাম ওঁদের স্কুলে। একতলা একটা বাংলো বাড়ীর মতো। স্কুলের চারদিকের লন সবুজে ঢাকা। লনের পাশেই একটা বিরাট পার্ক— চারদিকে গাছ দিয়ে ঘেরা। বাইরের থেকে বোঝাই যায় না যে এর মধ্যে এত বড় একটা পার্ক লুকিয়ে আছে।

স্কুলের ভিতরে ঢুকতেই কয়েকটা ছেলেমেয়ে গুড মর্ণিং মেরী বলে আমাদের স্বাগতম জানালো। মেরীর বয়স কম করেও ছেচল্লিশ বছর আর এইসব ছেলে-মেয়েদের বয়স বড় জোর দশ-বারো বছর হ'বে। মেরীর নাম ধরে ওদের ডাকতে শুনে আমার ভারতীয় মনে একটু খোঁচা লাগলো বৈকি— কিন্তু কি আর করা যায়, যস্মিন দেশে যদাচার। আস্তে আস্তে আরও কয়েকজনের সাথে পরিচয় হ'ল— তাদের কথাবার্তায় বুঝলাম যে মেরীর বাড়ীতে আমার আগমন এখানে সবাই জানে।

এবার আমরা এসে পৌঁছলাম মেরীর লাইব্রেরীতে, দেখে তো আমি অবাক! একটা এলিমেন্টরী স্কুলের লাইব্রেরী, সেও এক বিরাট ব্যাপার। চারদিকের দেওয়ালে ঠাসা বই-এর আল্‌মারী— কত হাজার হবে কে জানে। তার সাথে ছোট ছেলেমেয়েদের ইন্‌ডোর গেম্‌সের ঘর ও তার সরঞ্জাম। ম্যাপ্‌, এনাটমি ইন্‌সেক্টস্‌, সব কিছুর এক বিপুল সম্ভার। তা ছাড়াও রয়েছে হাতে-গড়া কুটীর শিল্প জাতীয় একটা ছোটখাটো প্রদর্শনী।

মেরীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম— এই সব কিছুই কি আপনার লাইব্রেরীর মধ্যে পড়ছে?

—অবশ্যই, এ সব কিছুই সরাসরি আমার তত্ত্বাবধানে।

—এসব দেখে মনে হচ্ছে যে আপনার দায়িত্ব অনেক, তাই না?

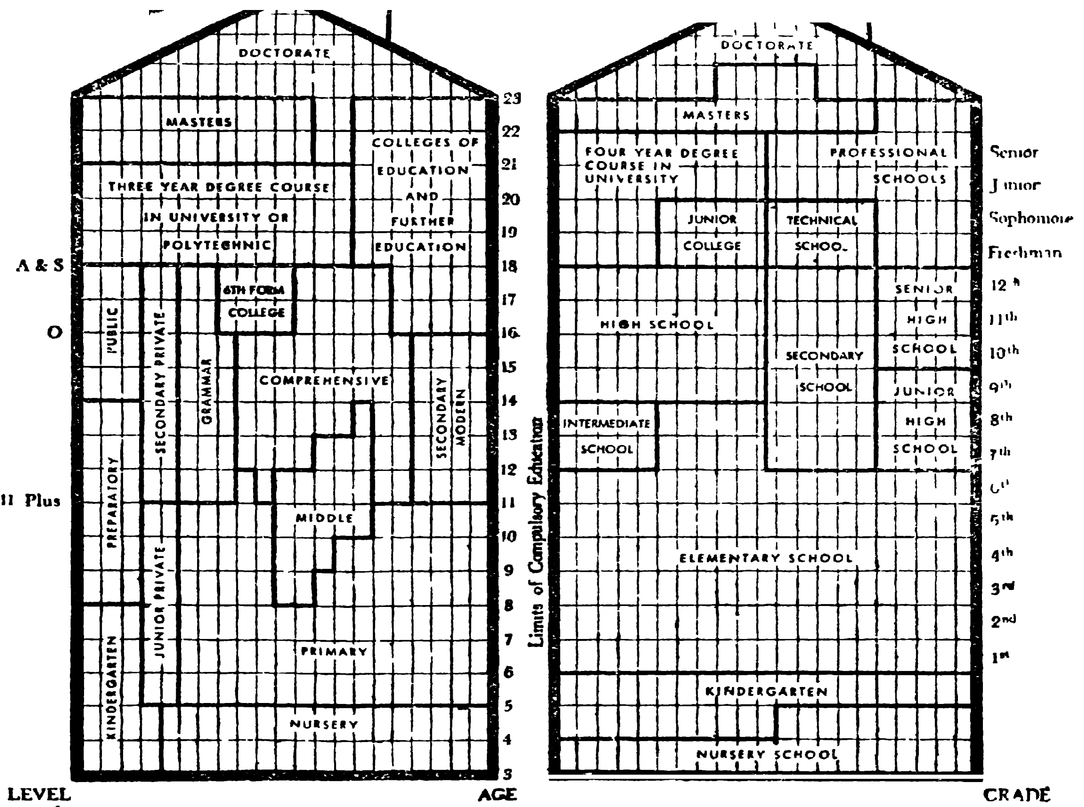
—অবশ্যই, সে আর বলতে! তবে জিনিসপত্র গোছাতে ছেলে-মেয়েরা আমাকে খুব সাহায্য করে, আর তা'ছাড়া সপ্তাহে দুদিন মায়েরা আসেন আমাকে সাহায্য করতে— অনেকটা স্বেচ্ছাসেবিকার মতো।

—আচ্ছা, আপনি আমাকে এক কথায় বুঝিয়ে দিতে পারেন কি, আপনার ঠিক্ কাজটা কি— অবশ্যই আপনি যদি কিছু মনে না করেন।

—স্বচ্ছন্দে। আমার দায়িত্ব অনেক। আমি সংক্ষেপে বলছি। মেরী সংক্ষেপে তাঁর কাজের বর্ণনা দিতে লাগ্‌লেন—

একজন লাইব্রেরীয়ানের প্রধান কাজ হচ্ছে লাইব্রেরী মেইন্‌টেইন করা, অর্থাৎ লাইব্রেরীর বইপত্র ও অন্যান্য জিনিসপত্রের যথোপযুক্ত ব্যবহার হচ্ছে কি না তা দেখা এবং ছেলেমেয়েদের পড়ার ব্যাপারে ঠিক পথে পরিচালনা করা।

মেরীর মতে প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের চরিত্র পৃথক। তাদের বয়সে, উচ্চতায়, চোখ-মুখের গঠনে, মাথার চুলের রঙে একজন আর একজনের থেকে ভিন্ন, আর ঠিক সেরকমই পড়ার ব্যাপারেও তারা ভিন্ন। এক-একজনের পড়ার ভঙ্গি এক-এক রকমের; তার ওপর আছে তাদের ব্যক্তিগত যুক্তি ও বোঝাপড়া, এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে ব্যক্তিগত শিশু-প্রতিভা। সেই সব দিকে লক্ষ্য রেখে লাইব্রেরীয়ানদের চলতে হয়। তাদের বুদ্ধি ও প্রতিভার যাতে যথোপযুক্ত ব্যবহার হয় সেদিকে ভীষণ লক্ষ্য রাখতে হয়।



United States and British System of Education.
Chart by the courtesy of USIS Geneva.

ক্লাশের বাইরে যে সব পড়াশুনা চলে তারদিকে লাইব্রেরীয়ানদের সতর্ক দৃষ্টি— সে আড্‌ভেঞ্চার, পরীর গল্প, সাধারণ জ্ঞান অথবা যে কোনো বিষয়ই হোক না কেন। রীডিং রুমের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে—

(ক) ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ার ক্ষমতার বৃদ্ধিসাধন করা।

(খ) নিজেদের মধ্যে সংযোগের প্রসারতা করা ও পরস্পরকে বোঝাবার চেষ্টা করা।

(গ) পড়ার মাধ্যমে জেনে নিয়ে সোসাইটিতে তার ভালো দিকটার প্রয়োগ করা।

(ঘ) প্রচুর পরিমাণে নতুন শব্দ ও বাক্য সংগ্রহ করা।

মেরীর সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ ঘুরে ফিরে আমরা সবাইকে বিদায় জানিয়ে ঘরের পথ ধরলাম। এতক্ষণে প্রফেসর নিশ্চয়ই বাড়ী ফিরে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। চলার পথে মেরীকে তাঁর কাজের সুখ্যাতি না করে পারলাম না,

—সত্যি মেরী, আমার মনে হয় তোমরাই জাতির মেরুদণ্ড।

—থ্যাংক ইউ— ইট্ ইজ্ ট্যু মাচ্— মুচকি হেসে মেরী আমার উক্তিতে সায় দিলেন।

আমেরিকানরা সাধারণতঃ রাত্রির খাওয়া খায় বিকেলবেলা, সে শীত বা গ্রীষ্ম যে কালই হোক না কেন। বেক্‌টেল পরিবারও খায় প্রায় সন্ধ্যেবেলা। সন্ধ্যে সাতটার আগেই এদের রাতের খাওয়া শেষ, গরমকালে সন্ধ্যে সাড়ে-সাতটা পর্যন্ত বাগানে দিনের আলো। যথারীতি সেদিনও আমরা খাওয়া-দাওয়া সেরে বৈঠকখানা ঘরে এসে বসেছি। ল্যারী আমাদের সাথে নেই, ও গেছে ওর গার্ল ফ্রেণ্ড-এর বাড়ীতে।

সতেরো-আঠারো বছর বয়স থেকেই এদের বন্ধু বা বান্ধবী জুটে যায়। তারপর বহু অদল-বদলের পর পরিণত বয়সে গৃহীত হয় অর্ধাঙ্গী। অবশ্য কৈশোরের বান্ধবী যে স্ত্রী পর্যন্ত এগোয় না— সেকথা আমি বলতে চাই না, তবে খুবই কম।

আমাদের আসরে মেরী আসতেই, আমাদের আলোচনা শুরু হ'ল। মেরী টেবিলের ওপর অনেকগুলো চিঠি রেখে একে একে পড়তে লাগলেন। অধিকাংশই আমন্ত্রণলিপি— ব্যক্তিগত আমন্ত্রণলিপি আর ক্লাব বা স্কুলের। ব্যক্তিগতভাবে আমন্ত্রণলিপি রক্ষা করা অসম্ভব। প্রত্যেকের বাড়ীতে যেতে হ'লে আমাকে সেখানে বছরখানেকের প্রোগ্রাম করতে হ'বে। কিন্তু তাই বলে তাঁদের আমন্ত্রণকে আমি উপেক্ষা করতেও চাই না— তাই মেরী ও প্রফেসরের সাথে আলোচনা করে ঠিক হ'ল এক চমৎকার ব্যবস্থা। যাঁরা আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তাঁদের সকলকে একদিন প্রফেসরের বাড়ীতে ডাকা হবে— এবং সেখানেই তাঁদের সাথে আমার পরিচয় ও আলাপ হবে। প্রফেসরের বাগানে একসাথে দু'শজনের পার্টি দেওয়ার মতো যথেষ্ট জায়গা আছে। প্যাম্, স্যু ও তাদের আরও তিনজন বন্ধু-বান্ধবীকে ভলান্টিয়ার হিসাবে রাখা হবে, চেয়ার ভাড়া করা হবে আর জলখাবারের জন্য প্যাকেটের অর্ডার দেওয়া হবে। কাজেই

ব্যবস্থা সব ঠিক। আমি এবার মেরীর দিকে তাকিয়ে উঠে অনেকটা থিয়েটারের ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলাম,

—কিন্তু মহামান্য চেয়ারম্যানকে জিজ্ঞেস করতে পারি কি— এরজন্য টাকাটা আসবে কোত্থেকে?

মেরী সংগে সংগে জবাব দিলেন,

—টাকার জন্য চিন্তা কি? আপাততঃ আমার ব্যাগ থেকেই সেটা দেবো; তারপর পার্টির দিন সকলের কাছ থেকে কমপক্ষে এক ডলার করে নেওয়া হবে। তাতে সুদে আসলে সব উঠে আসবে।

ঠিক কথা— আমার মনে হয় মেরীর আইডিয়াটা ভালো। প্রফেসর মেরীর প্রস্তাবে সমর্থন জানালেন।

তাদের নিমন্ত্রণ করে তারপর তাদের কাছ থেকে ডলার চাওয়াটা কি ঠিক হবে? আমি কিন্তু কিন্তু করতে লাগলাম— আমার কিন্তু ভাব দেখে প্রফেসর অভয় দিয়ে বললেন,

—তোমার অভিজ্ঞতা শুনতেই তারা আসছে, সেটা যদি সম্পূর্ণ ফ্রি হয় তাহলে তারা মোটেই খুশী হবে না— কিন্তু যদি ডোনেশান হিসেবে কিছু চাওয়া হয় তাহলে তারা খুশীই হবে। ডোনেশানটা যদি এক ডলারের বদলে তিন অথবা চার ডলার করা যায় তাহলে তারা ভাববে যে তোমার অভিজ্ঞতাটা দামী বটে। তবে আমরা প্রবেশমূল্য বাড়াতে চাই না, কারণ আমার মনে হয় যারা আসবে তাদের অধিকাংশই ছাত্র-ছাত্রী।

—বেশ, যা ভাল বোঝেন করুন, আমার তরফ থেকে গ্রীন লাইট দেওয়া রইল। এ প্রসঙ্গের আজকের মতো এখানেই সমাপ্তি। মেরীর ওপর সব দায়িত্ব ছেড়ে আমরা অন্য প্রসঙ্গে এলাম।

রোজই আমাকে বিভিন্ন দেশ-বিদেশ সম্পর্কে কিছু বলতে হয়, কোন দেশের কি রীতি-নীতি— আচার-ব্যবহার ইত্যাদি। প্রফেসর ফ্যামিলি আমার কথা অবাক হয়ে শোনেন, আবার মাঝে মাঝে প্রফেসর তাঁর ব্যক্তিগত ভ্রমণ বিষয়ক তথ্য শোনান, আমিও অবাক্ হয়ে শুনি। এ বিষয়ে আমাদের কখনও একঘেয়েমি আসে না। গল্প করতে করতে অনেক সময়—রাত দশটা বেজে যায়। সাধারাণতঃ রাত দশটার পর প্রফেসর ও মেরী আমাদের গুড নাইট্ জানিয়ে শোবার ঘরে চলে যান। কর্তা গিন্নী দু'জনেই শোবার আগে একটু লেখাপড়া করেন, তারপর স্নান করে শুতে যান; অবশ্য রোজ রাতে তাঁরা স্নান করেন না।

আমি, স্যু আর প্যাম গল্প চালিয়ে যাই। কোনো কোনো সময় গল্প করতে করতে রাত বারোটা বেজে যায়। ওদের ব্যক্তিগত প্রশ্ন হচ্ছে ভারত সম্পর্কে— ভারতের মেয়েরা শাড়ী পরে কেন? কপালে সিঁদুর দেয় কেন, রাস্তায় গরু ঘোরে কেন, হিন্দু ধর্ম কি, যোগীরা চোখ বুজে কি করে, তারা কি খাবে— ইত্যাদি

নানা ধরণের প্রশ্ন। আমি যথাসাধ্য তাদের প্রশ্নের উত্তর দিই, আর যখন দেখি যে নেহাৎই ঠিক উত্তর আমার জানা নেই, তখন ঐতিহ্যের দোহাই দিয়ে এড়িয়ে যাই।

ওদের প্রশ্নে আমি নিজেই অবাক হই। মাঝে মাঝে আমি ভাবি, সত্যিইতো, ভারতীয় হয়েও আমি এই সামান্য জিনিসগুলি জানি না।

এখানেই আমার এক চরম শিক্ষা। আমি পরের সম্পর্কে অনেক জানি, কিন্তু নিজের সম্পর্কে কিছুই জানি না। সহজ সরল শিশুদের মাঝেও আমার মাঝে মাঝে এই কথাটা মনে হয়েছে— ওদের অতি সহজ প্রশ্নে আমি সচেতন হয়েছি। আমি এই বহির্বিশ্বে যতই দেখছি মনে হচ্ছে কিছুই যেন দেখছি না...এই দ্যাখো, কথায় কথায় অন্য প্রসঙ্গে এসে যাচ্ছি— আবার আসা যাক পূর্ব প্রসঙ্গে।

যথারীতি সেদিনও গল্প করতে করতে অনেক রাত হয়ে গেল। গল্পের কি আর শেষ আছে, বিশেষ করে বক্তা ও শ্রোতার মাঝে যেখানে আন্তরিক যোগাযোগ।

আমি নিজেই থামলাম— না, অনেক রাত হয়ে গেল, এবার বিছানায় যাওয়া যাক্। নীচের আলো ও দরজা জানালা বন্ধ করে আমরা ওপরে উঠে এলাম— ওপরেই আমাদের শোবার ঘর। প্যামের ঘর, তার পাশেই স্যু আর ঠিক তার উল্টো দিকে আমার ঘর। প্যাম্ আমাকে গুড্ নাইট জানিয়ে মনে করিয়ে দিল যে— আগামী কালই ওর স্কুলে আমার প্রোগ্রাম আছে।

স্যু-এর সাথে আরও কিছুক্ষণ কথা বলে গুড্ নাইট্ জানালাম। শুতে যাবার ঠিক আগে স্যু-এর দিকে তাকিয়ে বললাম,

—একটা কথা জিজ্ঞেস করবো, কিছু মনে করবো না তো?

—কথাটা না জেনে কি করে তোমায় বলবো যে আমি কিছু মনে করবো কি না?

—তা ঠিক কথা, স্যুজি, আচ্ছা তোমাকে সরাসরি বলেই ফেলি— কারণ আমার সত্যি জানতে ইচ্ছে করছে তাই...

—তুমি বলেই ফেলো না, অত ভাবছো কেন?

—আচ্ছা সুজি, তোমাদের সাথে আমি এত রাত পর্যন্ত গল্প করি, মাঝে মাঝে তুমি বা প্যাম্ একাই তো থাকো, এতে তোমার মা-বাবা কিছু মনে করেন না তো?

—তাঁরা মনে করলে তোমাকে সাথে সাথে জানিয়ে দিতেন আর তাছাড়া তোমাকে তাঁরা শুধু যে স্নেহ করেন তা নয়, তোমার প্রতি তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ আলাদা।

—আচ্ছা স্যুজি, তুমি তো আর এখন ছোট্ট মেয়েটি নও, বলতে গেলে তোমার এখন ভরা যৌবন। ধর, তুমি যদি একা আমার ঘরে ঢুকে গল্প করো আর তোমার মা-বাবা যদি দেখেন তাহলে তাদের রিঅ্যাক্সনটা কি হবে? তুমি আন্দাজ করতে পারো কি?

—তাঁরা মোটেই কিছু মনে করবেন না, আর মনে করার আছেই বা কি? আমার বয়স এখন ষোলোর ঊর্ধে, আমি এখন স্বাধীন। এখানে তাঁদের বলার কিছু নেই। এটাই স্বাভাবিক— তাই নয় কি?

—তা বটে, তা বটে— মুখে বললাম বটে, কিন্তু আমার ভারতীয় মন বলে উঠলো— বাহ্‌বা বটে— ধন্য আমেরিকান জাত— কত সহজ এদের চিন্তাধারা, কত সোজা এদের কথা।

—যাই হোক, ধন্যবাদ স্যুজি, আমার মনে এই প্রশ্নটা কয়েকদিন যাবৎ ঘুরপাক্ খাচ্ছিল তাই জিজ্ঞেস করলাম।

—শুধু কি তাই? ব্যস তার বেশী কিছু নয়তো— চপল হাসিতে প্রশ্ন করল স্যু। আমি ওর টক্‌টকে লাল গালটা ধরে একটু নাড়িয়ে দিয়ে আদরের ভঙ্গিতে বললাম,

—দুষ্টুমি করো না। যাও অনেক রাত হয়েছে—গুড্ নাইট্—

পরের দিন দশটার সময় কফি টোস্ট খেয়ে আমি ও মেরী বেরিয়ে পড়লাম পামেলার স্কুলের দিকে। পনেরো-কুড়ি মিনিটের মধ্যে আমরা এসে পৌঁছলাম। আমার ভাষণ সাড়ে দশটায়।

স্কুলে পৌঁছাতেই দেখি স্কুলের গেটের কাছে পামেলা তার বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মোটর থেকে নামতেই আমার হাতে একটা বিরাট গোলাপ ফুলের তোড়া দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা আমাকে স্বাগতম্ জানালো। বলাই বাহুল্য যে এই স্কুলটাও অন্যান্য স্কুলের মতো কো-এডুকেশন।

ভিতরে ঢুকেই সকলের সাথে পরিচিত হ'লাম। মিস্টার মিস্ট্রেস-ডিরেক্টর সকলেই আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা সবাই স্কুলের হলঘরে এসে হাজির হলাম। স্টেজের ওপর থেকে আশে-পাশে চোখ বুলিয়ে মনে হ'ল প্রায় সাত-আটশোর মতো ছেলে-মেয়ে হবে।

সভা শুরু হ'ল।

ডিরেক্টর আমাকে স্বাগত জানাতে পাঁচ মিনিটের জন্য মাইক্‌টা নিলেন। তারপর মেরী আমার সংক্ষিপ্ত বিবরণ জানিয়ে আমার হাতে ভারটা ছেড়ে দিলেন।

আগের থেকে কোন সাবজেক্ট বাছা ছিল না, এরকম ক্ষেত্রে আমি সাধারণতঃ ভ্রমণের উদ্দেশ্য ও আমি কেন সাইকেলে ঘুরছি সে সম্পর্কে একটা নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে থাকি। এ ক্ষেত্রেও তাই শুরু করলাম।

স্কুল-কলেজে বক্তৃতা দিতে হলে, আমি একঘেয়েমিটাকে এড়াবার জন্য মাঝে মাঝে থামি, তারপর দেখি শ্রোতাদের রিঅ্যাক্‌সন। যদি শ্রোতারা আমার সাবজেক্ট

পছন্দ করে তাহলে ওরা চুপচাপ অপেক্ষা করে অথবা সরাসরি জিজ্ঞাসা করে, তারপর কি হ'ল? আর যদি পছন্দ না করে তাহলে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা শুরু করে অথবা খুব বেশী নড়াচড়া করে— হল ছেড়ে বাইরে যেতে পারে না কারণ টিচাররা সব সমানেই বসে থাকেন। আমি আমার ছাত্রজীবনের কথা মনে করে এদের মনস্তত্ত্ব বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পারি।

আমার বক্তৃতা থামতেই দেখি সবাই চুপচাপ, তারমানে বুঝতেই পারছি আমাকে কন্‌টিন্যু করতে হবে। আমি আমার ভ্রমণের কয়েকটি সরস গল্প বলে থামলাম। আমার প্রোগ্রাম হচ্ছে আধ ঘণ্টা বক্তৃতা আর পঁয়তাল্লিশ মিনিট প্রশ্ন ও উত্তর।

আমি থামতেই সবাই হাততালি দিয়ে উঠলো। আমি তাদের আমার আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,

—তোমাদের মধ্যে যদি কাবও এ সম্পর্কে প্রশ্ন করার থাকে তাহলে দ্বিধা করো না, আমাদের হাতে যথেষ্ট সময় আছে।

এরা যেন আমাব এই কথার অপেক্ষাতেই ছিল। চারদিক থেকে অসংখ্য প্রশ্ন ভেসে উঠল। আমি তাব মধ্য থেকে প্রশ্ন বেছে নিয়ে একের পর এক জবাব দিতে লাগলাম।

অসংখ্য জিজ্ঞাসা। তাদের মধ্যে ছেলেদেব মূল প্রশ্ন—

—আপনার ওয়ার্ল্ড ট্যুরে কত টাকার (ডলাব) বাজেট?

—আপনি কি বড়লোক?

—আপনার সাইকেলের কত দাম?

—কোথায় কিনেছেন?...ইত্যাদি

মেয়েদের মূল প্রশ্ন—

—আপনার বয়স কত?

—রাস্তায় চলতে চলতে কি কি খান?

—আপনার যদি অসুখ করে, কি করেন তাহলে?

—আপনি বিয়ে করেছেন কি?...ইত্যাদি

সকলকে সন্তুষ্ট রেখে আমি একের পর এক জবাব দিয়ে যেতে লাগলাম। আমি আর সবিস্তারে যাব না, তাহলে আমার এই ডায়েরীটা বিরাট এক গ্রন্থ হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, আর একটি বিশেষ প্রশ্ন এখনও বাকী আছে—

হাতে আর মাত্র পাঁচ মিনিট সময় আছে, আমি এবার বললাম— এবার একটি মাত্র প্রশ্নের জবাব দেবো, কারণ হাতে বেশী সময় নেই।

আমার ঠিক সামনেই দ্বিতীয় সারি থেকে একটি মেয়ে উঠে দাঁড়ালো। বড় জোর পনেরো বছরের, ছোট্টর উপর মেয়েটাকে দেখতে পরীর মতো সুন্দরী। আমি ওরদিকে তাকিয়ে বললাম,

—বলো।

মেয়েটা গলা পরিষ্কার করে স্পষ্ট করে বললো,

—আপনি তো পৃথিবী ঘুরেছেন— আচ্ছা বলুন না সব দেশেই কি প্রস্ আছে?

আমার কানে হঠাৎ যেন কাঁসর বাজলো। আমি তার প্রশ্ন শুনে ঠিক ঠাওর করতে পারলাম না মেয়েটা ঠিক তাই বলছে তো— না আমার শুনতে ভুল হয়েছে! আমি তাই জিজ্ঞেস করলাম,

—আমি ঠিক তোমার প্রশ্নটা শুনতে পাইনি, প্লীজ আর একবার বল না!

,মেয়েটা আগের মতোই স্পষ্ট করে বললো

—আমি জিজ্ঞেস করছি যে, পৃথিবীর সব জায়গাতেই প্রস্ আছে কি?

ওর প্রশ্ন শুনে আমার কান দুটো লাল হয়ে উঠলো— কি সাঙ্ঘাতিক ডেপো মেয়েয়ে বাবা! এরকম প্রশ্ন আমি কোনদিন পাইনি। আজ পর্যন্ত আমি কম করেও শ'খানেক স্কুল কলেজে বক্তৃতা দিয়েছি, কিন্তু এমন বেখাপ্পা অবস্থায় কোনদিন পড়িনি— তাও কিনা একটা মেয়ের হাতে! ওর প্রশ্ন শুনে ছেলেদের মধ্যে একটু চঞ্চলতার আভাস পেলাম। আমি ওর প্রশ্নের জবাব দেবো কিনা ঠিক্ করতে না পেরে পাশে শিক্ষকমণ্ডলীর দিকে তাকালাম— আশ্চর্য, তাঁদের মধ্যে এতটুকু চাঞ্চল্য নেই। আমি তো ভেবেছিলাম যে মেয়েটার এই প্রশ্নের জন্য তাঁরা সব লজ্জিত। আমি মেরীকে উদ্দেশ্য করে বললাম,

—প্রশ্নের জবাবটা দোবো নাকি?

—অবশ্যই, অবশ্যই। মেরীর সাথে আরও দু'একজন একসঙ্গে তাঁদের অভিমত জানালেন, ভাবটা এমন যে এটা যেন তাঁদেরও প্রশ্ন। ঠিক আছে বলে আমি সংক্ষেপে জবাবে বললাম,

—নিশ্চয়ই, পৃথিবীর অধিকাংশ বড় বড় শহরে এটা আছে, বরঞ্চ বড় বড় শহরে এদের আধিপত্যও অনেক। লণ্ডন-প্যারিস্-হাম্বুর্গ-নিউ ইয়র্ক ইত্যাদি শহরে তাদের জন্য আলাদা শহর রয়েছে। বায় দা ওয়ে— তোমার নাম কি?

—ডরোথি।

—ডরোথি, তোমার এই সহজ ও সরল মনের পরিচয় পেয়ে আমি খুব আনন্দিত হয়েছি। মনের যে কোন রকম প্রশ্নকে সরাসরি প্রকাশই শিক্ষার একটা বিরাট অংগ। আশা করি তোমার বন্ধু-বান্ধবীরা তোমাকে এর জন্য নিশ্চয়ই প্রশংসা করবে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি সময় হয়ে গেছে, কাজেই সবাইকে আমার কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করলাম। ফেরবার পথে গাড়ীতে বসে মেরীকে জিজ্ঞাসা করলাম,

—ডরোথির এ ধরণের প্রশ্নে আপনারা কি মোটেই অবাক্ হননি?

—না মোটেই না। ওদের যে কোন ধরণের প্রশ্ন করার স্বাধীনতা আমরা দিয়েছি— আর ঠিক তোমার মতো আমরাও তার উত্তর দিতে সব সময় প্রস্তুত। তা ছাড়া স্কুলে সেক্স এডুকেশন শিক্ষা দেওয়া হয়; যৌন বিষয়ে উঠতি বয়সেই শিক্ষা দেওয়া ভালো, নয়তো পরে অনেক অঘটনা ঘটে।

আমাদের গাড়ী এসে বাড়ীর কাছে থামলো।

হুইটনে আমাদের দিনগুলো খুব ব্যস্ততার মধ্যে কাটছে। আজ এখানে কাল ওখানে করে দেখতে দেখতে হুইটনের প্রায় সবগুলো প্রতিষ্ঠানেই আমার ঘোরা হয়ে গেছে। তবুও যেন শেষ নেই। ইতিমধ্যে রোটারী ক্লাবের উদ্‌যোগে আমাকে সম্বর্ধনা দেবার বিরাট আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে হুইটনের মেয়র মানে লেডি মেয়র— তিনি আমাকে হুইটনের সর্বোচ্চ সম্মান 'অল্ আমেরিকান সিটি' মেডেলটি দিয়ে সম্মানিত করলেন— তাবপর থেকে আমি হুইটনে এক ডাকে পরিচিত হয়ে গেলাম।

মেরীর মাধ্যমে ইতিমধ্যে গ্যারী ফিলিপস্-এর সাথে পরিচিত হই। গ্যারী ফিলিপস্ আসলে ছেলেমেয়েদের গাইড এবং কাউন্সিলার। দুষ্টু ছেলেমেয়েদের কিভাবে বশে আনতে হয় সে বিদ্যায় সে বিশেষ দক্ষ। অবশ্য এই পদের জন্য তাকে শিশুবিদ্যা ও মনস্তত্ত্ব নিয়ে বিশেষ পড়াশুনা করতে হয়েছে। সে প্রায়ই আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতো, তার সঙ্গে আমার বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ চলত। গ্যারী পয়ত্রিশ বছরের, দেখতে শুনতে সুপুরুষ। ওর থেকে আমারও জানার অনেক কিছু ছিল,— আমেরিকার ছেলেমেয়েদের শিক্ষা সম্পর্কে আরও অনেক কিছু জানলাম। তারই বিশেষ কিছু অংশ এখানে আমার ডায়েরীতে স্থান পেয়েছে— আমি তার কিছু নমুনা দিচ্ছি।

আমেরিকায় অবাধ্য ও বদ্‌চরিত্র ছেলেমেয়েদের জন্য রয়েছে জেল, অবশ্য সরাসরি জেল না বলে তাকে বলা হয় ইয়ুথ কারেক্‌সন(Youth Correction) অথবা কোন কোন সময় ডিটেন্‌সন (Detention Facilities)। নাম যাই হোক না কেন, নিয়মকানুন অনেকটা জেলের মতোই। ছোটদের জন্য নিঃসঙ্গ জীবন, তবে অধিকাংশ সময়ই তারা যখন সেখান থেকে ফিরে আবার স্কুলে আসে তখন তাদের পুরানো বন্ধুবান্ধবদের টিট্‌কিরি ও ভৎর্সনায় জীবনটা হয় আরও দুর্বিসহ। জেলের সময় হচ্ছে তিন ঘন্টা থেকে শুরু করে একশ কুড়ি দিন পর্যন্ত— অবশ্য সেটা নির্ভর করে তাদের দোষের ওপর। অনেক গার্জিয়ানদের মতে এধরণের কারেক্‌সন্ ক্যাম্প ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ ভালো করার পরিবর্তে অন্ধকারে ভরে দেয় অর্থাৎ অল্পদোষে মহাশাস্তি অর্থাৎ লঘু অপরাধে গুরু দণ্ড। এই ধরণের শিশুদের জেলে সাত বছর থেকে শুরু করে সতেরো বছরের ছেলেমেয়েরা স্থান পায়। এদের দোষও বিভিন্ন ধরণের— বাপ-মা-এর অবাধ্য হওয়ার থেকে শুরু করে বাক্‌স ভাঙা পর্যন্ত।

লেখাপড়ায় পিছিয়ে পড়া ছেলে-মেয়েদের কথা জিজ্ঞেস করতে গ্যারী জানালো যে, লেখাপড়ায় পিছিয়ে পড়া ছেলে-মেয়েদের জন্য আমেরিকার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিশেষ যত্ন নিতে হয়। কোন কোন সময় সহজ এবং কোন কোন সময় সমস্যা সমস্যাই থেকে যায়। তবে যতটা সম্ভব ছেলে-মেয়েদের শাস্তির পথটা এড়িয়ে যাওয়াই ভালো। মার-ধরতো সম্পূর্ণ আইনবিরুদ্ধ। ব্যাকওয়ার্ড ছেলে-মেয়েদের ব্যাপারে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সমস্যা অনেক, আর সেই সমস্যার সমাধানেও কতকগুলো উপায় আছে বটে। নীচের অংশে আমি তার মোটামুটি বিবরণ দিচ্ছি।

সমস্যা—Rebellous Students: (ডানপিটে ছাত্র-ছাত্রী)— এই শ্রেণীর ছেলে-মেয়েরা সাধারণতঃ সব কিছুবই বিরোধী। মাস্টারদের কথা তো শোনেই না, বরং যে কোন কাজ বললে করে তার ঠিক বিপরীত। কোন শাসন তারা মানে না— স্কুলে এদের নিয়ে একটা বিরাট সমস্যা।

সমাধান— বা স্কুলে এধরণের ছাত্র-ছাত্রীদের বশে আনবার উপায়। শিক্ষকরা এধরণের ছেলে-মেয়েদের সবরকম শাসন করা ও ধমক দেওয়া সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়ে ওদের উপেক্ষা করেন। ক্লাশে ওরা থেকেও যেন নেই এমন ভাব। বরং ছলে-বলে-কৌশলে তাদের বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে ছেলে-মেয়েরা নিজেই তাদের অবাধ্যতার জন্য দায়ী। এই ধরণের সাইকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্টের ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুফল দেখা দিয়েছে।

সমস্যা—Apathetic Students: —এই ধরণের ছেলে-মেয়েরা যে কোন কাজ করতেই দ্বিধাবোধ করে; এরা সাধারণতঃ কুঁড়ে শুধু বসে বসে চিন্তা করাই যেন এদের একমাত্র লক্ষ্য।

সমাধান— শিক্ষকরা এই শ্রেণীর ছেলে-মেয়েদের ওপর নজর রেখে সবসময় তাদের উৎসাহিত করলে তাতে কাজ দেয়। বিশেষ করে তাদের বলতে হয় যে তাদের কাজ সত্যি প্রশংসনীয় এবং এইভাবে তাদের সবসময় উৎসাহিত করতে হয়। গ্যারীর ভাষায়— They need constant praise and assurance so that they can succeed.

সমস্যা—Students with personal problems: (ব্যক্তিগত সমস্যায় জর্জরিত ছেলে-মেয়েরা)— সাধারণতঃ এদের সমস্যা অনেক, কেউ বাপ-মা হারা, কারও বাড়ীতে অত্যধিক শাসন, অন্যান্য ভাই-বোনদের বিরক্তি। কেউ হয়তো ভাবে, আমি অত্যন্ত কুৎসিৎ; কেই ভাবে— আমি অত্যন্ত সুন্দরী, আমি অত্যন্ত বলবান, আমি খুব দুর্বল, আমি খুব খারাপ, ইত্যাদি ইত্যাদি।

সমাধান— এই সমস্যা সমাধানের মূল উপায় হচ্ছে, অভিভাবকদের সাথে এই ব্যাপারে সরাসরি আলাপ ও তাদের সাহায্য।

সমস্যা—Students with ability who lack basic skills:— সাধারণতঃ ক্লাশে এই শ্রেণীর ছেলে-মেয়ে পড়াশুনায় ভাল নয়। এমনকি কোন প্রশ্নও বুজতে পারে না, লেখাপড়ায় অন্যান্য ছেলে-মেয়েদের সাথে তার বিরাট তফাৎ।

সমাধান— তাদের প্রাইভেট টিউটর প্রয়োজন। টিউটরকে অবশ্যই খুব ধৈর্যশীল ও কোঅপারেটিভ হতে হবে। এই ধরণের পারসোনাল কেয়ারের ফলে তারা সহজেই স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

সমস্যা—Acting out Students: (মাতব্বর ধরণের ছেলে-মেয়ে) —এধরণের ছেলে-মেয়েরা সব সময়ই সকলের ওপর খবরদারী করতে চায়; তার ফলে ঘটে সংঘাত।

সমাধান— তারা যখন অঘটন ঘটায় ঠিক সেইসময় তাদের উপদেশ না দিয়ে, পরে যখন শান্ত হয় সেইস্ময় তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে এধরণের ব্যবহার সত্যি পাগলামি। এ ব্যাপারে তাদের গার্জিয়ানকেও সতর্ক করে দেওযা ভালো। অনেক সময় এই ধরণের ছেলে-মেয়েরা অপরের নকল করে। বেশ কয়েকমাস আবজারভেশনের পরেও যদি তারা কন্‌টিনিউ করে তাহলে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া ভাল।

উপরি-উক্ত এসব সমস্যা যদিও সমস্যা বটে, কিন্তু সমাধানেব উপায় তাদের আছে। তাছাড়া আরও এক বিরাট সবস্যা থেকে গেছে, যার সহজ সমাধানের উপায় আজও তাদের জানা নেই। প্রায় সবরকমের সাইকোলজিই ফেইল করেছে। সেটা হচ্ছে— Drug Users.

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে ড্রাগ সমস্যা। বারো থেকে পঁচিশ বছরের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এটা হচ্ছে ক্রমবর্ধমান। গ্যারীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম— ওরা কোন ধরণের ড্রাগ ব্যবহার করে।

—ওঃ কি নয়! ছোট্ট একটা বাচ্ছা ছেলে সিগারেট থেকে আরম্ভ করে চুরুট-গাঁজা এল্‌-এশ-ডি (L.S.D) মরফিন পর্যন্ত সব কিছু।

—কিন্তু ওরা এসব পায় কোথায়?

—ও, সে বলতে গেলে এক বিরাট অভিধান হয়ে দাঁড়াবে।

ভেবেছিলাম আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আমাদের দেশের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মতো অত সমস্যার মধ্যে পড়তে হয় না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখলাম— নাঃ সমস্যা সব দেশেই আছে। ছোট দেশে ছোট সমস্যা আর বড় দেশে সমস্যাও বিরাট।

কুড়ি দিন যে কোথা দিয়ে কেটে গেল বুঝতেই পারলাম না। এর মধ্যে অরলিয়ান্‌স্ থেকে স্টীভ্ টেলিফোন করেছে। ও জানতো না যে আমি এখানে আছি; ও আমাকে কথা দিয়েছে যে দু'চার দিনের মধ্যেই ও বাড়ী আসছে। ও আসলে স্কুল থেকে ড্রপ আউট্ করেছে— এখন মিউজিসিয়ান। আজকাল আমরা অনেক সময়, সময় কাটাবার জন্য ডায়েরী লিখি, বাগানে কাজ করি, দরজা-জানলায় রঙ করি, আর প্রফেসর যখন বাড়ীতে থাকেন তাঁর কাছ থেকে সাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করি। বল্‌তে গেলে আমি এখন ওদের বাড়ীর ছেলে। সকালে আমি যথারীতি

সূর্যনমস্কার ব্যায়াম করি। ভোরবেলা ওঠা আমার অভ্যেস, আমার সাথে স্যু ও প্যামও যোগ ব্যায়াম করে। বলাই বাহুল্য যে আমেরিকায় যোগ ব্যায়ামের প্রচলন খুব বেশী। স্যুজি ও পামেলা তাই আমার সাথে সাথে সেটা আয়ত্তে আনবার চেষ্টা করছে। সন্ধ্যার পর প্রফেসর ও মেরী আমার কাছে বসে একসাথে প্রাণায়াম করেন। আমি অবশ্য এসবে পাকা নই, নিতান্তই শরীর রক্ষার জন্য করি। প্রতি শনিবার বিকেলে সপরিবারে সাঁতার কাটতে যাই আর রবিবার যাই তাঁদের চার্চে। এই হচ্ছে মোটামুটি আমার হুইটনের জীবন। বাড়ীর সকলেরই ইচ্ছা যে আমি সেখানে শীতটা কাটাই; আইডিয়াটা খারাপ নয়। বিশেষ করে এই পরিবারের প্রত্যেকেই যখন আমাকে ভালোবাসে, থাকতে দোষ কি? আর সেই সাথে এদের কাছ থেকে জানাও যাবে অনেক কিছু। আমার শুধু একটা সমস্যা, বেশীদিন থাকলে, যাবার সময় মায়ার বন্ধনও তো আছে...তবুও আমি থেকে গেলাম।

আমি এখানে আছি প্রায় মাস কয়েক হতে চলল। ইতিমধ্যে হুইটনে সকলের সাথেই আমার ভাব জমে উঠেছে। এই শহরতলীর প্রত্যেকটি পথ-ঘাট, ক্লাব, স্কুল-কলেজ, বাড়ী-ঘর সবই যেন আমার বহুদিনের চেনা। এখনকার গীর্জা ও যুব সংস্থাতে কম করেও দশবার বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছি। এখানকার কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা আমাকে ভালোবাসে, ঠিক তেমনি পেন্সন হাউসের বুড়ো-বুড়িরাও আমাকে স্নেহ করেন। কাজেই এদেব কাছে আমি যখন আমার যাত্রার কথা জানালাম সকলেই যেন আমাকে আঁকড়ে ধরলো— যেতে নাহি দিব। প্রফেসর অবশ্য জ্ঞানী মানুষ, তিনি বাধা দিলেন না, তিনি মৃদু হেসে বললেন— আমি জানি তুমি থাকবার ছেলে নও, পৃথিবীব মাটি ও মানুষ তোমাকে টানছে, তোমাকে বাধা দেব না। তবে ভবিষ্যতের জন্য আমাদের দরজা তোমার জন্য খোলা রইল, যদি কোনোদিন চলার পথে বাধা আসে আমাদের কথা মনে রেখো।

বিদায় জানালাম হুইটন্‌কে, পাড়ি দিলাম পশ্চিমের দিকে— উদ্দেশ্য ক্যালিফোর্ণিয়া।

ইয়েলোস্টান পার্ক

চিকাগো ছেড়ে সেমি-অটোরুট ধরে দক্ষিণ-পশ্চিমের দিকে কয়েকটা শহর ঘুরলাম। সেন্ট লুইস্ ও কান্সাস্ সিটি তার মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু হঠাৎ আমাকে দিক পরিবর্তন করতে হ'ল, অনেকের কাছে শুনলাম যে কান্সাস্ বা ওক্লাহামার দিকে রাস্তাঘাট অনেকটা মরুভূমিব মতো, কাজেই সে পথ এড়ানো ভালো।

উত্তরের পথটা পর্বতসংকুল এবং বড় বড় গাছ-গাছড়া ও বনে জঙ্গলে ঢাকা। রাস্তায় একঘেয়েমি নেই বটে, কিন্তু কষ্টকর। সিউক্স্ ফলস্, র‍্যাপিড্ সিঁড়ি ইত্যাদি শহরগুলো অনেকটা ইটালীর পার্বত্য শহবের মতো। ব্ল্যাক্হিল পাহাড়টা পেরোতে আমাকে গলদ্ঘর্ম হতে হয়েছে; প্রায় আটদিন লেগেছে এই এলাকাটা পেরোতে। ব্ল্যাকহিলে অধিকাংশ সময়েই আমাকে হেঁটে সাইকেল ঠেলে উঠতে হয়েছে। এইভাবে প্রায় ষোলদিনের দিন অর্থাৎ চিকাগো ছাড়ার পর সতেবোদিনের মাথায় এসে পৌঁছলাম আমেরিকার বিখ্যাত ন্যাশ্নাল পার্ক ইয়েলোস্টোন পার্কে (Yellowstone Park)।

ইয়েলোস্টোন পার্ক বাংলায় বলতে হল্দে পাথরের বাগান। আমি এলাকায় প্রবেশ করি রাত প্রায় আটটার সময়, কাজেই পাথরের রঙ্ দেখার মতো অত ধৈর্য ছিল না। সরাসরি অ্যাড্মিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং— আসলে কাঠের একটা বিরাট বাড়ী, সেখান থেকে রাতে শোবার জন্য এবং আমার তাঁবু খাটাবার জন্য একটা জায়গার বন্দোবস্ত করে নিলাম।

ইয়েলোস্টেন পার্কে ক্যাম্পিং করার অনেক জায়গা রয়েছে, তাঁবু পাতবার জন্য এসব জায়গার ভাড়া দিতে হয়। পাঁচ মিটার বাই পাঁচ মিটার-এর একটা ছোট্ট জায়গা এক রাতের জন্য ভাড়া দেড় ডলার, ভারতীয় প্রায় তেরো টাকার মতো। সুবিধা হচ্ছে কাছাকাছি সরকারী পায়খানা ও কলের জলের বন্দোবস্ত আছে আর রান্নার জন্য সিমেন্টের উনোন এবং মাংস পোড়াবার জন্য সিকের উনোন। জ্বালানির জন্য কাঠ বা গ্যাস অ্যাড্মিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং-এ কিনতে পাওয়া যায়। আমি আমার ছোট্ট তাঁবুটা খাটিয়ে নিলাম; তারপর, খাবার জন্য ছোট গ্যাসের স্টোভে তিনটে আলু ও দুটো ডিম সিদ্ধ করে তাতে গোলমরিচ ও নুন দিয়ে পরমানন্দে রাতের আহার সারলাম। তারপর যথারীতি স্লিপিং ব্যাগটাকে খুলে তার ওপর নিজেকে এলিয়ে দিলাম। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে পুরোনো সবচেয়ে নামী আর সবচেয়ে

বড় পার্ক হচ্ছে ওয়াইওমিং (Wyoming) প্রদেশের এই ইয়েলোস্টোন পার্ক। আমেরিকার পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ চারদিক থেকে দলে দলে লোক আসছে এখানে বেড়াতে, হোটেল মোটেল ক্যাম্পিং সবকিছুরই চূড়ান্ত ব্যবস্থা ; এখানকার প্রধান আকর্ষণ গাইসার— মাটির নীচ থেকে গরম ও ফুটন্ত জল ও জলবাষ্প তুবড়ির মতো বারবার উপছে উঠছে, আর তার সাথে সাথে ভেসে আসছে তীব্র রাসায়নিক পদার্থের গন্ধ— ঠিক যেমনটা দেখেছিলাম আইস্‌ল্যাণ্ডে।* এখানকাব সবচেয়ে বড় গাইসারের নাম ওল্ড ফেইথ্‌ফুল। আশ-পাশেব আনেককেই জিজ্ঞাসা করেছি এই নামের রহস্য কি, কিন্তু সবাই আমার মতো। তবে এক ভদ্রলোক আমাকে এখানকার একটা গাইড্ বুক কিনতে পরামর্শ দিলেন, তাতে সব বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া আছে। কিন্তু সেই গাইড্ কিনে ফলো করার মতো ধৈর্য বর্তমানে আমার নেই, ওপব ওপর নিজের চোখে যতটা দেখা যায় ততোটাই ভালো। একেই তো বলে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ, তাতে সময় ও পয়সা দুটোই বাঁচে। আমি সারাটা দিন·এদিক-ওদিক ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। ছোটখাটো প্রচুর গাইসার বেসিন ও থারমাল সোর্স রয়েছে। কম করেও মনে হয় হাজাবখানেকতো হবেই। ভেবেছিলাম আইস্‌ল্যাণ্ডেব পরে আর গাইসার চোখে পড়বে না, কিন্তু এখানে দেখে অবাক হয়ে গেলাম।

গাইসার ছাড়াও এখানে রযেছে বিরাট একটি লেক, ইয়েলোস্টোন লেক। লেকের চার ধারে প্রচুর লোকের ভীড়। তাদের মধ্যে অধিকাংশই মাছধরার নেশায় মশগুল। এই লেকের ট্রুইট্ (Truit) মাছ খুব বিখ্যাত, আমাদের দেশেব অনেকটা ল্যাটা মাছের মতো।

আমি যেখানে ক্যাম্প খাটিয়েছি ঠিক তার পাশেই জঙ্গলে রয়েছে ভালুকদের আড্ডা। এই জঙ্গলে অনেক ভালুক আছে, প্রায় শ'খানেকতো হবেই। এই ভালুকগুলো অনেকটা দক্ষিণেশ্বরের বাঁদরের মতো, কাছে আসে খাবারের জন্য, কিন্তু ওদের ধরতে গেলেই বিপদ। এখানকার ভালুকগুলোর প্রিয় খাবার হচ্ছে বিভিন্ন ধরণের বিস্কুট ও কেক। ট্যুরিস্টদের গাড়ীর জানলায় অথবা রাতে তাঁবুর পাশে প্রায়ই এসে খাবারের জন্য ধর্না দেয়। আইনতঃ এদের ধরা বা শিকার করা দণ্ডনীয়। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের কাছে এই জঙ্গলে স্বাধীনভাবে ভালুক দেখা একটা বিশেষ মজার ব্যাপার। অবশ্য কোন কোন সময় ওদের বিরাট চেহারা দেখে অনেকেই সাহস পায় না। আমার মতে এদের চরিত্র প্রশংসনীয়, এরা কারো ক্ষতি করে না। ভালুক ছাড়াও এখানকার জঙ্গলে হরিণ, নীল গাই এবং ঐ ধরণের আরও অনেক জীবজন্তু রয়েছে। জঙ্গলের ভিতরে কানে আসে পাখির কূজন আর চোখে পড়ে রঙ-বেরঙের পাতা-বাহারের গাছ। এখানকার সবকিছুই সংরক্ষিত, আমেরিকার অন্যতম রিজার্ভ ফরেস্ট এই ইয়েলোস্টেন পার্ক সত্যিই শান্তির নীড়।

ইয়েলোস্টোন পার্কে দুদিন কাটিয়ে আমি রওনা দিলাম সল্ট লেকের দিকে। দূরত্ব খুব বেশী নয়, কিন্তু রকি পাহাড়ের পাথর ডিঙোতে ডিঙোতে আমি প্রায় হয়রাণ! প্রায় চারদিনের দিন আমি পৌঁছলাম সল্ট লেক্ সিটিতে। এই সিটিতে থাকবার জন্য আমার আমন্ত্রণ ছিল। হুইটনের এক ভদ্রলোক আমাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছিলেন আমি যেন তাঁর ভাই-এর সাথে দেখা করি। তাঁর ভাই এডওয়ার্ড সল্ট লেক সিটির একটি স্কুলের শিক্ষক। এডওয়ার্ডের বাড়ী খুঁজে বার করতে কোন অসুবিধেই হ'ল না। ক্যাপিটালের পাশে এভ্যেনুর ওপব আটতলা বাড়ীর তিনতলার বাসিন্দা। দরজার ওপর ওরিয়েন্টাল নক্সা আঁকা কলিং বেল টিপতেই ভিতর থেকে দরজা খুলে গেল, একটি মেয়ে হাসি মুখে জিজ্ঞেস করলো— কি চাই?

—এডওয়ার্ড বাড়ী আছে কি?

—না—মেয়েটি উত্তর দিল।

—আমার নাম বিমল— আসছি হুইটন্ থেকে। এডওয়ার্ডের দাদা আমাকে এখানকার ঠিকানা দিয়েছে...

আমাকে আব বাকীটা বলতে হ'ল না— দবজা খুলে মেয়েটি স্বাগতম্ জানালো। আমি তার কাছ থেকে পাঁচ মিনিট সময় চেয়ে নীচে নেমে এলাম, সাইকেলটাকে লিফ্টের পাশে রেখে মালপত্রগুলো ওপবে নিয়ে এলাম। বিবাট একটা হলঘরের চারদিকে চেয়াব টেবিলে ঠাসা, তারই মাঝখানে একটা বিরাট সোফা। টেবিলের ওপর একটা নটরাজের মূর্তি, দেয়ালের গায়ে একটা বিরাট খড়্গ ঝোলানো, কাপড়ের ওপর জলরঙে আঁকা তিব্বতী কুঠি। এসব দেখে মনে হ'ল ভদ্রলোক নিশ্চয়ই ভারত দর্শন করেছেন।

মেয়েটি আমার সামনে এসে দাঁড়ালো— কফি বা সরবৎ কিছু খাবেন?

—এক কাপ চা হলে ক্ষতি নেই— হেসে জবাব দিলাম। মেয়েটি অদৃশ্য হ'ল; আবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফিরে এল, আমার সামনের কোচে এবাব ভালোভাবে গুছিয়ে বসল। আমি তার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম,

—তোমার পরিচয়টা কিন্তু জানতে পারিনি।

—আমি এডওয়ার্ডের স্ত্রী; ও এখন স্কুলে গেছে, আসবে ঘন্টাখানেক পরে...

ওর পরের কথাগুলো কানে অস্পষ্ট হয়ে গেল, কিন্তু স্ত্রী কথাটা শুনেই আমি তো অবাক! মেয়েটার বয়স কত তাহলে— অবশ্য আমি মেয়েদের বয়স সম্পর্কে বারাবরই কাঁচা। সাধারণ ক্ষেত্রে মেয়েদের বয়স জিজ্ঞাসা করা মানে নন্-পোলাইট্, কিন্তু এখানে আমার কৌতুহলকে দমন করতে পারলাম না— তাই অনেকটা স্বগত স্বরে বললাম,

—আমি ভেবেছিলাম আপনি তাঁর ছোট বোন— মনে হচ্ছে একেবারে কচি বয়স।

একেবারে কচি মেয়েটি খিল্‌খিল করে হেসে উঠে জবাব দিল— আমার বয়স আঠারো, এডওয়ার্ডের বয়স তেইশ। এই তো সবে আমরা কলেজ ছেড়েছি।

আমাদের আড্ডা জমে উঠলো; এককাপ চা পেয়ে পরিবেশটা যেন আরও ঘরোয়া হয়ে উঠল।

এডওয়ার্ড একমাসের ছুটিতে ভারত ও নেপাল ঘুরে এসেছে; এখন সে নাকি খুব ভারত-প্রেমিক। ভারতবাসীদের নাকি তুলনা হয় না, ও রকম আপন-করা সমাজ নাকি পৃথিবীতে বিরল। এডওয়ার্ডের স্ত্রীর নাম শ্যেলী। এখন প্রায় সাড়ে এগারোটা, আর আধঘন্টার মধ্যেই এডওয়ার্ড আসবে। কাজেই শ্যেলী আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রান্নাঘরের দিকে উঠে গেল। আমি তার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে বাথরুমে ঢুকলাম। প্রায় পনেবোদিন হতে চললো, স্নান করিনি, কাজেই এ সুযোগ না ছাড়াই ভালো।

প্রায় সোয়া বারোটার সময় এডওয়ার্ড এল— ঘরে ঢুকে একজন অপরিচিত মানুষ দেখে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো। আমি তাবদিকে এগিয়ে গিয়ে হাত বাড়িয়ে বললাম,

—আমি বিমল।

—ওঃ ইউ! আমাকে জড়িয়ে ধরল এডওয়ার্ড।

ছোটখাটো মিষ্টি চেহারা— স্বভাবটাও আপন-করা। এডওয়ার্ড ও শ্যেলীর সঙ্গে সখ্যতা হয়ে গেল।

এরা আমার সম্পর্কে প্রায় সব তথ্যই জানে; ওর দাদা চিঠির মাধ্যমে সবই জানিয়েছে। এডওয়ার্ড সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোনে হুইটনে তার দাদাকে আমার উপস্থিতির কথা জানিয়ে দিল এবং সেই সাথে, আমাকে এখানে পাঠানোর জন্য বিশেষ ও আন্তরিক ধন্যবাদ দিতে ভুললো না। আমেরিকায় ধন্যবাদটা দেখেছি রাস্তাঘাটে ছড়াছড়ি, —বাবা-মা, ভাই-বোন, স্ত্রী-পুত্র থেকে আরম্ভ করে দোকানদার-পাওনাদার, ঝাড়ুদার পর্যন্ত সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। মা, ছেলের জন্য চকোলেট কিনে এনেছে, তার জন্য ছেলে মাকে জানাচ্ছে ধন্যবাদ। স্ত্রী, স্বামীর জন্য এক গ্লাস জল এগিয়ে দিচ্ছে— স্বামী বলছে ধন্যবাদ। ছাত্র, শিক্ষককে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছে—উত্তর শুনে ছাত্র বলছে ধন্যবাদ! তাই আমিও বাধ্য হয়ে এডওয়ার্ড ও তার স্ত্রীকে শতবার ধন্যবাদ দিতে লাগলাম।

শ্যেলীর সংসার ছোট, কিন্তু তাঁর ভাঁড়ার বিরাট। রান্নাঘরে একটি বিরাট রেফ্রিজারেটর, তার মধ্যে দু'জনের অন্ততঃ তিনমাসের খাবার মজুত। এটা আমেরিকানদের আর একটা চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেকটি বাড়ীতে আছে বিরাট রেফ্রিজারেটর। এরা রোজ বাজারে যায় না, সপ্তাহে একবার। খাদ্যের মধ্যে অধিকাংশই হচ্ছে কৌটোজাত অর্থাৎ কৌটো বন্ধ করে রেফ্রিজারেটরে যাতে মাসের পর মাস রাখা চলে।

কাজেই আমার মতো না-বলে আসা অতিথিদের জন্য এদের আর বাজারে দৌড়তে হয় না। তা ছাড়া আমেরিকানরা অতি সহজ মানুষ, অর্থাৎ ভদ্রতা বা আতিথেয়তার জন্য বাড়াবাড়ি কিছু করে না।

প্রায় একটার সময় শ্যেলী জানালো যে, স্যুপ পাউরুটী ও সসেজ্ রেডি। আমরাও রেডিই ছিলাম। খাওয়া দাওয়া ও গল্পগুজবে ঘন্টাখানেক কেটে গেল, এডওয়ার্ড আমাদের বিদায় জানিয়ে স্কুলে চলে গেল, ও আসবে বিকেল পাঁচটা নাগাদ। আমি একটু বিশ্রাম করে শ্যেলীর সাথে বেরিয়ে পড়লাম শহর দেখতে।

আপাতদৃষ্টিতে সল্ট লেক্ সিটিকে সাদা দেখায়, অর্থাৎ এখানকার অধিকাংশ বাড়ীঘরই সাদা রঙের। পাহাড়ী উপত্যকার মধ্যে এই শহরটি বড় সুন্দর।

সল্ট লেক্ সিটির প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে এখানকার চার্চ, এই চার্চটি বিরাট ক্যাথলিক চার্চের মতো দেখতে বটে, কিন্তু আসলে এটা মোটেই ক্রীশ্চান চার্চ নয়। এই চার্চটাকে বলা হয় মরমন-মন্দির (Mormons Temple)। এই সম্প্রদায়কে বলা হয় মর্‌মন।

শ্যেলীর সাথে মন্দিরে ঢুকলাম, বেশ ভীড়। মর্‌মনদেব আদি তীর্থ, কাজেই যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন জায়গা থেকে তীর্থযাত্রীরা আসছে। বিরাট একটা ক্যাথিড্রালকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন মর্‌মন মন্দির। গেট দিয়ে ঢোকার সাথে সাথেই ইন্‌ফরমেশন সার্ভিস, সেখান থেকে সম্পূর্ণ মন্দির প্রদক্ষিণের জন্য রয়েছে গাইড্ সার্ভিস।

গাইড্-এর সাথে বিভিন্ন মন্দিরে ঘুরলাম। এখানকার মন্দির মানে চার্চের ভেতর মর্‌মন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা জোসেফ স্মিথের স্টাচু সমেত পূর্ণ জীবনী ধরে রাখা হয়েছে। আমার মতে এই ধর্মটা খৃষ্টধর্মের পরিবর্তিত রূপ, খৃষ্ট-যুগের নব অবতার জোসেফ্ স্মিথ (১৮০৫-১৮৪৪) এই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় এর শাখা সমেত প্রায় ছ'হাজার মন্দির আছে আর ভক্তের সংখ্যা সবসমেত প্রায় উনিশ লক্ষ (১৯,০০,০০০)। সল্ট লেক্ সিটিব গোড়াপত্তন করে এই মর্‌মন সম্প্রদায়— এদের আগের কেন্দ্র ছিল মিসৌরি ও ইল্লিনয়ে।

প্রায় ঘন্টাখানেক সফর করে আমরা মন্দির ছাড়লাম। সেখান থেকে শহরের একটু এদিক-ওদিক ঘুরে আমরা বাড়ী ফিরলাম।

বিকেলবেলা এডওয়ার্ড এলে আমাদের গল্প জমে উঠলো। এডওয়ার্ড ইতিমধ্যেই তার কয়েকজন বন্ধুকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে, কিছুক্ষণের মধ্যে তারা এসে হাজির হ'ল। এডওয়ার্ড তার ভারত ভ্রমণের অভিজ্ঞতা আমাকে শোনাতে লাগলো আর আমার কাছ থেকে শুনতে লাগলো সাইকেলে আমেরিকা ঘোরার গল্প। বৈঠকখানা ঘরে সবশুদ্ধ ছ'জন। মর্‌মনদের ধর্মবিষয়ে আলোচনা উঠল আর তার শেষ হ'ল আমাদের তান্ত্রিকশাস্ত্র দিয়ে।

পরের দিন এডওয়ার্ডকে ওর স্কুলে পৌঁছে দিয়ে, আমি ও শ্যেলী গ্রেট সল্ট লেকের পথ ধরলাম। শ্যেলীর ড্রাইভিংএ পাকা হাত। আমার ইচ্ছে ছিল সাইকেলেই যাওয়া, কিন্তু শ্যেলীর সাইকেল নেই, কাজেই বাধ্য হয়ে ওর গাড়ীতে আসতে হ'ল।

দি গ্রেট সল্ট লেক্, পৃথিবীর বৃহত্তম লবন জলের হ্রদ, ওপর থেকে দেখতে অন্যান্য হ্রদের থেকে এমন কিছু আহা-মরি রূপ নয়। কিন্তু এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জলের মধ্যে নুনের মাত্রা এত বেশী যে, যে কোন অল্প-সাঁতার জানা লোকের পক্ষেও ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা কম। অতি সহজে চিৎ হয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা ভেসে থাকা সম্ভব।

আমরা এই লেকের ধার ধরে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। প্রথম প্রথম ভেবেছিলাম যে শ্যেলী কম কথা বলে, কিন্তু পরে ওর সাথে ঘনিষ্ঠতা হতেই যেন মুখ খুললো। ওকে দেখতে যেমন ফুট্‌ফুটে বাচ্ছা মেয়ের মতো, কথায় ঠিক তেমনি। অনর্গল জিজ্ঞাসা— আমার বাড়ী, দেশ, ভ্রমণ...আমার অভিজ্ঞতার সব কিছুটাই ও যেন নিতে চায়।

লেকের চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে এদিকে বেলা গড়িয়ে এল। একটা দোকানে ঢুকে হামবুর্গার ও কফির মাধ্যমে মধ্যাহ্ন আহার সারতে হ'ল। তারপর বেরিয়ে পড়লাম লেক ছেড়ে একটু আশ-পাশের দিকে ঘুরতে।

বিকেল প্রায় ছ'টা নাগাদ আমরা বাড়ী ফিরলাম। এডওয়ার্ড কিছুক্ষণ আগেই বাড়ী ফিরেছে। আজ বিকেলে ও ওর স্কুলের সহকর্মী শিক্ষকদের ডেকেছে— তাদের সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া এবং সেই সাথে একটু মজলিসে বলা যাবে।

যথাসময় একে একে সবাই আসতে লাগলো, প্রায় পনেরো জন। কোকোকোলা, সরবৎ, বিস্কুট ও বাদাম-ভাজাকে কেন্দ্র করে জমে উঠল আমাদের আসর..।

পরের দিন শনিবার এডওয়ার্ডের ছুটি, সকাল থেকে আমরা বিভিন্ন জায়গায় চক্কর দিতে লাগলাম। বেলা প্রায় দশটার সময় আমরা আবার এলাম মর্‌মন-মন্দিরে, সেখানকার একজন পুরোহিত আমাদের জলখাবারের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। যাজক ম্যান্‌হাম অতি চমৎকার ভদ্রলোক। ছাব্বিশ বছরের তরুণ যুবক। পেশায় ইলেকট্রিক ইঞ্জিনীয়ার আর নেশায় মর্‌মন প্রিস্ট, তিনি আমাদের বোঝাতে লাগলোন মর্‌মন-দর্শন ও তার কার্যকলাপ। মর্‌মনদের ইচ্ছা এই সল্ট লেক্ সিটিকে আধুনিক যুগের আদর্শ নগর হিসেবে গঠন করা, কিন্তু কাজটা যতটা সহজ ভাবা গিয়েছিল আসলে তা নয়। মর্‌মনরা খুব সিরিয়াস; মদ্যপান ধূমপান ধর্মত্যাগ নিষেধ। শুদ্ধ, সহজ ও আনন্দময় পরিবেশ ও সমাজ সৃষ্টি করাই তাদের মূল উদ্দেশ্য।

এডওয়ার্ড ও শ্যেলীর আতিথেয়তার তুলনা হয় না; এটা ঠিক যেন আমার নিজের বাড়ী। আমি তাদের সাথে শনিবার-রবিবার কাটিয়ে সোমবার দিন ভোরবেলা রওনা দিলাম— আমাকে যেতে হবে স্যান্‌ফ্র্যান্সিস্‌কোর দিকে।

পথ মোটেই সহজ নয়, কারণ রকি পাহাড়ের পাঁচিল এখান থেকেই যেন শুরু হয়েছে। পথ যত কষ্টেরই হোক না কেন, তাতে মজা আছে অথবা বলা যেতে পারে কষ্টকর না হলেই মনে হয় যেন একঘেয়েমি।

এই অঞ্চলের পাহাড়গুলো, এই দেশের উত্তর দিকের পাহাড়ের মতো সবুজ নয়। অনেকটা রুক্ষই বলতে হবে। তবে রাস্তাঘাট অতি চমৎকার— মাঝে মাঝে ছোট ছোট শহর দোকান, সুপার মার্কেট, কোনটারই অভাব নেই।

প্রায় সাত দিনের পথ ডিঙিয়ে আমি দেখতে পেলাম স্যানফ্র্যান্সিস্‌কোর আকাশ। পাহাড়ের ওপাশে স্যান্‌ফ্র্যান্সিস্‌কোর আলো ঠিকরে পড়ছে। রাতের বেলা দূর থেকে শহরের আলো পরিব্রাজকের কাছে অনেকটা মরিচিকার মতো, বিশেষ করে আমার মতো যারা সাইকেল-সফরী। রাতের আকাশে শহরের ঠিকরে পড়া আলো দেখলে অনেক সময় মনে হয় এই তো হাতের কাছে শহরটা, আধ ঘণ্টার মধ্যেই হাজির হওয়া যাবে সেখানে— কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এগোতে গেলেই ধাঁধাঁটার পরিচয় পাওয়া যায়। আধ ঘণ্টার জায়গায় কোন কোন সময় মনে হয় ওই তো কাছেই, আর একটু এগোলেই তাকে ছোঁয়া যাবে, কিন্তু আসলে তা অনেক দূর।

আমার ম্যাপে দেখা যাচ্ছে স্যানফ্র্যান্সিস্‌কো আরও প্রায় শ খানেক মাইল।

স্যানফ্র্যান্সিস্কো

অবশেষে পৌঁছলাম, আমেরিকানদের ছুটির দিনের স্বর্গরাজ্যে, বহুজনের আকাঙ্খিত স্যানফ্র্যান্সিস্কোতে। প্রশান্ত মাহাসাগরের কূলে আমেরিকার বিচিত্র নগরী। আমেরিকার পথ-ঘাটে লোকের মুখে মুখে রাস্তা-ঘাটে শুনেছি স্যান্‌ফ্র্যান্সিস্কোর কথা। আমেরিকার প্রধান শহরগুলোর মধ্যে নিউ ইয়র্ক, ওয়াশিংটন, চিকাগো, বোস্টন ঘুরেছি, এবার দেখবো স্যান্‌ফ্র্যান্সিস্কো। সাক্রামেন্টো থেকেই ধরা যেতে পারে স্যান্‌ফ্র্যান্সিস্কোর যানবাহনের গাড়ি। রাস্তাঘাটে গাড়ী-ঘোড়ার সব কিছুরই গতি স্যান্‌ফ্র্যান্সিস্কোর দিকে। রাস্তার দু'ধারে নজরে পড়ছে বিরাট বিরাট হোটেল, মোটেল ও যাবতীয় জিনিষের অ্যাড্‌ভারটাইজ্‌মেন্ট।

স্যান্‌ফ্র্যান্সিস্কোতে আমার থাকবার জন্য ভাবতে হবে না, প্রায় ডজনখানেক ঠিকানা ও আমন্ত্রণ রয়েছে, তবে এর মধ্যে প্রথমে কোথায় উঠবো সেটাই সমস্যা। এদের মধ্যে তিন জনকে আগের থেকেই চিনি, তার মধ্যে গর্ডন টমাসের কথা বিশেষ করে আমার মনে পড়ল।

গর্ডন টমাস আইস্‌ল্যাণ্ডে থাকাকালীন ওর সাথে পরিচয়। আমরা একই হোটেলে পাশাপাশি ছিলাম। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়স হবে— পেশায় সিস্‌মোলজিস্ট অর্থাৎ ভূকম্পনবিশারদ। আইস্‌ল্যাণ্ডে সে পড়াশুনার জন্যই গিয়েছিল। ওর সাথে আমার খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল, ও আমাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছিল, ওর ওখানে উঠলে ও খুব খুশীই হবে।

বিরাট বড় শহর, কিন্তু ম্যাপ থাকলে কোন শহরেই ঠিকানা খোঁজবার অসুবিধে নেই। শহরের ভিতর ঢুকলে সব শহরই সমান। রাস্তা, বাড়ী-গাড়ী আর শব্দের এক বিরাট মিলনকেন্দ্র।

বেলা প্রায় তিনটের সময় নাইন্‌থ্‌ এভেন্যুর একশ চৌত্রিশ নম্বর বাড়ীর দরজায় পৌঁছলাম। নীচের তলায় সাইকেলটায় তালা মেরে রেখে, কাঁধে ব্যাগটা নিয়ে লিফ্‌টে করে সাত তলায় এসে পৌঁছলাম। দরজায় কলিং বেল টিপতেই ভিতর থেকে একটা কণ্ঠ ভেসে এল,

—কি চাই?

শব্দটা অনুসরণ করবার জন্য এদিক-ওদিক তাকাতেই দেখি দরজার ঠিক পাশেই মনিটর বসানো। আমি সেদিকে এগিয়ে মাইক্রোফোনের কাছে মুখে এনে উত্তর দিলাম,

—আমার নাম বিমল, ভারতীয়। গর্ডন কি এখানে থাকে? গর্ডন মানে টমাস্ গর্ডন, আমি ওর বন্ধু।

—বেমাল? কি জানি বাপু, আমি তোমার নাম কোনোদিন শুনিনি। গর্ডন এখানেই থাকে বটে, তবে এখন বাড়ীতে নেই, পরে এস।

মনিটরেই কথা চললো— দরজা খোলার নাম নেই। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম,

—গর্ডন ক'টার সময় বাড়ী ফিরবে বলতে পারেন?

—ওর ফিরতে প্রায় সন্ধ্যে ছ'টা-সাতটা হতে পারে।

—আপনাকে বিশেষ ধন্যবাদ— পরে আসবো।

অমি নেমে এলাম। ওয়াকি-টকির মাধ্যমেই কথা হ'ল, ভদ্রমহিলার রূপ দেখবার সৌভাগ্য হ'ল না। সাইকেলটা নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লাম শহরটা ঘুরে দেখবার জন্য।

শহরটা মোটেই সমতল নয়, উঁচু-নীচু, অনেকটা উপত্যকার মতো, তবে এই শহরের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ট্রাম— আমেরিকানর সব শহরে ট্রাম নেই; আণ্ডারগ্রাউণ্ড মেট্রোই ট্রামের স্থান নিয়েছে। কিছুদূর এগোতেই সামনে পড়ল একটা পার্ক। আজকাল গরমটা পুরোপুরি পড়েনি। এপ্রিল মাস, নাগরিকদের গায়ে এখনও রয়েছে ওভারকোট। আমার কাছে শীত-গ্রীষ্ম সব সমান, রাস্তাটা ঠিক থাকলেই হ'ল। অত্যধিক বৃষ্টি আর বরফ এই দুটো জিনিসই আমার কাছে বড় বাধা, অন্যান্য বাধাকে আমি বড় একটা গ্রাহ্য করি না। পার্কে বসে, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ও এদিক-ওদিক পোস্টার ও সিনেমার ছবি দেখে কাটিয়ে দিলাম ঘণ্টা তিনেক। তারপর আবার এসে ধর্না দিলাম গর্ডনের দরজায়।

কলিং বেল টিপতেই ভিতর থেকে পুরুষ কণ্ঠ ভেসে এল,

—এক মিনিট অপেক্ষা কর। ঠিক তার পরেই দরজা খুলে গেল, ভিতর থেকে দাড়ি-গোঁফে ভর্তি একটা মুণ্ড বেরিয়ে এল— কি চাই?

—আমি গর্ডনের সাথে দেখা করতে চাই, সে কি বাড়ী আছে?

—আমিই গর্ডন? আপনাকে ঠিক চিনতে পারছি না।

—আপনিই গর্ডন। মাপ করবেন, আইস্‌ল্যাণ্ডে আমি একজন গর্ডনের সাথে পরিচিত হই, তিনি আমাকে এখানকার ঠিকানাই দিয়েছিলেন, এই দেখুন আমার নোট বই-এ তাঁর নিজের হাতের লেখা ঠিকানা। এই বলে আমি আমার নোট বইটা দিলাম।

ভদ্রলোক খুব ভালোভাবে দেখে চেঁচিয়ে উঠলো— বি-মল।

প্রায় বছরের ব্যবধান, তাতেই বিরাট পরিবর্তন— ওর আগে দাড়ি-গোঁফ ছিল না তাই আমি ওকে চিনতে পারিনি। আমারও আগে বড় চুল ছিল না, তাই

সেও আমাকে চিনতে পারেনি। আমি ওর ঘরে এসে ঢুকলাম। সকালের সেই ভদ্রমহিলা এখন আর নেই, আসলে তিনি রোজ সকালে আসেন ঘর-দোর ও বাসনপত্র পরিষ্কার করবার জন্য।

গর্ডন, একা ব্যাচেলার— আমাকে ভালোভাবেই ও রিসিভ করলো, নীচের থেকে সাইকেলটাকে উঠিয়ে আনা হ'ল সাততলায়। ঠিক হ'ল এখানে কয়েকদিন থাকা যাবে। কথায় কথায় ওকে জিজ্ঞেসা করলাম যে এই বাড়ীর সব অ্যাপার্টমেন্টরই কি এই ধরণের মাইক্রোসিকিউরিটির বন্দোবস্ত আছে নাকি? সে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল— অবশ্যই। স্যানফ্র্যান্সিস্‌কো চোরদের স্বর্গরাজ্য, এত সত্ত্বেও হরদম দিন-দুপুরে চুরি রাহাজানি হচ্ছে।

আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম— সেটা চিকাগোতে নয়?

—চিকাগো! হুঃ, স্যানফ্র্যান্সিস্‌কোর কাছে কোন শহরই টেঁকে না। এই তো মাসখানেক আগে পাশের অ্যাপার্টমেন্টে এরিক্‌দের বাড়ীতে চুরি হয়ে গেল।

—কি ভাবে? আমি জানতে উৎসুক হলাম।

—সে এক মজার ব্যাপার— গর্ডন শুরু করল,

এরিক ও তার স্ত্রী দু'জনেই কাজ করে। তাদের দশ বছরের একটা মেয়ে আছে। সকালবেলা স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই কাজে চলে যায়, ওদিকে একই সময়ে মেয়ে যায় স্কুলে। সেদিন মেয়েটির ছিল ছুটির দিন, মেয়েটাকে বাড়ীতে রেখে কর্তা-গিন্নী দু'জনেই গেছে চাকরীতে। মেয়েকে বার বার সাবধান করে দিয়েছে, কেউ এলে দরজা যেন না খোলে। তারপর ঘন্টাখানেক বাদে হঠাৎ কে যেন দরজায় বেল টেপে। মেয়েটি ভিতর থেকে মনিটরে বলে উঠল— কি চাই?

—দরজা খোল, আমি তোর বাবা, কাগজটা ভুলে ফেলে গেছি তাই নিতে এসেছি। মেয়েটি তার বাবার জন্য যেই দরজা খুলেছে সঙ্গে সঙ্গে একজন লোক তার মুখ টিপে ধরল, তারপর মুখে রুমাল ঢুকিয়ে বেঁধে রেখে বাড়ীর সব দামী জিনিস সরিয়ে নিয়ে গেছে..।

আশ্চর্য বটে! মজাদার গল্প— আমি হেসে উঠলাম। এবার অন্য প্রসঙ্গে আসা যাক, পৃথিবীর অন্যতম সেরা শহর স্যানফ্র্যান্সিস্‌কো সম্পর্কে প্রথমেই নেতিবাচকভাবে আরম্ভ না করাই ভালো। আমরা ঘুরে এলাম আমাদের মিলনকেন্দ্র আইস্‌ল্যাণ্ড প্রসঙ্গে।

গর্ডনের মতে আইস্‌ল্যাণ্ড এক আশ্চর্য জগৎ, সিস্‌মোলজিস্টদের কাছে সে এক স্বর্গরাজ্য। প্র্যাকটিকাল রিসার্চের এমন প্রাকৃতিক ল্যাবরেটরী অতি বিরল। গর্ডন এরপরেও আর একবার সেখানে গিয়েছিল, সেই প্রসঙ্গেই আমাদের কথা চলল। এবার আমার ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে ফিরে এলাম। গর্ডনকে জিজ্ঞেস করলাম,

—তোমার এখানে আমাকে কতদিন রাখতে পারবে— শুধু থাকার বন্দোবস্ত। খাওয়ার বন্দোবস্ত আমি নিজেই করবো। তোমার কথা পেলে আমি সেই অনুযায়ী প্ল্যান করবো।

—সপ্তাহখানেক তুমি স্বচ্ছন্দে থাকতে পারো, তারপর তোমার স্বভাব-চরিত্র যদি আমার ভালো লাগে তাহলে মেয়াদ বাড়ানো যাবে— দু'জনেই হেসে উঠলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা বাইরে বেড়িয়ে এলাম— রাতের ফ্র্যান্সিস্কোকে দেখবার জন্য।

উঁচু-নীচু পাহাড়ী জায়গার ওপর তৈরী হয়েছে এই শহরটা। কোন কোন সময় খাড়া পাহাড়ের ঢাল ধরে এগিয়ে গিয়েছে আলোর মালা, আবার কোন জায়গায় মনে হচ্ছে অজস্র আলোর বন্যা বয়ে চলেছে। পাহাড়ের যে কোন একটা কলিন ধরে ওপরে উঠলেই দেখা যাবে সম্পূর্ণ ফ্র্যান্সিস্কোর রাতের দৃশ্য। আলোর বাহার দুরে দেখা যাচ্ছে— গোল্ডেন গেট এই শহরের প্রতীক চিহ্ন। শহরের বর্ণনা এর বেশী আর কি দেবো— অন্যান্য বড় বড় শহরগুলোর রাস্তাঘাট যেমন হয়ে থাকে। আমার মতে স্যান্‌ফ্র্যান্সিস্কোর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে স্কাই লাইন।

গর্ডনের সাথে একটা বারে ঢুকলাম, বারটা কোন শ্রেণীর বলা মুশকিল, তবে ভিতরকার পরিবেশটা খুবই জমাটে। সাদাকালো সিগারেট চুরোট বিয়ার হুইস্‌কি— সবকিছুরই ছড়াছড়ি। নর্তকীও বর্তমান দেখছি। প্রায় অর্ধনগ্ন কালো মেয়েটা কাছে আসতেই আমরা অর্ডার দিলাম— স্যান্‌ড্‌উইচ বিয়ার এ্যাণ্ড কফি প্লীজ।

সকালবেলা ন'টা নাগাদ গর্ডন তার অফিসে চলে গেল। ও জিওলজিক্যাল সার্ভেতে কাজ করে। আমার কাছে একটা বাড়তি চাবি দিয়ে বলল— তোমার যখন খুশি বেরিয়ো, তবে দশটা পর্যন্ত— বুড়ি'র আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর, নয়তো পরে ঘরে ঢুকতে অসুবিধা হবে— বুড়ি কিন্তু ভীষণ কড়া।

আমাকে বিভিন্ন উপদেশ দিয়ে গর্ডন বেরিয়ে পড়ল।

বেলা ঠিক দশটার সময় দরজা খুলে বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা ঘরে ঢুকলেন— আমাকে দেখেই চমকে উঠলেন, তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলেন,

—কি করে ঘরে ঢুকলে?

—আমি গর্ডনের বন্ধু, রাতে এখানেই ছিলাম, কয়েকদিন থাকবো। গর্ডন আমাকে ফ্ল্যাটের চাবি দিয়েচে আর আপনার সাথে পরিচিত হবার জন্য আমি অপেক্ষা করছি— আমি এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে ফেললাম।

বৃদ্ধা আমার কথায় কান দিলেন না, তিনি তার ছোট্ট হাতব্যাগটার ভিতর থেকে হাতিয়ে হাতিয়ে একটা নোটবুক বার করলেন, তারপর এপাতা ওপাতা উল্‌টে টেলিফোনের কাছে এগিয়ে গেলেন। তারপর রিসিভারটা তুলে ডায়াল করলেন,

—হ্যালো গর্ডন গুড্ মর্নিং। আমি থেরেসা বলছি, তুমি কি তোমার বন্ধুকে থাকতে বলেছো....ওর কাছে ফ্ল্যাটের চাবিও রয়েছে....কি বললে...হ্যাঁ...অলরাইট। ভদ্রমহিলা রিসিভারটা যথাস্থানে রাখলেন, বুঝলাম তিনি আমার সম্পর্কে ভেরিফাই করে নিলেন। কড়া বটে, মনে হয় আগে তিনি জেলখানায় কাজ করতেন।

ভদ্রমহিলা আমার দিকে হাসিমুখে এগিয়ে এলেন, হাত বাড়িয়ে করমর্দন করে বললেন— তোমার নাম...বিমল— আমি নামটা ধরিয়ে দিলাম।

—হ্যাঁ, তোমার সাথে পরিচিত হয়ে খুব খুশী হলাম।

—আমিও।

আমি উঠলাম, এবার একটু বেরোনো ভালো। তাকে গুড্‌বায় জানিয়ে বেরোতে যাবো, এমন সময় বৃদ্ধা আমার কাছে এসে অতি গোপনীয় কথার মতো ভাব করে বললেন,

—তুমি ইণ্ডিয়ান— সে তো কৃষ্ণ দেশ, কিন্তু এখানে কৃষ্ণ নেই, অরাজকতা— খুব সাবধানে থেকো, বুঝলে হে— বিশেষ করে পকেট ও সাইকেলটা সব সময় সামলে...গুড্ বায়।

—গুড্ বায়— মনে মনে বললাম, হ্যাঁঃ ভারত কৃষ্ণের দেশ! সে কৃষ্ণ ভারতেও বেঁচে নেই, কলকাতাতেও পকেট ও সাইকেল সামলে চলতে হয়।

প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে পর্বত-কন্যার মতই সুন্দরী এই শহরটা, রাতের বেলা বুঝতে পারিনি এর মাহাত্ম্য, এখন পরিষ্কার দিবালোকে এই শহরকে প্রশংসা করতেই হবে। প্রশান্ত মহাসাগরের অবাধ্য জলতরঙ্গ যেন কূল ভেঙে ঢুকে পড়েছে এই শহরের ভিতর, সৃষ্টি করেছে বে অফ্ স্যানফ্র্যান্সিস্কো। ভেঙে পড়া সেই কূলকে জোড়া লাগানো হয়েছে, তৈরী হয়েছে বিরাট ও লম্বা গোল্ডেন ব্রীজ, জলপথে 'বে'তে ঢোকবার পথে এ যেন একটা মহাতোরণ। বে-তে ঢেউএ দুলছে অজস্র কারবারী ও সখের বোট আর বাইরের বন্দরে বিরাট বিরাট জাহাজ— বাইরের জগতের সাথে আমদানি রপ্তানির কাজে ব্যস্ত।

ভৌগোলিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে আমি বলবো যে, নিউ ইয়র্ক, বোস্টন ও চিকাগো থেকে এই শহরের লে-আউট অনেক সুন্দর। নিউ ইয়র্কে স্কাই-স্ক্রেপার আছে বটে, কিন্তু তা মোটেই আকাশকে আচ্ছন্ন করেনি। বে অফ্ স্যানফ্র্যান্সিস্কোর ওপর আরও তিনটে বিরাট বিরাট ব্রীজ রয়েছে— মাটেও ব্রীজ, বে ব্রীজ ও কোয়েনটিন। শহরের পশ্চিম দিকে প্রশান্ত মহাসাগর আর দক্ষিণ দিকে বিভিন্ন আমেরিকান-ইণ্ডিয়ান রিজার্ভ। প্রচুর পার্ক ও স্কোয়ারে ভর্তি।

চায়না টাউন

আমি এসে হাজির হলাম শহরের ঠিক কেন্দ্রে। হঠাৎ যেন চোখের ওপর থেকে আমেরিকা উধাও হয়ে গেল। চারপাশের দোকানপাট, লোকজন, সাইনবোর্ডের লেখা ও বাড়ীঘরগুলোর ডেকোরেশন দেখে মনে হচ্ছে, কোন যাদুবলে আমেরিকার স্যানফ্র্যান্সিস্কো পিকিং-এর একটা অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। কলকাতার চীনা-পল্লী থেকে অবশ্য অনেক অনেক উন্নত। আমেরিকার মধ্যে এমন পরিবেশ পাবো স্বপ্নেও ভাবিনি। এই পরিবেশটাকে আরও কাছে পাবার জন্য একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে পড়লাম—

কিছু খেতে হবে আর সেই সাথে যদি কিছু তথ্য পাওয়া যায় তাহলে তো বাড়তি লাভ।

সাইকেলটাকে একটা লাইটপোস্টের সাথে তালা দিয়ে রেখে ভিতরে ঢুকলাম। অদ্ভুত বটে, চীনদেশে আমি এখনও যাইনি, কিন্তু মনে হয় সেখানকার একটা রেস্টুরেন্টের পরিবেশ ঠিক এরকমই হবে।

রেস্টুরেন্টের চারদিকের দেওয়ালে চীনা শিল্পের বহর। আলমারীতে ও দেওয়ালের তাকে সাজানো রয়েছে সারি সারি চীনামাটির বিভিন্ন মূর্তি ও নিখুঁত কাজ করা কাপ-ডিস্, কাপড়ের ওপর জলরঙা দৃশ্যপট আর লম্বা লম্বা ফুলঝুড়ির মতো কাঠের ফ্রেমে আটকানো বিভিন্ন রঙের কাগজের ল্যাম্প। বাহারের প্রশংসা করতেই হবে। অতি মৃদুস্বরে একটা রেকর্ড বাজছে, আর তাকে ছড়িয়ে কানে আসছে ইংরেজী ও চীনা ভাষার সংমিশ্রণে এক অপূর্ব বাক্য-স্রোত।

মেনুর তালিকাতেও রয়েছে চীনা ভাষা। বাঁ দিকে চীনা ভাষা, ডানদিকে তারই ইংরেজী তর্জমা। আমি লাল-হাঁসেব রোস্ট ও চাইনিজ ভেজিটেবিলের অর্ডার দিলাম। ভিতরে কথাবার্তায় ঠিক জমাতে পারলাম না, তাই খাওয়া-দাওয়া সেরে বাইরে বেরিয়ে পড়লাম।

হাঁটা যাক— অবশ্য সাইকেলে চড়া প্রায় অসম্ভব, খাড়াই রাস্তা, ট্রামগুলোকে পর্যন্ত চেনের সাহায্যে উঠতে হচ্ছে, যে কোন গাড়ী দাঁড়ানো মাত্রেই হ্যাণ্ড ব্রেক দিতে হচ্ছে, নয়তো গড়িয়ে পড়ে এক দুর্ঘটনার সৃষ্টি করবে। রাস্তায় চলতে হলেও হাঁটুর জোর দরকার। রাস্তায় প্রচুর চীনা, তাদের মধ্যে অনেকেই তাদের দেশীয় ঢোলা পোষাকে অতি সহজভাবে চলাফেরা করছে। আমেরিকার মধ্যে এমন একটি চীনা পরিবেশ সত্যি অবাক করে বটে।

মার্কেট স্ট্রীট চায়না টাউনকে সমান দুভাগে ভাগ করেছে, দক্ষিণ দিকে বিভিন্ন রাজনৈতিক সংস্থা, কন্‌সুলেট হাউস, এম্বাসী এবং ঐ ধরণের বিভিন্ন দেশ-বিদেশের প্রতিনিধি দপ্তর। উত্তর দিকটা অতি-আধুনিক বিল্ডিং-এ পূর্ণ, তারমধ্যে অধিকাংশই বিভিন্ন হোটেল ও স্কাই-স্ক্র্যাপারে ভর্তি। একটা পাহাড়ের ওপর অতি সুন্দর একটি প্যাগোডা। চায়না টাউনে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের জন্য তাদের ভাষায় একটি স্কুলও নজরে পড়েছে, চীনা ভাষার পাশেই ইংরেজীতে লেখা— 'চীলড্রেন স্কুল'টা না থাকলে বোঝা মুশকিল। সংক্ষেপে বলতে গেলে, আমাদের কলকাতা চীনাপট্টী এ তুলনায় কিছু নয়। ওখান থেকে আমি এগিয়ে এলাম গোল্ডেন গেটের দিকে। বিরাট একটা ব্রীজ, তার ওপর দিয়ে যাতায়াত করছে হাজার-হাজার গাড়ী। ব্রীজের নামটা গোল্ডেন ব্রীজ, কিন্তু রঙটা মোটেই গোল্ডেন নয়। রঙটা ঠিক কমলা রঙের। লোকে বলে এটাই নাকি পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু ব্রীজ। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই ব্রীজের তলা দিয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় যুদ্ধজাহাজ বে-অফ্-ক্যালিফোর্নিয়াতে ঢুকেছিল। ১৯৩৭ সালে ব্রীজটা তৈরী হয়েছে। ইঞ্জিনিয়ার জোসেফ্ স্ট্র'ম-এর বুদ্ধি

আর তদানীন্তন কুবেরপতি এ-পি-গিয়ানিনীর টাকায় সম্ভব হয়েছে। মিঃ গিয়ানিনী ব্যাঙ্ক অফ্ আমেরিকার মালিক ছিলেন। তিনি অবশ্য টাকাটা দান করেননি, সরকারকে ধার দিয়েছিলেন মাত্র। তারই ফলে আজকের এই ব্রীজ স্যান্‌ফ্র্যান্সিস্‌কো ও মারিনা কাউন্টিকে এক করেছে। বর্তমানে এই ব্রীজটা স্যান্‌ফ্র্যান্সিসকোর প্রতীক— নাগরিকদের গর্ব এবং সেই সাথে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের একটি ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় বস্তু।

রাতের আলো জ্বলতেই আমি ফিরে এলাম গর্ডনের বাড়ীতে। সারাদিন হাঁটতে হাঁটতে আমার পা ব্যথা। রাস্তাঘাটের এই অবস্থা জানলে আমি আর সাইকেলটা বার করতাম না। গর্ডনের ঘরে ঢুকে আমি হাঁফ ছাড়লাম। রান্নাঘরে ঢুকে চা-এর জন্য উনোনে জল চড়ালাম— কলকাতা থেকে বেরোবার পর থেকে এই একটি মাত্র জিনিসই আমার সাথে সাথে ঘুরছে— যেখানে যাই সেখানেই আছে চা। তাই, চায়ের সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা দিন দিন যেন বেড়েই চলেছে। যখন আমি খুব খুশী তখনও এক কাপ চা চাই, আর যখন ক্লান্ত তখন চা-ই আমার সখা। তাই চা-কে আমি ভালোবাসি, আমি চা-প্রেমিক।

সেদিন রাতে গর্ডনের কাছ থেকে আরও অনেক তথ্য জানলাম। স্যান্‌ফ্র্যান্সিস্‌কো সম্পর্কে তথ্যগুলো সত্যি চমকপ্রদ বটে।

স্যান্‌ফ্র্যান্সিস্‌কো শহরের মূলে রয়েছে সোনা। সে অনেক দিনের কথা, স্যান্‌ফ্র্যান্সিস্‌কো শহরের গোড়াপত্তনই হয় সোনার জন্য। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বর্তমান সাক্রামেন্টো শহরের প্রায় একশ মাইল পূর্বে হঠাৎ আবিষ্কৃত হ'ল সোনার ধূলো অর্থাৎ ধূলোর মধ্যে পাওয়া গেল সোনার গুঁড়ো। আমেরিকানদের কাছে এটাই হ'ল সেই সময়কার বিরাট আবিষ্কার— তাদের ভাষায় "ওয়া-বু-উ-ম"। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল এই সংবাদ। ধূলোর মধ্যে যখন সোনার কণা পাওয়া গেছে তার মানেই বুঝতে হবে ওখানে লুকিয়ে আছে সোনার খনি। বাতাসে বাতাসে সেই সংবাদ রটে গেল— শুধু আমেরিকাতেই নয়, পৃথিবীর চারদিকে।

কলম্বাসের স্বপ্ন এতদিনে সফল হতে চলেছে, পাওয়া গেছে গ্র্যাণ্ড খানের গুপ্ত ভাণ্ডার। পৃথিবীর চারদিক থেকে আসতে লাগলো মানুষ, স্যান্‌ফ্র্যান্সিস্‌কোর পাহাড়ী বন্দরে এসে ভীড়তে লাগলো জাহাজের পর জাহাজ। ইউরোপীয়রা আগের থেকেই সেখান হাজির ছিল। এবার দেখা দিল নতুন লোক— অস্ট্রেলিয়ান, রাশিয়ান, চীনা। এই শহরে এই ভাবেই প্রথমে চীনারা আসে। প্রথমে ছিল মাত্র পঁয়তাল্লিশ জন, আর আজকে প্রায় উনপঞ্চাশ হাজার।

সেই সময়কার ঘরবাড়ীগুলো ছিল ব্যারাক্ টাইপের— কাঁচা বসতি। কোন রকমে কয়েকশ' মিটার লম্বা দেওয়ালকে ঘিরে ছোট খুপরি ঘর। আর বনেদি ব্যবসায়ীদের জন্য কাঠের ঘর। বলাই বাহুল্য, সকলের ভাগ্যে সোনা জোটেনি। সোনার হুজুগের

পরে বিরাট ও ব্যাপকভাবে রেল লাইন তৈরীর ব্যাপারে প্রয়োজন হয়ে পড়ে হাজার হাজার শ্রমিকের। ১৮৬৯ সালের মে মাসে ক্যালিফোর্ণিয়ার গভর্ণর মিঃ লল্যাণ্ড প্রথম রেলগাড়ীর উদ্বোধন করেন। রেল লাইনের কাজ শেষ হ'ল বটে, কিন্তু শ্রমিকরা সেখানে থেকে গেল। এইভাবেই শুরু হ'ল স্যানফ্র্যান্সিস্‌কোর ইতিহাস।

১৯০৬ সালের ১৯শে এপ্রিল— স্যানফ্র্যান্সিস্‌কোর এক দুর্ভাগ্যের দিন। ভোরবেলা শুরু হ'ল কাঁপন, সম্পূর্ণ শহর কেঁপে উঠলো— দেখা দিল ভূমিকম্প। লোকে যখন বুঝলো যে এটা ভূমিকম্প, তার আগেই সব শেষ। ভোর পাঁচটার সময়, অধিকাংশ লোকই তখন বিছানায় শুয়ে, অনেকে ঘুমন্ত অবস্থাতেই ছাদ চাপা পড়েছে, অনেকে মাটির ধ্বসে বিলীন হয়েছে, আবার অনেকে আগুনে পুড়ে ছাই হয়েছে। এই ভূমিকম্পটা বেশিক্ষণ ধরে চলেনি। মাত্র আটচল্লিশ সেকেণ্ড, এক মিনিটও নয়, তারই ফলে শহর প্রায় শ্মশান! কাঠের বাড়ীতে হ্যারিকেন উল্টে পড়ে অথবা বিছানায় মোমবাতি পরে হাজার-হাজার কাঠের বাংলো শুকনো জঙ্গলের মত দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে।

গর্ডনের মতে স্যানফ্র্যান্সিস্‌কোর বাসিন্দারা আস্ত পাগল, শুধু পাগল নয়, অর্থপিশাচও বটে। বর্তমানের অর্থকরী সমাজ সত্যি অভাবনীয়! অর্থের জন্য মানুষ পোকার মতো আগুনে ঝাঁপ দিতেও দ্বিধা করে না।

গর্ডনের এই ধরণের উক্তিতে আমি সত্যি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম— বিশেষ করে ওর মতো একজন সুশিক্ষিত আমেরিকানের মুখ থেকে আমি এই ধরণের কথা আশা করিনি। অবশ্য পরে আমি ওর মুখ থেকে সব শুনে ওর সাথে একমত না হয়ে পারিনি। গর্ডন নিজে ভূমিকম্প-বিশারদ, এ সম্পর্কে ওর অগাধ পাণ্ডিত্য। ওর আইডিয়াটা আমার ভাষায় লিখছি:

১৯০৬ সালের সেই ভয়াবহ দিনগুলোকে আজ ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে তার কোন স্বাক্ষরই নেই। অতীতের কোন চিহ্ন নেই বটে, কিন্তু তাই বলে ভূমিকম্পের সম্ভাবনা আগের থেকে কোন অংশে কম নয়। সিস্‌মোলজিস্টদের মতে এই শহরের ভূ-গর্ভ একটা বিরাট মরণ-ফাঁদ। ১৯০৬ সালের মতো যে কোন মুহূর্তে এখানে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হতে পারে। ভিতরকার রুদ্ধ রাসায়নিক গরল যে কোন সময় ভূ-তল ফাটিয়ে বেরিয়ে পড়তে পারে, সামান্য একটু নড়ন— ব্যস, তাতেই সম্পূর্ণ শহরের মরণ। ভূ-তলের মাত্র এক মিটারের পরিবর্তনের ফলে এইসব বিরাট বিরাট পাথর ও সিমেন্টের মজবুত বাড়ীঘর তাসের বাড়ীর মতো ভেঙে পড়বে।

সকলেই একথা জানে, এ শহরটা টিকে আছে একমাত্র ভগবানের দয়ায়। শহরের কর্তৃপক্ষ সে কথা ভালোভাবেই জানেন, অথচ তবুও তাঁরা এ স্থান ত্যাগ করতে রাজি নন। হঠাৎ দুর্ঘটনার জন্য তাঁরা প্রস্তুত— অ্যাম্বুলেন্স, হাসপাতাল, দমকল,

সব কিছুরই শক্তি দিনের পর দিন বাড়ানো হচ্ছে, কিন্তু ভূমিকম্প-বিশরদদের মতে এ সবই ছেলেমানুষী। হাসপাতালগুলো যখন ধ্বসে পড়বে, শহরে যখন আগুন ছড়িয়ে পড়বে, রাস্তাঘাটে তখন শুরু হবে এক বিরাট অরাজকতা।

ক্যালিফোর্ণিয়া ও বার্কলে ইউনিভারসিটির বিজ্ঞান-বিশেষজ্ঞদেরও এই একই মত। অনেক জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি এ সম্পর্কে নিত্য-নতুন তথ্য বের করছেন, সকলেই একমত— এখন বা অদূর ভবিষ্যতে যে কোন সময় ভূমিকম্প হবেই হবে।

ডক্টার বল্ট (Dr. Bruce Bolt) বার্কেল ইউনির্ভাসিটির সিস্‌মোলজিস্ট, জর্জ গেটস্‌ (George Gates) ইউ. এস. জিওলজিক্যাল সার্ভে, কার্ল (Karl V. Streibrugge), স্ট্যান্‌লে স্কট (Stanley Scott), এই ধরণের আরও অনেক টপ্‌ ক্লাসের বিজ্ঞানীরা রোজই এ সম্পর্কে ভেবে ভেবে মাথার চুল পাকাচ্ছেন, কিন্তু তাঁদের সে চেষ্টা ভূমিকম্প রোধ করতে পারবে কি?

আমি গর্ডনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম— তোমার মতে বাঁচবার উপায়টা কি?

—উপায় একমাত্র শহর ত্যাগ, কিন্তু কে ছাড়বে এই শহর? সবাই সবাইকে বলছে— দেখা যাক্‌ সবাই যদি মরে, আমরাও মরব— সাধারণ লোক থেকে কুবেরপতি, সকলের একই কথা। তবে এ ছাড়াও বিজ্ঞানীরা আর একটা উপায়ের কথা ভাবছেন— ভূ-গর্ভের যে আগ্নেয় তরল পদার্থের চাপে ভূমিকম্পেব সৃষ্টি হবে, সে চাপটাকে যদি কোন রকমে শহর থেকে অনেক দূরে নিউক্লিয়ার এক্সপ্লোশনের সাহায্যে বার করে দেওয়া যায় তাহলে হয়তো স্যানফ্র্যান্সিস্‌কো রক্ষা পেতে পারে। তবে এই থিওরির রূপদান করার জন্য বিরাট শক্তি ও সামর্থ্যের দরকার। স্যানফ্র্যান্সিস্‌কোর তদন্ত কমিটি (Joint Committee on Seismic Safety) এ বিষয়ে ভেবে দেখছে। অবশ্য তার আগেই যদি সব শেষ হয়ে যায় তাহলে....।

গর্ডনের কথায় অবিশ্বাস করি তার উপায় কি? ও নিজে একজন বিশেষঞ্জ, তা ছাড়া এসব বিজ্ঞানতথ্য আজ সকলেই জানে। আমি শুধু ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, —তাহলে তুমি আছো কেন, পালিয়ে যাও না কেন এই মুহূর্তে?

হেসে ও জবাব দিল—

—আমি দেখতে চাই ভূমিকম্পের ফল— আমি হতে চাই একজন স্বাক্ষী— অবশ্য যদি বেঁচে থাকি। অথবা বলতে পারো, আমিও এই শহরবাসীদের মতোই আর এক পাগল।

পরের দিন আমি স্যানফ্র্যান্সিস্‌কো বে'র ওপারে অক্‌ল্যাণ্ডে এলাম। কোথায় যাব তার কোন ঠিক্‌ নেই, অনেকটা ইতঃস্ততভাবে ঘুরছিলাম। বে'র ঠাণ্ডা বাতাসটাকে এড়াবার জন্য আমি অক্‌লাণ্ডের ভিতর ঢুকলাম,— সামনেই পেলাম বিরাট একটি এভেন্যু, এটা আসলে রাস্তা— রাস্তাটার নাম চোদ্দ নম্বর রাস্তা (14th Street)। ফুটপাতের ঠিক্‌ ওপরেই দেখলাম ছোট্ট একটা বার। বারের সামনে ছোটখাটো ভীড়।

সাধারণতঃ ভীড় দেখলে আমি এড়িয়ে চলি, কিন্তু এই ভীড় আমাকে আকর্ষণ করলো। কাছে যেতেই নজরে পড়ল ফুটপাতের ওপর কাপড় পেতে তাতে লেখা হচ্ছে ব্ল্যাক পান্থার (Black Panther)—তা দেখবার জন্যই আশ-পাশের উৎসুক জনতা। নিশ্চয়ই প্রসেশনের জন্য। ব্ল্যাক্ প্যান্থার— ব্ল্যাক পান্থার নামটা খুবই পরিচিত মনে হচ্ছে, কোথায় যেন শুনেছি অথবা পড়েছি। একটি ছেলেকে জিজ্ঞেস করলাম— ব্ল্যাক্ প্যান্থার জিনিসটা কি ভাই?

ছেলেটি আমাকে সোজা আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল— ওই তো এদের অফিস, ভেতরে যাও সব ইন্‌ফরমেশন পাবে— চোদ্দ নম্বর রাস্তা, আর আটহাজার পাঁচশো এক নম্বরের বাড়ী। ভেতরে ঢুকতেই একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করলো— কি চাই?

—কি চাই! তাই তো বটে! আমি মাথা চুলকে জবাব দিলাম— আসলে আমার কিছুই চাই না।

—তবে ভেতরে ঢুকেছো কেন?

যে লোকটি আমাকে প্রশ্ন করছিল— তার বিরাট চেহাবা, তার ওপব কালো চক্‌চকে চাম্‌ড়ার জ্যাকেট— নিগ্রো। আমার কিন্তু কিন্তু ভাব দেখে সে আমাকে পাশের একটা অফিসে নিয়ে গেল। একটা গোল টেবিল, তার চাবপাশে কয়েকটা চেয়ার ও টুল, পাশের একটা আল্‌মারীতে বই-পত্র ঠাসা, ঘরের এক কোণে প্রচুর খবরের কাগজ, মনে হয় দৈনিক পত্রিকা হবে।

—হ্যালো, আপনার নাম কি? টেবিলের এক কোন থেকে প্রশ্নটা এগিয়ে এল। আমি আমার নাম বললাম।

—এখানে কি করতে এসেছেন?

—বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য নেই, রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ কৌতুহলী হয়েই এখানে ঢুকেছি।

—কোথায় থাকেন?

—এখানে আমার জানাশুনো এক ভদ্রলোক আছেন, তার কাছে কয়েকদিনের জন্য উঠেছি।

—তারমানে আপনি এখানকার লোক নন।

—আজ্ঞে না, আমি আমেরিকান নই, আমি সামান্য একজন ভারতীয় পর্যটক।

ভারতীয়? সকলেই অবাক হয়ে এ ওর দিকে তাকাতে লাগলো— আমার উত্তর শুনে ওরা মনে হয় আশ্চর্য হয়ে গেছে।

—সেকি? বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি যে আমি ভারতীয়! এই দেখুন আমার পাশপোর্ট এই বলে আমি আমার পাশপোর্টটা ওদের দিকে বাড়িয়ে ধরলাম। তারপর তাদের আমি বুঝিয়ে বললাম আমার পর্যটন পরিকল্পনা।

তাদের মধ্যে একজন আমাকে হাসিমুখে বসতে বলে পাশপোর্টটা আমার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললো,

—আমরা ভেবেছিলাম স্পাই। ওদের কথা শুনে আমি হা-হা করে হেসে উঠলাম।

—হাসবেন না মশাই— আমাদের এটা একটা পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশন, কাজেই পেছনে পিগ্ লেগেই আছে। ভদ্রলোক আমাকে তাঁর অর্গানাইজেশন সম্পর্কে সব বিষয় জানাতে লাগলেন।

ব্ল্যাক্ প্যান্থার ফর সেল্ফ ডিফেন্স (Black Panther for self defense —এই পার্টির স্রষ্টা হুয়ে নিউটন ও ববি সীল Huey Newton, Bobby Seale)। ১৯৬৬ সালে এর গোড়া পত্তন হয়। অধিকাংশ মেম্বারই নিগ্রো, তবে অনেক সাদা চামড়াও আমাদের মেম্বার। গভর্নমেন্ট আমাদের মিলিট্যান্ট টেরোরিস্ট বলে ডিক্লেয়ার করেছে। শুধু তাই নয়, ১৯৬৮ সালে এড্গার হুভার আমরা দেশের এক নম্বর শত্রু বলে ঘোষণা করেছে। অবশ্য আমরা তারজন্য কেয়ার করি না। আসলে সরকারই আমাদের প্রচার যন্ত্র।

আমি তাদের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে জানতে চাইলে ভদ্রলোক জানালেন যে, তাঁদের পার্টি আসলে নিগ্রোদের জন্য অথবা বলা যেতে পারে গরীবদের বাঁচাবার জন্য, গরীবদের প্রতিনিধি। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ধনীদের রক্ষা করবার জন্য রয়েছে সরকার, কিন্তু যারা পথের মানুষ— যাদের পয়সা নেই, চাকরী নেই, অথচ মাথার ওপর বিরাট সংসারের দায়িত্ব, তাদের হয়ে কেউ দাঁড়ায় না। লক্ষ-লক্ষ ডলার ভিয়েৎনামে মানুষ মারার জন্য ব্যয়িত হচ্ছে আর এদিকে দেশের মানুষদের বাঁচাবার জন্য তাদের নেই পয়সা। ক্যাপিটালিজম্ আর কাকে বলে!

ভদ্রলোক উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বুঝলাম এখানে আর বেশিক্ষণ না বসাই উচিত। আজ পর্যন্ত পলিটিক্স্ বুঝিনি, কাজেই আর বোঝার বোঝা করবারও প্রয়োজন নেই। বিশেষ করে, আমি ওই লাইনের লোক নই অথবা সাংবাদিকও নই। ওখান থেকে ওঠবার জন্য তৈরী হ'লাম। ভদ্রলোক উপযাচক হয়েই আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন,

—উঠছেন তাহলে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, যদি হাতে বাড়তি সময় থাকে তাহলে আর একদিন আসা যাবে— কি বলেন?

—দাঁড়ান এক মিনিট। আপনি তো ভূ-পর্যটনে বেরিয়েছেন, খুব ভালো। আপনি ভাগ্যবান মানুষ, আপনার কথাই আলাদা— ববী সীলের সঙ্গে দেখা করবেন না কি বলুন?

—ববি সীল মানে....

—মানে আমাদের লীডার, ফাউণ্ডার প্রেসিডেন্ট— ভদ্রলোক আমার মুখ থেকে কথাটা কেড়ে নিয়ে জবাব দিলেন।

মনে মনে ভাবলাম— ক্ষতি কি। এটাও আর এক ধরণের অভিজ্ঞতা। রাজি হয়ে গেলাম। ভদ্রলোকের সাথে ওখান থেকে বেরিয়ে পাশের একটা দোকানে ঢুকলাম। দোকানে আসলে প্রায় কিছুই নেই; দোকানের ভিতরে ঢুকে তারই পাশ দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠে এলাম। এখানে আমাকে অপেক্ষা করতে বলে তিনি ভিতরে ঢুকলেন— প্রায় দশ মিনিট পর তিনি হাসি মুখে বেরিয়ে এলেন— সব রেডি। তারপর কানের কাছে মুখ এনে খুব টপ্ সিক্রেট জানাবার ভান কবে মৃদুস্বরে বললেন,

—সামনের বছর তিনি অক্ল্যাণ্ডের মেয়রের জন্য ইলেক্‌শনে দাঁড়াবেন, তাই খুব ব্যস্ত— তা সত্তেও আপনাকে তিনি রিসিভ করবেন।

পাশের ঘরে ঢুকতেই নজরে পড়লো কালো চামড়ার জ্যাকেট পবা, কালো রঙের বিরাট চেহারার একজন নিগ্রো ভদ্রলোক। নিগ্রোদের চেহাবার প্রশংসা কবতেই হবে। শক্ত ও মজবুত শরীরের ওপব, অতি কালো কোঁকড়ানো ঝাঁকড়া চুল— সত্যি প্রকৃতির এক অপূর্ব সৃষ্টি।

চেয়ারের ওপর সঙ্গীদের সাথে বসে আছে যেন ব্ল্যাক্ প্যান্‌থাব! ববী সীলের সাথে পরিচিত হলাম। ও আমাকে হাসিমুখেই ওয়েলকাম জানালো।

তারই পাশের চেয়ারে তার সেক্রেটারী, টেবিলেব ওপর রয়েছে একটা রিভলভার। আমি সেইদিকে তাকিয়ে তাকে প্রশ্ন করলাম,

—রিভলভার কি চার্জ করা?

—অবশ্যই— সেক্রেটারী জবাব দিল।

—এটা কি আত্মরক্ষাব জন্য না অন্যকে রক্ষার জন্য?

—বলতে পারেন এটা আমাদের সিম্বল।

—আপনারা তাহলে সংগ্রামী পুরুষ— কি বলেন?

—না, ঠিক তাই নয়।

—শুনলাম আপনি নাকি সামনের বছর মেয়র পদের জন্য ইলেক্‌শনে দাঁড়াচ্ছেন?

—আমরা সে সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

—এর পরের বার যখন আসবো, তখন নিশ্চয়ই মেয়র ববী সীলের সাথে দেখা করা আজকের মত সহজ হবে না। যাই হোক, যদি দেখা না হয়, তার জন্য আজকেই আপনাকে আমার কন্‌গ্রাচুলেশন জানাচ্ছি। আমি হাতটা এগিয়ে দিয়ে করমর্দন করলাম। ববী সীল আমার কথায় বেশ সন্তুষ্টই হ'ল বুঝলাম।

—হ্যাঁ, কৌতূহলটা দমন করতে পারছি না, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?

—নিশ্চয়, বলুন।

—আপনি মেয়র হলে সবচেয়ে প্রথমে কোন প্রজেক্টে হাত দেবেন?

ববী সীল একটু চিন্তিত হ'ল, কিন্তু জবাবটা যেন তার তৈরীই ছিল। চেয়ারটার ওপর একটুখানি নড়ে চড়ে বসলো, তারপর তার সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে বললো,

—আমার প্রথম বছরের পরিকল্পনা হবে— এই অক্ল্যাণ্ডের যত নিগ্রো* পরিবার আছে তাদের সম্পূর্ণ প্রটেকশন দেয়া।

—সম্পূর্ণ প্রটেক্শন বলতে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন?

—চেয়ে দেখুন, আজকের স্যানফ্র্যান্সিস্কোর পথে-ঘাটে, অথবা নিগ্রো এলাকায় তারা অবহেলিত। ছোটদের জন্য নেই জুতো, নেই জামা— নো ফ্রি মেডিকেল ট্রিটমেন্ট। বড়দেব জন্য নেই চাকরী। স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং মিজারেবল্। ব্ল্যাক্ প্যানথার তাদের জন্য দাঁড়াবে— আমাদের পার্টির এটাই হচ্ছে প্রথম করণীয়।

—আর একটা প্রশ্ন, কিছু মনে করবেন না যেন— কিভাবে আপনি ইলেক্শনে দাঁড়াবেন? শুনেছি ইউনাইটেড স্টেটস্-এ ইলেকশনের জন্য হাজাব হাজার ডলার খরচা হয়, আপনাব পার্টিব সেই সামর্থ্য আছে কি?

—অপনাব প্রশ্নটা ঠিক সাংবাদিকদের মতো— শুনুন, আমাব হাতিয়ার টাকা নয়— আমাব পবিচয়ই আমাকে দাঁড় করাবে।

নিগ্রো লিডাব এবাব উঠে দাঁড়ালো, তাকে বেরোতে হবে, যা ব্যস্ত মানুষ! আমার জন্য যে কিছুটা সময় দিয়েছে তার জন্য বিশেষ ধন্যবাদ জানালাম! সবাই বেরিয়ে পড়ল— আমিও আমাব পূর্ব-পরিচিত ভদ্রলোকেব সাথে বেরোলাম, তাকে জিজ্ঞেস কবলাম— আমার সাথে এককাপ চা খাবেন কি?

—অবশ্যই, তবে চা নয কফি— একগাল হেসে তিনি জবাব দিলেন।

স্যানফ্র্যান্সিস্কোতে প্রায দশদিন কাটিয়ে আমি পথ ধরলাম লস্ এঞ্জেলেসের দিকে। ওপব ওপব দেখে কোন শহবকেই যাচাই করা সম্ভব নয়, কাজেই আমিও স্যানফ্র্যান্সিস্কো সম্পর্কে ভালো-মন্দ কিছুই বলতে পাববো না, শুধু এক নজবে এই শহরের কিছুটা আমাব ডায়েরীতে লিখলাম।

স্যানফ্র্যান্সিস্কো থেকে লস্ এঞ্জেলেসের পথ আগের মতোই উঁচু-নীচু, রকি পাহাড়ের ওপব দিয়ে অতি চমৎকার রাস্তা। আমার পথে যাঁরা এই পথে সাইকেলে আসবেন তাঁদের আমি সাবধান করে দিচ্ছি, এ পথে সাধারণ সাইকেল নিয়ে আসবেন না— পাঁচ বা দশ গিয়াবের হাল্কা সাইকেল হলে খুবই ভালো।

লস্ এঞ্জেলেস্

সকাল দশটা নাগাদ আমি লস্ এঞ্জেলেস্ বা সংক্ষেপে এল-এ-তে পৌঁছলাম। আমার কাছে লস্ এঞ্জেলেস্ অনেকটা মরুভূমির মধ্যে একটা শহরেব মতো। শহরের বর্ণনা দিয়ে আমি আমার ডায়েরীর পাতা ভরতে চাই না, কিন্তু তার পারিপার্শ্বিক দেখে মনে হয় না যে, লস্ এঞ্জেলেসের মতো এতবড ও সুন্দর একটি শহর লুকিয়ে আছে— শহর মানে যা-তা শহর নয়, পৃথিবীব অন্যতম সেরা। এখানে আসতে হলে অবশ্যই পাহাড় ডিঙ্গোতে হবে। উত্তর-পশ্চিমে সান্তা মণিকা, উত্তরে স্যান্ গাব্রিয়েল, বে-ব দিকে পুয়েনত্ পর্বতমালা। এল-এ ঠিক যেন মাঝখানে একটি এ্যাম্ফিথিয়েটাব। ট্রেনের লাইন দেখে মনে হচ্ছে যে এই লাইন বসাতে ইন্‌জিনীয়ারদের গলদঘর্ম হতে হযেছে। শহরের ভিতরে এবং আশ-পাশেব নামগুলো স্প্যানিস। হবে নাই বা কেন, এই শহরের গোড়াপত্তন হয় স্প্যানিস মিশনারীর দ্বাবা। তারও অনেক পরে পাওয়া গেছে পেট্রোলের খনি। ব্যস— সঙ্গে সঙ্গে শুরু হ'ল বসতি! স্যান্‌ফ্র্যান্সিস্‌কোর সোনা আর লস্ এঞ্জেলেসেব পেট্রোল একটা দেশকে ধনী ও জনবহুল করার পক্ষে যথেষ্ট।

সান্ পেড্রো, বুয়েনা পার্ক, পিকো রিভেরা, আল্‌হাম্‌ব্রা, পাসাডেনা, এল্-এর সাথে এই স্প্যানীস্ নামগুলো বিশেষভাবে জড়িত। তার মানে এই এলাকাগুলো স্প্যানিস্‌দের আমল থেকেই বিদ্যমান অর্থাৎ সতেরো শ' আশি-'াঁচাশি খৃষ্টাব্দ থেকে।

বর্তমানে এল-এর রূপ বিরাট— আদি নামেব ফাঁকে ফাঁকে যুক্ত হয়েছে নতুন নাম, যথা— গ্লেন ডেল্, হলিউড, হান্টিংটন, ডোনি. লেক্‌উড, টারেনস্, লং বীচ, সীল বীচ্, বেডোন্‌ডো বীচ্ ইত্যাদি।

আমি আছি জীমের* সাথে স্যান্‌ফারনেন্‌ডো ভ্যালীতে।

জীমেব সাথে আমি অ্যাড্‌ভেঞ্চার করেছি; গ্রীসের ক্রীত্ দ্বীপে আমাদের পরিচয়। সে পেশায় জার্নালিস্ট। জীম এখন শহরের বাইরে, কিন্তু ওর স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের সাথে আমাব আগের থেকেই পরিচয় থাকাতে ওদের বাড়ীতে থাকার কোন অসুবিধাই নেই। ও আমাকে বিশেষ করে ওর সাথে থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। ওর বড় ছেলের বয়স বারো— খুব চট্‌পটে, বয়সে ছোট হলে হবে কি, কোন কোন

বিষয়ে ও আমাব চেয়ে অনেক বেশী জানে। লস্ এঞ্জেলেসের অন্যতম একটি বনেদী শহরতলীতে জীমের বাড়ী, এলাকার নাম স্যান্ফারনেন্ডো ভ্যালী। এগারোটা ঘর নিয়ে দোতলা বাড়ী, সাজানো বাগান। বাগানে রয়েছে অজস্র ফুলের বাহার আর মাঝখানে চমৎকার একটি পির্সিন।

এই এলাকায় প্রায় প্রত্যেকটি বাড়ীতেই রয়েছে এই ধরণের পির্সিন বা জলাধার— গরমের দিনে সাঁতার কাটার জন্য। আমেরিকানরা আমার মনে হয় খুব জল-প্রেমিক, অবশ্য খাবার জন্য নয়— আসলে সাঁতাবের জন্য। আমি ঠিক পুকুরের ধারঘেষা একটা ঘরে আছি; এটা হচ্ছে গেস্ট রুম। জীমের স্ত্রী ন্যান্সি, খুব আমুদে ধরণের, কোন জড়তাই নেই। অতি আপোন করা স্বভাব। নিজের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে তার সম্পর্ক ঠিক অন্তবঙ্গ বন্ধুর মতো। একসঙ্গে সাঁতার কাট্ছে, টেনিস খেলছে, বাজারে যাচ্ছে, দিনরাত হৈ-চৈ করেই কাটানো, আবার তারই ফাঁকে ফাঁকে রান্না-বান্না, ঝাড়ু দেওয়ল, বাগান পরিষ্কার করা, জামা-কাপড় ইস্ত্রি করা, সব কিছুতেই তিনি যেন সিদ্ধহস্ত।

হলিউড্

স্যান্ফারনেন্ডোর কাছাকাছিই হচ্ছে জগৎবিখ্যাত হলিউড্। হলিউড্ লস্ এঞ্জেলেসেরই একটি অংশ। সিনেমা জগতের স্বর্গ— সিনেমা-প্রেমিকদের কল্পরাজ্য। বড় বড় শহর দেখে একঘেয়েমি এসে গেছে, কাজেই এল-এর সব কিছুই খুঁটিয়ে দেখার ইচ্ছে আমার নেই। কিন্তু হলিউড্টা একবার দেখা দরকার।

ন্যান্সি আমার হলিউডে যাবার ইচ্ছা শুনেই লাফিয়ে উঠ্ল। ছেলে-মেয়েরা স্কুলে যায় সকাল সাতটায়, বাড়ী ফেরে দুটো নাগাদ। তারপর ওরা নিজেদের খেলাধূলা নিয়ে ব্যস্ত। আমি ন্যান্সিব সাথে একমত হয়ে গেলাম। পরে যথারীতি ছেলে-মেয়েরা স্কুলে চলে যাবার পর আমরাও বেরিয়ে পড়লাম। ন্যান্সির সাইকেলটা বল্তে গেলে একেবারে নতুন আর আমার সাইকেলটা সে তুলনায় সেকেলে। তা'হোক, কিন্তু আমার সাইকেলেব মর্যাদা আছে, আমি নিজেও এরজন্য গর্বিত কম নয়। ন্যান্সি তিন সন্তানের মা, কিন্তু ওকে দেখলে কিছুতেই বোঝার উপায় নেই যে স্পোর্টর্স জগতের সে যেন কলেজ স্টুডেন্ট। ওর সাথে সাইকেল চালিয়ে মজা আছে।

লস্ এঞ্জেলেসেরই আর এক কোণে হলিউড্। ঘন্টা দুয়েকের মধ্যেই আমরা ওখানে এসে হাজিব হলাম। বিরাট একটা কাঠের সাইন্বোর্ডে লেখা চোখে পড়ল 'স্বাগতম্' "Welcome To Hollywood"।

হলিউডের একটা রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছি। দুপাশে অজস্র বার, সিনেমা আর রঙ-বেরঙের সেলুন চোখে পড়তে লাগ্লো; এসব পার হ'য়ে আমরা এসে পড়লাম বিরাট এভেন্যুতে। এটা নর্থ হলিউড্। এগিয়ে চল্লাম সেন্ট্রালের দিকে। ন্যান্সি এবার আমাকে আঙ্গুল দিয়ে কয়েকটা লাক্জুরিয়াস্ ভিলা দেখিয়ে বলল— ওই

যে বাড়ীগুলো দেখছো— সিনেমা জগতের মূলধন ওখানেই লুকিয়ে আছে। কোটিপতি তো নয়, যেন কুবেরপতি। পৃথিবীময় এদের বিজ্‌নেস, সিনেমা ঠিক পেট্রোলের মতোই এক অদ্ভুত টাকার খেলা—

আমি ন্যান্‌সির দিকে তাকিয়ে বললাম— তার মানে সব বড় বড় সিনেমা আর্টিস্টরা এখানেই বাড়ী করেছে, নাকি?

—আরে ধ্যুৎ! সিনেমা আর্টিস্টরা আবার বড়লোক নাকি? ওদের মধ্যে সবাই কি আর গ্যাবী কুপার! আমি বল্‌ছি প্রডিউসারদের কথা। ওরাইতো আসলে হলিউডের মালিক।

সিনেমা জগৎ সম্পর্কে আমার ধারণা বুঝলাম নেহাৎই ছেলেমানুষী।

বড় এভেন্যুটা ধরে এগোতেই সামনে নজরে পড়লো— বিরাট একটা লোহার থামের ওপর লেখা "Warners"। থামের কাছাকাছি এসে আমরা থামলাম।

দশতলার একটা বিরাট মডার্ন বিল্ডিং। ন্যানসি বিল্ডিংটার দিকে তাকিয়ে বললো— এটাই ওয়েরনার্স প্রোডাক্‌সন। চল ভিতরে যাওয়া যাক। আমার এক বন্ধু এখানে কাজ করে, ওর যদি সময় থাকে তাহলে একসঙ্গে কফি খাওয়া যেতে পারে।

বাড়ীটার একতলা অনেকটা কাঁচঘরের মতো। ঘোরানো দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকতেই দেখি আর এক জগৎ, বিরাট একটা হলঘর— বিভিন্ন ধরণের অর্কিড ঝুলছে আর রয়েছে হরেক রকম বাহারি গাছ। পরপর অনেকগুলো সোফা পাতা রয়েছে, এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছে কর্মব্যস্ত লোকজন। পাশাপাশি চারটে লিফট। লিফ্‌টের পাশেই বিভিন্ন দিকে যাবার ডিরেক্‌শন দেওয়া হয়েছে। আমরা এগিয়ে এলাম রিসেপ্‌শন ডেস্‌কের দিকে।

ন্যান্‌সি রিসেপ্‌শনিস্ট ভদ্রমহিলাকে জিজ্ঞেস করলো,

—ক্রেগ হোভার প্লীজ্।

রিসেপ্‌শনিস্ট সঙ্গে সঙ্গে রিসিভার তুললেন— তারপর ন্যান্‌সির দিকে তাকিয়ে বললেন— চার নম্বর কেবিনে যান, ক্রেগ আপনার সাথে কথা বলবে। রিসেপ্‌শন টেবিলের পাশেই পরপর অনেকগুলো টেলিফোন কেবিন। ন্যান্‌সি চার নম্বর কেবিনে ঢুকে গেল। ক্রেগের সাথে আমাকে আলাপ করিয়ে দিল। আমরা সবাই মিলে সামনের সেল্‌ফ-সার্ভিসে ঢুকলাম। ক্রেগ্ ভদ্রলোক যুবক ও সাধারণ আমেরিকানদের মতোই চট্‌পটে। ন্যান্‌সির বাল্যবন্ধু, ওরা একই কলেজে পড়াশুনা করেছে। আমার ভূ-পর্যটনের ভূয়সী প্রশংসা করে ক্রেগ বললো, —ওর এখন হাতে খুব বেশী সময় নেই, তবে আমাদের এদিক্-ওদিক্ ঘুরিয়ে দেখাবার জন্য ও ভিজিটিং সার্ভিসের সাহায্য চাইতে পারে। আমরা রাজি হয়ে গেলাম।

ক্রেগ্ এখানকার অন্যতম একজন অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেটর। সে আমাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল মেরী লিজ্‌বাহের সাথে। সংক্ষেপে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে ক্রেগ্ চলে গেল। ক্রেগ্ পরের দিন ন্যান্‌সির বাড়ীতে আসবে বলে বিদায় জানালো।

মেরীর সাথে আমরা ভিতরে ঘুরতে লাগ্‌লাম। এটা আসলে স্টুডিও নয়, অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং। এখানকার কাজ প্রধানত পাব্‌লিক রিলেশন, ফাইনান্‌সিয়াল ও রীল সেটার আপ করা। ভিতরে একটা ছোটখাটো সিনেমাও আছে। এখানে বিভিন্ন ধরণের সিলেক্‌শন কমিটিও রয়েছে। এখানে বিভিন্ন ধরণের, যেমন বই বাছাই, ডিরেক্‌টর বাছাই, আর্টিস্ট বাছাই এবং এই ধরণের আরো অনেক কিছু হয়। স্টুডিও এখান থেকে প্রায় মাইলখানেক দূরে। আমরা ওখানকার ভিজিট শেষ করে বেরিয়ে পড়লাম স্টুডিওর দিকে। মেরীর গাড়ীতেই উঠ্‌লাম, কারণ সাইকেলে কবে যেতে একটু সময় নেবে, ওর হাতে অত সময় নেই।

স্টুডিও মানে একটা বিরাট বাগান-বাড়ী, ছোটখাটো অনেকগুলো বাড়ী আর সব বাড়ীগুলোই বিভিন্ন ধরণের সাজ-সরঞ্জামে ভর্তি। আমরা সরাসরি চলে এলাম একটা রেন্‌জে— আশ-পাশে কেউ নেই। রেন্‌জের ভিতরে ঢুকলাম। দেখে মনে হয় অনেকদিনের পুরোনো একটা কাঠের বাড়ী, বাইরে চৌবাচ্ছা, ঘোড়ার সেল, ঘাস আর কয়েকটা এক্কাগাড়ী, কিন্তু ঘোড়া নেই। মেরীকে জিজ্ঞাসা করতেই উনি বললেন যে এখানকার কোন স্টুডিওতেই ঘোড়া বাখা হয় না। ঘোড়া রাখার অনেক ঝামেলা, তবে সস্তায় ফিল্‌মের জন্য আশ-পাশের থেকে ঘোড়া আনা হয়। এব জন্য বযেছে প্রচুর খামার। আজকালকাব সেরা বাজার হচ্ছে ওয়েস্টার্ণ ফিল্ম অর্থাৎ "কাউ বয়"-এব মার্কেট। মেরী আমাদেব বুঝিয়ে দিল যে আজকাল ফিল্ম জগৎটা হচ্ছে টেক্‌নিকাল। উদাহরণস্বরূপ, যে সব ফিল্ম আগে আউটডোর সুটিং হতো অথবা বিভিন্ন দেশে গিয়ে ফিল্ম তুলতে হতো, আজকাল সে সব কিছুই হয় ইন্‌ডোরে। সব কিছুই ক্যামেরাব কারসাজি। বড় বড় শহরেব এবং বিভিন্ন দেশের ডকুমেন্টারী ফিল্ম অতি সস্তাদরে কিনতে পাওয়া যায়, সেগুলো নিয়ে একটু অ্যাড্‌জাস্টমেন্ট করেই আজকালকাব ফিল্ম তৈরী হয়। বলাই বাহুল্য যে এর জন্য রয়েছে টেক্‌নিসিয়ান্‌দেব বাহাদুরী। এই হলিউডে পৃথিবীর সব দেশেরই এবং প্রায় সব সমাজেরই ডকুমেন্টারী ফিল্ম আছে। ছোট-খাটো এই ধরণের ফিল্ম কেনবার জন্য উঠছে প্রচুর সংস্থা। এই তো কিছুদিন আগে আমাদের একজন খদ্দের বিক্রি করলো আসামের উপজাতিদেব সম্পর্কে একটা ফিল্ম। সব রকমেবই জিনিষ তৈরী রাখ্‌তে হয়— কখন কি কাজে লাগে বলা যায় না।

আমরা মেরীর সাথে মোটরে ঘুরতে লাগলাম তার স্টুডিওতে। এটাই সব নয়— আল্‌বুকার্কেও এদের রেনজ্‌ রয়েছে প্রায় দু'হাজার একর জমির ওপর। আজকাল সেখানেই সুটিং চলছে। সত্যি কথা বলতে কি, সিনেমা জগতে আমার আনাগোনা একেবারে নেই বললেই চলে, আর এ সম্পর্কে আমার জ্ঞানও খুব সীমিত। কাজেই মেরী আমাকে যা দেখাচ্ছে বা যা বলছে তাই আমার কাছে চমক্‌প্রদ। ঘণ্টাখানেকের একটা চক্কর লাগিয়ে আমরা আমরা ফিরে এলাম এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং-এর কাছে। মেরীকে ও ক্রেগকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ দিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

হলিউড্! আমি অবশ্য আগে কোনদিনই ভাবিনি যে হলিউডে যাবো— এটা অনেকটা হঠাৎ হয়ে গেল। কাজেই এখানে কোথায় যাবো এবং ঠিক্ কি উদ্দেশ্য তা আমার জানা নেই। কাজেই ন্যান্সির সাথে এদিক্-ওদিক ঘুরে আমরা এসে থামলাম একটা কফি হাউসের সামনে— কিছু খেতে হবে। বারের ভিতর খুব বেশী লোক নেই— আমরা দুটো মিল্ক শেক্ ও চিকেন রোস্টের অর্ডার দিলাম।

চিকেন রোস্ট অনেকটা হট্-ডগের মতোই বাজারে চলে। বাংলাদেশের যেখানেই যাওয়া যাক্ না কেন, অন্তত ফুলুরি-বেগুনি জুটবেই; ঠিক সেই রকম আমেরিকার সব জায়গাতেই হট্-ডগ্ ও চিকেন রোস্টের দাম এক প্লেট ভর্তি ভাতের চেয়ে কম।

এই বারটির নাম হলিউড্ কর্ণার। খারাপ নয়। আমি ও ন্যান্সি একটা টেবিলকে কেন্দ্র করে বসলাম। আমাদের ঠিক পাশের টেবিলের এক ভদ্রলোক আমাদের দিকে বারবার তাকাচ্ছেন, অনেকটা চেনা-চেনা ভাব। সেদিকে আমি ন্যান্সিব দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম—

—তুমি ভদ্রলোককে চেন নাকি?

ন্যান্সি কালো আমেবিকান ভদ্রলোকের দিকে একবাব তাকিয়ে আমাকে জানালো,

—না, আমার সাথে ওনাব পরিচয় নেই।

আমাদের খাওয়া প্রায় হয়ে এসেছে, এমন সময় ভদ্রলোক আমাদেব দিকে এগিয়ে এলেন। অতি বিনয়ে এবং হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলেন— কি, নতুন নাকি?

অদ্ভুত ধরণের প্রশ্ন, তবে জবাবটা আমার জানাই ছিল।

—না, অনেকদিনের পুরোনো।

—বুঝতেই পারছি।

ভদ্রলোক উপযাচক হয়েই আত্মপরিচয় দিলেন। তিনি নাকি এক আসাধারণ মানুষ, হলিউডের প্রত্যেকটা অলি-গলি তাঁর চেনা, শুধু তাই নয়, প্রত্যেকটা প্রোডাক্‌শনের সাথেও তাঁর দহরম-মহরম। নাম হারভে।

বুঝলাম— এ লাইনের দালাল। ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন— আপনার কোন লাইনে যাবার ইচ্ছা সেটা শুধু জানান, এখানে বসেই আপনার সব কাজ হাসিল হবে। ভদ্রলোককে আমি তাঁরই মতো বিনয়ী হয়ে বললাম— আমার মনে হয় আপনি আপনার মহামূল্য সময় ও প্রতিভার অপচয় করছেন। সিনেমা লাইনে নামার জন্য আমরা এখানে আসিনি। আমার বন্ধু ন্যান্সি স্যান্‌ফারনেন্‌ডোতে থাকে আর আমি তার কাছে বেড়াতে এসেছি। আর সিনেমা লাইনের সব রকম খবরাখবরের জন্য আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুও রয়েছে, কাজেই বুঝতে পারছেন...আমি ভদ্রলোককে এড়াতে চাইলাম। কিন্তু অত সহজেই ছাড়া পেলাম না, আমি তাঁকে বললাম যে ওয়ার্ণার ব্রাদারস্-এর ক্রেগ্ আমাদের বন্ধু....

—ক্রেগ— ক্রেগ্ হোভার, হি ইস এ নাইস্ বয়, কিন্তু এ লাইনে ও একদম নতুন। ভদ্রলোক আমার কথাটা লুফে নিয়ে তাঁর কথায় এলেন— ওরা জানেটা কি? আমার বয়স প্রায় পঞ্চান্ন, ওয়ার্ণার ব্রাদারস্‌কে আমি প্রায় জন্মাতে দেখেছি...ভদ্রলোক অনর্গল বকে চললেন।

আদি ওয়ার্ণার ছিল নিউ ইয়র্কে। সেখানেই তাদের শুরু। জ্যাক্ ওয়ার্ণারের বাবা ছিলেন একজন সাধারণ মুচী, নতুন জুতো তৈরী আর পুরানো জুতো মেরামত করাই তাঁর পেশা। তিনি ছিলেন নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে, তাঁরই ছেলে জ্যাক্ ওয়ার্ণার, বাবার মতো মুচী না হয়ে বেছে নিলেন অন্য পথ। তিনি ছোট্ট একটা হাতে চালানো বড় কলের গানের মতো একটা কিনেটোস্কোপ (Kinctoscope) কিনলেন; সেই হচ্ছে সিনেমার আদিযুগ। সেই যন্ত্রটার বাঁদিকে এক পেনি ফেলে চোখ লাগিয়ে দেখতে হয়। সেইগুলো ছিল ঠিক স্লাইড্স্-এর মতো, খুব তাড়াতাড়ি হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে তাকে অনেকটা সজীব করা হতো। তারপর আস্তে আস্তে উঠ্‌তে লাগলো সিনেমা জগতের ধাপ— কিনেটোস্কোপ, ফ্যান্টাস্কোপ, ভিটেস্কোপ, বায়স্কোপ, ইত্যাদি।

নিউ ইয়র্কে তাঁদের স্বাধীনতা ছিল না। অধিকাংশ সময়েই পুলিশের তাড়া খেতে হ'ত, এবং কয়েকবার নিউ ইয়র্ক পুলিশ ওয়ার্ণারের যন্ত্র বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছে। সেই অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচবার জন্যই তারা হলিউডে এসে উঠেছে। তার আগে ঠিক একই কারণে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ থেকেই লস্ এঞ্জেলেসে একে একে আরও অনেকেই হলিউডে এসে জুটেছে। নির্বিঘ্নে পুলিশের হাত এড়িয়ে মেয়েদের নিয়ে একটা কারবার খোলার এমন অপূর্ব জায়গা তখন আমেরিকায় বিরল। আমেরিকান আদিবাসী ও বনজঙ্গলের মধ্যে নির্বিঘ্নে স্যুটিং করা আব ঠিক পাশের বর্ধিষ্ণু শহব লস্ এঞ্জেলেস বা স্যান্‌ফ্র্যান্সিস্‌কো গিয়ে তা দেখিয়ে পয়সা বোজগার করা। আজকের এই হলিউড্ এইভাবেই গড়ে উঠেছে।

আমরা উঠলাম— কারণ ভদ্রলোক যেভাবে তথ্য সরবরাহ করতে আরম্ভ করেছেন, বেশীক্ষণ শুনলে নিশ্চয়ই দক্ষিণা দিতে হবে। আমরা তাঁকে কোনরকমে এড়িয়ে আবার রাস্তায় পড়লাম। ন্যান্সি চলার পথে আমাকে হলিউড্ সম্পর্কে আরও কিছু কিছু তথ্য জানাতে লাগল; সেই তথ্যগুলোর কিছুই আমি আগে জানতাম না, তথ্যগুলো ঠিক উপেক্ষা করারও নয়, আমি তারই কিছুটা বিবরণ দিচ্ছি। বলাই বাহুল্য যে হলিউডের প্রধান সম্পদ হচ্ছে সিনেমা ইণ্ডাস্ট্রী।

প্রতি বছর আমেরিকায় প্রায় ছ'শ ফিল্ম প্রোডাক্শন হয় আর তার অধিকাংশই আসে হলিউড্ থেকে। ছ'শ— লঙ্ মিটার সে একটা বিরাট অংক। সমগ্র ফ্রান্সে বছরের প্রোডাক্শন হচ্ছে একশ আর জার্মানীতে (পঃ) দুশ। আমেরিকার প্রডিউসারদের সবাই যে হলিউডে থাকে তা নয়, দিন দিন হলিউডের বাজার কমে আসছে।

তবে হলিউডের নামটা যাবে কোথায়! বড় বড় সিনেমা আর্টিস্টরা হলিউডে তাদের বাড়ী করেছে। চার্লি চ্যাপ্লিন যদিও এখন স্যুইজারল্যাণ্ডে আছেন, কিন্তু তাঁর প্রথম বাড়ী ছিল হলিউডেই। নামকরা অনেক পুরোণো ও নতুন অর্টিস্টদের সাজানো বাংলো হামেসাই চোখে পড়ে। তাদের মধ্যে আছেন— গ্রেটা গার্বো, জন গিলবার্ট, রুডলফ্ ভালেন্টিনো, জন ব্যারিমোর, মেরী অ্যাস্টাব, মন্টগোমারি, গ্যারী কুপার, মারলো ব্রাণ্ডো, এলিজাবেথ টেলর, ইত্যাদি আরও অনেক।

কয়েকদিন পর হঠাৎ খুব ভোরবেলা বাগানেব পাথরগুলো খস্খসিয়ে উঠল— মনে হচ্ছে কেউ ভারী জিনিস টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি বিছানায় উঠে বসলাম। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি একটা বিরাট চেভ্‌রোলেট আস্তে আস্তে ভিতরে ঢুকছে। ব্যাপার কি— এত ভোরে আগন্তুক! তাড়াতাড়ি গেঞ্জিটা পরে দরজা খুলে বেরিয়ে এলাম। গাড়ীর ভিতর থেকে বেবিয়ে এলেন একজন ভদ্রলোক— চুল ছোট করে কাটা, কিন্তু মুখ দাড়িতে ঠাসা। আমি তাঁর দিকে এগিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,

—গুড মর্ণিং! আমি আপনার কোনো উপকারে আসতে পারি কি? ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। তারপর মিনিট পাঁচেক ধরে আমাকে ঘুবে ফিবে দেখতে লাগলেন, তারপর আমাব চোখেব ওপর সরাসরি তাকালেন। আমি তাঁব আচরণে একটু অস্বস্তি বোধ কবতে লাগলাম— সেই ভাবটা কাটাবার জন্য জিজ্ঞেস করলাম,

—আমি আমেরিকান নই, আমি ইণ্ডিযান, জীমেব বন্ধু, আমার নাম বিমল। আপনি কি ন্যান্সির সাথে কথা বলতে চান?

—নিশ্চয়ই, ডাকো তাকে। আমি ঘবে ঢুকে ন্যান্সিব দরজায় মৃদু আঘাত করলাম— ভিতর থেকে তার স্বরে ভেসে আসতেই গুড্ মর্ণিং জানিয়ে তাকে জানালাম যে একজন ভদ্রলোক তার জন্য অপেক্ষা করছেন। আমি বাইবে বেরিয়ে এলাম। ভদ্রলোকের সাথে একটু আলাপের চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমার চেয়ে ভদ্রলোকের উৎকণ্ঠাটা বেশী। তিনি নিজেই শুরু করলেন,

—আপনি জীমের বন্ধু?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—জীমতো আজকাল বাইরে আছে তা আমি জানি। তা আপনিই কি এখন তার হয়ে সবকিছু দেখাশুনা করছেন?

—না ঠিক্ তা নয়— তবে...

—তা বেশ! তা বেশ! তার স্ত্রীর দেখা-শুনার দায়িত্বও কি আপনার ওপর?

—আজ্ঞে না, তিনিই আমার দেখাশুনা করছেন।

—তা বেশ! তা বেশ!

হঠাৎ দুরে ন্যান্সির গলা ভেসে এল— এ....ইউ..

—ক্রেগ— ক্রেগ্ হোভার, হি ইস এ নাইস্ বয়, কিন্তু এ লাইনে ও একদম নতুন। ভদ্রলোক আমার কথাটা লুফে নিয়ে তাঁর কথায় এলেন— ওরা জানেটা কি? আমার বয়স প্রায় পঞ্চান্ন, ওয়ার্ণার ব্রাদারস্‌কে আমি প্রায় জন্মাতে দেখেছি...ভদ্রলোক অনর্গল বকে চললেন।

আদি ওয়ার্ণার ছিল নিউ ইয়র্কে। সেখানেই তাদের শুরু। জ্যাক্ ওয়ার্ণারের বাবা ছিলেন একজন সাধারণ মুচী, নতুন জুতো তৈরী আর পুরানো জুতো মেরামত করাই তাঁর পেশা। তিনি ছিলেন নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে, তাঁরই ছেলে জ্যাক্ ওয়ার্ণার, বাবাব মতো মুচী না হয়ে বেছে নিলেন অন্য পথ। তিনি ছোট্ট একটা হাতে চালানো বড় কলের গানের মতো একটা কিনেটোস্কোপ (Kinctoscope) কিনলেন; সেই হচ্ছে সিনেমার আদিযুগ। সেই যন্ত্রটার বাঁদিকে এক পেনি ফেলে চোখ লাগিয়ে দেখতে হয়। সেইগুলো ছিল ঠিক স্লাইড্‌স্-এব মতো, খুব তাড়াতাড়ি হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে তাকে অনেকটা সজীব করা হতো। তাবপর আস্তে আস্তে উঠ্‌তে লাগলো সিনেমা জগতেব ধাপ— কিনেটোস্কোপ, ফ্যান্‌টাস্কোপ, ভিটেস্কোপ, বায়স্কোপ, ইত্যাদি।

নিউ ইয়র্কে তাঁদের স্বাধীনতা ছিল না। অধিকাংশ সময়েই পুলিশের তাড়া খেতে হ'ত, এবং কয়েকবার নিউ ইয়র্ক পুলিশ ওয়ার্ণারের যন্ত্র বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছে। সেই অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচবার জন্যই তারা হলিউডে এসে উঠেছে। তার আগে ঠিক একই কারণে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ থেকেই লস্ এঞ্জেলেসে একে একে আরও অনেকেই হলিউডে এসে জুটেছে। নির্বিঘ্নে পুলিশেব হাত এড়িয়ে মেয়েদের নিয়ে একটা কারবার খোলার এমন অপূর্ব জায়গা তখন আমেরিকায় বিরল। আমেরিকান আদিবাসী ও বনজঙ্গলের মধ্যে নির্বিঘ্নে স্যুটিং করা আর ঠিক পাশের বর্ধিষ্ণু শহর লস্ এঞ্জেলেস বা স্যান্‌ফ্র্যাঙ্গিস্‌কো গিয়ে তা দেখিয়ে পয়সা রোজগার করা। আজকের এই হলিউড্ এইভাবেই গড়ে উঠেছে।

আমবা উঠলাম— কারণ ভদ্রলোক যেভাবে তথ্য সরবরাহ করতে আরম্ভ করেছেন, বেশীক্ষণ শুনলে নিশ্চয়ই দক্ষিণা দিতে হবে। আমরা তাঁকে কোনরকমে এড়িয়ে আবার রাস্তায় পড়লাম। ন্যান্‌সি চলার পথে আমাকে হলিউড্ সম্পর্কে আরও কিছু কিছু তথ্য জানাতে লাগল; সেই তথ্যগুলোর কিছুই আমি আগে জানতাম না, তথ্যগুলো ঠিক উপেক্ষা করারও নয়, আমি তারই কিছুটা বিবরণ দিচ্ছি। বলাই বাহুল্য যে হলিউডের প্রধান সম্পদ হচ্ছে সিনেমা ইণ্ডাস্ট্রী।

প্রতি বছর আমেরিকায় প্রায় ছ'শ ফিল্ম প্রোডাক্‌শন হয় আর তার অধিকাংশই আসে হলিউড্ থেকে। ছ'শ— লঙ্ মিটার সে একটা বিরাট অংক। সমগ্র ফ্রান্সে বছরের প্রোডাক্‌শন হচ্ছে একশ আর জার্মানীতে (পঃ) দুশ। আমেরিকার প্রডিউসারদের সবাই যে হলিউডে থাকে তা নয়, দিন দিন হলিউডের বাজার কমে আসছে।

তবে হলিউডের নামটা যাবে কোথায়! বড় বড় সিনেমা আর্টিস্টরা হলিউডে তাদের বাড়ী করেছে। চার্লি চ্যাপ্‌লিন যদিও এখন স্যুইজারল্যাণ্ডে আছেন, কিন্তু তাঁর প্রথম বাড়ী ছিল হলিউডেই। নামকরা অনেক পুরোণো ও নতুন আর্টিস্টদের সাজানো বাংলো হামেসাই চোখে পড়ে। তাদের মধ্যে আছেন— গ্রেটা গার্বো, জন গিলবার্ট, রুডলফ্ ভালেন্টিনো, জন ব্যারিমোর, মেরী অ্যাস্‌টার, মন্‌টগোমারি, গ্যারী কুপার, মারলো ব্রাণ্ডো, এলিজাবেথ টেলর, ইত্যাদি আরও অনেক।

কয়েকদিন পর হঠাৎ খুব ভোরবেলা বাগানেব পাথরগুলো খস্‌খসিয়ে উঠল— মনে হচ্ছে কেউ ভারী জিনিস টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি বিছানায় উঠে বসলাম। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি একটা বিরাট চেভ্‌রোলেট আস্তে আস্তে ভিতরে ঢুকছে। ব্যাপার কি— এত ভোরে আগন্তুক' তাড়াতাড়ি গেঞ্জিটা পরে দরজা খুলে বেবিয়ে এলাম। গাড়ীর ভিতর থেকে বেবিয়ে এলেন একজন ভদ্রলোক— চুল ছোট করে কাটা, কিন্তু মুখ দাড়িতে ঠাসা। আমি তাঁর দিকে এগিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,

—গুড মর্ণিং! আমি আপনার কোনো উপকারে আসতে পারি কি? ভদ্রলোক আমাব দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। তারপব মিনিট পাঁচেক ধরে আমাকে ঘুবে ফিবে দেখতে লাগলেন, তারপর আমাব চোখেব ওপর সরাসরি তাকালেন। আমি তাঁব আচরণে একটু অস্বস্তি বোধ কবতে লাগলাম— সেই ভাবটা কাটাবার জন্য জিজ্ঞেস করলাম,

—আমি আমেরিকান নই, আমি ইণ্ডিযান, জীমেব বন্ধু, আমার নাম বিমল। আপনি কি ন্যান্‌সির সাথে কথা বলতে চান?

—নিশ্চয়ই, ডাকো তাকে। আমি ঘবে ঢুকে ন্যান্‌সির দরজায় মৃদু আঘাত করলাম— ভিতর থেকে তাব স্বরে ভেসে আসতেই গুড্ মর্ণিং জানিয়ে তাকে জানালাম যে একজন ভদ্রলোক তার জন্য অপেক্ষা করছেন। আমি বাইবে বেরিয়ে এলাম। ভদ্রলোকের সাথে একটু আলাপের চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমার চেয়ে ভদ্রলোকের উৎকণ্ঠাটা বেশী। তিনি নিজেই শুরু করলেন,

—আপনি জীমের বন্ধু?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—জীমতো আজকাল বাইরে আছে তা আমি জানি। তা আপনিই কি এখন তার হয়ে সবকিছু দেখাশুনা করছেন?

—না ঠিক্ তা নয়— তবে...

—তা বেশ! তা বেশ! তার স্ত্রীর দেখা-শুনার দায়িত্বও কি আপনার ওপর?

—আজ্ঞে না, তিনিই আমার দেখাশুনা করছেন।

—তা বেশ! তা বেশ!

হঠাৎ দূরে ন্যান্‌সির গলা ভেসে এল— এ....ইউ..

আমরা দু'জনেই সেদিকে তাকালাম।

ন্যান্সি ছুটে এসে— প্রায় জীমের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে চুমু দিতে লাগলো...আমি সত্যি হতবাক্!

আমিও তার কাঁধে একটা বিরাট থাপ্পর বসিয়ে দিয়ে বললাম— ইউ...জিম্!

দুটো ঠোঁটকে শক্ত করে কষে আমার দিকে তাকিয়ে বললো— ইউ বিমল— আই নো— আই ওয়াজ কিডিং, কাম অন্—ওয়েলকাম্। বুঝলাম জীম্ সেই আগের মতোই আছে।

লস্ এঞ্জেলেসের সব অলি-গলি অথবা দর্শনীয় স্থান দেখার ইচ্ছা আমার ছিল না। এখানে আসা অবধি আমি একমাত্র হলিউডেই গিয়েছি, তা ছাড়া অন্যান্য জায়গায় যাইনি, বিশ্রামের প্রয়োজনে। কিন্তু জীমের আসামাত্রই আমার সব প্ল্যান গেল ভেস্তে।

সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ওর সঙ্গে এদিক-ওদিক করে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে। জীম খুব দিল্‌খোলা মানুষ, যেখানেই যাক্ না কেন আমাকে নিয়ে যাওয়া চাই। এই শহরের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ড্রাইভ্ ইন্ (Drive in)। বিভিন্ন ধরনের ড্রাইভ্ ইন্ আর্থাৎ গাড়ীশুদ্ধ ভিতরে ঢোকা— আমেরিকার সব জাযগাতেই তা আছে বটে, কিন্তু এই শহরে যেন তার চূড়ান্ত। তার কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিই— সেদিন সকাল ন'টার সময় বেরোচ্ছি, রাস্তায় হঠাৎ ওর মনে পড়ল পকেটে পয়সা নেই, সাড়ে ন'টার সময় ওকে পৌঁছতে হবে ওর অফিসে, তার আগেই তিনটে আরজেন্ট চিঠি রেজিস্টারি করে ছাড়তে হবে, কাজেই পোস্ট অফিসেও যাওয়া দরকার। আমি জীমকে বললাম যে আমি ওর হয়ে কিছু করতে পারি কিনা। কিন্তু সে জবাবে বলল— প্রয়োজন নেই, সব কিছুই আধ ঘন্টার মধ্যে ম্যানেজ্ হয়ে যাবে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমরা অনেকটা গ্যারেজ আকারের একটা বাড়ীর মধ্যে ঢুকলাম। গাড়ীর ঠিক দরজার পাশেই একটা কাউন্টার— জীম মোটরের জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে চিঠিগুলো কাউন্টারে দিল। কাউন্টারের ভদ্রমহিলা সাথে সাথে রশিদ কেটে দিল। জীমের পকেটে খুচরো পয়সা ছিল না বটে, কিন্তু চেক বই ছিল, সে চেক কেটে তার দাম দিয়ে দিল— বুঝলাম এটা হচ্ছে ড্রাইভ্ ইন্ পোস্ট অফিস। ড্রাইভ্ ইন্— যেখানে গাড়ী থেকে না নেমেই কাজ হাসিল হয়। ওখান থেকে আমরা দশ মিনিট পরে এসে হাজির হলাম আর একটা গ্যারেজ কাউন্টারে। গাড়ীর থেকে হাত বাড়িয়েই ও চেক্ ভাঙিয়ে নিল— দু মিনিটের ব্যাপার। এটা ড্রাইভ ইন্ ব্যাংক।

এই ধরণের বহু ড্রাইভ ইন্ লস্ এঞ্জেলেসের বিভিন্ন রাস্তায় ছড়িয়ে রয়েছে। কাঁচা সব্জি দোকান, মাংসের দোকান, ইন্‌ফরমেশন, চায়ের দোকান, জলখাবারের দোকান— সোজা কথায় এই সব দোকানে সরাসরি গাড়ী শুদ্ধ ঢুকে টুকিটাকি কেনা-কাটা চলে। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে সিনেমা— আমার কাছে সেটাই

সবচেয়ে আশ্চর্যের। সিনেমার জন্য টিকিট কেটে আর চেয়ারে বসতে হয় না, মোটর শুদ্ধ সোজা কাউন্টারে টিকিট কিনে গাড়ী থামিয়ে মোটরে বসেই সিনেমা দেখ— তারপর সিনেমার শেষে মোটর স্টার্ট দিয়ে সরাসরি বেরিয়ে যাও। এখানেই আমার মনে হয় আমেরিকার সাক্‌সেস। যন্ত্রযুগের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন অথবা বলা যেতে পারে মানুষের কাজে যন্ত্র-সভ্যতার দান।

এল-এ'র আর একটা মজার ব্যাপার এখানকার ধর্ম। সম্পূর্ণ শহরে প্রায় দু'হাজার একশ'ব মতো বিভিন্ন ধর্ম সংস্থা— তার মধ্যে অধিকাংশই হচ্ছে ক্রীশ্চান ধর্মীয় সংস্থা। ক্রীশ্চান ধর্মের মধ্যেও যে এতগুলো ভাগ আছে তা আগে জানতাম না। জীমেব মতে ক্রীশ্চানদের মধ্যে কম কবেও তিনশ' সম্প্রদায় আছে— এদের মধ্যে সকলেই মনে করে তাবাই আসল ক্রীশ্চান আর অন্যান্যরা সব ফালতু— সত্যি আশ্চর্য নয় কি?

পৃথিবীব সব ধর্মেরই একটা না একটা শাখা এখানে পাওয়া যাবে। আমাব মতে লস্ এঞ্জেলেসই হচ্ছে বর্তমানে সবধর্ম সমন্বযেব এক পীঠস্থান।

এখানে ভারতীয় অনেক ধর্মীয় সংস্থা বয়েছে; তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—

মহাঋষি মহেশ যোগীর ট্রান্সেনডেন্টাল মেডিটেশন্ সোসাইটী,
শিবানন্দ মহারাজের— শিবানন্দ যোগ সেন্টার,
গুরু মহারাজের— ডিভাইন লাইফ্ সেন্টার,
স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণের— বেদান্ত সেন্টার,
সচ্চিদানন্দের— দিব্যজ্যোতি কেন্দ্র,
সাইবাবার— সাইবাবা কেন্দ্র,
যোগানন্দজীর— গোল্ডেন লোটাস্ টেম্পল,
প্রভুপাদ ভক্তিবেদান্তর— কৃষ্ণ কন্‌সাশনেস্ মুভ্‌মেন্ট,
কেশবচন্দ্রজীর— শিব-মন্দির।

এই সব সংস্থাগুলোর সভ্যরা সবাই আমেরিকান। একমাত্র রামকৃষ্ণ মিশনেই কিছু সংখ্যক ভারতীয়দের আনাগোনা আব বাকি অন্যান্য কেন্দ্রগুলো সবই খাঁটী আমেবিকানদের। তার মধ্যে কৃষ্ণমন্দির খুবই বিখ্যাত, কারণ সাহেব-মেমরা সবাই নেড়া হয়ে গেরুয়া পরে রাস্তায় খোল-করতাল নিয়ে দুবাহু তুলে নাচছে— সেটা ছাত্রমহলে বলতে গেলে একটা নতুন আন্দোলন! বাংলাদেশের বৈষ্ণবদের এরা হার মানায়।

এল-এ আশ্চর্যজনক একটি শহর! মরুভূমির শুক্‌নো পাথরের ওপর গড়ে উঠেছে আমেরিকা তথা পৃথিবীর অন্যতম সেরা শহর। আবহাওয়া রুক্ষ, বৃষ্টিপাতও অতি অল্প; কিন্তু চারদিকে তাকালে মনেই হবে না— চারিদিকে সাজানো বাগান, গাছ-গাছড়া আর সবুজের সারি। কলোরেডো ও ওয়েনস্ (Colorado, Owens) নদীর ওপর বাঁধ দিয়ে এরা জল ধরছে, তাছাড়াও রয়েছে ভূ-গর্ভস্থ জলভাণ্ডার। সেই জলের

ফলেই এল্-এর মাটীতে ফলছে সোনা। এখানকার চাল খুব বিখ্যাত, কমলালেবু তো জগৎ-বিখ্যাত। তাছাড়া রয়েছে বিরাট ও ব্যাপক আকারে অতি-আধুনিক প্রথায় গবাদি পশুর চাষ। এখানকার খামারও জগৎ-বিখ্যাত। ক্যালিফোর্ণিয়ায় হাজার হাজার একর জমি জুড়ে রয়েছে খামার, তাতে রয়েছে কোটি কোটি পশু। এখানকার একটা খামার সারাদিন মোটরে ঘুরলেও শেষ হবে না।

ইণ্ডাস্টিয়াল কথাটা বলতে যা বোঝায় এখানে তার চুড়ান্ত রূপ। বিজ্ঞানকে যে কত রকমে কাজে লাগানো যেতে পারে, এখানে না এলে তা বোঝা মুশকিল। বড় বড় কারখানাগুলোর মধ্যে রয়েছে মোটর তৈরীর কারখানা, মোটর বোট, রেল, নানা ধরনের ফ্যাটজাত পদার্থের কারখানা, লোহা-লক্করের ও আসবাবপত্রের, প্লাস্টিকের— সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য এরোপ্লেন তৈরীর কারখানা। এখানে কম করেও আটটি এরোপ্লেন তৈরীর কারখানা রয়েছে, তার মধ্যে সেরা চারটি, লক্-হেড (Lockheed), ডগলাস্ (Douglas), হাগস্ (Hugs), রিপাবলিক (Republc), পৃথিবী বিখ্যাত। এছাড়াও রয়েছে সিনেমার ব্যবসা— সে তো পৃথিবীর সেরা।

এক কথায় বল্‌তে গেলে এল-এ শুধু যে শিল্প-বাণিজ্যে উন্নত তাই নয়, উপরন্তু অত্যধিক ধনী শহর। কলকাতা থেকে ক্যালিফোর্ণিয়া পর্যন্ত আমার যাত্রাপথে এ ধরণের শহর এর আগে চোখে পড়েনি। আমার মতো ভবঘুরেদের এল্-এ স্বর্গরাজ্য, পৃথিবীতে চলার পথে যা কিছু সবই এখানে পরিপূর্ণ। মাঝে মাঝে মনে হয়— বিধাতার অভিশাপে গড়ে উঠেছে কলকাতা আর আশীর্বাদে লস্ এঞ্জেলেস।

হুইটনের মতো এল-এতেও আমাকে বিভিন্ন ক্লাবে প্রায়ই বক্তৃতা দিতে যেতে হতো, আর যেখানেই যাই না কেন, খালি হাতে কেউ বিদায় দেয় না। লস্ এঞ্জেলেসে আমি প্রথমে ভেবেছিলাম দিন দশ-পনেরোর বেশী থাকবো না, কিন্তু জীমের পাল্লায় পড়ে আমাকে থাকতে হ'ল প্রায় মাসখানেক। সাধারণতঃ আমেরিকানরা আত্মীয়স্বজন খুব বেশী পছন্দ করে না, টেলিফোনে হ্যালো বলেই ক্ষান্ত। আমার সাথে এদের সম্বন্ধটা আত্মীয়তা থেকেও অনেক বেশী। আমেরিকানরা ছোট বড় সবাইকে নাম ধরে ডাকে, আমি তাদের কাকু ডাক শিখিয়েছি, ছেলে-মেয়েরা আমাকে কাকু বলে। জীমের বউকে ডাকি বৌদি বলে, কারণ বয়সে আমার থেকে অন্ততঃ সাত-আট বছরের বড়।

শেষ পর্যন্ত একদিন তাদেরও বিদায় জানালাম' তাদের আতিথেয়তা ও আপন-করা স্বভাবকে আমি কোনদিন ভুলতে পারবো না। খুব ভোরের দিকে উঠে আমি পাড়ি দিলাম— উদ্দেশ্য গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ন।

গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ন

(Grand Canyon)

লস্ এঞ্জেলেস্ থেকে সরাসরি আমি দক্ষিণের পথ ধরলাম। একটু দক্ষিণে গিয়ে সমতল এলাকা ধরে আবার উত্তরের দিকে আসবো। গরম পরে গেছে, মাথার ওপর কাঠফাটা রোদ— এগিয়ে চলেছি ফোনিক্সের (Phoenix) দিকে। প্রায় একমাস পরে আবার পথের ছেলে পথে পড়েছি। রাস্তাটা ভালোই, কিন্তু অসহ্য গরম। মনে মনে কয়েকদিন ধরে ভাবছি যে, অনেক হয়েছে, যুক্তরাস্ট্র তো হ'ল— এবার যাওয়া যাক দক্ষিণের দিকে— আসলে রাখে হরি মারে কে! আমেরিকায় পা দেবার সাথে সাথেই আমার ভাগ্যটা খুলে গেছে।

সেদিন দুপুরবেলা একটা বারের ভিতর আলাপ হয়ে গেল দুটি মেয়ের সাথে। তারা আসলে সুইজারল্যাণ্ডের অধিবাসী, কিন্তু আমেরিকায় থেকে পড়াশুনা করে। তারা একটা বিরাট গাড়ী ভাড়া করে গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়নের দিকে যাচ্ছে। তাদের গাড়ীতে প্রচুর জায়গা আর তাছাড়া আমাকে তাদের সাথে নিতে চায়। মন্দ নয়— সুযোগ সে বড়ই হোক আর ছোটই হোক পেলে ছাড়তে নেই।

সুজান আর মিরিয়াম। বয়সে দু'জনেই বাইশের কাছাকাছি। কথায় কথায় জানলাম তারা সুইজারল্যাণ্ডের রাজধানী বার্ণ-এ থাকে— আমিও বার্ণ-এ প্রায় দিনপনেরো ছিলাম, সেখানকার একজন বাঙালী ইঞ্জিনীয়ার শান্তগোপাল চন্দ্র মহাশয়ের বাড়ীতে। বর্তমানে আমি পর্যটক— এরাও পর্যটক, কাজেই নিজেদের মধ্যে অনেক পয়েন্ট বেরিয়ে গেল। শেষে আমার ক্লান্ত সাইকেলটাকে তাদের গাড়ীর ভেতরে ঢুকিয়ে নিলাম।

এরা বিরাট একটা Record গাড়ী ভাড়া নিয়েছে— যাতে প্রয়োজন হলে ভিতরে শোয়া যায়। আমেরিকার মটরগুলোর সবই বড় মডেলের। স্যানফ্র্যান্সিস্কো থেকে ওরা গাড়ীটা ভাড়া নিয়েছে; বিভিন্ন শহর ঘুরে ওরা যাবে শেষ পর্যন্ত নিউ ইয়র্কে, সেখানে ওরা গাড়ীটাকে ছেড়ে দেবে। যুক্তরাষ্ট্রে ক্রস-কান্ট্রি ট্যুরের জন্য এ ধরণের গাড়ী ভাড়া দেবার বহু প্রতিষ্ঠান আছে। বিভিন্ন শহরে তাদের এজেন্সি রয়েছে। সেল্ফ্ ড্রাইভ করতে হয়।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর দিক সফর করেও দক্ষিণের আবহাওয়া সম্পর্কে আমার কোন ধারণাই ছিল না। বোস্টন, চিকাগো, নিউ ইয়র্কে, গরমকালের গরম যত কঠিন হোক না কেন, দক্ষিণের গরমের সাথে তার তুলনাই চলে না। নিউ মেক্সিকো

বা ক্যালিফোর্ণিয়ার মধ্যাহ্ন সূর্যের তাপে মনে হয় ধান রাখলে ফুটে খই হয়ে যাবে। সেই অসহ্য গরমকে নিয়ে আমরা এসে হাজির হলাম গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়নে।

বিকেলের দিকে আমরা আরিজোনা প্রদেশে এসে ঢুকলাম। মজবুত গাড়ী আর মেয়েদুটি চালায়ও ভালো, গাড়ীব বেগ সব সময়ই ঘন্টায় একশ কুড়ি কিলোমিটারের মতো— একেই বলে ড্রাইভিং! আরিজোনায় বিভিন্ন ছোটখাটো শহর পেরিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম মেইন ট্যুরিস্ট স্পটের দিকে। হাতে ম্যাপ রয়েছে, কাজেই কাউকে জিজ্ঞাসা করবার দরকাব নেই। আমার পরনে হাফ্ প্যান্ট ও হাতাকাটা গেঞ্জি, মেয়ে দুটির পরনে হাফ্ প্যান্ট আব হাতওলা গেঞ্জি। লজ্জার কোন ব্যাপার নেই। লজ্জা-সরমেব ব্যাপারটা এশিয়া এবং আফ্রিকার, ইউবোপের বা আমেরিকায় আমাদের দেশীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করতে গেলে, বড় একটা চোখে পড়ে না। সাতষট্টী নম্বব রাস্তা ধরে আমরা এবার এগিয়ে চলেছি সবাসরি দক্ষিণের দিকে। সন্ধ্যার অনেক আগেই আমরা এসে পৌঁছলাম (Kaıbab) ন্যাশনাল ফরেষ্টের শেষ শহবে— রাস্তাটার এখানেই শেষ।

বিরাট একটা কাঠেব বাড়ীর সামনে সিমেন্টের একটা তোরণ ট্যুরিষ্টদের স্বাগতম জানাচ্ছে। ঠিক তার পাশেই কয়েকজন পুলিশ এবং একটা সরকারী অনুসন্ধান অফিস চোখে পড়ল। গাড়ীটাকে পার্ক করে আমরা পায়ে হেঁটে এগিয়ে চললাম। প্রথমে কিছু খেতে হবে, দুপুবেলা খাওয়া হয়নি। কাঠেব বাড়ী। শহরটার নাম "ফাইনাল কেপ্"। কাঠের বাড়ীটাই হচ্ছে এখানকার সুপার মারকেট অর্থাৎ চুল কাটার দোকান থেকে আবম্ভ করে বেস্টুরেন্ট পর্যন্ত সবই বিদ্যমান।

হঠাৎ দেখি প্রায় সবাই বেরিয়ে আসছে— ব্যাপার কি, বন্ধ হয়ে যাবে নাকি? আমি এগিয়ে গিয়ে পাশেব দোকানে জিজ্ঞাসা করলাম—

—আপনার দোকান কি এখনি বন্ধ করবেন? ভদ্রলোক অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,

—তুমি কি পাগল? সন্ধ্যের আগেই কি আমাদের কারবার গুটোতে বল? এখানকার সব দোকানই খোলা থাকে বাত প্রায় এগারোটা বারোটা পর্যন্ত।

—তাহলে এই সব লোক বেরিয়ে যাচ্ছে কেন? —আমি তার কাছ থেকে জানতে চাইলাম। ভদ্রলোক হা-হা করে হেসে উঠে বললেন,

—ওঃ তাই বলো— এখন প্রায় সূর্যাস্তের সময়, তাই সব লোক বেরিয়ে যাচ্ছে সূর্যাস্ত দেখার জন্য। চিন্তা করো না, ওরা আবার ফিরে আসবে।

—সূর্যাস্ত! সেটা কি খুব দর্শনীয় বস্তু নাকি? —আমি অনেকটা বোকার মতো প্রশ্ন করে বসলাম। ভদ্রলোক আমার পিঠে অনেকটা থাপ্পড় মারার মতো একটা হাত রেখে বললেন,

—বুঝতে পারছি— তুমি এ সম্পর্কে কিছুই জানো না দেখছি, যাও বাইরে বেরিয়ে দু' চোখ খুলে রাখ, তাহলেই বু'ঝবে— এ জিনিস ব্যাখ্যা করা যায় না বাছা।

আমি চট করে তিনটে স্যাণ্ডউইচ্ কিনে নিয়ে সুজান ও মিরিয়ামকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম, দেখাই যাক....।

আহা মরি! কি বিচিত্র শোভা, এর বর্ণনা দেবো এমন ভাষা কোথায়? শুধু নয়ন মেলে চেয়ে রইলাম সামনের ওই শুকনো পাহাড়ের দিকে। দেখলে মনে হয় যে একটা বিরাট দেশ হঠাৎ যেন মাটির নীচে নেমে গেছে, আর আমরা দাঁড়িয়ে আছি ঠিক যেন পাহাড়ের চূড়ায়। সূর্যের রঙ পাল্টে আস্তে আস্তে অস্তমিত হ'ল— আর ঠিক তার পরেই শুরু হ'ল রঙের খেলা--- মুহূর্তে মুহূর্তে পাথরের রঙ পাল্টাতে লাগলো। পাথরের যে এত রঙ হয় আমি কোনদিনই ভাবিনি। সূর্যাস্তের পর আকাশে মেঘের ওপর রঙের খেলা দেখে দেখে আমরা ধাতস্ত হয়ে গেছি; কিন্তু পাথরের ওপর এমন রঙের বাহার এই প্রথম। আমি ভূ-পর্যটক, প্রকৃতির প্রেমিক, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তই আমার একমাত্র শৈশবের বন্ধু যে প্রতিদিন আমার সাথে সাথে ঘুরছে— তার এমন পরিবর্তন হচ্ছে দেখে আমিও অবাক! বিশেষ করে এ'তো আকাশ বা মেঘ নয় যে অসীমের ওপর রঙের আঁচড় দিয়ে তাকে সীমাবদ্ধ করা হচ্ছে। এ সম্পূর্ণ আলাদা। গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়নের প্রত্যেকটা পাহাড়, পাথর ও মাটীর ওপর রঙের আঁচড় দিয়ে— এই রুক্ষ কঠিন এলাকাটাকে করা হয়েছে স্বপ্নমধুর মায়াবী রাজ্য। দার্জিলিং-এর টাইগার হিলে সূর্যোদয় দেখেছি— মিশরের পিরামিড থেকে দেখেছি সূর্যাস্ত। উত্তর গোলার্ধের ট্রমসো থেকে দেখেছি মধ্যরাতের রঙিন সূর্য। গ্রীনল্যাণ্ডের থুলে থেকে দেখেছি বরফের ওপর সূর্যাস্তের রঙিন ও মনমাতানো প্রভা, কিন্তু গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়নের রূপ সম্পূর্ণ আলাদা। আমি বলবো না যে এখান থেকেই দেখা যায় পৃথিবীর সেরা সূর্যাস্ত, আমি বলবো এই গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়নে পাথরের রঙের খেলা এর আগে আর দেখিনি। এটা শুধু আমার অভিমত নয়, আমার মতো হাজার হাজার পর্যটক, যাঁরা গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়নের সূর্যাস্ত দেখেছেন তাঁদেরও অভিমত বটে।

প্রায় ঘন্টাখানেক পরে আমরা আবার ফিরে এলাম সেই বড় কাঠের ঘরের কাছে। সেখানে লোকারণ্য, অধিকাংশই বার রেস্টুরেন্ট আর স্যুভেনিরের স্টল। সেখান থেকে কিছুটা দূরে অনেকটা ব্যারাকটাইপের সারি সারি কাঠের বাড়ী, বাড়ী না বলে আমার মতে ঘর বলাই ভালো। তার কিছু দূরে রয়েছে ক্যাম্পিং এরিয়া। সুজান ও মিরিয়াম তাদের দু'জনের জন্য দু'বেডের একটা ঘর ভাড়া নিল। ঠিক ঘরের সামনেই কল রয়েছে, কাঁচা পায়খানাও রয়েছে আলাদা জায়গায়। ঠিক ঘরের সামনেই গাড়ী রাখবার জন্য রয়েছে ছোট্ট মতো একটা জায়গা। কয়েক রাতের জন্য ব্যবস্থা খারাপ নয়। নিতান্তই সাধারণ বন্দোবস্ত। আমেরিকানরা সাধারণতঃ লাক্সারিয়াস্ হোটেলে থেকে থেকে অভ্যস্ত— বড় বড় হোটেল আর মোটেল যাদের কাছে একঘেয়ে হয়ে গেছে, তারা এখানে আসে একটু সময় পাল্টাতে। দাম সে তুলনায় অবশ্য মোটেই সস্তা নয়। একটা বেড একরাতের জন্য এগারো ডলার। সুজান এবং মিরিয়াম ভেবেছিল

যে আমি ওদের মতো একটি ঘর নেবো, কিন্তু আমি তাদের বুঝিয়ে বললাম যে আমার ঘরের দরকার নেই। এরকম সুন্দর আবহাওয়ায় আমি বাইরে থাকতেই পছন্দ করি— বিশেষ করে অনেকদিন পর আমার ছোট্ট তাঁবুটার সদ্-ব্যবহার করা যাবে। আমি ওদের বিশেষ ধন্যবাদ ও আন্তরিকতা জানিয়ে ক্যাম্পিং-এর দিকে রওনা দিলাম। যাদের পক্ষে গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়নে আসা সম্ভব নয় তাদেব বোঝাবার জন্য আমি এখানকার একটু বর্ণনা দিই। আবিজোনা প্রদেশেব রাস্তা ধরে সরাসরি উত্তর থেকে দক্ষিণে আসতে হলে ড্রাইভারকে হঠাৎ থামতে হবে— কারণ রাস্তা বন্ধ। সমতল রাস্তা ধরে আসতে আসতে হঠাৎ পাহাড়ের দেয়াল দেখলে আমবা থামতে বাধ্য। এবার কল্পনা করুন পাহাড়ের বদলে বিরাট খাদ, তার মানে আর একটু এগোলেই— ব্যস, হাজার মিটাব নীচে পড়তে হবে! তারই জন্য এখানে বারবার চোখে পড়বে বিভিন্ন সাবধান বাণী। এখানকার একটা কাল্পনিক ছবি দেওয়া যাক।

হৃষীকেশের উত্তরে লছমনঝোলার কাছাকাছি গঙ্গার রূপটা কল্পনা করতে পারেন কি? এবার কল্পনা করুন যে খরস্রোতা গঙ্গা আবও হাজাব খানেক মিটার নীচে নেমে গেছে, দুপাশের ডাঙা গঙ্গার স্রোতে ভেসে গেছে, রয়েছে শুধু পাথর অথবা শুকনো বালি পাথর। গঙ্গাব এপার থেকে ওপারে যেতে হলে প্রায় পাঁচ-ছ' ঘন্টা ধরে নীচে নামতে হবে, তারপর কোন প্রকারে এ পাথর ও পাথর ডিঙিয়ে ভয়াবহ খরস্রোতা গঙ্গাকে পার হওয়া গেল— তারপর আবার ওপরে উঠতে হলে সামনে পড়বে বিরাট পাঁচিলের মতো খাড়াই পাহাড়, সে খাড়াই পাহাড়ে ওঠা সত্যি কষ্টসাধ্য ব্যাপার; এপার থেকে ওপারের দূরত্ব প্রায় মাইল দশ-পনেরো তো বটেই।

এই হ'ল মোটামুটি গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ানেব রূপ। লক্ষ লক্ষ বছর আগে কলোরাডো অন্যান্য নদীর মতোই সমতল ভূমির ওপর দিয়ে বয়ে চলতো— তারপর ক্রমশঃ তার দুপাশের মাটিকে খেয়ে আস্তে আস্তে সাপের মতো এদিক-ওদিক করে রূপ পাল্টাতে লাগলো নদী-ভূমির নরম মাটি ধুয়ে বয়ে চললো অনেক দূরে আর সেই সাথে নদীটাও সমতল ভূমির থেকে অনেক নীচে নেমে যেতে লাগলো।

নদীর এই ভাঙাগড়াব কাজে প্রকৃতির অন্যান্য শক্তিগুলো এসে যোগ দিতে লাগলো। ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাত ও অত্যধিক তুষারপাতের ফলে একে একে মাটি, বালি, চুনাপাথর, খড়িমাটি, সব ধ্বসে নেমে যেতে লাগলো গভীর কলোরেডো নদীর দিকে, আর কলোরেডো নদীর খরস্রোতে তা আস্তে আস্তে অনেক দূরে সরে গিয়ে শুরু হতে লাগলো বিভিন্ন আকারের ব-দ্বীপ। এইভাবেই সৃষ্টি হয়েছে আজকের পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ট দ্রষ্টব্য গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ন।

আমি খুব ভোরবেলাই উঠলাম, ভেবেছিলাম সূর্যাস্তের মতো সূর্যোদয়ও নিশ্চয়ই খুব চমৎকার দৃশ্য হবে, কিন্তু হতাশ হতে হ'ল। হলদে রঙের পাইন গাছের ফাঁক দিয়ে ভোরের সূর্যের রূপ দেখলাম। সে অনেকটা ঝাড়গ্রামের শালবনের ভিতর থেকে সূর্যোদয়ের দৃশ্য দেখবার মতো অবস্থা।

ভোর তখন সাড়ে পাঁচটা— আমি তাঁবু গুটিয়ে ব্যাগ গোছালাম, তারপর ব্যারাকের দিকে এসে সরাসরি সুজানদের দরজায় ঘা মারলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই মিরিয়াম নাইট ড্রেস পরে বেরিয়ে এল— আমাকে গুড্ মর্নিং জানিয়ে অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করলো,

—কি ব্যাপার বিমল, এই ভোর রাত্তিরে।

—ভোর রাত্রি— বল কি? এই দেখ বেলা গড়িয়ে এসেছে। হ্যাঁ ভালো কথা, আমি গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়নের নীচের দিকে যাচ্ছি, তোমরা কি যাবে নাকি আমার সাথে? যদি যেতে চাও চলে এসো— এখনি তৈরী হয়ে নাও। রোদ উঠে কড়া হয়ে গেলে নামতে ভীষণ কষ্ট হবে...

মিরিয়ম বা সুজান কেউই গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়নের নীচে নামতে রাজি নয়। কাজেই ওদের কাছ থেকে দ্বিতীয়বার বিদায় নিলাম। সাইকেলটাকে সিকিউরিটি অফিসে জমা দিয়ে দিলাম, কারণ কখন বা কবে ফিরবো তাবতো ঠিক নেই।

এখান থেকে নীচে নামবাব একটাই পথ। বিবাট সাইনবোর্ডে লেখা বয়েছে ব্রাইট্ এঞ্জেল ট্রাক্ (Bright Angel Track)। বাস্তাব ঠিক মোড়েই দাঁড়িয়ে আছে প্রায গোটা পঞ্চাশেক গাধা আর গাইড। যাদেব পাযে হেঁটে যেতে অসুবিধা তাবা গাধার পিঠে চড়ে যেতে পাবে। এখন বওনা দিলে ওখানে গিয়ে পৌঁছাবে প্রায় এগারোটা নাগাদ, অর্থাৎ নামতে লাগবে প্রায় পাঁচঘণ্টা আর উঠতে কমপক্ষে সাত ঘণ্টা। যাতায়াতের জন্য গাধা ও গাইড সমেত পযত্রিশ ডলার। অথবা শুধু ওঠবাব জন্য নীচের থেকেও গাধা ভাড়া পাওয়া যায়।

নীচে নামবার জন্য আমার মতো আরও ডজনখানেক লোক আগে থেকেই জড়ো হয়েছে। আবার কেউ কেউ সরাসরি নেমে যাচ্ছে। আমিও তাদের পথ ধরলাম। অতি সরু একটা রাস্তা কোনো রকমে পাহাড়েব গা বেয়ে এঁকেবেঁকে নীচের দিকে নেমে গিয়েছে। রাস্তাটা এত সরু যে কোন কোন জায়গায় পাশাপাশি দু'জন চলারও উপায় নেই। লাল মাটির পথ। কোন কোন জায়গায় ধস্ নামবার সম্ভাবনা আছে, সেখানে স্পষ্ট করে সাবধান লেখা রয়েছে। চলতে চলতে আলাপ হয়ে গেল আগে-পিছের অভিযাত্রীদের সাথে।

নামতে বেশ সোজা— আমার পিঠে ব্যাগ, টেন্টটাও সঙ্গে এনেছি। এখন ওটা ভারী লাগছে না— তার মানে মন ও গায়ের শক্তি পুরোপুরি আছে, কিন্তু ওঠবার সময়ই মজা বেরোবে! আমাদের সামনে বিরাট খাদ— আমরা যাচ্ছি অনেকটা পাতালপুরীর যাত্রী হয়ে। পাহাড়ের এ প্রান্ত পর্যন্ত ব্যবধান মনে হয় পনেরো-ষোল মাইল তো হবেই। জায়গাটা সত্যি অদ্ভুত! এখান থেকে অনেক কিছু কল্পনা করা যায়— অনেকটা মনে হয় মাটির নীচে কুবেরের পুরী আর তার ছাদটা যেন হঠাৎ উধাও হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে শ্যাওড়া ও কামরাঙা জাতীয় গাছ চোখে পড়ছে,

ছোট ছোট অসংখ্য বুনো ঝোপ-ঝাড় ও ফুলের গাছ; শাল বা পাইন ধরণের কোন গাছই নেই।

প্রায় চার ঘন্টার মধ্যেই আমরা এসে হাজির হ'লাম কলোরেডো নদীর ধারে, বেলা প্রায় দশটা; কিন্তু মাথাব ওপর প্রখর সূর্যের তাপ। কলোরেডো নদীর স্বচ্ছ জল দেখে মনে হ'ল ঝাপিয়ে পড়ি। মবিসও আমারই মতো— সে সঙ্গে সঙ্গে কাঁধের ব্যাগটা নামিয়ে রেখে প্যান্ট ও গেঞ্জি খুলে বাচ্ছা ছেলের মতো ন্যাংটা হয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল— আমিতো অবাক! অবাক মানে— দেখাদেখি তার স্ত্রীও সম্পূর্ণ উলঙ্গভাবে লাফাতে লাফাতে গিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল! সত্যি, সাধে কি আর বলে— আমেবিকানবা নতুন জাত— নাবালক। কাজেই আমি আর বাদ যাই কেন— ওদেব দলে আমিও গিয়ে যোগ দিলাম। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের ছোট্ট দলটা প্রায কুড়ি জনেব উলঙ্গবাহিনী হয়ে দাঁড়ালো। আমেরিকার মধ্যে পৃথিবী-ছাডা এ যেন এক সম্পূর্ণ অন্য জগৎ— যেখানে নেই সভ্যসমাজের নিষ্ঠুব বাঁধন....। প্রকৃতিব নিজেকে হাবিয়ে ফেলার এক অপূর্ব সুযোগ। এখানে যারা এসেছে মনে প্রাণে সবাইই এক-একজন অভিযাত্রী। মনে হচ্ছে, পৃথিবীর ওপর রেখে এসেছি আমাদেব সংস্কাব আব নীচে নেমে এসেছি আমাদের সহজ ও সরল প্রবৃত্তি নিয়ে।

নদী বয়ে চলেছে অতি শান্ত ও নির্বিঘ্নভাবে, পৃথিবী থেকে চলে এসেছে নীচে, খুঁজে পেয়েছে তাব শান্তি। এ নদীকে দেখে মনেই হবে না, যে একসময় সে প্রলংকারী ছিল। এই নদীবই ধারে পরিচিত হলাম কয়েক ঘর ইণ্ডিয়ানদেব সাথে। তাবা তাদের পুবোনো ট্রাডিশন বাঁচিয়ে কোনো বকমে টিঁকে আছে। তাদেব আমি আত্মপরিচয় দিলাম—

—তোমরা আমেবিকান ইণ্ডিয়ান, আর আমি হচ্ছি ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিয়ান অর্থাৎ খাঁটি ইণ্ডিয়ান।

আমাদেব ভাষায় যাকে বলে রেড ইণ্ডিয়ান, পিকাপাপা অথবা পিখাপাপা একুশ বছরের একজন যুবক— পরণে পাখীর পালকের একটা রঙীন ঘাঘড়া, মাথায় ঈগল পাখীর পালকের তৈরী লম্বা চূড়া, গলায় ও হাতের বাজুকায় রঙিন পুঁতির মালা। পিখাপাপা এখানকাব আদি বাসিন্দা বলে দাবী করে। আমাদের দলটার সাথে পরিচয় হবার একটু পরেই সে আমাদের চারদিকে ঘুরে ফিরে নাচ্‌তে শুরু করলো। প্রায় মিনিট দশেক নাচের পরেই সে সকলের কাছ থেকে দাবী করে বসল মাথাপিছু এক ডলার। যে যার খুশী মতো তাকে কিছু দিল, তারপর আমাদের নিয়ে সে তাদের ছাপরায় ঢুকলো; সেখানে একজন ভদ্রমহিলা চামড়ার কাজ করছে, একটি মেয়ে পুঁতির হার বুনছে আর একজন প্রবীন লোক রান্নাঘরে রান্না করছে— সকলের পরণেই খাঁটী রেড্ ইণ্ডিয়ান পালকের পোষাক। পিখাপাপা তার মা বোন ও বাবার সাথে তাদের ভাষায় কথা বলতে লাগলো। কিছুক্ষণ পরে সে আমাদের দিকে ফিরে ঠিক গাইডের মতো ভঙ্গিতে ইংরেজীতে সব ব্যাখ্যা করতে লাগলো।

এই অঞ্চলের রেড ইণ্ডিয়ানরা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে; তাদের মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য— ইয়াভাপাই, হুয়ালাপাই ও হাভাসুপাই। পিখাপাপার ভাষাকে বলে হাভাসুপাই। এদের দেবতা অনেক, জল ঝড় বৃষ্টি বজ্রপাত ও সাপ, এরা প্রধান দেবতা। তা ছাড়া রয়েছে প্রচুর উপদেবতা। এদের প্রধান উপজীবিকা শিকার কবা। আজকাল এরা আধুনিক উপায়ে মাছ ধরে বটে, কিন্তু আগে এরা মাছ ধরা জানতো না। বৃষ্টি না হলে বা বেশী বৃষ্টি হলে অথবা ঝড়ের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য এরা দেবতার উদ্দেশ্যে নাচে। ভগবান নাকি নাচ খুব পছন্দ করে।

পিখাপাপা এই ধরণের আরও কিছুক্ষণ বিভিন্ন প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করে তারপর থামলো। সকলকে জিজ্ঞাসা করলো তারা যদি কিছু কিনতে চায় তাহলে কিনতে পারে— সব হাতের তৈরী, মজবুত —খাঁটি ইণ্ডিয়ানদের তৈরী— খুব সস্তা, এখানেই কেনা ভালো, নয়তো ওপরে উঠলে একই জিনিস ডবল দামে কিনতে হবে। ..পিখাপাপাব হাবভাব ও কথাবার্তায় আমি আন্তরিকতার কোন আঁচ পেলাম না, উপরন্তু মনে হ'ল খাঁটী ব্যবসায়ী— সব পয়সার ধান্দা। ওখান থেকে একটু দূবেই আব একটি কাঠের বাড়ী পেলাম, এটা আসলে একটা বর্ধিষ্ণু দোকান, ছোট্টব ওপব মন্দ নয়, হাতের কাজেব একটা স্টল, ছোটখাটো এক রেস্টুরেন্ট, ওপরে থাকাব জন্য একটা হলঘর রয়েছে, রাতের জন্য খাটিয়া ও কম্বল পাওয়া যায়। এখানে আবও অনেক ইণ্ডিয়ান সেলসম্যান বয়েছে।

অমি, মরিস ও মাড্‌লিন সব সময় একই সঙ্গে রয়েছি। আমরা স্যাণ্ডউইচ ও টমেটো শস্‌ খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম। এখানে ইণ্ডিয়ান গাইডও পাওয়া যায় বটে, কিন্তু আমরা নিজেরাই স্বাধীনভাবে ঘুবে ফিরে দেখতে চাই। মরিসেব কাছে এ জায়গার একটা টোপোগ্রাফি রয়েছে, কাজেই হারাবার সম্ভাবনা নেই— অবশ্য একমাত্র যদি চোরাবালিতে না পরি।

আমরা কলোরেডো নদীটাকে সাঁতার কেটে পার হয়ে ওপারে এলাম অনেকটা। নদীটা বেশী চওড়া নয়, অনেকটা বনগাঁ'র কাছে ইছামতী নদীর মতো। তারপর হাঁটা ধরলাম পূর্ব দিকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা নদীর বাঁকে দেখলাম তিনটি রেড ইণ্ডিয়ান ছেলে ছিপে করে মাছ ধরছে। তাদের মধ্যে একটির সাথে আলাপ করলাম। কথায় কথায় ওকে পিখাপাপার কথা বললাম, ছেলেটি পিখাপাপার নাম শুনেই চটে লাল! ওর মতে পিখাপাপা খুব গুল মারে আর শুধু তাই নয়, ও নিজে ইণ্ডিয়ান যদিও কিন্তু ওর বাবা মা থাকে অন্যত্র— আসলে ট্যুরিস্টদের দেখিয়ে পয়সা পাবাব জন্যই ওর ওই সাজ-গোজ— এমন কি ছাপ্‌ড়া ঘর পর্যন্ত। রাতের বেলা ওরা ওখানে থাকে না। আসলে এখানকার রেড ইণ্ডিয়ানদের বলা হয় হোপী, গভর্ণমেন্ট থেকে এরা সামন্য কিছু ভাতা পায়, অধিকাংশ টাকাই আসে ট্যুরিস্টদের থেকে। ছেলেটিকে

দেখে মনে হয় বেশ ভদ্র— এদের পোষাক অন্যান্য রেড্ ইণ্ডিয়ানদের মতো নয়, সার্ট-প্যান্ট পরণে; নীচে নেমে আসা আমেরিকানদের চেয়ে অনেক ভদ্র।

আমরা তারপর আরও এগিয়ে চললাম। প্রায় ঘন্টাখানেক নদীর চড়ায় হেঁটে আমরা এসে হাজির হলাম আর একটি ইণ্ডিয়ান রিজারভেশনে। এটার এলাকা ও বাসিন্দাদের নাম হাইগু (Higu)। দেখে বিশ্বাস হয় না যে, এত গরীব লোকও যুক্তরাষ্ট্রে আছে। আমার ভাষায় বলবো— অনেকটা দিনমজুর সাঁওতালদের মতো। আমাদের দেখেই কয়েকটি ন্যাংটা ছেলে-মেয়ে দৌড়ে এল— সিগারেট, চুইনগাম, ডলার প্লীজ্— তাদের ভাবটা এমন যেন কোন জন্মে বাইরের লোক দেখেনি। এরা ইংরেজী ভাষাও জানে না। নিতান্তই অবহেলিত আমেরিকার অধিবাসী আমেরিকলি ইণ্ডিয়ান। কি দুরবস্থা!

একজন বুড়ো ভদ্রলোকের সাথে আলাপ হ'লো। তাকে আমি দুটো ডলার দিতেই ফোকলা দাঁত বের করে হি-হি করে হেসে উঠলেন। ভদ্রলোক ইংরাজী বলেন— তাঁর কাছ থেকে শুনলাম এখানকার বিশদ বিবরণ, হাইগু কাহিনী।

গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়নের কাইবা এলাকায় অনেকগুলো ইণ্ডিয়ান রিজার্ভ রয়েছে— হোপী, হাইগু ইত্যাদি আরও অনেক, এদের তুলনায় তা অতি সামান্য। বুড়ো ভদ্রলোকের মতে গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়নের ইণ্ডিয়ানরা অনেকটা চিড়িয়াখানারা জন্তর মতো। ওপর থেকে সাদা লোকেরা আসে তাদের দেখতে আর সময়ে সময়ে খাঁচার ফাঁক দিয়ে কিছু খাবার ছুঁড়ে দেয়।

বুড়ো ভদ্রলোক আগে কাজ করতেন, ওপরের একটা পেট্রোল পাম্পে, কিন্তু আজকাল তাঁর আর সেই সামর্থ্য নেই। তাই নেমে এসেছেন তাঁর আদি গ্রামে। রিজার্ভের ইণ্ডিয়ানদের অবস্থা অতি শোচনীয়। সরকারী খাতায় তাদের জমি দেওয়া হয়েছে দুশ ষাট হেক্টর, কিন্তু দু'শ ষাট হেক্টর জমির মধ্যে মাত্র পঁচাত্তর হেক্টর চাষযোগ্য। তাও তাদের হাতিয়ার নেই— সেই মান্ধাতা আমলের কোদাল কুড়ুল দিয়ে কি আর পাথরে ফসল ফলানো যায়? তবুও তারা আপ্রাণ চেষ্টা করছে ফসল ফলাবার জন্য। সাদালোকেরা বলে এরা কুঁড়ে, কিন্তু আসলে এরা কুঁড়ে নয়। ছেলে-মেয়েদের জন্য কোন শিক্ষাব্যবস্থা নেই, এমন কি তাদের সাদা লোক দেখতে হলে দশঘন্টার পথ বেয়ে কার্নিস ধরে ওপরে উঠতে হবে— সে এক বিরাট ঝামেলা। এখানে লোকে পয়সা দিলে তাদের নেবার অধিকার আছে, কিন্তু ওপরে সে অধিকার তাদের নেই; ভিক্ষা চাইলে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশে ধরবে। কাজেই ঝামেলার মধ্যে কে যায়?

কলোরেডোর ইণ্ডিয়ানরা শিকার খুব পোক্ত, কিন্তু আজকাল বন্দুকের যুগে সে ক্ষমতা তারা হারিয়েছে। রিজার্ভের যদি কেউ কোনরকমে একটা বন্দুক যোগাড় করতে পারে তাহলে তার জন্য চাই লাইসেন্স— সে অনেক টাকার ধাক্কা। তীর-ধনুক

দিয়ে শিকার করা যায় বটে, কিন্তু তার জন্য চাই বিরাট এলাকা— এখানে তারা সবাই সীমাবদ্ধ।

বুড়ো ভদ্রলোকের দুঃখের কথার কোন অন্ত নেই। এটা তাদের আদি দেশ— চৌদ্দ পুরুষের ভিটে-মাটি— আব সে মাটিতে'সাদা লোকেরা এসে সোনার সিংহাসনে বসে আছে, অথচ ইণ্ডিয়ানদের খাবার জন্য একটা চামচও নেই।

বুড়ো ভদ্রলোকের সাথে আমরা একমত। কিন্তু আমাদের করার কিছুই নেই— আমরা সবাই বিদেশী। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা আরও হাঁটতে লাগলাম। দেখতে দেখতে সন্ধ্যা গড়িয়ে এল, আমরাও প্রস্তুত হয়ে রইলাম সূর্যাস্ত দেখার জন্য।

অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা কবেও গতকালের মতো পাহাড়ের সেই মনোহর দৃশ্য আমরা দেখতে পেলাম না। আমাদের পাশেই নদীঘেষা বিরাট পাহাড়ের পাঁচিল, আর অন্যদিকেও বিরাট উঁচু-নীচু এবড়ো-খেবড়ো পাথর। তার রঙটা কিছুটা পাল্টালো বটে, কিন্তু তা এমন আহামবি কিছু নয়। আসলে সূর্যের সেই বঙিন থিয়েটার ওপর থেকেই দেখা সম্ভব।

আমরা এবার ফেরবার পথ ধবলাম— ব্রাইট এঞ্জেলের হোপী গার্ডেন। প্রায় ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমরা এসে হাজির হলাম আমাদের চটীতে। ওঠার কোন প্রশ্নই আসে না— অবশ্য প্রায় নব্বই ভাগ লোকই নদী পর্যন্ত এসে আবার ওপরে উঠে গেছে। কিন্তু আমরা আরও অনেক এদিক-ওদিক ঘুরেছি, আমরা সত্যি ক্লান্ত।

চটীতে সবশুদ্ধ আমরা এগারোজন। অনেকে সঙ্গে করে কৌটোজাত খাবার এনেছে আর বাকী লোকদের খাবার আয়োজন ইণ্ডিয়ানরাই করেছে। এটা ওদের নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। এখানে ইলেকট্রিকের কোনো ব্যাপার নেই, রাতে হ্যাজাক ও মোমবাতির আলোতেই কাজ সারতে হয়। পরিবেশটা সত্যি চমৎকার, অনেকটা অজ পাড়াগাঁয়ের বিয়ে-বাড়ীর মতো।

পরের দিন সকালে খাবার টেবিলে বসে হঠাৎ মরিস চেঁচিয়ে উঠল— এই দেখ দেখ! তার কথামতো আমি তার দিকে ঝুঁকে পড়লাম। সে আমাকে আঙ্গুল দিয়ে টোপোগ্রাফির ওপর ভালো করে নজর দিতে বললো— সত্যি অবাক বটে! আমি নিজেও অবাক হয়ে গেলাম— স্পষ্ট করে ইংরেজীতে লেখা শিব টেম্পল, আর একটু দূরেই বিষ্ণু টেম্পল, তার কাছাকাছি আর এক জায়গায় লেখা রয়েছে বুদ্ধ টেম্পল— সত্যি আশ্চর্য! এই সুদূর গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়নের রহস্যময় খাদেও রয়েছে হিন্দু নিদর্শন। সত্যি জানতে হবে তো, আর দেখতেও হবে এই মন্দিরটা। আমরা সেখানকার ইণ্ডিয়ানদের এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। তারা এ সম্পর্কে কিছুই জানে না। আমি একে একে সব ট্যুরিস্টকেই জিজ্ঞাসা করতে লাগলাম যদি তাদের মধ্যে কেউ এ বিষয়ে কিছু জেনে থাকেন, কিন্তু প্রায় সকলেই দেখলাম আমারই মতো। হঠাৎ একটি ছেলে আমার দিকে এগিয়ে এলো, তার হাতে একটা বই।

প্রায় ষোল-সতেরো বছরের ছেলেটা আমার দিকে এগিয়ে এসে বলল— দেখ, এই গাইড বইটার মধ্যে হয়তো কিছু পেতে পারো। মরিস সঙ্গে সঙ্গে বইটা নিয়ে পাতার পর পাতা ওল্টাতে লাগলো, প্রায় আধঘন্টা পর ও চেঁচিয়ে উঠ্ল— হুর্‌রে— পেয়েছি।

ব্যস কথা নয়— টোপোগ্রাফি বা ম্যাপ রয়েছে, গাইড বুকও পাওয়া গেছে। অতএব যাওয়া যাক। মরিস ও আমি গাইড হয়ে সকলেই বেরিয়ে পড়লাম, এগারোজনের মধ্যে নজনই রাজি হয়ে গেল আমাদের সাথে যেতে। আমরা সকলেই নতুন, একমাত্র ম্যাপই ভরসা। ব্রাইট্ এঞ্জেলের পথ ছেড়ে আমরা অন্য পথ ধরলাম।

আমাদের মধ্যে একজন স্পেলিয়লগ ছিলেন, তিনি রাস্তায় যেতে যেতে প্রত্যেকটি পাথরের বিষয় বিভিন্ন তথ্য জানাতে লাগলেন— কোন ধরণের পাথরেব কত বয়স, কি কাজে লাগে, ইত্যাদি। এই কলোরেডোব জমিও অত্যন্ত উর্বর ও খনিজ ধাতুতে পরিপূর্ণ। আমাদের মধ্যে একজন ছিলেন ফরেস্টার, তিনি যাবার পথে বিভিন্ন গাছ-গাছড়া সম্বন্ধে অনেক তথ্য সরববাহ করতে লাগলেন। একজন প্রজাপতি-বিশেষজ্ঞ জানালেন যে এখানে অনেক বেয়ার টাইপেব প্রজাপতি পাওয়া যায়। কলোরেডো নদীকে ধরে আমরা পশ্চিমদিকে ঘন্টাখানেক হাঁটাব পর অবশেষে দেখতে পেলাম শিব মন্দির। সত্যি শিব মন্দিরই বটে, অনেকটা দক্ষিণ ভারতীয় মন্দির ধরণের অর্থাৎ মন্দিরের ঠিক ওপরের অংশটা সূচালো নয়, ছাদের মতো। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে দেখে মনে হচ্ছে একটি অতি প্রাচীন কালের সুরক্ষিত মন্দির। কি অদ্ভুত সুন্দর মনে হচ্ছে! প্রত্যেকটা দেওয়ালের গায়ে অসংখ্য কারুকার্য করা। আরও কাছে যেতেই দৃশ্যটা অন্য রকম দেখতে লাগলো, অর্থাৎ দূর থেকেই এর সৌন্দর্য, কাছে গেলেই তার রূপ যায় পাল্টে। এই শিব মন্দিরটা আসলে একটা ছোটখাটো স্বতন্ত্র পাহাড়, শিলাবৃষ্টি ও অত্যধিক বরফ-পরার দরুণ আশ-পাশেব মাটি ধুয়ে নিয়ে নেমে গেছে, এইভাবেই গড়ে উঠেছে শিবমন্দির। ভারতে এই ধরণের যদি কোন প্রাকৃতিক মন্দির থাকতো তাহলে নিশ্চয়ই তা অন্যতম মহাতীর্থে পরিণত হ'ত। এর উচ্চতা প্রায় হাজার খানেক মিটারতো হবেই।

এই মন্দির-আকৃতির পাহাড়টার নামকরণ করেছেন বিখ্যাত আমেরিকান আর্কিটেক্ট ক্লারেন্স ডাটন (Clarence Dutton)। তিনি ছিলেন আমেরিকান ইনস্টিট্যুট অফ জিওলজির প্রফেসর এবং বিভিন্ন এক্স্‌পিডিশনের নেতা। দক্ষিণ আমেরিকায় বিভিন্ন ইনকা (Inka) অভিযানেও তাঁর দান অনেক। ভদ্রলোক ভারত-দরদী এবং বিশেষ করে হিন্দু ধর্মের ও হিন্দু স্থাপত্যের। তাঁর মতে ভারতীয় প্রাচীন মন্দিরগুলোর গঠন ও কারুকার্য ভীষণ কমপ্লিকেটেড— বিশেষ করে যে সময়ে যন্ত্রসভ্যতা প্রায় ছিলই না বলতে গেলে। তারই অনুপ্রেরণায় তিনি তাঁর পরবর্তী আবিষ্কারগুলোর নাম রেখেছেন হিন্দু স্থাপত্যানুযায়ী। এই শিবমন্দিরে ওঠার কোন উপায় আমাদের নেই। চারপাশের খাড়া দেওয়াল বেয়ে উঠতে হলে প্রয়োজন উপযুক্ত সরঞ্জামের, আর

তাছাড়াও প্রয়োজন প্রায় পাঁচ-ছয় ঘন্টা বা আরও বেশী সময়। আমাদের সঙ্গী আমেরিকানরা কেউই শিব সম্পর্কে কিছু জানে না, এবার আমার সুযোগ! তাদের বসতে বলে আমি শোনাতে লাগলাম শিব-সংবাদ।

আমার বক্তব্যটাকে যতটা সম্ভব সরস করবার জন্য বিভিন্ন রূপ-কথারও উল্লেখ করলাম। শিবের গুণ, তাঁর কাজ, সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় এবং তাঁর সঙ্গে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের সম্বন্ধ। পৃথিবীর কোন কিছুই স্থায়ী নয়, সবই তুলনামূলকভাবে— এই যে কলোরেডো নদীটাকে দেখেছি, দূর থেকে একে দেখে মনে হবে স্থায়ী, কিন্তু কাছে গেলেই দেখা যায় এর স্রোত একই স্থানে— প্রতিমুহূর্তে নতুন জল আসছে আর সেই নিত্য নতুন জলধারাতেই তৈরী হয়েছে নদী। এই যে সুন্দর ঘাসের ওপর হলদে ফুলটা ফুটে রয়েছে, সে একদিন ছিল না— তারপর সৃষ্টি হয়েছে কুঁড়ি, তারপর প্রকাশ হয়েছে সৌন্দর্যের, কয়েকদিন থাকবে, তারপর সে ঢলে পড়বে। ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু পালন করেন, আর শিব ধ্বংস করেন। এই তিনের খেলা নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে পৃথিবী। আপনারা যদি দেবতায় না বিশ্বাস করেন তাহলে ক্ষতি নেই, কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে যে একটা পরিপূর্ণ সংগঠনী শক্তি রয়েছে তাকে নিশ্চয়ই অস্বীকার করেন না, তাই না? দৃশ্য বা অদৃশ্যভাবে জগতের এই যে পরিবর্তন, তার পিছনে রয়েছে একটা বিরাট শক্তি— সেই শক্তিকেই আমরা পূজা করি, তাকেই আমরা দেবতা বলি— নাম এবং রূপ তার প্রতীক মাত্র। সাধারণ মানুষের কাছে আসল রূপ সব সময় ধরা পড়ে না, প্রতীকের মাধ্যমেই আমরা প্রত্যক্ষ করি সেই চিরন্তন সত্যকে। প্রতীক আমাদের অবলম্বন মাত্র। এই দেখুন না— এই এত বড় আমেরিকা তার বৈশিষ্ট্যকে ধরে রেখেছে আপনার গেঞ্জির বুকে ফ্ল্যাগের আকারে।

এই গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন আগে ছিল না, প্রাকৃতিক দুর্যোগে গড়ে উঠেছে আজকের গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন— আমাদের সামনের এই শিব মন্দির। সংক্ষেপে শিব সংহারের দেবতা, তাঁর সংহার বা ধ্বংসের মাধ্যমেই গড়ে উঠছে নতুনের। আমি থামলাম।

আমার ব্যাখ্যা শুনে প্রায় সকলেই সন্তুষ্ট, তার মধ্যে তো একজন প্রস্তাবই করে বসল আমি এর জন্য কোন পয়সা চাই কিনা। আমেরিকানদের এটা আর এক বৈশিষ্ট্য, পয়সা ছাড়া কোন কিছু পাওয়ার চিন্তা এরা করতে পারে না।

আমরা উঠলাম। এরই আশে-পাশে আরও অনেক এই ধরণের হিন্দু নামের কয়েকটি জায়গা রয়েছে, কিন্তু সেখানে যেতে হলে আরও ঘন্টাখানেক হাঁটতে হবে, কাজেই আমরা আর অগ্রসর হলাম না। ক্লারেন্স ডাটন শুধু শিবমন্দিরের নাম দিয়েই ক্ষান্ত হননি, তিনি আরও পাহাড়ের ও চুনাপাথরের বিভিন্ন আকারের ধ্বসের কাল্পনিক আকার আবিষ্কার করেছেন; তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য— বিষ্ণু-মন্দির, বুদ্ধমন্দির ও মিশরীয় সভ্যতার অনুকরণে নাম রেখেছেন হা-মন্দির, রা-মন্দির ও সূর্যমন্দির। এই সব স্থানের আগে কোন নাম ছিল না, কারণ রেড্ ইন্ডিয়ানরা খুব বেশী

একটা নামের পক্ষপাতী নয়, এই রহস্যময় উপত্যকাটাকে এরা ব্যবহার করতো শিকার ভূমি হিসেবে। মিঃ ডাটনের আগেও কয়েকটি জায়গার নাম রেড্ ইন্ডিয়ানরা দিয়েছে, কিন্তু সেই সব নামগুলো চলতি কথায় একটু বেখাপ্পা ধরণের। শিবমন্দিরের ঠিক পাশেই দুটো গোলাকার ধরণের পাথুরে ঢিবির নাম সুপাইদের ভাষায় বেনা, ইংরেজীতে Maiden's Breast, বাংলায় তার অনুবাদ নাই বা করলাম। আমি অবশ্য এই (কোনান্ ডয়ালের মতে) রহস্যময় জগতে কয়েকটা হিন্দুনাম পেয়ে খুবই সন্তুষ্ট।

প্রায় দুপুরের আগেই আমরা ফিরে এলাম চটীতে। সকলেই ক্ষুধার্ত। চটীতে এসে দেখি, তখন আর এক দল ওপর থেকে এসে হাজির হয়েছে, তাদের সঙ্গে রয়েছে একজন চোস্ত আমেরিকান গাইড। সে রোজ নামে না, তার রেটও খুব চড়া। এই গাইডের কাছ থেকে আমরা আরও অনেক কিছু জানলাম, গাইড নিজেই একজন স্পেলিয়লজিস্ট; জিওলজিস্ট তো বটেই।

এখানকার আদিবাসী রেড্ ইন্ডিয়ানদের মধ্যে এই গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন সম্পর্কে অনেক আজব গল্প প্রচলিত আছে। হাভাসুপাই উপজাতিরা বিশ্বাস করে এটা প্রেতলোক। রাতের চন্দ্রালোকেও এখানে বিভিন্ন কুহকের সৃষ্টি হয়, রঙ-বেরঙের পাথরের ওপর চাঁদের আলেয়া পরে অনেক ভূত-পেত্নীর সৃষ্টি হয়। বহু দুর্ধর্ষ ও সাহসী রেড ইন্ডিয়ান এখানে ভয়েই মারা গেছে।

বহু লেখক কবি ও শিল্পী এখানে আসে তাদের কল্পনাশক্তির বিকাশের জন্য।এখানে ভয়াবহ্ ভাইনাব জাতীয় সাপ প্রচুর রয়েছে, তাছাড়া রয়েছে শিয়াল, শিকারীদের জন্য রয়েছে খরগোশ, অ্যান্টিলোপ ও নানান ধরণের পাখী। গাঁজা ও চরস-ভক্তদের এটা নন্দনকানন। এখানে বিভিন্ন ধরণের গাছ-গাছড়া থেকে অনায়াসেই হ্যালুনিসেজিক্ পদার্থ তৈরী করা চলে। এই এলাকা সম্পর্কে রেড ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে অনেক রূপকথা আছে, তাদের মধ্যে একটা গল্পে বলে যে আকাশ থেকে ভগবানের অভিশাপে এক দৈত্য নেমে আসে, আর তারই চাপে মাটি নেমে গেছে পাতালে। আমি সেখানে আর এক রাত থাকলাম। রাতের নিঃশব্দ, ঘন অন্ধকার, তারই মাঝখান দিয়ে অতি মৃদু কলকল শব্দ করে বয়ে চলেছে কলোরেডো। একা-একা ঘুরলে গা ছমছম করে। এক অপূর্ব পরিবেশ!

পরের দিন আমি উঠে এলাম ওপরে। মরিস ওরা আগের দিনই উঠে এসেছে, মিরিয়াম ও সুজান চলে গেছে। ওপরে আমি এসে পড়লাম আবার জনারণ্যে। মাথার ওপর প্রচণ্ড সূর্যের তাপ। কিন্তু মনের মধ্যে তখনও গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়নের শূন্যতা—এখনও যেন শুনতে পাচ্ছি অন্ধকারের কান্না। সিকিউরিটি অফিস থেকে সাইকেলটি নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। আমেরিকায় আমার ম্যাপটার প্রত্যেকটি ভাঁজ এখন ছিড়ে গেছে। অনেকগুলো শহরের ওপর দাগ মারতে মারতে এফোড়-ওফোড় হয়ে গেছে। আমেরিকার মাটিতে পা দিয়েছিলাম শূন্য পকেটে, সকলের সহযোগিতায়

আর ঠাকুরের ইচ্ছায় আমার পকেট পূর্ণ। এখানে আমি সব পেয়েছি, আদর আপ্যায়ন সম্মান অর্থ— একজন পর্যটকের পরিপূর্ণতার জন্য যা প্রয়োজন সবই আমার সঞ্চিত হয়েছে। আর নয়, আমি অল্পেতেই সন্তুষ্ট, কিন্তু আমি পেয়েছি অনেক, এখনকার লোকেরা আমাকে দিয়েছে প্রেরণা— এখন আমাকে বিদায় জানাতে হবে।

গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়নে দুদিন থেকে আবার ফিরে পেয়েছি আমার বৈশিষ্ট্যকে— সেখানকার নিস্তব্ধতায় আমি উপলব্ধি করেছি যে আমি পর্যটক...প্যাডেলে পা দিলাম— এবার সোজা দক্ষিণের দিকে, জানি না এখান থেকে কতদিনে গিয়ে পৌঁছাবো মেক্সিকোর বর্ডার। মাথায় রোদ্দুর বটে, কিন্তু আমি জানি, আবও ওপবে রয়েছেন ভগবান....!